ভারতের অর্থনীতির পরিচয়

ভারতের
অর্থনীতির
পরিচয়

Written according to the Syllabuses of Two year Pass and Three-year Honours Arts and Commerce Degree Courses of Calcutta, Burdwan, North Bengal, Vidyasagar Viswavidyalaya, Ranchi and other Universities of West Bengal and Bihar.

ভারতের অর্থনীতির পরিচয়

বিদ্যোদয়

লাইব্রেরী

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
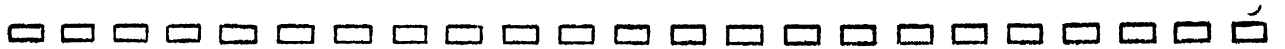
The Book covers the Syllabuses of :
Calcutta University : **B.Com. Honours,**
B.A. Economics Pass (Papers II & III),
B.A. Economics Honours (Paper IV),
B.A. Pol. Sc. Honours (Paper VI, Second half) ;
Burdwan University : **B.Com. Pass (Papers II & IV),**
B.A. Economics Pass (Papers II & III),
B.A. Economics Honours (Paper IV) ;
North Bengal University : **B.Com. Pass & Honours (Paper II),**
B.A. Economics Pass (Paper III) ;
Vidyasagar Viswavidyalaya : **B Com. Honours (Paper VIII),**
B.A. Pass (Papers II & III) ;
and *Ranchi University* : **B.Com. Pass (Paper II).**

অনিলকুমার বসাক

এম এ / প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চারুচন্দ্র সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা

অমৃতরঞ্জন চক্রবর্তী

এম এ. / প্রাক্তন অধ্যাপক, হেরম্বচন্দ্র (সিটি সাউথ, দিবা বিভাগ) কলেজ, কলিকাতা

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত নবম (নবপর্যায়)
সংস্করণের ভূমিকা

নবম সংস্করণের প্রকাশনার সুযোগে বইটির আরেকবার আদ্যোপান্ত সংস্কার, পরিবর্জন ও পরিমার্জন করা হ'ল। আশা করি বর্তমান সংস্করণটি পূর্বতন সংস্করণগুলির মতই অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সমাদৃত হবে।

বইখানির প্রকাশনার ব্যাপারে বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য রইল গ্রন্থকারদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। ইতি—

কলকাতা

অনিলকুমার বসাক
অমৃতরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম ভাগ

ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক সমস্যাবলী

প্রথম খণ্ড

অর্থনীতির কাঠামো ও উপকরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থনীতির বিকাশ ও পরিকল্পনা

তৃতীয় খণ্ড

অর্থনীতিক বিকাশের নির্দেশকসমূহ

চতুর্থ খণ্ড

অর্থনীতিক নীতি ও অর্থনীতিক বিকাশ

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রগত সমস্যাবলী

পঞ্চম খণ্ড

কৃষিক্ষেত্রের সমস্যাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

শিল্পক্ষেত্রের সমস্যাবলী

সপ্তম খণ্ড

সেবাক্ষেত্রের সমস্যাবলী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিবার্ষিক বি. কম. (অনার্স)
দ্বিতীয়পত্র

অধ্যায়	
১	২৪
২	২৫
৩	২৬
৪	২৭
৫	২৮
৮	২৯
৯	৩০
১১	৩১
১২	৩২
১৭	৩৩
১৮	১৩
১৯	১৪
২০	১৫
২১	১৬
২২	৬
২৩	

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিবার্ষিক (পাস) বি. এ.
তৃতীয়পত্র

অধ্যায় ২, ৩, ৪, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিবার্ষিক বি. কম. (পাস)
তৃতীয়পত্র

অধ্যায় ১, ২, ৫, ৮, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ৩২, ২৭, ৩০, ৩৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিবার্ষিক (পাস) বি. এ.
দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৫, ৩১

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিবার্ষিক বি. কম. (পাস)
দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিবার্ষিক বি. এ. (অনার্স)
চতুর্থ পত্র

অধ্যায়	
৩	১২
৪	৩০
১১	৩৩
১৭	১৫
১৮	১৪
১৯	১৩
২০	১৬
২১	২৯
২৩	৮
২৬	৯
২৮	১০
৩১	

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিবার্ষিক বি. এ. (পাস) দ্বিতীয় পত্র	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. (পাস ও অনার্স) দ্বিতীয় পত্র		বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম (অনার্স) অষ্টম পত্র
অধ্যায় ৫	অধ্যায় ১	২৮	অধ্যায় ১
৬	১১	৩০	(গ্রুপ এ) ২
৭	৩	৩১	৮
	১২	৩৩	১০
	১৭	১৫	১১
	১৮	১৪	৩
	১৯	১৬	১৭
	২০	৮	১৮
	২১	৯	১৯
	২২	১০	২০
	২৫	৪	২১
	২৬	২৯	২২
	২৭		২৩
			২৪
			২৫
			২৬
			২৭
			২৮
			২৯
			৩০
			৩১
			৩২
			১৩
			১৪
			১৫
			১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিবার্ষিক বি. এ. (পাস) তৃতীয় পত্র	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিবার্ষিক বি. এ. (পাস) তৃতীয় পত্র
অধ্যায় ১	অধ্যায় ১
১১	১১
৩	১৭
১৮	১৮
২০	২০
২১	২১
২৬	৩১
২৭	২৮
২৮	২৬
৩১	৩০
৩০	১৩
৩৩	৩৩
১৪	১৫
১৩	১৪
৮	১৬
১০	১০

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. (পাস) দ্বিতীয় পত্র	বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. (পাস) তৃতীয় পত্র		রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় বি. কম. (পাস) দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ১	অধ্যায় ১	২৩	অধ্যায় ১
৫	৫	২৪	৩
৬	৮	২৫	১২
৭	৯	২৬	১১
৮	১০	২৭	১৭
৯	১১	২৮	১৮
৪	২	২৯	২০
৩৩	৩	৩০	২১
১৭	১৭	৩১	২২
১৮	১৮	১৩	২৩
২৬	১৯	১৪	২৪
২১	২০	১৫	২৭
২০	২১	১৬	২৬
	২২	৩৩	৩০
			৩১
			৩২
			১০

প্রথম খণ্ড

অর্থনীতির কাঠামো ও উপকরণ
ECONOMIC STRUCTURE AND RESOURCES

১

ভারতের অর্থনীতির কাঠামো
The Structure Of The Indian Economy

১.১. অর্থনীতির কাঠামো
The Structure of an Economy

১. 'জীবন ধারণ করতে গিয়ে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে মানুষ পরস্পরের সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়; সে সম্পর্ক তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না; সে সম্পর্কটা হল উৎপাদনের বস্তুগত শক্তিগুলির বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায় অনুযায়ী যথোপযুক্ত উৎপাদন-সম্পর্ক। সামগ্রিকভাবে এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলি দিয়ে গঠিত হয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। সমাজের এই অর্থনৈতিক কাঠামোটাই হল প্রকৃত বনিয়াদ, যার উপর গড়ে ওঠে সমাজের আইনগত ও রাষ্ট্রনৈতিক উপরিকাঠামো।'[১]

উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়, বিনিয়োগ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজকর্ম-গুলি হল দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশ এবং জাতীয় অর্থনীতি হল এ সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মের সমষ্টি। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটি ওই সব অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

২. যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জানতে হলে সে দেশের অর্থনীতির কাঠামোটির গঠন বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। একটা দেশের অর্থনীতির কাঠামোর বা গঠনের আলোচনা থেকে সে দেশের অর্থনীতির আসল রূপ ও বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৩ কিন্তু পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কোনো দেশেরই জাতীয় অর্থনীতি ও তার গঠন চিরস্থায়ী নয়। ঐতিহাসিক-ভাবে অর্থনীতির কাঠামো চার প্রকারের: আদিম সাম্য-বাদী, সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক। ভারতে ইংরেজের আসার পর, বিশেষত বিগত শতকের মধ্য-ভাগ থেকে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, আজ তা একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, গ্রামভিত্তিক ও আত্মনির্ভর এক ধীরগতি-সম্পন্ন সমাজব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ থেকে আজ যন্ত্রভিত্তিক, শহরমুখী ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর পারস্পরিক নির্ভরশীল এক নতুন ভারতের আবির্ভাব ঘটছে।

১. **Karl Marx: Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy, 1859.**

১.২. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অসম অর্থনীতিক বিকাশ Uneven Economic Development of the Countries of the World

১. বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৪০০ কোটি। বিশ্বের সমৃদ্ধিশালী যে অংশে মানুষ সপ্তাহে ৪০।৫০ ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম করে না এবং সবিশেষ পরিমাণে বিশ্রাম ভোগ করে ও যাদের ভোগের মান পশ্চিম ইউরোপের সমতুল্য তার জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ বা ৮০ কোটি। পৃথিবীর বাদবাকি মানুষের অধিকাংশকে নিত্যসংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। তার মধ্যে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ অর্থাৎ মোট বিশ্বজনসংখ্যার অর্ধেকই জীবনমানের এমন স্তরে আজও বাস করছে যার তুলনায় ৫ হাজার বৎসর আগেকার প্রাচীন উন্নত সভ্য দেশগুলির কৃষকদের জীবনযাত্রার মান ছিল উঁচু।

২. বিশ্বব্যাংক পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে ঃ

(ক) বিকাশমান বা স্বল্পোন্নত দেশ (Developing or Less Developed Countries)।

(খ) শিল্পোন্নত বাজারভিত্তিক দেশ (Industrial market economies)।

(গ) পূর্ব-ইয়োরোপের বাজারবিহীন দেশ (East European non-market economies)।

(ক) বিকাশমান দেশগুলি আবার স্বল্প আয়ের দেশ (low income countries) এবং মাঝারি আয়ের দেশ (middle income countries), এই দুই ভাগে বিভক্ত।

স্বল্প আয়ের দেশগুলিতে বার্ষিক মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপন্ন (gross national product) ৪০০ ডলারের কম। মাঝারি আয়ের দেশগুলিতে বার্ষিক মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপন্ন ৪০০ ডলার বা তার বেশি।

মাঝারি আয়ের দেশগুলিকে বিশ্বব্যাংক আবার তিন ভাগে ভাগ করেছে ঃ (১) মাঝারি আয়ের তেল রপ্তানি-কারী দেশ (Middle income oil exporters)। এরা হল আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, ক্যামেরুন, কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, মিশর, গ্যাবন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পেরু, সিরিয়া, ত্রিনিদাদ ও ট্যাবাগো, টিউনিসিয়া এবং ভেনিজুয়েলা।

(২) মাঝারি আয়ের তেল আমদানিকারী দেশ (Middle-income oil importers)। এরা হল যন্ত্র-শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিকারী দেশ,—আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, গ্রীস, হংকং, ইস্রায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, পোর্তুগাল, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়া।

(৩) উঁচু আয়ের তেল রপ্তানিকারী দেশ (High income oil exporters)। এরা হল বাহেরিন, ব্রুনেই, কুয়েত, লিবিয়া, ওমান, কুয়েতর, সৌদী আরব এবং আরব যুক্ত আমীরশাহী (এখন এদের পরিবর্তন ঘটছে)।

(খ) শিল্পোন্নত বাজারভিত্তিক দেশগুলি পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বিকাশ সংগঠনের (Organisation for Economic Cooperation and Development or OECD) সদস্য এবং তৎসহ রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া।

(গ) পূর্ব ইয়োরোপের বাজারবিহীন দেশগুলি। আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মান গণতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া এবং সোভিয়েত রাশিয়া (এখন এদের পরিবর্তন ঘটছে)।

পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫০ ভাগেরও বেশি আজ গভীর দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। এই দেশগুলিতে জন্মহার বেশি, সাক্ষরতার হার কম এবং জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার আরও কম। তৃতীয় বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে।[৩]

১.৩. অর্থনীতির স্বল্পোন্নতি ও স্বল্পোন্নত দেশ Underdevelopment of an Economy and Underdeveloped Country

১. পৃথিবীর দেশগুলি আজ ধনী এবং গরিব দুটি ভাগে বিভক্ত। গরিব দেশগুলি অর্থনীতিকভাবে পশ্চাৎপদ, ধনী দেশগুলি উন্নত। গরিব দেশগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ। কেউ এদের বলেন বিকাশমান দেশ। কিন্তু 'উন্নত' ও 'স্বল্পোন্নত'—এ দুটি শিরোনামে পৃথিবীর দেশগুলিকে সুস্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়। কারণ, কোন্ দেশ সত্যিকারের উন্নত আর কারাই বা সত্যিকারের 'স্বল্পোন্নত' তা নির্ণয় করার সর্বজনস্বীকৃত নিখুঁত কোন মানদণ্ড স্থির করা কঠিন। তবে একটা বিষয়ে সকলেই একমত যে, পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি দেশ হল ধনী আর অধিকাংশ দেশ হল দরিদ্র।

২. যাদের আমরা উন্নত দেশ বলি তাদেরও সকলের উন্নয়নের স্তর এক নয়। অর্থাৎ, উন্নত দেশগুলির প্রত্যেকটিই

২. Lipsey : An Introduction to Positive Economics. p. 710.

৩. **Report of Dr. P. N. Dhar : UN Assistant Secretary General for Development Research and Policy Association to the 32-Nation Commission for Social Development at the Vienna Session, February 1983.**

উন্নয়নের সমান স্তরে রয়েছে, এমন নয়। এদের মধ্যে কয়েকটির অগ্রগতি খুবই উল্লেখযোগ্য, কারো বা ততটা অগ্রগতি হয়নি। তবে অগ্রগতির ব্যাপারে তারতম্য থাকলেও এরা সকলেই কিন্তু 'উন্নত' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায়, 'উন্নত' দেশগুলির মধ্যেও অর্থনীতিক অগ্রগতির দিক থেকে পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন, অর্থনীতিক উন্নয়নের যে স্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসে পৌঁছেছে, সে তুলনায় হয়ত সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো কোনো দিক থেকে স্বল্পোন্নত। পশ্চিম ইউরোপের কোনো কোনো উন্নত দেশ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। এর আর একটা দিক আছে। সেটি হল দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনার দিক। বহু উন্নত দেশ তাদের উন্নয়নের সবটুকু সম্ভাবনা শেষ করে ফেলেনি। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশও ভবিষ্যতে আরও উন্নত হতে পারে—এমন সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং উন্নয়ন হল একটা গতিশীল প্রক্রিয়া (dynamic process)।

৩. দরিদ্র দেশগুলির মধ্যেও দারিদ্র্য ও স্বল্পোন্নতির মাত্রায় পার্থক্য দেখা যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ দারিদ্র্যের শোচনীয় স্তরে রয়েছে, আবার অনেকেই বিকাশমান (developing)। এদের সকলকেই সাধারণভাবে স্বল্পোন্নত বলা হয় বটে, তবে এ স্বল্পোন্নতির মধ্যে নানা রকমের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী কোনো কোনো অঞ্চলে এই বিংশ শতাব্দীতেও সুপ্রাচীন উপজাতীয় সংগঠন টিকে রয়েছে। আবার, ভারতের মত দরিদ্র দেশে এমন এক সভ্যতা রয়েছে যা পশ্চিমী দেশগুলি থেকেও অনেক বেশি প্রাচীন। এ সব দেশের জনবসতির ঘনত্বের ব্যাপারেও বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। ব্রেজিলের মাথাপিছু জমির আয়তন তাইওয়ানের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনবসতির ঘনত্ব এশিয়ার তুলনায় অনেক কম।

৪. সুতরাং 'স্বল্পোন্নতি' বলতে একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট অবস্থা বোঝায় না। স্বল্পোন্নতির অবস্থাটা বস্তুতপক্ষে বহু বৈচিত্র্যময় ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মিলিত পরিণতি। এ কারণেই, সব স্বল্পোন্নত দেশের উন্নতির পথের বাধাগুলিও ঠিক এক ধরনের নয়। দেশে দেশে এ বাধাগুলির রকমফের দেখা যায়।

৫. স্বল্পোন্নত দেশগুলির অবস্থার মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য থাকলেও 'স্বল্পোন্নত দেশ' এর ধারণাটি তাৎপর্যহীন নয়। এ দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি বৈশিষ্ট্য এদের সকলের মধ্যেই দেখা যায়। সে বৈশিষ্ট্যটি হল : উন্নত দেশগুলির দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের বিরাট ও চমকপ্রদ ঘটনা সম্পর্কে এদের অনেকে সচেতন হয়েছে এবং নিজ নিজ দেশের অর্থনীতিকেও যে ঐভাবে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে এরা অবহিত হয়েছে। এ সব দেশের ক্ষেত্রে আরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেটা হল এ সব দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়া 'শুরু করার' সমস্যাটা কমবেশি থেকেই গেছে।

৬. অর্থনীতিক স্বল্পোন্নতির নানা দিক আছে। তা বিচারের নানা মাপকাঠি ব্যবহার করা যায়। যেমন, মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু পুঁজি ব্যবহারের পরিমাণ, মাথাপিছু সঞ্চয়, দেশে সাক্ষর জনসাধারণের অনুপাত, জনসাধারণের শিক্ষার মাত্রা, খাদ্য, পরিধেয়, ভোগের পরিমাণ, মাথাপিছু শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ, উপকরণ ব্যবহারের অনুপাত ইত্যাদি, ইত্যাদি। সাধারণত দেশের জনসাধারণের বার্ষিক মাথাপিছু আয়টাকে অর্থনীতিক উন্নতির একটা প্রধান মাপকাঠি বলে ধরা হয়। যেমন রাষ্ট্রসংঘ ধরেছে।

৭. তাই 'স্বল্পোন্নতি' কি -এর উত্তর একটি মাত্র সংজ্ঞায় দেওয়া সম্ভব নয় ; বিভিন্ন দিক থেকে ও বিভিন্ন মানদণ্ডে এ ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ মানদণ্ডগুলি হল : (ক) দেশে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা বা রোগ প্রভৃতি কতটা তীব্র ও গভীর। (খ) জাতীয় আয়ের বণ্টন কতটা সুষম বা অসম। (গ) দেশের প্রশাসন কতটা দক্ষ বা অদক্ষ। (ঘ) দেশের সামাজিক, অর্থনীতিক জীবনে কি পরিমাণ বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং স্বল্পোন্নতি বলতে যা বোঝায় তার সবটাই প্রকাশ করতে পারে এমন একটি ব্যাপক সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৮. উৎপাদনের মূল উপাদান তিনটি : প্রাকৃতিক উপকরণ, মানবশক্তি এবং পুঁজি। এই তিনটির ব্যবহার স্বল্প হলে বা কম দক্ষতাসম্পন্ন হলে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ স্বল্প হবে। মানুষের জীবনযাত্রার মানও নিচে নেমে যাবে। অর্থনীতিক স্বল্পোন্নতির এটাই মূল কারণ। এজন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশন বলেছে, স্বল্পোন্নতি হল এমন একটা অবস্থা যেখানে কমবেশি অব্যবহৃত বা অল্পব্যবহৃত মানবশক্তির সাথে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সহাবস্থান দেখতে পাওয়া যায়।

৯. এই কথাটাই ভিন্ন ভাবে অধ্যাপক এম. এল. শেঠ বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশ হল এমন দেশ, যে দেশে পুঁজি গঠনের স্বল্পহারের দরুন অব্যবহৃত বা অল্পব্যবহৃত মানবশক্তির সাথে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সহাবস্থান দেখতে পাওয়া যায়।

১০. সাইমন কুজনেৎস স্বল্পোন্নতির তিনটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। (ক) স্বল্পোন্নতি এমন একটা অবস্থা বোঝাতে পারে যেখানে দেশটি প্রচলিত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের উৎপাদন সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করতে

পারছে না। (খ) স্বল্পোন্নতি বলতে অর্থনীতিক দিক থেকে উন্নত দেশের তুলনায় কোনো দেশের পশ্চাৎপদ অর্থনীতিক অবস্থা বোঝাতে পারে। (গ) স্বল্পোন্নতি বলতে **অর্থনীতিক দারিদ্র্যও বোঝাতে পারে। এ দারিদ্র্য হল দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন ধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব।**

১.৪. দারিদ্র্যের পরিমাপ
Measure of Poverty

১ কোনো দেশ দরিদ্র—একথা বলতে আমরা ঠিক কি বুঝব? দারিদ্র্যের কি কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাপ আছে? কারণ, দারিদ্র্যের অর্থ একজন মার্কিন শ্রমিকের কাছে যে রকম, ভারতের শ্রমিকের কাছে সে রকমের নয়। আবার স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যের গভীরতা বা তীব্রতার অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এ জন্যই প্রশ্নটি হল : আধুনিক কালের স্বল্পোন্নত দেশগুলির দারিদ্র্যের পরিমাণ কি মাপা যায়? উত্তরে বলা যায়, তা পরিমাপ করার অনেক অসুবিধা আছে। নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব এ ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। তা ছাড়া, উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এক ধরনের নয়। এদের উৎপাদনের পরিমাণেও বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। তাই এক দেশের সাথে অন্য দেশের উন্নতি বা দারিদ্র্যের তুলনা করা অতি কঠিন। তা সত্ত্বেও উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির বার্ষিক মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে। সারণি ১-১-এ বিভিন্ন দেশের ১৯৮৭ সালের মাথাপিছু উৎপাদনের হিসাব দেখান হয়েছে।

সারণি ১-১ মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেণীবিভাগ (১৯৮৭) [১২৮টি দেশের পরিসংখ্যান থেকে]

দেশ (১)	জনসংখ্যা (কোটি) (২)	মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (ডলার হিসাবে) (১৯৮৭) (৩)	গড়পড়তা বার্ষিক উন্নয়ন হার (শতাংশ) (১৯৬৫-৮৭) (৪)
১. স্বল্প আয়ের দেশ	২৮২.২৯	২৯০	৩.১
ভারত	৭৯.৭৫	৩০০	১.৮
চীন	১০৬.৮৫	২৯০	৫.১
পাকিস্তান	০.২৫	৩৫০	২.৫
২. স্বল্প মাঝারি আয়ের দেশ	৬০.৯৬	১,২০০	২.২
ইন্দোনেশিয়া	১৭.১১	৪৫০	৪.৫
মিশর	৫.০১	৬৮০	৩.৫
থাইল্যান্ড	৫.৩৬	৮৫০	৩.৯
ফিলিপাইন	৫.৮৪	৫৯০	১.৭
৩. উচ্চ মাঝারি আয়ের দেশ	৮৫.২৫	২,৭১০	২.৯
ব্রেজিল	১৪.১৪	২,০২০	৪.১
মালয়েশিয়া	১.৬৫	১,৮১০	৪.১
দক্ষিণ কোরিয়া	৪.২১	২,৬৯০	৬.৪
৪. উচ্চ আয়ের দেশ	৭৭.৭২	১৪,৪৩০	২.৩
সৌদী আরব	১.২৬	৬,২০০	৪.০
কুয়েত	০.১৯	১৪,৬১০	৪.০
যুক্তরাজ্য	৫.৬৯	১০,৪২০	১.৭
জাপান	১২.২১	১৫,৭৬০	৪.২
সুইজারল্যান্ড	০.৬৫	২১,৩৩০	১.৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪.৩৮	১৮,৫৩০	১.৫

সূত্র : World Development Report, World Bank, 1989.

১.৫. স্বাধীনতা লাভের সন্ধিক্ষণে ভারত : ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল

India on the Eve of Independence : Impact of the British Rule

১. ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ শাসনের অবসান মুহূর্তে ভারত ছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম। স্বল্পোন্নত অর্থনীতি বলতে যা কিছু বোঝায় তার সমস্ত লক্ষণ ছিল সর্বাঙ্গে প্রকট। এ সব লক্ষণ ১৯৪৮-৪৯ সালের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিক কার্যাবলীর অবদান থেকে দেখা যায় :

কৃষি তখন জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন করত (৪৯'১%)। খনি, কলকারখানা ও ক্ষুদ্র শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি উৎপাদন করত মোট জাতীয় আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র (১৭'১%)। যা তখন অন্যান্য সেবাক্ষেত্রের অবদানের (১৫ ৭%) তুলনায় সামান্য বেশি হলেও, ব্যবসায়, পরিবহণ ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের অবদানের চাইতেও কম ছিল। এই তথ্যগুলি থেকে প্রায় দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষে ভারতের অর্থনীতিতে বিভিন্ন অর্থনীতিক কার্যকলাপের তুলনামূলক গুরুত্বটি প্রকাশ পেয়েছে।

২. **প্রাক্-ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক সম্পর্ক** (Pre-capitalist economic relationships) : খনি, রেল ও অন্যান্য পরিবহণ, ডাক ও তার, ব্যাংক ও বীমা, কল কারখানা, এবং আংশিকভাবে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি যে সব ক্ষেত্রে মজুরি ও বেতনের বিনিময়ে নিযুক্ত শ্রমশক্তির দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয়, তা সামগ্রিকভাবে ভারতের অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ক্ষেত্ররূপে গণ্য করা যায়। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী, উভয় ক্ষেত্রই এর অন্তর্গত। অধ্যাপক বেটেলহেইমের মতে কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও ব্যবসায় থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অন্ততঃ ৩০ শতাংশ স্বাধীনতালাভের সময় অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ৩০ শতাংশের মধ্যে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানাজাত আয় ধরা হয়নি। সেটা ধরা হলে এর পরিমাণ ৩০ শতাংশের বেশিই হবে। অন্যদিকে, যদি কেবল পুঁজি ও সম্পত্তির মালিকানাজাত আয় ধরা হয়, তাহলেও তার পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশের মতই দাঁড়ায়। স্বাধীনতালাভের সময় ভারতের মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। এটাই ভারতের অর্থনীতিতে প্রাক্-ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক সম্পর্কের গুরুত্ব নির্দেশ করে। ওই প্রাক্-ধনতন্ত্রী অর্থ-নীতিক সম্পর্কগুলি দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের হারের বৃদ্ধির পথে তা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

৩. **দেশে কর্মরত শ্রমশক্তি** (The working force) : ১৯৫১ সালে দেশের মোট কর্মরত শ্রমশক্তি ছিল ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ।[৪] বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে তার বণ্টন ছিল নিম্নরূপে :

স্বাধীনতা লাভের সময় দেশের মোট কর্মরত শক্তির ৭২ শতাংশ নিযুক্ত ছিল কৃষিক্ষেত্রে ; বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল মাত্র ২ শতাংশ, যা সে সময়ে প্রশাসনে কর্মরত শ্রম-শক্তির (২'৭ শতাংশ) চাইতেও ছিল কম। সবপ্রকার শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিল ১১ শতাংশেরও কম : ৮ শতাংশের কম শ্রমশক্তি নিযুক্ত ছিল তাবৎ ব্যবসায় ও পরিবহণ ক্ষেত্রে। ১০ শতাংশেরও কম নিযুক্ত ছিল অন্যান্য সেবা ক্ষেত্রে। এ সব তথ্য তৎকালীন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতার পরিচয় বহন করে।

কিন্তু শিল্পোন্নতির অভাব সত্ত্বেও, সে সময় দেশের কর্মরত শ্রমশক্তির প্রায় ৩৮ শতাংশ ছিল বেতন ও মজুরি জীবী। এদের একটা বড়ো অংশ ছিল ক্ষেতমজুর। কিন্তু তৎকালীন ভারতের ওই বিপুল সংখ্যক ক্ষেতমজুরের বা কৃষি শ্রমিকের উদ্ভব আধুনিক ধনতন্ত্রী কৃষি ব্যবস্থার ফলেই হয়েছিল এ রকম ধারণা করলে ভুল হবে। বস্তুতপক্ষে সেটা ছিল কৃষিতে জনাধিক্যেরই লক্ষণ। ভারতের কৃষক সমাজের একটা বিরাট অংশ ছিল তখন জমিহীন এবং সারা বৎসর ধরে তারা কাজও পেত না।

সুতরাং সামান্য শিল্পায়ন, কৃষির উৎপাদনের স্বল্পতা, মাথাপিছু জাতীয় আয়ের স্বল্পতা, অর্থনীতির যৎসামান্য উন্নয়ন হার, বিরাট বেকার বাহিনী ও স্বল্পনিযুক্তি—এই ছিল স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতের সামাজিক-অর্থনীতিক অবস্থার চিত্র।

১.৬. ভারতসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলির মূল বৈশিষ্ট্য

Basic Features of Underdeveloped Countries including India

১ একটা দেশ স্বল্পোন্নত কিনা তার প্রধান নির্দেশক হল তার মাথাপিছু প্রকৃত আয় বা মাথাপিছু প্রকৃত অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপন্ন। নানা রকমের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে অর্থনীতিক স্বল্পোন্নতি প্রকাশ পায়। ওই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার দুরকমের। কতকগুলি বৈশিষ্ট্য স্বল্পোন্নতি নামক ব্যাধিটির **লক্ষণমাত্র**। আর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে **অন্তরায়ও** বটে।

---

৪. **Final Report of the National Income Committee.**

২. মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ : (১) রূপান্তর প্রক্রিয়ার অধীন প্রাচীন ঐতিহ্যের সমাজ : এই সব স্বল্পোন্নত দেশ হল প্রাচীন রীতিনীতি ও ঐতিহ্যে আবদ্ধ সামাজিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার দেশ (traditional societies)। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যক্তিগত মালিকানা ও বাজার ব্যবস্থার পথে কিংবা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমষ্টিগত মালিকানা ও পরিকল্পনার পথে এদের যে অর্থনীতিক উন্নয়ন শুরু হতে পারত তার কোনোটিরই বিকাশ এসব দেশে ঘটেনি। এটা হল এদের গভীর ও ব্যাপক দারিদ্র্যের মূল কারণ।

(২) প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত কিন্তু বিকৃত অর্থনীতির উত্তরাধিকারী এবং নতুন অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিপদের সম্মুখীন উন্নতি-কামী সমাজ : ভারতসহ এইসব স্বল্পোন্নত ও বিকাশমান দেশগুলি পশ্চিমী উন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলির অধীন উপনিবেশ ছিল। শোষণের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ করল রেলপথ স্থাপনে, খনি ও বাগিচা শিল্পে, চটকলে। এরই ফলে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি এসব দেশে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা দেশীয় প্রাচীন কুটির ও হস্তশিল্পগুলিকে ধ্বংস করে উপনিবেশগুলিকে নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের বাজার ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানদারে পরিণত করল। স্থাপিত হল অল্প কয়েকটি মাত্র শিল্প যা শাসকদেশের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে পারে। ভারত হল পাট, চট ও চায়ের যোগানদার। সীমাবদ্ধ এবং বিকৃত শিল্পায়ন ঘটানো হল শাসকদেশের স্বার্থে, উপনিবেশগুলির প্রয়োজনে নয়। সেই থেকে **উত্তরাধিকার সূত্রে সব স্বল্পোন্নত দেশই পেয়েছে একটি বিকৃত অর্থনীতি** (lopsided economy)। বিকৃত অর্থনীতির দরুন বিকৃতি এসেছে স্বল্পোন্নত দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যেও। **এরা সকলেই অল্প কয়েকটি দ্রব্যের রপ্তানিকারী রয়ে গেছে আজও।** ভারত প্রধানত চা, পাট, চট ও কাপড়, চিলি তামা, হণ্ডুরাস কলা, মালয় টিন, আরব দেশগুলি তেল, ব্রেজিল কফি রপ্তানি করে। **উৎপাদনে বৈচিত্র্য নেই বলে রপ্তানী বাণিজ্যও এদের বৈচিত্র্যহীন।**

বর্তমান পৃথিবীতে বিদেশী রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনীতিক শোষণের পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে বটে, তবে প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী তথা উন্নত ধনতন্ত্রী দেশ-গুলির বেসরকারী বহুজাতিক একচেটিয়া করপোরেশন-গুলির অর্থনীতিক জাল এইসব প্রাক্তন ঔপনিবেশিক তথা স্বাধীন স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিস্তৃত হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দুনিয়ার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি উন্নত ধনতন্ত্রী দুনিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে অসুবিধা-জনক অসম প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দিশেহারা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এইসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বহুজাতিক একচেটিয়া করপোরেশনগুলি এসব দেশকে কিছু বেশি মজুরি, সামান্য কিছু আধুনিক কারিগরী বিদ্যা, কিছু কর্মীর কাজের ভাল শর্ত, কিছু নতুন কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে এসব দেশে শিল্প স্থাপনের অনুমতি আদায় করছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি এসব প্রস্তাব মেনে নিচ্ছে শিল্পায়ন ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সুবিধার আশায়; যদিও তারা জানে এর দ্বারা **দেশের অর্থনীতি বিদেশী বহুজাতিক একচেটিয়া করপো-রেশনগুলির নিয়ন্ত্রণে ধীরে ধীরে চলে যাবার প্রবল আশংকা থাকে।** এই হল স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে আধুনিক অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের বা নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের ক্রমবর্ধমান বিপদ এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৩) অর্থনীতির দুর্বল কৃষি ভিত্তি : ভারত সহ সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশেরই কৃষি দক্ষতাহীন এবং দুর্বল। ফলে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় **স্বল্পোন্নত দেশগুলির কৃষির উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম।** কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতেও কম। এই কারণে **জনসংখ্যার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ বা তারও বেশি কৃষিতে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এবং কৃষি থেকে জাতীয় আয়ের অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন** করা সত্ত্বেও, এরা না পারে জনসাধারণের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে না পারে যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদন করতে, যদিও কৃষিজাত দ্রব্যই এসব দেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানী সামগ্রী।

এইসব দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি ও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। কৃষির প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের দ্বারাই, এবং তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ হল ভূমিসংস্কার,—কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সূত্রপাত করা যায়। কিন্তু নগদ অর্থের জন্য চাষীর ফসল উৎপাদনের প্রবণতা এবং ভূস্বামী শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ এসব দেশে ভূমিসংস্কারের প্রবল অন্তরায় হয়ে রয়েছে। ফলে ভারতে ও অন্যান্য অনেক স্বল্পোন্নত দেশে ভূমিসংস্কারের সাম্প্রতিক চেষ্টা বিফল হয়েছে। কৃষির উন্নয়নের যে সব কারিগরী কৌশল ও যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে তারও সদ্ব্যবহার ঘটছে না। এ কারণে কৃষিতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে না।

স্বল্পোন্নত দেশগুলির দুর্বল **কৃষি-অর্থনীতির পাঁচটি ফল** দেখা যায় : (ক) জাতীয় আয়ের সর্বাধিক অংশ,

প্রায় অর্ধেক বা তার বেশি, উৎপন্ন হয় কৃষিতে। তুলনায় উন্নত দেশগুলিতে কৃষি থেকে উৎপন্ন হয় অনধিক ৫ শতাংশ এবং বাকিটা উৎপন্ন হয় শিল্প ও সেবাক্ষেত্রে। (খ) উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ কৃষির দ্বারা জীবনধারণ করে (ভারতে ৭০ শতাংশের বেশি)। এর অর্থ, জমির উৎপাদনশীলতা যেমন কম, তেমনি কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতাও অতি সামান্য। (গ) দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। (ঘ) রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বেশি। এবং (ঙ) এসব দেশের কৃষি মূলত প্রত্যক্ষ ভোগ নির্ভর (subsistence farming), বাজার নির্ভর নয়। অর্থাৎ চাষীরা প্রধানত নিজেদের প্রত্যক্ষ ভোগের প্রয়োজনে চাষ করে, ফসল বাজারে বিক্রি করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। বাজারে চাহিদা বাড়লে এই ধরনের কৃষির দ্বারা ফসলের যোগান প্রয়োজন মতো বাড়ানো যায় না।

(৪) **স্বল্প পুঁজি এবং প্রাচীন কৌশল ঃ** কি কৃষিতে, কি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল উৎস হল দুটি শ্রমিক-চাষীর মাথাপিছু পুঁজির পরিমাণ এবং কারিগরী কৌশল। কারিগরী কৌশল নির্ভর করে পুঁজির উপর। পুঁজি হল উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারত সহ সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশেই প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির ব্যাপকতা এবং উৎপাদনশীলতার দরুন কৃষিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সামান্য হয়। এ কারণে, দেশে পুঁজি গঠনের পরিমাণ খুবই কম। ফলে কি কৃষিতে, কি শিল্পে পুঁজির স্বল্পতা গোটা অর্থনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, তাকে এগুতে দিচ্ছে না। কৃষিতে যেটুকু সামান্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তা জমিদার, ভূস্বামী, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতি পরগাছারা শুষে নেয় এবং অনুৎপাদনশীল ভোগে অপব্যয় করে। তবে ইদানীংকালে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছে। পুঁজি গঠনের হার বাড়ছে।

(৫) **জনসংখ্যার গুরুতর চাপ ঃ** ভারতসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলির একটা বড় সমস্যা হল, বিপুল জনসংখ্যার চাপ। ফলে এ সব দেশে কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন যেটুকু বাড়ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকেই খাওয়াতে পরাতে সেটুকু ফুরিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের জন্য দরকারী পুঁজি গঠনের হার কোনোমতেই বাড়ানো যাচ্ছে না। তবে বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জন্মহার সামান্য পরিমাণে হ্রাসের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। জনসংখ্যা বিশারদরা মনে করেন জীবনধারণের মানের উন্নতির ও শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে তা আরও কমবে এবং আগামী শতকের মাঝামাঝি কমে গিয়ে তা মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল হবে। যেমন উন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে ঘটেছে। তবে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যারূপে এর গুরুত্ব কমে গেলেও, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে স্বল্পমেয়াদী সমস্যারূপে এর গুরুত্ব এখনও অত্যধিক।

(৬) **গভীর ও ব্যাপক দারিদ্র্য এবং আয় ও সম্পদ বৈষম্য ঃ** স্বল্পোন্নত দেশগুলি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৭১.৪ শতাংশ নিয়ে পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র ১৭.৩ শতাংশ ভোগ করে। আর পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ধনীদেশগুলি বিশ্বজনসংখ্যার মাত্র ২৮.৬ শতাংশ নিয়ে বিশ্ব আয়ের মোট ৮২.৭ শতাংশ ভোগ করে। একদিকে উন্নত দেশগুলির তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির দারিদ্র্য যেমন প্রকট, অন্যদিকে তেমনি স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যেও আয় এবং সম্পদ বণ্টনে গভীর এবং ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে যা উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় না।

ভারতে গ্রামীণ মানুষের সব চাইতে গরিব ৫৪ শতাংশ ব্যয়যোগ্য আয়ের মাত্র ৩০.৮ শতাংশ ভোগ করে। অথচ গ্রামীণ মানুষের সব চাইতে ধনী ২.৮ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ মোট ব্যয়যোগ্য আয়ের ১৩.৬ শতাংশ ভোগ করে। তেমনি শহরাঞ্চলের সবচেয়ে গরিব ৩৫ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলের মোট ব্যয়যোগ্য আয়ের ১৩ শতাংশ ভোগ করে, আর শহরাঞ্চলের সব চাইতে ধনী ৮.৬ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলের মোট ব্যয়যোগ্য আয়ের ৪০ শতাংশ ভোগ করে। গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ৪ শতাংশ পরিবার মোট গ্রামীণ সম্পত্তির ৩১.৪ শতাংশের মালিক। ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভের একটি সমীক্ষা থেকেও দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের ৬০ শতাংশ গরিব পরিবার আবাদী জমির মাত্র ৯.৩ শতাংশের মালিক।

শহরাঞ্চলের ও শিল্প সম্পত্তির বণ্টনেও একই বৈষম্য দেখা যায়। ১৯৮৬-৮৭ সালের শেষে দেশের ১,০০০ কোটি টাকার অধিক সম্পত্তির মালিক সর্ববৃহৎ তিনটি কোম্পানির মোট সম্পত্তি ছিল ৪,৪৯২ কোটি টাকা, যা ছিল ১০১টি সর্ববৃহৎ কোম্পানির সর্বমোট সম্পত্তির ১৬.৫ শতাংশ। আরও ৪টি কোম্পানি ছিল ৫০০ কোটি থেকে ১,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক, যাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২,৭৫৯ কোটি টাকা এবং যা ছিল ১০১টি সর্ববৃহৎ কোম্পানির সর্বমোট সম্পত্তির ১০.১ শতাংশ। বাকি ৫৪টি বৃহৎ কোম্পানী ১০১টি কোম্পানির সর্বমোট সম্পত্তির ৭৩.৪ শতাংশের মালিক।

(৭) **স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ও স্বল্প উন্নয়ন হার ঃ** ভারত সহ সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এদের বার্ষিক মাথাপিছু আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন হারের স্বল্পতা। এর কারণ হল ঃ উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র কৃষির উৎপাদনশীলতা কম বলে, এসব দেশে মাথাপিছু আয় কম। আয় অল্প বলে তার

বেশির ভাগটাই ভোগের জন্য খরচ হয়ে যায়। তাই সঞ্চয় অত্যন্ত কম। সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগও কম। বিনিয়োগ কম বলে উন্নয়ন হারও কম। উন্নয়ন হার স্বল্প বলে আয় কমই থেকে যাচ্ছে। এই হল স্বল্পোন্নত দেশগুলির দারিদ্র্যের পাপচক্র। সম্প্রতিকালে অবশ্য বিদেশী পুঁজির সাহায্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলির পুঁজি গঠনের (অর্থাৎ বিনিয়োগের) হার বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তা কিছুটা বেড়েছেও।

(৮) **দক্ষতা ও উদ্যোগের ঘাটতি এবং নিরক্ষরতা :** স্বল্পোন্নত দেশগুলির অপর বৈশিষ্ট্য হল মানব শক্তি অর্থাৎ মানবিক পুঁজির (human capital) নিম্নমান ও ব্যাপক নিরক্ষরতা, শিক্ষার সীমাবদ্ধ গণ্ডী, দক্ষতা ও উদ্যোগের ঘাটতি। গণনিরক্ষরতা মানুষকে কুসংস্কার, রক্ষণশীলতার জালে বন্দী করে রাখে। দক্ষতা বৃদ্ধিতে ও উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে না। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় না। অথচ যে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থা মানবিক পুঁজির দক্ষতা বাড়ায় তা প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ ব্যয়ের সমতুল্য। ভারতে জনসংখ্যার মাত্র ৩৭ শতাংশ সাক্ষর এবং ৬৩ শতাংশ নিরক্ষর (১৯৮১ লোকগণনা)। শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় মাথাপিছু বৎসরে মাত্র ৯ টাকা, মোট জাতীয় উৎপন্নের ৩ শতাংশ মাত্র। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার জন্য সরকারের খরচ হয় মাথাপিছু বার্ষিক ২,০০০ টাকা, বা জাতীয় উৎপন্নের ১০ শতাংশ।

(৯) **ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক সংগঠন :** স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রশাসনিক সংগঠন ও তাদের বিধিব্যবস্থাগুলি উন্নয়নের অনুকূল নয় এবং পণ্যের বাজারগুলি একচেটিয়া অথবা মুষ্টিমেয় বৃহৎ কারবারীর (অলিগোপলি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যাংকগুলির কার্যকলাপ ও ঋণদান নীতি একচেটিয়া বড় কারবারী, ফাটকাবাজ ও মজুতদারদের অনুকূল। সরকারের করব্যবস্থা অধোগতিশীল এবং অস্থিতিস্থাপক।

(১০) **দ্বৈত অর্থনীতি :** স্বল্পোন্নত অর্থনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর দ্বৈত চরিত্র। অর্থাৎ এ সব দেশে প্রাচীন ও আধুনিক এ দুটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সহাবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ক্ষেত্রটিতে বিরাজ করে প্রাচীন কারিগরী বিদ্যা ও কলাকৌশল, পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন, পুরাতন জীবনধারা, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী। অন্যদিকে আধুনিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিতে বিরাজ করে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষা, উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন, আধুনিক জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী।

১৭. স্বল্পোন্নত অর্থনীতির শ্রেণীবিভাগ
Classification of Underdeveloped Economies

১. পৃথিবীর স্বল্পোন্নত বা গরিব দেশগুলিকে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হলেও, মনে রাখতে হবে, উন্নত দেশগুলির সকলের অবস্থা যেমন এক নয়, তেমনি স্বল্পোন্নত দেশগুলির সকলের অবস্থাও আবার এক রকমের নয়। অধ্যাপক বেঞ্জামিন হিগিনস স্বল্পোন্নত দেশগুলির মোটামুটি চার রকমের শ্রেণীভেদ করেছেন।

২. **কতকগুলি স্বল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু আয় কম হলেও প্রাকৃতিক সম্পদগুলি তারা ব্যবহার করছে এবং শিল্প ও কৃষির বিকাশ ঘটিয়ে মাথাপিছু আয় অনেকটা পরিমাণে** বাড়াতে পেরেছে। এরা পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় করছে, কারিগরি গ্রহণ করছে এবং বিদেশী সাহায্য পাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সব দেশ পুঁজির যোগান, দক্ষ শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে তীব্র অসুবিধা ভোগ করছে। এদের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র পরস্পরের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। একটি যখন এগিয়ে যাচ্ছে, আরেকটি তখন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নয়নের গতি বাধা পাচ্ছে। এদের সমস্যা হল, ধারাবাহিক উন্নয়ন বজায় রাখা, বেকারী ও প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা কমানোর এবং উন্নয়নের সুফলগুলি দেশের মধ্যে আরও সমভাবে বণ্টন করা। সমস্যা। (যেমন ভারত)।

৩ **কতকগুলি স্বল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু আয় এখন কম,** জনসংখ্যার অনুপাতে এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য নেই বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দিকে। যেমন শ্রীলঙ্কা।

৪ কতকগুলি স্বল্পোন্নত দেশ গরিব, এদের **অর্থনীতি স্থানু হয়ে বসেছে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।** কিন্তু এদের **প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে** (যেমন বাংলাদেশ)।

৫. আর কতকগুলি স্বল্পোন্নত দেশ আছে, যারা **খুবই গরিব,** যাদের **মাথাপিছু আয় খুবই কম এবং তা বাড়ছে না,** আর **প্রাকৃতিক সম্পদও বিশেষ নেই** (যেমন আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দেশ চ্যাড)।

১৮. ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থনীতির গঠন বৈশিষ্ট্য
Structural Features of the Underdeveloped Economy of India

১ **জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা :** ভারতের মোট জাতীয় এবং মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয়ের মান পৃথিবীর উন্নত এমনকি অনেক স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় **কম।** অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা আর্থিক আয়

বাড়লেও লক্ষ্যের তুলনায় তা কম হয়েছে এবং আর্থিক আয় (money income) যতটা বেড়েছে প্রকৃত আয় (real income) ততটা বাড়েনি। ১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরে ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১৬,৭৩১ কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় ছিল ৪৬৬ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয় ৩ গুণের বেশি বেড়ে ৬০,১৪৩ কোটি টাকায় এবং মাথাপিছু আয় ৭৯৭ টাকায় পরিণত হয়। ১৯৮০ ৮১ সালের মূল্যস্তরে জাতীয় আয় ১৯৮০-৮১ সালে ১,১০,৪৮৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১,৫০,৫৭৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। ওই মূল্যস্তরে ওই সময়ে মাথাপিছু আয় ১,৬২৭'২ টাকা থেকে বেড়ে ১,৯১৮ ১ টাকায় পরিণত হয়।

২. **জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব**ঃ জাতীয় আয় যে সকল কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় তা মূলত তিন ধরনের। কৃষি, বনভূমি ও মৎস্য চাষ প্রভৃতি নিয়ে হল **অর্থনীতির প্রাথমিক ক্ষেত্র** (প্রাইমারী সেকটর)। যাবতীয় যন্ত্রশিল্প এবং খনি শিল্প হল **অর্থনীতির মাধ্যমিক ক্ষেত্র** (সেকেন্ডারী সেকটর)। আর ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, ব্যাঙ্কিং, বীমা, সরকারী ও অন্যান্য চাকুরি, চিকিৎসা, শিক্ষাদানকার্য প্রভৃতি নিয়ে হল **অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্র** (টার্সিয়ারী সেকটর) বা সেবা ক্ষেত্র।

ভারতে জাতীয় আয়ের ৩৯ শতাংশ প্রাথমিক ক্ষেত্রে, ২১ শতাংশ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে ও ৪০ শতাংশ তৃতীয় ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়।

৩. **বিভিন্ন জীবিকায় শ্রমশক্তির বণ্টনে প্রবল বৈষম্য**ঃ ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৭.৬ শতাংশ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে। এই শ্রমশক্তির প্রায় ৬৯ শতাংশ কৃষি অর্থাৎ প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এবং প্রায় ৩১ শতাংশ শিল্প ও অন্যান্য অর্থনীতিক কর্মে নিযুক্ত। গত ৯০ বৎসরেরও বেশিকাল ধরে কৃষিক্ষেত্রে মোট শ্রমশক্তির যোগান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ কর্মসংস্থানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি বিশেষ প্রসারিত হয়নি। এজন্য ভারতের কৃষি-ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের নিয়ম দেখা দিয়েছে এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা, মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় স্বল্প হচ্ছে।

৪ **উপার্জনশীল ব্যক্তির সংখ্যাল্পতা**ঃ ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৭ ৬ শতাংশ উপার্জনে নিযুক্ত (১৯৮১ সালের লোকগণনা অনুসারে)। জনসমষ্টির বাকি ৬২ ৪ শতাংশ উপার্জনহীন এবং সম্পূর্ণ পরনির্ভর। দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে স্বল্প আয়ে যদি বাকি দুই-তৃতীয়াংশের ভরণপোষণের ভার নিতে হয় তাহলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম না হয়ে পারে না।

৫. **কোনো মতে বেঁচে থাকার স্তরের জীবনযাত্রা**ঃ ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের হিসাবে মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য (১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তর অনুসারে) প্রতিমাসে মাথাপিছু ২০ টাকা ভোগব্যয়ের প্রয়োজন ছিল। পরিকল্পনা কমিশনের মতে এটা হল দারিদ্র্য বা গরীবীর সীমারেখা। তখন ভারতের ৪০ শতাংশ মানুষ এই রেখার নিচে ছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে গরীবী রেখার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যা বেড়ে ৫৪ শতাংশ হয়। বর্তমানে মূল্যস্তর ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়েছে। সুতরাং গরীবী রেখার নিচে অবস্থিত মানুষের অনুপাত, অনেকের মতে, এখন ৭০ শতাংশের কম নয়।

৬ **সঞ্চয়ের স্বল্পতা**ঃ ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে উৎপাদন ক্ষমতা কম, আয়ও কম। আবার এই অল্প আয়ের বেশির ভাগই ভোগের জন্য ব্যয় হয় বলে সঞ্চয়ও কম হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মোট সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীয় আয়ের ৬'৯ শতাংশ। ১৯৮৬-৮৭ সালে তা বেড়ে ২১ ৭ শতাংশ হয়েছে। তবে নীট সঞ্চয়ের হার তার চেয়ে কম।

৭. **পুঁজি গঠন হারের স্বল্পতা**ঃ স্বল্প আয় ও স্বল্প সঞ্চয়ের দরুন ভারতে মোট পুঁজি গঠনের হার কম, যদিও এখন তা বাড়ছে এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে ২৩ ৪ শতাংশ হয়েছে।

৮. **পুঁজিঃ উৎপন্ন অনুপাতের স্বল্পতা**ঃ ভারতে পুঁজিঃ উৎপন্ন অনুপাতটি (capital-output ratio) এখনও কম।

৯. **ব্যাপক কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি**ঃ ভারতের অর্থনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ অপরদিকে তেমনি মানবিক শক্তিও বিপুল পরিমাণে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এর ফলে দেখা দিচ্ছে ব্যাপক কর্মহীনতা। বর্তমানে দেশে মোট বেকার সংখ্যা অন্তত ৪ কোটি।

১০. **সম্পদ ও আয়ের বণ্টনে তীব্র বৈষম্য**ঃ ভারতে মুষ্টিমেয় বৃহৎ ভূস্বামী ও পুঁজিপতি বণিকদের হাতে দেশের মোট সম্পদ ও আয়ের অধিকাংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বেশির ভাগ দেশবাসীর আয় অতি অল্প। ভারতে গ্রামের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের নিজস্ব কোনো জমি নেই আর শতকরা ২৫ ভাগের জমির পরিমাণ ১ একরেরও কম। অর্থাৎ, গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৪৫ ভাগ পরিবারের হয় কোনো জমি নেই, বা থাকলেও তা ১ একরেরও কম। অপর পক্ষে, শতকরা ৫ ভাগ পরিবারের হাতে মোট কৃষি জমির শতকরা ৩৭ ভাগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রকৃত ভূমিসংস্কারের

অভাবই হল এর কারণ। অন্যদিকে শহরের ৫ শতাংশ পরিবার শহরাঞ্চলের ৫২ শতাংশ ভূ-সম্পত্তির মালিক এবং ২০ শতাংশ শহরবাসী-পরিবারের কোনো ভূ-সম্পত্তি নেই।

জনসংখ্যার ৫ শতাংশ জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশের বেশি ভোগ করে আর ৫০ শতাংশ মানুষের ভাগে পড়ে জাতীয় আয়ের মাত্র ২০ শতাংশ।

আয় ও সম্পদের বণ্টনে এই বিরাট বৈষম্য রয়ে গেছে বলেই দেশের উৎপাদন বাড়ছে না। ফলে শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও উপযুক্ত পরিমাণে বাড়তে পারছে না।

১১ উৎপাদনে বৈচিত্র্যহীনতা : ভারতের কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, গম ভুট্টা, পাট, চা, ইক্ষু, তুলা, ছোলা, চীনাবাদাম ও জোয়ার ইত্যাদি অল্প কয়েকটি দ্রব্যই প্রধান। যন্ত্রশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, সুতা ও সুতী বস্ত্র, চিনি, লৌহ-ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি জিনিসই উল্লেখযোগ্য।

কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যায়, অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখনও মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদনের উপরেই ভারতের কৃষি ও শিল্প এবং রপ্তানী ব্যবসায় নির্ভর করছে। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনের এই বৈচিত্র্যহীনতা দেশের উৎপাদন কাঠামোর একটি প্রধান দুর্বলতা।

১২. প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির ব্যাপকতা : ভারতের কৃষির অন্যতম ত্রুটি এই যে, কৃষকেরা প্রধানত নিজেদের ব্যবহারের জন্যই চাষ করে। উৎপন্ন ফসল বাজারে বিক্রয় করা তাদের প্রধান লক্ষ্য নয়। ফলে, নিজেদের চাহিদা মিটাবার পর কৃষকদের নিকট বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল বিশেষ থাকে না। এই ধরনের কৃষিকে বলে প্রত্যক্ষ ভোগ-নির্ভর কৃষি (subsistence farming)। বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ কম বলে শিল্পে কাঁচামালের যোগানও অল্প। ফলে দেশে শিল্প সম্প্রসারণের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে।

১৩ একচেটিয়া পুঁজির প্রাধান্য : ভারতে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির প্রাধান্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একচেটিয়া কারবার তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল টাটা ও বিড়লা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ৭৫টি কারবারী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রনাধীন ১,৫৩৬টি কোম্পানি ভারতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বেসরকারী কারবারী ক্ষেত্রের মোট সম্পত্তির শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগের মালিক হয়ে বসেছে। সর্বশেষ তথ্যে অর্থনীতিক ক্ষমতার আরো বেশি কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়।

১৪. বিদেশী পুঁজি ও ঋণের বৃদ্ধি : ভারতের অর্থনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, দেশের শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণ এবং দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। স্বাধীনতা লাভের সময় দেশে বিদেশী পুঁজির লগ্নি ছিল ২৫৬ কোটি টাকা। ১৯৮৯ সালে ভারতের মোট বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

১৫. জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাপ : জন্মহার ও মৃত্যুহার দুটোই ভারতে বেশি। জন্মহার হাজারে ৩৬ আর মৃত্যুহার হাজারে ১৫। ফলে বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীট হার হাজারে ২১ বা ২.১ শতাংশ। অধিকাংশ ভারতবাসী পর্যাপ্ত খাদ্যগুণসম্পন্ন খাদ্য পায় না। এ ছাড়া, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-বিধি ও জনস্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞানও এদেশে শোচনীয় স্তরে রয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষণ, শিক্ষা ও জীবিকা সংস্থান করা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছে।

জাতীয় আয়ের অতি নিম্ন স্তর, পশ্চাৎপদ উৎপাদন কৌশল, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, অব্যবহৃত বিপুল মানবিক সম্পদ, তীব্র দারিদ্র্য এবং চরম অর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য—এ সবই ভারতের অর্থনীতিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। অন্য দিকে আমাদের অর্থনীতিতে প্রাচুর্য সৃষ্টির বিশাল সম্ভাবনাও বর্তমান। কিন্তু ভারতের বিদ্যমান শিল্পজ্ঞান, কৃৎকৌশল ও সংগঠনক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয় না বলে, উৎপাদনে প্রাচুর্য সৃষ্টি ঘটছে না। তাই এমন একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে দেশের স্থায়ী ধারাবাহিক অর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

১.৯. ভারতের অর্থনীতির স্বল্পোন্নতির কারণ

Causes of Underdevelopment of the Indian Economy

১ ভারতসহ এই সব দেশগুলির স্বল্পোন্নতির কারণ কি? পশ্চিমের অগ্রগামী দেশগুলির উন্নতি ও ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির অনুন্নতি বা স্বল্পোন্নতির কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সাথে সাথে বর্তমান ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের তিনটি উপাদান সৃষ্টি হয়েছিল। যথা—(ক) জমি থেকে উৎসাদিত, শিল্পে নিয়োগের উপযুক্ত বিরাট কৃষক-মজুর শ্রেণী। (খ) ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নগর সৃষ্টি, বণিক এবং কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব এবং শ্রমবিভাগের প্রচলন। (গ) নতুন এক শ্রেণীর বণিক ও বিত্তশালী কৃষকের হাতে বিপুল পুঁজির উদ্ভব। কিন্তু যে পথে ইউরোপের দেশ-সমূহে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছিল, ভারতসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহে তা সম্ভব হয়নি। এর জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী।

২. রাজনীতিক কারণ : যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসারের

জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন। একটি হল কাঁচামালের সুনিশ্চিত যোগান এবং অপরটি হল বাজারের সম্ভাবনা। শিল্পভিত্তিক পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকায় এই দুটির অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে এই দুটি মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করে। ইউরোপীয় দেশগুলির নিজ নিজ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বার্থে এশিয়া ও আফ্রিকার পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং এসব দেশের শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে এবং ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করতে ভারতের কৃষিকে অনুন্নত স্তরেই রেখে দেয়।

৩ **অর্থনীতিক কারণ:** ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের মধ্য থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ জন্মলাভ করে। ভারতে ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশে তা নানা কারণে সম্ভব হয়নি। প্রথমত, ভারতে বিদেশী শাসকগণ নিজেদের সমর্থক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন সামন্তশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। লর্ড কর্নওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা তার দৃষ্টান্ত। এর ফলে ভারতে সামন্ততন্ত্রের শিকড় অটুট থেকে গেল।

দ্বিতীয়ত, শিল্প বিকাশের প্রাথমিক প্রয়োজন পুঁজি। অর্থনীতিক কার্যাবলীর দ্বারা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়ে, তা থেকে পুঁজি গঠন হয়। কিন্তু ভারতের কৃষকরা যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করত তা জমিদার ও সামন্তপ্রভুরা শোষণ করে নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করত। ফলে কৃষিক্ষেত্র থেকে দেশে পুঁজিগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব হল না। দেশের শিল্পবিকাশ না হওয়ার এইটেই প্রধান কারণ।

তৃতীয়ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশে জমির উপর চাপ বাড়তে লাগল। কৃষকদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পেতে লাগল। কৃষি ও পুরাতন কুটির শিল্প থেকে বিচ্যুত মানুষ শিল্পের উপযোগী শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি করল বটে, তবে শিল্প বিকাশের অভাবে তারা পুনরায় কৃষিতে আশ্রয় নিল। ফলে, কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি দেখা দিল। দেশের বেশির ভাগ মানুষেরই জীবনযাত্রার মান আরও নিচে নামতে লাগল। এতে দেশের মধ্যে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমশই সংকুচিত হতে লাগল। এ কারণে দেশে কলকারখানা স্থাপনে উৎসাহ সৃষ্টি হল না আর দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তারও উদ্ভব হল না।

চতুর্থত, এ সকল দেশে দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টা গড়ে উঠল না, কিন্তু শাসক-দেশের প্রয়োজনে প্রধানত খনি-শিল্প ও বাগিচা-শিল্প বিস্তার লাভ করল। শাসক-দেশের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পরাধীন দেশে শাসকরা রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাল। কিন্তু বিদেশী পুঁজির দ্বারা যে অল্প সংখ্যক শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির মুনাফার সবটুকুই বিদেশে চলে যেত। এভাবে, ঔপনিবেশিক দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তি থেকে যতটুকু উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হত, তার সবটুকুই বিদেশী শাসকরা নিজ দেশের পুঁজিগঠনের কাজে লাগাত। এ হল ঔপনিবেশিক শোষণের মূল চরিত্র।

পঞ্চমত, দেশে আধুনিক শিল্পপ্রসারের পথ রুদ্ধ হওয়ায়, আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের বিকাশও পঙ্গু হয়ে রইল।

৪ **সামাজিক কারণ:** ভারতের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা, ধর্মের অত্যধিক প্রভাব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রাচীন নিয়ম এবং সমাজে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অস্তিত্ব দেশের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধিতে বাধা দিয়েছে। ধর্মের প্রভাব বৈষয়িক কাজকর্মকে হীন মনে করতে শিখিয়েছে। বর্ণভেদ প্রথা শ্রমের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়নি। এ ধরনের পুরাতন সমাজ সংগঠন, এবং রক্ষণশীল সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী স্বল্পোন্নত দেশের অগ্রগতির পথে বাধা। ভারতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

১.১০. ভারতের অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক পরিবর্তন: বিকাশমান অর্থনীতির উদীয়মান বৈশিষ্ট্য

Recent Changes : Emerging Features of a Developing Economy

১ অদ্যাবধি ভারতের অর্থনীতির স্বল্পোন্নত চরিত্র পরিবর্তিত না হলেও, গত ৪০ বৎসর ধরে ভারতের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এগুলিকে ভারতের বিকাশমান অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য বলে অবশ্যই গণ্য করা যায়। আমরা প্রথমে এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করে তারপর নতুন পরিবর্তনের নির্দেশকগুলি উল্লেখ করব।

২. **উন্নয়নের অন্তর্কাঠামো সৃষ্টি:** সেচ, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি হল দেশের অর্থনীতির অন্তর্কাঠামোর উপাদান। এদের বৃদ্ধি ও বিকাশে দেশের অর্থনীতিক অন্তর্কাঠামোটি শক্তিশালী হয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। নিচে অন্তর্কাঠামোর কয়েকটি উপাদানের ক্রমবিকাশের তথ্য সন্নিবেশ করা হল:

(ক) **সেচের অধীন জমির পরিমাণ** ১৯৫০-৫১ সালে ২.২৬ কোটি হেক্টেয়ার থেকে বেড়ে ১৯৮৬-৮৭ সালে ৬.৪১ কোটি হেক্টেয়ারে পরিণত হয়েছে। রেলপথে মোট পরিবাহিত পণ্যের দুই-তৃতীয়াংশ ও মোট যাত্রীদের দুই-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয়। বাসে পরিবাহিত হয় পরিবাহিত পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ ও যাত্রীদের ৫০ শতাংশের বেশি। বিকাশ-

মান দেশগুলির মধ্যে ভারতের **জাহাজ পরিবহণ ক্ষমতা** সর্বাধিক এবং পৃথিবীতে তা **পঞ্চদশ** স্থানের অধিকারী। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ভারতের জাহাজ পরিবহণ ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ২৪ গুণ। বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারতীয় পণ্যের ৪০ শতাংশ ভারতীয় জাহাজগুলির দ্বারা পরিবাহিত হয়। **বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা** ১৯৫০-৫১ সালে ১,৭১০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৯৮৬-৮৭ সালে ৫৫'৪ হাজার মেগাওয়াটে পরিণত হয়েছে।

(খ) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির শাখা** ১৯৫০-৫১ সালে ৪,১২০ থেকে বেড়ে '৮৮ সালের জুন মাসে ৫৫,৪১০ হয়েছে। এর অর্ধেকের বেশি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এখন ১২ হাজার মানুষ পিছু একটি করে ব্যাঙ্কের শাখা রয়েছে।

(গ) ১৯৫১ সালে জনসংখ্যার ১৬'৬ শতাংশ ছিল সাক্ষর। ১৯৮১ সালে **সাক্ষর জনসংখ্যা** বেড়ে হয়েছে ৩৬ ১৭ শতাংশ। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে ১২'২ লক্ষ থেকে বেড়ে ১২ কোটি ৮৯ লক্ষ হয়েছে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ৫ ৩ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪'৫২ লক্ষ। প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ২.০৯,৬৭১ থেকে হয়েছে ৫ ৫ লক্ষ। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০,৮৮৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ। কলেজের সংখ্যা ৫৪২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ২৭ থেকে হয়েছে ১৩৫।

(ঘ) **বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা**ঃ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও শিল্প সংস্থাগুলি সহ বেসরকারী সংগঠনগুলিও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। ভারতে এরকম ১৫০টি বড় গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

(ঙ) দেশে **মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা** ১৯৫১ সালে ৩০টি থেকে বেড়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০৭টি হয়েছে। ১৯৫১ সালে দেশে কোনো প্রাইমারী হেলথ সেন্টার ছিল না। বর্তমানে **প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের** সংখ্যা হল ৭৩ হাজার এবং সাবসিডিয়ারি সেন্টারের সংখ্যা হল ৫১,৯২টি। ১৯৫১-৫২ সালে **হাসপাতালে রোগীর শয্যার সংখ্যা** ছিল ১'১৩ লক্ষ। ১৯৮৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫'৯৯ লক্ষ। **মৃত্যু হার** ১৯৪১-৫১ সালে ছিল হাজার পিছু ২৭'৪। বর্তমানে তা কমে হয়েছে হাজার পিছু ১৫। মানুষের গড় আয়ু ১৯৫১ সালে ৩২ বৎসর থেকে বেড়ে বর্তমানে ৫৩ বৎসর হয়েছে।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নতি**ঃ এই ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় হলঃ (ক) সরকারের ভূমিকার প্রসার, (খ) কৃষি, শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থসংস্থান ব্যবস্থা এবং (গ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা কর্মী শিক্ষার বন্দোবস্ত।

(ক) স্বাধীনতার আগে দেশের সরকার আইনশৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা পালন করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য সরকারী ব্যয়ের একটা বড়ো অংশ ব্যয় করা হচ্ছে। হিসাবেও উন্নয়নমূলক ব্যয়ের অনুপাত ক্রমবর্ধমান। এই ব্যয়ের দ্বারা দেশের অর্থনীতিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়েছিল ২৯ কোটি টাকা। ১৯৮৬-৮৭ সালে ওই বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে ৫০,০০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র স্থাপনের দ্বারা সরকার এখন দেশের অর্থনীতিতে সর্বপ্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নতির দ্বিতীয় পরিচয় হল কৃষি, শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থসংস্থানের জন্য নতুন নতুন অর্থসংস্থানকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ। এর ফলে কৃষিতে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, পরিবহণে প্রভৃতি অবহেলিত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণের অভাব কিছুটা দূর করা সম্ভব হচ্ছে। দেশে সঞ্চয়, আমানত জমা, ঋণদান ও বীমার পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে।

(গ) ব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য শিক্ষাদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টায় নিযুক্ত রয়েছে।

৪. **অর্থনীতিক বিকাশের নির্দেশকসমূহ**ঃ (ক) ভারতে গত ৩৭ বৎসরে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নতির পর তৃতীয় পরিকল্পনায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার শূন্য হলেও তারপর থেকে এর ঊর্ধ্বগতি লক্ষণীয়।

(খ) গত ৩৭ বৎসরে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের হারের ক্রমাগত বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ উভয় হারই প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকে ক্রমশ বেড়ে পঞ্চম পরিকল্পনাকালে আড়াইগুণ হয়েছে। সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হারের বৃদ্ধিটা (পঞ্চম পরিকল্পনা ছাড়া) সম্ভব হয়েছে বিদেশী পুঁজির সাহায্যে।

(গ) কৃষির এবং শিল্পের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। কিন্তু কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হারটি গত ৩৭ বছর ধরে মোটামুটি একটা নিচু স্তরে (২'৪-২ ৫ শতাংশ) স্থির রয়েছে। তুলনায় শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হারে ওঠানামা ঘটেছে। ১৯৫০-৫১ থেকে ২০ বৎসরে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক গড়পড়তা ১৩ শতাংশ। সেটা গত দশ বৎসরে ৫'৪ শতাংশে নেমে গেছে। এটা একদিকে যেমন দেশের শিল্প ক্ষেত্রে গত এক দশকের সঙ্কটের পরিচায়ক অন্যদিকে তেমনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রী দুনিয়ায় বিশ্বমন্দার প্রভাবের ফল।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের অর্থনৈতিক স্বল্পোন্নতির প্রকৃতি বর্ণনা কর।

[Discuss the nature of economic under-development of India.]

২. ভারতের মত দেশগুলির স্বল্পোন্নতির কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Point out the causes of underdevelopment of the countries like India.]

৩. "ভারতের অর্থনীতি হল বিকাশমান অর্থনীতি।" এই বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর এবং বিগত তিন দশকে ভারতের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তাদের প্রকৃতি নির্দেশ কর।

["The Indian economy is a developing economy." Explain this statement indicating the nature of the changes that have occurred in the various sectors of the Indian Economy during the last three decades.]

৪. স্বল্পোন্নত অর্থনীতি কাকে বলে? ভারতের অর্থনীতি কি স্বল্পোন্নত? আমাদের শিল্পগত পশ্চাৎপদ অবস্থার কারণগুলি কি?

[What is an underdeveloped economy? Is India an underdeveloped economy? What are the causes of our industrial backwardness?]

৫. স্বল্পোন্নত অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? ভারতের অর্থনীতির বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে ভারতের অর্থনীতিকে স্বল্পোন্নত অর্থনীতি বলা যায় কিনা বল।

[What are the main features of an underdeveloped economy? State whether the Indian economy may be described as an underdeveloped economy in the context of its prevailing characteristics.]

৬. স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে আলোচনা কর।

[Discuss fully the characteristics of an underdeveloped economy.]

৭. ভারতের বিশেষ উল্লেখ সহ একটি বিকাশমান অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

[Describe the main features of a developing economy with special reference to India.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. কোন মানদণ্ডে অর্থনীতিবিদ্‌রা পৃথিবীর কোনো কোনো দেশকে উন্নত বলে অভিহিত করেন?

[By what criterion do the economists seek to mark certain countries of the world as 'developed'?]

২. কিসের ভিত্তিতে কোনো কোনো দেশ 'স্বল্পোন্নত' বলে চিহ্নিত হয়?

[On what basis are some countries marked as 'underdeveloped'?]

৩. 'স্বল্পোন্নত দেশের' একটি সংজ্ঞা দাও।

[Give a definition of an 'underdeveloped country'.]

৪. 'বিকাশমান' দেশ বলতে কোন্ দেশগুলিকে বোঝায়?

[Which countries are regarded as 'developing countries'?]

৫. স্বল্পোন্নত দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

[What are the characteristics of the population of an underdeveloped country?]

৬. অর্থনীতির প্রাথমিক ক্ষেত্র বলতে কি বোঝায়?

[What is meant by the 'primary sector' of an economy?]

৭. অর্থনীতির দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটা কাজের উল্লেখ কর।

[Mention some of the activities that belong to the secondary sector of an economy.]

৮. অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজ বলতে কোন্‌-গুলিকে বোঝায় ?

[What are the activities that belong to the tertiary sector ?]

৯. ভারতে জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়—এ উক্তির সমর্থনে যথাযথ তথ্য দাও।

[It is said that there is an imbalance among the different sources of India's national income. Elucidate the statement with the aid of appropriate data.]

১০. ভারতে বিভিন্ন জীবিকায় শ্রমশক্তির বণ্টনে প্রবল বৈষম্য বিদ্যমান- এ বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য দাও।

[Labour force in India is most unevenly distributed among the different professions—Justify the statement by furnishing relevant data.]

১১. ভারতে (আনুমানিক) কত শতাংশ মানুষ 'দারিদ্র্য রেখার' নিচে অবস্থিত ?

[What percentage (approximately) of the Indian population lives below the 'poverty line' ?]

১২. ভারতে জাতীয় আয়ের বণ্টনে গভীর বৈষম্য দেখা যায় উপযুক্ত তথ্যের সাহায্যে এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ কর।

[There is great inequality in the distribution of national income in India.—Supply proper data to establish the validity of this statement.]

১৩. প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষি কাকে বলে ?

[What is meant by subsistence farming ?]

১৪ ভারতের দেশী একচেটিয়া পুঁজির প্রাধান্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য দাও।

[The position of the Indian monopoly capital is becoming more and more predominant in the country.—Furnish facts in justification of this statement.]

১৫. ভারতের জনগণের কত শতাংশ প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করে ?

[What percentage of the population of India depends on the primary sector for livelihood ?]

প্রাকৃতিক উপকরণ
Natural Resources

প্রাকৃতিক উপকরণ ও
অর্থনীতিক উন্নয়ন /
উপকরণ ব্যবহারের নীতিসমূহ /
ভূমি সম্পদ /
ভারতের প্রধান ফসলসমূহ /
জল সম্পদ /
বন সম্পদ/
খনিজ সম্পদ /
তেজ শক্তি /
ভারতে শক্তি সংকট /
আলোচ্য প্রশ্নাবলী ।

২.১. প্রাকৃতিক উপকরণ ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Natural Resources and Economic Development

১ দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটে জাতীয় উৎপন্নের (national output) বৃদ্ধির দ্বারা। জাতীয় উৎপন্ন বাড়ে মাথাপিছু উৎপন্নের বৃদ্ধির দ্বারা। সে বৃদ্ধিটা ঘটে প্রাকৃতিক উপকরণ, মানবিক উপকরণ এবং উৎপাদিত উপকরণ বা পুঁজির সম্মিলিত ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা।

২. প্রাকৃতিক উপকরণ হল ভূমি, জল সম্পদ, মৎস্য, খনিজ, বনজ, ও জলজ সম্পদ, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

ভূমি, জল, মৎস্য, বন প্রভৃতির মত কতকগুলি প্রাকৃতিক উপকরণ একবার ব্যবহারে নিঃশেষিত হয় না। কিন্তু অনেকগুলি প্রাকৃতিক উপকরণ আছে যা একবার ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়। যেমন খনিজ উপকরণসমূহ। সুতরাং যে সব উপকরণ নিঃশেষিত হয় তাদের সযত্ন ব্যবহার এবং যেসব উপকরণ নিঃশেষিত হয় না তাদের উপযুক্ত মান সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৩. প্রাকৃতিক উপকরণগুলি দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে তা নির্ভর করে দেশের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান ও মানবিক প্রচেষ্টার গুণাগুণ ও পরিমাণের উপর।

৪. দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক উপকরণগুলির উন্নয়ন প্রয়োজন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল, জাতীয় উৎপন্নের বৃদ্ধিতে এদের সর্বাধিক ও নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা সুনিশ্চিত করা। জাতীয় আয়ের সর্বাধিক বৃদ্ধির জন্য দেশের প্রাকৃতিক উপকরণগুলির কাম্যতম ব্যবহার প্রয়োজন। এবং তা শুধু স্বল্পকালের জন্য নয়, দীর্ঘমেয়াদী কালের জন্যও দরকার। এই লক্ষ্যটি সফল করার জন্য পাঁচটি প্রয়োজনীয় নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন: (ক) উপকরণগুলির সর্বাধিক অর্থনীতিক ব্যবহার: (খ) জাতীয় আয়ের সর্বাধিক সম্ভব একটানা বৃদ্ধির জন্য উপকরণগুলির নিরবচ্ছিন্ন সযত্ন ব্যবহার; (গ) সমাজের বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপকরণগুলির বহুমুখী ব্যবহার (দৃষ্টান্ত—জল সম্পদ); (ঘ) উপকরণগুলির ব্যবহারে সংযোজিত পরিকল্পনা অনুসরণ; এবং (ঙ) পরিবহণ খরচ সর্বনিম্ন করার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে শিল্পের অবস্থান নির্দেশ।

৫. সাধারণত মনে হয়, দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকলে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ বেশি এবং সহজ হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ কম থাকলে তা হয় না। কিন্তু প্রাকৃতিক **সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও যে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সম্ভব তার দৃষ্টান্ত হল হল্যাণ্ড, জাপান ও তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এবং হংকং ও সুইজারল্যাণ্ড।** আজকের দিনে প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

২.২. ভূমি সম্পদ
Land Resources

১ ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হল ৩২ কোটি ৮৮ লক্ষ হেক্টেয়ার। এর বিশদ ব্যবহার তথ্য সারণি ২-১-এ দেওয়া হল।

সারণি ২-১ : ভারতে ভূমি সম্পদের ব্যবহার

	(কোটি হেক্টেয়ার)	১৯৮১
১.	মোট ভৌগোলিক আয়তন	৩২'৯
২.	যে পরিমাণ ভূমি ব্যবহারের তথ্য পাওয়া গেছে	৩০'৫
৩.	বনভূমি	৬'৭
৪.	অকৃষিগত ব্যবহারের জমি	৪'০
৫.	আবাদী জমি	১৭'৩
	(একাধিক ফসলী জমি)	৩'৩
৬.	পতিত জমি	২'৫
৭	আবাদযোগ্য পতিত জমি	৩'২
৮.	নীট সেচের জমি	৩'৮
৯.	মোট সেচের জমি	৪'৮

২. ভারতের মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জমির আয়তন পৃথিবীর অন্য দেশের মাথাপিছু আয়তনের তুলনায় কম। যেমন, ভারতে মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জমির আয়তন (১৯৭৫-৭৬) যেখানে ০'২৪ হেক্টেয়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হল ০'৯২ হেক্টেয়ার, সোবিয়েত ইউনিয়নে ০'৯৪ হেক্টেয়ার, কানাডায় ১'৯৮ হেক্টেয়ার, এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৩'৪২ হেক্টেয়ার। এ প্রসঙ্গে যে তথ্যটি উল্লেখযোগ্য, সেটি হল পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ ভারতে বাস করে, অথচ ভূপৃষ্ঠের মাত্র ২'৪ শতাংশ হল ভারতের ভৌগোলিক আয়তন। স্পষ্টই বোঝা যায়, জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের ভৌগোলিক আয়তন খুবই কম।

এখন প্রশ্ন হল—ভারতের নীট কর্ষণযোগ্য ভূমির আয়তন বৃদ্ধি করার কোনো সম্ভাবনা আছে কি? পতিত জমির খুব বড় একটা অংশ পুনরুদ্ধার করে চাষের অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা কম। ভারতের পতিত জমির বেশির ভাগই হয় পার্বত্য অঞ্চলের অনুর্বর ভূমি অথবা এমন অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে বৃষ্টিপাত অপ্রচুর। ফলে ঐ পতিত জমির কর্ষণযোগ্যতা খুবই কম। তা ছাড়া এ সব পতিত জমি আবাদযোগ্য করে তুলতে বহু অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন। সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেও বড় জোর মোট ২০ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সুতরাং, শস্যোৎপাদনের উপযোগী জমির পরিমাণ বাড়ানোর আশা খুবই কম। এ অবস্থায় বর্তমান জমিতে নিবিড় চাষের (intensive cultivation) ব্যবস্থা করা এবং জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। এ ছাড়া, জমিতে বৎসরে একাধিক ফসলের চাষ করাও প্রয়োজন। এ কাজে দরকার হল সেচের সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ।

২.৩. জলসম্পদ
Water Resources

১. দেশের অর্থনীতির পক্ষে দেশের জলসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে না পারলে কৃষিকার্যে বিঘ্ন ঘটে, কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানো যায় না। শিল্পোৎপাদনের কাজেও জলসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। এ ছাড়াও, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বদ্ধ জল নিকাশের সমস্যা দেশের জলসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

২. ভারতের জলসম্পদকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (ক) মাটির উপরিভাগস্থ জল এবং (খ) মাটির নিচের জল।

৩. ভারতে মাটির উপরে অবস্থিত জলের পরিমাণ হল বাৎসরিক ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টেয়ার মিটার (হেঃ মিঃ)। এর ৩৩ শতাংশ (অর্থাৎ ৫ কোটি ৬০ লক্ষ হেঃ মিঃ) বাষ্পে পরিণত হয়; ২২ শতাংশ (অর্থাৎ ৩ কোটি ৬০ লক্ষ হেঃ মিঃ) ভূগর্ভে প্রবেশ করে। অবশিষ্ট ৪৫ শতাংশ (অর্থাৎ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ হেঃ মিঃ) দেশের নদীগর্ভে প্রবাহিত হয়। সেচের কাজে এই ৪৫ শতাংশ জল পাওয়া যেতে পারে। তবে ভূপৃষ্ঠের অসম গঠন, বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর পার্থক্য, মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং জলপ্রবাহের গতিধারায় অসমতা প্রভৃতি কারণে ঐ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ হেঃ মিঃ জলের সবটুকুই সেচের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। হিসাব করা হয়েছে, এই ৭ কোটি ৬০ লক্ষ হেঃ মিঃ জলের মধ্যে

২ কোটি ৫০ লক্ষ হেঃ মিঃ জলসেচের কাজে ব্যবহার করা বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব। এই ব্যবহারযোগ্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেঃ মিঃ জলের মাত্র ৪২ শতাংশ বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪. **ভূগর্ভস্থ জল** : ভারতের মোট জলসম্পদের ৩ কোটি ৬০ লক্ষ হেঃ মিঃ জল মাটির নিচে চলে যায়। এর মধ্যে ২ কোটি হেঃ মিঃ ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তর শোষণ করে নেয়। এতে শস্যোৎপাদনের খুব অসুবিধা হয়। অবশিষ্ট ১ কোটি ৬০ লক্ষ হেঃ মিঃ মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং ঐ গভীর প্রদেশে সঞ্চিত জলভাণ্ডারকে প্রতি বৎসরই বাড়ায়। এ সম্পর্কে কোনো নিয়মিত সমীক্ষা এখনো করা যায়নি। ভূগর্ভের গভীরতর প্রদেশে এই জলভাণ্ডারের মাত্র ২০ শতাংশ জল আমরা বর্তমানে ব্যবহার করছি বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত এবং ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ এই জলসম্পদ সেচের কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজন মেটাতে, শিল্পের কাজে এবং জলপথে পরিবহণের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অধুনা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের জল ব্যবহৃত হচ্ছে; সেটা হল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। এ কাজে জলসম্পদের পূর্ণতম ব্যবহার আমাদের দেশে এখনো সম্ভব হয়নি।

২.৪. বনসম্পদ
Forest Resources

১ বনভূমি হল দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপকরণ। বনভূমি কেবল বিভিন্ন প্রকারের বন্য পশুপক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীর বাসভূমি নয়, বা শুধু কাঠ, জ্বালানী ও পশু খাদ্যের উৎসও নয়, উপরন্তু তা দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের, ভূমিক্ষয় রোধের ও পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে মানুষের হাতিয়ারও বটে। তা ছাড়া বনভূমি দেশের বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের ও জীবিকার বিরাট উৎস।

২. ভারতের বনভূমি আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা এই তিন রাজ্যেই প্রধানত কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সুতরাং দেশের সর্বত্র আজ বনভূমি বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতে বনভূমির সম্প্রসারণ না ঘটায় জাতীয় উৎপন্নে বনভূমির অংশ এখনও পর্যন্ত মাত্র ১'৪ শতাংশে সীমাবদ্ধ রয়েছে (১৯৭৬-৭৭)।

৩ ভারতের বনাঞ্চল ৭'৪৮ কোটি হেক্টেয়ার বা দেশের মোট ভূ ভাগের ২২'৭ শতাংশ (১৯৮০-৮১)। দেশের অন্তত এক-তৃতীয়াংশে বনভূমি রচনা করার জাতীয় বন-নীতি সত্ত্বেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তার ফলে জমি আবাদের জন্য, নদী-উপত্যকা প্রকল্পের জন্য, নতুন শিল্পাঞ্চল স্থাপনের জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে বনভূমির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। এর ফলে গত ৩০ বৎসরে প্রায় ৪৫ লক্ষ হেক্টেয়ার বনভূমি বিনষ্ট হয়েছে। ফলে ১৯৮০ সালে বনভূমি (সংরক্ষণ) আইন পাস করে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোরভাবে বনভূমি সংরক্ষণের চেষ্টা করছে। বনাঞ্চলের ধ্বংস ও ক্ষয় পূরণের জন্য বন রচনা নীতি অনুসৃত হচ্ছে এবং নতুন বনভূমি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

৪. বন্যপ্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ছাড়াও বনভূমি থেকে রাজ্য সরকারগুলির রয়ালটি রূপে বার্ষিক আয় হয় কেবল শিল্পের কাঠ ও জ্বালানী কাঠ থেকে যথাক্রমে ২৪৪ কোটি ও ৩২১ কোটি টাকা। এছাড়া বনভূমি থেকে কাঠের মণ্ড, তক্তা, দিয়াশলাইয়ের কাঠ, বাঁশ, বেত, কেন্দু পাতা, ঘাস, ভেষজ তৈল, ঔষধি গাছ, লাক্ষা, আঠা, চামড়া পাকা করার মালমশলা, রং, প্রাণিজ সম্পদ ইত্যাদি নানা প্রকার কাঁচামাল পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি আবার বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের সহায়ক।

২.৫. খনিজ সম্পদ
Mineral Resources

১. ভারতে বহুরকমের খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের ব্যাপক জরিপ ও অনুসন্ধান এখনো সম্পূর্ণ হয়নি; তাই দেশের মোট খনিজ পদার্থের পরিমাণ সম্বন্ধে সামগ্রিক চিত্র এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবে শিল্পায়নের পক্ষে অপরিহার্য দুটি খনিজের (কয়লা ও লোহ) মজুদভাণ্ডার ভারতে প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। এ ছাড়া, থোরিয়াম, টাইটেনিয়াম, এবং অভ্রের মজুদও বেশ ভাল। অন্যদিকে অ্যালুমিনিয়াম, তাপসহ খনিজ (refractories), চুনাপাথর প্রভৃতির মজুদ-ভাণ্ডারও সন্তোষজনক।

২. **খনিজ পদার্থের গুরুত্ব** : বর্তমান যন্ত্রশিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে খনিজ পদার্থ একটি অপরিহার্য উপাদান। দেশে কি ধরনের শিল্প গড়ে তোলা যাবে, কোথায় কোথায় শিল্প স্থাপন করা যাবে, শিল্পায়নের গতিবেগ কতটা দ্রুত করা যাবে, শিল্পে সামগ্রিক উন্নতি কতটা করা সম্ভব—এসব কিছু দেশের খনিজ কাঁচামালের অবস্থান ও তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

লোহ, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি হল লোহ জাতীয় ধাতু এবং তামা, বক্সাইট, দস্তা, সীসা, ইলমেনাইট প্রভৃতি হল অ-লোহ জাতীয় ধাতু। এ ধাতুগুলি হল ভারী ও মূলশিল্প, বৈদ্যুতিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভিত্তি। এ সকল শিল্প উন্নত না হলে কোনো দেশই শিল্পে

স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। ভারতের সৌভাগ্য যে, এদেশে লোহ ও অ লোহ এই দুই ধরনের ধাতুই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

দেশের অর্থনীতিক উন্নতির পরিমাপ করতে সাধারণত দেশে মাথাপিছু লোহের উৎপাদনের ও ব্যবহারের পরিমাণ মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, দেশে লোহআকরিকের পর্যাপ্ত ভান্ডার ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই লোহ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও সেটা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তেমনি লোহ উৎপাদনে কয়লা ও চুনা-পাথরের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থের অবস্থিতি ও তার যথাযথ ব্যবহার ছাড়া শিল্পোন্নয়ন, জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা কঠিন।

৩. **দেশের প্রধান খনিজ সম্পদের বিবরণ : লোহ :** বিশ্বের মোট মজুদ লোহের এক-চতুর্থাংশ ভারতে অবস্থিত। সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায়, ভারতের মজুদ হিমাটাইট লোহ আকরিকের মোট পরিমাণ ৯৬৫ কোটি টন। এছাড়া ম্যাগনেসাইট লোহ আকরিকের আনুমানিক মজুদ হল ২৯৮ কোটি টন। প্রভূত পরিমাণে লোহ-আকরিকের অবস্থিতি ভারতে লোহ-ইস্পাত শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দিচ্ছে। **ম্যাঙ্গানীজ :** ম্যাঙ্গানীজ আকরিকের মজুদের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। লোহ-ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং ড্রাই ব্যাটারী শিল্পে ম্যাঙ্গানীজ অপরিহার্য। ভারতে ম্যাঙ্গানীজ আকরিকের মোট মজুদের পরিমাণ (আনুমানিক) ১১ কোটি টন। **ক্রোমাইট :** ক্রোমাইটের মোট মজুদের পরিমাণ (আনুমানিক) ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টন। **স্বর্ণ :** ভারতে স্বর্ণ আকরিকের মজুদের পরিমাণ (আনুমানিক) ১২½ লক্ষ টন। **তাম্র :** বিহার রাজ্যের সিংভূম ও বারগন্ডা অঞ্চলের ৮০ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থানে তাম্র আকরিকের প্রধান মজুদ অবস্থিত। এর পরিমাণ আনুমানিক ২৫ কোটি টন। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শিল্পে তাম্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। **বক্সাইট :** ভারতের উচ্চশ্রেণীর বক্সাইটের মজুদের পরিমাণ ২৫½ কোটি টন ও মোট মজুদের পরিমাণ ১২৫ কোটি টন বলে অনুমান করা হয়েছে। বক্সাইট অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের কাঁচামাল। বিভিন্ন যান-বাহনের 'বডি' নির্মাণে, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্পে, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **অভ্র :** পৃথিবীতে গুণের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ অভ্র উৎপাদন করে বিহার। বৈদ্যুতিক শিল্পের অন্যতম উপাদান হল অভ্র। ভারতে উৎপন্ন অভ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী ও জাপানে রপ্তানী করা হয়। **ইলমেনাইট :** ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল ভাগের সমুদ্রতটভূমির বালুকারাশিতে প্রচুর পরিমাণে ইলমেনাইটের সন্ধান পাওয়া যায়। বালুকারাশিতে ইলমেনাইটের আনুমানিক মজুদ ১৩'৪ কোটি টন। **সীসক ও দস্তা :** ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সীসক ও দস্তার অবস্থিতির কথা জানা গিয়েছে। বর্তমানে ভারতের শিল্পায়নের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সীসক ও দস্তা আমদানি করতে হচ্ছে। ভারতে ১১ কোটি টন সীসক ও দস্তা আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। **অ্যান্টি-মনি :** পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার লাহুল হিমবাহে (glacier) অ্যান্টিমনি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া, মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অ্যান্টিমনির খনি রয়েছে। **টিন :** বিহারে হাজারিবাগ অঞ্চলে টিন আকরিকের খনি আছে। **জিপসাম :** রাসায়নিক সার ও সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম অপরিহার্য উপাদান। রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, তামিলনাড়ু ও গুজরাটে জিপসামের প্রচুর মজুদ রয়েছে। মোট মজুদের আনুমানিক পরিমাণ ১১০ কোটি টন। **তাপসহ খনিজ :** (refractories) : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যাগনেসাইট, অগ্নিসহ মৃত্তিকা (fire clay), কেয়ানাইট, সিলিম্যানাইট ও কোরানডাম প্রভৃতি শক্ত ও তাপসহ খনিজ পাওয়া যায়। **গন্ধক ও পাইরাইট :** গন্ধক ও সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির কাজে পাইরাইটের দরকার হয়। বারুদ, কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার, বস্ত্র, কাগজ, রং, বিস্ফোরক প্রভৃতির উৎপাদনে সালফিউরিক অ্যাসিড একটি অত্যাবশ্যক কাঁচা-মাল। ভারতে পাইরাইটের মজুদের পরিমাণ ৩৯ কোটি টন। এর থেকে প্রায় ১৬ কোটি টন গন্ধক পাওয়া যাবে অনুমান করা হচ্ছে। ভারতে গন্ধকের কোনো মজুদ নেই বলে পাইরাইটের সন্ধান করতে হয়েছিল। **কয়লা ও খনিজ তৈল :** এ দু'টি খনিজ জ্বালানি ও শক্তির উৎস হিসেবে পরিচিত।

ভারতের খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, লোহ, জিপসাম ও চুনাপাথরই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উত্তোলিত হয়ে থাকে। নিচে এদের খনির সংখ্যা দেওয়া হল :

কয়লা	মোট খনিসংখ্যা		৯০০
অভ্র	,,	,,	৬৭০
ম্যাঙ্গানীজ	,,	,,	৬০০
লোহ	,,	,,	২২০
চুনাপাথর	,,	,,	১১৪
জিপসাম	,,	,,	৩৫

এ সকল খনিতে সারা ভারতে বর্তমানে প্রায় ৮½ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হচ্ছে। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ,

অপরিশোধিত তৈলের বিপুল মজুদভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এখান থেকে ভবিষ্যতে প্রচুর তৈল পাওয়া যাবে। অয়েল ইণ্ডিয়া ও আসাম অয়েল কোম্পানি উৎপাদনের কাজ মোটামুটি ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। **তৈল পরিশোধন ব্যবস্থা :** ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতের তৈল পরিশোধন ক্ষমতা ছিল ২ কোটি ২৫ লক্ষ টন। ১৯৮৬-৮৭ সালে এ ক্ষমতা বেড়ে ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টনে পৌঁছায়। অন্যতম তৈল শোধনাগারগুলি হল, বারাউনি, হলদিয়া, বনগাইগাঁও, মথুরা এবং কয়ালী। এই শোধনাগারগুলি পূর্ণশক্তিতে কাজ শুরু করলে ভারতের প্রয়োজনের মাত্র ৪০ ভাগ এর সাহায্যে মেটাতে পারবে।

(গ) তাপ ও জলবিদ্যুৎ : ভারতের বর্তমান শক্তির চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎশক্তিই হল অন্যতম প্রধান উৎস। বাষ্প, ডিজেল তৈল ও জলশক্তি চালিত যন্ত্র—এ তিন ধরনের যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ এখনো কম। তবে ভবিষ্যতে এ সূত্র থেকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ও উৎপাদন খুবই কম। জাপানের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ভারতের উৎপাদনের তুলনায় ৬ গুণ বেশি।

(ঘ) পারমাণবিক বিদ্যুৎ : পরমাণুকে বিভক্ত করে প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করা যায়—আধুনিক বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে। ১১,০০০ টন কয়লা থেকে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়, এক টন ইউরেনিয়াম থেকেই তার সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে প্রচুর খরচ পড়ে। পারমাণবিক বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সে সমস্যা নেই। বর্তমানে যদিও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় খরচ তুলনায় বেশি পড়ছে, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতিতে ভবিষ্যতে এ খরচ কমবে।

৮. ভারতের শক্তি সংকট ও সমাধানের ব্যবস্থাসমূহ : ১৯৫১ সালে ভারতে বাৎসরিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৮ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ১৯৮০-৮১ সালে তা বেড়ে হয় ১৩২ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ১৯৫১ সালের পর থেকে ভারতে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ গুণেরও বেশি হয়েছে। ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত ভারতের ৩,১২৬টি শহর ও ২,৯৬,৫০৫ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রসারিত হয়েছে। এতটা বৃদ্ধি পেলেও পৃথিবীর অগ্রসর-শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ অতি সামান্য। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ভারতের শিল্পায়নের বিরাট কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য শক্তির যোগান বাৎসরিক ২০ শতাংশ হারে বাড়ানো অত্যাবশ্যক।

স্বাধীনতার পর থেকে, বিশেষত অর্থনীতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ বাড়লেও, প্রতিটি পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় এ বিষয়ে অগ্রগতি কম হয়েছে এবং তা লক্ষ্য পূরণে ঘাটতিটা ক্রমশ বেড়েছে। এটি হল দেশে বিদ্যুৎ সংকটের মূল কারণ।

সামগ্রিকভাবে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হলেও, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দেশের এই পাঁচটি অঞ্চলে তা আনুপাতিকভাবে বাড়েনি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বেড়েছে পশ্চিমাঞ্চলে, তারপর উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণাঞ্চলে। পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবহেলা আজ পশ্চিমবঙ্গ সহ

সারণি ২-৪ : বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য ও অগ্রগতি (মেগাওয়াট হিসাবে)

	অতিরিক্ত লক্ষ্য	উৎপাদন ক্ষমতা অগ্রগতি	ঘাটতি (শতাংশ হিসাবে)
প্রথম পরিকল্পনা	১,৩০০	১,১০০	১৫
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৩,৫০০	২,৩০০	৩৬
তৃতীয় পরিকল্পনা	৭,০০০	৪,৫০০	৩৬
বার্ষিক পরিকল্পনা	৫,৪০০	৪,১০০	২৪
চতুর্থ পরিকল্পনা	৯,৩০০	৪,৬০০	৫০
পঞ্চম পরিকল্পনা	১২,৫০০	৭,১০০	৪৩
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	১৯,৬৭০	১৪,২৩০	২৮
সপ্তম পরিকল্পনা	২২,৪৪০	১,৭৩০ (১৯৮৬-৮৭)	—

সূত্র : Draft Fifth Five-Year Plan, Part II, Draft Sixth Five Year Plan, 1978-83 and Seventh Five Year Plan, 1980-85.

পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ সংকটের জন্য মূলত দায়ী। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সংকটের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ অর্থ অন্যত্র খরচ করা (কোলাঘাট বিদ্যুৎ প্রকল্পের টাকায় কলকাতায় ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি) এবং নাশকতামূলক কাজ।

দেশে তেজশক্তির মোট যোগান অপ্রচুর বলে বিদেশ

৮০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ২৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারছি। জলবিদ্যুতের যে সব প্রকল্প আমাদের হাতে আছে, সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হলে আরও মাত্র ১৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এর পরেও আরও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা অব্যবহৃত থেকে যাবে।

সারণি ২-৫ : ভারতে অঞ্চলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট হিসাবে)

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৩	১৯৮০	১৯৮৫
উত্তরাঞ্চল	৩৫৪	৯০৮	৪,০৭৫	৭,৯০৪	১১,৮৩৮
পশ্চিমাঞ্চল	৪২২	১,৩৫৯	৫.০৬৯	৭,৩১৮	১২,৯৩৭
দক্ষিণাঞ্চল	৩৬৩	১,১১৫	৪,৫১৭	৬,৮৯৭	১০,৩৫৭
পূর্বাঞ্চল	৫৯৯	১,২৪১	৩ ৬৫৪	৪,৫৩৫	৭,৩৫৮

সূত্র : Economic Survey, 1950-51 to 1980-81. Seventh Five Year Plan.

থেকে আমদানি করা তরল জ্বালানীর উপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। এটা মোটেই কাম্য নয়। এ ব্যাপারে দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন অবশ্যকর্তব্য, সংকটের আশু সমাধানের জন্য কিছু স্বল্পকালীন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

(১) দেশে তরল জ্বালানীর ব্যবহার যথাসম্ভব কমানোর জন্য পেট্রল ও কেরোসিনের রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা। এ জন্য মোটর গাড়ী, স্কুটার, মোটর সাইকেল, জীপ প্রভৃতি যানবাহনের জন্য পেট্রল ব্যবহারের একটা উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিতে হবে। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা পেট্রলের ব্যবহার অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ কমানো দরকার।

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে তেলের পরিবর্তে কয়লার ব্যবহার। এ কাজ করতে গেলে দেশে কয়লার উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে। অধিক কয়লা উত্তোলনে সরকারী প্রচেষ্টা যতটা সফল হবে, তৈলের পরিবর্তে কয়লার ব্যবহারও সেই অনুপাতে বাড়ানো যাবে।

(৩) দেশের মোট শক্তি উৎপাদনে জলবিদ্যুৎকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে দিতে হবে। উপাদান হিসাবে জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এমন কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে যা কয়লার মত উপাদানের নেই। দেশে কয়লার অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই—তাই কয়লার যোগান একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জলস্রোত একটি চিরস্থায়ী উপাদান, একে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে, কোনোদিনই জলস্রোত নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। হিসেব করা হয়েছে, ভারতে ২ কোটি

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর বেশি গুরুত্ব দেবার আরো কয়েকটি কারণ হল : (ক) দেশে তৈল, কয়লা এবং গ্যাস জাতীয় সম্বলের যোগান সীমাবদ্ধ। আমাদের এমন নীতি হওয়া উচিত যাতে শক্তির এ সব উপাদান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে জলবিদ্যুতের ব্যবহার যেন ব্যাপকতর করা যায়। (খ) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম সুবিধা হল এতে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, এবং পরিত্যক্ত আবর্জনা বিনষ্ট করার সমস্যাও থাকে না। (গ) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের তুলনায় খুবই কম। (ঘ) একটা ধারণা আছে যে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের রূপায়ণে দীর্ঘ সময় লাগে। এ ধারণা ভুল। কারণ, অনুসন্ধানে দেখা গেছে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণেও প্রায় একই সময় লাগে।

শহরাঞ্চলের ঘরোয়া বা সাধারণ কাজে (যেমন, রন্ধন) ব্যবহৃত শক্তির প্রধান উৎস হল কেরোসিন। এদেশে কেরোসিনের যোগান নির্ভর করে প্রধানত আমদানির উপর। গ্রামাঞ্চলেও কেরোসিনের ব্যবহার হয় বটে, তবে সেখানে জ্বালানি হিসাবে কাঠ বা গোবরই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। কেরোসিনের উপর দেশের নির্ভরতা কমাতে হলে বিকল্প হিসেবে সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা অবশ্যকর্তব্য। জল গরম করা বা রন্ধনের কাজে সৌরশক্তিযুক্ত হিটার তৈরির ব্যবস্থা করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন হলে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে করতে হবে। গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সুবিধা হল

এই যে এতে কোন জটিলতা নেই ; এটা অতি সহজেই পরিচালনা করা যায়। এর গ্যাস যেমন আলোক বিতরণ করবে, তেমনি গোবরের অবশিষ্টাংশ সার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারবে। যুগ যুগ ধরে ভারতে গোবরের অপচয় হচ্ছে ; গোবর-গ্যাস প্ল্যাণ্ট গোবরের সার্থক ব্যবহার করে দেশের অনেক কাজে সাহায্য করবে।

তেজশক্তি সংকট ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতা অর্জনের যে লক্ষ্য পঞ্চম পরিকল্পনায় পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না। এ সংকটের হাত থেকে বাঁচতে হলে দেশে অপরিশোধিত তেলের আমদানি কমাতে হবে এবং বিকল্প হিসেবে জলবিদ্যুৎ ও কয়লার উৎপাদন বাড়াতে হবে। যেহেতু কয়লা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে, কারণ, তার ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, তাই জলবিদ্যুতের ও পারমাণবিক বিদ্যুতের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোটাই হল ভারতের শক্তি সংকট মোচনের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সমাধান। সপ্তম পরিকল্পনার ওয়ার্কিং গ্রুপ সপ্তম পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ৩০,৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য ৬৭,৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ হতে পারে ৩৫ হাজার কোটি টাকা থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা। বাকিটার জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সম্ভবত নির্ভর করা হবে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে তেজশক্তির বিবিধ উৎস সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

[Write a note on the varied sources of power that are available in India.]

২ ভারতের শক্তি সংকট সম্পর্কে আলোচনা কর। এ সংকট সমাধানে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ?

[Discuss the nature of the power crisis in India, Suggest measures to solve the crisis.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতের কর্ষণযোগ্য ভূমির নীট আয়তন বৃদ্ধি করা কি সম্ভব ?

[Is it possible to increase the net area of the cultivable land in India ?]

২ ভারতে (আনুমানিক) কি পরিমাণ পতিত জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ?

[How much (approximately) of the fallow land in India can be reclaimed ?]

৩. ভারতের প্রধান খনিজ সম্পদের নাম উল্লেখ কর।

[Name the chief minerals of India.]

মানবিক উপকরণ
Human Resources

জনসমষ্টি বা মানবিক সম্পদের গুরুত্ব / ভারতের জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য / জীবিকার ধাঁচ / জীবিকার ধাঁচের পরিবর্তন : সরকারী নীতি / জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন / ভারতে কি জনাধিক্য ঘটেছে ? / জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ও পরিবার পরিকল্পনা / জনসংখ্যার সম্ভাব্য সমাধান / পরিবার কল্যাণ / জনসংখ্যার গুণগত মান / আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

৩.১. জনসমষ্টি বা মানবিক সম্পদের গুরুত্ব
Importance of Human Resources (Population)

১. জনসমষ্টি হল উৎপাদনের মানবিক উপকরণ। জনসমষ্টির পরিমাণ ও গুণাগুণের দ্বারা জাতীয় আয়ের অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ নির্দিষ্ট হয়। জনসমষ্টির অর্থাৎ দেশবাসীর অভাব-তৃপ্তির জন্যই জাতীয় আয় উৎপাদন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুতরাং, জনসমষ্টি যেমন উৎপাদনের উপকরণ, তেমনি উৎপাদনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও বটে। আধুনিক বিকাশমান দেশসমূহে অর্থনীতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে জনসমষ্টির আলোচনার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। কারণ, জনসমষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনীতিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ নির্দিষ্ট হয় :

২. জনসমষ্টির মোট আয়তন, বা পরিমাণ বৃদ্ধির হার, ঘনত্ব, নারী ও পুরুষ এবং বিভিন্ন বয়সের অনুপাত, শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যায় বণ্টন, মোট জনসংখ্যার কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত, সাক্ষরতার হার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের গুরুতর অর্থনীতিক তাৎপর্য রয়েছে।

৩. মানুষ কেবল ভোগী নয়, এবং কেবল শ্রমের যোগানদার নয় ; মানুষ দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিও বটে। দেশের জনসমষ্টি হল দেশের যাবতীয় সম্পদের স্রষ্টা এবং শুধু তাই নয় ; এ জনসমষ্টি অফুরন্ত সৃজন-ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনীতিক বিকাশ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে তার মানবিক শক্তির বিকাশ ও সদ্ব্যবহারের উপর।

৩.২. ভারতের জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য (লোকগণনা ১৯৮১)
Features of Population of India (Census, 1981)

১. মোট জনসংখ্যা : ভারতের মোট জনসমষ্টি ১৯৮১ সালে ছিল ৬৮.৪ কোটি। বর্তমানে তা হয়েছে ৮২ কোটিরও বেশি। জনসমষ্টির আয়তনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয়। ১৯৫১ সাল থেকে ৩ দশকে জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৬ কোটি ৩০ লক্ষ ; গত দশ বছরে বেড়েছে ১৩ কোটি।

সারণি ৩-১ : ভারতের জনসংখ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (লোকগণনা ১৯৮১)

	জনসমষ্টি (কোটি)	জনবসতির গড়পড়তা ঘনত্ব	নারীর অনুপাত (শতাংশ)	গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত	প্রতি দশকে বৃদ্ধির হার
১৯৫১	৩৬'১১	১২১	৪৮'৬	৮২'৪	
১৯৬১	৪৩'৯২	১৪৪	৪৮'৫	৮২	২১ ৫১
১৯৭১	৫৪'৮২	১৭৭	৪৮'২	৮০'১	২৪ ৮০
১৯৮১	৬৮'৪	২২১	৪৮'৪	৭৬'৩	২৪ ৭৫

সূত্র : লোকগণনা, ১৯৮১

২. **বসতির ঘনত্ব :** ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়পড়তা ২২১ জন লোক বাস করে। গত তিন দশকে ঘনত্ব বেড়েছে ১০০ ; গত দশকে বেড়েছে ৪৪।

৩. **বসতির আঞ্চলিক বণ্টন :** ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে জনবসতির বণ্টনে কিন্তু খুব বেশি বৈষম্য দেখা যায়। দিল্লী, চণ্ডীগড়, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব যথাক্রমে ৪,১৭৩, ৩,৯৪৮, ৬৫৪, ৬১৪ ; পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, নাগাল্যাণ্ড ও মধ্যপ্রদেশে জনবসতির ঘনত্ব হল যথাক্রমে ৪৭, ৭৬, ১০০, ১১৮।

সারণি ৩-২ : বিশ্বের কয়েকটি দেশের জনবসতির ঘনত্ব (১৯৭৬)

	জনসংখ্যা (কোটি)	আয়তন (হাজার বঃ কিঃ)	বসতির ঘনত্ব (প্রতি কিলোমিটারে)
বিশ্ব	৪২৯'৩০	১৩০ ৫৫২	৩৩
জাপান	১১'৫৭	৩৭২	৩১১
ব্রিটেন	৫'৫৯	২৪৫	২২৮
চীন	৯৬'৪৫	৯,৫৯৭	১০১
ভারত	৬৫'৯২	৩,২৮৮	২০২

সূত্র : World Development Report, 1981.

৪. **স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত :** ভারতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত বর্তমানে ৯৩৫। ১৯৫১ সালের লোকগণনায় হিসাবে তা ছিল হাজার পুরুষ প্রতি ৯৩২। জনসমষ্টির ৪৮ ৬ শতাংশ হল নারী।

৫. **বয়স অনুযায়ী জনসমষ্টির গঠন :** ভারতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিশু ও বালক-বালিকার অনুপাত (লোকগণনা ১৯৭১) ৪১'৪, ১৫ থেকে ৫৪ বৎসরের কর্মক্ষম কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এবং প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ার অনুপাত ৫৩'৪ ও তদূর্ধ্ব বয়সের নরনারীর অনুপাত ৫'২। কর্মক্ষম অর্থাৎ ৫৩'৪ শতাংশের প্রায় অর্ধেকই নারী।

৬. **জন্ম ও মৃত্যু হার :** ভারতে জনসংখ্যার হাজার প্রতি জন্ম ও মৃত্যু হার ১৯৫১-৬০ সালে প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৪০ ও ১৮ থেকে ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ৩৬ ও ১৪'৮-এ নেমে এসেছে।

৭. **জনসমষ্টির বৃদ্ধির হার :** ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে তিন দশকে ভারতে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ ১৫ শতাংশ ছিল। তুলনায় উন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলির বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হল ০'৭ শতাংশ, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হল ০'৮ শতাংশ। ভারতের বর্তমান জন্ম হার অত্যন্ত বেশি। এই হার কমানোর প্রয়োজন।:

৮ **গড় আয়ু :** গত তিন দশকে ভারতবাসীর গড় আয়ু ৪১'২ বৎসর (১৯৫১-৬১) থেকে বেড়ে ১৯৮১ সালে ৫৪ বৎসর হয়েছে। ধীরে ধীরে এ দেশে মানুষের গড়পড়তা আয়ু বাড়ছে, তবে, অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় তা এখনও অনেক কম।

৯. **গ্রাম ও শহরে জনসমষ্টির বণ্টন :** বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই গত আশি বৎসর ধরে ভারতে শহরবাসীর অনুপাত ক্রমশ বাড়ছে ও গ্রামবাসীর অনুপাত ক্রমশ কমছে। ১৯৫১ সালের পর থেকে এই পরিবর্তন দ্রুততর হয়েছে। ১৯০১ সালে প্রতি ৯ জন ভারতবাসীর

মধ্যে ১ জন শহরে বাস করত। ১৯৫১ সালে বাস করত প্রতি ৫ জনে একজন। ১৯৮১ সালে প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন হল শহরবাসী। শহরের সংখ্যাও ১৯০১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার শহরীকরণের (urbanization) গতিবেগ সমান নয়। মহারাষ্ট্র (৩৫%), তামিলনাড়ু (৩৩%), গুজরাট (৩১%) ও কর্ণাটকে (২৮%) এই ঝোঁক সবচাইতে বেশি। সবচেয়ে কম হল উড়িষ্যা (১১'৮%), ত্রিপুরা (১১%) ও হিমাচল প্রদেশে (৭' ,)। শহরগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বেশি হল বৃহত্তর কলকাতা (৯১ ৬ লক্ষ), বৃহত্তর বোম্বাই (৮২ ৩ লক্ষ), দিল্লী (৫৭'১ লক্ষ ও মাদ্রাজ (৪২ ৮ লক্ষ)।

৩.৩. জীবিকার ধাঁচ, অর্থনীতিক বিকাশ এবং ভারত Occupational Distribution, Economic Development and India

১ আধুনিক কালের জীবিকাগুলিকে অর্থনীতিবিদরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন: (ক) কৃষি ও পশুপালন, মৎস্য শিকার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজকে বলা হয় প্রাথমিক পর্যায়ের জীবিকা (primary sector)। প্রকৃতি নির্ভর এই কাজগুলি মানুষের বাঁচার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন, এজন্য প্রাথমিক জীবিকা বলে এবা গণ্য হয়। (খ) ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন সব রকম (খনিসহ) যন্ত্রনির্ভর দ্রব্য-উৎপাদন ব্যবস্থাকে বলা হয় মাধ্যমিক কিংবা দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবিকা (secondary sector)। এবং (গ) পরিবহণ, যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং, বীমা ইত্যাদির কাজ, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের কাজকর্মকে সাহায্য করে এবং সেবা শিল্প প্রভৃতিকে তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকা (tertiary sector) বলে গণ্য করা হয়।

সারণি ৩-৩ : ৮০ বৎসরে (১৯০১-১৯৮১) ভারতে গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার পরিবর্তন

	জনসংখ্যার অনুপাত গ্রাম : শহর	শহরবাসী জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (শতাংশ)	শহরের সংখ্যা	শহর ও গ্রামবাসীর অনুপাত
১৯০১	৮৯ : ১১		১৮৩৪	১ : ৮'১
১৯৫১	৮২ ৪ : ১৭'৬	৪১ ৫	২৮৪৪	১ : ৪ ১
১৯৮১	৭৬ ৩ : ২৩ ৭	৪৬ 0	৩২৪৫	১ : ৩'২

সূত্র : Census of India, 1981 Series I, India, Paper 2 of 1981.

১০ **জীবিকা অনুযায়ী জনসমষ্টির বণ্টন:** দেশে কর্মে নিযুক্ত মোট ২২ কোটি ২০ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ পুরুষ ও ৪ কোটি ৮০ লক্ষ নারী। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৩৭ ৬ শতাংশ কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। দশ বৎসর আগে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত ছিল ৩৪ ২ শতাংশ। এদের মধ্যে শতকরা ৪১% কৃষক, শতকরা প্রায় ২৫% ক্ষেত-মজুর ও বাকি শতকরা প্রায় ৩৩% অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত।

১১. জনসমষ্টির অর্থনীতিক অবস্থা: মোট জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ৩৭ ৬ শতাংশ কোনো-না-কোনো কর্মে নিযুক্ত এবং উপার্জনশীল, বাকি শতকরা প্রায় ৬২'৪ শতাংশ কোনও অর্থোপার্জনকারী কর্মে নিযুক্ত নয় এবং পরনির্ভরশীল। সারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করে।

১২. অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অনুপাত: দেশে অক্ষর পরিচয়বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুপাত এখন ৩৬ শতাংশ। পুরুষদের ৪৬ ৬ শতাংশ ও নারীদের ২৪ ৭ শতাংশ অক্ষর পরিচয় বিশিষ্ট। ১৯৬১ সালে সাক্ষর জনসংখ্যা ছিল ২৪ শতাংশ; ১৯৭১ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ২৯ শতাংশ।

কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এই তিন ধরনের জীবিকার যে কোনটিতে অন্তর্ভুক্তিই জনসংখ্যার জীবিকাগত কাঠামো (occupational structure) বা জীবিকার ধাঁচ (occupational pattern) বলে গণ্য করা হয়।

২ অর্থনীতিবিদদের মতে, কোনো দেশের মানুষের জীবিকার ধাঁচের সঙ্গে সেই দেশের অর্থনীতিক বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেশের অর্থনীতিক বিকাশের সাথে সাথে তার জীবিকার ধাঁচের একটা সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে এবং আগে থেকেই তা অনুমানও করা যায়। তা হল এই: অর্থনীতিক অগ্রগতির সাথে সাথে প্রাথমিক কার্যকলাপের থেকে বিনিয়োগ এবং কর্ম-সংস্থান মাধ্যমিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সরে যেতে থাকে এবং পরে তৃতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি করে সরে যেতে থাকে। এজন্য দেখা যায় মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হলে প্রাথমিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যা বেশি হয়। মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়তে শুরু করলে ক্রমশ মাধ্যমিক উৎপাদনের

ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যা বাড়ে এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় খুব বেশি হলে তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকায় নিযুক্ত জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়।

৩ ভারতে যে সব সংজ্ঞার ভিত্তিতে ১৯৫১ সালের লোকগণনার তথ্য সংগ্রহ ও পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছিল সেগুলির সাথে ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালের লোকগণনার জন্য

সারণি ৩-৪ : কয়েকটি উন্নত দেশে ও ভারতে মাথাপিছু আয়ের ও জীবিকাগত কাঠামোর পরিবর্তন (১৯৬০-১৯৮২)

দেশ	বৎসর	মার্কিন ডলারে মাথাপিছু আয়	মোট জনসংখ্যার শতাংশরূপে কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যা	কৃষি	শিল্প	সেবা
				(কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার শতাংশ)		
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৬০	২,৫০২	৬০	৭	৩৬	৫৭
	১৯৮২	১৩,১৬০	৬৬	২	৩২	৬৬
ব্রিটেন	১৯৬০	১,২৬১	৬৫	৪	৪৮	৪৮
	১৯৮২	৯,৬৬০	৬৪	২	৪২	৫৬
কানাডা	১৯৬০	১,৯০৯	৫৯	১০	৩৪	৫২
	১৯৮২	১১,৩২০	৬৭	৫	২৯	৬৬
ফ্রান্স	১৯৬০	১,২০২	৬২	২২	৩৯	৩৯
	১৯৮২	১১,৬৮০	৬৪	৮	৩৯	৫৩
জাপান	১৯৬০	৪১৭	৬৪	৩৩	৩০	৩৭
	১৯৮২	১০,০৮০	৬৮	১২	৩৯	৪৯
ভারত	১৯৬০	৬৯	৫৪	৭৪	১১	১৫
	১৯৮২	২৬০	৫৭	৭১	১৩	১৬

সূত্র : U.N. Statistical Year Book, 1977 and World Development Report, 1984.

সারণি ৩-৫ : ভারতে মোট জনসংখ্যায় কর্মরত জনসমষ্টির পরিমাণ ও শতাংশ

	১৯৬১			১৯৭১			১৯৮১		
	মোট জনসংখ্যা	কর্মরত জনসংখ্যা	শতাংশ	মোট জনসংখ্যা	কর্মরত জনসংখ্যা	শতাংশ	মোট জনসংখ্যা	কর্মরত জনসংখ্যা	শতাংশ
গ্রামীণ	৩৪·৭	১৫·৭	৪৫·১	৪২·২	১৪·৯	৩৫·৩	৫২·২	২০·৫	৩৯·৫
শহরবাসী	৭ ৮	২·৬	৩৩ ৫	১০·৭	৩·১	২৯·৬	১৬·২	৫·২	৩১·৪
মোট	৪২ ৫	১৮·৩	৪৩·০	৫২·৯	১৮ ০	৩৪ ২	৬৮·৪	২৫·৭	৩৭·৬

সূত্র : Census, 1981.

সারণি ৩-৬ : দেশের বিভিন্ন কর্মে কর্মরত শ্রমশক্তির বণ্টন (১৯৭১-৮১) (শতাংশ হিসাবে)

	১৯৭১			১৯৮১		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
১ কৃষক	৪৫·৭	২৯·৭	৪২·৯	৪৩·৮	৩৩·০	৪১ ৫
২ খেতমজুর	২১·৭	৫১ ০	২৬·৯	১৯·৮	৪৫ ৬	২৫·২
মোট (১+২)	৬৭ ৪	৮০ ৭	৬৯·৮	৬৩·৬	৭৮·৬	৬৬·৭
৩ অন্যান্য	৩২·৬	১৯ ৩	৩০·২	৩৪·৪	২১·৪	৩৩·৩
	১০০ ০	১০০ ০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

সূত্র : Census of India 1981, Paper 3 of 1981, Provisional Totals—Workers and non-workers.

সারণি ৩-৭ : ভারতে বিভিন্ন জীবিকার ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির বণ্টন (শতাংশ হিসাবে)

	১৯০১	১৯৫১	১৯৭১	১৯৮১*
কৃষক	৫০·৬	৫০·০	৪৩·৩	৪১·৫
খেতমজুর	১৬·৯	১৯·৭	২·৬৩	২৫·২
পশুপালন, মৎস্য শিকার, প্রভৃতি	৪·৩	২·৪	২·৫	
মোট	৭১ ৮	৭২·১	৭২·১	৬৬·৭
শিল্প	১২·৬	১০·৬	১১·২	৩৩ ৩
সেবা	১৫·৬	১৭·৩	১৬ ৭	
	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র : A Note on Working Force Estimates—1901-1961. B. R. Kalra. Final Population Totals. Paper No. 1, 1962, Census of India, 1971, and 1981, Series 1, India Paper 3 of 1981 ; *Figures of 1981 incomplete.

ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলির পার্থক্য থাকায় ১৯৫১ সালের লোকগণনার পরিসংখ্যানগুলি ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালের লোকগণনার পরিসংখ্যানের সাথে সঠিকভাবে তুলনীয় নয়। বরং ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালের লোকগণনার পরিসংখ্যানগুলি তুলনীয় বলে সে তুলনার ভিত্তিতেই ভারতে জনসংখ্যার জীবিকার ধাঁচটি আলোচনা করা হল।

(ক) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কর্মরত জনসংখ্যাও ১৯৬১ সালে ১৮ ৩ কোটি থেকে বেড়ে ১৯৮১ সালে ২৪·৭ কোটিতে পরিণত হয়েছে।

(খ) কৃষি এখন পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির জীবিকা নির্বাহের উপায় রূপে রয়ে গেছে।

(গ) কিন্তু ১৯৭১ থেকে ১৯৮১, এই দশ বৎসরে অতি সামান্য হলেও কৃষিতে নিযুক্ত জনসমষ্টির শতাংশ কমেছে (৬৯·৬% থেকে ৬৬ ৭%) এবং শিল্প ও সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসমষ্টির অনুপাত বেড়েছে (৩০·২% থেকে ৩৩·৩%)। এটা স্পষ্টতঃই জমিচ্যুত মানুষের জীবিকার সন্ধানে কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্যত্র যোগদানের ফলেই ঘটেছে। এটি অর্থনীতিতে 'সর্বহারাকরণের ঝোঁক' (trend of proletarianisation) নামে পরিচিত। ধনতন্ত্রী অর্থনৈতিক বিকাশের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ঝোঁকটি প্রবলতর হবে। ১৯৫১ সালের পর থেকে এই ঝোঁকটি শুরু হয়েছে এবং সেটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ১৯৭০-এর দশকে।

(ঘ) ১৯০১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে ৮০ বৎসরে দেশের জমির মালিক কৃষকের অনুপাত ৫০·৬ শতাংশ থেকে কমে ৪১·৫ হয়েছে এবং ক্ষেতমজুরের অনুপাত ১৬·৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৫·২ হয়েছে। এর কারণ হল একদিকে ক্রমশ অল্পসংখ্যক মালিকের হাতে কৃষি জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্র চাষীরা জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুর বাহিনীর আয়তন বাড়িয়ে দিচ্ছে।

(ঙ) ক্ষেতমজুরের শতাংশটি গত দশকে যেমন সামান্য কমেছে তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শহরাঞ্চলে ও শিল্প এবং সেবাক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমশক্তির শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ সর্বহারায় পরিণত জনসমষ্টি গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে শহরে ও শিল্প এবং সেবাক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে।

(চ) কিন্তু একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ১৯৫১ সাল থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ সত্ত্বেও, কৃষি থেকে শিল্পে শ্রমশক্তির স্থানান্তরের পরিমাণটি এখনও অতি সামান্যই থেকে গেছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দুই দশকে এর পরিমাণ হয়েছে মাত্র ০ ৬ শতাংশ (১০·৬% থেকে ১১·২%)।

(ছ) এছাড়া, আরেকটি ঝোঁকও প্রবল হয়ে উঠেছে। তা হল দেশের শ্রমশক্তিতে নারীশ্রমের অনুপাত বৃদ্ধি। শহরের তুলনায় এই বৃদ্ধি গ্রামীণ ক্ষেত্রেই বেশি।

৩.৪. জীবিকার ধাঁচের পরিবর্তন : সরকারী নীতি Changes in Occupational Distribution : Governmental Policy

১. স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজে (অর্থাৎ কৃষিতে) নিযুক্ত শ্রমজীবির অনুপাত হ্রাস পাবে এবং পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবির অনুপাত বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। ভারতে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবির অনুপাতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

২. ভারতের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনতে হলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো দরকার। এতকাল বহু রকমের অসুবিধার জন্য ভারতের কৃষি পশ্চাৎপদ ছিল। অধুনা, বিশেষ করে পরিকল্পনাকালে, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যাপক সম্প্রসারণ, নতুন বীজের ব্যবহার এবং কৃষিতে যন্ত্রীকরণের ফলে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে জীবিকার ধরনে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রও সমান তালে সম্প্রসারিত হয়। কেননা তখনই কৃষি থেকে উৎসাদিত শ্রমশক্তি এই দু'পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে কাজ পেতে পারে। তা ছাড়া, গ্রামীণ শিল্প ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্প বিপুল সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির নিয়োগ সম্ভব হবে। একই সঙ্গে জমি পুনরুদ্ধারের কাজ, যন্ত্রপাতির মেরামতি কাজ, পরিবহণ-সংসরণের কাজ, প্রভৃতি প্রসারিত করতে পারলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অনেকটা সুবন্দোবস্ত করা যায়। দেখা যাচ্ছে, ভারতে জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনতে গেলে শিল্পায়নের কার্যক্রমের সাথে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা দরকার।

৩ **ভারতে জীবিকার ধরনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন কেন হয়নি :** সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ যখন শুরু হয়, তখন কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগও সৃষ্টি হয়। ভারতেও তাই হয়েছে। জলসেচ ব্যবস্থা, শক্তি উৎপাদন, বুনিয়াদী শিল্প, পরিবহণ ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ প্রভৃতি কাজের সম্প্রসারণ হচ্ছে, ফলে নতুন নতুন কাজেরও সুযোগ বাড়ছে। যেমন, সেচ-ব্যবস্থার যত সম্প্রসারণ হচ্ছে, জমিতে দু'টি ফসল উৎপাদনের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে, এবং সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে মরশুমী (seasonal) কর্মহীনতার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ যত প্রসারিত হবে ততই বিভিন্ন আয়তনের শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হবে। এভাবে নানাবিধ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাজে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ভারতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচি রূপায়িত হচ্ছে তাতে এদেশের জীবিকার ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাজে যত বেশি বিনিয়োগ হবে, ততই বেশি বেশি হারে ভারতের কর্মহীন মানুষ এই দু'টি পর্যায়ের কাজে নিযুক্ত হতে থাকবে। কিন্তু এটা হিসাবে ধরা হয়নি যে এতে ভারতের সামগ্রিক জীবিকার ধরনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। তার কারণ বিশাল জনসমষ্টির চাপে বিপর্যস্ত ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি।

বিগত চার দশকের কর্মসংস্থান নীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কার্যসূচির বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি। তার কারণ : প্রথমত, পরিকল্পনা-কালে গ্রামীণ কর্ম-সংস্থানের জন্য যেসব প্রকল্পের কথা বলা হয়েছিল, সেগুলি যথেষ্ট যত্ন ও দৃঢ়তার সাথে রূপায়ণ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ অর্থনীতির আধুনিকীকরণও সম্ভব হয়নি ; ফলে স্থানীয় সম্বল ব্যবহার করে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রের কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি করা যায়নি, কৃষিতে ব্যবহৃত নানাবিধ উপাদানের (inputs) গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা যায়নি, তাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কাজে সাফল্য লাভ করা যায়নি। তৃতীয়ত, জমি বণ্টনের লক্ষ্য সামনে রেখে গ্রামীণ ভূমিসংস্কার নীতির সফল রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। চতুর্থত, গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি দরিদ্র কৃষককে সাহায্য করেনি, মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকই এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। ফলে, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূর করার কাজে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি।

অপরদিকে, শিল্পায়নের কার্যসূচিতে পুঁজিদ্রব্য শিল্প স্থাপনের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এবং এ সব শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে নির্ভর করা হয়েছে বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর। স্থানীয় দক্ষতা ও সম্বল কাজে লাগাবার বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়নি। উপরন্তু দেশে ব্যাপকভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের ব্যাপারে তেমন প্রচেষ্টাও চালান হয়নি। শ্রম-নিবিড় (labour-intensive) শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না করে, পুঁজি-নিবিড় (capital-intensive) শিল্পেব উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করে বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্পায়নের এই কৌশল অবলম্বনের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির তেমন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এ সবের ফলে গত তিন দশকের উন্নয়নমূলক কাজের দ্বারা ভারতের জীবিকার ধরনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৩ ৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
Population Growth and Economic Development

১. দেশের জনসমষ্টি এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জীবনযাত্রার মানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সাধারণত দেখা যায় দেশের জনসংখ্যা বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। তাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। বিনিয়োগ বাড়তে থাকলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ে। চাহিদা পূরণের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি, প্রয়োগ কৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়। এর ফলে উৎপাদনের বহরও বড়

হয় এবং উৎপাদন ব্যয়ও কমে। জনসংখ্যা বাড়লে দেশের প্রয়োজনমত অতিরিক্ত শ্রমের যোগান দেওয়া যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে তবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। এরূপ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একমাত্র উন্নত দেশের পক্ষেই সম্ভব। আর উপযুক্ত বিনিয়োগের অভাবে ভারতের মতো অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

২. স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল ঃ স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি নানা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তা ভারতের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। অনেকের মতে, জনসমষ্টির দ্রুত বৃদ্ধি ভারতে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায়।

সাধারণত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু এ সুযোগ কতখানি গ্রহণ করা সম্ভব তা নির্ভর করে পাঁচটি বিষয়ের উপর—(ক) দেশের কারিগরী জ্ঞানের স্তর, (খ) কৃষি ও শিল্পের অবস্থা; (গ) প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা (ঘ) পুঁজি-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতা; এবং (ঙ) অর্থনীতির কাঠামো।

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম সমস্যা হল এদের উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার অপ্রতুলতা। এসব দেশে কৃষির কাঠামো এখনও পশ্চাৎপদ এবং দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপযুক্ত। শিল্পক্ষেত্রে এখনও ভোগ্য-পণ্যশিল্পের প্রাধান্য রয়েছে। মূল ও বুনিয়াদী শিল্পের কেবলমাত্র ভিত্তি রচিত হচ্ছে। দেশে নানারূপ প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যবহৃত ভাণ্ডার থাকলেও তা ব্যবহারের জন্য যে হারে পুঁজিগঠন প্রয়োজন তা আয়ের (এবং সঞ্চয়ের) স্বল্পতার জন্য সম্ভব হচ্ছে না; সর্বোপরি, দেশে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক কাঠামো বিদ্যমান থাকায় এগুলি দেশের সর্বাত্মক উন্নতির পথে প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

এ কথাগুলি মনে রেখে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টার উপর জনসমষ্টির বৃদ্ধির ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া আলোচনা করতে হবে।

ভারতের জনসমষ্টি আয়তনে পৃথিবীতে দ্বিতীয়। জন্ম-হারও বেশি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে দেশে রোগ, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ হ্রাস ও জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থার উন্নতির দরুন মৃত্যু-হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার হয়েছে ২'১ শতাংশ। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বর্তমানে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল জনসংখ্যার মোট বৃদ্ধির পরিমাণ। একমাত্র গত দশকেই ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১০ কোটি।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার আরও কিছুকাল নিশ্চিত রূপেই বেশি হবে বলে অনুমান করা যায়। কারণ, পৃথিবীর সর্বত্র অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে দেখা গেছে।

এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি অর্থনৈতিক উন্নতির গতি-বেগ বিশেষভাবেই কমিয়ে দিচ্ছে। তার কারণ—

(ক) এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির অধিকাংশ অল্প বয়স্ক। এরা শ্রমের যোগান বাড়াচ্ছে না, কিন্তু দেশে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়াচ্ছে। সুতরাং দেশের আয়ের যে অংশ সঞ্চিত হয়ে পুঁজি গঠনে লাগতে পারত, উৎপাদন বাড়াত, তা সরাসরি অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে, বিনিয়োগের হার যথেষ্ট বাড়তে পারছে না।

(খ) জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই কৃষক। সুতরাং, কৃষিক্ষেত্রের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত জনসমষ্টিই বিশেষরূপে বাড়ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার তীব্র চাপ প্রধানত কৃষিজমির উপরেই পড়ছে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম দেখা দিয়েছে, অপরদিকে তেমনি কৃষকদের মধ্যে প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতাও ব্যাপকভাবে বাড়ছে।

(গ) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হচ্ছে বলে শিল্পসমূহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদন করা যাচ্ছে না।

(ঘ) উৎপাদিত খাদ্যশস্যের অধিকাংশই উৎপাদনকারী ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এজন্য বাজারে শস্যের যোগান উল্লেখযোগ্যহারে বাড়ছে না। ফলে, দেশের খাদ্যাভাব দূর করার জন্য দুর্লভ, বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে এখনও বিদেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এ কারণে শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট পুঁজিদ্রব্য বিদেশ থেকে আনা যাচ্ছে না। অবশ্য বর্তমানে গমের ফলন বেড়েছে এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি কমেছে বটে তবে সে আমদানি একেবারে বন্ধ করা যায়নি।

(ঙ) জনসংখ্যা বাড়লে দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু ভারতের মাথা-পিছু আয় অত্যন্ত অল্প বলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও খুবই কম থাকায় খাদ্যসামগ্রীর 'কার্যকর চাহিদা' তেমন বাড়ছে না।

পরিশেষে এ আলোচনায় দেশের বর্তমান মূল অর্থ-নৈতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্তিত থাকবে বলে

ধরে নেওয়া হয়েছে। যদি তা না হয়, অর্থাৎ যদি অর্থনীতিক কাঠামোর মৌলিক রূপান্তর ঘটে, সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার অবশ্যই সম্ভব হবে।

৩. ভারতের দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় বিশেষ বাড়ছে না, পুঁজি গঠনও বিশেষ হচ্ছে না, তাই উৎপাদন তেমন বাড়ছে না, জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়ও বাড়ছে না। ফলে দারিদ্র্য শুধু যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকছে তাই নয়, বরং আরও শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলে বর্ণনা করা যায়।

ভারতের মত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের একটা ফল হিসাবেও বর্ণনা করা যায়। এর ব্যাখ্যাটা এ রকম ঃ দরিদ্র পরিবারের মোট আয় কম। তাতে সংসার চলে না। তাই যেমন করে হোক পরিবারে আয় বৃদ্ধি করতেই হবে। পরিবারে যদি অল্প লোক থাকে তবে সবার অল্পস্বল্প আয় যোগ করেও প্রয়োজন মেটানো যায় না। তাই পরিবারের লোকসংখ্যা বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনেক লোক হলে উঞ্ছবৃত্তি করেও আয় বাড়ানো যেতে পারে। এই জন্যই বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিক থেকে দারিদ্র্যেরই ফল। অন্য একটা দিক থেকেও এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। দারিদ্র্যের জন্য মৃত্যুহার সাধারণত বেশি হয়। কারণ দরিদ্র লোকের সাধারণ অপুষ্টি তো আছেই, তার উপর রোগের সুচিকিৎসা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় বংশরক্ষার জন্য ও বিভিন্ন কাজে পরিবারের কর্তাকে সাহায্য করার জন্য (অর্থাৎ অতিরিক্ত শ্রমশক্তি সৃষ্টি করতে) পরিবারের লোকসংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। অনেক সন্তান-সন্ততির জন্ম হলে তাদের মধ্যে কিছু যদি মরেও যায় তবুও যে কয়টি বেঁচে থাকবে তাদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ মনোভাবই হল সন্তান সংখ্যা বাড়িয়ে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা (safety in number)। তাই ভারতে জনসংখ্যা একদিকে যেমন দারিদ্র্যের কারণ অন্যদিকে তেমনি দারিদ্র্যের ফলও বটে।

৪ জনসংখ্যার উপর অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলাফল ঃ জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হার যেমন দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনই অর্থনীতিক উন্নয়ন- প্রচেষ্টাও জনসংখ্যাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

(ক) অনুন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নতির অন্যতম ফল তার জনসমষ্টির বৃদ্ধি। তবে এ বৃদ্ধির হার উন্নতির সব অবস্থায় একই রকম হয় না। উন্নতির প্রথম অবস্থায় অনুন্নত দেশগুলিতে যখন স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থা গৃহীত হতে থাকে, তখন মৃত্যুহার দ্রুত কমে গিয়ে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ে। পরবর্তীকালে যখন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হয়, জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়ে, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সামগ্রিক উন্নতি ঘটে, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে। পরে এমনও দেখা যায় যে, জনসমষ্টি স্থিতিশীল হয়ে পড়েছে অথবা কমে যাচ্ছে। অত্যন্ত অগ্রসর এবং জীবনযাত্রার উন্নতমানবিশিষ্ট কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশে এরূপ জনসমষ্টির হ্রাস গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং ভারতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তা অবিলম্বে কমার সম্ভাবনা কম। পরে অবশ্য জাতীয় অর্থনীতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলে তা সম্ভব হতে পারে।

(খ) অর্থনীতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় ফল জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে জনসমষ্টির পুনর্বণ্টন। অনুন্নত দেশগুলির জনসাধারণের অধিকাংশই কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের জীবিকার উপর নির্ভর করে। অর্থনীতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকাসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐগুলিতে ক্রমশ জনসমষ্টির ক্রমবর্ধমান অংশ নিযুক্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মে নিযুক্ত জনসমষ্টির অনুপাত কম। তখন যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প লোক অধিক পরিমাণ কৃষিসম্পদ উৎপাদনে সক্ষম হয়। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি ক্রমেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকাগুলিতে নিযুক্ত হয়। অর্থনীতিক উন্নয়নের দরুন এভাবে দেশের বিভিন্ন জীবিকানির্বাহের উপায়গুলির মধ্যে জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন ঘটে। ভারতেও ১৯৮১ সালের লোকগণনার হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত কমেছে ও কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত বেড়েছে।

(গ) অর্থনীতিক উন্নয়নের দরুন জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে। জীবনযাত্রার মানোন্নতির ফলে উৎকৃষ্টতর খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও শিক্ষা ইত্যাদির সুব্যবস্থার দরুন জনসমষ্টির গুণগত উন্নতি ঘটে।

(ঘ) অর্থনীতক উন্নয়নের ফলে দেশে যতই শিল্প, পরিবহণ ও অন্যান্য কাজকর্মের প্রসার ঘটতে থাকে, ততই গ্রাম থেকে জনসমষ্টি শহরাঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। পুরাতন শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ে, নতুন শহর সৃষ্টি হয়। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ে। গ্রাম ও

শহরাঞ্চলের মধ্যে লোকসংখ্যার পুনর্বণ্টন ঘটে। শুধু তাই নয়, পরিকল্পিতভাবে দেশের জনবিরল অঞ্চলে শিল্প-স্থাপন করে, জনবহুল অঞ্চল থেকে সেখানে জনসমষ্টি আকৃষ্ট করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসমষ্টির সুষম বণ্টনের চেষ্টা করা যায়। ভারতেও দেখা যায়, ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালে শহরবাসীর সংখ্যা বেড়েছে, গ্রামবাসীর সংখ্যা কমেছে।

(৬) অর্থনীতিক উন্নতির ফলে দেশে পরিবহণ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে। এর সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির দরুন ও শিক্ষা প্রসারের ফলে মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত বাড়ে। দেশের মধ্যে শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পায়। এটা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির বিশেষ সহায়ক। ভারতে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার ও যাত্রীসংখ্যার বৃদ্ধি এর প্রমাণ।

৩.৬. ভারতে কি জনাধিক্য ঘটেছে ?
Is India Overpopulated ?

১. ভারতে জনাধিক্য ঘটেছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই 'জনাধিক্য' কথাটির অর্থ জানা প্রয়োজন। জনাধিক্য কথাটির দুটি অর্থ আছে। প্রথমত, ম্যালথাস মতাবলম্বীরা মনে করেন দেশের খাদ্য উৎপাদন যে পরিমাণ জনসমষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম, জনসমষ্টি তার বেশি হলে জনাধিক্য ঘটেছে বুঝতে হবে। সুতরাং জনাধিক্যের প্রধান লক্ষণ হল, দেশে খাদ্য ঘাটতি। এছাড়া জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চ হার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, অনাহার, তীব্র দারিদ্র্য প্রভৃতি জনাধিক্যের অন্যান্য লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব অনুসারে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যা বাড়লেও দেশে জনাধিক্য ঘটেনি বুঝতে হবে। কিন্তু জন-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পেলে জনাধিক্য ঘটেছে বুঝতে হবে।

২. ম্যালথাসের মতে জনাধিক্য একটি চূড়ান্ত অবস্থা। এর দ্বারা দেশের এমন একটি অবস্থার কথা বোঝানো হয় যে অবস্থায় দেশ তার বর্তমান জনসংখ্যা ধারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা মতবাদ বলে, জনাধিক্য কোনো চূড়ান্ত অবস্থা নয়। আজ যে জনসংখ্যা বেশি বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল নতুন প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারে, নতুন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে এবং শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে, ঐ জনসংখ্যার দ্বারাই হয়তো আরও বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় উৎপাদন করা যেতে পারে। আবার ভবিষ্যতে ঐ জনসংখ্যাই প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলে গণ্য হতে পারে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনাধিক্যের প্রশ্নটিকে শুধু খাদ্যোৎপাদন দ্বারা বিচার না করে দেশের সর্বপ্রকার সম্পদ উৎপাদনের মোট সমষ্টির (অর্থাৎ জাতীয় আয়) দ্বারা বিচার করা হয়। জনাধিক্য ঘটেছে কিনা তা বিচার করার যে মানদণ্ড আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা মেনে নিয়েছেন, সেই মানদণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয় ও জীবন-যাত্রার মান বাড়ছে কিনা সেটাই বিচার করা হয়।

৩. এ থেকে বোঝা যায়, কোনো দেশে জনাধিক্য ঘটেছে কিনা তা দেশের আয়তন কিংবা শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। এই মানদণ্ডের বিচারে ইংল্যান্ড কিংবা হল্যান্ড বহুপূর্বেই জনাধিক্যের দেশ বলে গণ্য হত। এ কথা মনে রেখে ভারতের জনাধিক্য সংক্রান্ত সমস্যার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৪ ম্যালথাসের অনুগামীদের মতে, ভারতের জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চহার, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, দেশে খাদ্যের ক্রমাগত ঘাটতি, বন্যা, খরা, মহামারি, অনাহার, শিশুমৃত্যু প্রভৃতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলির প্রকোপ, তীব্র ও ব্যাপক দারিদ্র্য, খাদ্যে পুষ্টির অভাব, স্বল্পায়ু, অকালমৃত্যু এবং ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা—এই সকল লক্ষণকে সুনিশ্চিতভাবে ভারতের চূড়ান্ত জনাধিক্যের প্রমাণ বলে গণ্য করা যায়।

৫. অপরপক্ষে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের অনুগামীরা মনে করেন, ভারতে এখনও জনাধিক্য ঘটেনি। কারণ ভারতে জনবসতির ঘনত্ব পৃথিবীর অনেক দেশ, এমন কি ইউরোপের অনেক দেশ অপেক্ষা কম। তা ছাড়া, ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় যেমন ক্রমাগত বাড়ছে তেমনি দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যও রয়েছে। ঐ তত্ত্বের অনুগামীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, দারিদ্র্য, স্বল্পায়ু, অকালমৃত্যু, বেকার সমস্যা, মহামারী, বন্যা, খরা প্রভৃতির জন্য জনাধিক্য দায়ী নয়, দায়ী কৃষি ও শিল্পের অর্থাৎ সমগ্র অর্থনীতির উন্নয়নের ব্যর্থতা এবং আয় বণ্টনে বৈষম্য। সুতরাং দেশে জনাধিক্য ঘটেছে, এ কথার গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই।

৬. পরস্পরবিরোধী এই দুই মতবাদের পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ম্যালথাস বর্ণিত অর্থে ভারতে চূড়ান্তভাবে জনাধিক্য ঘটেছে, এ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত বলে কোনোমতেই গ্রহণ করা যায় না।

অন্যদিকে, ভারতে জনাধিক্য ঘটেনি—কাম্য জনসংখ্যা-বাদীদের এই মতও অনেকে স্বীকার করেন না। কারণ, জনাধিক্যের চাপ ও তার লক্ষণসমূহ ভারতে খুবই প্রকট। এ প্রসঙ্গে আপেক্ষিক জনাধিক্য ও চূড়ান্ত জনাধিক্যের মধ্যে

পার্থক্য করা হয়। এমন উক্তি করা অসঙ্গত নয় যে, এ পার্থক্যের ভিত্তিতে বিচার করলে ভারতে চূড়ান্ত জনাধিক্য ঘটেনি। তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারত স্পষ্টতই 'আপেক্ষিক জনাধিক্যের' স্তরে উপনীত হয়েছে।

জনাধিক্যের সমস্যার বিচারে অনেকে 'জনাধিক্যের অবস্থা' এবং 'জনাধিক্যের প্রবণতা', এ দুটি বিষয়ের পার্থক্যের উপর জোর দেন। তাঁদের মতে ভারত এখনও জনাধিক্যের অবস্থায় পৌঁছায়নি বটে তবে জনাধিক্যের প্রবণতা এদেশে সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় এবং ব্যাপকভাবে অব্যবহৃত সম্পদ আহরণ করে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় এই জনাধিক্যের প্রবণতা ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

৭. ড. জ্ঞানচাঁদ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে শুধুমাত্র দেশের সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা দ্বারা বিচার করলেই চলবে না। তাঁদের স্পষ্ট মত হল, ভারতে এ পর্যন্ত জনসংখ্যা সমস্যার যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে দেশের অর্থনীতিক কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ এক কথায় ভারতের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে এবং এই কাঠামোর মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত নন। তাঁরা বলেন, বর্তমান অর্থনীতিক কাঠামো জনসমষ্টির দারিদ্র্য দূর করতে অক্ষম। সুতরাং এ কাঠামো বর্তমান থাকলে ভবিষ্যতে বর্ধিত জনসমষ্টির অর্থনীতিক উন্নয়নের আশা করা বৃথা।

প্রকৃতপক্ষে দেশের অর্থনীতিক সম্পদ, অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের পটভূমিকায় জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধির সমস্যা বিচার করা উচিত। এ ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, একমাত্র **সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। এবং একমাত্র সেই কাঠামোর মধ্যেই সমাজের অব্যবহৃত সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার ও জনাধিক্যের সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।**

ভারতের জনাধিক্যের সমস্যার সমাধান হিসাবে যাঁরা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে চান, তাঁদের একথা মনে রাখা উচিত যে, একমাত্র দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা হিসাবেই তা কার্যকর হতে পারে। সুতরাং, স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে তার বিশেষ কোন উপযোগিতা নেই। এ কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে, ভারতের সমস্যাটি আসলে স্বল্পোৎপাদনের (অর্থাৎ উন্নয়নের), জনাধিক্যের নয়। এর সমাধান রয়েছে অর্থনীতিক ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ও আমূল পরিবর্তনের মধ্যে। শুধু জন্মহার সীমিত করা এর সমাধান নয়। তা যদি হত, তবে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশগুলিতে কখনই দারিদ্র্য দেখা দিত না।

৩.৭. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ও পরিবার পরিকল্পনা National Population Policy and Family Planning

১ ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় জমি এবং পুঁজিদ্রব্য অপ্রচুর। এ অবস্থায় জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করতে হলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। সুতরাং পরিকল্পনাকালে জন্মহার হ্রাসের ব্যবস্থা করা পরিকল্পনার একটি অন্যতম শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ভারত সরকার জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, এবং একে কার্যকর করার জন্য প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জন্মহার হ্রাসের জন্য পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচি প্রচলন করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মতো পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য জনমত গঠন, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য ব্যাপক প্রচার, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ ও উপদেশ দানের জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রস্থাপন, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সুলভে বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে বিতরণ এবং মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়ানো ও নির্ভরযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিপুল ব্যয় সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত সফল হয়নি।

২. ভারত সরকার পরিবার পরিকল্পনাকে যে অর্থে গ্রহণ করে কাজে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন (অর্থাৎ শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিবারের আয়তনকে সীমাবদ্ধ করা), তাতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয় বলেই ডঃ জ্ঞানচাঁদ প্রমুখ অনেকে মনে করেন। ডঃ জ্ঞানচাঁদ কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। তবে তিনি পরিবার পরিকল্পনা অপেক্ষা সামাজিক এবং অর্থনীতিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ভারতের এই

সমস্যা নিছক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নয়, সমস্যাটি আসলে জন্মহারের তুলনায় উন্নয়ন হারের স্বল্পতার। সুতরাং উন্নয়ন হার বৃদ্ধির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

৩ 'জনসংখ্যা পরিকল্পনা' বলতে শুধু জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনাই বোঝায় না। এসব ছাড়াও অর্থনীতিক উন্নয়নের পটভূমিকায় জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষার উন্নতি, জনবসতির সুষম আঞ্চলিক বণ্টন, জীবিকার সংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যূনতম জীবনযাত্রার ব্যবস্থা, মানবিক শক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ ইত্যাদি অনেক কিছুই বোঝায়।

৩.৮. জন-সমস্যার সমাধান
Problem of Over Population : The Way Out

১ ভারতে জনসমষ্টির সমস্যা বা 'জনাধিক্যের' সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্মশাসন, কৃষির ফলন বৃদ্ধি ও অবিবেচনাপ্রসূত মাতৃত্ব হ্রাসের পরামর্শ দিয়েছেন। ডঃ জ্ঞানচাঁদের মত কেউ কেউ সমাজ কাঠামোর মৌলিক রূপান্তরের মধ্যে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্য দিয়ে বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্বারা এর সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ শিক্ষার প্রসার এবং জনসমষ্টির উৎকর্ষ বৃদ্ধির অর্থাৎ গুণগত নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। এই পরামর্শগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

২. জনসমষ্টির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ : ভারতে কয়েক দশক ধরে যে হারে জনসমষ্টি বাড়ছে তাতে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। স্বভাবতই এর ফলে জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয়, পরিধেয়, আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতিক উন্নয়নের গতিবেগ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এ কারণে ভারত সরকার, পরিকল্পনা কমিশন এবং দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ সকলেই অবিলম্বে জনসমষ্টির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এজন্য পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা অবিবেচনাপ্রসূত মাতৃত্ব রোধ করে, জনসমষ্টির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতেও এজন্য ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে। এর ফলে অবিবেচনাপ্রসূত মাতৃত্ব হ্রাস পেলে যেমন প্রসূতির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে, তেমনি জন্মহারের বৃদ্ধির প্রবণতাও কিছুটা কমানো সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধার কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, ভারতের মত বিপুল জনসমষ্টির দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে, যেখানে অধিকাংশ দেশবাসীই অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং দরিদ্র, সেখানে এ ব্যবস্থার দ্বারা শীঘ্র ফল পাওয়ার আশা কঠিন। দ্বিতীয়ত, শুধু জনসমষ্টির পরিমাণ হ্রাস করলেই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। কারণ, ভারতের জনসংখ্যা যদি কমও হত, তাতে যে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হত, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাহলে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জনবিরল দেশগুলির স্বল্পোন্নত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। জনসমষ্টির সমস্যা শুধু পরিমাণগত সমস্যাই নয়, এই সমস্যার অন্যান্য দিকও আছে। অতএব, একমাত্র পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণই ভারতের জনসমস্যার সমাধান হতে পারে না।

৩. দ্রুতগতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন : জন-সমস্যার মৌলিক সমাধান হবে দ্রুতগতিতে ও উচ্চহারে অর্থনীতির উন্নয়ন। একথা ঠিক যে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি ; কিন্তু এটাও ঠিক যে, এই দেশের উন্নয়নের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাও বেশি। উপরন্তু, সকলেই স্বীকার করেন, ভারতের উন্নয়নের হার আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইউরোপ ও আমেরিকায় অর্থনীতির উন্নয়নের হার বৃদ্ধির দ্বারা জনসমষ্টির দারিদ্র্যের সমাধান করা হয়েছে। ঐ সকল দেশ প্রথমে জনসমষ্টির বৃদ্ধির হার হ্রাস করার জন্য অপেক্ষা করেনি। তা ছাড়া, সে সব দেশের অভিজ্ঞতা হল, অর্থনীতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করতে পারলে জীবনযাত্রার মানেরও সাথে সাথে উন্নতি হয়। আবার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হতে থাকলে জন্মহারও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। অতএব, ভারতে আমাদের আরও উচ্চতর হারে অর্থনীতিক উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে।

৪ জাতীয় আয়ের অধিকতর সমবণ্টন : সেলিগম্যান অনেক আগেই বলেছেন, জনসমস্যার প্রশ্নের সাথে শুধু উৎপাদন নয়, বণ্টনের বিষয়ও খুব বেশি রকমে জড়িত রয়েছে। সকলেই জানেন, দেশের উন্নয়ন-হার বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও কৃষকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা দরকার। তাদের মধ্যে তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে না পারলে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিক-কৃষকও যাতে বর্ধিত জাতীয় আয়ের বেশি অংশ ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এতে উৎপাদনের কাজে এঁরা উৎসাহ নিয়ে যোগ দেবেন। আর এঁদের আয় বাড়লে জীবযাত্রার মানও উঁচু হবে, ফলে জন্মহার হ্রাসের প্রবণতাও দেখা দেবে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই এটা সম্ভব।

৫. বিভিন্ন অঞ্চলে জনসমষ্টির পুনর্বণ্টন : ভারতের জনসমস্যার আরও কয়েকটি দিকের উল্লেখ করতে হয়। যেমন, (ক) এই দেশের কয়েকটিমাত্র অঞ্চলে বা শহরে জনবসতির ঘনত্ব অত্যধিক। (খ) ঐ সব অঞ্চলে বা শহরে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী বস্তি ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে। (গ) কর্মহীন ব্যক্তিরা কর্মের সন্ধানে এই সব অঞ্চলে বা শহরেই ক্রমাগত ভিড় করছে। এই সব সমস্যার স্বল্পকালীন সমাধান সম্ভব নয়। দীর্ঘকালীন সমাধান হিসাবে জন-স্থানান্তর নীতি গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। জন-স্থানান্তর নীতির মূল কথা হল, অপেক্ষাকৃত ঘন বসতির অঞ্চলে থেকে বিরল বসতির অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে জনসাধারণকে স্থানান্তর করা।

৬. জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণ : জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণ বলতে মানবিক শক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি বোঝায়। শিক্ষার বিস্তার, কারিগরী দক্ষতার উন্নতি, স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির বৃদ্ধি, শৃংখলাজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতির দ্বারা জনসমষ্টির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এটা বাদ দিয়ে শুধু জন্মহার বৃদ্ধি রোধ করলেই জনসমস্যা দূর হয় না। সুতরাং জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অর্থনীতিক উন্নয়নের হার বাড়ানো সম্ভব হবে।

৭ জনসমষ্টি সম্পর্কিত সামগ্রিক নীতি : ভারতে আজ যা যা দরকার তা হল জনসমস্যার সব কটি দিক বিচার করে একটা সামগ্রিক সরকারী নীতি কার্যকর করা। মনে রাখা দরকার, জনসমস্যার একটি বিশেষ দিকের উপর জোর দিলে চলবে না। সবদিক থেকে সমস্যাটিকে আক্রমণ করার জন্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন নীতি গ্রহণ করতে পারলে তবেই এর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব।

৩.৯. পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি
Family Welfare Programme

১ সরকারী কর্মসূচি রূপে ১৯৫২ সালে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমানোর উদ্দেশ্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সামান্যভাবে এই প্রচেষ্টার কাজ চলে, বেশির ভাগ গুরুত্ব দেওয়া হয় কিভাবে পরিবার পরিকল্পনায় জনসাধারণকে আগ্রহী করা যায়, কোন্ উপায়টি বেশি কার্যকর প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার উপর। ১৯৬১ সালে লোকগণনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের উর্ধ্বগতি ধরা পড়লে তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কর্মসূচি পুনর্গঠিত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার, জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হতে থাকে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মসূচিটিকে অন্যতম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পঞ্চম পরিকল্পনায় এই কর্মসূচির সাথে কল্যাণমূলক সেবার কর্মসূচি একত্রিত হয়ে নতুন নতুন নামকরণ হয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি। এতে জন্মনিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্ন ও পুষ্টি বিষয়ে কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার কর্মসূচিটিকে অন্যতম অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং ১৯৯৬ সালের মধ্যে পুনরুৎপাদন হার (net reproduction rate) ১-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

৩ ১০. জনসংখ্যার গুণগত মান
The Quality of Population

১. কোন দেশের জনসংখ্যার গুণগত মাপকাঠি হল তার : (ক) মানুষের গড় আয়ু; • (খ) সাক্ষরতার স্তর; এবং (গ) কারিগরী শিক্ষার মান।

২. দেশে এখন মানুষের গড়পড়তা আয়ু ১৯৫১ সালে ৩২ বৎসর থেকে বেড়ে ১৯৮১ সালে ৫৩ বৎসর হয়েছে। নারী এবং পুরুষ উভয়ের গড় আয়ু বেড়েছে। শিশু-মৃত্যুর হার কমেছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি এবং জীবন প্রদায়ী আধুনিক ওষুধের সহজলভ্যতা এটা সম্ভব করে তুলেছে।

৩ ভারতে এখন গড়পড়তা সাক্ষরতার হার হল ৩৪ শতাংশ, পুরুষ—৪৫ শতাংশ ও নারী—২২ শতাংশ। শহরাঞ্চলের সাক্ষরতার হার ৬০ শতাংশ, কিন্তু গ্রামে ২৭ শতাংশ। সুতরাং দেশের ৬৬ শতাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর। উন্নত দেশগুলির সাক্ষরতা স্তরের সাথে তুলনায় বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীর অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে বটে, কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়াছুট ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা হল হাজার প্রতি ১৩ ও ১৬। সাধারণ কারিগরী শিক্ষার প্রসারও সীমাবদ্ধ হয়েই রয়েছে।

৪ কিন্তু সবটা মিলিয়ে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতোই ভারতের জনসংখ্যার গুণগত মান এখনও স্বল্পোন্নত বিকাশমান দেশগুলির স্তর অতিক্রম করতে পারেনি।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১ "জনসংখ্যার বৃদ্ধিটা হল দারিদ্র্যের কারণ ও ফল।" ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

["An increase in population is both a cause and an effect of poverty." Examine this statement in the context of the Indian economy.]

২. ভারতের জনসমস্যা সমাধানের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ?

[What measures should be adopted to solve the problem of population in India ?]

৩. ভারতে জীবিকার বর্তমান ধাঁচটিই ভারতের অর্থনীতিক অনগ্রসরতার পরিচায়ক, এই মতটি আলোচনা কর।

[Discuss the view that the present occupational distribution in India is indicative of her economic backwardness.]

[B.U. B A. III ('78 '79 Syll.) '83]

৪ জনসংখ্যাবৃদ্ধির উচ্চহার অর্থনীতিক উন্নয়নে কি ভাবে বাধার সৃষ্টি করতে পারে ? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[How far is a high rate of population growth an obstacle to economic development ? Give reasons for your answer.]

[B.U. B.A. II ('80 '81 Syll.) 1983]

৫ ১৯৫১ সালের পর ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির উচ্চহারের কারণগুলি আলোচনা কর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমায়িত করতে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা কি ?

[Discuss the factors responsible for the high growth rate of India's population since 1951. What has been the role of family planning programmes in controlling population growth ?]

[B.U. B A. II ('78-'79 Syll.) 1983]

৬. জনসংখ্যার বৃদ্ধির উপর অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রভাব আলোচনা কর।

[Discuss the effects of economic development on population growth.]

[B.U. B.A. II ('80-'81 Syll.) 1982]

৭ ভারতের 'জনসংখ্যার সমস্যা' সম্পর্কে তোমার মতামত বল।

[Comment on the 'population problem' in India.]

[B.U. B.A. III ('80-'81 Syll.) 1982]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১ ১৯৭১-৮১-এর দশ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কি ছিল ?

[What was the rate of growth of population in India during 1971-81 ?]

২ ভারতের জনসমষ্টির বণ্টন গ্রাম ও শহরে কি অনুপাতে ঘটেছে ?

[How is the population of India distributed as between the rural and the urban areas ?]

৩ ভারতের মোট জনসমষ্টির শতকরা কতজন অর্থোপার্জনকারী কর্মে নিযুক্ত ?

[What per cent of the total population of India is engaged in income-earning activities ?]

৪. ভারতের শ্রমশক্তির কত শতাংশ (ক) প্রাথমিক পর্যায়ের কাজে, (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে, এবং (গ) তৃতীয় পর্যায়ের কাজে নিযুক্ত ?

[What per cent of India's working force is engaged in the economic activities of (a) the primary sector, (b) the secondary sector and (c) the tertiary sector ?]

৫. 'জনাধিক্যের প্রবণতা' বলতে কি বোঝায় ?

[What is meant by 'tendency towards overpopulation' ?]

৬. 'জনাধিক্যের অবস্থা' বলতে কি বোঝায় ?

[What does 'state of overpopulation' mean ?]

৭. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ: জনবিস্ফোরণ উন্নয়নের বাধা।

[Write a note on : Population explosion as an obstacle to growth.]

[B.U. B.A. III ('79-'80 Syll.) 1982]

৪

পুঁজি গঠন

Capital Formation

'পুঁজি গঠন' বলতে কি বোঝায় / পুঁজি গঠনের গুরুত্ব এবং প্রক্রিয়া / ভারতে পুঁজি গঠনের হারের হিসাব / ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের চড়া হার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বল্প হারের স্ববিরোধিতা / মানবিক পুঁজি / ভারতে মানবিক পুঁজি গঠন / স্বল্পোন্নত দেশ এবং বিদেশী পুঁজি ও সাহায্য / বিদেশী পুঁজির বিবিধ রূপ / ভারতে বিদেশী বেসরকারী পুঁজির বিনিয়োগ / বহুজাতিক করপোরেশন : অধীন ও শাখা কোম্পানিসমূহ / ভারতের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজি ও কারিগরী সহযোগিতার ফলাফল / বিদেশী পুঁজি ও কারিগরী সহযোগিতা সম্পর্কে সরকারী নীতি / ভারতে বিদেশী ঋণ-সাহায্য / ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে বিদেশী ঋণ-সাহায্যের ফলাফল / বিদেশী সাহায্যের সমস্যা / বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত / ভারত ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার থেকে ঋণ / আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

৪.১. 'পুঁজি গঠন' বলতে কি বোঝায়

Meaning of Capital Formation

১ 'পুঁজি' শব্দটি অর্থবিদ্যায় সচরাচর 'দ্রব্যপুঁজি' অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কলকারখানা প্রভৃতি যে সব জিনিসের দ্বারা উৎপাদন প্রচেষ্টার কার্যকারিতা বাড়ানো যায় সেসব জিনিসকে বোঝায়। অর্থাৎ পুঁজি হল প্রকৃত ভৌত সম্পত্তির (real physical assets) সমষ্টি বা ভাণ্ডার (stock)। এই অর্থে পুঁজি শব্দটি অর্থবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়।

২ 'পুঁজি গঠন' কথাটির দ্বারা এমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় যার দ্বারা সমাজের বর্তমানে লভ্য উপকরণগুলির একটি অংশ দ্রব্যপুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং যার ফলে ভবিষ্যতে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে।

৩. অর্থবিদ্যায় 'পুঁজি' এবং 'পুঁজি গঠন' শব্দটির উপরোক্ত অর্থ ও ধারণা দুটি অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ বলে অনেক আধুনিক অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন। কারণ এতে মানুষের বা মানবিক উপকরণের মধ্যে বিনিয়োগের বিষয়টি (investment in man) বিবেচনা করা হয়নি। পুঁজির মৌল চরিত্র হল সমাজের সম্ভাব্য-উৎপাদন ক্ষমতার প্রসারে সহায়তা করা। তা যদি সত্য হয়, তাহলে পুঁজি গঠন বলতে কেবল স্থির পুঁজি সৃষ্টি নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা এবং খেলাধুলা ও বিনোদন প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যয়ের দ্বারা মানুষ নানারূপ দক্ষতা আয়ত্ত করে এবং যা শেষ পর্যন্ত তার অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে সে সব ব্যয়কেও বিনিয়োগ ব্যয় তথা মানবিক পুঁজি গঠনের ব্যয় বলে গণ্য করা উচিত এবং তা সমাজের সামগ্রিক পুঁজি গঠন প্রক্রিয়ার ও বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা উচিত।

৪. অতএব ভৌত পুঁজি (physical capital) অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদি ও মানবিক পুঁজি (human capital) অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, স্বাস্থ্যবান ও দক্ষ মানবিক শক্তি—এই দুটি হল সামগ্রিক পুঁজির দুটি অঙ্গ (components); এরা দু'য়ে মিলেই সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুঁজি এবং পুঁজি গঠন বলতে সাধারণত ভৌত পুঁজি এবং ভৌত পুঁজি গঠনকেই ধরা হয়ে থাকে। এই অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন।

৪.২ পুঁজি গঠনের গুরুত্ব এবং প্রক্রিয়া
Capital Formation : Stages and Importance

১ যে কোনো দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এবং দেশের অর্থনীতির আরও বিকাশ নির্ভর করে তার ভৌত পূঁজির মজুত পরিমাণ (stock of physical capital), মানবিক পূঁজির পরিমাণ ও গুণমান এবং পূঁজির পরিমাণ বার্ষিক কি হারে বাড়ছে তার উপর। তবে, এখন পর্যন্ত পূঁজি বলতে সাধারণত ভৌত পূঁজিকেই ধরা হয় বলে পূঁজির বার্ষিক পরিমাণ বৃদ্ধির হার বলতে ভৌত পূঁজির বার্ষিক বৃদ্ধির হারটাকেই বোঝান হয়। ভৌত পূঁজির বার্ষিক বৃদ্ধির হারই হল পূঁজি গঠনের হার।

২. সাধারণত পূঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনীতিক বিকাশের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। এবং এটাও দেখা গেছে, পূঁজি গঠনের হার বেশি হলে অর্থনীতিক বিকাশের হারও দ্রুত এবং বেশি হয়। তবে, একথাও সত্য, পূঁজি অর্থনীতিক অগ্রগতির একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও কেবল সেটাই অর্থনীতিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৩. তবে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে স্বল্পতর পরিমাণ পূঁজির দরুন উৎপাদনের মোট পরিমাণ, উৎপন্নসামগ্রীর বৈচিত্র্য, উৎপাদনশীলতা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সবই অত্যন্ত অল্প। ফলে এসব দেশে দারিদ্র্যও ব্যাপক এবং গভীর। স্বল্পোন্নত দেশে পূঁজির পরিমাণ বাড়লে অন্যান্য শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পগুলি স্থাপন করা সম্ভব হয়। ব্যয়বহুল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। দীর্ঘকালীন সময়ে তা উৎপাদন খরচ কমায় ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। পূঁজিদ্রব্য শিল্প স্থাপিত হলে তা নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি ঘটাতে উৎসাহিত করে। শিল্পের উৎপাদন ও বৈচিত্র্য বাড়লে তা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

অতএব সামগ্রিক ফল হিসাবে পূঁজি গঠনের হার বৃদ্ধির দরুন স্বল্পোন্নত অর্থনীতির মূল সমস্যা (অর্থাৎ স্বল্প উৎপাদনশীলতা) দূর হয়। সুতরাং ভারতসহ সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক সমস্যার মূল সমাধান হল পূঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি।

৪. পূঁজি গঠন প্রক্রিয়াটির অপরিহার্য উপাদান হল তিনটি ঃ

(ক) ভোগ হ্রাসের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ প্রকৃত সঞ্চয় বৃদ্ধি ;

(খ) দেশবাসীর আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণদানের জন্য দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ;

(গ) উৎপাদনশীল বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশীয় বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অবস্থিতি কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা গ্রহণ।

৫ পূঁজি গঠন (অর্থাৎ বিনিয়োগের) হার বাড়াতে হলে চাই প্রকৃত সঞ্চয়ের হার (rate of real savings) বৃদ্ধি। স্বল্পোন্নত দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার কম হলে বিদেশী ঋণের ও পূঁজির সাহায্য নিয়ে বিনিয়োগের হার বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ছাড়াও বিদেশী ঋণ ও পূঁজির সাহায্য নিয়ে বিনিয়োগের হার বাড়ানোর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪.৩ ভারতে পুঁজি গঠনের হারের হিসাব
Estimate of the Rate of Capital Formation in India

ভারতে পূঁজি গঠন হারের বৃদ্ধি হল ভারতীয় অর্থনীতিক পরিকল্পনার একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

প্রথম পরিকল্পনার ঠিক আগের বৎসর (প্রাক্-পরিকল্পনা কাল) নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (NDP) শতাংশ রূপে পূঁজি গঠনের হার ছিল ৫'৫। তা ক্রমশঃ বেড়ে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ১৯৭৮-৭৯ সালে (চলতি মূল্যস্তরে) ১৯'৬ শতাংশে পৌঁছায়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে তা কমে ১৭'৬ শতাংশে ও সপ্তম পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে ১৯৮৬-৮৭ সালে ১৪ ৬ শতাংশে নামে।

ভারতে পূঁজি গঠন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। নীট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ১৯50-৫১ সালে ছিল ৫'৫ শতাংশ। তা ক্রমশঃ বেড়ে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ২০'১ শতাংশে ওঠে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে তা খানিকটা কমে ১৬'১ শতাংশে ও সপ্তম পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর ১৯৮৬-৮৭ সালে ১২'৭ শতাংশে নেমে আসে। এখানে আরেকটি উল্লেখনীয় বিষয় হ'ল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, বিধিবদ্ধ বেসরকারী ক্ষেত্র ও পারিবারিক ক্ষেত্র, – এই তিনটি ক্ষেত্রেই সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে। এর মধ্যে পারিবারিক ক্ষেত্রের অবদান সর্বাধিক। মোট সঞ্চয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এই ক্ষেত্রটি থেকে আসছে।

৪.৪. ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের চড়া হার ও অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বল্প হারের স্ববিরোধিতা
High rates of Savings & Investment and Low Growth Rate : An Indian Paradox

১. অর্থনীতিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের অভিমতের ভিত্তিতে

এক সময়ে এদেশে মনে করা হত (এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে একথা বারংবার বলা হয়েছে), মোট জাতীয় উৎপন্নের (GNP) বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫০/৫'৬ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় উৎপন্নের বার্ষিক বৃদ্ধির ৩'৫ শতাংশ সুনিশ্চিত করতে হলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার ২০-২২ শতাংশ হওয়া দরকার। অন্যদিকে, দেখা গেছে পৃথিবীর স্বল্প আয়ের দেশগুলির সঞ্চয়ের হার হল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের GDP) ৮ শতাংশ, মাঝারি আয়ের দেশগুলির সঞ্চয় হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের ২০ শতাংশ এবং শিল্পোন্নত বেশি আয়ের দেশগুলির সঞ্চয় হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের ২৪ শতাংশ। এদিকে ভারতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অনুযায়ী সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার গত তিন দশক ধরেই ক্রমশ বেড়েছে এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে সঞ্চয়ের মোট হার হয়েছিল বাজার দামে মোট জাতীয় উৎপন্নের ২৪'৪ শতাংশ এবং নীট সঞ্চয়ের হার ছিল নীট জাতীয় উৎপন্নের ১৯'৭ শতাংশ। ওই বৎসর মোট বিনিয়োগের হার ছিল বাজার দামে মোট জাতীয় উৎপন্নের ২৪'৬ শতাংশ এবং নীট বিনিয়োগের হার ছিল নীট জাতীয় উৎপন্নের ১৯ ৮ শতাংশ।

২. ভারতের বর্তমান চড়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হারকে অনেকটাই একটা 'নাটকীয় উন্নতি' বলে মনে করছেন। বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, মাথাপিছু স্বল্প আয় সত্ত্বেও ভারত উঁচু সঞ্চয় হার আয়ত্ত করতে পেরেছে। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের বর্তমান সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার পৃথিবীর মাঝারি আয়ের দেশগুলির সমান তো বটেই, এমনকি বেশি আয়ের অনেক দেশের সমান হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরমাশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও ভারতে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় তথা জাতীয় উৎপন্নের বার্ষিক বৃদ্ধির হার কিন্তু স্বল্পই থেকে যাচ্ছে। পরিকল্পনার প্রথম দশকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৩'৮ শতাংশ। দ্বিতীয় দশকে তা নেমে ৩ ০ শতাংশ হয়। তৃতীয় দশকে তা আবার যৎসামান্য বেড়ে ৩ ৩ শতাংশ হয়। ভারতের অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও অর্থনীতির বার্ষিক উন্নয়ন হার স্বল্প থেকে যাচ্ছে কেন? এই স্ববিরোধিতার কারণ কি?

৩ এই স্ববিরোধিতার কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (ক দামস্ফীতির ফলে বিনিয়োগ দ্রব্যগুলির অত্যন্ত চড়া দামের দরুন বিনিয়োগের আর্থিক খরচ অর্থাৎ আর্থিক বিনিয়োগ যতটা বেড়েছে, প্রকৃত বিনিয়োগ সে তুলনায় অনেক কম বেড়েছে।

(খ) দেশের মধ্যে আয় বণ্টনে প্রবল বৈষম্যের দরুন, উঁচু আয়ের শ্রেণীগুলির জন্য এমন সব ভোগ্যপণ্য শিল্পে বিনিয়োগ ঘটছে যেগুলি অত্যন্ত পুঁজি-নিবিড় (capital-intensive) এবং যে জন্য যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম অনেকটাই আমদানি করতে হয়। এদের বাজার সীমাবদ্ধ এবং পুঁজি উৎপন্ন অনুপাতটি অত্যন্ত বেশি ও তা কমানো কঠিন। ফলে এসব শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভাবনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা কম। এটি হল পুঁজির আবণ্টনে বিকৃতি (distortion of allocation of capital resources)। বাজারটি উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিপুল ব্যয়ে যে উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে তার অনেকটাই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে (unutilised capacity)। সুতরাং তা উন্নয়নহার বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে না।

(গ) দ্রব্য বা ভৌত পুঁজির তিনটি অংশের মধ্যে একটি হল অবিক্রীত মজুত সম্ভার (inventories)। বাকি দু হল নির্মিত গৃহাদি (construction) এবং যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম (machinery and equipment)। ভারতে গত দুই দশক ধরে এবং বিশেষত গত এক দশকেরও বেশি কাল ধরে মোট পুঁজির মধ্যে মজুতসম্ভারের অনুপাতটি যথেষ্ট বেশি হতে দেখা যাচ্ছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে তা ২০ ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে ২৪'৭ শতাংশ হয়। ১৯৭৮-৭৯ সালে তা কমে ১৪ শতাংশের মতো হলেও, তা মোটেই অল্প নয়। মজুতসম্ভারের এরকম চড়া অনুপাতের অর্থ হল বাজারে চাহিদার ঘাটতি। বিভিন্ন শিল্পে মজুতসম্ভারের পরিমাণটা বেশি থেকে যাচ্ছে বলে শিল্পগুলি উৎপাদন বাড়াতে সাহস ও উৎসাহ পায় না। ফলে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বাড়ছে না।

(ঘ) আরেকটি গুরুতর কারণ হল, ভারতে কি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, কি বেসরকারী ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শিল্পের ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা রয়েছে। এর ফলেও পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতটি বেড়ে যায়, উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। বিনিয়োগ বেড়ে যায়। অথচ সে অনুপাতে উৎপাদন বাড়ে সামান্যই।

এই সব কারণে দেশে উচ্চতর হারে সঞ্চয়ের প্রায় সবটাই ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ খরচ শুষে নিচ্ছে। ফলে আর্থিক বিনিয়োগ বাড়লেও প্রকৃত বিনিয়োগ বাড়ছে না এবং জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্ন বৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু আয় বা মাথাপিছু জাতীয় উৎপন্ন বৃদ্ধির হার গত তিন দশক ধরে কখনও অতি সামান্য হারে বাড়ছে, কখনও কমছে। কখনও বা স্থির হয়ে থাকছে।

৪.৫. মানবিক পুঁজি
Human Capital

১. মানুষ হল এমন একটি পুঁজিজাতীয় সম্পত্তি (capital asset) যা সারা কর্মজীবন ধরে অর্থনৈতিক উপকার বা সুবিধার প্রবাহ (stream of economic

benefits) সৃষ্টি করে। এই হল মানবিক পুঁজি কথাটির অর্থ। সুতরাং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য খরচকে বিনিয়োগ ব্যয় বলে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ এই সব ব্যয়ের দ্বারা মানুষের গুণমান, কার্যদক্ষতা, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা এবং কর্মজীবনকাল বাড়িয়ে দেয়। এবং তার নীট ফলস্বরূপ বাড়ে উৎপাদনশীলতা এবং সমাজের মোট উৎপাদন।

২ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, হাতিয়ার প্রভৃতি দিন দিনই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে। তা ব্যবহার করার জন্য চাই ক্রমবর্ধমান উন্নত কারিগরী-জ্ঞান, তীক্ষ্মবুদ্ধি ও কুশলতা। সুতরাং পুঁজিদ্রব্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রব্যপুঁজির সার্থক ও সফল ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন মানবিক পুঁজিতেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

৩ স্বল্পোন্নত দেশগুলির দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের অন্যতম বাধা হল দেশবাসীর প্রাচীন, রক্ষণশীল, পরিবর্তনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। এর ফলে উদ্যোগ, সচলতা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সবই ক্ষুণ্ণ হয়। এই মানসিক বাধাগুলি দূর করার কাজে শিক্ষা হল সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার। শিক্ষা মানবিক পুঁজি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪ উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান এবং গবেষণাও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। উন্নত দেশগুলি মানবিক পুঁজিরূপেই এক্ষেত্রে অগ্রগতি আয়ত্ত করছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষেও অর্থনীতির বিকাশ এবং জনসাধারণের জীবনমানের পরিমাণগত ও গুণগত উন্নয়নে এই বিষয়গুলি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৫ স্থির পুঁজির পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক পুঁজির গুণগত মানোন্নয়নের ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা কতটা বাড়তে পারে তার একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক স্ত্রুমিলিন মন্তব্য করেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ৪০ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা ১০০ শতাংশ এবং উচ্চতর শিক্ষার দ্বারা ৩০০ শতাংশ বাড়তে পারে। আর এক সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সেকমস্কি মনে করেন অর্থনীতিক বিকাশের প্রথম পর্বে, বিশেষত কৃষির আধুনিকীকরণে এবং শিল্পায়নের গতিবেগ বৃদ্ধিতে প্রাথমিক শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

৪.৬ ভারতে মানবিক পুঁজি গঠন

Formation of Human Capital in India

১ বাস্তবিক পক্ষে ভারতে একথা বিশেষ করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, পুঁজি বলতে কেবল ভৌত বা স্থির পুঁজি বোঝায় না, মানবিক পুঁজিও তার অন্তর্গত এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের প্রাকৃতিক বা ভৌত উপকরণগুলির উন্নয়ন যেমন দরকার, তেমনি দরকার মানবিক উপকরণেরও উন্নয়ন। অর্থাৎ স্থির পুঁজিতে বিনিয়োগ যেমন অর্থনীতিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, তেমনি মানবিক পুঁজিতে বিনিয়োগটাও সেজন্য অবশ্য প্রয়োজন। এবং সামগ্রিক পুঁজি গঠন প্রক্রিয়াটি যাতে সুষম হয় এবং তার ফলটি যাতে সুনিশ্চিত হয় সেজন্য ভৌত পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়াটির সঙ্গে মানবিক পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়াটিরও সংযোজন এবং সামঞ্জস্য বিধান অত্যাবশ্যক।

২ মানবিক পুঁজি গঠনে বিনিয়োগ ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষার ব্যয় হল সর্বপ্রধান, তাছাড়া রয়েছে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় ও বাসস্থানের বন্দোবস্তের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। আমাদের দেশে এই ব্যয়গুলিকে 'কল্যাণমূলক' বা 'ন্যূনতম জীবনমান সুনিশ্চিত করার' ব্যয় প্রভৃতি রূপে গণ্য করার যে দৃষ্টিভঙ্গী তা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যয়গুলিকে মানবিক পুঁজি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ব্যয় বলে গণ্য করা উচিত এবং তা যদি করা হত তাহলে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবহেলিত থাকতো না এবং তার ফলে স্বল্প উৎপাদনশীলতার ব্যাধিতে এতদিন ধরে আমাদের অর্থনীতিকে রুগ্ন হয়ে থাকতে হত না।

৩ অর্থনীতিক বিকাশের জন্য যে সব উন্নত দেশগুলিকে নানা বিষয়ে আমরা অনুকরণ ও অনুসরণের চেষ্টা করছি, এ বিষয়ে তাদের সাথে আমাদের অবস্থাটা তুলনা করলে সমস্যাটা আরও পরিষ্কার হবে।

জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানিতে ভৌত পুঁজির তুলনায় মানবিক পুঁজি বেড়েছে ৩ ৩ গুণ, ১'৯ গুণ ও ১'৫ গুণ বেশি হারে। কিন্তু ভারতে, ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০ ৬১ সালের মধ্যে এক দশকে ভৌত পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে ৭১ শতাংশ অথচ মানবিক পুঁজি বেড়েছে ১৮ শতাংশ মাত্র![1] ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার জন্য খরচ হত মোট জাতীয় উৎপন্নের (GNP) প্রায় ১২ ও ১৩ শতাংশ। তুলনায় ভারতে শিক্ষার জন্য ব্যয় হত ১৯৫০-৫১ সালে মোট জাতীয় উৎপন্নের ৩'৪ শতাংশ, ১৯৫৯-৬০ সালে ৬ ২ শতাংশ, ১৯৬০-৬১ সালে ৩ ৯ শতাংশ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ৭'৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতে শিক্ষার জন্য ও মানবিক পুঁজিগঠনের জন্য বিনিয়োগ হারের তুলনায় স্থির পুঁজির জন্য বিনিয়োগের হার অনেক বেশি। পরিকল্পনার বিগত তিন দশক ধরেই এটা চলেছে এবং এটাই হল সরকারী নীতি।

---

১. সূত্র. Education and Economic Development, Dr. N. Gounden (1965).

৪.৭. স্বল্পোন্নত দেশ এবং বিদেশী পঁুজি ও সাহায্য Underdeveloped Countries and Foreign Capital and Aid

১. ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশই অর্থনৈতিক বিকাশ চায়। এসব দেশে অর্থনৈতিক বিকাশের যে উপাদানটির বিশেষ অভাব রয়েছে তা হল, ভৌত পুঁজি বা দ্রব্য পুঁজি বা স্থির পুঁজির অর্থাৎ এককথায় পুঁজি গঠনের অভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পায়নের জন্য অত্যাবশ্যক কাঁচামালেরও অভাব। এসব দেশে আশু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হলে চাই যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ, যন্ত্রচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দরকারী কারিগরী জ্ঞান ও অত্যাবশ্যক কাঁচামাল। দেশে এই জিনিসগুলির অভাব থাকায় বিদেশ থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে।

২. বিদেশ থেকে ঐ জিনিসগুলি, অর্থাৎ এককথায় পুঁজিদ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায় দুটি উপায়েঃ

(ক) বিদেশী ভোগ্যপণ্য আমদানি যথাসম্ভব কমিয়ে এবং রপ্তানি সর্বাধিক সম্ভব বাড়িয়ে উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়ে তা বিদেশ থেকে কিনে আনা যায়। অথবা,

(খ) কোনো না কোনো ভাবে বিদেশী পুঁজি দেশে আমন্ত্রণ করে আনা যায় এবং দেশের মধ্যে তা বিনিয়োগের সুবিধা-সুযোগ করে দেওয়া যায়।

প্রথম উপায়টি অবলম্বন করা হলে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির দরুন দেশবাসীর ভোগের পরিমাণ কমবে এবং সেজন্য কষ্ট হবে। সরকারকেও পরিপূর্ণভাবে অর্থনীতিটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটি হল স্বনির্ভরতার পথ। সমাজতন্ত্রী দেশগুলি এই পথেই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটিয়েছে। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলি, ভারতসহ, দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়েছে। তবে, বর্তমানে সব দেশই, কমবেশি পরিমাণে উভয় পন্থাই একযোগে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।

৩. স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা যে সব কারণে দেখা দেয় তা হলঃ

(ক) এসব দেশে জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার অত্যন্ত কম বলে, অর্থনৈতিক বিকাশ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির ঘাটতি, আধুনিক কারিগরী জ্ঞানের অভাব, দেশীয় উদ্যোক্তার অপ্রতুলতা এবং আধুনিক কারবারী ও ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার স্বল্পতা থাকে। বিদেশী পুঁজির দ্বারা এই অভাবগুলি কিছুটা দূর করা সম্ভব হয়।

(খ) এসব দেশে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের ফলে অর্থনীতিতে আধুনিক ক্ষেত্রের (modern sector) উৎপত্তি ঘটে, পুঁজির ও টাকার বাজারটি সংহত ও উন্নত হয়, আয় বৃদ্ধি শুরু হলে সম্ভাব্য সঞ্চয়গুলি বাস্তবে পরিণত হতে থাকে, বাজারের বিস্তার ঘটে, আর্থিক লেনদেন বাড়ে, নতুন নতুন আর্থিক সংস্থা স্থাপিত হতে থাকে এবং সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে, দেশীয় উদ্যোক্তারা আধুনিক শিল্প ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়, আমদানি করা বিদেশী কারিগরী জ্ঞান দেশীয় কর্মীদের শেখানো হলে তা ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং দেশে নতুন নতুন কারিগরী উদ্ভাবন প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং পুঁজি গঠন প্রক্রিয়ার গতিবেগ ক্রমশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায়।

সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সাময়িকভাবে বিদেশী পুঁজি আমদানি অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করতে পারে।

৪. কিন্তু বিদেশী পুঁজি ব্যবহারের তত্ত্বগত সুবিধা যাই হোক না কেন, বাস্তবে কোনো স্বল্পোন্নত দেশেরই বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিশেষ সুখকর নয়। এর প্রায় সবটাই আসে ধনতন্ত্রী দেশগুলি থেকে।

(ক) সাধারণত চড়া মুনাফার শর্ত ছাড়া বেসরকারী পুঁজি কোনো স্বল্পোন্নত দেশে আসতে চায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োজিত মার্কিন পুঁজির মুনাফার হার হল ১০-১২ শতাংশ। কিন্তু ভারতে মার্কিন পুঁজিকে ১৯.২ শতাংশ এবং কানাডীয় পুঁজিকে ৩৩.৩ শতাংশ মুনাফা করতে দিতে হয়েছে। এরা এরকম চড়া হারে মুনাফার জন্য সাধারণত বাগিচা শিল্প, খনিজ শিল্প এবং ভোগ্যপণ্য ও একচেটিয়া ওষুধ শিল্পে বিনিয়োগ করে। এর ফলে দেশের বাগিচা ও খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটেছে। ভোগীরা শোষিত হয়েছে এবং রপ্তানি নির্ভর ও ভারসাম্যহীন শিল্প বিকাশ ঘটেছে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীরা ভারতসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে চড়া হারে মুনাফা করে অন্যত্র তাদের একচেটিয়া কারবারের বিস্তার ঘটিয়েছে।

(খ) বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগে স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পায়নে খানিকটা অগ্রগতি ঘটলেও এবং কর্মসংস্থান খানিক বাড়লেও সেগুলি প্রধানত পুঁজি নির্ভর শিল্প বলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকে। দেশীয় উদ্যোক্তাদের সাথে তারা তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টার অগ্রগতিতে বাধা দেয়, দেশীয় ঋণ, বীমা পরিবহণ ও কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বদেশীয় ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে এবং নিজেদের উন্নত কারিগরী জ্ঞান দেশীয় কর্মীদের দিতে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও বাস্তবে তা পালন করে না।

(গ) যে দেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োজিত হয় তার সাথে কখনও নিজ দেশের স্বার্থের সংঘাত লাগলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সর্বদাই নিজ দেশের ও নিজেদের স্বার্থকেই

অগ্রাধিকার দেবে বলে, যুদ্ধ বা শান্তি কোনো সময়েই বুনিয়াদী ও ভারী শিল্পের জন্য বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করাটা উচিত নয়।

(ঘ) বিদেশী পুঁজি এলে যেমন স্বল্পোন্নত দেশের বিদেশী মুদ্রা বাঁচে তেমনি যখন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের দরুন সুদ ও লভ্যাংশ বিদেশে পাঠাতে হয় তখন প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে বিদেশী মুদ্রা খরচ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বিদেশী পুঁজি আনার দরুন যত টাকার বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল, তার চাইতে অনেক বেশি বিদেশী মুদ্রা বিদেশী পুঁজির সুদ ও লভ্যাংশ দিতে খরচ হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, দেশের আয়ের এই অংশ বাইরে চলে যাওয়ার দরুন দেশে পুঁজি গঠনের হারটি কম হয়।

(ঙ) বিদেশী পুঁজির কবলে পড়লে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগকারী দেশগুলি নিজেদের অর্থনীতিক শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বন্ধনে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে। ফলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়। এটি হল বিদেশী ধনতন্ত্রী পুঁজির নয়া-উপনিবেশবাদী কৌশল।

ইদানীংকালে ভারতে বিদেশী পুঁজির আগমনে কতটা উপকার ঘটেছে সে সম্পর্কে অধ্যাপক বি. আর. শেনয় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, প্রথম পরিকল্পনাকালে আগত বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশই সোনার চোরাই আমদানিতে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের একটি বৃহৎ অংশ প্রধানত খাদ্যশস্যের গোপন মজুদ ধারণ ও অংশত চোরাই সোনার আমদানিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সামান্যই বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারতীয় সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করেছে। এইরূপে, তাঁর মতে, ভারতে আগত বিদেশী পুঁজির অপব্যবহারের দরুন, তা দেশে পুঁজি গঠনের কাজে তেমন সাহায্য করেনি।

বিদেশী পুঁজির আগমনে যেমন বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত নানাবিধ সংকটের সাময়িক সমাধান সহজ হয় তেমনি ঐ পুঁজির নির্গমন এবং তার সুদ ও লভ্যাংশ প্রেরণে বিদেশী মুদ্রা তহবিল নিঃশেষ হতে থাকে। ১৯৪৮-৫৮ সালে মোট ১৫৫ কোটি টাকার বিদেশী পুঁজি ভারতে এসেছিল। অথচ ঐ সময়ে পুঁজি চলে যাওয়া এবং সুদ ও লভ্যাংশ পাঠানো বাবদ ভারতের ৩৭৫ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয়েছে।)

৪৮. বিদেশী পুঁজির বিবিধ রূপ

Different Forms of Foreign Capital

১. চার রকম ভাবে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটতে দেখা যাচ্ছে :

(ক) সরাসরি বিনিয়োগ : বিদেশী উদ্যোক্তা—পুঁজিপতিরা সরাসরি কোনো দেশে (স্বল্পোন্নত বা উন্নত দেশেও) পুঁজি বিনিয়োগ করে। এটা আবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে :

(১) তারা বিদেশে নিজেদের কোম্পানির শাখা স্থাপন করে তার মারফত বিনিয়োগ করে; কিংবা,

(২) নিজেদের কোম্পানির অধীন কোনো কোম্পানি (subsidiary) বিদেশে স্থাপন করে তার মারফত বিনিয়োগ করে; কিংবা,

(৩) বিদেশী কোনো কোম্পানির শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার (ঋণপত্র) কিনে তার মারফত বিনিয়োগ করে। এই ধরনের বিনিয়োগকে বলে 'পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট'।

(খ) বিদেশী সহযোগিতা (foreign collaboration) : বিদেশী সহযোগিতা তিন ধরনের হতে পারে।

(১) বেসরকারী বিদেশী কোম্পানির সাথে দেশীয় বেসরকারী কোম্পানির বিনিয়োগ ও কারিগরী সহযোগিতা সম্পর্কে চুক্তি;

(২) বেসরকারী কোনো বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে দেশের সরকারী সংস্থায় বিনিয়োগ ও কারিগরী সাহায্যের জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি;

(৩) কোনো বিদেশী সরকারের সঙ্গে বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তা সম্পর্কে দেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি।

(গ) দুই দেশের সরকারের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ও সাহায্যের আদান-প্রদান (inter-government loans) : রাজনৈতিক স্বার্থেই হোক কিংবা অর্থনীতিক উদ্দেশ্যেই হোক দুই দেশের সরকারের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও সাহায্যের চুক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিস্তার লাভ করেছে। পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সে সব দেশের সরকারগুলির সাথে মার্কিন সরকারের ঋণ ও সাহায্যদানের চুক্তি থেকে এর সূত্রপাত ঘটে। তারপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির সাথে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের সরকারের সাথেই এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তেমনি আবার ভারতের সঙ্গেও অন্যান্য অনেক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ (loans from international financial institutions) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সংযোগী সংস্থাগুলি ভারত সহ বহু স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে চলেছে।

৪.৯. ভারতে বিদেশী বেসরকারী পুঁজির বিনিয়োগ
Investment of Private Foreign Capital in India

১. **সূত্রপাত ঃ** উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্কিং, রেল পরিবহণ, চটকল ও কয়লা খনিশিল্প, চা, কফি ও রবার বাগিচা শিল্প ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগের দ্বারা স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ পুঁজিই ছিল ভারতে প্রথম বিদেশী পুঁজি। পরবর্তীকালে অন্যান্য বিদেশী বেসরকারী পুঁজি কিছু পরিমাণে ভারতে আকৃষ্ট হয়।

২ **পরিমাণ ঃ** সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও, কারো কারো মতে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯১৪ সালে ভারতে বিনিয়োজিত ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি পাউন্ড। ১৯৩৩ সালে তা ১০০ কোটি পাউন্ডে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৬ কোটি টাকা (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব), তার মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজি ছিল ২৩০ কোটি টাকা। ১৯৫৫ সালে ভারতে বিদেশী পুঁজির মোট পরিমাণ বেড়ে হয় ৪৩৮ কোটি টাকা। ১৯৬৭ সালে দেশে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৮৩ কোটি টাকা। বর্তমানে এর পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকার বেশি হয়েছে।

বিনিয়োগের প্রকৃতি ঃ অতীতে বিদেশী পুঁজি ভারতের রেল পরিবহণ, বাগিচা ও খনিজ শিল্পেই অধিক পরিমাণে বিনিয়োজিত হয়েছিল। অর্থাৎ, এ পুঁজি এমন শিল্পে আকৃষ্ট হত যে শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে নিজেদের দেশে রপ্তানি করা চলত।

১৯৫৫ সালে এদেশে মোট বিনিয়োজিত ৪৩৭'৫ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৬৭ সালে এদেশে বিনিয়োজিত ১,৩৮২'৬৭ কোটি টাকা বিভিন্ন শিল্পে খাটছিল।

১৯৮৫ সালে শাখা রয়েছে এমন সব বিদেশী কোম্পানির ভারতীয় সম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল ৩,৭৫০ কোটি টাকা। ভারতীয়-অধীন কোম্পানির মালিক বিদেশী কোম্পানিগুলি মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২,৬৫০ কোটি টাকা। ভারতীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে সহযোগিতাকারী বিদেশী কোম্পানিগুলির বিনিয়োগের পরিমাণ ওই সময়ে ছিল ১০৭ কোটি টাকা। আর ওই সময়ে অনাবাসী ভারতীয়দের ভারতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

উৎস ঃ বিদেশী পুঁজির উৎস বিচারে দেখা যায়, স্বাধীনতার আগে ব্রিটেনই প্রকৃতপক্ষে বিদেশী পুঁজির একমাত্র উৎস ছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও এখন পর্যন্ত ভারতের বিদেশী পুঁজির মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজিই প্রধান, তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ বাড়ছে। এ ছাড়া আছে পশ্চিম জার্মানী, জাপান ও সুইস পুঁজি।

বিগত ৪০ বৎসর ধরে ভারতে বিদেশী পুঁজির আগমন ঘটছে প্রধানত দুটি আনুষ্ঠানিক রূপের কারবারী সংস্থা মারফত ঃ বিদেশী বহুজাতিক কারবারী সংস্থাগুলির ভারতীয় শাখা মারফত এবং বিদেশী বহুজাতিক কারবারী সংস্থার অধীন রূপে গঠিত ভারতীয় কোম্পানি মারফত।

৪.১০. বহুজাতিক করপোরেশন ঃ অধীন ও শাখা কোম্পানিসমূহ
Multinational Corporations : Subsidiaries and Branches

১. ধনতন্ত্রী জগতে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী এবং জার্মান একচেটিয়া কারবারী সংস্থার উৎপত্তি ঘটেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্রিটিশ আই সি আই, বার্মাশেল, মার্কিন দ্যুঁপো কেমিক্যালস্, ইউ. এস স্টীল, জার্মান সিমেন্স, আই. জি. ফরবেন ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি।

এই সংস্থাগুলি ছিল এক একটি নির্দিষ্ট জাতিভিত্তিক আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবারী সংস্থা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওই সব প্রাক্তন জাতিভিত্তিক একচেটিয়া আন্তর্জাতিক কারবারী সংস্থাগুলির অনেকগুলিরই রূপান্তর ঘটেছে। উন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলির এক একটিতে এদের প্রধান কার্যালয় রয়েছে কিন্তু এদের মালিকানা বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিভিন্ন অংশের করতলগত। এজন্য এরা এখন বহুজাতিক করপোরেশন (Multinational or Transnational Corporation) নামে পরিচিত। কিন্তু এদের শাখা, অধীন কোম্পানি ও কলকারখানা এবং পুঁজি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত এবং বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রাক্-স্বাধীনতা কালে যেসব বিদেশী বেসরকারী পুঁজির সংস্থা ছিল তাদের অধিকাংশই বর্তমানে এই সব দৈত্যাকার বহুজাতিক করপোরেশনের শাখা কিংবা অধীন সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

২ এই সব বহুজাতিক করপোরেশনগুলির বিপুল অর্থনীতিক ক্ষমতার একটি দৃষ্টান্ত হল, ১৯৬৯ সালে কেবল মার্কিন বহুজাতিক করপোরেশনগুলির উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্যই ছিল ১৪,০০০ কোটি ডলার, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া বাদে অন্য যে কোনো দেশের জাতীয় মোট উৎপন্নের চাইতে বেশি। ব্রিটিশ বহুজাতিক করপোরেশন ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের মোট অর্থনীতিক শক্তি বুলগারিয়া, ফিনল্যান্ড বা গ্রীসের চাইতে বেশি। মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশন্যাল

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের মোট আয় পর্তুগালের জাতীয় আয়ের চাইতে বেশি। আজ পৃথিবীতে ১০০টি বৃহত্তম অর্থনীতিক শক্তির মধ্যে ৫৭টি হল বিভিন্ন দেশ এবং ৪৩টি হল বিভিন্ন বহুজাতিক করপোরেশনের। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ৫০টি বহুজাতিক করপোরেশনের মধ্যে ২১টির প্রধান কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। ওই ২১টি বৃহত্তম বহুজাতিক করপোরেশনের মোট আয় হল ৫০টি সর্ববৃহৎ বহুজাতিক করপোরেশনের মোট আয়ের ৫০ শতাংশ। পৃথিবীর মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ হল বহুজাতিক করপোরেশনগুলির পারস্পরিক বাণিজ্য। সুতরাং আজকের ধনতন্ত্রী জগতে শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে এই বেসরকারী একচেটিয়া বহুজাতিক করপোরেশনগুলি এক প্রবল অর্থনীতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং এদের স্বার্থরক্ষায় বৃহৎ ধনতন্ত্রী দেশগুলি পরিচালিত হচ্ছে।

৩. ভারতে বিবিধ বেসরকারী বহুজাতিক করপোরেশন ভারতীয় বেসরকারী কোম্পানিগুলির সঙ্গে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সঙ্গেও সহযোগিতার চুক্তির (foreign collaboration agreements) মারফত এদেশে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করছে। এই সব বিদেশী সহযোগিতার চুক্তিগুলি তিন প্রকারের: (ক) অধীন কোম্পানি (subsidiaries) গঠন করে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার কিনছে; (খ) অধীন কোম্পানি গঠন করে তার সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার কিনছে; (গ) ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে কেবল কারিগরী সহযোগিতার (purely technical collaborations) চুক্তি করছে। এ ছাড়া, বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কিছু নিজস্ব শাখাও এদেশে আছে। ভারত সরকারের সাধারণ নীতি হল, বিদেশী সহযোগিতার চুক্তির ক্ষেত্রে বহুজাতিক করপোরেশনগুলিকে সংখ্যালঘু শেয়ার কিনতে উৎসাহিত করা। কিন্তু তথ্য থেকে দেখা যায়, বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধিকাংশ অধীন কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার খরিদ করাটাই বেশি পছন্দ করে। কারণ তাতে ওই অধীন কোম্পানিগুলির উপর তাদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং যতটা কম পরিমাণে সম্ভব প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তরের সুবিধা তারা ভোগ করতে পারে।

৪. তথ্য থেকে আরও দেখা যায় বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানির সংখ্যা কমলেও এবং মোট আদায়ীকৃত শেয়ার পুঁজিতে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অংশ সামান্য কমলেও তাদের মোট আদায়ীকৃত পুঁজি এবং তাতে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির মোট পরিমাণ বেড়েছে। অর্থাৎ বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানিগুলির শেয়ার মালিকানার ভারতীয়করণের সরকারী নীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

৫ বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানিগুলির পুঁজির ১০ শতাংশের বেশি বিনিয়োজিত রয়েছে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রস্তুতকরণ শিল্পে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ওষুধ, কাপড়কাচা সাবান ও মোটরগাড়ি শিল্প। ৬ শতাংশের বেশি বিনিয়োজিত রয়েছে কৃষি ও সংশিষ্ট শিল্পে। বাকিটা ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থসংস্থান, খনি ও সেবা শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে।

৬. বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানিগুলির গড়পড়তা মুনাফার হার (মোট সম্পত্তির শতাংশ হিসাবে) বাড়ছে। কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলি শিল্পে (যেমন, সুগন্ধি, প্রসাধন, সাবান, ওষুধ, মোটরগাড়ি ও যন্ত্রাংশ শিল্পে) তারা অত্যন্ত চড়া হারে মুনাফা করছে। এই চড়া হারে মুনাফা করে তা নিজ দেশে পাঠাতে গিয়ে আসলে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানিগুলি ২ থেকে ৪/৫ বছরের মধ্যে তাদের বিনিয়োজিত পুঁজির সবটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং বছরের পর বছর এই রকম চড়া হারে মুনাফার দরুন তাদের বিনিয়োজিত পুঁজির বহুগুণ বেশি নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এটা ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির পক্ষে একটি স্থায়ী অপচয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং তা পুঁজি গঠনের হারকে বিশেষভাবেই কমিয়ে দিচ্ছে।

৭. বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানিগুলি স্থাপনের অনুমতিদানের একটা প্রধান যুক্তি ছিল এদের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির দ্বারা বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাড়বে। কিন্তু সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় সে আশাও খুব একটা পূর্ণ হচ্ছে না। কারণ, এই সব অধীন কোম্পানিগুলির জন্য বিবিধ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানির জন্য এবং লভ্যাংশ, সুদ ইত্যাদি পাঠাতে যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা খরচ হচ্ছে সে তুলনায় তাদের দ্বারা উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসছে।

৮. ভারতে বর্তমানে অধীন কোম্পানি ছাড়াও বহুজাতিক করপোরেশনগুলির নিজস্ব শাখা রয়েছে। আগের তুলনায় এই শাখাগুলির সংখ্যা কমলেও, তাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এদের মধ্যে ব্রিটিশ বহুজাতিক করপোরেশনগুলির শাখা ও তাদের সম্পত্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় স্থান হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক করপোরেশনগুলির শাখা এবং তাদের সম্পত্তির পরিমাণের।

ভারতে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির শাখার মোট

সংখ্যার ৭০ শতাংশ এবং তাদের মোট সম্পত্তির ৯০ শতাংশ হল ব্রিটিশ ও মার্কিন বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অন্তর্গত।

৯. বিভিন্ন শিল্পে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির ভারতীয় শাখাগুলির বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় শাখার সংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে হ্রাস হলেও, সেবা শিল্পে, কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রস্তুতকরণ, ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থসংস্থানে এবং পরিবহণ, যোগাযোগ ও গুদামজাতকরণে বর্তমানে এরা কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

উপসংহার: ভারতে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানি ও শাখাগুলির কাজ ও অবস্থার উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে না পেঁৗছে পারি না:

(ক) এদের কাজকর্মের দ্বারা ভারতে বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঘটছে না।

(খ) এদের অধিকাংশই, বিশেষতঃ, শাখাগুলির অধিকাংশই ব্যবসায়, বাণিজ্য, এবং অর্থসংস্থান কারবারে ও চা রপ্তানিতে নিযুক্ত থাকায় এরা আমাদের বিশেষ কিছু আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তর করছে না।

(গ) অধীন কোম্পানিগুলি কমবেশি ভারতীয় শেয়ারহোল্ডার নিয়ে গঠিত হয়ে ভারতীয় কোম্পানির ছদ্ম আবরণে বিপুল হারে মুনাফা করছে, বিরাট আকারে সম্পত্তি বাড়াচ্ছে এবং বিদেশী পুঁজির স্বার্থ সিদ্ধি করছে।

(ঘ) এইসব অধীন শাখা কোম্পানিগুলির অধিকাংশই হল ব্রিটিশ এবং মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণাধীন।

৪.১১. ভারতের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজি ও কারিগরী সহযোগিতার ফলাফল
Foreign Capital & Technical Collaboration: Effects on Indian Economy

১. বিদেশী সহযোগিতা বলতে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনীতিক উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা বোঝায়, ভারতের পক্ষে তার অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক বলা যায় না।

২. ভারতে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানিগুলির তুলনায় শাখার সংখ্যা এবং মোট সম্পত্তির পরিমাণ বেশি। কিন্তু অধিকাংশই ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিযুক্ত। কৃষিতে নিযুক্ত শাখাগুলির সবই চা বাগিচায় নিযুক্ত। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রস্তুতকরণ শিল্পে নিযুক্ত শাখার সংখ্যা কম। সুতরাং এদের দ্বারা ভারতে বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ আমদানি যে হচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য। অধীন কোম্পানিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রস্তুতকরণ শিল্পে নিযুক্ত থাকলেও, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত অধীন কোম্পানিগুলি।

৩. বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অধীন কোম্পানি এবং শাখাগুলির ভারতকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তর করার যে কথা, বাস্তবিক পক্ষে তা এরা করছে না। নিজেদের দেশে এরা যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে ভারতকে তা হস্তান্তর না ক'রে নিজেদের পরিত্যক্ত পুরাতন প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার নাম করে ভারতকে দিচ্ছে। এবং তা যতটুকু দিচ্ছে তার বিনিময়ে চড়া পারিশ্রমিক ও দাম নিচ্ছে। এটা যে শুধু ভারতীয় বেসরকারী কোম্পানিগুলির সাথে কারিগরী সহযোগিতার চুক্তির ক্ষেত্রেই করছে তা নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতার চুক্তির ক্ষেত্রেও একই রকম আচরণ করছে। অর্থাৎ কারিগরী সহযোগিতার নামে বিদেশী সংস্থাগুলি একদিকে চাপ দিয়ে চড়া দাম নিচ্ছে, অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে ভারতকে বঞ্চিত করছে।

৪. অধিকাংশ অধীন কোম্পানি ভারতেই তাদের পুঁজির অধিকাংশ সংগ্রহ করেছে, তাদের মালিক বিদেশী বহুজাতিক করপোরেশনগুলি খুব কম পুঁজিই ওই সব অধীন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু অধীন কোম্পানি ও শাখা কোম্পানিগুলি ভারতে মোটা মুনাফা ক'রে তাদের পুঁজির বহুগুণ বেশি অর্থ এখান থেকে বিদেশে নিয়ে গেছে ও যাচ্ছে।

৫ বহুজাতিক করপোরেশনগুলির সমস্ত শাখাও অধীন কোম্পানিগুলিই ধীরে ধীরে তাদের বিদেশী মালিকানার অনুপাত হ্রাস ও ভারতীয় মালিকানার অনুপাত বাড়ানোর নীতি মেনে নিয়েছে। কিন্তু কার্যত তারা এই নীতি পালন করছে না। এমনকি যেখানে ভারতীয় মালিকানা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে সেখানেও, তারা বিদেশী মূল কোম্পানির সাথে ভারতীয় অধীন কোম্পানির এমন চুক্তিতে ভারত সরকারের সম্মতি আদায় করেছে যার বলে, বিদেশী বহুজাতিক করপোরেশন সংখ্যালঘু শেয়ারের মালিক হলেও কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাখতে পারবে।

৬ বহুজাতিক করপোরেশনের ভারতীয় অধীন কোম্পানিগুলির ও শাখাগুলির ভারতীয়করণের জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যাপারটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। 'বিদেশী মুদ্রা' বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন (FERA) লঙ্ঘন করে এরা অতি সহজেই বিপুল মুনাফা নিজেদের দেশে পাচার করছে। পন্ডস লিঃ ও ওয়ারেন টী কোম্পানি কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতে তাদের মোট সম্পত্তির সমপরিমাণ অর্থ নিজদেশে নিয়ে

গেছে। কলগেট-পামঅলিভ লিমিটেডের মাত্র ১৪ মাসের মুনাফা তার এদেশের মোট সম্পত্তির সমপরিমাণ হয়েছে এবং দেশে নিয়ে গেছে। এমনিভাবে অর্থনীতিক উন্নয়নে সাহায্য করার নামে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির কাছে ভারত চড়া হারে মুনাফা শিকারের একটা লোভনীয় ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা ভারতীয়দের হাতে এলেও এদের নিয়ন্ত্রণ আগের মতোই বিদেশী বহুজাতিক করপোরেশনের হাতেই রয়ে গেছে বলে, বিদেশী কোম্পানির ভারতীয়করণের কথাটা একটা অলীক কথায়, একটা স্তোকবাক্যে পরিণত হয়েছে মাত্র।

৭ বর্তমানে বহুজাতিক করপোরেশনগুলির ভারতীয় শাখা ও অধীন কোম্পানিগুলি পুরাতন কর্মক্ষেত্র থেকে নতুন নতুন কর্ম ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ প্রসারিত করছে এবং তার মারফত ভারতের অর্থনীতিতে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির জাল বিস্তৃত হচ্ছে।

৪.১২. বিদেশী পুঁজি ও কারিগরী সহযোগিতা সম্পর্কে সরকারী নীতি

Foreign Capital & Technical Collaboration : Government Policy

১. স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পরাধীনতার কালে ভারত সরকারের নীতি ছিল ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির শর্তবিহীন বিনিয়োগে উৎসাহ দান এবং শিল্পে, বৈদেশিক বাণিজ্যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে, বাগিচা ও খনি শিল্পে, পরিবহণে একচেটিয়া ব্রিটিশ পুঁজির আধিপত্য ও অবাধ শোষণের আনুকূল্য করা। এই কারণে সে সময় বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল।

২. স্বাধীনতা লাভের পর বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি কঠোর থেকে ধীরে ধীরে নমনীয় হতে থাকে।

(ক) স্বাধীন ভারত সরকারের বিদেশী পুঁজি সংক্রান্ত নীতি প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৪৮ সালের প্রথম শিল্প নীতিতে। তাতে বিদেশী পুঁজির উপর কিছু কিছু শর্ত আরোপ করে বিছুটা পরিমাণে বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের ভারতীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, ভারতীয় শ্রমিক-কর্মীদের কারিগরী শিক্ষাদানের মারফত বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তরের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

(খ) কিন্তু তাতে বিদেশী পুঁজি খানিকটা নিরুৎসাহিত হওয়ায় ১৯৪৯ সালে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু বিদেশী বিনিয়োগকারীদের তিনটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন :

(১) বিদেশী ও দেশী পুঁজির মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হবে না ;

(২) বিদেশী পুঁজির সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ; এবং

(৩) বিদেশী মুদ্রার অসুবিধা না হলে বিদেশী সংস্থাগুলিকে মুনাফা ও পুঁজি নিজের দেশে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে।

৩. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদেশী মুদ্রার সংকট দেখা দিলে ভারত সরকার বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে আরও উদার নীতি গ্রহণ ক'রে বিদেশী ঋণ পুঁজির পরিবর্তে শেয়ার পুঁজি (ইকুয়িটি ক্যাপিট্যাল) সংগ্রহের উপর জোর দেয় এবং দেশী-বিদেশী জোটবদ্ধ সংস্থা গঠনে উৎসাহ দিতে শুরু করে। তখন থেকে দেশের অর্থনীতিক বিকাশে দেশীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ঘাটতি পূরণে এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব দূর করার জন্য ভারত সরকার এদেশে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে শুরু করে। এজন্য বিদেশী পুঁজি সংস্থাগুলিকে কর-ছাড়ের সুবিধা দান ও অনুমতিপত্র দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু বিদেশী পুঁজির সংস্থাগুলির অধিকাংশ শেয়ার ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তরের নীতিটি তখনও অব্যাহত ছিল। ১৯৬১ সালে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের মিলন কেন্দ্ররূপে ভারতীয় বিনিয়োগ কেন্দ্র (Indian Investment Centre) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে।

৪ ১৯৭২ সালে আগের নীতি পরিবর্তন করে সরকার সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানিকে (অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্থার সম্পূর্ণ অধীন কোম্পানিকে) এই শর্তে ভারতে কারবারের অনুমতি দেবার নীতি গ্রহণ করে যে, ঐ সব কোম্পানির উৎপাদনের সমস্তটাই রপ্তানি করতে হবে। যদি উৎপাদনের সমস্তটাই রপ্তানি করা হবে এই উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা না হয় তাহলে তার ঐ কোম্পানির মালিকানার কত ভাগ বিদেশীদের হাতে থাকবে তা ভারত সরকারের সাথে আলোচনার দ্বারা স্থির করতে হবে। এর ফলে তখন থেকে ভারত সরকারের নীতির পরিবর্তন ঘটে যায়। এর আগে বিদেশী কোম্পানিগুলির ক্রমশ ভারতীয়করণের নীতির পরিবর্তে রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রধানত সম্পূর্ণ বিদেশী কোম্পানিগুলির উপর আংশিক নির্ভরতার নীতি গৃহীত হয়। এর দরুন ভারতের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ ঘটেছে।

৫. ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশী পুঁজি ও সহযোগিতা সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে ভারত সরকারের অনুসৃত নীতির মূল কথা ছিল :

(ক) যে সব ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজি ও শিল্পকৌশল রয়েছে সে ক্ষেত্রে বিদেশী সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে না ;

(খ) যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দেবে সে সব ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা, কারিগরী কৃৎকৌশল ও যন্ত্রপাতি কেনার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হবে ;

(গ) ভোগ্যপণ্য শিল্পে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (FERA) কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে ; এবং

ঘ) বিদেশী কোম্পানিগুলির ভারতীয়করণের নীতিটি অনুসরণ করা হবে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে দেওয়া হবে না।

এই নীতির অনুসরণে জনতা সরকার দু'টি বিদেশী বহুজাতিক করপোরেশনের ভারতীয় কারবার বিলোপের সিদ্ধান্ত নেয়। একটি হল কোকা কোলা কোম্পানি, অপরটি হল ইণ্টারন্যাশন্যাল বিজনেস মেশিন্‌স্ (IBM)।

৬. ১৯৮০ সালে কংগ্রেস সরকার নির্বাচনে জয়লাভের পর বিদেশী সহযোগিতা সম্পর্কে কংগ্রেস সরকারের পূর্ব-বর্তী নীতির প্রত্যাবর্তন ঘটে। ফলে ভারতে বহুজাতিক করপোরেশনের এমন অনেক শাখা ও অধীন কোম্পানির সৃষ্টি হয় যারা বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তরের নামে এদেশে এমন সব ক্ষেত্রে কারবারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলেছে যেখানে বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন প্রায় নেই বললেই চলে। যেমন, ঐ যুক্তিতে হিন্দুস্থান লিভারের শেয়ার মালিকানার ৫১ শতাংশ বিদেশীদের হাতে রয়েছে অথচ, তার উৎপন্ন দ্রব্যগুলি হল প্রধানত বনস্পতি তেল, প্রসাধন দ্রব্য, সাবান, দাঁতের মাজন, কাপড় কাচার রাসায়নিক পদার্থ (detergent)। আবার বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করে ডানলপ, অ্যাসবেস্টস সিমেণ্ট, গুডইয়ার প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানিকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এ কথা ঠিক যে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে পুঁজি ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবের দরুন বিদেশী পুঁজি ও বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু বিদেশী সহযোগিতার নামে বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বেসরকারী বিদেশী পুঁজির আমন্ত্রণ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই ডেকে আনে বেশি করে। চিলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি তার দৃষ্টান্ত। বিদ্যুৎশক্তি, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু শিল্প, খনিজ তৈল উৎপাদন ও শোধন শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির সাহায্য সমর্থনযোগ্য হলেও যে সব শর্তে সাধারণত এগুলি সংগৃহীত হয় তা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া, একবার বেসরকারী বিদেশী পুঁজি স্বল্পোন্নত দেশে এলে সেই পুঁজি নানা-ভাবে ভোগ্যপণ্য শিল্পে সম্প্রসারিত হবারও নানা ধরনের অসুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে। এদের দুর্নীতিপরায়ণ কার্যকলাপে এরা দেশের রাজনীতিজ্ঞ ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদের জড়িয়ে ফেলে এবং নিজেদের অর্থনীতিক শোষণ বজায় রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানোর এবং নিজেদের ক্রীড়নক সরকারকে গদীতে বসানোর চেষ্টা করে। সুতরাং বিদেশী বেসরকারী পুঁজি সম্পর্কে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় যে, ভারতসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বেসরকারী বিদেশী পুঁজির সহযোগিতার নামে বহুজাতিক করপো-রেশনগুলির মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির অবসান যত দ্রুত ঘটে ততই মঙ্গল।

৭. ভারতে ১৯৮৯-র সংসদীয় নির্বাচনের ন্যাশন্যাল ফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়েছে। এখন বিদেশী সহযোগিতা সম্পর্কে পূর্বেকার সরকারী নীতির পরিবর্তন আশা করা যায়।

৪ ১৩. ভারতে বিদেশী ঋণ-সাহায্য

Foreign Loan Aid in India

১. ইদানীংকালে ভারতে তিন রকমের বিদেশী সাহায্য আসছে : (ক) ঋণ, (খ) অনুদান, এবং (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পি. এল ৪৮০ ৬৬৫-এর অন্তর্গত সাহায্য রূপে। এর মধ্যে ঋণ রূপে পাওয়া গেছে ৭৬ শতাংশ, বাকি ২৪ শতাংশের প্রায় অর্ধেক হল অনুদান এবং অর্ধেক হল পি এল. ৪৮০/৬৬৫-এর অন্তর্গত সাহায্য।

বিভিন্ন সাহায্যকারী দেশ ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মোট সাহায্যের ৮৭ শতাংশ এসেছে Aid India Consortium-এর সদস্য দেশগুলি থেকে, সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলি থেকে এসেছে ৬ শতাংশের মত এবং অন্যান্য দেশগুলি থেকে এসেছে ৮ শতাংশ।

দেশ হিসাবে সর্বাধিক সাহায্য এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কিন্তু সর্বাধিক ঋণ এসেছে বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী সংস্থা International Development Agency থেকে।

২. **ভারতে বিদেশী সাহায্যের ব্যবহার :** মার্কিন পি এল ৪৮০ ঋণটা ভারতে খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। পি. এল. ৬৬৫-এর অন্তর্গত সাহায্য থেকে ভারত মার্কিন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য ব্যয় করা হয়। বাকি মার্কিন সাহায্য কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক সার, রেয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রেল পরিবহণ শিল্পের উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ ব্যবহার করা হয়েছে প্রধানত রেলপথ ও কৃষির উন্নয়নে, দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের কাজে কয়লাখনি ও ইস্পাত উৎপাদনের উন্নয়নে।

পশ্চিম জার্মানির সাহায্য ব্যবহার করা হয়েছে রূরকেল্লা ইস্পাত কারখানা স্থাপনে। ব্রিটিশ সাহায্য ব্যবহার করা হয়েছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থাপনে ও খনিজ তৈল শিল্প উন্নয়নে।

সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাহায্য ব্যবহার করা হয়েছে ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপনে ও শোধনাগার প্রতিষ্ঠায়।

সুতরাং ভারতে বিদেশী ঋণ সাহায্যের অধিকাংশই অর্থনীতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে ব্যবহার করা হয়েছে বলা যায়।

৩ ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত ৩৭ বৎসরে ভারত মোট বিদেশী সাহায্য পেয়েছে ৬১,৪২৫ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে থেকে ৪৩,০০৩ কোটি টাকা ব্যবহার করেছে। ঋণ মঞ্জুরি ও ব্যবহারের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান অনিবার্য কারণেই ঘটে। তবে ঋণ ব্যবহারের দক্ষতা বেশি হলে ব্যবধানটা কমে।

৪ বিদেশী ঋণ সাহায্যের পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত কমে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকে আবার দ্রুত গতিতে বাড়তে আরম্ভ করেছে।

৫ বিদেশী ঋণ সাহায্যের অধিকাংশই (৪০ শতাংশের বেশি) ঋণদাতা-দেশের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কেনার শর্তবিশিষ্ট (tied loans)। দেখা গেছে এই সুযোগে ঋণদাতা-দেশগুলি ওই সব জিনিসের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার দর থেকে ৩০/৪০ শতাংশ, বেশি দাম নিয়ে থাকে। সুতরাং বিদেশী ঋণ সাহায্যটা এক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলির কাছে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে শোষণের চমৎকার উপায় হিসাবেও কাজ করছে। এই কারণে শর্তবিশিষ্ট বিদেশী ঋণের চাইতে শর্তহীন (untied) ঋণই বেশি কাম্য।

৪.১৪. ভারতের অর্থনীতিক বিকাশে বিদেশী ঋণ-সাহায্যের ফলাফল

Effects of Foreign Loan-Aid on India's Economic Growth

১. নীতিগতভাবে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বা যুক্তি হল তিনটি: (ক) দেশে সঞ্চয় হার কম বলে পুঁজির যে ঘাটতি থাকে বিদেশী সাহায্যরূপে বিদেশী পুঁজি ঋণ পেলে তা ওই ঘাটতি দূর করতে পারে; (খ) বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা বিদেশী সাহায্য রূপে পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করা সম্ভব হয়; (গ) বিদেশী সাহায্য হিসাবে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পুঁজিদ্রব্য, কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানি করা সম্ভব হয়।

বিদেশী সাহায্যের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশ কতটা ঘটবে তা নির্ভর করে বিদেশী সাহায্য কোন্ শর্তে কি কি আকারে কতটা এবং কখন পাওয়া যাচ্ছে এবং তা কতটা বিচক্ষণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর।

২ ভারতে প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকে এ পর্যন্ত যে বিদেশী ঋণ ও সাহায্য পাওয়া গেছে তা প্রধানত ছয় রকমের কাজে লেগেছে: (ক) বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের দরুন ভারতে বিনিয়োগ হার বেড়েছে।

(খ) বিদেশী সাহায্য মারফত যে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গেছে তা এই সময়ে দেশের বিদেশী মুদ্রা সংকট মোচনে এবং উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানিতে সাহায্য করেছে।

(গ) মোট বিদেশী সাহায্যের যতটা ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রায় অর্ধেক ছিল খাদ্যশস্য আমদানির জন্য সাহায্য। ওই খাদ্য আমদানির দ্বারা সে সময় দেশে খাদ্যঘাটতি দূরে করা ও খাদ্য-মূল্যস্তর মোটামুটি স্থিতিশীল রাখা গেছে।

(ঘ) বিদেশী সাহায্যের দ্বারা ভারতে ইস্পাত শিল্পের বিরাট সম্প্রসারণ ঘটেছে। তার ফলে গত ৪০ বৎসরে দেশে ইস্পাতের উৎপাদন ৬ গুণ বেড়েছে।

(ঙ) বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাহায্যের দ্বারা ব্যাপকভাবে ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তনের সূত্রপাত হয়।

(চ) বিদেশী সাহায্য কৃষিতে সেচ সম্প্রসারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণে এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে, এককথায় আধুনিক অর্থনীতির অন্তর্কাঠামো সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

৪.১৫. বিদেশী সাহায্যের সমস্যা

Problems of Foreign Aid

১. বিদেশী সাহায্য নিয়ে ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়ন করা উচিত কিনা এ বিষয়ে এদেশে মতভেদ আছে।

সপক্ষে যুক্তি: ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া অর্থনীতিক উন্নয়ন অসম্ভব। কারণ ভারতের পুঁজি কম, শিল্পজ্ঞান অপ্রতুল ও উৎপাদনকৌশল পুরাতন। শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল এদেশে দুষ্প্রাপ্য। যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, মেরামতি কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। তাই বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে ভারতের মত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন করলে তাতে আপত্তির কোনো কারণ থাকা উচিৎ নয়।

বিরুদ্ধে যুক্তি: এরূপ সাহায্য আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হলেও এর সাথে সাহায্যকারী দেশ নানারূপ শর্ত

আরোপ করে সাহায্যপ্রার্থী দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, সাহায্য দানের সুযোগে সাহায্যপ্রার্থী দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে সাহায্যকারী দেশ নিজের স্বার্থ ষোল আনা সিদ্ধ করে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ঋণ ও সাহায্যকে চাপ হিসাবে ব্যবহার ক'রে স্বল্পোন্নত ও দুর্বল দেশগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন করে। এর ফলে সাহায্যপ্রার্থী দেশ সাহায্যকারী দেশের উপর এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, প্রথমোক্ত দেশের পক্ষে সেই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা কেবল যে শক্ত হয় তাই নয়, বরং সেটা দিন দিন আরও বাড়তে থাকে। কারণ নতুন ঋণের অনেকটাই পুরাতন ঋণ শোধ করতে চলে যায় যার ফলে ঋণ শোধের জন্যই আবার ঋণ করতে হয়। তা ছাড়া, বৈদেশিক সাহায্য একবার নিতে আরম্ভ করলে তার পর কোনো দেশ নিজের ইচ্ছামত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ, শিল্প বা কৃষি কোন্‌টি অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কোন্ শিল্প সর্বাগ্রে গড়ে তুলবে সে বিষয়ে নীতি নির্ধারণ—ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না, কারণ সাহায্যকারী দেশ এসব ক্ষেত্রে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে চলেছে। এই বিশাল বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে ভারত নানা রকমের শিল্প গঠন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই উন্নয়ন হয়েছে কিনা, যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে তা আশানুরূপ ও যথেষ্ট কিনা, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই ঐ উন্নয়ন সম্ভব হত কিনা, এ ধরনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে উত্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলির উপর আলোচনাও হয়েছে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন আমরা বৈদেশিক সাহায্যের কয়েকটি সমস্যা ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করব।

২. বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা : কোনো বিশেষ সময়ে বৈদেশিক সাহায্য কি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং সেই সাহায্যের রূপ কি হবে এ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ আগে পাওয়া গেলে সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলির পরিকল্পনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বিদেশী সাহায্য সাধারণত পাওয়া যায় বার্ষিক ভিত্তিতে। উন্নয়নের জন্য ভারত দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের এক একটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে যদি বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যেত তবে ভারতের পরিকল্পনাগুলির বিশেষ উপকার হত। কিন্তু 'এইড ইন্ডিয়া কন্‌সর্টিয়াম'-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণে নিজস্ব মানদণ্ড ব্যবহার করে, কি পদ্ধতিতে সাহায্য পাঠান হবে তাও নিজেদের প্রয়োজন বিচার ক'রে স্থির ক'বে এবং সর্বোপরি, ভারতে সাহায্য পাঠান উচিত কিনা সে বিষয়েও নিজেদের স্বল্প ও দীর্ঘকালীন স্বার্থ-বিচার করে নীতি ঠিক করে। স্বভাবতই এত দিক বিচার ক'রে সাহায্যকারী দেশ বাৎসরিক ভিত্তিতে ভারতকে সাহায্য পাঠায় বলে ভারতের পরিকল্পনার গতি, প্রকৃতি ও সাফল্য, অসাফল্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ডলার সংকটে ভারতের প্রধান সাহায্যদাতা দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জর্জরিত হওয়ায় এই অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।

৩. বৈদেশিক সাহায্যের যথাযোগ্য ব্যবহারের সম্ভাব্যতা : কোন্ দেশ কি পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে তা নির্ভর করে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য ঐ দেশ কতটা নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারবে সেই ক্ষমতার উপর। কোনো দেশে শুধু সাহায্য পাঠালেই সমস্যার সমাধান হয় না; কারণ সেই দেশ যদি অতিশয় পশ্চাৎপদ হয় তবে হয়ত ঐ সাহায্য অব্যবহৃত থেকে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ দেশের সাহায্য বিশেষ কোন কাজে আসবে না। সাহায্যপ্রার্থী দেশের নিকট বিদেশী সাহায্য কতটুকু কাজে লাগবে তা প্রশাসনিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। শিক্ষিত, নিপুণ, সৎ এবং একনিষ্ঠ কর্মচারী ও নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব গ্রহণ না করলে বিদেশী সাহায্য যথাযথরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, যে দেশ সাহায্য পায় সে দেশের জনসাধারণের সহযোগিতা ও অনুকূল মনোভাবও এই সাহায্যের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। তা হল সাহায্যপ্রার্থী দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ভূমি-সংক্রান্ত মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে দেখা দেয়। যেমন, বহুকালের পুরাতন জমির মালিকানা-ব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন। ভারতে দেখা যায় এখানকার সামন্ততান্ত্রিক জমির মালিকানা-ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে কৃষিকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। কৃষিক্ষেত্রের মৌলিক পরিবর্তন না করলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটান হল না অথচ বৈদেশিক সাহায্য প্রচুর পরিমাণে ভারতে আসছে এমন অবস্থায় ভারতের অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর একটি কথা : যে সকল উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য আনা হয়, সেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি দক্ষতা সহকারে পরিচালিত হওয়ার দরকার। কারণ বৈদেশিক

সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্য কোনো প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, যে সকল প্রকল্পের সাথে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ জড়িত থাকে (যেমন, কৃষি উন্নয়নের প্রকল্প, সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বা গ্রামীণ পুনর্গঠন ইত্যাদি) সে প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে ঐ সকল সাধারণ মানুষের সক্রিয় ও একনিষ্ঠ সহযোগিতার উপর। এ সহযোগিতা না পাওয়া গেলে সব কিছুই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৪. সাহায্য প্রাপ্ত দেশের ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা : বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে এর উপরেই কোনো দেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ঋণ পরিশোধের শর্ত সহজ ও অনুকূল হলে সাহায্যপ্রার্থী দেশের সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে, অর্থাৎ অধিকতর পরিমাণে সাহায্য ঐ দেশের অর্থনীতি ব্যবহার করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু তাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ যতদিন না অর্থনীতি স্বয়ংভর হবে ততদিন বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। তখন ঋণ-পরিশোধের সমস্যাও তীব্রতর হবে। এই অবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা না করলে অর্থনীতিকে সংকটের হাত থেকে বাঁচাবার কোনো উপায় থাকে না। এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। তাই রপ্তানি-শিল্পসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণ না করলে বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহারেও পরিশোধের-সমস্যার সমাধান করা যায় না। বর্তমানে ডলার সংকট তথা বিশ্বব্যাপী মন্দার লক্ষণ দেখা দেওয়ার জন্য এবং উন্নত দেশগুলির সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারত সহ স্বল্পোন্নত ও ঋণী দেশগুলির রপ্তানি বাড়ান খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে বিদেশী ঋণ পরিশোধের সমস্যাটি তীব্রতর হচ্ছে।

৫. সুদে-আসলে ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা : অর্থনীতিক বিকাশের প্রয়োজনে বিদেশী ঋণ গ্রহণের দরুন সুদে-আসলে সে ঋণের বোঝা বিপুলভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে। দেশের অর্থনীতির পক্ষে এটা শুভ নয়।

৪.১৬. বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত
The World Bank and India

১. ১৯৪৪ সালে ব্রেটনউডস্ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার (IMF) স্থাপনের সিদ্ধান্তের সাথে বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় এবং IMF-এর সাথী সংগঠনরূপে তা ১৯৪৬ সালের জুন মাস থেকে কাজ শুরু করে। জাতিসংঘের সকল সদস্যই এই দুটি সংস্থার সদস্য হবার অধিকারী। ভারত এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। এর শেয়ার পঁুজি প্রথমে ১,০০০ কোটি ডলার ছিল, বর্তমান পঁুজি ২২,৯৪২ কোটি ডলার।

২ ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিল্পের ও অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে সাহায্য করা এবং ঋণপ্রাপ্ত দেশগুলিতে বেসরকারী দেশী ও বিদেশী পঁুজির বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া। এজন্য বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের সরকারকে যেমন, তেমনি সে সব দেশের বেসরকারী উদ্যোগকেও ঋণ দিতে পারে। বিশ্বব্যাঙ্ক কেবল নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য ঋণ দেয়, অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সাধারণত ঋণ দেয় না। বিশ্বব্যাঙ্কের এই ঋণ বিদেশী মুদ্রায় দেওয়া হয়।

৩ বিশ্বব্যাঙ্ক প্রথমে পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনীতিক পুনর্গঠনের জন্য ঋণ দেয়। পরে তারা স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য, উৎপাদন-ক্ষমতা বিকাশের জন্য ঋণ দিতে আরম্ভ করে। বিশ্বব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে ১৯৫৬ সালে ইণ্টারন্যাশন্যাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) নামে একটি সংস্থা এবং ১৯৬০ সালে ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন (IDA) নামে আর একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। প্রথমটির উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন দেশের কেবল বেসরকারী উদ্যোগকে শেয়ার পঁুজি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি হল ঋণদাতা-দেশগুলির সমিতি। এই সংস্থাগুলিও ঋণ দিয়ে থাকে।

৪. বিশ্বব্যাঙ্ক রেলপথ উন্নয়ন, পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, দামোদর প্রকল্প, বিমান পরিবহণ (এয়ার ইণ্ডিয়া) প্রভৃতির জন্য ভারত সরকার মারফত ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে TISCO, IISCO, বোম্বাইয়ের টাটা কোম্পানির জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও ICIC-কে ঋণ দিয়েছে। ১৯৮৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ভারত বিশ্বব্যাঙ্ক এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সী (IDA) এবং আই. এফ এ ডি. থেকে মোট ৭,৫২৯'৮ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। IFC-ও ভারতকে নানান বেসরকারী শিল্পের জন্য ঋণ দিয়েছে।

৪.১৭ ভারত ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার (IMF) থেকে ঋণ
India and Borrowings from the I.M.F

১. ভারত সরকারের আবেদনক্রমে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার (IMF) ১৯৮১-১৯৮৪ সালের মধ্যে তিন কিস্তিতে ভারতকে এক বিরাট অংকের ঋণ দিতে রাজি হয়। ঋণের মোট পরিমাণ ৫০০ কোটি SDR [মুদ্রা বিনিময়ের বর্তমান হারে এটা ৫৮০ কোটি ডলারের সমান। ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ হল ৫,২০০ কোটি টাকা]। এ ঋণ তিনটি বাৎসরিক কিস্তির ১ম বৎসরে ৯০ কোটি (SDR),

২য় বংসরে ১৮০ কোটি (SDR) ও ৩য় বংসরে ২৩৩ কোটি (SDR) হিসাবে দেওয়া হয়। IMF-এর নিয়মবিধি অনুযায়ী, প্রত্যেকটি কিস্তির ঋণ পাবার ব্যাপারে ভারতের উপর নানা ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। IMF কর্তৃপক্ষ যখন সন্তুষ্ট হবে যে, বিশেষ কোনো একটি পর্যায়ের শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয়েছে, তখনই কেবল ঋণপ্রার্থী দেশটি পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট ঋণ পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ ঋণের উপর গড়ে বাৎসরিক ১০ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। ঋণের শেষ কিস্তি পাবার পরের বছর থেকে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে সুদ ও আসল সমেত পুরো ঋণ শোধ করতে হবে।

১৯৮৪ সালের ১লা মে ভারত সরকার চুক্তিটির মেয়াদ শেষ করে এবং তিন বংসরে মোট ৩৯০ কোটি SDR ঋণ নেয়। কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী আমদানী উদারিকরণ ও রপ্তানি প্রসার করতে গিয়ে, রপ্তানি বৃদ্ধির তুলনায় আমদানি বেশি করে ফেলেছে এবং তার ফলে লেনদেনের ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৫-৮৬-র মধ্যে আমদানির পরিমাণ ১২,৫৪৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৫,৭৬৩ কোটি টাকা ও রপ্তানির পরিমাণ ৬,৭১১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯,৮৬৫ কোটি টাকায় উঠেছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. 'মানবিক পুঁজি গঠন' বলতে কি বোঝায়? এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি?

[What is meant by 'human capital formation'? What are its importance and need?]

২. ভারতে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ও বিনিয়োগের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the volume and nature of foreign capital investment in India.]

৩ ভারতে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির উৎস, রূপ ও মুনাফার হার সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the sourcess, forms and rates of profit of foreign capital invested in India.]

৪. ভারতে বিদেশী পুঁজির কোনো প্রয়োজন আছে কি?

[Is there any need for foreign capital in India?]

৫. ভারতে কর্মরত বিদেশী বহুজাতিক করপোরেশনগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the role played by the multinational corporations working in India.]

৬. ভারত বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি আলোচনা কর।

[Discuss the Government Policy regarding foreign capital in India.]

৭. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনীতিক বিকাশে বিদেশী সাহায্য নিলে কি কি ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তা আলোচনা কর।

[Discuss the various problems that underdeveloped countries like India may have to face when they decide to use foreign aid for their economic development.]

[C.U. B.Com. (Hons) 1984]

৮. বিদেশী সাহায্য কিভাবে একটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশের গতিবেগ বাড়াতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain how foreign aid can promote the pace of economic development of an underdeveloped country.] [C.U. B.A. (II), 1985]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার গত তিন দশক ধরেই বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনীতিক উন্নয়নের হারটি কমই রয়ে গেছে। এর কারণ কি?

[Over the last three decades the rates of savings and investment have been quite high. Yet the rate of economic growth has remained low. Why?]

২. মানবিক পুঁজি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিনিয়োগ ব্যয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যয় প্রধান?

[Which items of investment expenditure made on the formation of human capital are major ones?]

৩. কি কি কারণে স্বল্পোন্নত দেশে বিদেশী পুঁজির দরকার হয়?

[Why does foreign capital become necessary in underdeveloped countries?]

৪. 'বিদেশী সহযোগিতা তিন ধরনের হতে পারে'। সেগুলি কি কি?

['Foreign collaboration may be of three types.' What are these types?]

৫. কি কি পদ্ধতিতে সরাসরি বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে?

[What are the different methods of direct investment of foreign capital?]

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থনীতির বিকাশ ও পরিকল্পনা

ECONOMIC DEVELOPMENT AND PLANNING

অধ্যায়

স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উন্নয়নের সমস্যা
The Problem Of Development Of Underdeveloped Economy

৫.১. স্বল্পোন্নতির মূল সমস্যা
Fundamental Problem of Development

১. স্বল্পোন্নত দেশের প্রধান সমস্যা তার তীব্র ও ব্যাপক দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণ স্বল্প আয়, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা। স্বল্প আয়ের দরুন দেশের সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও হার অত্যন্ত অল্প। সঞ্চয় সামান্য বলে পুঁজিগঠনের হারও নগণ্য। অর্থাৎ, স্বল্প উৎপাদন-ক্ষমতার দরুন স্বল্প আয়ের ফলে সঞ্চয় স্বল্প এবং সঞ্চয় স্বল্প হওয়ার ফলে পুঁজিগঠন নগণ্য।

২ পুঁজিগঠন নগণ্য হলে উৎপাদনে ব্যবহার করার উপযুক্ত পুঁজিদ্রব্যের অভাব হয়। সেক্ষেত্রে সামান্য পুঁজিদ্রব্যের দ্বারাই উৎপাদন পরিচালিত হয়। ভারতের কৃষিকার্যে ব্যবহৃত প্রচীন যন্ত্রপাতি এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনে স্বল্প পুঁজি নিযুক্ত হলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও স্বল্প হয়। সুতরাং, পুঁজিগঠন নগণ্য বলে ভারতবাসীর আয়ও স্বল্প। অতএব, **স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার দরুন স্বল্প আয়→আয়ের স্বল্পতার দরুন সঞ্চয়ের স্বল্পতা→সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুন পুঁজিগঠনের স্বল্পতা→পুঁজিগঠনের স্বল্পতার দরুন স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা→স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার দরুন স্বল্প আয়—** এইরূপে একটি চক্রের আকারে ভারতের জনজীবনে চিরন্তন দারিদ্র্য আপনাকে আপনি বজায় রেখেছে। **এ হল দারিদ্র্যের অভিশপ্ত পাপচক্র। এই পাপচক্রের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পুঁজিগঠনের অভাব। সংক্ষেপে এই হল ভারতের মতো গরিব দেশগুলির স্বল্পোন্নতি বা অনুন্নতির কারণ।**

৩. অনেকের মনে হতে পারে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ও জনসংখ্যার আধিক্যই বুঝি স্বল্পোন্নতির মূল কারণ। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। কারণ প্রকৃতি ইচ্ছা করে কতকগুলি দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও অপর কতকগুলি দেশকে রিক্ত করেছে—এরকম কল্পনার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো চিরনির্দিষ্ট ভাণ্ডার নেই। মানুষের সামনে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্ভাবনাময় সম্পদের ভাণ্ডার পড়ে রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে তা জয় করে, ঐ সম্ভাব্য সম্পদকে বাস্তব সম্পদে পরিণত করতে হয়। সুতরাং, কোন্ দেশ কখন, কতটা পরিমাণে

প্রকৃতির ভান্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করতে পারবে তা নির্ভর করে ঐ দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির উপর। **স্বল্পোন্নত দেশ এই কারণেই স্বল্পোন্নত যে, পুঁজিগঠনের অভাবে তারা প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ হয় মোটেই ব্যবহার করতে পারে না, নয়তো সে সবের অপব্যবহার কিংবা সামান্যই ব্যবহার করে।** সুতরাং, **পুঁজিগঠনের স্বল্পতা বা অক্ষমতার দরুন প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের অব্যবহার, স্বল্পব্যবহার বা অপব্যবহারই ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের স্বল্পোন্নতি বা দারিদ্র্যের মূল সমস্যা।**

৪. এ ছাড়া, বৈদেশিক পুঁজির শোষণ এখনও পর্যন্ত এসব দেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। প্রতি বছর যে হারে এসব দেশে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটছে তার চেয়ে বেশি হারে প্রতি বছর এসব দেশ থেকে বিদেশে সুদ ও মুনাফা বাবদ সম্পদ চলে যাচ্ছে।

৫.২ অর্থনীতিক উন্নয়ন
Economic Development

সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি, উন্নতি এবং বিকাশ অর্থাৎ অর্থনীতিক উন্নয়ন ভারতের মত সব ঔপনিবেশিক-শাসনমুক্ত দেশেরই আজ প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু, অর্থনীতিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? সহজ করে বলা যায়, **যে প্রক্রিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে একটি অর্থনীতির** (অর্থাৎ দেশের) **প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাই হল অর্থনীতিক উন্নয়ন।**[1] সুতরাং, অর্থনীতিক উন্নয়ন হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃত জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে। 'প্রক্রিয়া' বলতে কতকগুলি শক্তির ধারাবাহিক ক্রিয়া বোঝায়। এই শক্তিগুলি দীর্ঘকাল ধরে ক্রিয়াশীল থাকে এবং তার ফলে কতকগুলি অর্থনীতিক কার্যে ও ক্ষেত্রে, অর্থনীতির গঠনে, বিবিধ পরিবর্তন ঘটে। এই সকল পরিবর্তনের সামগ্রিক ফল হল প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। সুতরাং, **অর্থনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশ হল প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির একটি দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া।**

৫.৩. অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা
Need for Economic Development

১. ভারতসহ সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশেরই নিজস্ব প্রয়োজনে যেমন নিজেদের অর্থনীতির বিকাশ দরকার, তেমনি সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজনেও তা 'অপরিহার্য'। বিকাশ বা উন্নয়ন যেমন প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন, তেমনি তা প্রতিটি দেশেরও। সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং পরিবারে পরিবারে অবস্থার তারতম্যে যেমন দ্বন্দ্ব, কলহ, উত্তেজনা ও সংঘর্ষের উৎপত্তি হয় তেমনি দেশে দেশে অবস্থার বৈষম্য অনিবার্যভাবে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধবিগ্রহ ডেকে আনে। অতএব বিকাশ ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর এবং সমগ্র দেশের বৈষয়িক উন্নতির ও সমৃদ্ধির দ্বারা যেমন তাদের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সমৃদ্ধি লাভ ঘটে, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও রাষ্ট্রনীতিক স্থিতি দেখা দেয়, অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের সমান বিকাশের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। এই কারণে **স্বল্পোন্নত দেশগুলির দ্রুত অর্থনীতিক বিকাশের দ্বারা ধনী ও গরিব দেশগুলির মধ্যে বর্তমান দুস্তর ব্যবধান দূর করার প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার মতো পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।**

২. স্বল্পোন্নত দেশগুলির অধিবাসী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ মানুষ বিশ্বের মোট আয়ের **মাত্র ১৫ শতাংশ** নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। তাদের অধিকাংশেরই না আছে পানীয় জলের ব্যবস্থা, না আছে চিকিৎসার ব্যবস্থা, না আছে ন্যূনতম পরিধেয় ও বাসস্থান, শিক্ষার কথা দূরে থাকুক। কোনোমতে প্রাণধারণের গ্লানি থেকে এদের উদ্ধার করে মানুষ হিসাবে **জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম পরিমাণে খাদ্য, পরিধেয়, পানীয়, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিক বিকাশ ছাড়া পথ নেই।** একথা ভারতের পক্ষে যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে কোনো স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষেও।

৩. অভাব পূরণ করতে হলে চাই উৎপাদন এবং উৎপাদনের জন্য দরকার হল মানুষের কাজের। স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিপুল অভাব দূর করতে হলে চাই অভাব পূরণের দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল পরিমাণে উৎপাদন এবং সেইজন্য চাই বিপুল পরিমাণ শ্রম বা কাজ। অথচ, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় বিরাট সংখ্যক বেকার ও অর্ধবেকারের বাহিনী। এর কারণ **হল প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ** ব্যবহারে স্বল্পোন্নত

[1] "Economic development is a process whereby an economy's real income increases over a long period of time."—Meier and Baldwin, Economic Development p. 2.

দেশগুলির অক্ষমতা। একমাত্র **অর্থনীতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক উপকরণের সদ্ব্যবহার দ্বারা একদিকে যেমন বিপুল বেকার ও অর্ধবেকার বাহিনীকে কাজ দেওয়া সম্ভব এবং অন্যদিকে তেমনি তাদের অভাব পূরণের সামগ্রীগুলিও উৎপাদন করা সম্ভব। কর্মসংস্থানের ফলে যে আয় ও ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি তার দ্বারাই মানুষ উৎপন্ন-সামগ্রী ভোগ-ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের অভাব পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সক্ষম হয়।**

৪. **অর্থনীতিক বিকাশের দরুন মানুষ হিসাবে দেশবাসীর গুণগত উৎকর্ষও বাড়ে।** শিক্ষা ও চিকিৎসার বিস্তারে মানুষ সুস্থ দেহমনের অধিকারী হয়, আয়ু বাড়ে, তার কর্মক্ষমতা ও কর্মকালের দৈর্ঘ্য বাড়ে, কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অর্থনীতিক বৈষম্য কমে এবং সামাজিক-অর্থনীতিক কল্যাণ বাড়ে। এসবের সামগ্রিক ফল হিসাবে মানুষ ও কর্মী হিসাবে তারা হয় উন্নতমানের।

সুতরাং বলা যেতে পারে ভারত সহ সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশেরই চরম দারিদ্র্য অপসারণ, ধনী ও গরিবের মধ্যে আর্থিক অবস্থার বৈষম্য হ্রাস, উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োগ বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ও বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা—এই সকল প্রয়োজনে ভারত সহ প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশের প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

৫.৪ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফল
Effects of Development

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দরুন উপাদান যোগানের ক্ষেত্রে এবং উৎপন্ন পণ্যের চাহিদার গঠনে পরিবর্তন ঘটে।

১. **উপাদান যোগানের ক্ষেত্রে:** (ক) নতুন নতুন সম্পদের আবিষ্কার ঘটে। (খ) পুঁজি গঠনের হার বাড়ে। (গ) জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। (ঘ) নতুন ও উন্নততর উৎপাদন কৌশল প্রবর্তিত হয়। (ঙ) কারিগরী দক্ষতা বাড়ে। (চ) নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগত পরিবর্তন ঘটে।

২. **উৎপন্ন পণ্যের চাহিদার গঠন:** (ক) জনসংখ্যার মোট আয়তন ও তার মধ্যে বিভিন্ন বয়সের জনসমষ্টির অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। (খ) আয়ের স্তর ও বণ্টনে পরিবর্তন ঘটে বলে ক্রয়ক্ষমতা ও কার্যকর চাহিদার পরিবর্তন দেখা দেয়। (গ) ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তন ঘটে। (ঘ) বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন দেখা দেয়।

৩. এ ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটিতে গভীর পরিবর্তনের সামগ্রিক ফল হিসাবে চাহিদার প্রসার, বাজারের সম্প্রসারণ ও উপাদানসমূহের অধিকতর ব্যবহার দ্বারা মোট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় বাড়তে থাকে এবং দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি ঘটতে থাকে।

৫.৫. অর্থনীতিক পরিকল্পনা
Economic Planning

একটি পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্ধারিত হারে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে উপকরণসমূহের উপযুক্ত বণ্টন মারফত নির্দিষ্ট হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্ভব করার যে ব্যবস্থা, পদ্ধতি, কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়—এক কথায় তাকেই অর্থনীতিক পরিকল্পনা বলে।

৫.৬ অর্থনীতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ
Essential Factors of Economic Development

যে কোনো দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন তা হল:

১. **দেশজ শক্তিসমূহ:** দেশের জনসাধারণের মধ্যে **অর্থনীতিক উন্নয়নের সুতীব্র ইচ্ছা ও উদ্যোগ** থাকা চাই। কারণ, দেশের জনসাধারণের মধ্যে উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেজন্য ত্যাগ স্বীকারের এবং সব রকমের পরিবর্তনকে মেনে নেবার আগ্রহ দেখা না দিলে শুধু বাইরে থেকে চেষ্টার দ্বারা, অথবা উপর থেকে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চাপিয়ে দিলে তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

২. **বাজারের অসম্পূর্ণতা অপসারণ:** স্বল্পোন্নত দেশে পণ্য ও উপাদানের চাহিদায়, যোগানে, ব্যবহারে ও বণ্টনে এমন কতকগুলি অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা থাকে, যেগুলি **অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে বাধা** সৃষ্টি করে। এই **বাধাগুলি দূর না হলে উন্নয়ন সম্ভব হয় না।** এই কারণে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিলোপসাধন, বাজারসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে বেসরকারী একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, পুঁজির বাজারের সম্প্রসারণ, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এ সব

ব্যবস্থা নিলে বাজারের অসংগতি দূর হবে, দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হবে।

৩. **পুঁজিগঠন : একমাত্র পুঁজিগঠনের স্বারাই স্বল্পোন্নতির পাপচক্র ভাঙা সম্ভব।** পুঁজিগঠনের তিনটি স্তর। প্রথম স্তর, সঞ্চয়ের সৃষ্টি। দ্বিতীয় স্তর, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান স্বারা ঐ সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগকারীর নিকট উপস্থিত করা। তৃতীয় স্তর, বিনিয়োগকারীদের স্বারা ঐ সঞ্চিত ও সংগৃহীত অর্থ ঋণ নিয়ে দ্রব্য-পুঁজিতে রূপান্তরিতকরণ, অর্থাৎ বিনিয়োগ।

৪. **প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পকৌশলের উন্নতি :** প্রযুক্তি-বিদ্যার অভাব, কারিগরী দক্ষতার অভাব, শ্রমের ভৌগোলিক সচলতার অভাব, ব্যবস্থাপনার ও তদারকী জ্ঞানের এবং শিল্পকৌশলের অভাবে স্বল্পোন্নত দেশে আর্থিক পুঁজি দ্রব্য-পুঁজিতে পরিণত হতে পারে না। সুতরাং পুঁজিগঠনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাধাগুলি দূর করার ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

৫. **দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন :** জনসাধারণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় মনোভাবও দেশে পুঁজির বিনিয়োগ ও উন্নয়নের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। দেশের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেরণা অর্থনৈতিক উপাদানের মতই উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মত দেশে পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি **সামাজিক কাঠামো ও মনোভাবের পরিবর্তনও** প্রয়োজন।

৬. **উদ্যোগ :** পশ্চিমী অগ্রসর দেশসমূহে উন্নয়নের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিগত উদ্যোগই উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে বর্তমান-কালে নানাবিধ ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সংখ্যায় ও সামর্থ্যে অর্থাৎ, পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়ে দেশীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এসব দেশে দুর্বল। এইজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকেই এ সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হয়। এ ছাড়া, ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির চাহিদা মেটানো ব্যক্তিগত উদ্যোগের পক্ষে কঠিন। এ কারণেই **স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়, উভয় প্রকার উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব থাকা বিশেষ প্রয়োজন।**

৫.৭. উন্নয়নের চাহিদা
The Demand for Development

১ স্বল্পোন্নত দেশগুলি সাধারণভাবেই দরিদ্র, কোথাও কোথাও খুবই দরিদ্র। কিন্তু তাদের এই দারিদ্র্য কোনো নতুন ঘটনা নয়। অনেক অর্থনীতিবিদ অবশ্য এ ধরনের একটা মত পোষণ করেন যে, উন্নত ও অগ্রসর দেশগুলির শিল্পোন্নয়ন বহু ক্ষেত্রেই দরিদ্র দেশগুলির জীবন-যাত্রার মানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। গুন্নার মিরডাল এ বক্তব্যের সমর্থক। তিনি বলেন উন্নত দেশগুলির শিল্পায়নের অন্তত একটা কুফল (হয়ত সেটা অপ্রত্যক্ষ) এই হয়েছে যে, দরিদ্র দেশ-গুলি উন্নত দেশগুলির শক্তিশালী শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় একেবারেই দাঁড়াতে পারেনি। তাদের বহু শিল্পই ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া, ইতিহাসে এমন বহু নজির আছে যে উন্নত দেশগুলি তাদের দেশের শিল্পগুলির স্বার্থে তাদেরই অধীন উপনিবেশগুলিতে নতুন শিল্প গড়ে ওঠার পথে নানাভাবে বাধা দিয়েছে। এমনকি ঐ সব দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকেও ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেছে।

২. এ থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির দারিদ্র্যের ব্যাপারটা নতুন কোনো ঘটনা বা একটা নতুন আবিষ্কারও নয়। তবে সব দেশে একটা জিনিস অবশ্যই নতুন। সেটি হল, তারা যে দরিদ্র এ বিষয়ে আজ তারা সচেতন হয়েছে। আর যে বিষয়টি নতুন তা হল তাদের মধ্যে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে 'একটা কিছু করতেই হবে' এ ধরনের একটা দৃঢ় মনোভাবের সৃষ্টি। নতুন এই চেতনা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প গ্রহণের পিছনে পশ্চিমী দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি ও বিস্ময়কর সাফল্যের উদাহরণ অবশ্যই রয়েছে। এটা একটা আন্তর্জাতিক 'প্রদর্শন প্রভাব' (demonstration effect)-এর ফল।

৩. গত ৩০।৪০ বছর ধরে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দ্রুত উন্নয়নের চাহিদা ক্রমশই ব্যাপক ও তীব্র হয়েছে। তাতে কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, পশ্চিমী দেশগুলিতে নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা (social security) ও জনকল্যাণমূলক (welfare) ব্যবস্থার সাফল্য দেখে তার অনুকরণে বহু স্বল্পোন্নত দেশ সেগুলি প্রবর্তন করেছে বা করবার চেষ্টা করছে।

এ ব্যাপারে যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হল, পশ্চিমী দেশগুলি উন্নয়নের পথে বহুদূর অগ্রসর হবার পর অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শেষের দিকে এ সব নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছিল। অর্থাৎ, এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত সম্বল ও শক্তি ঐ দেশগুলি অর্জন করেছিল উন্নয়নের শেষের দিকে। বিকাশমান স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, উপযুক্ত সম্বল ও শক্তি সংগ্রহ না করেই এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গেলে হিতে বিপরীত হবারই সম্ভাবনা। কারণ, যে সম্বল ব্যবহারে উন্নয়নে দ্রুতগতি ও স্থায়িত্ব আনা যেতে পারত, সে সম্বল ঐ সব ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্যয়িত হয়ে গেলে দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে বাধ্য। দরিদ্র দেশের পক্ষে তাই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু ওই ধরনের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আবার উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে জনজীবনে আগ্রহ সৃষ্টি করাও কঠিন হয়।

৪. পরিশেষে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকাশক্তি হল উন্নয়নের জন্য দেশবাসীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও জাগ্রত চেতনা। এ শক্তিই স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে তাদের দারিদ্র্যের পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে উন্নয়নের পথে সঞ্চালিত করতে পারে।

৫.৮. উন্নয়নের পথে বাধা
Obstacles to Development

১. আধুনিক কালের স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল, তাদের উন্নয়নের পথে বাধাও তেমনি অনেক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তখনকার উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করার সময় যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল, আধুনিক কালের উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের পথে বাধা তার তুলনায় কম তো নয়ই, বরং বেশি। নিচে এরকম কয়েকটি বিশেষ ধরনের বাধা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

২. **দেশের প্রয়োজনের সাথে পশ্চিমী প্রযুক্তিবিদ্যা খাপ খাইয়ে নেবার অসুবিধা :** বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে উন্নত পশ্চিমী প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করা হয়, সে প্রযুক্তিবিদ্যা কোনোমতেই স্বল্পোন্নত দেশের উপযোগী নয়। কারণ পশ্চিমী দেশগুলির বিশেষ অবস্থায় বিশেষ লক্ষ্য পূরণের জন্য ঐ সব দেশের উপযোগী প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব হয়। ঐ প্রযুক্তিবিদ্যায় (তুলনামূলকভাবে) কম শ্রমিক ও (তুলনামূলকভাবে) বেশি পুঁজি ব্যবহৃত হয়। সে প্রযুক্তিবিদ্যার সফল প্রয়োগের জন্য দরকার হয় বহু সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক ও উন্নত উৎপাদন কৌশলে শিক্ষণপ্রাপ্ত বিরাট কর্মীবাহিনী। পশ্চিমী দেশে ঐ সময় এগুলি সবই বর্তমান ছিল। তাই এই প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে তারা সফল হয়েছে। এ ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুপযোগী। তার কারণ : (১) এ সব দেশে শ্রমের যোগান সুপ্রচুর, (২) পুঁজির যোগান খুবই সীমাবদ্ধ, এবং (৩) দক্ষ শ্রমিক ও পরিচালন কর্মীর একান্ত অভাব। এ অবস্থায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে একশ বছর আগেকার পশ্চিমী প্রযুক্তিবিদ্যা যেমন অনুপযোগী, তেমনি অনুপযুক্ত সর্বাধুনিক অত্যুন্নত পশ্চিমী প্রযুক্তিবিদ্যা। স্বল্পোন্নত দেশের জন্য চাই অন্য ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা—যে প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিক উৎপাদন কৌশল স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিশেষ অবস্থার সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। বলা যায়, এটা হবে একটা 'তৃতীয় ধরনের' প্রযুক্তিবিদ্যা। ঠিক এই ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন ও প্রয়োগের চেষ্টা না করে স্বল্পোন্নত দেশগুলি যদি নির্বিচারে সর্বাধুনিক উন্নত পশ্চিমী উৎপাদন কৌশল আমদানি করে এবং সেটা অর্থনীতিতে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করে তবে তাতে যে বিশেষ সুবিধা হবে না সেটা ভারত সহ বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যাচ্ছে।

৩. **শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতির অভাব :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি অনেক আগে থেকেই বেশ ভালভাবেই তৈরী হয়ে উঠেছিল। স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি না থাকার অর্থ হল : (১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ করার আগে ইউরোপের দেশগুলির যে অবস্থা ছিল আধুনিক কালের স্বল্পোন্নত দেশগুলি তার থেকে অনেক বেশি দরিদ্র। (২) কৃষি ও বাণিজ্যক্ষেত্রগুলির এখনও এমন অগ্রগতি হয়নি যাতে এ সব দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া এ ক্ষেত্রগুলির মাধ্যমে নিজের শক্তিতেই সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। (৩) এ সব দেশের প্রচলিত ধ্যানধারণা, প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সমর্থ হয়নি।

অর্থনীতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল, আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিয়মিতভাবে ও নিষ্ঠা-সহকারে কঠোর শ্রম করার আগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ সুফলের জন্য বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা। বেশির ভাগ স্বল্পোন্নত দেশেই এ পূর্বশর্তগুলি অনুপস্থিত।

৪. **জনসংখ্যার সমস্যা:** আধুনিক কালের স্বল্পোন্নত দেশগুলির জনসংখ্যার সমস্যা একশ বছর আগেকার বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার সমস্যা থেকে আলাদা ধরনের এবং অনেক বেশি গুরুতর। এখনকার যুগের মূল সমস্যা দুটি: ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমি ও অন্যান্য সম্পদের তুলনায় জনবসতির অতিঘনত্ব।

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল: এ সব দেশে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থার এতটা উন্নতি হয়েছে যে আগেকার অত্যধিক মৃত্যুহার অনেকটা কমেছে। জন্মহারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হলেও মৃত্যুহার কমে যাওয়ার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এ সব দেশে এমনিতেই পুঁজির তীব্র অভাব রয়েছে। জন-সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকলে [illegible] পুঁজি কিছুটা বাড়লেও মাথাপিছু পুঁজি বিশেষ বাড়ে না।

এমনিতেই এসব দেশে বসতির ঘনত্ব খুব বেশি। তার উপর জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফল হল বসতির ঘনত্বের আরো বৃদ্ধি, মাথাপিছু জমি ও সম্পদের পরিমাণ হ্রাস। পশ্চিমী দেশগুলিতে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়নের এক সহায়ক শক্তি ছিল। আধুনিক কালের স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে পুঁজির সীমা-বদ্ধতার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি 'উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি'র সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ প্রকাশ্য বা ছদ্ম-বেকারির অভিশাপ নিয়ে আসছে। উন্নয়নের গতি ব্যাহত হচ্ছে।

৫. **আন্তর্জাতিক পরিবেশ:** সবশেষে অনেক অর্থ-নীতিবিদের মত আধুনিক কালে সামগ্রিক আন্তর্জাতিক পরিবেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের পক্ষে একশ বছর আগেকার তুলনায় যেমন ভিন্ন তেমনি অনেক বেশি প্রতি কূলও বটে। আধুনিক যুগে উন্নত দেশগুলির বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা প্রতিবেশী দরিদ্র দেশে তাদের পুঁজি পাঠাতে খুব একটা আগ্রহী হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পুঁজি বিপুল পরিমাণে এবং অবাধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের কাজে এসেছিল। বিংশ শতাব্দীতে অতি সামান্য পুঁজিই উন্নত দেশ থেকে দরিদ্র দেশে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল বেসরকারী পুঁজি (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে) কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মতো উন্নত দেশেই বিনিয়োজিত হচ্ছে। যাদের অত্যধিক দরকার সেই সব স্বল্পোন্নত দেশে এই বেসরকারী পুঁজির খুব কম অংশই আসছে। শুধু তাই নয়, বৈদেশিক পুঁজি এমন নানা ধরনের শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চায় যা স্বল্পোন্নত দেশের স্বাধীন অর্থনীতিক বিকাশের অনুকূল নয়।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, বেসরকারী বিনিয়োগ সঙ্কুচিত হলেও সরকারী স্তরে উন্নত দেশ থেকে স্বল্পোন্নত দেশে সামান্য পরিমাণে পুঁজি সাহায্য আসছে। তার সাথে আসছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (যেমন IMF) থেকে। এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে যত দিন যাচ্ছে ততই নানান শর্তকণ্টকিত আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রকল্পগুলি সম্পর্কে স্বল্পোন্নত দেশগুলির আগের মত মোহ ও আগ্রহ থাকছে না।

৫.৯. ভারতে অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা
Problems of Development of the Indian Economy

১. ভারতের অনুন্নতি, দেশজোড়া দারিদ্র্য, জন-সাধারণের মধ্যে আয়, সম্পদ ও সুযোগের বণ্টনে গভীর বৈষম্য—এ সব দূর করার জন্য অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রয়োজন। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দুটি লক্ষ্য—(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি। (খ) অর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস। এই দুদিকেই দৃষ্টি রেখে ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার কথা পরিকল্পনা কমিশন বলেছে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে সুষম, সুশৃঙ্খল ও দ্রুত হারে উন্নয়নের পর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে এ ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সামনে যে সমস্যা রয়েছে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা হল।

২. **উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনীতিক সমস্যা:** সারা দেশ জুড়ে অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। ভারতের মত বিপুল জনবহুল বিরাট দেশের পক্ষে তো বটেই। অতএব এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য দীর্ঘকাল ধরে জাতিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

৩. জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন লাভের সমস্যা ঃ দীর্ঘকালীন ও দেশজোড়া অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত, স্বেচ্ছামূলক অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এ জন্য জনসাধারণের মধ্যে নতুন ভাবধারা গ্রহণের আগ্রহ ও সমাজচেতনা জাগিয়ে তোলা দরকার। উন্নয়নের অনুকূলে এই সমাজমানসের সৃষ্টি হলে তবে তা সমাজের ভিতর থেকে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অফুরন্ত শক্তি জোগাতে পারে। এ মনোভাব উন্নয়নের সাফল্যের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। জনমনে এই প্রগতিশীল সমাজচেতনা সৃষ্টি কিভাবে করা যায় তা উন্নয়নের একটি প্রধান সমস্যা।

৪. প্রতিষ্ঠানগত ও সংগঠনগত পরিবর্তন সাধনের সমস্যা ঃ প্রতিষ্ঠানগত ও সংগঠনগত পরিবর্তন সাধন হল উন্নয়নের আর একটি সমস্যা। অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে সমাজে বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। তদনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে মানুষে মানুষে উৎপাদন-সম্পর্ক, সামাজিক সম্বন্ধ ও উৎপাদন সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে তা সমাজের মানুষের মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে সমাজের প্রয়োজন যখন পরিবর্তিত হয়েছে তখন নতুন প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক, সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন গড়ে উঠেছে। ভারতের উন্নয়নের পটভূমিকায় আজ অতীতের পুরাতন সমাজ-সম্বন্ধ ভেঙে মানুষে মানুষে নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক, নতুন সামাজিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রতিভার বিকাশ ও শ্রমের সচলতা বৃদ্ধির বাধা পুরাতন বর্ণভেদ প্রথা ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার পরিবর্তে নতুন সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তে প্রকৃত ভূমি-সংস্কার ও স্বেচ্ছানির্ভর সমবায় জোতের সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। **এ ধরনের নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি ও সংগঠন গড়ে তোলা ছাড়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক আধুনিক যন্ত্রকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরী-বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব নয়।**

৫. আধুনিক কারিগরী কলাকৌশল প্রয়োগের সমস্যা ঃ মানুষের দুঃখকষ্ট ও অভাব দূর করার কাজে আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা খুব বেশি পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগে, কারিগরী কৌশলের ব্যবহারে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ কখনই উচিত হবে না। দেশের প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যের সাথে তার সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।

৬. দ্রুত হারে পুঁজি গঠনের সমস্যা ঃ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি। যে কোনো দেশের উৎপাদনশীলতা চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঃ

(১) মাথাপিছু জমির পরিমাণ অর্থাৎ **জমি ও মানুষের অনুপাত**, (২) দেশে যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, কারখানা বাড়ি, কলকারখানা, সংসরণ ও সেচের সুবিধা প্রভৃতি **উৎপাদনের উপায়সমূহের** (অর্থাৎ পুঁজি দ্রব্যাদির) **পরিমাণ**, (৩) **কারিগরী দক্ষতা**, ৪) **শ্রমিকদের মনোভাব**।

অবশ্য, নিহক মাথাপিছু জমির পরিমাণ দ্বারা উৎপাদন ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা নির্দিষ্ট হয় না। কারণ, পুঁজির ব্যবহার বাড়িয়ে এবং উন্নত আধুনিক উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।

জাতীয় আয়ের যত বেশি অংশ পুঁজি গঠনে নিয়োগ করা হবে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ততই বাড়বে। অর্থনীতিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে। ভারতে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়ছে। সুতরাং, বিরাট জনসংখ্যা যাতে উন্নয়নের ফলভোগ করতে পারে তার জন্য উচ্চতর হারে পুঁজি গঠন প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে দেখা গেছে যে, জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ১.২৫ শতাংশ হারে বাড়লে, দেশের মাথাপিছু আয়কে অন্তত স্থির রাখার জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের ৪.৫ শতাংশ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। ভারতেও প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময় এইরূপ হারেই বিনিয়োগ ঘটেছিল। ইংলণ্ডে ১৮৭০-১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় আয়ের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হারে পুঁজি গঠন ঘটেছিল এবং তাতে ঐ সময়ের জাতীয় আয় দেড়গুণ বেড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৯-১৯১৩ সালের মধ্যে তার চেয়ে আরও বেশি হারে পুঁজি গঠনের দ্বারা জাতীয় আয় পাঁচগুণ বেড়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯২৮-১৯৪০ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশের কিছু বেশি হারে পুঁজি গঠনের দ্বারা জাতীয় আয় বেড়েছিল প্রায় ১৩০ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায়, জাতীয়

আয় ও মাথাপিছু আয় অন্তত দ্বিগুণ করতে হলে অর্থাৎ, দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ২৫/৩০ বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপে বাড়াতে হলে, এখন প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করা অবশ্য প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন এবং সমস্যা হল কিভাবে এবং কোন্ অবস্থায় আমরা এটা সম্ভব করতে পারি।

৭. **সঞ্চয় বৃদ্ধির সমস্যা :** যে কোনো দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতটা পরিমাণে বিনিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে তা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি হল সমাজের **সঞ্চয়ের হার**। অপরটি হল, প্রত্যক্ষ **বিনিয়োগের উপযুক্ত অব্যবহৃত মানবশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ**। ভারতে দ্বিতীয়টি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। সেদিক থেকে বিচার করলে অব্যবহৃত শ্রমশক্তি ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এই দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুকূল। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা, কারিগরী দক্ষতা, পথ-ঘাট ও যানবাহনের উন্নতি, শক্তি-উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচের সম্প্রসারণ ইত্যাদির অভাবে অব্যবহৃত সম্পদ অবিলম্বে বিনিয়োগের অসুবিধা রয়েছে। সেজন্য, প্রাথমিক অবস্থায় সঞ্চয়বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে উপায় নেই। তাই বর্তমান আয় থেকে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির দ্বারা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো আমাদের আশু কর্তব্য।

৮. **রাষ্ট্রের যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের সমস্যা :** অর্থনীতিক উন্নয়নের সাফল্যের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত হল রাষ্ট্রের উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ। দ্রুত পুঁজিগঠন পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, নতুন উৎপাদন-কৌশলের প্রচলন, জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, সামাজিক শক্তিসমূহ ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস—এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। এজন্য শিল্পক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রসার দরকার তেমনি প্রয়োজন নানাক্ষেত্রে উন্নয়নের সহায়ক নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সরকারী আয়-ব্যয় নীতির বা ফিসক্যাল পলিসিরও উপযুক্ত পরিবর্তন। রাষ্ট্রের যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের সমস্যা অন্যান্য সমস্যা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৯. **প্রশাসনিক সমস্যা :** স্বল্পোন্নত দেশের প্রশাসনিক যন্ত্র সাধারণত পুরাতন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে সৃষ্ট একটি অচলায়তন বিশেষ। এইরূপ প্রশাসনিক যন্ত্র স্বাধীন দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়ক নয়। সুতরাং, ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে প্রশাসনিক যন্ত্রের গভীর সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সব স্তরের সরকারী কর্মচারীদের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপন ও সব স্তরের সরকারী কর্মচারীদের অধিকতর দায়িত্ব সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন প্রয়োজন। দ্রুত কর্তব্য সমাপনে সক্ষম, দুর্নীতিমুক্ত, জনসাধারণের আস্থাভাজন ও সহযোগিতা লাভে সক্ষম সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য।

১০. **বিদেশী পুঁজি, ঋণ ও সাহায্য :** স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজির অভাব রয়েছে। এজন্য বিদেশী পুঁজির প্রশ্ন ওঠে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে আমরা যেমন বিদেশী পুঁজির সাহায্যে অর্থনীতিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, তেমনি বিদেশী পুঁজির সাহায্য ছাড়া অর্থনীতিক উন্নয়নের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। প্রথমটির দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। আর দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীন। জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়া নিজ পুঁজির উপর নির্ভর করেই অর্থনীতিক উন্নতিলাভ করেছে। অবশ্য তাতে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় সে কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব করা যায়। তবে সম্পূর্ণ শর্তবিহীন না হলে বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণ করা বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ তাতে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা থাকে। আর অত্যধিক পরিমাণে বিদেশী পুঁজির ও সাহায্যের উপর নির্ভর করার বিপদ এই, ঋণদাতা দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শ ঋণগ্রহণকারী দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। এবং কোনো কারণে যদি বিদেশী ঋণ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায় তবে ঋণগ্রহণকারী দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। ইতোমধ্যেই এদেশে বিদেশী পুঁজির উপর অত্যধিক নির্ভরতার মারাত্মক কুফল দেখা দিয়েছে।

১১. **কর্মসৃষ্টির সমস্যা :** অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা আসলে কর্মসৃষ্টির সমস্যা। কারণ, মানবশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করার অক্ষমতাই অনুন্নতির কারণ। কিন্তু উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে কর্মসৃষ্টি সংক্রান্ত কোন্ নীতি গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই স্তরে দুটি প্রয়োজনই বর্তমান। প্রথমত, উন্নয়নকার্যে কর্মহীন

মানবশক্তির সর্বাধিক ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। তাতে কর্মসংস্থান বাড়বে। ঐ জন্য ব্যয় যথাসম্ভব অল্প রাখতে হবে। সুতরাং, প্রথম অবস্থায় বেশি মজুরিতে নিয়োগ বৃদ্ধির প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের প্রকৃত আয় যাতে বাড়ে সেজন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এটা অবশ্য নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে দেশে পুঁজিগঠনের হার ও প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির উপর। এবং সে কারণে এটা সময়সাপেক্ষ।

১২. প্রযুক্তিবিদ্যাগত সমস্যা ঃ এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, শ্রমের দক্ষতা বাড়াতে গেলে বেশি পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করতে হয়। আবার বেশি পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করলে অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমিকের দ্বারাই উৎপাদন করা চলে। সেজন্য পুঁজি-প্রগাঢ় পদ্ধতি ব্যবহার অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কর্মসংস্থান করা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার এর দ্বারাই সব ক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দেশের কর্মসংস্থানের স্তর ক্রমশ উন্নত হয় ও দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটে। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় বেশি পরিমাণে কর্মসৃষ্টি করতে হলে উৎপাদনের এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক যাতে অল্প পুঁজি ব্যবহৃত হয় (**শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি**)। কিন্তু অল্প পুঁজি ব্যবহার করা হলে শ্রমের দক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ান যায় না। সুতরাং যদিও আমাদের লক্ষ্য—অধিক কর্মসংস্থান এবং অধিক দক্ষতা, তথাপি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে এই দু'টি লক্ষ্যের মধ্যে যে বিরোধ আছে তা বুঝতে হবে এবং এর সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

৫.১০ উন্নয়নের সম্ভাব্য মাত্রা

The Scale of Possible Development

১. একদিকে দ্রুত উন্নয়নের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে উন্নয়নের পথে বহু বাধা—এ দু'য়ের ফলে বহু স্বল্পোন্নত দেশে দারুণ সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, স্বল্পোন্নত দেশগুলির এ আকাঙ্ক্ষা কি সত্যই পূর্ণ হওয়া সম্ভব? উন্নত দেশগুলির সাথে স্বল্পোন্নত দেশগুলির যে ব্যবধান তা সম্পূর্ণ দূর করা বা সঙ্কুচিত করে আনা কি এসব দেশের পক্ষে সম্ভব? স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রকৃত উন্নয়ন ভবিষ্যতে কত দূর অবধি হতে পারে? বস্তুতপক্ষে, এসব প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া কঠিন।

২. তবে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে কয়েকটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যায়। একটি অভিজ্ঞতা হল আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এমন বহু দিকে ও বহুভাবে কাজ করে যে সাধারণভাবে সেগুলি সম্পর্কে আগে থেকে কোনো কিছু ভাবা সম্ভব হয় না। জাপানের একশ' বছরের উন্নয়নের ইতিহাস এ অভিজ্ঞতার কথাই বলে। সাম্প্রতিক কালে বহু স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের গতিবেগ ক্রমাগত বেড়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের (**The Commission on International Development**) ১৯৬০ সালের এক হিসাব থেকে দেখা যায়, স্বল্পোন্নত দেশগুলির (বাৎসরিক) মোট জাতীয় উৎপন্ন (**Gross National Product**) গড়ে ৫ শতাংশ হারে এবং মাথাপিছু উৎপাদন গড়ে ২'৫ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে। উন্নয়নের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হারও এ রকমই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের হার যা ছিল তার তুলনায় বর্তমান যুগের উন্নয়নের হার খুবই ভাল এ কথা বলা চলে।

৩. দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হল, স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও অগ্রগতি হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা যায়। যে 'তৃতীয়' প্রযুক্তিবিদ্যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি সন্দেহাতীতভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হতে শুরু করেছে। **'সবুজ বিপ্লব'** (**Green Revolution**) ঠিক এ ধরনেরই একটা **'তৃতীয়' প্রযুক্তিবিদ্যার উদাহরণ**। স্বল্পোন্নত দেশগুলির জলবায়ু ও মৃত্তিকার গঠন-বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে উচ্চ-ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ (**HYV**) আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃষিতে তার ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে গম উৎপাদনে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। দশ বা পনেরো বছর আগেও এ ধরনের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবাই যেত না। এতে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়। তা হল, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে সঠিক প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবনের ক্ষমতা মানুষের এখনো শেষ হয়ে যায়নি। স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে এটা নিশ্চয়ই আশা ও আশ্বাসের কথা।

৪. তবে এটাই সব নয়। এর অন্ধকার দিকটির

কথাও উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল, ক্রমবর্ধমান হারে এসব দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। একথা অনস্বীকার্য যে ১৯৬০ সালের পরবর্তী দশ বছরে স্বল্পোন্নত দেশগুলি বেশ ভালোভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছে। তবে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এসব দেশের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার কমেছে। ঐ সময়ে কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি অব্যাহত থেকেছে। ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নত দেশগুলির মধ্যে আয়ের ব্যবধান কমিয়ে আনার যে আশা ১৯৬০-৭০ দশকে পোষণ করা হয়েছিল তা কার্যকর হয়নি, বরং ব্যবধান কিছুটা বেড়েছে। এ থেকে একটা বিষয় কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়ন হলেও একথা ঠিক যে, শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক উন্নয়নের সমান স্তরে এ দেশগুলির পৌঁছতে হয় দশক ত লাগবেই, এমনকি অনেক শতাব্দীও লেগে যেতে পারে। এর সাথে সম্পর্কিত আরো একটা বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। ইদানীং অনেক অর্থনীতিবিদেরই মনে আশংকা দেখা দিয়েছে যে, পৃথিবীর সব পিছিয়ে-পড়া দেশে শিল্পোন্নত পশ্চিমী ধরনের উন্নয়ন ঘটান হলে সে উন্নয়নের গতি সারা পৃথিবী জুড়ে সমানভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব কিনা।

৫. এ আশংকার কারণ হল প্রধানত দুটি : (ক) স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রায় দু'শ কোটি লোকের বাস। এরা দরিদ্র। এ সব দেশের উন্নয়ন যত এগোতে থাকবে, নানা ধরনের কাঁচামাল ও অর্থনীতিক সম্পদ ততই এসব দেশের মানুষের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকবে। সারা পৃথিবীর কাঁচামালের যোগান যদি সীমাবদ্ধ (অন্তত, স্বল্পকালীন বিচারে) ধরে নেওয়া হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের অত্যুন্নত অর্থনীতিকে স্ব-নির্ভরতার স্তরে টিকিয়ে রাখা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

(খ) অদ্যাবধি সারা পৃথিবীতে যতটুকু উন্নয়ন ঘটেছে (উন্নত দেশগুলিতে খুব বেশি, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অবশ্যই কম বা নগণ্য) তাতেই পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডল ভীষণভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। এর উপর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এ দূষণ যে কি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবে তা অকল্পনীয়। সে অবস্থায় উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অস্তিত্বই টিকে থাকবে কিনা সেটাই অনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

৬. তা হলে কি স্বল্পোন্নত দেশগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কোনো আশা নেই? তারা কি চিরকালই পশ্চাৎপদ অবস্থায় থেকে যাবে? না, শত অসুবিধা সত্ত্বেও এসব দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এতটা হতাশাব্যঞ্জক নয়। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, এদের উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে না, যাবে না। তবে বাস্তব অবস্থার বিচারে এদের উন্নয়নের লক্ষ্যের কিছুটা অদলবদল করে নিতে হবে। যে চরম দারিদ্র্য মানুষের সমস্ত মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়—সে দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে দূর করে নতুন সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনিবার্যভাবে পশ্চিমী দেশগুলির সমকক্ষ হতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকেই খুব সঙ্গত ও স্বাভাবিকভাবে এ দাবি, এ আকাঙ্ক্ষা, এ লক্ষ্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর কিছু না হোক, অন্তত নৈতিক দিক থেকেও এ লক্ষ্য অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কারণ আধুনিক সভ্য সমাজ গঠনের জন্য এ দাবি ও লক্ষ্য নিঃসন্দেহে ন্যূনতম।

৭. কিন্তু, সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করলে একটা বড় প্রশ্ন মনে জাগে। সেটি হল, আগামী এক শতাব্দী ধরে চেষ্টা করেও আধুনিক যুগের স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হবে কি? এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ আছে। তবে এতটা অগ্রগতি এদের পক্ষে সম্ভব না হলেও কয়েকটা লক্ষ্য পূরণের জন্য এরা চেষ্টা করতে পারে। এবং সেখানে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। স্বল্পোন্নত দেশগুলির এই মুহূর্তের সব থেকে বড় প্রয়োজন হল, এসব দেশের শিশুরা যাতে খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে না মরে সেটা সুনিশ্চিত করা। সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্য, আরাম ও অবসরের ন্যূনতম ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, যাতে তারা উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক শান্তি নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে এ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব।

৫.১১. তিনটি মৌল বিষয়
Three Key Issues

১. এখন প্রশ্ন হল, একটি স্বল্পোন্নত দেশ কিভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে? কিভাবে দেশটি অগ্রগতির পথের বাধাগুলিকে অতিক্রম করবে?

২. সাধারণভাবে বলা যায়, সব স্বল্পোন্নত দেশেরই উন্নয়নের ব্যাপারে মূল বিষয় তিনটি। সেগুলি হল,

(ক) পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি, (খ) 'ভারসাম্যবিশিষ্ট' (balanced) বনাম 'ভারসাম্যহীন' (unbalanced) উন্নয়ন, (গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে চলা।

এখানে এ বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা করা হল।

(ক) **পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি** (Raising the rate of investment)**ঃ** স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম সমস্যা হল কিভাবে বিনিয়োগ বাড়ান যায়। স্বল্পোন্নত দেশ সাধারণত দরিদ্র দেশ ; সে দেশের পুঁজিও অপ্রচুর। অথচ বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে না পারলে অর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় করা চাই। সঞ্চয় হল একটা উদ্বৃত্ত। এ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় আয় অপেক্ষা ব্যয় কমিয়ে। বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে ব্যক্তি তথা সমাজ এ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে। ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে সঞ্চয়ের সৃষ্টি। যে সম্বল বিনিয়োজিত হল সেটা বর্তমান ভোগে লাগান হল না। বিনিয়োগ যত বেশি হবে বর্তমান ভোগের পরিমাণও তত কমাতে থাকবে। এর অর্থ হল, বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টাটা হল আসলে একটা বোঝা বা ভার মাথায় নেওয়া। এ বোঝা বহনে বেদনা আছে, কষ্ট আছে। একটা স্তর পর্যন্ত হয়ত এ ভার বহন করা যায়, কিন্তু সে স্তর পেরিয়ে গেলে এ ভার বহন করা সাধ্যের অতীত হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়। ভার গুরুতর হলে সেটা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। করভার বেশি হলে শ্রমিকের আয় কমে যাবে, তাতে যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করা হয়ত তার পক্ষে সম্ভব হবে না, ফলে তার কর্মক্ষমতা কমবে। কর্মের স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া তাতে ব্যাহত হতে পারে।

এ সব সত্ত্বেও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কয়েকটা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

(১) দেশে যদি উদ্বৃত্ত শ্রমিক থাকে তবে সেই **উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়।** স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে বিরাট সঞ্চয়-সম্ভাবনা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বিশেষ করে **গ্রামাঞ্চলে যে বিপুল পরিমাণ প্রচ্ছন্ন বেকারী বা স্বল্পনিযুক্তি রয়েছে তাকে বিরাট বোঝা বলে গণ্য না করে পুঁজি-সৃষ্টির উৎসে পরিণত করা যায়।** এ সব শ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে কম মজুরিতে কাজ করান সম্ভব বলে শিল্পে ভাল মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। ঐ মুনাফার একটা বড় অংশ পুনরায় বিনিয়োগ করে শিল্পপ্রসারে সাহায্য করতে অসুবিধা না হতেও পারে। অর্থাৎ পূর্ণ বেকার বা প্রচ্ছন্ন বেকারদের গ্রামীণক্ষেত্রে পুঁজিগঠনে বা নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এ কাজগুলি হল, রাস্তাঘাট তৈরী, সেচখাল বা কূপ খনন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি।

এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুবিধা হল, এতে খরচ কম পড়ে। যে সম্বল অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকতো তার সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। তবে এ পদ্ধতির বাস্তব রূপায়ণ শক্ত কাজ। দেশে কৃষির উৎপাদন যদি যথেষ্ট না হয় তবে শিল্পক্ষেত্রের জন্য কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া শক্ত হবে। তা ছাড়া, গ্রামীণ শ্রমিকদের সচল করা, তাদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়ে বিভিন্ন কর্ম-প্রকল্পে যুক্ত করা বেশ কঠিন কাজ। অন্য সমস্যাও আছে। তারা যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের চাই যন্ত্রপাতি, আর চাই অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালক ও সংগঠন। এ দুটির যোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম হতে পারে। ফলে শ্রমিক পাওয়া গেলেও উৎপাদনের কাজে তাদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব নাও হতে পারে। তাই সমস্যা হল, উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার যথাযথ ব্যবহার।

(২) **সরকারের চলতি রাজস্ব থেকে যদি কোনো উদ্বৃত্ত** (revenue surplus) **পাওয়া যায় তবে সেটা পুঁজিগঠনের কাজে লাগান যায়।** সরকারী বাজেটে চলতি খাতে ব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-আয় সৃষ্টি করা যায় করের দ্বারা। স্বল্পোন্নত দেশের বাজেটে বাস্তব-উদ্বৃত্ত (actual surplus) সাধারণত কমই হয়। কিন্তু তার সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের (potential surplus) পরিমাণ অবশ্যই কম নয়। সম্ভাব্য-উদ্বৃত্তকে বিনিয়োগের কাজে লাগাতে হলে সরকারকে কর বসিয়েই তা করতে হয়। সুতরাং, স্বল্পোন্নত দেশে কর ধার্য করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দুটি। প্রথমটি হল, করের মাধ্যমে বাস্তব-উদ্বৃত্তের সবটুকু ত বটেই এমন কি সম্ভাব্য উদ্বৃত্তেরও সবটুকু সংগ্রহ করে নিতে হবে। এ জন্য সম্ভাব্য-উদ্বৃত্তের সমস্ত গোপন উৎসের সন্ধান করতে হবে। [এ প্রসঙ্গে ভারত সম্পর্কে অধ্যাপক পল ব্যারানের মন্তব্য স্মর্তব্য। ভারতের ক্ষেত্রে তিনি সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের দুটি গোপন উৎসের উল্লেখ করেছিলেন। তার একটি হল, উচ্চ আয়-বিশিষ্ট মানুষের অত্যধিক ভোগ ব্যয় ; অন্যটি হল, জমিদার, মহাজন, বণিক, কমিশন এজেন্ট, প্রয়োজনাতিরিক্ত আইনজীবী, সরকারী আমলা, বিজ্ঞাপনী এজেন্ট

ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল কর্মী যারা জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশে ভাগ বসায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের আয়ের উপর চড়া আয়করের মারফত অত্যধিক ভোগব্যয় বন্ধ করে ওই উদ্বৃত্ত আয় অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন। আর দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিদের সামাজিকভাবে উপযোগী ও উৎপাদনশীল কাজে স্থানান্তরিত করা দরকার।

করের হার বাড়িয়ে সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগের কাজে লাগান যায়। ঐ অর্থ প্রয়োজন মত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (private sector) শিল্পায়নের কাজে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **সোবিয়েত রাশিয়া একই পণ্য যতবার কেনাবেচা হয় ততবারই তার উপর উচ্চহারে কর বসিয়ে পুঁজি গঠন করেছে। জাপানও শিল্পায়নের প্রথম যুগে উচ্চহারে ভূমিকর বসিয়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের কাজে লাগিয়েছিল।**

স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজিগঠনের জন্য **উচ্চহারে কর** বসাতে হবে এ কথা ঠিক। তবে এভাবে **কর বসানর কিছু কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে।** অতিরিক্ত করভার উৎসাহ ও উদ্যমকে দমিয়ে দিতে পারে। সঞ্চয় সৃষ্টিতেও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। একজন সফল উদ্যোক্তার আয়ের উপর উচ্চহারে কর বসানো হলেও সেটাকে সাফল্যের পুরস্কারের বদলে শাস্তি বলে মনে হতে পারে। উপরন্তু, কৃষিপ্রধান দেশে কর সংগ্রহের অসুবিধা অনেক। এ সব দেশে উৎপাদনের বড় একটা অংশ বাজারে আসে না, ফলে ঐ অংশের উপর কর ধার্য করা সম্ভব হয় না।

(৩) **বিনিয়োগ বৃদ্ধির আর একটি উৎস হল মুদ্রাস্ফীতি।** অনেক সময় স্বল্পোন্নত দেশের সরকার কর বৃদ্ধির অসুবিধার সম্মুখীন হতে চায় না। তাই তারা কর বৃদ্ধির পথে না গিয়ে মুদ্রাস্ফীতির পথে যায়। ঘাটতি ব্যয় নীতি অর্থাৎ নতুন অর্থ সৃষ্টি করে সরকার তার ব্যয় নির্বাহ করে এবং বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। এতে সমাজের মোট ব্যয় বাড়ে, দামস্তর বাড়ে। ফলে ক্রেতার আসল ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, কারণ দামস্তর যখন বাড়তে থাকে মুদ্রার মূল্যও বিপরীত অনুপাতে কমতে থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর ভোগের পরিমাণও কমে যায়। পদ্ধতি হিসাবে এর প্রয়োগ সহজ। এতে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। কারণ দামস্তর বাড়তে থাকলে মুনাফার পরিমাণও বাড়ার সুযোগ পায়, বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হয়। অর্থনীতি ঊর্ধ্বমুখী হয়। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে সামান্য পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়ক। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় 'সামান্য' মুদ্রাস্ফীতি সামান্য না থেকে বিরাট মুদ্রাস্ফীতির আকার ধারণ করতে পারে। পৃথিবীর বহু স্বল্পোন্নত কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে এ বিপদ মাথা তুলেছে। লাতিন আমেরিকার বলিভিয়াতে ১৯৫৩-৫৮ সালের মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয় ২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রেজিলে ১৯৫৮-৬৩ সালের মধ্যে দামস্তর প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে। চিলিতে ষাটের দশকে মুদ্রাস্ফীতি বাৎসরিক ২০ থেকে ৪০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ঐ সব দেশের মত এতটা তীব্র না হলেও ভারতে দামস্তর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রায় ৯ গুণ এবং ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪ গুণেরও বেশি হয়েছে।

বড় আকারের মুদ্রাস্ফীতি যে অর্থনীতির পক্ষে বিপজ্জনক সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। মুদ্রাস্ফীতি তীব্র হলে দেশে পুঁজি গঠন ব্যাহত হয়। উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত না হয়ে সমাজের সম্পদ চোরাকারবার, ফাটকা প্রভৃতির মত অর্থনীতির দিক থেকে হানিকর কাজে ব্যবহৃত হয়। দেশের দামস্তর খুব বেশি হলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। রপ্তানির পরিমাণ কমে যেতে পারে, ফলে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনও কমে যাবার সম্ভাবনা। ফলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কলকব্জা ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করতে দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

উপরে বর্ণিত পুঁজি গঠনের প্রতিটি পদ্ধতিরই যেমন সুবিধা আছে, তেমনি কিছু কিছু অসুবিধাও রয়েছে। সব কয়টি পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করলেও হয়ত দেখা যাবে বিনিয়োগের হার যথেষ্ট বাড়ছে না। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে যথেষ্ট পুঁজিগঠন সম্ভব হচ্ছে না। এমন অবস্থায় বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা কঠিন।

(খ) **ভারসাম্যবিশিষ্ট বনাম ভারসাম্যহীন উন্নয়ন (Balanced vs. Unbalanced growth):** স্বল্পোন্নত দেশের সামনে আর একটি সমস্যা হল উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের ধাঁচ (pattern of investment) কি রকম হবে তা স্থির করা। এটা ঠিক করতে গিয়ে ঐ সব দেশকে প্রথমেই যে মূল প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হয় তা হল অর্থনীতিক উন্নয়ন কি ভারসাম্য-বিশিষ্ট হবে

না ভারসাম্যহীন হবে। **অধ্যাপক স্ক্যুম্পিটারের** অর্থনীতিক উন্নয়ন তত্ত্বের মূল কথা ছিল অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য চাই দেশের সমস্ত শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন এবং এ উন্নয়ন সব শিল্পে যতদূর সম্ভব এক সঙ্গেই হবে। **তাঁর মতে বাছাই-করা বিশেষ কয়েকটি শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। একযোগে সব শিল্পের ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন হলেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার হবে।** কারণ, তা হলে উন্নয়নশীল শিল্পগুলি সকলেই পরস্পরের দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরস্পরের উন্নয়নে সাহায্য করবে। ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সার কথা হল, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে পরস্পরের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন। **নার্ক্সে, লিউইস, অ্যালিন ইয়ং, রোডেনস্টাইন-রোডান এবং মেয়ার ও বাল্ডুইন** প্রমুখ অনেকেই ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নে সমর্থক। কিন্তু ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন কৌশলটি দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়ক কিংবা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উপযোগী নাও হতে পারে।

অন্যদিকে, **ভারসাম্যহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়,** প্রথমে উন্নয়ন হারটি অল্প হলেও পরে তা ক্রমশ দ্রুত বাড়তে পারে। ভারসাম্যহীন **উন্নয়নের মূল কথা হল, পুঁজিদ্রব্য শিল্প ও ভোগ্যপণ্য শিল্পের পারস্পরিক ভারসাম্যহীন** উন্নয়ন। ভোগ্যপণ্য শিল্পের তুলনায় পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের বণ্টনে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সোভিয়েত পরিকল্পনায় **সর্বপ্রথম** এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়েছিল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা নিখুঁত করা হয়েছে। এ পদ্ধতির সুবিধা এই যে, প্রথমে পুঁজিদ্রব্য শিল্পের উন্নয়নের অগ্রাধিকার দিয়ে তার মারফতে পরবর্তীকালে ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। অধ্যাপক **বেটেলহেইমের** কথায়, "ভোগের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের উপর।" তাছাড়া, ভারসাম্যহীন উন্নয়নে যে সব ভারী শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সেগুলিও পারস্পরিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনীতির সর্বাধিক উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হয়। তবে এ কৌশলের একটি বিপদ আছে। তা হল, বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অধিকাংশই পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বিনিয়োগ করার দরুন মুদ্রাস্ফীতি তীব্র হতে পারে। অবশ্য এ কৌশলটিকে কিছু **সংশোধন করে মুদ্রাস্ফীতির বিপদ কমিয়ে আনা যায়। সংশোধনের রূপ হবে—একই সময়ে শ্রম-প্রগাঢ় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিয়ে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাওয়া।** চীনদেশে এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, এর সাথে সাময়িকভাবে অন্তর্বর্তীকালে, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মারফৎ অত্যধিক ভোগ, বিশেষত জাঁকজমকপূর্ণ ভোগ নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হতে পারে। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা ও প্রবণতা যদি উপযুক্ত পরিমাণে সংযত রাখা যায়, তা হলে স্বল্পোন্নত দেশের দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে ভারসাম্যহীন উন্নয়ন কৌশলটি আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। তদনুযায়ী বিনিয়োগের গাঁচটিও নির্ধারিত হতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিয়োগযোগ্য সম্বলেরও বণ্টন করা যেতে পারে।

ভারী শিল্প বনাম হাল্কা শিল্প (Heavy industry vs. Light industry) : এ প্রসঙ্গে ভারী শিল্প বনাম হাল্কা শিল্পের বিতর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। **অনেকের মতে, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের গোড়ার দিকে হাল্কা শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।** সেই সময়ে বিদেশ থেকে ভারী শিল্পজাত দ্রব্যগুলি আমদানি করে প্রয়োজন মেটানো উচিত। কারণ, (১) হাল্কা শিল্পে পুঁজি কম লাগে। এ শিল্পের কাজে উপযোগী করে শ্রমিকদের সহজে সুশিক্ষিত করে তোলা যায়। প্রথমে হাল্কা শিল্পে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে, পরে ভারী শিল্প স্থাপিত হলে তা কাজে লাগবে। (২) হাল্কা শিল্পে বিনিয়োগের অল্প দিনের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হয় এবং অল্প বিনিয়োগে বেশি উৎপাদন করা যায়। (৩) উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে, ভারী শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিলে গুরুতর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। (৪) ভারী শিল্পের উন্নয়ন দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে বিরাট আঘাত দিতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে দেশের উপর একটা বড় সামাজিক খরচের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে।

অন্যদিকে ভারী শিল্পের উন্নয়নের প্রবক্তাদের মতে— (১) ভারী শিল্পের উন্নয়ন অল্পকালের মধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশকে উন্নত ও স্ব-নির্ভর করে তুলতে পারে। (২) প্রথম দিকে ভারী শিল্পের উন্নয়নের হার কম হলেও পরের দিকে এবং শেষ পর্যন্ত তা বেশি হয়। (৩) ভারী শিল্পের

উন্নয়নের উপর উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত করা হলে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অনেক মধ্যবর্তী স্তর এড়ানো যায় ও তাতে সময় সংক্ষেপ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ২৫ বৎসরে উন্নয়নের যে পথ অতিক্রম করেছে তা পার হতে পশ্চিমী দেশগুলির একশ বছরেরও বেশি লেগেছিল।

উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি বিচার করে এ মন্তব্য করা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-রচনায় কৌশল হিসাবে ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপের যুক্তিটি বেশি শক্তিশালী। কারণ, এতে দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান সম্ভব হয়। তবে এর দু'টি অসুবিধার কথা বলা দরকার। একটি হল স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজির স্বল্পতা, অপরটি হল মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা। অবশ্য, কষ্ট স্বীকার করে ভোগ কমিয়ে ও সঞ্চয় বাড়িয়ে পুঁজির যোগান বাড়ানো যেতে পারে। শ্রম-প্রগাঢ় ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়িয়ে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তে রাখা যেতে পারে।

বিনিয়োগ অগ্রাধিকারের রূপরেখা: ভারসাম্যহীন উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ-অগ্রাধিকার ও বিনিয়োগের ধাঁচ নির্দেশ করা যেতে পারে। ধরে নেওয়া যেতে পারে স্বল্পোন্নত দেশের সামনে মূল লক্ষ্য হল: কৃষির পুনর্গঠন, দ্রুত শিল্পায়ন, সর্বাধিক উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা।

প্রথম পর্যায়: স্বল্পোন্নত দেশে সাধারণত খাদ্যশস্যে ঘাটতি দেখা যায়। এসব দেশে কৃষি একদিকে যেমন শিল্পের কাঁচামাল যোগায়, তেমনি জনসাধারণের খাদ্যেরও যোগান দেয়। শিল্পসম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাই উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রথম পর্যায়ে কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। কৃষিতে বিনিয়োগ দু'রকমভাবে প্রয়োজন হয়: প্রথমত, সেচের জন্য নদীপ্রকল্প এবং মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্প সৃষ্টিতে; দ্বিতীয়ত, পতিত জমির পুনরুদ্ধারে। এই সঙ্গে কৃষির সাথে জড়িত কিছু ভারী শিল্পেও বিনিয়োগের দরকার হয়। ঐ শিল্পগুলির মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক সার, সেচ ও বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি, ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্মাণ শিল্প। পুঁজির স্বল্পতা সত্ত্বেও, প্রথম পর্যায়েই এগুলির উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ খুবই জরুরী। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে কেবল কৃষির পুনর্গঠনই নয়, ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের ভিত্তিও স্থাপন করা দরকার। এজন্য এ পর্যায়েই বিদ্যুৎ ও পরিবহণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। এদের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও ভোগ্যপণ্যের অভাব দূর করার জন্য শ্রম-প্রগাঢ় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। এরই সঙ্গে প্রয়োজন হল জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসগৃহ ইত্যাদি সামাজিক উপরি-ব্যবস্থাগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের বন্দোবস্ত করা।

দ্বিতীয় পর্যায়: প্রথম পর্যায়েই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবহণ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে ইস্পাত, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ভারী বৈদ্যুতিক, ভারী রাসায়নিক প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলিতে। কৃষির উপর প্রথম পর্যায়ে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সামাজিক উপরি-ব্যবস্থাগুলির জন্য বিনিয়োগও বাড়াতে হবে মানব শক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নও অব্যাহত রাখতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়: অর্থনৈতিক উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ে কৃষি ও ভারী এবং মূল শিল্পগুলির অগ্রাধিকার অব্যাহত রাখতে হবে। তবে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলটির পরিমাণ বাড়িয়ে ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। এ স্তরে এমন কিছু ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যারা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিযোগী নয়।

উপরে বর্ণিত এই তিনটি পর্যায়কে বলা যেতে পারে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তিস্থাপন, সংহতকরণ ও সম্প্রসারণের পর্যায়। এ তিনটি পর্যায় সফলভাবে রূপায়ণের দ্বারা অর্থনীতির উন্নয়নের স্বনির্ভর শক্তির সৃষ্টি হবে এবং তার দ্বারা ভবিষ্যৎ উন্নয়নের গতিবেগ আপনা থেকে ত্বরান্বিত হবে। অধ্যাপক বেটেলহেইমের মতে পরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বিনিয়োগের র‍্যাশনালাইজেশন ও আধুনিকীকরণের উপরও ধীরে ধীরে জোর দিতে হবে। বেকার সমস্যা দূর হবার পর র‍্যাশনালাইজেশন ও আধুনিকীকরণই হবে শ্রমের গড়পড়তা উৎপাদনশীলতা

বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। অধ্যাপক বেটেলহেইম আরো বলেছেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়া বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেলে নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল ও বৈজ্ঞানিক কারিগরী গবেষণার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শিল্প বনাম কৃষি (Industry versus Agriculture) ঃ এখানে বহু বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নের ধাঁচ কি হবে সে সম্পর্কে আলোচনায় উত্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়টি হল অর্থনীতিক উন্নয়নে শিল্পায়ন অগ্রাধিকার পাবে, না কৃষি অগ্রাধিকার পাবে। এ ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী মত আছে। একটি মত শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিতে চায়, তার মধ্যে শিল্পে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে এ মত কিছুটা উদাসীন। প্রচণ্ড শক্তি ও তীব্রতা নিয়ে শিল্পায়ন এগিয়ে গেলে এবং কৃষি অবহেলিত থাকলে তাতে অর্থনীতিক উন্নয়নের ভারসাম্য হারিয়ে যাবে—অর্থাৎ ভারসাম্যহীন উন্নয়নকেই **(unbalanced growth)** পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেওয়া হবে; এ মতের সমর্থকরা ঠিক এ ধরনের ভারসাম্যহীন উন্নয়নের পক্ষে।

আবার, অন্যদিকে কৃষির উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেবার পক্ষে মত পোষণ করেন অন্য একদল অর্থনীতিবিদ। তাঁদের মতে, দরকার হলে প্রথম দিকে শিল্পায়ন অপেক্ষা করুক; কিন্তু কৃষির অগ্রাধিকার চাই। এক্ষেত্রেও কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পায়নকে অবহেলার বস্তু করে রাখলে ভারসাম্য নষ্ট হবে—অন্য এক ধরনের ভারসাম্যহীন উন্নয়নের পথকে বেছে নেওয়া হবে। এ মতের সমর্থকরা এটা স্বীকার করেন এবং এটাকে অনুসরণ করার কথা বলেন।

শিল্পোন্নত বহু দেশের ইতিহাস থেকে দেখা যায় কৃষির উন্নয়ন ঐসব দেশের শিল্পায়নের প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আসলে কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পের দিক থেকে যত উন্নতই হোক না কেন, কোনো দেশই কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন না করে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত তা নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

কৃষি ও শিল্পায়নের পারস্পরিক সম্পর্কহীন বা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত শিল্পায়নের জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো অত্যাবশ্যক। কৃষি আধুনিকীকরণ না হলে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়নের গতিবেগ বাড়ে না; কারণ, কৃষি উন্নত না হলে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও তেমন বাড়ে না। অন্যদিকে শিল্পায়নের প্রসার না হলে কৃষিরও খুব বেশি উন্নতি সম্ভব হয় না। কারণ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের জন্য শিল্পায়ন প্রয়োজন। তা ছাড়া, কৃষির আধুনিকীকরণের ফলে কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে সরিয়ে নেবার জন্যও শিল্পায়নের প্রসার দরকার। স্বল্পকালীন দৃষ্টিতে কৃষি ও শিল্পকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়, কারণ একটিকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বেশি দিলে অপরটিকে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মেলাতে হয়ত টান পড়ে। কিন্তু দীর্ঘকালীন বিচারে এরা পরস্পরের পরিপূরক।

(গ) **জনসংখ্যা নীতি (Population policy) ঃ** স্বল্পোন্নত দেশের বহু সমস্যার মধ্যে একটি হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। এসব দেশের অনেকগুলিতেই (বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলিতে) বিপুল জনসংখ্যা অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এমনিতেই যে জনসংখ্যা রয়েছে তা বিরাট। তার সাথে প্রতি বৎসর যুক্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নবজাত শিশু। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি অর্থনীতিক উন্নতির গতিবেগ বিশেষভাবেই কমিয়ে দেয়। এরকম হবার কয়েকটি কারণও আছে।

(১) ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির অধিকাংশই অল্পবয়স্ক। এরা শ্রমের যোগান বাড়াচ্ছে না কিন্তু দেশে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়াচ্ছে। সুতরাং দেশের আয়ের যে অংশ সঞ্চিত হয়ে পুঁজিগঠনে লাগতে পারত, তা সরাসরি অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভোগের জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগের হার যথেষ্ট বাড়ানো যায় না।

(২) এসব দেশে বর্ধিত জনসংখ্যায় তীব্র চাপ প্রধানত কৃষিজমির উপরেই পড়ে, কারণ এসব দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী ও কৃষিক্ষেত্রের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বাড়তে থাকে।

(৩) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হয় বলে শিল্পসমূহের জন্য

যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদন করা যায় না।

এ অবস্থায় প্রশ্ন হল, এ সব দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে চাইছে তারা তাদের বিশাল জনসংখ্যার সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী করবে?

এর উত্তরে বলা যায়, মোটামুটি **দু'টি পদ্ধতির** সাহায্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলি এ সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে পারে।

(ক) এসব দেশে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাকে মেনে নিয়ে অর্থাৎ বৃদ্ধির হার হ্রাস করার কোন চেষ্টা না করে সেই বৃদ্ধির কুফলগুলিকে কিভাবে লাঘব করা যায় সে চেষ্টা করা, (খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার চেষ্টা করা।

প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে হয়, নানা কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচলিত হার মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ স্বল্পোন্নত দেশের সামনে খোলা থাকে না। এর অন্যতম কারণ হল, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত চিন্তাধারা, অভ্যাস, ধর্মীয় মনোভাব ও আদর্শগত চেতনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার সব চেষ্টার পথেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, স্বাভাবিক কারণেই এ সমস্যার মূল কারণ দূর করার বদলে তার প্রতিক্রিয়ার দিক থেকেই ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবতে হয়। এজন্য ক্রমবর্ধমান বেকারীর সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় সে দিকেই সব দৃষ্টি দিতে হয়। সাধারণত দেখা যায় স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে পুঁজিগঠন সে হারে হয় না। শিল্পে খাটানোর মত পুঁজি যদি যথেষ্ট না হয়, বিরাট বেকার বাহিনীকে কাজে নিয়োগ করার সম্ভাবনা ক্রমশই দূরে সরে যায়। বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি করার কথা অনেক সময় বলা হয়। কিন্তু সে প্রযুক্তিবিদ্যা যদি পুঁজি-নিবিড় হয় (অর্থাৎ যাতে পুঁজির তুলনায় কম শ্রমিকদের দরকার হয়) তবে বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, সেটা বাড়তেই থাকবে। স্পষ্টতই, এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় নীতির প্রধানতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তীব্র বেকার সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামীণ বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হতে পারে। সরকারী উদ্যোগে জনকল্যাণ প্রকল্প সৃষ্টি করে তাতে শ্রমশক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করতে হয়। এ প্রকল্পগুলি অবশ্যই শ্রম-নিবিড় ও পুঁজি-লঘু শিল্প স্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই রচিত হবে। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প যে এ উদ্দেশ্য সাধনে খুবই কার্যকর তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের শিল্প শ্রম-নিবিড় ও পুঁজি লঘু। তুলনামূলকভাবে কম পুঁজি নিয়ে এ সব শিল্প গঠন করা যায়, এবং সুফল এই যে, তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শ্রমিক এসব শিল্পে নিয়োগ করা যাবে। তবে এর একটা অসুবিধা আছে। এস শিল্প স্থাপন করলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় বটে, তবে স্বল্পোন্নত অর্থনীতির পক্ষে উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত বেগে পৌঁছান কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা। এর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এ ব্যাপারে অতীতে অনেক বাধা ছিল এবং বর্তমানেও যে নেই এমন নয়। তবে ইদানীংকালে অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে ও ক্রমশঃ হচ্ছে। আজ বেশির ভাগ স্বল্পোন্নত দেশেই জন্মহার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো আপত্তি দেখা যায় না, জন্মহার হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অথবা আদর্শগত আপত্তি একটা ওঠানো হয় না। তাই এ সব দেশে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যাপক ভাবে গৃহীত হলেও তা ফলপ্রসূ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। এর অবশ্য কারণও আছে। এসব দেশে জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্র পরিবার সৃষ্টি করে সেটাকেই টিকিয়ে রাখা যে কত কাম্য ও সুবিধাজনক সে সম্পর্কেও জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে চেতনা ও আগ্রহের অভাব। ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে শহর ও নগর সৃষ্টি হলে জনমানসে নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়। এমন চেতনা উন্নত দেশে ইতোমধ্যেই এসেছে। তাই ক্ষুদ্র পরিবারের উপযোগিতা সম্পর্কে সেখানকার মানুষ অনেক বেশি সচেতন। স্বল্পোন্নত দেশে এ অবস্থা আসতে অবশ্যই দীর্ঘ সময় লাগে।

এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে দু'টি দেশ—জাপান ও তাইওয়ান—জন্মহার নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুফল লাভ করেছে একথা ঠিক। এদের দৃষ্টান্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলির সামনে যে কিছুটা আশার আলো আনে সেটা স্বীকার করতে হয়। বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এ দৃষ্টান্তে ততটা উৎসাহিত বোধ করেন না। তার কারণ হল, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এ দু'টি দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগর সভ্যতার বিস্তার এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে জন্মহার হ্রাসের উপযোগিতা সম্পর্কে মানসিক চেতনা সৃষ্টি করেছে।

তাই একথা মানতেই হবে, যে সব দেশ জন্মহার হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তাদের সকলকেই আগামী বেশ কয়েক বছর ধরে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

৫.১২. বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা
Role of Foreign Assistance

১ স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের অন্যতম বাধা **পুঁজির অভাব। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে উপযুক্ত**

পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলেই বিদেশী পুঁজির প্রয়োজন হয়। স্বল্পোন্নত দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশী পুঁজির যেমন চাহিদা থাকে, তেমনি বিদেশী পুঁজির সরবরাহকারীরাও তাঁদের পুঁজি স্বল্পোন্নত দেশের বাজারে বিনিয়োগ করতে উৎসুক হয়। কিন্তু নানা কারণে যতটা পরিমাণে বিদেশী পুঁজি প্রয়োজন ততটা পাওয়া যায় না বলে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

২. আজকাল পৃথিবীর বহু দেশই বৈদেশিক সাহায্য পাচ্ছে। এ সাহায্য বিভিন্ন আকারে স্বল্পোন্নত দেশে প্রবেশ করেছে এবং এদের প্রয়োজন মিটাচ্ছে। বৈদেশিক সাহায্য প্রধানত পাঁচ রকমে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে আসে। ক. বৈদেশিক ঋণ, খ. কারিগরী সাহায্য, গ অনুদান, ঘ. শিল্পে বিনিয়োগ, ঙ. দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সাহায্য।

৩ সাহায্যের প্রকৃতি : নামে বিদেশী 'সাহায্য' বলা হলেও এ সাহায্যের অতি সামান্য অংশই (মোটামুটি ৬—৭ শতাংশ) যথার্থ সাহায্য বা অনুদান আর বাকি ৯৩ ৯৪ শতাংশই হল বিদেশী ঋণ। 'সাহায্য' রূপে পাওয়া এই বিদেশী ঋণের বেশির ভাগই বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করতে হয়। তার ফলে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

৪. সাহায্যের ধরন : এ আর্থিক সাহায্য শর্ত কণ্টকিত নয় বলে যতই ঘোষণা করা হোক না কেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে অনেক অন্যায় শর্ত মেনে নিতে হয়। এ 'সাহায্য' এর অধিকাংশই সাহায্যদাতা দেশের জিনিসপত্রে ও বিশেষজ্ঞদের কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। অনেক স্বল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হল, যে দামে জিনিসপত্র ঋণ সাহায্যের রূপে আসে তা আন্তর্জাতিক বাজার দর থেকে বেশ চড়া। গুণের দিক থেকে ঐসব দ্রব্য যে উৎকৃষ্ট এমন কথা বলা যায় না। ঋণ বাবদ অনেক সময় বিদেশী 'বিশেষজ্ঞদের' অত্যধিক বেতনে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে পাঠান হয়। তা ছাড়া, সাহায্যদাতা দেশগুলি ঋণ সাহায্য বাবদ যে সব সামগ্রী পাঠিয়ে থাকে ঋণের শর্ত অনুযায়ী তা চড়া ভাড়ায় ও বীমার চড়া প্রিমিয়ামে ঋণদাতা দেশের জাহাজ ও বীমা কোম্পানীর সাহায্যেই বহন করে আনতে হয়। এতে সাহায্য গ্রহণকারী দেশের, না সাহায্যদাতা দেশের, কার যে সুবিধা হয় সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

৫. ঋণ সাহায্য পরিশোধের বোঝা : বিদেশী ঋণ সাহায্য গ্রহণের সপক্ষে প্রধান অর্থনৈতিক যুক্তি হল, এর সাহায্যে স্বল্পোন্নত দেশের উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা যায় এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। ফলে রপ্তানিবৃদ্ধি দ্বারা দেশে যে বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাড়বে তা দিয়ে ঐ বিদেশী ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে। এ দৃষ্টিতে বিচার করে বলা হয়, বিদেশী ঋণ দেশের বোঝা লাঘব করতে পারে। তত্ত্বের দিক থেকে এ যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা না গেলেও স্বল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু বিপরীত কথাই বলে। বিদেশ থেকে পাওয়া ঋণ স্বল্পোন্নত দেশগুলির বোঝা লাঘব করার পরিবর্তে তাকে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় এমন দ্রব্যসামগ্রীর আকারে ঋণ দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে ঋণ, প্রাপ্ত ঋণের পূর্ণ ব্যবহার করতে না পারা, আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, স্বল্পোন্নত দেশগুলি থেকে উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ—এ সব বিষয় ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলির পক্ষে বিদেশী ঋণ শোধ করা কঠিন করে তুলেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, রপ্তানি দ্বারা উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার অধিকাংশ দিয়েও ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ সব দেশ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য নতুন করে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

৬. বৈদেশিক সাহায্যের সমস্যা : স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য নেওয়া উচিত কি উচিত নয় এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতভেদ আছে। এ প্রসঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে উন্নয়নের চেষ্টা করার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয় তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

সপক্ষে যুক্তি : স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। কারণ, এ সব দেশের পুঁজি কম, শিল্পজ্ঞান ও উৎপাদন কৌশল পুরাতন। শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল এদেশে দুষ্প্রাপ্য। যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম, মেরামতির কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। তাই বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করলে তাতে আপত্তি করার কিছু থাকে না।

বিরুদ্ধে যুক্তি : এরূপ সাহায্য আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হলেও এর সাথে সাহায্যকারী দেশ নানারূপ শর্ত আরোপ করে সাহায্যপ্রার্থী দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সাহায্য দানের সুযোগে সাহায্যপ্রার্থী দুর্বল দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে সাহায্যকারী দেশ নিজের স্বার্থ ষোল আনা আদায় করে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ঋণ ও সাহায্যকে চাপ হিসাবে ব্যবহার করে স্বল্পোন্নত ও দুর্বল দেশগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন করে। সাহায্যপ্রার্থী দেশ সাহায্যকারী দেশের উপর এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, প্রথমোক্ত দেশের পক্ষে সেই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা কেবল যে শক্ত হয় তাই নয়, সেটা দিন দিন আরো বাড়তে থাকে। কারণ, নতুন ঋণের অনেকটাই পুরাতন ঋণ শোধ করতে লেগে যায় ; ফলে ঋণ শোধের জন্য আবার ঋণ করতে হয়। একটা অন্তহীন দুষ্টচক্রের আবর্তে সাহায্যগ্রহণকারী দেশগুলি ঘুরপাক খেতে থাকে,

এবং এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পায় না। তা ছাড়া, বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা কোনো দেশ নিজের ইচ্ছামত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ, শিল্প অথবা কৃষি কোনটি অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কোন শিল্প সর্বাগ্রে গড়ে তুলবে সেই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না কারণ সাহায্যকারী দেশ এ সব ক্ষেত্রে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে।

৭ সাধারণভাবে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের কয়েকটি **সমস্যা ও অসুবিধার** কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথম সমস্যা হল, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। কোনো বিশেষ সময়ে বৈদেশিক সাহায্য কি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং সেই সাহায্যের রূপ কি হবে, এ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ আগে না পেলে সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলির পরিকল্পনার পক্ষে অসুবিধা হয়।

দ্বিতীয় সমস্যা বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োগ ও পূর্ণতম ব্যবহার সংক্রান্ত। কোনো দেশ কি পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে তা নির্ভর করে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য ঐ দেশ কতটা নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারবে সেই ক্ষমতার উপর। কোনো দেশে শুধু সাহায্য পাঠালেই সমস্যার সমাধান হয় না কারণ, সেই দেশ যদি অতি পশ্চাৎপদ হয় তবে ঐ সাহায্য হয়ত অব্যবহৃত থেকে যাবে। সাহায্যপ্রার্থী দেশের নিকট বিদেশী সাহায্য কতটুকু কাজে লাগবে তা প্রশাসনিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। শিক্ষিত, নিপুণ, সৎ নিষ্ঠাবান কর্মচারী ও নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব গ্রহণ না করলে বিদেশী সাহায্য যথাযথরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। উপরন্তু যে দেশ সাহায্য পায় সে দেশের জনসাধারণের সহযোগিতা ও অনুকূল মনোভাবও এ সাহায্যের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

তৃতীয় সমস্যা সাহায্যগ্রহণকারী দেশের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সংক্রান্ত। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে এর উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে কোনো দেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা। ঋণ পরিশোধের শর্ত সহজ ও অনুকূল হলে সাহায্যপ্রার্থী দেশের সাহায্য গ্রহণের ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে, অর্থাৎ অধিকতর পরিমাণে সাহায্য ঐ দেশের অর্থনীতি ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু তাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ যতদিন অর্থনীতি স্বয়ংভর না হবে ততদিন বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। তখন ঋণ পরিশোধের সমস্যাও তীব্রতর হবে। এ অবস্থায় রপ্তানিবৃদ্ধির সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা না করলে সংকটের হাত থেকে অর্থনীতিকে বাঁচাবার কোনো উপায় থাকে না। রপ্তানিবৃদ্ধি করতে হলে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। তাই রপ্তানি শিল্পসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণ না করলে বৈদেশিক সাহায্যের ও পরিশোধের সমস্যার সমাধান করা যায় না।

৮ পৃথিবীর অনেক স্বল্পোন্নত দেশই বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে উন্নয়নের কার্যসূচি অনেকটা রূপায়ণ করতে পেরেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঘটনা থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না যে, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া কোনো দেশ কখনই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। এখানে তিনটি দেশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যারা বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব করেছে। তারা হল, সোভিয়েত রাশিয়া, সমাজতন্ত্রী চীন ও জাপান। এদের কেউই উন্নয়নের কাজে বৈদেশিক সাহায্য নেয়নি। এরা নিজেদের সম্বলের উপর নির্ভর করেই উন্নয়নের পথে এগিয়েছে।

১৯৮৪-৮৫ সাল (৩১ মার্চ) পর্যন্ত ভারত মোট ৩২,৪৩৭ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য রূপে পেয়েছে। তার ৭৮.৯ শতাংশ ছিল ঋণ, ১১.৭ শতাংশ ছিল অনুদান এবং ৯.৪ শতাংশ ছিল মার্কিন পি. এল ৪৮০/৬৬৫ প্রভৃতির অধীনে ঋণ। সেই ঋণ সাহায্যের ২৭.৬ শতাংশ দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের অধীন সংস্থা ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সী (IDA), ১১.৩ শতাংশ দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৮.১ শতাংশ দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক, ৫.৯ শতাংশ দিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, ৯.৫ শতাংশ ব্রিটেন এবং বাকি ২৭.২ শতাংশ দিয়েছে অন্যান্য দেশ। এই ঋণ পরিশোধের জন্য সুদে আসলে বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ ১৯৬১-৬২ সালে ১০২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৭৬৬ কোটি টাকায় উঠেছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১ "উন্নয়ন একটি গতীয় প্রক্রিয়া"—এ উক্তিটির মর্ম পরিস্ফুট কর।

["Development is a dynamic process." Elaborate the idea contained in this statement.]

২. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর যে সকল শক্তি মুখ্য প্রভাব বিস্তার করে সেগুলির একটি তালিকা রচনা কর।

[Prepare a list of major factors which influence the economic development of a country.] [C.U., B.A. (II) 1983]

৩. স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন না হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি ?

[What are the reasons for the growth of population in underdeveloped countries even though no worthwhile development has taken place there ?] [C.U., B.A (II) 1984]

৪. স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the nature of the population problem in underdeveloped countries.]

৫. "সকল স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের মূলে তিনটি কাজ নির্ণায়ক।" এই তিনটি চাবিকাঠি বিবৃত কর।

[In the matter of development of all underdeveloped countries there are three key issues. Describe these three issues.]

[C.U., B.A (II) 1984]

৬. স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধির সমস্যাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

[Analyse the nature of the problem of increasing the rate of capital formation in an underdeveloped country.]

৭. স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, তা বর্ণনা কর।

[What method should be adopted to increase investment in underdeveloped countries ?]

৮. "স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে বিরাট সঞ্চয় সম্ভাবনা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।" এ উক্তিটি বিচার কর।

["In the underdeveloped economies huge saving—potential lies idle." Discuss the statements.]

৯. প্রচ্ছন্ন বেকারদের পুঁজি গঠনের কাজে নিযুক্ত করলে কি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে ?

[What are the benefits that may be obtained by employing the disguised unemployed for capital formation ?]

১০. প্রচ্ছন্ন বেকারদের পুঁজি গঠনের কাজে নিয়োগে কি কি অসুবিধা দেখা দেয় সেগুলি বিবৃত কর।

[Narrate the difficulties of employing the 'disguised unemployed' for capital formation.]

১১. পুঁজি গঠনের কাজে সরকারী রাজস্ব কি ভূমিকা পালন করতে পারে ?

[What role can government revenue play in capital formation ?]

১২. স্বল্পোন্নত দেশের কর ধার্য করার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত ?

[What should be the aims of taxation in an underdeveloped country ?]

১৩. ভারতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের গোপন উৎসগুলি কি তা নির্দেশ কর।

[Indicate the hidden sources of potential surplus in India.]

১৪. বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতির পথ নেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা, তা বিচার কর।

[Consider if it is reasonable to resort to currency inflation as a method of increasing investment.]

১৫. ভারসাম্য বিশিষ্ট উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর।

[Explain what you mean by balanced growth.] [C.U., B.A (II) 1985]

১৬. ভারসাম্য বিশিষ্ট উন্নয়নের পক্ষে কি যুক্তি দেখান হয় ?

[What are the arguments that are given in favour of balanced growth ?]

১৭. ভারসাম্যহীন উন্নয়ন কাকে বলে ?

[What is meant by unbalanced growth ?]

[C.U., B.A (II) 1984]

১৮. ভারসাম্যহীন উন্নয়নের সমর্থনে কি যুক্তি দেখান হয় ?

[What arguments are advanced in support of unbalanced growth ?]

১৯. ভারসাম্যহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিপদের দিকটি বিবৃত কর।

[Narrate the danger that the process of unbalanced growth may create.]

২০. ভারসাম্যহীন উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা হলে স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার ও বিনিয়োগের ধাঁচ কি ধরনের হওয়া উচিত তা নির্দেশ কর।

[Indicate the nature of investment priority and the pattern of investment that an underdeveloped economy will have to choose when it seeks to adopt the technique of unbalanced growth.]

২১. অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়ন অথবা কৃষি—

কোনটির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত ? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

[In a programme for economic development which one—industrial development or agriculture—should receive priority ? Give reasons for your answer.]

২২ "স্বল্পকালীন দৃষ্টিতে কৃষি ও শিল্পকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়, কিন্তু দীর্ঘকালীন ভাবে তারা পরস্পরের পরিপূরক" — উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

["In the short run, agriculture and industry seem to be mutually exclusive and competetive but in the long run they are complementary." Explain the significance of this statement.]

২৩ "স্বল্পোন্নত দেশের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করে" — এরকম হবার কারণ কি ?

["A growing population retards the pace of economic development of underdeveloped countries." Explain why it is so.]

২৪ স্বল্পোন্নত দেশ ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ?

[What measures can an underdeveloped country adopt to solve its problem of growing unemployment ?]

২৫ স্বল্পোন্নত দেশে বিদেশী ঋণ সাহায্য গ্রহণের পক্ষে কি যুক্তি দেখানো হয় ?

[What arguments are advanced in support of an underdeveloped country receiving foreign aid ?]

২৬. স্বল্পোন্নত দেশের ঋণ সাহায্য পরিশোধের দায় একটি বোঝা হিসাবে দেখা দেয়। বক্তব্যটি পরিস্ফুট কর।

[Repayment of foreign loan aid by an underdeveloped country becomes a burden for itself. Discuss the statement.]

২৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় ? অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা কর।

[What is meant by economic development ? Discuss the relation between economic development and population growth.]

[B.U., B.A. (III) ('78 79 Syll.) 1983]

২৮ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌল বিষয়গুলি আলোচনা কর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্যকে কি অপরিহার্য বলে মনে কর ?

[Discuss the basic factors of economic development. Do you think that the balance between agriculture and industry is essential for economic development.]

২৯ স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাগুলি কি কি ? এই বাধাগুলি কতটা দূর করা সম্ভব ?

[What are the obstacles to economic development of underdeveloped countries ? To what extent can these obstacles be removed ?]

[B.U., B.A. II ('80 81 Syll.) 1983,
C.U., B.A. II 1984]

৩০ সুষম ও অসম উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। এই প্রসঙ্গে সুষম উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণের অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

[Distinguish between balanced and unbalanced growth. In this connection state the difficulties of a balanced growth.]

[B.U., B.A. II ('80 81 Syll.) 1983]

৩১ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশী সাহায্যের ভূমিকা আলোচনা কর।

[Discuss the role of foreign aid in the economic development of a country.]

[B.U., B.A. III ('79 80 Syll.) 1982

৩২ মূলধন গঠন বলতে কি বোঝায় ? কি কি বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে ? অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব কি ? এই প্রসঙ্গে বিদেশী সাহায্যের যৌক্তিকতা সংক্ষেপে লেখ।

[What is meant by capital formation ? On what factors does it depend ? What is its importance in economic development ? In this connection state the justification for foreign aid.] [B.U., B.A. II ('80 81 Syll.) 1981,
C.U., B.A. II 1984]

৩৩ প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বলতে কি বোঝায় ? কিভাবে তা পুঁজি গঠনের উৎস হতে পারে ? পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন বেকারদের নিয়োগের অসুবিধাগুলি কি কি ?

[What is meant by disguised unemployment ? How can this act as a source of capital formation ? What are the difficulties of employing the disguised unemployed for furthering capital formation ?]

[B.U., B.A. II ('80-81 Syll.) 1983,
C.U., B.A. II 1984]

৩৪ বৈদেশিক সাহায্য কিরূপে একটি অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি ঘটাতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain how foreign aid can promote the pace of economic development of an underdeveloped country.] [C.U., B.A. II 1985]

অর্থনৈতিক বিকাশের উপাদান
Factors Of Economic Development

৬.১. অর্থনৈতিক বিকাশের উপাদান
General Factors in Economic Development

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার উপরে দুই ধরনের উপাদান কাজ করে। ১ কয়েকটি উপাদান হল অর্থনৈতিক (economic) যেমন, (ক) উৎপাদন সংগঠন, (খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, (গ) প্রাকৃতিক উপকরণ, (ঘ) পুঁজি গঠন, (ঙ) বিশেষীকরণ, শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তন উৎপাদন, (চ) উপাদান ব্যবহারে দক্ষতা এবং (ছ) প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি। ২ আর কিছু উপাদান আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক উপাদান নয় (non-economic), যেমন (ক) সাংস্কৃতিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, (খ) সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান, (গ) রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা।

নিচে অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের বিশদ আলোচনা করা হল।

অর্থনৈতিক বিকাশের উপাদান / উৎপাদন সংগঠন / জনসংখ্যা বৃদ্ধি / প্রাকৃতিক উপকরণ / পুঁজি গঠন / বিশেষীকরণ, শ্রমবিভাগ, বৃহদায়তনে উৎপাদন / উপাদান ব্যবহারে দক্ষতা / প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি / আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

৬.২ উৎপাদন সংগঠন
Organisation of Production

১ উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদানগুলি হল শ্রম, প্রাকৃতিক উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার এবং অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য। এ উপাদানগুলি না থাকলে উৎপাদন হতে পারে না। কিন্তু উৎপাদন করতে গেলে এ উপাদানগুলিকে কোনো না কোনো ধরনের সংস্থার মধ্যে যথাযথভাবে সমন্বিত ও সংগঠিত করতে হয়। এ কাজে চাই দক্ষতা ও নৈপুণ্য, আর চাই উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরী জ্ঞান। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে উৎপাদক সংস্থায় নিয়োগ করে দক্ষতার সাথে প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করতে না পারলে মানুষ আদিমকালের আরণ্যক জীবনেই থেকে যেত।

২ উৎপাদনের উপাদানগুলিকে কিভাবে উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করা দরকার তা জানা যায় **উৎপাদন অপেক্ষক** (production function) থেকে। কি কি পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান একযোগে প্রয়োগ করলে কি পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়—উৎপাদন অপেক্ষক ওই দুটির মধ্যে সম্পর্কটি দেখিয়ে দেয়। একাধিক উপাদান মিলিয়ে মিশিয়ে, উপাদানগুলিকে সংযুক্ত ও সমন্বিত করে —যেমন, শ্রম, প্রাকৃতিক উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য

নিয়ে—উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন হয়। উৎপাদনের কাজে সুবিধার জন্য একটি উপাদানের কিছু কিছু এককের পরিবর্তে অন্য একটি উপাদানের কিছু কিছু একক ব্যবহার করা সম্ভব এবং দরকার হয়। এভাবে উপাদানগুলির এককের পরিমাণের ক্রমাগত পরিবর্তনের কাজ চলতেই থাকে। যেমন, একটি রাস্তা তৈরির কাজে বহু শ্রমিকের সাথে কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে বেশি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও সে কাজ করা যেতে পারে। বিভিন্ন উপাদানের এককগুলির একটির বদলে অন্যটি ব্যবহার করলে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর কি ধরনের হয় তা উৎপাদন অপেক্ষকের সাহায্যে জানা যায়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি কুয়ো খুঁড়তে হলে শ্রমিক লাগে, আবার খননের যন্ত্রপাতি। মনে করা যাক, ৫০টি কুয়ো খুঁড়তে হবে। নিচের চিত্র ৬.১ থেকে দেখা যাবে কত বিভিন্ন রকমে (অর্থাৎ শ্রম ও খনন যন্ত্রের কত বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়ে) এ ৫০টি কুয়ো খোঁড়া যায়। শ্রমের যোগান যদি সুপ্রচুর হয় এবং খননযন্ত্র যদি তুলনামূলকভাবে কম থাকে, তবে বেশি শ্রমিক ও অল্পসংখ্যক যন্ত্রের সাহায্যে ৫০টি কুয়ো A বিন্দুতে উৎপাদন করা যেতে পারে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, OL পরিমাণ শ্রম ও OT_2 পরিমাণ যন্ত্র নিয়োগ করে ৫০টি কুয়ো খোঁড়া যাচ্ছে। চিত্রে আবার এটাও দেখা যাচ্ছে যে, B বিন্দুতেও ঐ ৫০টি কুয়ো খোঁড়া সম্ভব। B বিন্দুতে আগের চাইতে অনেক কম শ্রমিক OL_1 লাগছে বটে তবে আগের চাইতে বেশি খননযন্ত্র (OT_1) লাগছে। কোনো দৈবদুর্বিপাকে জনসংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেলে কুয়ো খোঁড়ার জন্য B বিন্দুর শ্রম ও যন্ত্রের সমন্বয় গ্রহণ করা যেতে পারে। যে সব দেশে (যেমন অনেক স্বল্পোন্নত দেশে) জনসংখ্যা খুব বেশি সেখানে শ্রম প্রগাঢ় (labour intensive) পদ্ধতি গ্রহণ করা সুবিধাজনক, এতে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে ও কম সংখ্যক যন্ত্র ব্যবহার করে কুয়ো খোঁড়া সম্ভব। এমন ক্ষেত্রে A বিন্দুর শ্রম ও যন্ত্রের সমন্বয় গ্রহণযোগ্য। এভাবে দেখা যাবে ৫০টি কুয়ো খোঁড়ার জন্য শ্রম ও যন্ত্রের অনেক রকমের সমন্বয় সম্ভব। A ও B বিন্দুকে সংযুক্ত করে যে বক্ররেখাটি টানা হয়েছে সে রেখার প্রতিটি বিন্দু শ্রম ও যন্ত্রের বিভিন্ন সমন্বয়ের নির্দেশক। এই রেখায় অবস্থিত যে কোনো বিন্দুর শ্রম ও যন্ত্রের সমন্বয় প্রয়োগ করে ৫০টি কুয়ো খোঁড়া যায়। চিত্রে আরো দুটি রেখা রয়েছে। এরা ১০০ বা ১৫০টি কুয়ো খোঁড়ার কাজ কত রকমের শ্রম ও যন্ত্রের সমন্বয়ে সম্ভব হতে পারে তা দেখিয়ে দিচ্ছে। ১৫০টি কুয়ো খোঁড়ার জন্য যত রকমের শ্রম ও যন্ত্র সমন্বয় দরকার তার একটি সমন্বয় C বিন্দুতে পাওয়া যায়। এ বিন্দুতে শ্রম OL_3 পরিমাণ আর যন্ত্র OT_3 পরিমাণ। সাধারণভাবে বলা যায়, উৎপাদন স্তর ক্রমশ উঁচুতে তুলতে হলে উপাদান নিয়োগ বেশি পরিমাণে করতে হয়। অনেক

চিত্র ৬.১

সময় এ কাজে দুটি উপাদান বাড়ালে তো কথাই নেই, **একটি মাত্র উপাদানকে বাড়িয়েও উৎপাদন স্তরের পরিবর্তন করা সম্ভব।** উৎপাদন যত বাড়তে থাকবে, চিত্রের বক্ররেখাগুলি ততই ডানদিকে সরে গিয়ে উত্তর পূর্ব দিকে উঠে যেতে থাকবে।

চিত্রের বক্ররেখা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। A বিন্দুতে শ্রম ও যন্ত্রের একটি বিশেষ সমন্বয় রয়েছে। এ সমন্বয় থেকে যদি আমরা কিছু সংখ্যক যন্ত্র সরিয়ে নিতে চাই এবং ৫০টি কুয়োই খুঁড়তে চাই, তবে সরিয়ে নেওয়া যন্ত্রের জায়গায় আরো কিছু শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। তেমনি B বিন্দু থেকে একই সংখ্যার যন্ত্র সরিয়ে নিয়ে খনন করা কুয়োর সংখ্যা ৫০টিতেই রাখতে হলে উপরে বর্ণিত অবস্থার তুলনায় কম শ্রমিক ব্যবহার করলেই চলবে। এর কারণ হল, যন্ত্রের পরিবর্তে শ্রম B বিন্দুতে যতটা সহজলভ্য A বিন্দুতে ততটা নয়। অর্থাৎ A বিন্দুতে শ্রম তুলনামূলকভাবে সুপ্রচুর, এবং B বিন্দুতে যন্ত্র তুলনামূলকভাবে সুপ্রচুর। বক্ররেখার গতিপথ অনুসরণ করে চললে এটা বোঝা যাবে, সহজলভ্য একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য একটি উপাদান ব্যবহার করা যেমন সহজ তেমন যে উপাদান দুর্লভ তার পরিবর্তে অন্য একটি উপাদান ব্যবহার করা কঠিন।

একটা অর্থনীতি কিভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায় চিত্রটি থেকে তা বোঝা যায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণের চরম দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও ঐ সব দেশে জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

৬.৪. প্রাকৃতিক উপকরণ
Natural Resources

১ পৃথিবীর মোট আয়তনের মাত্র ৩০ শতাংশ স্থল ভাগ স্থলভাগের আয়তন ৫,৭১,৬৮,০০০ বর্গ মাইল। এর এক তৃতীয়াংশ কর্ষণযোগ্য। বাকি দুই তৃতীয়াংশ স্থায়ীভাবে চাষের অনুপযুক্ত। কিন্তু চাষের অনুপযুক্ত হলেও এ ভূমিখণ্ডের কিছু অংশ পশুচারণের উপযুক্ত, কিছু অংশের মৃত্তিকার গভীরে রয়েছে খনিজ সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার, আবার কিছু অংশ বনাঞ্চল। এ দিক থেকে বলা যায় ভূমি খণ্ড উৎপাদনশীল। সমগ্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপকরণের এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি হচ্ছে

২ অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার যেমন বিশেষ ভূমিকা আছে, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে প্রাকৃতিক উপকরণের। দেশের মোট উৎপাদন কত হবে তা প্রধানত নির্ভর করে মৃত্তিকার অবস্থান ও গঠন, বনভূমি, মৎস্যচাষ, কয়লা, তৈল, লোহ ও জনসম্পদের উপর। এ ছাড়া জৈব ও অজৈব খাদ্যীয় উপাদানের অবদানও কম নয়।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যে প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হল, কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানা যেমন সীমাবদ্ধ এবং মোটামুটিভাবে চিরস্থির, তেমনি সে দেশের প্রাকৃতিক উপকরণও কি চিরস্থির, না পরিবর্তনীয়? এ সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ধারণা হল ভূমির যোগান চিরস্থির, কিন্তু ভূমির যোগান ছাড়া অন্যান্য উপকরণ ও উপাদানের যোগান পরিবর্তনীয়। যেমন জনসংখ্যা, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদির বৃদ্ধি সম্ভব কিন্তু প্রাকৃতিক উপকরণের যোগান স্থির, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, পৃথিবীর দেশে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপকরণ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অথবা তাদের গুণগত উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেমন, কয়লা ও তৈলের মত খনিজ সম্পদের পরিমাণ দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে কমে আসছে, হয়ত ভবিষ্যতে একদিন এগুলি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। বনজ সম্পদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নতুন বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ব্যবহৃত বৃক্ষসমূহের শূন্যস্থান পূরণ না করতে পারলে বনভূমির আয়তন ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকবে। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে অতিরিক্ত পশুচারণের জন্য, আগুনে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘাস ধ্বংস হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের খুবই ক্ষতি হয়েছে, ভূমির গুণ নষ্ট হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার মোট ভূখণ্ডের এক চতুর্থাংশে ব্যাপক ক্ষয়ের ফলে ভূত্বকের দারুণ ক্ষতি হয়েছে। এ সবই বাস্তব সত্য। এ থেকে বোঝা যায় **ভূমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি বলে কিছুই নেই। এ শক্তি বিনাশশীল অর্থাৎ পরিবর্তনীয়।**

৪. প্রাকৃতিক উপকরণ চিরস্থির, অপরিবর্তনীয়, একথাও সত্য বলে আজ আর গ্রহণ করা যায় না। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে অনেক নতুন উপকরণ যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি অনেক অব্যবহৃত উপকরণের ব্যবহারও সম্ভব হয়েছে। বহু উপকরণের ব্যবহার অজানা ছিল, তাই সে সব অপ্রয়োজনীয় বলে অবহেলিত ছিল। বহু উপকরণের ব্যবহার জানা গেলেও দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে মানুষ সেখানে কোনো দিন যেতে পারেনি। আধুনিক জ্ঞানের প্রসারের ফলে নতুন উপকরণের আবিষ্কার হয়েছে এবং তার ব্যবহারও সম্ভব হয়েছে। এ দিক থেকে বলা যায়, বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহারযোগ্য উপকরণের যোগান বেড়েছে এবং বাড়ছে। পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে দেখা যায়, কয়েক শতাব্দী পূর্বে এরা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করেছে, সেগুলিকে দখল করে নিয়েছে, তাদের উপকরণগুলিকে নিজ নিজ দেশের উন্নয়নের কাজে লাগিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডার ইতিহাসে দেখা যায়, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে নতুন উপকরণের আবিষ্কার, অব্যবহৃত উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ, এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থিত দুর্গম অঞ্চলের উপকরণের সান্নিধ্যে পৌঁছান ও তাকে উন্নয়নের কাজে লাগাবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা। তবে একথা সত্য, আধুনিক পৃথিবীতে মূল্যবান উপকরণে ভরা সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত নতুন ভূখণ্ড আজ আর পাওয়া যাবে না। দুই, তিন বা চার শতাব্দী পূর্বে দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা পৃথিবীর দিকে দিকে অভিযান চালিয়ে নতুন দেশ আবিষ্কার করেছিল, বর্তমানে তেমন আবিষ্কারের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ সমগ্র পৃথিবীর ব্যাপক জরিপের কাজ শেষ হয়েছে অনেক দিন আগেই। তবে একটা জিনিস এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। তা হল, দেশে দেশে এতকাল ধরে **অনাবিষ্কৃত উপকরণের আবিষ্কার**। নাইজিরিয়া, আলজিরিয়া, লাইবেরিয়া ও

লিবিয়াতে এমনকি ভারতেও তৈল ও অন্যান্য খনিজ উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়াও পৃথিবীর বহু স্বল্পোন্নত দেশে ভূগর্ভে লুকানো নানাবিধ প্রাকৃতিক উপকরণের আবিষ্কারের জন্য জরিপের কাজ চলছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া নতুন নতুন প্রাকৃতিক উপকরণের আহরণ ও ব্যবহার সম্ভব করছে। এমনটি অতীতেও হয়েছে।

৫ কিন্তু এ সব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আগামী দিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে প্রাকৃতিক উপকরণ বৃদ্ধির ব্যাপারটা কিছুটা সীমাবদ্ধ ভূমিকাই নেবে। অতীতে অবশ্য বিপুল পরিমাণে উপকরণ লাভ সম্ভব হয়েছিল বলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আগামী দিনে তা সম্ভব হবে না। তাই, অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন, আগামী দিনে এ গ্রহ থেকে নতুন উপকরণ নিষ্কাশনের খুব বেশি চেষ্টা না করে মূল কাজ হবে **আমরা যা কিছু ব্যবহার করছি তার পুনরাবর্তন** (recycling) **করান**। অর্থাৎ মহাকাশগামী যানে অবস্থিত ব্যক্তি যেমন তার নিজেরই ব্যবহৃত সব কিছুকেই (যা অন্য হিসাবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে) পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে নেন, তেমনি ভাবেই মানুষকেও নতুন উপকরণের অভাব এভাবেই দূর করতে হবে।

৬ এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভবিষ্যতে উন্নত ও স্বল্পোন্নত সব দেশেই উপকরণের সীমাবদ্ধতা একটা বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে। তবে, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা ভাল যে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রযুক্তিবিদ্যার এমন অগ্রগতি হয়েছে যে কোনো বিশেষ উপকরণের গুরুত্ব বা অপরিহার্যতা সম্পর্কেই পুরাতন ধারণা আমূল বদলে যাচ্ছে। গত কয়েক দশকে পেট্রোলিয়াম শিল্পের যে ব্যাপক প্রসার হয়েছে, শিল্পের ব্যবহার্য উপাদানের ক্ষেত্রে যে কৃত্রিম মালমশলার (synthetic materials) আবিষ্কার হচ্ছে, এবং সর্বোপরি পারমাণবিক শক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ঘটছে, তা থেকে উপকরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণাই সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। ফলে, কোনো বিশেষ উপকরণ দুষ্প্রাপ্য বা নিঃশেষ হয়ে গেলেও মানুষ নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদনের কাজে নিত্য নতুন উপাদান সৃষ্টি করে নেবার চেষ্টা করেই যাবে। যা নেই, যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, যা আছে তারই পূর্ণতর বা অন্যতর ব্যবহার কিভাবে সম্ভব সেই চেষ্টাই মানুষ করে যাবে। কোনো উপকরণের স্বল্পতার জন্য সমস্যার উদ্ভব হলে মানুষ তার সমাধানে অধিকতর সুলভ উপকরণ পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হবে। আর যেটা করবে সেটা হল, যে সব উপকরণের যোগান অপ্রচুর সেইসব উপকরণ সংরক্ষণের কাজে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি সাধন।

৬.৫ পুঁজি গঠন
Capital Formation

১ পুঁজি হল মানুষের তৈরী উৎপাদনের উপায়। ঘরবাড়ি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও মজুদ ভাণ্ডারে সঞ্চিত দ্রব্যসামগ্রী– সাধারণতঃ এগুলি এবং এ জাতীয় বস্তু নিয়েই গড়ে ওঠে একটা দেশের পুঁজি। প্রকৃতির দান ভূমি, পুঁজি এবং মানুষের শ্রম শক্তিও (labour) পুঁজি নয়। পুঁজি হল উৎপাদনের উৎপাদিত উপায় (produced means of production)। এর অর্থ হল, পুঁজির পেছনে মানুষের শ্রম ও প্রচেষ্টা থাকে। সেজন্যই পুঁজি হল 'উৎপাদিত' উপাদান। অর্থনীতিবিদরা শ্রম ও পুঁজি, এই দুটিকেই সম্পূর্ণ আলাদা উৎপাদনের উপাদান হিসেবে গণ্য করেন। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার অন্যতম কারণ হল পুঁজির বস্তুগত ভিত্তি আছে, শ্রমের তা নেই। কারণ শ্রম অবস্তুগত, **কিন্তু** তা অনেক কালের ধারণায় **পুঁজি অবস্তুগতও হতে পারে।** যেমন, একজন শ্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত একটি বছর (অর্থাৎ পুরো এক বছর) তোলার কাজে নিজের শ্রম ও সময় ব্যয় না করে বিশেষ ধরনের অধ্যয়নের কাজে নিজের শ্রম ও সময় ব্যয় করতে লাগল, যাতে সে নিজের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বাড়াতে পারে। এতে যে যন্ত্র সে বর্তমানে ব্যবহার করছে, নতুন দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করে ঐ যন্ত্রই সে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে, যাতে উৎপাদন বাড়ে। যে কোনো পুঁজির অন্যতম কাজ হল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে শ্রমিক উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে কিন্তু যন্ত্রের সংখ্যা বাড়েনি। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে বস্তুগত পুঁজি উৎপাদিত হয়নি, যেটা উৎপাদিত হয়েছে সেটা হল শ্রমিকের দক্ষতা, **কর্মকুশলতা ও উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞান। এজন্য দক্ষতা, কর্মকুশলতা, প্রযুক্তিজ্ঞানই অ-বস্তুগত পুঁজি বলে আজকাল ধরা হচ্ছে।** স্পষ্টই বোঝা যায়, বস্তুগত পুঁজির মতই অবস্তুগত পুঁজিও intangible capital) (যাকে মানবিক পুঁজি বলা যায়) সমাজের উৎপাদনের কাজে সহায়তা করছে।

ইঞ্জিনিয়ার, সেই হোক) এক একটা দিকে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। জ্ঞানের বিশাল ও পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আধুনিক পৃথিবীতে জ্ঞানের ও কাজের জগৎ ক্রমাগত খণ্ডিত হয়েই চলেছে। খণ্ডিত ও আংশিক জ্ঞানের উপরই চলেছে বিশেষায়ন। তাই পরিপূর্ণ মানুষের বদলে আজ সমাজের সব স্তরে সংকীর্ণ বিশেষায়িত মানুষের উদ্ভব হচ্ছে।

৩. **শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার**—এ দুটো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শ্রমবিভাগ তিন ধরনের হতে পারে সরল, জটিল ও আঞ্চলিক। সরল শ্রমবিভাগে অনেকে একসঙ্গে একটা কাজ করে। কিন্তু ঐ কাজে কে ঠিক কতটুকু করল তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। যেমন, দশ জন শ্রমিক একত্রে হাত লাগিয়ে একটা ভার উত্তোলন করল। সকলের যৌথ চেষ্টায় কাজটা হল বটে, কিন্তু প্রত্যেকে এককভাবে কতটা কাজ করল তা বলা সম্ভব হয় না। জটিল শ্রমবিভাগে শ্রমিকদের এক একটা দল সমগ্র কাজের বিশেষ একটা অংশ সম্পাদন করে। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগে দেশের এক একটা অঞ্চল এক একটা দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

৪. শ্রমবিভাগ নানাভাবে উৎপাদনের কাজে সাহায্য করে। (ক) শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। অ্যাডাম স্মিথ একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন। আলপিন তৈয়ারির সম্পূর্ণ কাজটিকে ১৮টি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। দশ জন শ্রমিক নিজেদের মধ্যে শ্রম বিভাগের মাধ্যমে যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রতিদিন ৪৮,০০০ আলপিন তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ একজন শ্রমিক গড়ে দৈনিক ৪,৮০০ আলপিন উৎপাদন করতে সক্ষম। শ্রমবিভাগ না হলে একজন শ্রমিক দিনে ২০টি আলপিনও উৎপাদন করত কিনা সন্দেহ।

(খ) শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বাড়ায়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একই কাজ করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক ঐ কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে।

(গ) এক জনকেই সব কাজ করতে হলে এক ধরনের কাজ থেকে অন্য ধরনের কাজে নিজেকে সরিয়ে নিতে যে সময় ব্যয় হয় শ্রমবিভাগের ফলে তা আর হয় না।

(ঘ) একই কাজ করার মধ্য দিয়ে কাজটা অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে যায়। কাজটা যান্ত্রিক হওয়ার সুবিধা এই যে শ্রমিক ঐ কাজ করতে করতে নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের কথা চিন্তা করতে পারে, এমন কি যন্ত্রপাতি আবিষ্কারও করতে পারে। তাতে উৎপাদনের কাজ আরো ত্বরান্বিত হয়।

(ঙ) শ্রমবিভাগ বৃহদায়তনে উৎপাদন সম্ভব করে। তাতে বৃহদায়তন উৎপাদনের যে সব ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে, সমাজ তাতে প্রভূত সুবিধা লাভ করে।

(চ) শ্রমবিভাগের ফলে দ্রব্যের পরিমাণ যেমন বাড়ে, তেমনি দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষও বাড়ে।

৫. **শ্রমবিভাগ কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত করা সম্ভব?** অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, বাজারের আয়তনের উপর শ্রম বিভাগের প্রসার নির্ভর করে। উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা যদি কম হয়, অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে উৎপাদন বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। শ্রম বিভাগ তো উৎপাদন বাড়াবার জন্যই। আবার বাজারে জিনিসের চাহিদা যদি খুব বেশি হয়, দ্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনাও বাড়ে। উৎপাদন বৃদ্ধি তখন লাভজনক হয়। শ্রমবিভাগ সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনা যায়, বাজারের বিরাট চাহিদার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে উৎপাদক লাভবান হতে পারে। সমাজেরও তাতে কল্যাণ। **বাজারের আয়তন কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (ক) পর্যাপ্ত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।** এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মাল চলাচল, সংবাদ আদান প্রদান ও মানুষের দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা যত সুষ্ঠু ও সহজ হবে, ততই একটা বিস্তৃত বাজার গড়ে উঠবে। দেশের ভিতরে দূর দূরান্তে অবস্থিত বিভিন্ন অঞ্চল এক সন্নিবদ্ধ অর্থনীতির মধ্যে একত্রিত হয়ে উঠবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি উদাহরণ থেকে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এক ওয়াগন মাল ১,৫০০ মাইল দূরে নিয়ে যেতে ১১৫ দিন সময় লাগত আর খরচ পড়ত এক হাজার ডলার। এ রকম অবস্থায় বড় আয়তনের বাজার গড়ে উঠতে পারত না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজারের অস্তিত্বই এতে সম্ভব। এ থেকে বোঝা যায়, ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে বড় হলেই দেশে বড় বাজার গড়ে উঠবে এমন কথা বলা যায় না। (খ) **উৎপাদনের স্তর**: শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বেশি হলে বাজারও সম্প্রসারিত হয়। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হলে আয় বাড়ে, আয় বৃদ্ধি হলে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ক্রয়ক্ষমতা বেশি হলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে—অর্থাৎ ঐ সব দ্রব্যের বাজার প্রসারিত হয়। অন্যদিকে আয় কম হলে ক্রয়ক্ষমতাও কমে যায়। স্বল্পোন্নত দেশের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ কথাটা খাটে। ফলে স্বল্পোন্নত দেশে মোটর গাড়ি, টি. ভি. সেট এবং অন্যান্য দামী শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ কম হয়, মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি ছাড়া এ সব জিনিস কেউ ক্রয় করতে পারে না। এর অর্থ হল, এ সব দ্রব্যের বাজার স্বল্পোন্নত দেশে খুবই সীমাবদ্ধ। ফলে, বৃহদায়তনে এ সব দ্রব্য উৎপাদন করার সুযোগ সম্ভাবনাও কম। তাই বৃহদায়তনে উৎপাদন করে এ সব দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কমিয়েও বিশেষ কোনো লাভ হয় না। (গ) **বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা:**

যে সমাজে জনসমষ্টি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বসবাস করে, যে সমাজে ঐ সব বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রামীণ গণ্ডীর প্রয়োজন মেটাতেই উৎপাদন করে এবং সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই উৎপাদন ও ভোগের ব্যাপারে স্বয়ংভর হতে চায়, সে সমাজে স্বাভাবিকভাবেই বাজার প্রসারিত হয় না এবং শ্রমবিভাগও বেশি দূর এগোতে পারে না। বিভিন্ন গ্রামীণ সমাজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভোগের প্রয়োজনে উৎপাদন না করে বিনিময়ের জন্য যদি উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিনিময়ের ব্যবস্থা করে তবেই সুবিস্তৃত বাজার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং বাজারের প্রয়োজন মিটাতে শ্রমবিভাগও এরই সঙ্গে সূক্ষ্মতর হতে পারে।

৬.৭ উপাদান ব্যবহারে দক্ষতা
Efficiency in the use of Resources

১. উৎপাদনে উপাদান হল উৎপাদন [illegible] ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বপ্রধান নির্ধারক [illegible] উপকরণের [illegible] শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপাদন করে। উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত উপাদানের একক পিছু উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উৎপাদনগুলিকে আরো বেশি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হয়। দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে দেশের উপাদানগুলিকে আরো ভালোভাবে বণ্টন করে প্রতিটি একক থেকে আরো বেশি উৎপাদন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। বিপরীতভাবে অতিরিক্ত উপাদান নিয়োগ না করে বা অন্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস না করে যদি কোনো দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, তবে বুঝতে হবে যে অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া অদক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছিল।

২. উৎপাদনের কাজে উপাদানগুলির সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম বণ্টন ঠিক কিভাবে অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা শক্ত। কারণ সোভিয়েত অর্থনীতিতে উপাদান বণ্টনে দক্ষতার অভাব থাকা সত্ত্বেও ঐ দেশে বিগত ৬০ বৎসরে বিপুল অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। এ ঘটনা পর্যালোচনা করে অনেকে মনে করেন উপাদান বণ্টনের দক্ষতা ছাড়াও হয়ত এমন কোনো অন্য ধরনের দক্ষতা আছে যা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে **হারভে লিবেনস্টাইন এক্স দক্ষতা** (X-efficiency) কথাটি ব্যবহার করেছেন। তার মতে উপাদান বণ্টনের দক্ষতার চাইতেও 'এক্স-দক্ষতা' উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেশি সাহায্য করে। 'এক্স-দক্ষতা' ধারণাটির এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: প্রতিটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজন মত শ্রমিক ও পরিচালনা-কর্মী সরাসরি নিয়োগ করে। নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন অনুযায়ী প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করে—সেটা ৮ ঘণ্টা বা ৯ ঘণ্টাও হতে পারে, কোথাও বা ৭ ঘণ্টাও হওয়া সম্ভব। নিজ নিজ কর্মস্থলে সুনির্দিষ্ট সময়ের পরিশ্রম প্রতিটি কর্মীকেই করতে হয়—এভাবেই শ্রমিক বা পরিচালন কর্মী উৎপাদনের কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখে। সপ্তাহ শেষে বা মাসের শেষে কর্মী যেমন উপার্জন তেমনি পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থাকে। একটা কারখানার শ্রমিকরা ঘণ্টা হিসাবে সবাই হয়ত সমান শ্রমই দিচ্ছে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তো বটেই এমন কি পরিমাণগত বিচারেও প্রতি ঘণ্টায় প্রতিটি শ্রমিকের শ্রমশক্তির মধ্যে কি কোনো তারতম্য নেই? দুজন শ্রমিকই ৮ ঘণ্টা কাজ করল, কিন্তু একজন নিষ্ঠা, একাগ্রতা দিয়ে কাজ করছে, অন্যজন দায়সারা ও উদাসীনভাবে তার ৮ ঘণ্টার কর্তব্য পালন করল। ৩.১ চিত্রে উৎপাদন অপেক্ষকের আলোচনায় শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে OI পরিমাণ [illegible] ও OL পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে আমরা [illegible] কুয়ো খনন করতে পারি। কিন্তু এক্স দক্ষতা ধারণা প্রয়োগ করলে OL শ্রমিক নিয়োগ করলেই [illegible] কুয়ো স্বাভাবিকভাবে খোঁড়া যাবেই এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তারা বলতে পারেন, OL, শ্রমিকের সাহায্যে [illegible] কেন, তারও বেশি কুয়ো খোঁড়া যেতে পারে, আবার খনন করা কুয়োর সংখ্যা ৫০টির কমও হতে পারে। তারা বলেন, **উৎপাদনের পরিমাণ আসলে নির্ভর করে কত ঘণ্টা শ্রম নিয়োগ করা হল শুধু তার উপরে নয়, ঐ শ্রমের মধ্যে কতটা গতি, যত্ন প্রচেষ্টা এবং গুণগত উৎকর্ষ সংযোজিত হয়েছে তার উপর।** এটা সাধারণ শ্রমিক এবং পরিচালনার সাথে যুক্ত কর্মী সকলেরই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণ শ্রমিকদের শ্রমে গতি ও প্রচেষ্টা থাকলেও পরিচালনা কর্মীদের যত্ন গতি ও প্রচেষ্টার অভাব থাকলে OL শ্রমশক্তি নিয়োগ করা গেলেও ৫০টি কুয়ো খোঁড়া নাও হতে পারে। সুতরাং 'এক্স দক্ষতা' (X-efficiency) যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা অবলম্বন করে, এ ধারণা অগ্রাহ্য করার মত নয়। এ ধারণাটির বিপরীত ধারণা হল **'এক্স অদক্ষতা'** (X inefficiency)। **'এক্স অদক্ষতা' উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা। সুতরাং, 'এক্স-অদক্ষতা হ্রাস করার উপরও উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে।**

৩. **দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন** -এ প্রশ্নটি আনুষঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়ের সাথে জড়িত। কাজের প্রতি শ্রমিকের মনোভাব কি, অবসর ও বিশ্রামকে সে কি দৃষ্টিতে দেখে, কর্মস্থলে শ্রমিকদের শৃঙ্খলাবোধের স্তর, এবং সব থেকে বড় কথা হল সমাজের সামনে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য তুলে ধরা হচ্ছে—এসব কিছুরই 'দক্ষতা'র সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

৪ উপরের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, উৎপাদন বন্টনে যেমন সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী দরকার, তেমনি শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও গুরুত্বপূর্ণ।

৬ ।. প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি
Technological Progress

১ অর্থনীতিক উন্নয়নে অন্য যে কোনো উপাদানের তুলনায় প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান সব চাইতে বেশি। আধুনিক যুগের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হলে প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতির কথাই উল্লেখ করতে হয়। আগে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে যে পরিমাণ জমি, শ্রম ও পুঁজির প্রয়োজন হত, আজ নতুন আবিষ্কার ও উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করে, অনেক কম জমি, শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করে সেই পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু যে উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্ষেপ হচ্ছে তাই নয়, প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে বর্তমান যুগে এমন নতুন নতুন দ্রব্যসামগ্রী বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে যা পূর্বে কখনো কল্পনাই করা যেত না, অথবা সব রকমের উপকরণ ব্যবহার করেও তৎকালীন প্রচেষ্টায় আধুনিক কালের বিশাল উৎপাদনের কাছাকাছি পৌঁছান যেত না। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত অগ্রগতির ফলে শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণ এমন এক অবস্থায় এসেছে যে আজ পৃথিবীর সব দেশেই মানুষ যেন যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার যত অগ্রগতি হবে, অর্থনীতিতে মানুষ এবং যন্ত্রের মধ্যেকার প্রভু দাস সম্পর্ক ততই ব্যাপক ও গভীর হবে। এ বাস্তব পরিস্থিতি ভাল কি মন্দ সে বিচার অপ্রাসঙ্গিক। তবে একটা কথা মানতেই হবে, বর্তমান যুগের অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তার পুষ্টি গ্রহণ করছে নিত্য নতুন আবিষ্কার প্রয়োগ কৌশল, নতুন ধ্যানধারণা থেকে। এগুলির ধারাবাহিকতা থেমে গেলে, অর্থনীতিক উন্নয়নও সম্ভব হত না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

২ প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ইতিহাস অতি পুরাতন। আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার চেষ্টায় নতুন হাতিয়ার, নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে। সাধারণ বস্তুকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার, আগুনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, চক্র (wheel) উদ্ভাবন, পশুপালন ও উদ্ভিদপালন, মৃৎশিল্প স্থাপন, ব্রোঞ্জের ব্যবহার এবং লৌহ আবিষ্কার—এ সবই সুদূর অতীতের মানুষের মৌলিক প্রযুক্তিবিদ্যার স্বাক্ষর বহন করে। অতীত কালের প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ছিল ধীর, অসম এবং বিক্ষিপ্ত, আর আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার সুশৃঙ্খল, প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন, গভীর, ধারাবাহিক, নির্ভরযোগ্য। অতীতের অগ্রগতি যেখানে ছিল অতিশয় সীমিত, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি সেখানে বন্যার মত বেগবান।

৩ **প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি মূলত নির্ভর করে বিজ্ঞানের উপর।** বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক—এ দুটো দিকই প্রযুক্তিবিদ্যার নিত্যনতুন আবিষ্কারের পথ খুলে দিচ্ছে। বিজ্ঞান যত ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করছে ততই সমাজে একটা 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' গড়ে উঠছে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুরই আদ্যোপান্ত বিচার বিশ্লেষণ করার আগ্রহ ও নিষ্ঠা মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর সব সমাজের প্রতিটি মানুষই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবে, এমন কথা অবশ্যই বলা যাবে না। বস্তুতপক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির জন্য প্রতিটি মানুষকেই যে এ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, বাস্তবে এমনটি কোথাও হয়ও নি। তবে এ ব্যাপারে সব সমাজেই বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষের অবস্থিতি প্রয়োজন এবং হবে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক (pure and applied) বিজ্ঞানে পারদর্শী নতুন গবেষণা ও আবিষ্কার—এটাই হবে এদের মূল কাজ। যে কোনো সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি সাধনে এদের অবদান চূড়ান্ত ও অপরিহার্য। প্রাথমিকভাবে দেশের বিশাল জনসমষ্টির জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়া চাই—এটা আবশ্যিক। এতে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক ও পরিচালনা কর্মিসম্প্রদায় প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন ধ্যানধারণা ও আবিষ্কারলব্ধ ফল অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারবে। শিক্ষাপ্রসারের সাথে সাথে নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণ করার মত মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এতে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি আরো অনেক সম্প্রসারিত করে। নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার এতে সম্ভব হয়। নতুন যন্ত্রপাতি ও নতুন উপকরণ উৎপাদনের কাজে সংযোজন করা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়। মূল কথা, চাই শিক্ষা। অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষ নিয়ে অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে খুব বেশি দূর যে অগ্রসর হওয়া যায় না, এটা সহজেই বোঝা যায়। কারণ, দেশে প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লব ঘটাতে নিরক্ষর জনসমষ্টির সক্রিয় কোনো ভূমিকা থাকাই সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এ কথাও মনে রাখা দরকার, অর্থনীতিক উন্নয়নের গতি যত ত্বরান্বিত হতে থাকবে, ততই, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বহুগুণে বাড়বে। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্য থেকেই এরা

আসবে। **তাই সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের গুরুত্ব এত বেশি।**

৪ অর্থনীতিক উন্নয়নে শিক্ষা অপরিহার্য বটে তবে প্রযুক্তিবিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগ উদ্যোক্তা (entrepreneur) ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থনীতিক উন্নয়নে প্রযুক্তিবিদের যেমন অসীম গুরুত্ব তেমনি উদ্যোক্তার গুরুত্বও অপরিসীম। উদ্যোক্তার প্রাথমিক কাজ হল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সেটিকে পরিচালনা করা। স্বল্পোন্নত দেশে উদ্যোক্তার অভাব খুব বেশি। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যাহত হয়। শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদনশীলতাও এ কারণে কম হয়, অর্থনীতির উন্নয়নে বাধা পড়ে। উদ্যোক্তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন। স্বল্পোন্নত দেশে উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত অনেক কিছুই অনিশ্চিত। বিনিয়োগের সুযোগ কোথায় কি রকম আছে, কোথায় বিনিয়োগ করলে লাভজনক হবে এ সব তথ্য স্বল্পোন্নত দেশের উদ্যোক্তার কাছে সাধারণভাবে অজানা থাকে। এটা অনিশ্চিত বলে ঝুঁকিও নিতে হয় বেশি পরিমাণে। তা ছাড়া, বাজারের আয়তনের ক্ষুদ্রতা, পুঁজির স্বল্পতা, শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের অভাব, প্রয়োজনমত কাঁচামাল সংগ্রহের অনিশ্চয়তা এ সব বিষয়গুলিও উদ্যোক্তার পক্ষে ঝুঁকির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। স্বল্পোন্নত দেশে অনেক উদ্যোক্তা এত বেশি ঝুঁকি নিতে চায় না। ফলে যাদের অর্থ বিনিয়োগ করার মত ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকে, তারাও নতুন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ার দিকে না গিয়ে তাদের অর্থে স্বর্ণ অলঙ্কার, জমি বাড়ি প্রভৃতি ক্রয় করে, অথবা ফাটকা কারবারে নেমে পড়ে। স্যুমপিটার মনে করেন, উদ্যোক্তার প্রধানতম কাজ হলো নতুন নতুন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক ব্যবহার প্রবর্তন করা (innovation)। এ কাজ করার মাধ্যমে উদ্যোক্তা অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়ে। উদ্যোক্তা হল বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তার ক্ষমতা সে ব্যবহার করে প্রযুক্তিবিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগের কাজে, নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদনে, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবনে অথবা নতুন বাজার সৃষ্টির কাজে। এভাবে সে উন্নয়নের কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই, প্রযুক্তিবিদ ও উদ্যোক্তা একে অপরের পরিপূরক। প্রযুক্তিবিদ্যা নিত্য নতুন আবিষ্কার করে চলে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তার ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখিয়ে দেয়, আর উদ্যোক্তা সেগুলিকে অর্থনীতিতে প্রবর্তন করে, বাস্তবে রূপ দেয় ব্যাপক আকারে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্থনীতি উন্নয়নের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে।

৫. **একটু ব্যাপকভাবে** ব্যাখ্যা **করলে** প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি কথাটির মধ্যে **নব উদ্ভাবিত** বা আবিষ্কৃত **বিষয়ের বাণিজ্যিক প্রয়োগের** (innovation) সমগ্র প্রক্রিয়াটি এসে পড়ে। অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে নতুন উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করতে হয়। এটা যাতে ফলপ্রসূ হয় তার জন্য আরো বেশি পুঁজির, প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির এবং উপযুক্ত সংখ্যায় সুশৃঙ্খল ও শিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের যোগান সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হিসাবে একটা অর্থনীতিক পরিবর্তনেরই সূচনা করে। আধুনিক যুগের পূর্বেকার যাবতীয় অর্থনীতিক পরিবর্তন ধীর গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হয়েছে। এ পরিবর্তনের ধীরগতি হওয়ার কারণ হল, প্রত্যেক সমাজেই মানুষের প্রতিষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা মূলত গতানুগতিক ভাবধারা অবলম্বন করে চলতে চায়, নতুন কিছুকে গ্রহণ করার ব্যাপারে একটা অনাসক্তি সব সমাজেই দেখা যায়।

৬. বলা বাহুল্য, **অর্থনীতিক উন্নয়নের বিষয়টি শুধু অর্থনীতির সাথেই সংপর্কযুক্ত নয়, এর সাথে আরো যে বিষয়গুলি জড়িত সেগুলি হল ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব** এবং **দর্শন**। এদের প্রত্যেকটি একে অপরের সঙ্গে **সন্নিবদ্ধ। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, চেতনা, প্রণোদনা—প্রতিটি ব্যাপারে এদের প্রত্যেক শাখারই কিছু না কিছু অবদান থাকে।**

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১ অর্থনীতিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় কি কি অর্থনীতিক উপাদান কাজ করে?

[What are the economic factors that act on the process of economic development?]

২. উৎপাদন অপেক্ষক বলতে কি বোঝায়?

[What is meant by production function?]

৩. বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানগুলির একটির বদলে অন্যটি ব্যবহার করলে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর কি ধরনের হবে সেটা কিভাবে জানা যায়? উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা কর।

[How can one know the different levels of production resulting from substitution of one factor for another? Explain with suitable examples.]

৪. একটি অর্থনীতি কিভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায় উপযুক্ত রেখাচিত্রের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain with a suitable diagram how an economy advances along the path of economic development.]

৫· অর্থনীতিক বিকাশে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি কি ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain the role of advancements in technology in economic development.]

৬· বলা হয়, প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদন অপেক্ষকও বদলে যায়। উপযুক্ত উদাহরণ ও রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট কর।

[It is said that the production function changes with improvements in technology. Illustrate your answer with suitable examples and diagrams.]

৭· কি পরিস্থিতিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপের রূপ নেয়?

[Under what circumstances can population growth in underdeveloped countries turn into a bane instead of a blessing?]

৮· স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সাম্প্রতিক কালে যে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটছে তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

[Explain the reasons for population explosion in underdeveloped countries in recent years.]

৯· পুঁজি কি অবস্তুগত হতে পারে? উদাহরণ সহযোগে এ প্রশ্নের আলোচনা কর।

[Can capital be non-material? Give your answer with examples.]

১০· বিনিয়োগ কাকে বলে?

[What is investment?]

১১· পুঁজি গঠন বলতে কি বোঝায়? এর বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা কর।

[What is meant by capital formation? Explain its different stages.]

১২· অর্থনীতিতে পুঁজি গঠনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

[State the importance of capital formation in an economy.]

১৩· পুঁজি-শ্রম অনুপাত বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর।

[Explain what is meant by capital-labour ratio.] [C.U., B.A. (Pass II) 1984]

১৪· পুঁজি-শ্রম অনুপাত বৃদ্ধির পথে বাধা কি?

[What are the hindrances to increase in the capital-labour ratio?]

১৫. পুঁজি গঠনের ব্যাপারে সব সমাজের সামনেই বাছাই করার একটা সমস্যা থাকে। উক্তিটি পরিস্ফুট কর।

[All societies face the problem of choice in the matter of capital formation. Elucidate the statement.]

১৬· অর্থনীতিক বিকাশের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে কোন্ কোন্ বিষয় সাহায্য করে? বিশদভাবে বিষয়গুলি আলোচনা কর।

[Which factors help in expediting economic development?]

১৭ কয়েকশ' বছর আগেকার পৃথিবীতে উৎপাদনের উপাদান কম ছিল না, অথচ মোট উৎপাদন খুব কম হত। এর কারণ কি ছিল?

[Several hundred years ago, there was no dearth of factors of production, yet total production used to be small. What were the reasons behind it?] [C.U., B.A. (Pass II) 1984]

১৮· উৎপাদন-উপাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি বলতে কি বোঝায়?

[What is meant by efficiency of factors?]

১৯· উৎপাদন প্রক্রিয়া অদক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা কিভাবে সেটা বুঝতে হবে?

[How is it to be ascertained whether any particular process of production is being carried on inefficiently?]

২০· হারভে লিবেনস্টাইন্ 'এক্স-দক্ষতা' কথাটির দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন উদাহরণের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain with the help of examples what Harvey Liebenstein has sought to mean by 'X-efficiency'?]

২১· 'এক্স-অদক্ষতা' ধারণাটি পরিস্ফুট কর।

[Elucidate the concept of 'X-efficiency'.]

২২· প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে অর্থনীতি কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা বিবৃত কর।

[State how an economy benefits from advancement of technology.]

২৩· আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে?

[What changes are being introduced in the relationship between man and machine by modern technology?]

২৪. অর্থনীতিক বিকাশে উদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।

[Describe the role of the entrepreneur in economic development.]

২৫· প্রযুক্তিবিদ্ ও উদ্যোক্তা একে অপরের পরিপূরক —এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

[The technologist and the entrepreneur are complementary to each other. Explain the significance of the statement.]

২৬· বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিশেষিকরণ এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ও কারিগরী কৌশলের উন্নতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

[Write short notes on : the relation between economic development and large-scale production and specialisation, disguised unemployment and improvements in technology.]

[B.U., B.A. (III) (78-79 Syll.) 1983]

২৭· কারিগরী কৌশলের উন্নতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। কি কি বিষয়ের উপর তা নির্ভর করে?

[Explain the nature of improvements in technology. On what factors does it depend ?]

[B.U., B.A. II) (80-81 Syll.) 1982]

২৮· অর্থবিদ্যায় পুঁজির সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া হয়? অর্থনৈতিক বিকাশে পুঁজি গঠনের ভূমিকা কি?

[How is capital defined in Economics ? What is the role of capital formation in economic development ?]   [C.U., B.A. (II) 1983]

২৯· প্রযুক্তিগত উন্নতির ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। এই প্রসঙ্গে উদ্ভাবন এবং বাণিজ্যিক প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[Explain the concept of technological improvement. Distinguish between invention and innovation.]   [C.U., B.A. (II) 1983]

অর্থনীতিক বিকাশতত্ত্বের ভূমিকা
Approaches To The Theory Of Development

অর্থনীতিক বিকাশের 'স্তর'/
অর্থনীতিক বিকাশের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব/
অর্থনীতিক বিকাশের উদ্বৃত্ত শ্রম-তত্ত্ব ঃ
প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার সমস্যা ও সমাধান /
উন্নয়নের পথে বাধা/
উন্নয়নের স্বয়ং-পুষ্টিকর দিক/
কারণসৃষ্ট সীমাবদ্ধতা/
উন্নয়নের আরম্ভ/
উন্নয়নের স্তর-বিভাগ সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব/
অধ্যাপক রস্টো বর্ণিত অর্থনীতিক উন্নয়নের
পাঁচটি স্তর/
আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

৭.১. অর্থনীতিক বিকাশের 'স্তর'
Stages of Economic Development

১. বিগত এক শতাব্দী বা তারও আগে থেকে অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ তত্ত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করে আসছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ যেসব স্তরের (stage) মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি অগ্রসর হয়েছে সে স্তরগুলি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন।

২. অনেকে বলেন, উন্নয়নের গতিপথে সব দেশকেই বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। স্তর বলতে তাঁরা যা বোঝেন তা হল "একটি নতুন অবস্থা যা পুরাতন অবস্থার সাথে প্রতিযোগিতা করছে।" **আডাম স্মিথ** যেভাবে স্তরগুলিকে ভাগ করেছেন তা হল, শিকার, মেষপালন, কৃষি, বাণিজ্য ও যন্ত্রযোগে উৎপাদন। **কার্ল মার্কসের** মতে স্তরগুলি হল, আদিম সাম্যবাদ, দাস সমাজ, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। জার্মান লেখক **লিস্ট** (১৮৪৪) স্তরগুলি নির্দেশ এভাবে করেছেন ঃ আদিম বন্য অবস্থা ; মেষপালন যুগ ; কৃষি যুগ, কৃষি ও যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের যুগ , কৃষি, যন্ত্রে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের যুগ। **হিলডিব্রাণ্ড** (১৮৬৪) বিনিময় সম্পর্কের দিক থেকে স্তর ভাগ এভাবে করেছেন ঃ প্রত্যক্ষ বিনিময়, অর্থের মাধ্যমে বিনিময় ; ঋণের মাধ্যমে বিনিময়। **অ্যাসলে ও আনউইনের** স্তর বিন্যাস হল ঃ পারিবারিক প্রথা, গিল্ড প্রথা, কারখানা প্রথা। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে **হফম্যান** স্তর ভাগ করেছেন। তিনি বিচার করেছেন শিল্পায়নের অগ্রগতির দিক থেকে। তিনি ভোগ্যদ্রব্যের নীট মূল্যের সাথে পুঁজিদ্রব্যের মূল্যের অনুপাত হিসাব করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শিল্পায়নের প্রথম অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্যের নীট মূল্য পুঁজিদ্রব্যের নীট মূল্যের ৪ বা ৫ গুণ হয়। শিল্পায়নের গতি যত ত্বরান্বিত হয় পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চাইতে তত বেশি হয়। শিল্পায়ন যখন খুব উঁচু স্তরে পৌঁছায় তখন শিল্পোন্নত দেশে দুই শ্রেণীর দ্রব্যেরই উৎপাদন প্রায় সমান হতে দেখা যায়। আবার কোনো কোনো উন্নত দেশে পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদন ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যেতেও দেখা যায়।

৩. আধুনিক কালে অর্থনীতিবিদরা যার উপর দৃষ্টি দিচ্ছেন তা হল **সমাজের অর্থনীতিক কাজকর্মের প্রকৃতি**। তাঁরা বিশ্লেষণ করছেন **দেশের অর্থনীতির কাঠামো** (struc-

ture)। তাঁরা দেখেছেন, অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়ন দ্রুত হয়। শিল্প ক্ষেত্রের প্রসার ও জাতীয় আয়ে তার অবদান কৃষিক্ষেত্র থেকে অনেক বেশি হয়। **কলিন ক্লার্কের** মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর বস্তুতপক্ষে তিনটি—(ক) স্বল্পোন্নত দেশে কৃষিই হল প্রধানতম পেশা। কৃষি থেকেই জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বেশি অংশ আসে। কৃষির মধ্যে অন্যান্য কিছু কাজও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন বনসম্পদ সংক্রান্ত কাজ, মৎস্যচাষ, মৌমাছি পালন ইত্যাদি কাজ। এ সমস্ত কাজ নিয়ে গঠিত হয় **অর্থনীতির প্রাথমিক ক্ষেত্র** (Primary sector)। (খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পক্ষেত্র অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ক্ষেত্র দ্রুতহারে প্রসার লাভ করে। অর্থাৎ, প্রাথমিক পর্যায় অপেক্ষা **দ্বিতীয় ক্ষেত্র** (Secondary sector) বেশি ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের কাজের মধ্যে আছে, যন্ত্র উৎপাদন, খনি ও নির্মাণমূলক কাজ। (গ) সবশেষে, অর্থনীতির অগ্রগতি হতে থাকে এবং **তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্রের** (Tertiary or Service sector) কাজকর্মই সব থেকে বেশি হারে বেড়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ের কাজের মধ্যে রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ। উন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, শিল্পায়ন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাবার পর, দ্বিতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্মের গতিবেগ কমে যায়, তুলনায় তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্মই বেড়ে যায়।

৪ সুদূর অতীত থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থনীতির ইতিহাস পর্যালোচনায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করা হল। এ স্তর বিন্যাস অবশ্যই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, এ ধরনের স্তরভাগ অবিসংবাদী, সব সমাজের ক্ষেত্রেই এরা সমভাবে প্রযোজ্য, এমন কথা বলা যায় না। কোনো কোনো অর্থনীতির ক্ষেত্রে এদের কোনো কোনোটি প্রযোজ্য হলেও কোনো একটি বিশেষ স্তর বিন্যাস পৃথিবীর সব দেশের পক্ষেই সত্য, এ ধারণা ঠিক নয়। একথা মানা যায় না যে, প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক স্তর অতীতে পর পর এভাবেই এসেছে এবং ভবিষ্যতে একই রকমের পারম্পর্য রক্ষা করে চলবে। এমনও হতে পারে, একটি অর্থনীতিতে হয়তো 'পরবর্তী' স্তরটি 'পূর্ববর্তী' স্তরের আগেই এসে পড়েছে। আবার এমনও হতে পারে, অগ্রগতির পথে একটি স্তর বাদ পড়ে গেল। সে স্তরটিকে ডিঙিয়ে অর্থনীতি এগিয়ে গেল। প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী স্তর থেকেই উদ্ভূত হবে, অথবা পরবর্তী একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে সব সময়ই উন্নীত হবে, এমনটি ইতিহাসে সব সময় হয়নি। রুশ বিপ্লবের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। মার্কসীয় স্তর বিন্যাস অনুসারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বাপেক্ষা উন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলিতেই প্রথম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী ও ফ্রান্সের মত অত্যধিক শিল্পোন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলির কোনোটিতে হয়নি। সে বিপ্লব হয়েছে রাশিয়াতে, যে রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে ধনতন্ত্রের বিকাশ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ কমই ছিল। এ বিষয়ে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। স্তরগুলি একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজও করে না। পুরাতন স্তরটির স্থানে যে নতুন স্তরটি আসে তাতে পুরাতন স্তরের অনেক কিছু থেকে যায় এবং দীর্ঘ দিন ধরে টিকেও যায়। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, একমাত্র কৃষিযুগ ছাড়া তার পরবর্তী সব কটি স্তরই মিশ্র স্তর। যেমন কৃষি-ব্যবসায়-শিল্পায়ন স্তর ইত্যাদি। সুতরাং সরলরেখার আকারে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ইতিহাসের স্তরে বিভক্ত করা যায় না। এ ধরনের স্তর বিন্যাসে ইতিহাসের গতিপথকে অসঙ্গত ও অযৌক্তিকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করে রাখার আশংকা থাকে।

৭.২. অর্থনৈতিক বিকাশের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব
Classical Theory of Economic Development

১ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা সাহসী ও দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অর্থনীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। দীর্ঘকালীন সময়ে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কি কি কারণে হয় এবং সে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই বা কি সেটার অনুসন্ধানই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের বিবেচনায় প্রধান বিষয়বস্তু ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

২. উন্নয়নের 'ক্লাসিক্যাল' তত্ত্ব ভালভাবে বুঝতে হলে **অ্যাডাম স্মিথ, টমাস্ ম্যালথাস্ ও ডেভিড্ রিকার্ডোর** চিন্তাধারা কি ছিল তা জানতে হয়।

'ক্লাসিক্যাল' অর্থনীতিবিদরা তাঁদের তত্ত্বে দু'টি বিষয়ের উপর বেশি জোর দিয়েছেন: (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং (২) প্রাকৃতিক উপকরণ। তাঁদের তত্ত্বের সিদ্ধান্ত দু'টি প্রধান ধারণার উপর নির্ভরশীল: (ক) শ্রমিকদের মজুরির হার জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরিহারের বেশি হলে জনসংখ্যা বাড়বে। (খ) জনসংখ্যা বাড়লে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হবে—অর্থাৎ শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন ক্রমশ কমবে।

৩. **ম্যালথাস্ ও রিকার্ডো** উভয়েই বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে একদিকে যেমন মৃত্যুহার কমে যাবে অন্যদিকে জন্মহারও বাড়বে। মৃত্যুহার কমে যাবে,

কারণ, উন্নয়নের ফলে খাদ্যোৎপাদন বাড়বে, জনসাধারণ বেশি পরিমাণে খাদ্য পাবে আর চিকিৎসার সুযোগ বেশি সংখ্যক লোক পেতে থাকবে, নতুন নতুন ঔষধ ও পথ্য রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে। জন্মহার বাড়বে, কারণ, আগের থেকে কম বয়সে মানুষ বিবাহ করবে, পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি হারে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে।

৪· দ্বিতীয় ধারণাটি অর্থনীতির অন্যতম একটি সূত্রের সাথে জড়িত। তাঁরা কৃষি জমিকে একটা স্থির উপাদান বলেই মনে করতেন। আর মনে করতেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি অর্থনীতির উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার প্রক্রিয়াটি হল ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। এই বর্ধিত চাহিদা মেটাতে দুটি কাজ করতে হতে পারে ঃ (ক) নতুন জমিতে খাদ্যোৎপাদন করা, অথবা (খ) যে জমিতে চাষ হচ্ছে সেখানে আরো বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে নিবিড় চাষের ব্যবস্থা করা। দেশে জমির মোট যোগান সীমাবদ্ধ ধরে নিলে অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের জন্য নতুন জমির ব্যবস্থা করা গেলেও সে জমি হবে নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কারণ তার তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতেই আগে চাষ শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে, যে উৎকৃষ্ট জমিতে ইতোমধ্যেই চাষ হচ্ছে সেখানে আরো বেশি সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করলে (অর্থাৎ নিবিড় চাষের চেষ্টা করলে) তাতে সীমাবদ্ধ জমিতে শ্রমিকের সংখ্যাই বাড়তে থাকবে এবং শ্রমিকের মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ কমতে থাকবে। উপরে বর্ণিত দুটো অবস্থাতেই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন অনিবার্যভাবেই কমতে থাকবে।
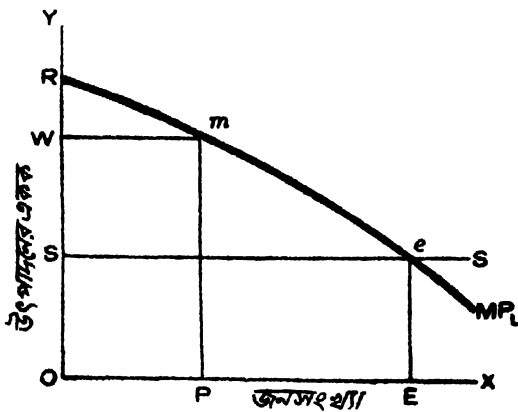
চিত্রে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব

চিত্র ৭·১

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা উপরের চিত্রটির সাহায্যে করা হয়েছে। OS রেখা শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নির্দেশ করেছে। মজুরি OS অপেক্ষা বেশি হলে, জনসংখ্যা বাড়বে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কি রকম হবে তা নির্দেশ করছে MPL রেখা। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্বলের যোগান সীমাবদ্ধ বলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হতে থাকবে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে ধরেই নেওয়া হয়েছে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিকের মজুরি তার প্রান্তিক উৎপন্নের (বা তার মূল্যের) সমান। ধনতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থায় মুনাফার জন্যই উৎপাদন করা হয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োগকর্তারা শ্রমিক নিয়োগের সীমারেখা কোথায় টানবে? নিয়োগকর্তার পক্ষে ততজন শ্রমিক নিয়োগ লাভজনক হবে, যা হলে, প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরি তার (প্রান্তিক) উৎপাদনের মূল্যের সমান হবে। শ্রমিকের মজুরি তার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হবার পর অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার লোকসান হবে। কারণ, পরবর্তী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন যা হবে, তার থেকে তার মজুরি হবে বেশি। মালিককে সে যতটুকু দিচ্ছে, নিচ্ছে তার থেকে বেশি। অন্যদিকে, এর থেকে কম শ্রমিক নিয়োগ করলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে না। সুতরাং নিয়োগের কাম্য স্তর হল মজুরির হার এবং প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমতা। ধনতন্ত্রী নিয়োগকর্তা তার বেশি বা কম শ্রমিক নিয়োগ করবে না। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, জনসংখ্যার যে কোনো স্তরে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ধারণ করে আমরা শ্রমিকের মজুরির হারও জানতে পারি।

৫· উদাহরণের সাহায্যে একে আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সমাজের এমন একটা স্তর কল্পনা করব যেখানে জনসংখ্যা খুবই কম। চিত্রে OP জনসংখ্যা নির্দেশ করছে। সমাজের OP জনসংখ্যায় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কত হবে সেটা MPL রেখা থেকে জানা যাবে। কারণ MPL হল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। মালিক শ্রমিককে কি মজুরি দেবে তাও বোঝা যাবে MPL রেখা থেকেই। চিত্রে দেখা যাবে OP জনসংখ্যার মজুরি হার হবে OW (কারণ OW = mP)। OW মজুরির হারে সমাজে ভারসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে না। এর কারণ হল, OW মজুরির হার জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরি হার (অর্থাৎ OS) অপেক্ষা অনেক বেশি। প্রচলিত মজুরি হার জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরি হার অপেক্ষা বেশি হলে জনসংখ্যা বাড়বে। কত অবধি জনসংখ্যা বাড়বে? চিত্রে দেখা যাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে OPE অবধি আসবে। কেন জনসংখ্যা OPE অবধি বাড়বে? এর উত্তর হল ঃ জনসংখ্যার এ স্তরে জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরি (OS) বাস্তব মজুরি

হারের (eE) সমান হবে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রবণতা আর থাকবে না। এতে ভারসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি হবে।

৬. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিতে যে স্থিতীয় অবস্থা'র (Stationary State) কথা বলেছিলেন চিত্রের e বিন্দু সেই অবস্থাটি নির্দেশ করে। এ অবস্থা সমাজের বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই চরম দুঃখ-দুর্দশার অবস্থা। এ অবস্থায় "একমাত্র ভূস্বামীরাই বহুল পরিমাণে উপকৃত হয়। কারণ, জনসংখ্যা বাড়লে জমির চাহিদাও বাড়ে ; কিন্তু জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলে জমির খাজনা বাড়ে।" প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও অর্থনীতিতে তার ব্যাপক প্রয়োগে 'স্থিতীয় অবস্থা'র বিশেষ কোনো হেরফের হওয়া কি সম্ভব? অর্থনীতির মধ্যে অন্যান্য সহায়ক উপাদান থাকলে সেগুলি 'স্থিতীয় অবস্থা'র দুর্দশা দূর করতে পারে কি? উত্তরে বলা যায়, এ সবের ফলে স্বল্পকালীন ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হলেও শেষ অবধি অবস্থা 'যথাপূর্বং তথাপরং' হয়েই থাকবে। কারণ, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ বা অনুকূল উপাদানের সাহায্যে MPL রেখা বর্তমানে যেখানে আছে সেখান থেকে আরও একটু ডানদিকে সরে যেতে পারে। তাতে ফল হবে এই যে, শ্রমিকের মজুরি কিছুটা বাড়বে। কিন্তু এটা হবে ক্ষণস্থায়ী। কিছুকালের মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেবে এবং বাস্তব মজুরির হার আবার জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরির স্তরে নেমে আসবে। নতুন অস্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। দুর্দশার অবস্থা চলতেই থাকবে।

৩. অর্থনৈতিক বিকাশের উদ্বৃত্ত শ্রম তত্ত্ব : প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার সমস্যা ও সমাধান : Labour Surplus Theories of Economic Development

১. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ পৃথিবীর বহুদেশের অর্থনীতিরই বিশিষ্ট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। এ সব দেশে স্বাভাবিক কারণেই শ্রমিক সংখ্যা বিরাট আকার ধারণ করছে। কর্মপ্রার্থী বহু, কিন্তু কর্মসংস্থান কম। তাই এ সব দেশে শ্রমিকের বিপুল উদ্বৃত্ত দেখা যায়। আধুনিক কালে এ পরিস্থিতি অর্থনীতিবিদদের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তাঁরা উদ্বৃত্ত শ্রমিকের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিকে বিচার-বিবেচনা করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করছেন তা হল :

স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে প্রধানত দু'টি ক্ষেত্র দেখা যায় : (ক) গতানুগতিক সুদীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান কৃষিক্ষেত্র, (খ) অতি ক্ষুদ্র পরিসরে ক্রিয়াশীল একটি আধুনিক শিল্পক্ষেত্র। এ সব দেশে 'উদ্বৃত্ত শ্রমিক' কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করা যায় : এ সব দেশে জনসংখ্যার চাপ ক্রমশই বাড়তে থাকে। জমির পরিমাণ বাড়ছে না। এ অবস্থায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে কোনো কাজের সুযোগসুবিধা না থাকায় কর্মপ্রার্থী মানুষ কৃষিতেই লেগে থাকে। ফলে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন শূন্যে এসে দাঁড়ায়। প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হওয়া সত্ত্বেও এরা কৃষি বা ঐ জাতীয় কাজে লেগে থাকে। তাই আপাতদৃষ্টিতে এদের বেকার বলে মনে না হলেও এরা আসলে বেকারের সমতুল্য বা প্রচ্ছন্ন বেকার ; বস্তুতপক্ষে কৃষিকাজে এদের লেগে থাকা না থাকা সমান। এ কথার তাৎপর্য হল এই যে, **কৃষিকাজ থেকে শ্রমিকদের একটা অংশ সরিয়ে নিলেও কৃষির মোট উৎপাদনে কোনো পরিবর্তনই হবে না।**

২. একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি খামারে ১০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। মনে করা যাক, খামারটির মোট উৎপাদন ২০০ টন। এমন যদি হয় যে, ঐ খামারে ৮ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে একই পরিমাণ উৎপাদন হয়, তাহলে বুঝতে হবে, ১০ জন শ্রমিকের শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ বা ব্যবহার হচ্ছে না। ৮ জনের কাজ ১০ জনে করছে। ২ জন শ্রমিক উদ্বৃত্ত বা প্রচ্ছন্ন বেকার। এদের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য (০), তাই এ ২ জনকে কৃষি থেকে সরিয়ে আনলে কৃষির কোনো ক্ষতি নেই। বরং, অন্য কোনো কাজে নিয়োগ করতে পারলে সেখানে এদের শ্রমের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব, সেখানে এরা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে পারে। অর্থনীতিবিদ **র‍্যাগনার নার্কসে** এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, **জনাধিক্যে ভারাক্রান্ত স্বল্পোন্নত দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারি পুঁজি গঠনের উৎস হতে পারে।** নার্কসের মতে 'প্রচ্ছন্ন বেকারী' হল, 'লুক্কায়িত সঞ্চয় সম্ভাবনা'। স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কৃষিক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন বেকারদের কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে অন্যত্র সামাজিক পুঁজিগঠনের কাজে স্বচ্ছন্দে নিয়োগ করা যেতে পারে। এতে কৃষি উৎপাদনের বিশেষ কোনো হেরফের হবে না। ঐ সব উদ্বৃত্ত শ্রমিক বা প্রচ্ছন্ন বেকারকে সেচ, জলনিষ্কাশন, রাস্তা নির্মাণ, রেলস্থাপন, কলকারখানা ও গৃহনির্মাণ, প্রশিক্ষণ, সমষ্টি উন্নয়ন, শিক্ষাপ্রসার ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এ কাজে একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের উন্নতি হয়, তেমনি স্থায়ী পুঁজিও সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন **নার্কসের হিসেব অনুসারে স্বল্পোন্নত দেশগুলির গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ১৫ থেকে ৩০ ভাগই হল প্রচ্ছন্ন বেকার।**

৩. এখানে দু'টি সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে :
(ক) এ সব উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের খাদ্যের ব্যবস্থা কিভাবে হবে ;
(খ) এদের কাজের জন্য হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জাম ইত্যা

কীভাবে সংগৃহীত হবে। প্রথম সমস্যাটি সম্পর্কে বলা যায়, উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের খাদ্য বাবদ অতিরিক্ত খরচ না করে তাদের পুঁজিগঠনের কাজে লাগান যেতে পারে। এ বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা নতুন নির্মাণ প্রকল্পে নিযুক্ত হবার আগে গ্রামে তাদের নিজ নিজ পরিবারের মধ্যেই থাকত। ঐ সময় (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের অবস্থায়) তারা যে খাদ্য গ্রহণ করত, এখন সে খাদ্য সংগ্রহ করে শ্রমিকদের নতুন কর্মস্থলে নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারলে অতিরিক্ত খাদ্য কিছুই লাগবে না। অথচ, তাদের শ্রমে যে নতুন পুঁজি সৃষ্টি হবে তার বিশেষ সুবিধা ও উপকারিতা এই যে, নতুন পুঁজি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বাইরের কোনো শক্তির উপর নির্ভর না করে নিজে নিজেই তৈরি করে চলতে থাকবে (self-financing)। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সেটা হল প্রচ্ছন্ন বেকার বাহিনীর জন্য আগে যে খাদ্য খরচ হত নতুন কাজে নিয়োগের পর তাদের সেই খরচ বেড়ে যেতে পারে। যেমন, নতুন কাজে এখন বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে বলে তারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে খাদ্য খেতে পারে, এবং প্রচ্ছন্ন বেকাররা অন্যত্র চলে যাবার পর তাদের পরিবারের লোকেরা বেশি খেতে শুরু করতে পারে। এ সবের ফলে সামগ্রিকভাবে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে এবং এ প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ করা নাও যেতে পারে। এ অবস্থায় যা করা দরকার তা হল গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে সরকারী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে তা নতুন কর্মে নিযুক্ত প্রচ্ছন্ন বেকারদের সরবরাহ করা। এভাবে সংগৃহীত খাদ্য পরিমাণে যথেষ্ট না হলে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে।

৪. দ্বিতীয় সমস্যাটি হল নতুন প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জাম সংক্রান্ত। এ সমস্যার সমাধানে কৃষিতে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশের কৃষিজমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত, তা ছাড়া একই ব্যক্তির জমি এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত, অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এ ভাবে চাষ করা হয় বলে অনেক বেশি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দরকার হয়। আবার, অনেক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির পূর্ণতম ব্যবহার সম্ভব হয় না এমনও দেখা যায়। জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি একত্রিত করে চাষ করা হলে বেশ কিছু সংখ্যক সাজসরঞ্জাম উদ্বৃত্ত হতে পারে। এগুলি নতুন প্রকল্পের কাজে প্রচ্ছন্ন বেকারেরা ব্যবহার করতে পারে এবং দরকারী কিছু কিছু সাজসরঞ্জাম, হাতিয়ার নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে। প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সাধারণ সরঞ্জাম বিদেশ থেকেও আমদানি করা যেতে পারে। তবে এমন সব সাজসরঞ্জাম ও হাতিয়ার আমদানি করা দরকার যেগুলি স্বল্পোন্নত দেশ নিজের কাজে যথাযথভাবে লাগাতে পারে। স্বভাবতই, স্বল্পোন্নত দেশের প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান ও উৎপাদন পদ্ধতি যে স্তরে রয়েছে তার সাথে খাপ খাওয়ানো যায় এমন ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করাই উচিত। এ ভাবে হাতিয়ার ও সরঞ্জাম সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়। খাদ্যের বাবদে অতিরিক্ত খরচ না করে হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জামের জন্যও অতিরিক্ত খরচ না করে প্রচ্ছন্ন বেকারদের নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে নিয়োগ করে নতুন পুঁজি সৃষ্টি করা যেতে পারে। সমগ্র বিষয়টিকে **নার্কসের** কথায় বলা যায়: **গ্রাম থেকে 'হাত' (অর্থাৎ শ্রমিক) নতুন নির্মাণ প্রকল্পের স্থানে যাবে, 'হাতের' সঙ্গে সঙ্গে 'মুখ'ও ঐখানে আসবে; গ্রামের 'মুখের' সংখ্যা কমে যাওয়ায় খাদ্যও গ্রাম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে নির্মাণ প্রকল্পের স্থানে আসবে; সে খাদ্য নির্মাণ প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রয়োজন মেটাবে। অন্যদিকে গ্রামে যারা রয়ে গেল তাদের ভোগের পরিমাণের কোনো হ্রাস হবে না।**

৫. **প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের মধ্যে সঞ্চয় সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে—এ তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগে কয়েকটি অসুবিধা দেখা দিতে পারে।** গণতান্ত্রিক পথে যে সব স্বল্পোন্নত দেশ এগিয়ে যেতে চায় তাদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে তা দেখা দিতে পারে। অসুবিধাগুলি হল: (ক) নার্কসের মতে গ্রাম থেকে সরিয়ে আনা নতুন নির্মাণ প্রকল্পে নিযুক্ত প্রচ্ছন্ন বেকারদের এবং গ্রামে যে সব শ্রমিক রয়ে গেল তাদের **ভোগ প্রবণতা** (propensity to consume) অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু নার্কসের এ ধারণা যে সঠিক এমন কথা বলা যায় না। **কুরিহারা** মনে করেন, **পুঁজি সৃষ্টির কাজে প্রচ্ছন্ন বেকারদের নিয়োগ করলে সমগ্র অর্থনীতিতেই ভোগ প্রবণতা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা।** এতে ফল হবে এই যে, পুঁজিগঠনের কাজে যে সম্বল ব্যবহার করা যেত সেটা ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে নিযুক্ত হতে থাকবে। **এতে পুঁজিগঠনের গতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে।**

(খ) নার্কসে প্রচ্ছন্ন বেকারদের নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহের কথা বলেছেন। এ জন্য বিভিন্ন কৃষি পরিবার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর জন্য খাদ্য-ভাণ্ডারে প্রতিটি কৃষক পরিবার কি পরিমাণ খাদ্য দেবে? তারা যদি স্বেচ্ছায় খাদ্য দিতে না চায় তখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? তা ছাড়া, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্য দেওয়া নেওয়ার পরিবহণ খরচই বা কে বহন করবে?

(গ) এ তত্ত্বে বলা হয়, কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিক সরিয়ে নিলে বাজারে বিক্রয়যোগ্য কৃষি পণ্যের উদ্বৃত্তের পরিমাণ (marketable surplus) বাড়বে। এ ধারণা

সঠিক বলে অনেকে মনে করেন না। **ক্যালডারের মতে,** স্বল্পোন্নত দেশের কৃষকেরা প্রধানত নিজেদের ভোগের উদ্দেশ্যে চাষ করে, বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়। তাই এ সব কৃষকেরা কি পরিমাণ খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনে তা নির্ভর করে কৃষকদের শিল্পদ্রব্যের চাহিদার উপর। এখন প্রচ্ছন্ন বেকার বাহিনী কৃষিক্ষেত্র থেকে সরে গেলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যাবে। তাতে বাজারে (অর্থাৎ শহর শিল্পাঞ্চলে) বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল কম আসারই সম্ভাবনা। এর ফলে কর্মে নিযুক্ত প্রচ্ছন্ন বেকারদের খাদ্য সরবরাহের সমস্যার কোনো সমাধান হবে না।

(ঘ) নিজ নিজ পরিবারের পরিজন ছেড়ে, পরিবারিক বাসস্থান থেকে দূরে নতুন কর্মস্থলে যেতে প্রচ্ছন্ন বেকাররা কতটা রাজি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

(ঙ) নার্কসের মতে পুঁজিগঠন প্রকল্পে নিযুক্ত প্রচ্ছন্ন বেকারদের আর্থিক মজুরি দেবার বিষয়টি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। কারণ ধরে নেওয়া হয় যে পুঁজিগঠনের কাজ নিজেই নিজের সম্বল তৈরি করে নিয়ে এগিয়ে চলে। শ্রমিকেরা খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সুনিশ্চিতভাবে পায় বলে আর্থিক মজুরি ছাড়াই তারা কাজ করবে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক বলে মনে করা যায় না। কারণ আর্থিক মজুরির আকর্ষণ না থাকলে প্রচ্ছন্ন বেকারদের কাজে টেনে আনা যাবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। এ প্রসঙ্গে **লিউইস** বলেন, যে সব দেশে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক কাজে লাগাবার ব্যবস্থা ও আইন আছে সে সব দেশে আর্থিক মজুরি না দিয়েই শ্রমশক্তিকে পুঁজিগঠনের কাজে নিযুক্ত করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু যে সব দেশে এটা করা সম্ভব নয়, সেখানে প্রচ্ছন্ন বেকারদের বিনা মজুরিতে কাজে লাগান খুবই শক্ত। এ ব্যাপারে দু'ধরনের নীতি প্রযুক্ত হতে পারে, সর্বাত্মক শাসনব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রে বা সমাজতন্ত্রে সংগঠিত মানুষের স্বেচ্ছাশ্রমে ও স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রে শ্রমিকদের দিয়ে অনেক সময় বল প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরনের কাজ করান সম্ভব হতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটা সম্ভব হয় না। এখানে চীনদেশে গৃহীত নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপ্লবের সময় চীনও ছিল স্বল্পোন্নত দেশ। প্রচ্ছন্ন বেকার ছিল কোটি কোটি। লুক্কায়িত সঞ্চয় সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সেখানে প্রচ্ছন্ন বেকারদের বিভিন্ন পুঁজি গঠন প্রকল্পে নিয়োগ করা হয় সারা দেশ জুড়ে। সমাজতন্ত্রী দেশ বলে চীনে প্রচ্ছন্ন বেকারদের কাজে টেনে আনতে জবরদস্তি করতে হয়নি। সেখানে সমাজের সাধারণ মানুষকে সামাজিক চেতনা ও রাজনীতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। অতি নগণ্য, অবহেলিত মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল গভীর দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধ। এরই ফলে আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে প্রচ্ছন্ন বেকারদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। মানুষের মধ্যে সুপ্ত কর্মশক্তি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। জোর খাটাতে হয়নি। নাৎসী জার্মানীতে বা ফ্যাসিস্ত ইতালীতে হিটলার ও মুসোলিনির শাসনকালে বলপ্রয়োগের দ্বারা এ ধরনের কাজ করান হয়েছিল।

(চ) **লিউইস** মুদ্রাস্ফীতি ও লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের কথা বলেছেন। লিউইস বলেন, উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যাপারে মূল সমস্যাটা স্থির পুঁজির স্বল্পতা নয়, সমস্যাটা হল কার্যকর পুঁজির স্বল্পতা। কারিগরি পুঁজি যোগাড় করা গেলেও সমস্যাটা দূর হয় না। বরং সমস্যাটা অন্যভাবে দেখা দেয়। এর কারণ হল নতুন পুঁজি গঠনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা মজুরি পাবে কিন্তু তাতে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে না অথচ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। এর ফলে বিদেশ থেকে ভোগ্যদ্রব্য আমদানি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেবে। বৈদেশিক লেনদেন উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেবে। সরকার এটা প্রতিরোধ করার জন্য আমদানির উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি করলে দেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের সীমিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করবে, মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি দেখা দেবে।

(ছ) প্রচ্ছন্ন বেকারদের সকলে না হলেও বেশির ভাগই 'অদক্ষ ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অজ্ঞ' এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা স্থির পুঁজি খুব বেশি পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব নয় বলেই অনেকে মনে করেন। এ সব শ্রমিক বড় জোর কারখানা স্থাপনের জন্য জলাভূমি পরিষ্কার করা, রাজপথ তৈরি করার জন্য মাটি ফেলে রাস্তা উঁচু করা, শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন দ্রব্যসামগ্রী হস্তশিল্পের মাধ্যমে তৈরি করা প্রভৃতি কাজ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ কথা মানতেই হয়, শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে যে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতির দরকার হয় তা যোগাড় করা সম্ভব একমাত্র যন্ত্রপাতি তৈরি করেই। প্রচ্ছন্ন বেকার কখনই এ যন্ত্রপাতির প্রতিকল্প (substitute) হতে পারে না।

(জ) **নার্কসে** পুঁজিগঠনের উপর জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব কি হতে পারে সেটা ভাল করে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পুঁজি গঠনকে দু'ভাবে ব্যাহত করে: (১) প্রচ্ছন্ন বেকারদের পুঁজিগঠনের কাজে সরিয়ে এনে সমাজে যতটুকু সঞ্চয়-সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বেশির ভাগই 'অনুৎপাদনশীল' বলে এরা নিজেরা কিছু সৃষ্টি না করে সমাজের সঞ্চয় সম্ভাবনার সবটুকুই ভোগ করে ফেলে। (২) সাধারণভাবে দেখা যায়, পুঁজিগঠনের হারের চেয়ে অনেক বেশি হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলে। ফলে প্রচ্ছন্ন বেকারদের দ্বারা যতটা পুঁজিগঠন হয়,

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মধ্য থেকে প্রচ্ছন্ন বেকারের সৃষ্টি তার থেকে অনেক বেশি হারে হতে থাকে।

(ঝ) নার্কসের মতে 'অনুৎপাদনশীল' প্রচ্ছন্ন বেকারদের কাজে লাগিয়ে সামাজিক উপরি-পুঁজিগঠন (social overhead capital) করা হবে। হার্শম্যান ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে দেখছেন। তিনি বলেন সামাজিক উপরি পুঁজিগঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবশ্যই দরকার। কেননা, উপরি পুঁজিগঠনের ফলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়, ত্বরান্বিত হয়। হার্শম্যান এটাকে 'সহায়ক' (permissive) উপাদান বলেছেন। হার্শম্যান একান্তভাবে অপরিহার্য উপাদানটিকে বলছেন 'বাধ্যতামূলক' (compulsive)। এ উপাদান বস্তুতপক্ষে 'প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কর্ম': লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম নির্মাণ শিল্প—বাধ্যতামূলক পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।' তবে হার্শম্যানের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে নার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্ট। প্রচ্ছন্ন বেকারদের নিয়োগ করে সামাজিক উপরি-পুঁজি গঠন করা সম্ভব হলেও, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ওই ধরনের পুঁজি কিছুটা গৌণ ভূমিকাই গ্রহণ করবে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মত প্রকাণ্ড অপরিহার্য শিল্প গঠনে প্রচ্ছন্ন বেকারদের নিয়োগ সম্ভব নয়। কারণ এদের প্রযুক্তি বিদ্যার শিল্প প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রায় নেই বললেই চলে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাজে নিযুক্ত হবার পক্ষে এরা মোটেই উপযুক্ত হতে পারে না।

৬. বহু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদরা সাধারণভাবে স্বীকার করেছেন যে, প্রচ্ছন্ন বেকারদের মধ্যে সঞ্চয় সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম কাজ হল, এ সঞ্চয় সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করা। তাতে পুঁজিগঠন হতে থাকে। শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হতে থাকে।

৭. ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্বৃত্ত শ্রমিক যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে সেটা হল: প্রথমত, কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের শিল্পক্ষেত্রে আকৃষ্ট করতে হবে। এ কাজে, শ্রমিকদের এমন একটা হারে মজুরি দিতে হতে পারে যেটা 'প্রচ্ছন্ন বেকার' অবস্থায় কৃষিতে লেগে থাকলে তারা যা পেত তার চাইতে অন্তত কিছুটা বেশি। তবে এটা ধরেই নেওয়া যায়, শিল্পক্ষেত্রে তারা কম মজুরিই পাবে, কারণ কৃষিক্ষেত্রে তারা যা পেত সেটা খুবই কম। দ্বিতীয়ত, যতদূর পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করে মালিক মুনাফা সর্বাধিক করতে পারে, সে ততদূর অবধি শ্রমিক নিয়োগ করবে বলে ধরে নিলে, শিল্পমালিকেরা বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করবে বলে মনে হয়। কারণ তাতে মুনাফার পরিমাণই বাড়বে। তৃতীয়ত, ধরে নেওয়া যায় মালিকেরা তাদের মুনাফার খুব বড় একটা অংশ যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, বাড়ি প্রভৃতি পুঁজিদ্রব্য তৈরি করার কাজে পুনরায় বিনিয়োগ করবে। এর ফলে শিল্পক্ষেত্র প্রসার লাভ করবে। তাতে কৃষিক্ষেত্র প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আরো শ্রমিক নিয়োগের ফলে মালিকের মুনাফার পরিমাণ আরো বাড়বে, বর্ধিত মুনাফার সবটুকু বা তার একটা অংশ পুনরায় বিনিয়োগ হবে। তাতে শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটতে থাকবে। প্রচ্ছন্ন বেকার বা উদ্বৃত্ত শ্রমিকও ক্রমশ বেশি বেশি করে নিযুক্ত হতে থাকবে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি এভাবেই কাজ করে। প্রক্রিয়াটি সব স্তরে সুষ্ঠুভাবে কাজ করলে কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-স্থানান্তর ব্যাপক ভাবে হতে থাকবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও, শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত দেশের মোট শ্রমশক্তির তুলনায় বাড়তে থাকবে।

৮. উদ্বৃত্ত শ্রমিক নিয়োগে শিল্পক্ষেত্র কিভাবে সম্প্রসারিত হয় চিত্র ৭.২-এ তা দেখান হল। জনসাধারণ যদি অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ হয়, যদি তাদের প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাব থাকে, তারা যদি উৎপাদন কাজে যথেষ্ট উদ্যোগী না হয় তবে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতম ব্যবহার হবে না। অন্য দিকে স্বল্পোন্নত দেশের মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ এ কারণে যে, দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ স্বল্পব্যবহৃত বা অব্যবহৃত বা নষ্ট হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, দেশের জনসাধারণের পশ্চাৎপদ অবস্থার একই সঙ্গে কারণ ও পরিণতি হল অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ।
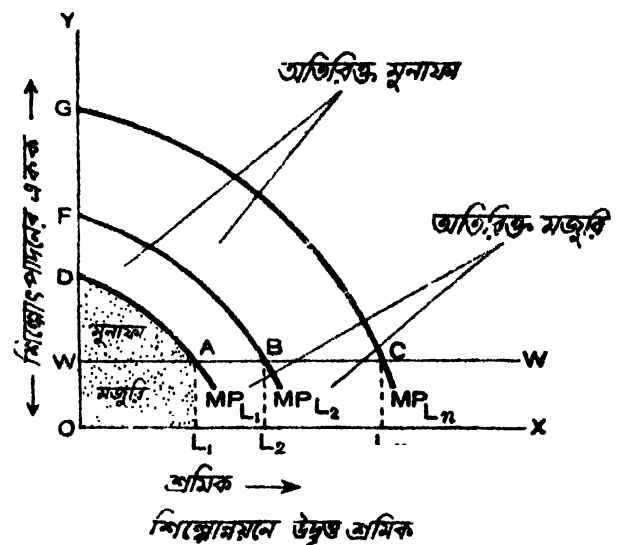
শিল্পোন্নয়নে উদ্বৃত্ত শ্রমিক

চিত্র ৭.২

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি পাপচক্রের তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। মাথাপিছু আয়ের স্তর যখন খুব নিচু থাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তখন এক ধরনের পাপচক্র

সৃষ্টি করতে পারে—ধরা যাক, খুব দরিদ্র দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হল। এর ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এ দেশে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে, অর্থাৎ জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাবে। অবস্থাটা এমন হতে পারে, মাথাপিছু উৎপাদন (আয়) কমে গিয়ে আগের স্তরেই ফিরে আসতে পারে। [উদাহরণ—জনসংখ্যা ১,০০০, মোট উৎপাদন ১,০০০, মাথাপিছু উৎপাদন ১। পরবর্তী স্তরে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হল ১০,০০০, মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হল ১০। উন্নত আয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে মৃত্যুহার কমে যাবে। জনসংখ্যা বাড়বে। জনসংখ্যা বেড়ে ১০,০০০ হল। মাথাপিছু আয় ১০ থেকে ১এ নেমে এল।] এটিই হল জনসংখ্যা সংক্রান্ত পাপচক্র বা 'জনসংখ্যা ফাঁদ' population trap)।

চিত্রে OW মজুরির হার নিচু। উন্নয়নের গোড়ার দিকে এ হার নিচুই থাকবে কারণ কৃষিক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক উদ্বৃত্ত শ্রমিক রয়েছে। গোড়ার দিকে শিল্পে পুঁজির পরিমাণ কম বলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনও (MPL_1) কম। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শিল্পায়নের প্রথম দিকে OL_1 সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করবে। মজুরির হার কম বলে মালিক OL_1 সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেও মুনাফা করবে। চিত্রে এ স্তরে মুনাফার পরিমাণ হবে WDA। [এ ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, OL_1 সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন হয় $ODAL_1$, এর মধ্যে $OWAL_1$ হল শ্রমিকদের মোট মজুরি। মোট উৎপাদন $ODAL_1$ থেকে মোট মজুরি $OWAL_1$ বাদ দিলে যা পড়ে থাকে সেটাই হল মুনাফা WDA।]

শিল্পমালিকেরা তাদের মুনাফার সবটুকুই পুনরায় বিনিয়োগ করছে। নতুন পুঁজিদ্রব্য নিয়ে কাজ করে মোট উৎপাদন বাড়াচ্ছে। নতুন পুঁজির মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিও ধরা হচ্ছে। আর ধরা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ। এ সব কিছুর মোট ফল হবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি। ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা উপরে ডানদিকে সরে যাবে। এ রেখাটি তখন হবে MPL_2। এ স্তরে মোট শ্রমিক নিয়োগ হবে OL_2।

পূর্ববর্তী স্তরে OL_1 ছিল শ্রমিকের সংখ্যা। দ্বিতীয় স্তরে L_1 থেকে L_2 পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ বেড়েছে। L_1L_2 সংখ্যক শ্রমিকের অতিরিক্ত উৎপাদন হল DAL_1L_2BF। অতিরিক্ত শ্রমিক অতিরিক্ত মজুরি পাচ্ছে AL_1L_2B। সুতরাং এরা অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টি করল FDAB। তৃতীয় স্তরে দেখান হয়েছে, শ্রমিকের সংখ্যা L_2 থেকে বেড়ে L_3। এই অতিরিক্ত শ্রমিকেরা অতিরিক্ত উৎপাদন করল FBL_2LnCG। তারা মজুরি হিসেবে পেল BL_2LnC। অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টি করল FBCG। এই প্রক্রিয়াতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে থাকবে। শ্রমিক উদ্বৃত্তের ছকটি (model) এভাবেই পরিস্ফুট করা হচ্ছে। এ ছক থেকেই দেখান হয়েছে শ্রমিক উদ্বৃত্ত কি ভাবে উন্নয়নের পথে অর্থনীতিকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

৯. এ প্রক্রিয়ায় অবাধ ও স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করার পথে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। শিল্প বিকাশের সাথে সাথে যদি কৃষিরও বিকাশ না হয় তবে প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। শিল্প ক্ষেত্রে যত বেশি প্রচ্ছন্ন বেকার নিযুক্ত হতে থাকবে ততই আয়ও বাড়তে থাকবে। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, এই বর্ধিত আয়ের একটা অংশ খাদ্যদ্রব্যে ব্যয় হবে। তা ছাড়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপেও খাদ্যের চাহিদা বাড়বে। এ পরিস্থিতিতে কৃষির উৎপাদন না বাড়লে কৃষিপণ্যের দাম বাড়বে, কৃষিক্ষেত্রের মজুরিও বাড়বে। ফলে শিল্প মালিকদেরও পূর্বাপেক্ষা বেশি মজুরি দিয়েই প্রচ্ছন্ন বেকারদের কাজে নিয়োগ করতে হবে। ৭২ চিত্র থেকে বোঝা যাবে, মজুরি হার বেশি হলে মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। মালিকদের কাছে লব্ধ মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করার ব্যাপারে আকর্ষণ ও আগ্রহ কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। নতুন পুঁজিদ্রব্য সৃষ্টি ও শিল্প বিকাশের গতিতে বাধা সৃষ্টি হবে। প্রচ্ছন্ন বেকার বাহিনী যে হারে কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হচ্ছিল সেটা কমে যাবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধা আসবে। **সুতরাং এ প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নয়নও প্রয়োজন।**

৭.৪. উন্নয়নের পথে বাধা
Obstacles to Growth

১ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে দেখা যায় সত্যিকারের উন্নয়ন হয়েছে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশেই—সব দেশে নয়—এবং উন্নয়ন অতীতে হয়েছে অত্যন্ত ঢিমেতালে, ধীর গতিতে। উন্নয়নের গতি দ্রুত হতে আরম্ভ করেছে মাত্র শ' দুয়েক বছর আগে, বিশেষ করে বিগত একশ বছরে সেটা উল্লেখযোগ্য গতিবেগ পেয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশ আজও পশ্চাৎপদ, স্বল্পোন্নত। সুদীর্ঘ কালের অনড় অবস্থা এ সব দেশে যেন চিরস্থায়ী হতে চাইছে। এ রকম কেন হচ্ছে? এর উত্তর সঠিকভাবে দিতে গেলে উন্নয়নের এমন একটি সাধারণ তত্ত্ব চাই যে তত্ত্বে সব কিছু ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু অদ্যাবধি তেমন কোনো সর্বব্যাপক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২. এ ধরনের কোনো তত্ত্ব এখনো প্রতিষ্ঠিত না হলেও এ তত্ত্বের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় অর্থাৎ উন্নয়নের পথে বাধাগুলি কি এবং কেন—সে সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনীতিবিদরা করেছেন। এ প্রসঙ্গে যে ধারণাটি সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে সেটি হল 'দারিদ্র্যের পাপচক্র'।

দারিদ্র্যের পাপচক্রের মূল কথা হল : একটি দেশের দারিদ্র্যই হল দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা। যুক্তিটা এ রকম ; দেশটি দরিদ্র তাই এটা উন্নতির পথে এগোতে পারছে না ; উন্নতির পথে এগোতে পারছে না বলে দেশটি দরিদ্র হয়েই থাকছে। নার্কসে পাপচক্রের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন : গুচ্ছবদ্ধ কিছু শক্তি বৃত্তাকারে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে একটি দরিদ্র দেশ দরিদ্র অবস্থাতেই থাকতে বাধ্য হচ্ছে। উদাহরণ, একজন দরিদ্র ব্যক্তির যথেষ্ট খাদ্য নেই। তাই সে প্রয়োজনের তুলনায় কম খায়। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বলতার জন্য তার কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। ফলে সে যথেষ্ট আয় করতে পারছে না। সে দরিদ্র হয়েই থাকছে। এ কারণে যথেষ্ট খাদ্য যোগাড় করতে পারছে না। এ ভাবে পাপচক্রটি আবর্তিত হচ্ছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে উদাহরণ দেওয়া হল সেটি জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমরা নার্কসের এ সূত্রটি উল্লেখ করতে পারি : "একটি দেশ দরিদ্র, কারণ দেশটি দরিদ্র।"

৩. স্বল্পোন্নত দেশে মূল পাপচক্রটি চাহিদা ও যোগান—এ দু'টো দিকেই রয়েছে। চাহিদার দিক থেকে পাপচক্র নিম্নলিখিত ভাবে আবর্তিত হয় : এ সব দেশে মোট উৎপাদনশীলতা কম→ফলে প্রকৃত আয় কম→প্রকৃত আয় কম বলে চাহিদা কম→ চাহিদা কম বলে বিনিয়োগও কম→ বিনিয়োগ কম হওয়ার অর্থ হল পুঁজির অভাব হওয়া→পুঁজির অভাবের জন্য মোট উৎপাদনশীলতাও কম। এভাবে পাপচক্রটি পূর্ণ হল। ৭·৩ চিত্রে পাপচক্রটিকে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

চিত্র ৭·৩

৪. যোগানের দিকে পাপচক্রটি এভাবে আবর্তিত হচ্ছে : স্বল্প উৎপাদনশীলতা→স্বল্প প্রকৃত আয়→স্বল্প সঞ্চয়→স্বল্প বিনিয়োগ→স্বল্প পুঁজি গঠন→স্বল্প উৎপাদনশীলতা। ৭·৩ চিত্রে এ পাপচক্রটি পরিস্ফুট করা হয়েছে।

৫. এ দু'টি ছাড়া আরো একটি পাপচক্র রয়েছে। এ চক্রটি মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্বল সংক্রান্ত। এটি এভাবে আবর্তিত হয় : দেশের প্রাকৃতিক সম্বলের উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার নির্ভর করে জনসাধারণের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। সে উৎপাদন ক্ষমতা স্বল্প হলে প্রাকৃতিক সম্বলেরও স্বল্প ব্যবহার ঘটবে। এবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি পাপচক্রের তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। মাথাপিছু আয়ের স্তর যখন খুব নিচু থাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তখন এক ধরনের পাপচক্র সৃষ্টি করতে পারে। ধরা যাক, খুব দরিদ্র দেশে মাথাপিছু উৎপাদন অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি হল। এর ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ দেশে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে ; অর্থাৎ জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়বে। অবস্থাটা এমন হতে পারে মাথাপিছু উৎপাদনের সামান্য বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি হারে বেড়ে যেতে পারে। এর নীট ফল হবে মাথাপিছু উৎপাদন (আয়) কমে গিয়ে আগের স্তরেই ফিরে আসতে পারে। [উদাহরণ : জনসংখ্যা ১,০০০, মোট উৎপাদন ১০,০০০, মাথাপিছু উৎপাদন ১০; পরবর্তী স্তরে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হল ১২,০০০, মাথাপিছু আয় ১২। উন্নত আয়ের ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৃত্যুহার কমে যাবে। জনসংখ্যা বাড়বে। জনসংখ্যা ১,২০০ হল। মাথাপিছু উৎপাদন (আয়) ১২ থেকে ১০-এ নেমে এল।] এটিই হল জনসংখ্যা সংক্রান্ত পাপচক্র বা 'জনসংখ্যার ফাঁদ' (population trap)।

৬. মাথাপিছু আয়ের স্তর বেশ কিছুটা উপরে উঠে গেলে ব্যাপারটা অন্য রকমের হয়। খুব বেশি আয়ের স্তরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি আয়ের উপর বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার নাও করতে পারে। এ অবস্থা আসে তখনই যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার বেশি হয়। এ রকম ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে চলার গতিবেগ পায় এবং সে গতিবেগ নিজ শক্তিতে অর্জিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হল পুঁজির স্বল্পতা। দারিদ্র্য, স্বল্পোন্নতি ও পুঁজির স্বল্পতা—এগুলি এক পাপচক্রের মধ্যে ক্রমাগত আবর্তিত হতে থাকে। তাই দারিদ্র্য একই সঙ্গে পুঁজির স্বল্পতার কারণ ও পরিণতি। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা এ ভাবে করা যায়, স্বল্পোন্নত দেশে জনসাধারণ অতিশয় দরিদ্র। তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, অদক্ষ। তারা পুরাতন (প্রায় অচল) পুঁজি দ্রব্য ও উৎপাদন কৌশল

নিয়ে কাজ করে। তাদের কৃষিকাজের প্রধান লক্ষ্য হল প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য উৎপাদন। তাই তারা বাজার নির্ভর অর্থনীতির (market economy) বাইরেই থেকে যায়। তাদের শ্রমের গতিশীলতা খুবই কম। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা খুবই কম। উৎপাদনশীলতা কম বলে প্রকৃত আয়ও কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম, পুঁজিগঠনের হারও তাই কম। তাদের জীবনযাত্রার মান ও ভোগের স্তর এত নিচু যে ভোগের পরিমাণ কমিয়ে কিছু সঞ্চয় করা অসম্ভব। তাই আধুনিক পুঁজিদ্রব্য ব্যবহার করা এদের সাধ্যের বাইরে। যদি কখনও কিছু করা সম্ভবও হয়, সে সঞ্চয় তারা প্রকৃত বিনিয়োগে না লাগিয়ে সোনাদানা, গহনা, বা জমি কিনে খরচ করে। দেশে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার আশানুরূপ না হওয়ার জন্যই বিনিয়োগের ইচ্ছা থাকলেও তারা তা করতে পারে না। কৃষকেরা নিজেদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তাদের আয়ের পরিমাণ যদি বাড়াতে পারতো, তবে বর্তমান ভোগের উপর কিছুটা উদ্বৃত্ত ভবিষ্যতের পুঁজি গঠনের জন্য সরিয়ে রাখতে পারতো। অর্থাৎ সঞ্চয় সৃষ্টি হত। এটিই একটি পাপচক্র। কারণ, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে চাই আরও বেশি যন্ত্রপাতি, আরো উন্নত ধরনের কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম। অর্থাৎ আরো পুঁজি। পুঁজি না হলে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়। উৎপাদনশীলতা না বাড়ালে সঞ্চয় বাড়বে না, পুঁজি সৃষ্টিও হবে না। স্বল্পোন্নত দেশে যা কিছু সঞ্চয় তা আসে উচ্চ আয়ের মানুষদের কাছ থেকেই। কিন্তু সঞ্চয়ের বেশির ভাগই বিনিয়োগের কাজে নিযুক্ত হয় না। বাড়িঘর, জমিজমা, সোনাদানা, গহনা, দ্রব্যসামগ্রীতে অথবা দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় মজুদ সৃষ্টি, নানা ধরনের অনুৎপাদনশীল যেমন ফাটকা। কাজে ঋণ হিসাবে খাটানো প্রভৃতি ব্যাপারে এ সঞ্চয়কে লাগানো হয়। এ ছাড়া আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয়ে ঐ সঞ্চয়ের একটা অংশ অপচয় করা হয়। গুণের দিক থেকে দুটোই একই স্তরের হলেও স্বদেশে উৎপন্ন জিনিস ব্যবহার না করে আমদানী করা জিনিসের দিকেই আকর্ষণ এ সব শ্রেণীর মানুষের খুব বেশি দেখা যায়।

৭. স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও বিনিয়োগের আগ্রহ কম হয় কেন? কারণ অনেক। যেমন দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আর্থিক নীতির অব্যবস্থা, যৌথ পরিবার প্রথা, যার কুফল হল সম্বলের অপচয় আর ব্যক্তিগত উদ্যোগের বাধা সৃষ্টি এবং কয়েক ধরনের ভূমি ব্যবস্থা। এ ছাড়া রয়েছে পুরাতন অভ্যাস ও চিন্তাধারা গতানুগতিকভাবে অতীত কাল থেকে যা চলে আসছে, যা কিছু পরিচিত তাকে আঁকড়ে থাকা। মানুষের মন প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ অনুসরণ করতে চায়— অজানা, অচেনা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দিকে স্বাভাবিকভাবেই মন যেতে চায় না।

৮. স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগের সমস্যাটি কয়েকটি পাপচক্রের সহিত জড়িয়ে থাকে। একটি পাপচক্র হল 'সীমাবদ্ধ বাজার' সংক্রান্ত। এটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বৃহদায়তন শিল্পের জন্য চাই বিরাট বাজার। কিন্তু দরিদ্র দেশে বাজারের আয়তন ছোট হবেই। বৃহদায়তন শিল্প গড়ে না ওঠা পর্যন্ত বাজারের আয়তন বড় হবে না। বাজারের আয়তন বড় হবার পথে অন্যতম বাধা হল পরিবহণ সংসরণ ও স্থায় সম্পদ। রাস্তাঘাট তৈরি, রেলপথ স্থাপন, বন্দর নির্মাণ, জাহাজ ও জাহাজঘাট তৈরি, প্রচুর সংখ্যক লরী, ট্রাক, প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবহণ সংক্রান্ত দ্রব্য বাজারের আয়তন বৃদ্ধির কাজে পরিবহণ ... এ সব তৈরি করবার জন্য বৃহৎ শিল্প স্থাপন করা দরকার। অতএব বৃহদায়তন শিল্প গঠনের জন্য চাই বড় আয়তনের বাজার, আবার, বড় আয়তনের বাজারের জন্য চাই বৃহদায়তন শিল্প—এটাই হল পাপচক্র।

৯. বৃহদায়তন উৎপাদন হল পরস্পর নির্ভরশীল উৎপাদন। বৃহদায়তন উৎপাদনে যত বেশি বিশেষায়ন (specialisation) ঘটে ততই বৃহদায়তন শিল্পকে অন্যান্য সাহায্যকারী শিল্পের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, সহায়ক শিল্পগুলি যন্ত্রপাতি বা অসম্পূর্ণ দ্রব্য সরবরাহ না করলে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখানেও একটি পাপচক্রের সন্ধান পাওয়া যায়। চক্রটি এ রকম: বৃহদায়তন শিল্পের জন্য চাই সহায়ক শিল্প। অর্থাৎ, সহায়ক শিল্প গড়ে না উঠলে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে উঠবে না। আবার বৃহদায়তন শিল্প গড়ে না উঠলে সহায়ক শিল্পগুলিই বা গড়ে উঠবে কেন এবং কিভাবে?

এ সব দেশে বিনিয়োগের পথে আর একটি বাধা হল ব্যাংক ও ঋণের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের অভাব। বৃহদায়তন শিল্পের জন্য যে বিপুল পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়, কোনো একজন উদ্যোক্তার একার পক্ষে এত অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। তাই চাই ব্যাংক ও ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। আর চাই সুগঠিত পুঁজির বাজার। স্বল্পোন্নত দেশে এদের কোনোটাই খুব একটা উন্নত স্তরে থাকে না।

১০. উন্নয়নের পথে কয়েকটি বাধা সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা সংক্রান্ত। নাকসের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের মানুষের গুণাগুণ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক আকস্মিক ঘটনা প্রভৃতি বিষয়ের অবদান ও প্রভাব অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজি খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু কেবল পুঁজিই যথেষ্ট নয়। সার্বিক বিচারে বলা যায়, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এমন সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মনোভাব দেখা

যায় সেগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এ সব সমাজের মানুষ পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন এবং সে স্তরবিভাগ কঠোর ও অনমনীয়। এ সমাজের মানুষের চোখে ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকা অমর্যাদাকর। বৃত্তি হিসাবে এগুলি নিম্নশ্রেণীর। উচ্চতর সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে এরা নিন্দনীয়। এ সব সমাজে রয়েছে বর্ণভেদ প্রথা, ধর্মের অত্যধিক প্রভাব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রাচীন নিয়ম। এসব সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রধানত জাতিভিত্তিক; অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র জাতির প্রতি আনুগত্যের বদলে নিজ নিজ বসতি অঞ্চলের প্রতিই অধিক আনুগত্য দেখা যায়। এ সব উপাদান সামাজিক ও ভৌগোলিক সচলতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে এসব দেশের মানুষ, বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে যে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়, তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ঐতিহ্য ও পুরাতন প্রথার বাইরে কিছু করা চলবে না, স্থিতাবস্থা বজায় থাকুক, তাতে উন্নতি হোক বা না হোক—এটাই মানুষের চিন্তাধারা। এ সব দেশে পরিবার হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক একক। পারিবারিক সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গী জনজীবনের প্রায় সব কিছুই নির্ধারণ করে। পরিবারের বাইরে যাওয়া কেউ অনুমোদন করে না। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরিবারের প্রতি ঐক্যবোধ ও আনুগত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রতি অনিচ্ছা ওই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে শিক্ষা করণিক (clerks) সৃষ্টি করতে পারে সে শিক্ষার প্রতিই বেশি আগ্রহ। তাই প্রযুক্তিবিদ্যা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য। এ কারণে দৈহিক শ্রম লাগে এমন কাজের প্রতি ঘৃণা ও অবহেলা। যারা এ ধরনের কাজে নিযুক্ত হয় তারা তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসে নিম্নতর পর্যায়ে অবস্থান করতে তারা বাধ্য হয়।

এ সব দেশে (বিশেষ করে প্রাচ্য দেশগুলিতে) জনমানসে ধর্মের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। ফলে এমন এক মানসিকতা গড়ে ওঠে যা কঠোর শ্রম ও মিতব্যয়িতার বিরোধী। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অজস্র অর্থের অপব্যয় নিন্দিত না হয়ে অভিনন্দিত হয়। পুঁজিগঠন যে এ জন্য ব্যাহত হবেই তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১১. **মিন্ট** (Myint), **প্রীবিশ** (Prebisch), **লিউইস** (Lewis) **ও মিরডাল** (Myrdal) প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের পথে আর এক ধরনের বাধার কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, **উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে তাতে উন্নত দেশগুলির বেশি লাভ হচ্ছে।** বিষয়টিকে তাঁরা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: বিগত কয়েক দশক ধরে স্বল্পোন্নত দেশগুলি বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করেছে ও তাদের রপ্তানির পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়েছে। কিন্তু এতে স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি হয়নি, এ সব দেশের কেবল রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পেরই যা কিছু সম্প্রসারণ হয়েছে। অন্যান্য শিল্প অবহেলিত হয়েছে, তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। এ সব দেশের অর্থনীতি অনিবার্য কারণেই রপ্তানি নির্ভর হয়ে পড়েছে। রপ্তানির উপর অত্যধিক নির্ভর করার কুফল এই যে, আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা ও দামের ওঠানামার সাথে সাথে রপ্তানিকারী দেশের অর্থনীতিতেও অস্থিরতা দেখা দেয়। তার উপর উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্য চক্রের দরুন এসব দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। **উন্নত দেশগুলি যখন মন্দার কবলে পড়ে বাণিজ্য শর্ত** (terms of trade) **তখন স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রতিকূল হয়।** ফলে তাদের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক পাওনার পরিমাণ দারুনভাবে কমে যায়। তাদের লেনদেনের ব্যালান্স (balance of payments) প্রতিকূল হয়। বিদেশে মন্দা দেখা দিলে স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানী দ্রব্যের দাম বিদেশের বাজারে অবশ্যই কমে যাবে। দাম কমে গেলে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবার সম্ভাবনাও থাকে না, কেননা দেখা গেছে, স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানী দ্রব্যের যোগান মূলত অস্থিতিস্থাপক। স্বল্পোন্নত দেশগুলি প্রধানত কৃষিপণ্য ও খনিজ দ্রব্য রপ্তানি করে বলেই প্রয়োজন মত বেশি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ সব দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে পারে না। আবার, বিশ্বের বাজারে তেজীভাব এলেও তার সুযোগ স্বল্পোন্নত দেশগুলি নিতে পারে না। **বাণিজ্য শর্ত স্বল্পোন্নত দেশের অনুকূল হলেও তারা এর সুযোগ নিয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সক্ষম হয় না।** এর কারণ, স্বল্পোন্নত দেশের বাজারের অসম্পূর্ণতা, প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব এবং অর্থনীতির গঠনে সমন্বয়ের অভাব। তা ছাড়া রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশ থেকে পাওয়া অর্থ ফাটকা কারবারে, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রায়, জমি বাড়ি ক্রয়ে, বিদেশের ব্যাঙ্কে, বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে লাগান হয়। সত্যিকারের পুঁজিগঠন আর হয় না।

১২. আরও একটি বাধা হল **স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের অদ্ভুত রূপ।** অভিজ্ঞতা হল, বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ থাকে প্রধানত রপ্তানী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। এর ফলে রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার ও উন্নতি ঘটলেও প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত জনসমষ্টির উৎপাদনশীলতা বা আয়ের বৃদ্ধি বা তাদের জীবন-

যাদের মানের কোনো উন্নতি হতে দেখা যায় না। এমন কি রপ্তানী দ্রব্য শিল্পে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিও খুব নিম্নস্তরেই থাকে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা মুনাফা ও পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে প্রচুর অর্থসম্পদ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিজের দেশে নিয়ে যায়। এই বিনিয়োগকারীরা তাদের মুনাফা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরাসরি তুলে নেয়। সরাসরি না তুলে যদি তারা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে দ্রব্য বা সেবা আমদানি করত তবে বৈদেশিক বিনিয়োগের ফল অশুভ না হয়ে সুবিধাজনক হতে পারত। অধ্যাপক **প্রীবিশ** (Prebisch) দেখিয়েছেন বিগত ৭০ বছর ধরে উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শর্ত (terms of trade) স্বল্পোন্নত দেশগুলির দিক থেকে কেবলই প্রতিকূল হচ্ছে। এটা যদি সাময়িক ঘটনা হত তাতে অত উদ্বেগের কারণ থাকত না। কিন্তু এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলির এক দীর্ঘকালীন সমস্যা। অর্থাৎ ভবিষ্যতেও এ সমস্যার কোনো সমাধান হবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। প্রতিকূল **বাণিজ্য শর্ত স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজি গঠনে বাধা দেয় অর্থাৎ অর্থনীতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।**

৭.৫. উন্নয়নের স্বয়ং-পুষ্টিকর দিক
Self-sustaining Aspects of Growth

স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উন্নয়নের পথে অনেক বাধা। বাধাগুলি কি তা আমরা আগের অংশে আলোচনা করেছি। **উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে স্বল্পোন্নত অর্থনীতিকে সব বাধা দূর করতে হয়।** ধরা যাক, একটি স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হল, উন্নতির পথে চলতে গিয়ে অর্থনীতি কতদূর যাবে বা যেতে পারে? কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়ে যাবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? **উন্নতির পথে একবার চলতে আরম্ভ করলে আপন বেগেই অর্থনীতি চলতেই থাকবে—এমন কোনো আশ্বাস কেউ দিতে পারে কি?** অর্থনীতিবিদরা অনেকে মনে করেন, অর্থনীতি যত উন্নত হতে থাকে ততই সেই উন্নত অর্থনীতি এমন কিছু শত কার্য সাধনের উপায় (mechanism), বাস্তব অবস্থা, দৃষ্টি ভঙ্গী, মানসিকতা সৃষ্টি করে যেগুলি উন্নয়নের শক্তিগুলিকে নব বলে বলীয়ান করে। নতুন বল সঞ্চয় করে ঐ শক্তিগুলি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অগ্রগতির পথে ঠেলে নিয়ে যায়। এভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হয়। নিজেই নিজেকে ধারণ ও বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কেন এটা সম্ভব হয়? এর কয়েকটা কারণ উল্লেখ করা যায়।

(ক) সম্প্রসারণশীল বাজার: অর্থনীতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের আয়তন বড় হতে থাকে। পরিবহণ সংসরণ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নতি হতে থাকে। উন্নয়নের ফলে উৎপাদন বাড়ে। যানবাহনের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী দেশের দূরতম অঞ্চলেও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। নতুন নতুন ক্রেতাগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে দেবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সংকীর্ণ বাজার ক্রমশই বড় হতে থাকে। দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতেও শিল্পপ্রসার সম্ভব হয়। শিল্পগুলির আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখা দেয়। বড় শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। যেমন আধা-তৈরী জিনিস, যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহের জন্য আবো অনেক ছোটখাট বা মাঝারি সহায়ক শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ ধরনের সহায়ক শিল্পের যত বেশি প্রসার হতে থাকে, ততই বড় বড় শিল্পস্থাপনের মজবুত ভিত্তি তৈরী হতে থাকে। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বেকারদের কাজের ব্যবস্থা হয়। সমাজের উৎপাদন ও আয় বাড়ে। চাহিদাও সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে। এ চাহিদা মেটাতে উদ্যোক্তাদের মনে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে শ্রমবিভাগ সূক্ষ্মতর হতে থাকে। ফলে বৃহদায়তন শিল্পস্থাপনের দৃঢ় ভিত্তি তৈরী হয়। সমগ্র অর্থনীতির মধ্যে বিপুল কর্মোদ্যম সৃষ্টি হয়। এর সুফল ভোগ করে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র। প্রতিটি ক্ষেত্রই সম্প্রসারিত হতে থাকে সব ক্ষেত্রেই মাথাপিছু উৎপাদন বাড়তে থাকে। এইভাবে অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। নতুন শক্তি সঞ্চয় করে নিচুস্তর থেকে উঁচুস্তরের দিকে অর্থনীতি এগিয়ে চলে।

(খ) পুঁজি গঠন: উন্নয়নের পথে অর্থনীতি কিছুটা এগিয়ে যাবার পর সেখানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি যখন খুবই পশ্চাৎপদ থাকে তখন দারিদ্র্যও খুব ব্যাপক ও গভীর হয়। এবং আয়ের স্তর এত নিচু থাকে যে সঞ্চয় হয় না বললেই চলে। তাই বিনিয়োগের কোনো প্রশ্নই থাকে না। উন্নয়নের সাথে সাথে আয়ের স্তরও উঁচু হতে আরম্ভ করে। ব্যয়ও অবশ্য বাড়ে—তা সত্ত্বেও কিছুটা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বিনিয়োগ করার মত ব্যবস্থাদি নেওয়াও অর্থনীতির পক্ষে সম্ভব হয়। উন্নতির পথে চলতে চলতে শিল্পের মুনাফা বাড়তে থাকে। সেই মুনাফার সবটুকু না হলেও বেশ বড় একটা অংশ পুনর্বিনিয়োগ হবে। অর্থাৎ, মুনাফা পুঁজিতে রূপান্তরিত হবে, পুঁজি গঠন হবে। তাতে শিল্পও সম্প্রসারিত হতে থাকবে। প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফার পরিমাণও বাড়তে থাকবে। এই মুনাফা পুঁজি হিসাবে খাটান চলবে। এতে শিল্পের আরও বেশি সম্প্রসারণ হবে, মুনাফার পরিমাণও বাড়বে—সেটা পুনর্বিনিয়োগ হবে—

এভাবে উন্নয়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। শিল্পবিকাশের ফলে সমাজে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে, আর সে উদ্বৃত্ত শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে আসছে—তারা এ উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এ থেকে বলা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিজের গতিপথে নিজেই পুঁজির উৎস সৃষ্টি করে চলে।

(গ) নতুন নতুন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ (innovation) ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন : অর্থনীতি যত উন্নত হতে থাকবে, গবেষণা, নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ও শিক্ষা প্রসার প্রভৃতি ব্যাপারে ততই বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে। শিল্পগুলি তাদের মুনাফা যেমন পুঁজি গঠনের কাজে লাগাতে থাকবে, তেমনি এটাও সম্ভব যে, তারা গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পেও তাদের সম্পদের একটা অংশ নিয়োগ করবে। সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারের ফলে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ সম্ভব হবে, শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে আরো বেশি কুশলী ও দক্ষ হবে। সাধারণভাবে পুরাতনের বর্জন, নতুনের প্রবর্তন ও ক্রমাগত অগ্রগতিকে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে—এমন এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শন সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়। এ সব কিছুর নীট ফল দাঁড়ায় উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলবার মত অর্থনীতির নিজস্ব শক্তি সঞ্চয়। এ জন্যই বলা হয়, উন্নয়নই পরবর্তী উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করে। এ কারণে 'ক্লাসিক্যাল' অর্থনীতিবিদদের সেই আশঙ্কাকে—অর্থাৎ সমাজে সম্পদের স্বল্পতার ও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটা স্তর অবধি অগ্রসর হয়ে তার পর এক নিশ্চল অবস্থায় এসে দাঁড়াবে—অমূলক বলে মনে করা হয়।

৭.৬. স্বয়ংসৃষ্ট সীমাবদ্ধতা
Self limiting Aspects

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে, সেটা নিজেই নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তির বলে অবিরাম উন্নয়নের পথে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, চলার পথের পাথেয় বা রসদ নিজেই সৃষ্টি করে নিতে থাকবে—এ তত্ত্ব অনেকেই বাস্তবভিত্তিক বলে মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন এর মধ্যে অতিসরলীকরণ দোষ রয়েছে। তাই এটাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। তাঁদের বক্তব্য হল, অর্থনীতি উন্নয়নের পথে এগিয়ে চললেও অর্থনীতির মধ্যে কিছু কিছু নেতিবাচক শক্তি তাদের ক্রিয়া আরম্ভ করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নেতিবাচক এই শক্তি বা বিষয়গুলি হল : (১) কুজনেৎসের মতে, অতি উচ্চ আয় অর্থনৈতিক প্রণোদনা ও কাজের স্পৃহা কমিয়ে দিতে পারে। কোনো উদ্যোক্তার আয় খুব বেশি হলে আরো অর্থ উপার্জনের জন্য আরো বেশি পরিশ্রম করার আগ্রহ কমে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। (২) শিল্পে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দূর করার জন্য শিল্পে নতুন সংস্থার প্রবেশ বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হতে পারে। (৩) কোনো দেশেই উন্নয়নের সহায়ক উপাদানগুলি অফুরন্ত নয়। তাই উপাদানের স্বল্পতা অনেক সময় উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। (৪) ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে উপাদানসমূহের (ভূমি, শ্রম, পুঁজি) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হ্রাসের প্রবণতা দেখা দিতে পারে। (৫) উন্নয়ন প্রক্রিয়া পৃথিবীর সব দেশে যতই পরিব্যাপ্ত হতে থাকবে, ততই পৃথিবীর পরিবেশ সংক্রান্ত (environmental) ও প্রাণিজগৎ প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য সংক্রান্ত (ecological balance) সমস্যা দেখা দিতে আরম্ভ করবে। ইতিমধ্যে সে সমস্যা নানা দেশে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে)। তখন এ সমস্যাই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করে দেবে। (৬) উন্নয়নের কাজে ভুল বা অবাস্তব নীতি প্রয়োগ করা হলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। আর্জেন্টিনার উদাহরণ থেকে দেখা যায়, অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আর্জেন্টিনার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বহু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-হারের সাথে সমান তাল রেখে চলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে আর্জেন্টিনায় জীবনযাত্রার মান ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। ঐ সময়ে তার সামনে ছিল উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা। ১৯৬০-এর পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, এমন সব ভুল ও অবৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক নীতি ঐ দেশে প্রবর্তন করা হল, যার ফলে আর্জেন্টিনার উন্নয়নের গতি খুব বেশি রকম হ্রাস পেতে আরম্ভ করল। (৭) **অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টির ব্যাপারে বাণিজ্য চক্রের (business cycles) ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে হয়।** বাণিজ্য চক্র পরিকল্পনাহীন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। ধনতান্ত্রিক বাজারনির্ভর অর্থনীতিতে তেজী ও মন্দার আবির্ভাব ঘটে। তেজীর সময় উৎপাদন, বিনিয়োগ, আয়স্তর প্রভৃতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে তারপর বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়স্তর ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়, বেকারী সর্বব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, উৎপাদনের উপাদান অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে—এ অবস্থাটা হল মন্দা। গভীর মন্দার সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শূন্যে নেমে আসে। উন্নয়ন প্রক্রিয়াও গুরুতরভাবে বাধা পায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসতে পারি: উন্নয়নের পথে নানা বাধা সত্ত্বেও দীর্ঘকালীন

বিচারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি যে অগ্রগতির পক্ষে এগিয়ে চলেছে ও চলছে এটা ঠিক। বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায়, যে সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে বা তারও আগে শুরু হয়েছিল সে সব দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আর যে সব স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে তাদেরও অগ্রগতি হচ্ছে বটে তবে জীবনযাত্রার মানের হিসেবে অগ্রসর দেশগুলির সাথে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একটি তথ্য হল, ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু উৎপাদন বেড়েছে ৫৩ শতাংশ আর স্বল্পোন্নত দেশে বেড়েছে ২৭ শতাংশ। পরবর্তী-কালে এই প্রবণতাটি আরও বেড়েছে বই কমেনি। এটি বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক ফল।

শেষ বিচারে বলা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নপ্রক্রিয়া নিজেই নিজের শক্তি ও পুষ্টি সংগ্রহ করে স্বয়ংচল হয়ে বহুদূর অগ্রসর হতে পারে। দূর ভবিষ্যতে কি হবে, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এ মন্তব্য করা যায় যে, আগামী দিনে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকবে।

৭৭. **উন্নয়নের আরম্ভ : 'শিল্প বিপ্লব' / 'যাত্রা শুরুর পর্ব' / 'জোরে ধাক্কা'**

Getting Started . Inductrial Revol ıtiod Take of / Big Push

১ আধুনিক পৃথিবীর বহু উন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল আজ থেকে কোথাও দু'শ বছর, কোথাও বা এক শ' বছর আগে। এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে যে যুগ শুরু হয়েছে সে যুগে বহু দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কাজ শুধু যে আরম্ভ হয়েছিল তাই নয়, অনেক দেশ সে কাজে বহুযুগ অগ্রসর হয়ে এসেছে। এখন প্রশ্ন হল, উন্নয়ন বলতে যা বোঝায়, সেটা কি যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত ধীর গতিতে গতানুগতিক ধারায় চলে আসা অর্থনীতির মধ্যে আপনা আপনি স্বাভাবিক-ভাবেই এসেছিল, নাকি উন্নয়নের আরম্ভের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা বা বিশেষ কোনো ঘটনার দরকার হয়? যদি কোনো কিছুর দরকার হয় তবে সেটা কি? উত্তরে বলা যায়, উন্নয়নের আরম্ভের জন্য চাই বিরাট প্রচেষ্টা, ব্যাপক প্রস্তুতি, বেশ কিছু সময় নিয়ে কয়েকটি সহায়ক শক্তির কেন্দ্রীভবন, এগুলি থাকলে তবেই উন্নয়ন আরম্ভ হতে পারে, এগুলি হল সেই উপাদান যা অর্থনীতিতে সৃষ্টি করে এক প্রচণ্ড ও প্রগাঢ় গতিশক্তি। এই গতিশক্তি এক বিরাট ধাক্কা (push) দিয়ে প্রায় নিশ্চল অর্থনীতিকে তার পুরাতন পরিচিত চলার পথ থেকে আকস্মিকভাবে তুলে নিয়ে তীব্র গতি সঞ্চার করে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। এমন প্রচণ্ড গতি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় যার ফলে অর্থনীতি। ঠিক বিমান যেমন আকাশে ওড়ার জন্য মাটির উপর খানিক দূরে ছুটে গিয়ে মাটি ছেড়ে উপরে ওঠে তেমনি) উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এ অবস্থাকেই বলা হয় উন্নয়নের আরম্ভ।

২. এখানে বলা দরকার, উন্নয়নের আরম্ভটা কিন্তু কখনই ঢিমে তালে হয়নি। কখনই আয়াসহীন ঝঞ্ঝাটমুক্ত পথে হয়নি, হয় না। এ পথে উন্নয়নের চেষ্টা করলে কোনো দেশের পক্ষেই বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয় না। দারিদ্র্যের পাপচক্রের মধ্যেই তাকে ঘুরপাক খেতে হয়। পাপচক্র ভেঙে বেরিয়ে আসতে হলে, উন্নয়নের পক্ষে এগোতে হলে, দরকার প্রবল ধাক্কার। ধাক্কাটা যথেষ্ট জোর না হলে যে সব নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হতে থাকে সেগুলি ব্যবহার করে অর্থনীতি এগিয়ে চলতে পারে না।

৩. উন্নয়নের ইতিহাস থেকে, সব উন্নত দেশের ক্ষেত্রেই খাটে এমন কয়েকটি ঘটনার কথা বলা যায় : (ক) উন্নত দেশগুলির উন্নয়নের গোড়ার দিকে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত অগ্রগতি হতে দেখা গেছে। উন্নয়নের সাথে সাথে প্রযুক্তি-বিদ্যা যেমন নতুন নতুন আবিষ্কারে আরো বেশি গুণগত উৎকর্ষ লাভ করেছে, তেমনি এই উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থ-নৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করেছে, তার গতি ত্বরান্বিত করেছে। (খ) উন্নয়নের প্রথম দিকে পুঁজি গঠনে মোট উৎপাদনে যে অংশ বিনিয়োগ করা হত, তার অনুপাতও ক্রমশই বাড়তে থাকে। (গ) শিল্পগুলির সাংগঠনিক কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান আয়তনে বড় হয়েছে। (ঘ) উৎপাদন পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রমবিভাগ (Division of Labour) আরও ব্যাপক ও গভীর হয়েছে। ফলে উৎপাদনের কাজে দক্ষতা ও নৈপুণ্য ক্রমাগত বেড়েছে। (ঙ) এসব পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের ফলে শ্রমিক ও উদ্যোক্তার চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। এ চাহিদা পূরণে শ্রমিক ও উদ্যোক্তার যোগানও ব্যাপকভাবে বাড়াতে হয়েছে। (চ) সব উন্নত দেশেই উন্নয়নের গোড়ার দিকে কিছু পরিমাণ প্রাথমিক নির্মাণের কাজ বা 'প্রস্তুতি'র কাজ হয়েছিল। এর জন্য দরকার হয়েছিল সারা দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম এমন একটি কেন্দ্রীয় সরকারের। (ছ) আর থাকার দরকার হয়েছিল এমন কিছু উদ্যোগী লোকের যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে নিষ্ঠার সাথে আত্মনিয়োগ করবে। এরাই হল উদ্যোক্তা। এ আত্মনিয়োগ তাদের কেউ কেউ করেছিল হয়ত নিজেদের লাভের জন্য, কেউ বা সমাজের কল্যাণের জন্য, আবার কেউ সামরিক প্রয়োজনে অথবা অন্য কোনো লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, একথা ঠিক যে উন্নয়নের কাজে

এগিয়ে আসার জন্য কিছু লোকের প্রয়োজন ছিল এবং তারা এগিয়ে না এলে উন্নয়নের কাজ আদৌ সম্ভব হত কিনা বলা শক্ত। মোদ্দা কথা হল, আরম্ভটা চাই। সেই আরম্ভ বিরাট ও প্রবল হওয়া চাই।

৪ তবে আরম্ভটা সব উন্নত দেশে যে একই ধরনের হয়েছে, এমন নয়। আরম্ভের ধরন বা ধাপ কি রকম হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন, উন্নয়ন কখন শুরু হয়েছিল অর্থাৎ প্রথম দিকে না শেষের দিকে। এ দেশটি কি উন্নয়নের প্রবর্তক দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি অথবা এ দেশ শুধু অন্য কোনো উন্নত দেশের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিল, এ দেশটি কি প্রযুক্তিবিদ্যা নিজেই আবিষ্কার করে নিয়েছিল, না সেটা বিদেশ থেকে আমদানি করে নিজের দেশে প্রয়োগ করেছিল, ইত্যাদি।

৫ এ প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে আরম্ভের ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল তার আলোচনা খুবই যুক্তিসংগত। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবই হল এ দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের আরম্ভ। আধুনিক পৃথিবীর অর্থনীতির উন্নয়নে ইংলণ্ডের ভূমিকা হল প্রবর্তকের ভূমিকা। তাই দারিদ্র্যের পাপচক্র ভাঙতে ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের তাৎপর্য অপরিসীম। শিল্প বিপ্লবের মূল বিষয় তাই আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নের আরম্ভ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি নতুন ধারণা আলোচনার মধ্যে এনেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল 'যাত্রা শুরুর পর' (Take off) এবং 'জোরে ধাক্কা' (Big push)।

৬ **শিল্প বিপ্লব** (Industrial Revolution): ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে অর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটেছে বাস্তবিক পক্ষে তার শুরু হয়েছে ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে বলা যায়, এ বিপ্লব একদিনে হয়নি। যে শক্তিগুলি শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে, তারা বহু শতাব্দী ধরেই ক্রিয়াশীল থেকে ধীরে ধীরে তার প্রয়োজনীয় ভিত্তিটি তৈরি করেছে।

সে যুগের যেটা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তা হল প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব ও [illegible] অগ্রগতি। এ অগ্রগতি হয়েছিল বলেই সে যুগে কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক যুগের বিরাট কারখানা কিছুতেই গড়ে উঠতে পারত না যদি সেই যুগে ইংলণ্ডে প্রযুক্তিবিদ্যার তেমন অগ্রগতি না হত। ইংলণ্ডের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন কৌশলের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হতে থাকে। প্রযুক্তিবিদ্যার ও নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এই নতুন এবং উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাই সম্ভব করেছে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলা, বিপুল পরিমাণ পুঁজির বিনিয়োগ এবং তার পণ্য [illegible]। [illegible] সম্ভব করেছে [illegible] শ্রমিক বাহিনী নিয়োগ ও তাদের শ্রমশক্তির সুষ্ঠু ও দক্ষতাপূর্ণ প্রয়োগ। একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, সেটা হল শিল্প [illegible] যা কিছু প্রয়োজন তা সবই [illegible] ইংলণ্ডের বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগ। [illegible] সংগঠিত [illegible] সরকারী হস্তক্ষেপ [illegible] সরকারী সাহায্য [illegible] হোক [illegible] ইংলণ্ডে শিল্প [illegible] অর্থনীতির [illegible] যাত্রা শুরু [illegible] সংগঠিত হয়েছিল।

৭ **যাত্রা শুরুর পর** (The Take Off): [illegible] take off কথাটির একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। [illegible] ওঠার আগে সব বিমান বিমানবন্দরে [illegible] প্রথমে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে [illegible] আরম্ভ করে। বেশ কিছু পথ চলার পর গতিবেগ [illegible] বিমানখানা মাটি ছেড়ে [illegible] উঠে গন্তব্যস্থলের দিকে নিজের গতি ও শক্তিতে চলতে আরম্ভ করে। বিমানখানি যে মুহূর্তে মাটির সংস্পর্শ ছেড়ে উপরে উঠল তখনই তার টেক অফ আরম্ভ হল। এ শব্দটি বিমান চালনা বিদ্যা থেকেই অর্থবিদ্যাতে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধারণাটির সাহায্যে অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া কি ভাবে কাজ শুরু করে তারই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গতানুগতিকভাবে চলে আসা, দারিদ্র্যের পাপচক্রে ঘুরপাক খাওয়া প্রায় নিশ্চল অর্থনীতি অলস গতিতে চলতে চলতে কেন, কি ভাবে, কখন, কোন শক্তির ক্রিয়ায় অকস্মাৎ সম্মুখ পানে ছুটতে আরম্ভ করে—সেটাকেই একটি উপমার সাহায্যে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

অর্থনীতিতে এ ধারণাটির প্রবর্তন করেছেন **অধ্যাপক রস্টো** (W. W. Rostow)। অর্থনীতিক উন্নয়নের সমগ্র প্রক্রিয়াকে তিনি মোট পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন। 'টেক-অফ' হল সে পাঁচটি স্তরের একটি।

রস্টোর মতে 'টেক অফ' হল সেই স্তর যে স্তরে উন্নয়নই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। সে স্তরে প্রগতি ও আধুনিকতার শক্তিসমূহ পুরাতন অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। পুরাতন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থবোধের জায়গায় নতুন মূল্যবোধ ও স্বার্থ

চেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এগুলি একবার গড়ে উঠতে আরম্ভ করলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে এরা ব্যাপক ও গভীরভাবে স্থান করে নেয়। এদের গড়ে ওঠার গতিও দ্রুততর হয়।

রস্টো আরো বলেছেন, টেক অফ হল একটা শিল্প বিপ্লব। সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিব মৌলিক পরিবর্তন ব্যাপক ও সুগভীর হয়ে স্বল্পকালের পরিসরে যখন অর্থনীতির উপর চূড়ান্ত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে তখন তারই পরিণতিতে ঘটে শিল্প বিপ্লব।

রস্টো বিভিন্ন উন্নত দেশের উন্নয়নের ইতিহাস থেকে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন 'টেক অফ' এর সাধারণ কাল ব্যাপ্তি হল মোটামুটিভাবে দুই দশক। কোথাও কোথাও তার কিছু কমবেশি হয়েছে। নিচে কয়েকটি দেশের 'টেক অফ' এর কাল ব্যাপ্তি রস্টো এভাবে নির্দেশ করেছেন :

দেশ	টেক অফ
গ্রেট ব্রিটেন	১৭৮৩ ১৮০২
ফ্রান্স	১৮৩০ ১৮৬০
বেলজিয়াম	১৮৩৩ ১৮৬০
ইউ. এস. এ	১৮৪৩ ১৮৬০
জার্মানী	১৮৫০ ১৮৭৩
সুইডেন	১৮৬৮ ১৮৯০
জাপান	১৮৭৮ ১৯০০
রাশিয়া	১৮৯০ ১৯১৪
কানাডা	১৮৯৬ ১৯১৪
আর্জেন্টিনা	১৯৩৫
তুরস্ক, ভারত, চীন	১৯৫২

টেক-অফ এর পূর্বশর্ত : তিনটি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত বিশেষ অবস্থা বা শর্ত বিরাজ করলে তবেই টেক অফ আরম্ভ হয়। শর্তগুলি হল :

(১) অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি। যেখানে বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ বা তারও কম সেখানে বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে ১০ শতাংশ বা তারও বেশি হওয়া চাই।

(২) উচ্চহারে উন্নয়নের সম্ভাবনাপূর্ণ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বৃহদায়তন ও স্থায়ী কয়েকটি নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা।

(৩) এমন একটি রাজনৈতিক সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর অস্তিত্ব বা উদ্ভবের প্রয়োজন, যে কাঠামো অর্থনীতির আধুনিক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ প্রেরণার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব করতে পারবে এবং উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারবে।

এ শর্তগুলিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে : **প্রথম শর্তটি হল** বিনিয়োগ সম্পর্কিত। রস্টো নীট জাতীয় আয়ের দশ শতাংশ বা তারও বেশি হারে বিনিয়োগের কথা বলেছেন। এর অর্থ হল, দেশে যে হারে জনসংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়ে, মাথাপিছু উৎপাদনের হার তার চাইতে অবশ্যই বেশি হতে হবে, এটি করতে পারলে তবেই জনসংখ্যা বাড়তে থাকলেও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িয়ে চলা সম্ভব হবে। রস্টো এভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন : উন্নয়নের একেবারে গোড়ার দিকে, ধরা যাক পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত (Capital output ratio) ৩.৫ : ১ এবং জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ১ থেকে ১.৫ শতাংশ। এ অবস্থায় মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন হার বজায় রাখতে হলে নীট জাতীয় আয়ের (NNP) ৩.৫ থেকে ৫.২৫ শতাংশ নিয়মিতভাবে বিনিয়োগ করে যেতে হবে। এ অনুমান থেকে আরো হিসাব করে বলা যায় মাথাপিছু বাৎসরিক নীট জাতীয় উৎপাদনের ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি ঘটাতে হলে বাৎসরিক বিনিয়োগের হার নীট জাতীয় উৎপাদনের ১০.৫ থেকে ১২.২৫ শতাংশ হওয়া চাই। এবং এ হারে বিনিয়োগ নিয়মিতভাবে করতে পারলেই মাথাপিছু জাতীয় আয়ের স্তর বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। এ থেকে বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক থাকবে ধরে নিয়ে একটি নিশ্চল অর্থনীতি মাথাপিছু জাতীয় আয়ের নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটাতে চাইলে জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ থেকে শুরু করে ১০ শতাংশ বা তার চাইতেও বেশি হারে বিনিয়োগ করে যেতে হবে। রস্টোর এই হিসাবে পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এটা ধরে নেওয়ার অর্থ হল, জাতীয় আয়ের উপর শ্রমশক্তি (অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যার) বৃদ্ধির ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির কোনো প্রভাবই পড়বে না, এমনটি মনে করে নেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় শর্তটি হল, অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান কয়েকটি নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত। রস্টো এ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণকে মানুষের দেহের অস্থি গঠনের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থনীতিতে সাধারণত তিনটি ক্ষেত্র দেখা যায়। (ক) **প্রাথমিক উন্নয়ন ক্ষেত্র—এ ক্ষেত্রের** অন্তর্ভুক্ত শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হলে, কোনো নতুন সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেলে বা অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহার করা হলে এ ক্ষেত্রের শিল্পের উন্নয়ন হার অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন হার থেকে অনেক বেশি হয়। উন্নয়নের গোড়ার দিকে ইংলন্ডের তুলাবস্ত্র শিল্পের উন্নয়নহার বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল।

(খ) **সম্পূরক উন্নয়ন ক্ষেত্র—এ ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই যে প্রাথমিক উন্নয়ন সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্রের উন্নয়নের ফলে**

এ ক্ষেত্রেও দ্রুত সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হতে থাকে। যেমন, রেলপথের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। আবার রেলপথের সম্প্রসারণের ফলে লোহ, কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন হতে থাকে। এ শিল্পগুলি সম্পূরক উন্নয়ন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) **উদ্ভূত উন্নয়ন ক্ষেত্র**—এ ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই যে সমাজের মোট আয়, জনসংখ্যা, শিল্পোৎপাদন প্রভৃতি যখন বাড়তে থাকে তখন এ বৃদ্ধির সাথে একটা মোটামুটি স্থির সম্পর্ক রেখে এ ক্ষেত্রও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি ও সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে। নতুন নতুন বাসস্থানও তৈরী হতে থাকে।

উন্নয়নের অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায়, এক এক দেশে এক একটা ক্ষেত্র উন্নয়নের সূত্রপাত করেছে। ইংলন্ডে, তুলাবস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী ও ফ্রান্সে রেলপথ, সুইডেনে গাছ কাটা। আধুনিক কৃষিও উন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রের ভূমিকা পালন করেছে। ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ডের দ্রুত উন্নয়নের মূলে ছিল বৈজ্ঞানিক প্রথায় ডিম, মাখন, ভেড়ার মাংস ও শূকরের মাংসের বিপুল উৎপাদন। এ থেকে বলা যায়, টেক-অফ-এর ব্যাপারটা বিশেষ একটি ক্ষেত্রই নির্ধারণ করে না বা বিশেষ একটা ক্ষেত্রের হাতেই টেক-অফ-এর যাদুদণ্ডটি নেই। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়নে, রস্টোর মতে চারটি মূল উপাদান কাজ করে। প্রথম, এক্ষেত্রের শিল্পগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের সক্রিয় চাহিদা (effective demand) ক্রমশই বাড়তে থাকা চাই। কারণ উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি না হলে শিল্পগুলির উন্নয়ন ব্যাহত হবে। দ্রব্য ক্রয়ের জন্য পূর্বের মজুদ অর্থ ব্যয়িত হতে পারে, অথবা বিদেশ থেকে পুঁজি আমদানি করা যেতে পারে বা জনসাধারণের প্রকৃত আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিও হতে পারে। দ্বিতীয়, শিল্পে ব্যবহৃত উৎপাদন উপাদানগুলির সমন্বয় নতুনভাবে করতে হবে এবং এরই সাথে শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতারও ব্যাপক সম্প্রসারণ করে যেতে হবে। তৃতীয়, এ সব ক্ষেত্রের শিল্পের জন্য প্রাথমিক পুঁজির যোগান যথেষ্ট হওয়া চাই এবং বিনিয়োগকারীর মুনাফার হারও যথেষ্ট হতে হবে। চতুর্থ, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির নিজস্ব উৎপাদন কৌশলের রূপান্তর ঘটিয়ে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা চাই।

তৃতীয় শর্তটি হল, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো সংক্রান্ত। এ কাঠামোটি এমন হবে যাতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রণোদনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারা যায়। এর তাৎপর্য হল এই যে, সমগ্র সমাজ-জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হওয়া চাই। এ পরিবর্তন পুরাতন অর্থনীতিক সংগঠনের ভিত্তিমূলে ধরে নাড়া দেবে, দেশের রাজনীতিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে যা সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রয়োজন মিটাতে কার্যকর হবে। এর আরো তাৎপর্য হল এই যে, নতুন ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন শক্তি পুরাতন ভাবধারা ও সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ গতানুগতিকতার শক্তিকে পরাভূত করে এগিয়ে যেতে থাকবে। অর্থনীতিক দিক থেকে দেখলে এই তৃতীয় শর্তটি হল, অর্থনীতি এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হবে যাতে মোট আয় যত বাড়তে থাকবে, সেই বর্ধিত আয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় সৃষ্টি করতে পারবে এবং সেই সঞ্চয় পুনর্বিনিয়োগের কাজে লাগাতে পারবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (external economics) ভোগ করতে পারবে।
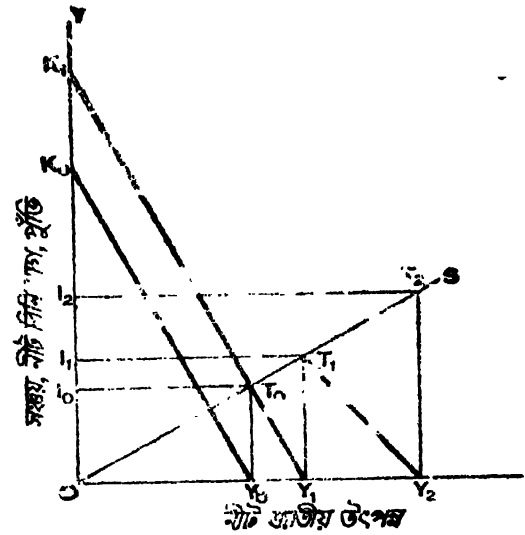
চিত্র ৭·৪

পরের রেখাচিত্রে 'টেক-অফ' স্তরটিকে পরিস্ফুট করা হল। OX অক্ষরেখা নীট জাতীয় উৎপন্ন বা আয় (NNP) ও OY অক্ষরেখা সঞ্চয়, নীট বিনিয়োগ ও পুঁজি নির্দেশ করে। OS সঞ্চয় তালিকার নির্দেশক। K_0Y_0 এবং K_1Y_1 পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত সূচিত করে। চিত্রটির সরলীকরণের জন্য দুটি রেখাকে বামদিক থেকে ডানদিকে ঢালু হয়ে ক্রমে নেমে আসতে দেখান হয়েছে। পুঁজি উৎপন্নের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকছে এটা দেখাবার জন্য রেখা দুটিকে সমান্তরাল করে আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ, $\frac{OK_0}{OY_0} = \frac{OK_1}{OY_1} = \frac{TY_0}{Y_0Y_1}$ = প্রান্তিক পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত।

প্রথম দিকে অর্থাৎ 'টেক অফ' স্তরের পূর্বাবস্থায় সঞ্চয় রেখা OS একটু বেশি রকমের চেটাল (flat), আর পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত রেখা K_0Y_0 বেশ খাড়া। এর তাৎপর্য হল, টেক অফ এর পূর্বাবস্থায় জনসাধারণ তাদের আয়ের অতি সামান্য অংশই সঞ্চয় করে এবং পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত খুব উঁচু। এ অবস্থায় O সময়ে OI_0 নীট বিনিয়োগ করা হল। এই বিনিয়োগের ফলে পুঁজি-ভাণ্ডার (capital stock) বড় হবে। এ পুঁজি উৎপাদন বাড়াতে থাকবে। ফলে কিছুকাল বাদে নীট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে OY_1 হবে। এর পর টেক অফ স্তরে নীট বিনিয়োগ OI_1 (অর্থাৎ Y_1T_1) হলে, অর্থনীতিতে এমন কতকগুলি উদ্দীপক শক্তি কাজ করতে আরম্ভ করে যার ফলে পুঁজি সৃষ্টি অতিশয় দ্রুত গতিতে হতে থাকে। এতে পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত নিচে নেমে এসে $\frac{T_1Y_1}{YY_1}$ হয়। এর ফলে বিনিয়োগের ধাঁচ (investment pattern) পরিবর্তিত হয়ে যায়। এবং পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত রেখা (T_1Y) আগের চাইতে বেশি চেটাল হয়। নীট জাতীয় আয় বেড়ে OY_2 হয়। এবং নীট বিনিয়োগ হয় $OI_2(=Y_2T_2)$। এ অবস্থায় পৌঁছাবার পর থেকেই টেক অফ শেষ হয়ে গেছে বলা যায়। এভাবে চলতে থাকলে অর্থনীতি নিজের শক্তিতেই ক্রমাগত এগিয়ে চলবে (self-sustained)।

৮. **জোরে ধাক্কা** (The Big Push): উন্নয়ন তত্ত্বে 'বিরাট ধাক্কা' ধারণাটি প্রবর্তন করেছেন অধ্যাপক রোডেনস্টাইন-রোডান। এ তত্ত্বটির মূল বক্তব্য অর্থনীতিক উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে একটু একটু করে করা যায় না, এর জন্য দরকার একটা ন্যূনতম কিন্তু বেশ বড় আয়তনের বিনিয়োগ, দরকার একই সঙ্গে অনেক নতুন বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলা। এ শিল্পগুলি হবে প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং একে অপরের সহায়ক। অনেক শিল্প গড়ে উঠলে অর্থনীতি নানা ধরনের অবিভাজ্যতার (indivisibility) ও তজ্জনিত ব্যয় সংক্ষেপের বহু সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারবে। এ অবিভাজ্যতা ও তার থেকে উদ্ভূত ব্যয়সংক্ষেপ অর্থনীতিক উন্নয়নের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করে।

রোডেনস্টাইন রোডান তিন রকমের অবিভাজ্যতার কথা বলেছেন: (ক) উপাদান ও উৎপাদন পদ্ধতির অবিভাজ্যতা [উদাহরণ: রেলপথ, বিদ্যুৎ, জাহাজ প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক উপরি পুঁজি (social overhead capital)], (খ) চাহিদার অবিভাজ্যতা, (গ) সঞ্চয় সরবরাহে অবিভাজ্যতা।

নিচে এ তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হল।

(ক) উপাদান ও উৎপাদন-পদ্ধতির অবিভাজ্যতা: এ অবিভাজ্যতার জন্যই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি (law of increasing returns) কার্যকর হয়। [ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হলে উৎপন্নের একক পিছু গড় উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।] রোডেনস্টাইন রোডান প্রমুখরা মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজি উৎপন্নের অনুপাত কমিয়ে আনার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি খুব বেশি কার্যকর ছিল। তাঁর মতে সামাজিক উপরি পুঁজিই হল অবিভাজ্যতার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। শক্তি, পরিবহণ ও সংসরণ প্রভৃতির মত বুনিয়াদী শিল্প হল সামাজিক উপরি পুঁজি। এরা প্রতিষ্ঠিত হতে এবং উৎপাদন করার মত অবস্থায় আসতে সুদীর্ঘ সময় নেয়। এরা পরোক্ষভাবে উৎপাদন করে। এদের প্রতিষ্ঠা করতে প্রাথমিকভাবে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করার ভিত্তিতে স্থাপন করতে হয়। উন্নয়নের গোড়ার দিকে এ শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করার প্রয়োজন না হতেও পারে। ফলে এদের উৎপাদন ক্ষমতা উদ্বৃত্ত হয়ে পড়তে পারে। আবার এ ধরনের শিল্প স্থাপন করতে গেলে নানা ধরনের সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করে উপায় থাকে না—এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে থাকে যে চেষ্টা করেও কোনো একটিকে বাদ দেওয়া হয়ত সম্ভব হয় না। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এসব সামাজিক উপরি পুঁজি খাতে মোট বিনিয়োগের ৩০-৪০ শতাংশের মত বিনিয়োগ না করে পারা যায় না। এ ধরনের শিল্প গড়ে উঠলে তবেই স্বল্পকালে ফলপ্রসূ (quick yielding) প্রত্যক্ষ উৎপাদনে সক্ষম শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সামাজিক উপরি পুঁজির এ ধরনের অবিভাজ্যতার ব্যাপারটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে দেখা দেয়। সেই জন্যই এসব দেশের পক্ষে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সামাজিক উপরি পুঁজি খাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ আবশ্যক হয়, যাতে এসব দেশে দ্রুত উৎপাদনশীল শিল্প গঠনের পথ সুগম হয়।

(খ) চাহিদার অবিভাজ্যতা: চাহিদার অবিভাজ্যতাকে চাহিদার পরিপূরকতাও বলা হয়। চাহিদার পরিপূরকতার কারণে স্বল্পোন্নত দেশে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল শিল্প স্থাপন করতে হয়। এর কারণ হল, কোনো একটা বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্পে অনেকখানি ঝুঁকি থাকে। কারণ এ প্রকল্পের উৎপাদনের সবটুকুই বিক্রয় করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকতেই পারে। অর্থাৎ উৎপাদকের সামনে আর দ্রব্যের ভাল বাজার থাকবে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত না হলে প্রকল্পটি কালক্রমে পরিত্যক্ত হতে পারে। রোডেনস্টাইন-রোডান একটি উদাহরণের সাহায্যে সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি বদ্ধ অর্থনীতিক (colsed economy) এক জুতার কারখানায় ১০০ প্রচ্ছন্ন বেকার

নিযুক্ত হয়েছে। এরা যে মজুরি পাবে তার সবটুকুই যদি তারা নিজেদের তৈরী জুতা কিনতে খরচ করে তবে জুতার কারখানাটি তার উৎপন্ন দ্রব্যের একটা সুনিশ্চিত বাজার পাবে এবং কারখানাটিও উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু এই শ্রমিকরা তাদের মজুরির সবটুকুই জুতা ক্রয়ে ব্যয় করতে চাইবে না—এটাই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের অভাব বিভিন্ন ধরনের। তাছাড়া এটাও মনে করা সঙ্গত যে কারখানার বাইরেকার মানুষেরাও তাদের দারিদ্র্যের জন্য ঐ কারখানার তৈরী জুতা কিনতে পারবে না। ফলে উপযুক্ত বাজারের অভাবে জুতার কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এ উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে রোডেনস্টাইন রোডান আরও একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর মূল বক্তব্যটিকে পরিস্ফুট করেছেন। ধরা যাক, দশ হাজার বেকার মানুষ একশটি কারখানায় নিযুক্ত হল। এই একশটি কারখানা নানা ধরনের ভোগ্যদ্রব্য তৈরি করে। এ শ্রমিকরা তাদের মজুরি ঐ কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যাদির উপর ব্যয় করে। অর্থাৎ ঐ দশ হাজার শ্রমিকই ঐ একশটি কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করেছে। উৎপাদকেরা এক নিশ্চিত বাজারের সন্ধান পেয়ে উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করবে না। এভাবে মানুষের নানাবিধ চাহিদা মিটাতে নানা ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা একসঙ্গে স্থাপন হলে তবেই সব কারখানা টিকে থাকবে। অর্থাৎ কারখানাগুলি পরস্পর পরস্পরের বাজার সুনিশ্চিত করবে এবং মানুষের চাহিদাও পূরণ করবে। এটাকে রোডেন-স্টাইন রোডান চাহিদার অবিভাজ্যতা বলেছেন। চাহিদার এই অবিভাজ্যতার জন্যই পরস্পর নির্ভরশীল শিল্পে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার হয়। তাতে বাজারের অনিশ্চয়তা দূর করা সম্ভব হয় এবং উদ্যোক্তারাও বিনিয়োগে উৎসাহী হয়।

গ) **সঞ্চয় সরবরাহে অবিভাজ্যতা :** আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সঞ্চয়ের প্রান্তিক হারও ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া উচিত। এটাকেই বলা হয় সঞ্চয়ের আয়-স্থিতিস্থাপকতা (income-elasticity of saving)। রোডেন-স্টাইন-রোডানের তত্ত্বে এটা হল তৃতীয় অবিভাজ্যতা। স্বল্পোন্নত দেশে প্রাথমিক অবস্থায় বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য প্রচুর পরিমাণ সঞ্চয়ের দরকার। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে আয়স্তর খুব নিচু বলে এত সঞ্চয় সৃষ্টি করা অতিশয় কঠিন কাজ। এ অসুবিধার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সঞ্চয় সৃষ্টির প্রান্তিক হার সঞ্চয় সৃষ্টির গড় হারের চাইতে অনেক বেশি হওয়া দরকার। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, নতুন বিনিয়োগের ফলে আয়স্তর যখন বাড়তে থাকবে, তখন পূর্বাপেক্ষা ক্রমাগত বেশি হারে সঞ্চয় সৃষ্টি হতে থাকবে। এভাবে সঞ্চয় বিনিয়োগের কাজে নিযুক্ত হবে।

উপরে বর্ণিত এ সব অবিভাজ্যতা ও তার থেকে উদ্ভূত ব্যয়সংকোচের সুবিধার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের পথে বাধা দূর করার জন্য একটা 'বিরাট ধাক্কা' প্রয়োজন হয়। এ 'ধাক্কা' হল উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বিনিয়োগ, কিন্তু এ বিনিয়োগ অবশ্যই বিপুল পরিমাণে হওয়া চাই। এ বিরাট ধাক্কার ফলে অর্থনীতি উন্নয়নের পথে চলতে আরম্ভ করবে, ন্যূনতম বিনিয়োগ অর্থনীতির মধ্যে নতুন বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। উদ্যোক্তারাও আরো বেশি বিনিয়োগ করতে উদ্দীপনা বোধ করবে।

৭৮ অধ্যাপক রস্টো বর্ণিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি স্তর

Rostow's Five Stages of Economic Growth

অধ্যাপক রস্টো অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটিকে ঐতিহাসিক কালানুসারে পাঁচটি পর্যায় বা স্তরে ভাগ করেছেন : (১) চিরাচরিত ধরনের সমাজ (traditional society), ২) যাত্রাশুরুর প্রস্তুতি পর্ব (pre-conditions for take-off), (৩) যাত্রাশুরু (the take-off), (৪) অর্থনৈতিক পরিপক্কতা লাভের প্রচেষ্টা (the drive to maturity), (৫) উচ্চ গণভোগের যুগ (the age of high mass consumption)।

১. **প্রথম পর্যায় : চিরাচরিত ধরনের সমাজ** এই সমাজে জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি সাধারণত কৃষিকার্যের দ্বারা জীবন ধারণ করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধার জন্য মাথাপিছু উৎপাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ একটা স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ সমাজে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে ঠিকই এবং উদ্ভাবিত বিষয়গুলির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারও সম্ভব হয় বটে তবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জামের যেমন অনটন থেকে যায়, তেমনি অভাব অনুভূত হয় মানুষের মধ্যে পরিবর্তনকামী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির। ফলে আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাত্রা বাড়িয়ে, হস্তচালিত কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের দ্বারা নানান অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটান যেতে পারে। কিন্তু সবকিছুই আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগের অভাবে ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। গোটা সমাজ থাকে আত্মসন্তুষ্ট, অল্পে তুষ্ট।

এই সমাজের সামাজিক কাঠামোটি থাকে উপর থেকে নিচু পর্যন্ত কর্তৃত্ব-প্রভুত্বের ছকে সাজানো এবং তাতে গোষ্ঠী (clan) এবং পরিবারের (family) প্রধান ভূমিকা থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে ভূস্বামী

অভিজাতদের অর্থাৎ সামন্ত প্রভুদের হাতে। তাদের অধীনে থাকে ছোট-বড় সেনাবাহিনী ও আমলাবর্গ। রাষ্ট্রের তথা ভূস্বামী সামন্ত প্রভুদের আয়ের প্রধান উৎস হয় কৃষি। কৃষিজাত উদ্বৃত্ত আর সামন্ত প্রভুরা বিলাস-ব্যসনে, মন্দির ও স্মারক স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মাণে ও যুদ্ধব্যয়ে নিঃশেষিত করে। উন্নয়নহীন এই সমাজ থেকেই ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার শুরু।

২. **দ্বিতীয় পর্যায়: যাত্রাশুরুর প্রস্তুতি পর্ব (পূর্বশর্তাদি):** উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করতে হলে এই চিরাচরিত ধরনের সমাজ উন্নয়নের কতকগুলি পূর্বশর্ত পূরণ করা দরকার এবং এটি একটি প্রক্রিয়া বিশেষ।

এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে সামাজিক জাগরণের মধ্য দিয়ে। অচলায়তন সমাজে ধীরে ধীরে সংস্কার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগতে শুরু করে। সমাজের উন্নতি ও প্রগতির কামনা ধীরে ধীরে দুর্দমনীয় গতিবেগ সঞ্চারিত করে মানুষের ধ্যানধারণায়, চিন্তা-ভাবনায়। সেটা অঙ্কুরিত হতে পারে নানান ভাবনাকে কেন্দ্র করে। কোথাও জাতীয় মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা, কোথাও বা ব্যক্তিগত মুনাফা, কোথাও বা জনকল্যাণ কামনা, কোথাও বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয় সমাজমানসে প্রণোদনা সৃষ্টি করে। এ মানসিকতাই শিক্ষা, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বিস্তারিত হতে থাকে। তার মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন ও পুরাতন ধ্যান ধারণা ও আদর্শের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে নতুন আদর্শ নতুন চিন্তাধারা। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে তা প্রতিফলিত হয় কমে। নতুন শিক্ষাধারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হতে থাকে। মানুষ কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থনীতিতে, সরকারে উদ্যমশীল ও নতুন ভাবধারায় উদ্দীপিত ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে। সমাজে নতুন নেতৃত্ব দেখা দেয়। সমাজের জীর্ণ পুরাতন কাঠামো ভেঙে পড়তে শুরু করে, তার স্থান নেয় নতুন কাঠামোর রূপরেখা। দিন দিন তা পরিপুষ্ট হতে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে, অর্থনীতিতে আসে নতুন জোয়ার, দেখা দেয় নতুন সংগঠন। সঞ্চয় বাড়ে এবং তা সংগ্রহের ও বিনিয়োগের জন্য তৈরি হয় নতুন নতুন সংস্থা। জাতীয় আয় বাড়ে, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার শুরু হয়। শুরু হয় বাজারের বিস্তৃতি। আর তার নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে দেখা দেয় রাজশক্তির কার্যকর শাসনব্যবস্থা।

রস্টোর মতে, যাত্রাশুরুর পূর্বশর্ত পূরণের প্রয়োজনে তিনটি জিনিস এই পর্যায়ে ঘটে: (ক) বাজারের বিস্তারের জন্য ঘটে পরিবহণ প্রভৃতি সামাজিক পুঁজি গঠন; (খ) ঘটে কৃষিতে কারিগরী বা প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব। তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও শহরবাসী মানুষের প্রয়োজনে বাড়ায় কৃষির উৎপাদন, (গ) সুদক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানির বিনিময়ে শুরু হয় পুঁজিসহ নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি বৃদ্ধি। রস্টোর মতে এ হল অর্থনীতির এক তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর। এই রূপান্তরের সারমর্ম হল বিনিয়োগ হারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও ধারাবাহিকভাবে সে বৃদ্ধির হারের ক্রমশই উচ্চতর স্তরে পৌঁছান যা জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়।

এই রূপান্তরের পিছনে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি রূপে কাজ করতে দেখা গেছে সক্রিয় জাতীয়তাবাদের প্রেরণা দৃষ্টান্ত, যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), আবার দেখা গেছে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা [যেমন, ব্রিটেন, জার্মানী ও ফ্রান্স (নেপোলিয়ন)], আবার দেখা গেছে পরদেশের অনুকরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা (demonstration effect), জাপান যার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

ব্রিটেন ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে এই রূপান্তর ঘটেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায়। এই পর্বে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। সেখানে চারটি প্রধান শক্তি এই রূপান্তর সম্ভব করেছিল: (ক) রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, (খ) নতুন রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়, (গ) 'নতুন বিশ্ব' আবিষ্কার, অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন ও বিস্তার, (ঘ) নতুন ধর্মের আবির্ভাব অর্থাৎ ধর্ম সংস্কার আন্দোলন (the reformation)।

৩. **তৃতীয় পর্যায়: যাত্রাশুরুর পর্ব:** পূর্ববর্তী ৭.৭ অংশে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

৪. **চতুর্থ পর্যায়: অর্থনীতিক পরিপক্কতা লাভের প্রচেষ্টা:** রস্টো বলেছেন, "এ হল এমন একটা সময় যখন কোনো সমাজ বা দেশ তার অধিকাংশ উপকরণসমূহ ব্যবহারের জন্য সমকালে লভ্য তাবৎ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে।" তাঁর মতে এটা হল অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ ধারাবাহিক চার দশকব্যাপী প্রচেষ্টার কাল। এই সময়ে উৎপাদনের পুরাতন কৃৎকৌশলগুলির পরিবর্তে নতুন নতুন কৃৎকৌশল প্রবর্তিত হয়। অর্থনীতির নতুন ও প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়। এই সময়ে বিনিয়োগের হারটি জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। অর্থনীতির পরিপক্কতার কালে এই সময়ে যে দেশ যতটা পরিপক্কতা লাভ করে সে দেশ আকস্মিক অর্থনীতিক ঘাত প্রতিঘাত ততটা সহ্য করতে সক্ষম হয়।

রস্টোর মতে, এই পর্যায়ে তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে: (১) শ্রমিক বাহিনীর চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। সকলেই মুখ্যত দক্ষ শ্রমিকে (skilled)

পরিণত হয়। মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বাস করে পছন্দ করে। প্রকৃত মজুরি বাড়তে থাকে। অধিকতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শ্রমিকেরা সংগঠিত হতে থাকে।

(২) উদ্যোক্তাদের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। কঠোর পরিশ্রমী ও জীবনসংগ্রামে অভ্যস্ত শিল্প প্রবর্তক উদ্যোক্তাদের পরিবর্তে ভদ্র, শান্ত ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপকদের উদ্ভব হয়।

৩ কিন্তু সর্বোপরি শিল্পায়নের অকল্পনীয় বিস্ময়কর ঘটনাবলীতে সমগ্র সমাজে একটা ক্লান্তিভাব জাগে, তার সাথে জেগে ওঠে নতুনতর পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

৫ **পঞ্চম পর্যায় : উচ্চ গণভোগের যুগ** : এই পর্বটি হল অর্থনৈতিক পরিপক্বতার উত্তর পর্ব। এই পর্বে শহর থেকে শহরের উপকণ্ঠে মানুষের বসবাস বাড়ে, মোটর গাড়ির ও নানারূপ দীর্ঘস্থায়ী ভোগপণ্যের ব্যাপক ব্যবহার ঘটতে থাকে। যোগানের দিক থেকে চাহিদার দিকে, উৎপাদনের সমস্যা থেকে ভোগের সমস্যার প্রতি এবং ব্যাপকতম অর্থে জনকল্যাণের প্রতি সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই পর্বে তিনটি বিষয় জনকল্যাণ বাড়াতে সাহায্য করে : (১) রাষ্ট্র এই সময়ে বিদেশে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সচেষ্ট হয় (২) প্রগতিশীল করব্যবস্থার প্রবর্তন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শ্রমিকদের জন্য আরও বেশি বিশ্রামের সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় আয়ের অধিকতর সমতামূলক বণ্টনের মধ্য দিয়ে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, (৩) নতুন নতুন বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং সস্তা মোটর গাড়ি, বাড়ি ও গৃহস্থালীর সহায়ক অসংখ্য বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন (electronics) উপকরণ প্রভৃতি উৎপাদনের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

এই ধরনের সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের গণভোগ, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক নিরাপত্তাবোধ প্রভৃতি প্রবণতাগুলি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। রস্টোর মতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৯২০-র দশকে এই পর্যায়ে উন্নীত হয়, ব্রিটেন হয় ১৯৬০ এর দশকে, আর জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এ পর্যায়ে আসে ১৯৫০ এর দশকে।

সমালোচনা : রস্টোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরসমূহের তত্ত্বটি সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিতর্কের অন্যতম বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সমালোচকদের প্রশ্ন : এই স্তরগুলি কি জন্মমৃত্যুর মতই অবশ্যম্ভাবী? এদের পারম্পর্য কি মানুষের শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, পরিণত বয়স এবং বার্ধক্যের মতই কালানুক্রমিক? কখন কোন্ স্তরটি শেষ হয় এবং অন্যটি শুরু হয় তা কি সঠিকভাবে বলা সম্ভব? প্রত্যেক দেশ একই পথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়, এই বক্তব্যের দ্বারা রস্টো কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের অতি জটিল প্রক্রিয়া এবং শক্তিগুলির এক অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা দেননি?

কারণ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলির উদ্ভব ও বিকাশ চিরাচরিত সমাজের বিবর্তন-ধারা মেনে সাধিত হয়নি। এদের উন্নয়নের উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছিল তৎকালে উন্নত দেশ ব্রিটেন থেকে। সুতরাং সব দেশকেই যে চিরাচরিত সমাজের মধ্যবর্তীণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হবে তা নয়। তেমনি, স্বয়ম্ভর বৃদ্ধির প্রস্তুতিপর্বে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার কথা বলা হয়েছে তাও যে সম্পাদিত না হলে চলবে না কিংবা পরবর্তী পর্যায় ও যে তা পূরণ হতে পারবে না, তা নয়। বাস্তবিকপক্ষে, অনেক দেশের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একাধিক পর্যায়ের স্তরগুলি একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে (overlapping)। রস্টোর স্বয়ম্ভর পর্যায়ের ধারণাটিও সমালোচিত হয়েছে। সমালোচিত হয়েছে নানান পর্যায়ের ধারণাগুলিও।

তবে, অনগ্রসর বা স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পায়নে স্বয়ম্ভর পর্বের ধারণাটি নানান ত্রুটি সত্ত্বেও সার্থক বলে অনেকে মনে করেছেন।

৭.৩ উন্নয়নের স্তর বিভাগ সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব

Stages of Economic Growth : The Marxian Viewpoint

১ **মার্কসীয় তত্ত্বে** মানব সমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অতীত কাল থেকে বহু মানের পথ বেয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তন তথা উন্নয়ন ও বিকাশের ধাপে ধাপে পাঁচটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে : আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক (ভূমিদাস) সমাজ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের সুদীর্ঘ বিবর্তনের চূড়ান্ত স্তরে সাম্যবাদী সমাজ।

২ **প্রথম স্তর : আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদ :** আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদী সমাজের পরিবেশ ছিল নির্মম, কঠোর। অতিশয় প্রতিকূল অবস্থায় প্রকৃতির সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করে আদিম মানুষকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হত। আদিম মানুষের প্রতি পদে ছিল ঘোর বিপদ। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ, প্রকৃতির অসীম শক্তির কাছে সে ছিল নিতান্ত অসহায়। তখন ছিল মানুষের গোষ্ঠী জীবন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টিতে বিভক্ত হয়ে মানুষ জীবনযাপন করত। মানুষের জীবন সংগ্রামে হাতিয়ার ছিল মাত্র দু'টি—লাঠি ও পাথর। কাজকর্ম সবই সম্পাদিত হত যৌথ শ্রমে, অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। শ্রমলব্ধ ফল সমাজের সকলের মধ্যে বণ্টিত হত সমানভাবে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছিল সমাজ বিকাশের

উপজাতির মধ্যে দ্রব্য বিনিময়ের (barter) ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেওয়া সে যুগের পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতিতে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে কৃষির সাহায্যে ধানাশস্য উৎপাদনের কৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছে। কৃষির প্রয়োজনে পরিবারগুলিকে কর্ষিত ভূমির কাছাকাছি অবস্থান করতে হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ভূমির সাথে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের নিবিড় সম্পর্ক অনিবার্যভাবেই গড়ে উঠতে থাকে। এরই ফলে পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ক্রমে ক্রমে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। একদিকে যেমন গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বাড়তে থাকে, কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি যত অনুন্নত স্তরেরই হোক না কেন কারিগরী শিল্পেরও কিছু কিছু বিকাশ ঘটে। এর ফলে সমাজের প্রতিপালনের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন উৎপাদন তার চাইতে বেশি হতে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া যত বেশি প্রসারিত হতে থাকে সমাজের প্রতিটি মানুষের কাজের পরিমাণও ততই বেড়ে যেতে থাকে। সমাজে অতিরিক্ত শ্রমশক্তির প্রয়োজনও ক্রমেই বেশি করে অনুভূত হতে আরম্ভ করে। সে যুগে অতিরিক্ত শ্রমশক্তির যোগান দিত যুদ্ধ। যুদ্ধে বিজয়ী উপজাতির হাতে বন্দী শত্রুসৈন্যদের দাসে পরিণত করা হত। তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের প্রথম বড় শ্রমবিভাগ ঘটে অর্থাৎ গোপালক উপজাতিদের আদিম সমাজের অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশেষ ধরনের উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত হওয়া। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সামাজিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে, উৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্রের আয়তন সম্প্রসারিত করেছে। সমাজের তৎকালীন বিবর্তনে প্রথম সামাজিক শ্রমবিভাগ দাসপ্রথার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। **সমাজের প্রথম বড় আকারের এই শ্রমবিভাগ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সমাজের প্রথম শ্রেণীবিভাগ।** তৎকালীন গোষ্ঠী সমাজ দাসমালিক ও দাস—এ দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখনই ঘটে এ দুটি শ্রেণীর উদ্ভব।

শ্রমের নতুন ধরন ও পদ্ধতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ যত বেশি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সমাজে শ্রমবিভাগও তত বেশি প্রসারিত হতে থাকে। মানুষ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, বাসনকোসন ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শেখে। এর ফলে কারিগরী শিল্প ও কৃষি সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। উৎপাদন কর্ম এভাবে পৃথক হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজে পণ্য বিনিময়ের (exchange) ভিত্তি প্রসারিত হয়।

ক্রমবিবর্তনের পথে সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দিলে শ্রেণীহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এত কালের যৌথ সম্পদ গবাদি পশু—ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ঠিক এমনিভাবেই ভূমি ও যন্ত্রপাতিও হয়ে যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যৌথ সম্পদ রূপান্তরিত হয়ে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হল তখন থেকেই সৃষ্টি হল সামাজিক অসাম্য।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের ধ্বংস ও বিলুপ্তির প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়ে গেল তখন এ সমাজে এমন কিছু লোককে দেখা গেল যারা তাদের জীবিকার জন্য অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে। এরাই হল শোষক শ্রেণী। আর যারা নিজেদের শ্রমে অপরকে বাঁচিয়ে রাখে তারা হল শোষিত শ্রেণী। এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শোষণ—এটাই হল শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বিকাশের প্রতিটি স্তরের শাশ্বত সত্য ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সমাজ বিকাশের স্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে শোষকের এবং শোষণের রূপও বদলায়।

দ্বিতীয় স্তর : দাস সমাজ : শোষক ও শোষিত এ দুটি শ্রেণীতে মানব সমাজের প্রথম বড় আকারের বিভাগের সূচনা করে দাস-প্রথা। আদিম সাম্যবাদের বিলুপ্তিকাল থেকে শুরু হয়ে শ্রেণীবিভাগ সভ্য সমাজের সব যুগে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। প্রাচীন সমাজের শোষণের প্রথম রূপ ও পদ্ধতি হল দাস-ব্যবস্থা। দাস ব্যবস্থার ভিত্তি হল : যন্ত্রপাতি ও দাস—এ দুটি উৎপাদনের উপাদানের উপরই পূর্ণ মালিকানা ও কর্তৃত্ব দাস মালিকের। মালিক তার দাসকে কোনো মতে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্য, বেশভূষা ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দেয় এবং দাসের শ্রমে উৎপাদিত সমস্ত সম্পদ দাসমালিক ভোগ করে। এভাবে নিষ্ঠুরতম শোষণ ও পীড়নের মাধ্যমে দাস প্রথার অর্থনীতি ও সমাজজীবন প্রায় হাজার বছর ধরে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে এটা অনুভূত হতে থাকে যে, দাস-প্রথা প্রথমদিকে যেমন লাভজনক ছিল, দাস নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন যেমন বাড়ান যাচ্ছিল তেমন সুফল এর মাধ্যমে আর পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে দাসদের মধ্যেও চেতনা ও সংঘবদ্ধতা দেখা দিতে থাকে। দাসেরা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে নানাভাবে অসহযোগিতা করতে আরম্ভ করে। দাসমালিকদের মধ্যেও নানা কারণে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সর্বোপরি, দেশে দেশে দাস বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দাসভিত্তিক অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ও যে সব উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপাদান আবিষ্কৃত হচ্ছে সেগুলিকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে অক্ষম। একদিকে দাসভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) এবং অন্যদিকে উৎপাদন উপাদানের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদন-

দক্ষতার সম্প্রসারণ (productive forces)—এ দু'য়ের মধ্যে স্পষ্টতই বিরোধ বাধে। এ সব কিছুর সামগ্রিক ফল হিসাবে একসময়ে দাস-সমাজের বিলোপ ঘটে। দাস-সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভূত হয় পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের সমাজব্যবস্থা—সামন্ততান্ত্রিক (ভূমিদাস) সমাজ।

৪. তৃতীয় স্তর : সামন্ততান্ত্রিক (ভূমিদাস) সমাজ : দাস-প্রথা বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গায় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের আর একটি ব্যবস্থা সমাজে আবির্ভূত হয়। এটি হল সামন্ততন্ত্র। প্রধানত মধ্যযুগই ছিল সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের কাল। সামন্ততন্ত্রের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিদাস প্রথার আবির্ভাব ঘটে। মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী দ্বারা কৃষক সমাজের বিপুলতম অংশের শোষণ—এ হল সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। কৃষকেরা যে জমিতে চাষ করত তার উপর সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ভূম্যধিকারী সামন্তদের। কৃষকদের জমি চাষ করার অধিকার দেওয়া হত বটে, তবে জমির মালিকদের (অর্থাৎ সামন্তদের) জন্য কৃষকদের বেগার খাটতে হত। সামন্ততন্ত্রের প্রথম দিকে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন কৃষকদের প্রত্যক্ষ ভোগেই ব্যবহৃত হত। কৃষিজ পণ্যের বিনিময় প্রায় হতই না বলা চলে। এ কারণে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ক্ষেত্র ও সুযোগ সীমাবদ্ধ ছিল। উৎপন্নের একটা অংশ কৃষকের কাছ থেকে নিয়ে সামন্তরা তাদের নিজেদের ও তাদের অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীর ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। এর অতি সামান্য অংশ তারা বিনিময় করত অস্ত্রশস্ত্র ও বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তারপর বিনিময়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা বেড়ে গেলে সামন্তপ্রভুদের আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে যেতে লাগল। এর ফল হিসাবে কৃষকদের শোষণও তীব্রতর হতে লাগল। বিনিময়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধির আর একটা কুফল হল এই যে, সামন্তপ্রভু ও তার উপর নির্ভরশীল কৃষকদের মধ্যে এতদিন ধরে যে পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক ছিল সেটি ধ্বংস হয়ে গেল। এটাই চূড়ান্ত রূপ পেল সামন্ততন্ত্রের ভূমিদাস প্রথার মধ্যে।

ভূম্যধিকারী কর্তৃক তীব্রতম শোষণের প্রতীক হল ভূমিদাস প্রথা। ভূমিদাসরা ছিল ভূমির সাথে স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ; তারা প্রচলিত আইনে সামন্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হত না। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কয়েকটা দিন সামন্তপ্রভুদের ভূমিতে বেগার শ্রম দিতে হবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলিতে নিজেদের ভূমিতে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকতে পারবে—এ ধরনের একটা চুক্তি হত ভূমিদাসদের সাথে সামন্ত ভূম্যধিকারীদের। ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকে খাজনা নিত সামন্ত রাজারা, সামন্ত রাজারা ঐ খাজনার একটা অংশ দিত মহারাজাকে। এই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে ছিল ভূমিদাসেরা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই ছিল উৎপাদন সম্পর্ক। স্বল্প পরিমাণে হলেও কিছু জমি ভূমিদাসেরা চাষ করার সুযোগ পেত এবং নিজেদের চাষ করা জমির উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ নিজেরা ভোগ করার সুবিধা পেত। তাই ভূমিদাসেরা জমির উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করত। এতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একটা সম্ভাবনা ও সুযোগ সব সময়েই থাকত। এদিক থেকে দেখলে পূর্বেকার দাস-ভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থার চাইতে ভূমিদাস-ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সংস্থা কিছুটা উন্নত ছিল।

তবে এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, ভূমিদাস-ভিত্তিক সামন্ততন্ত্র একটি আদর্শ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল। দাস সমাজের মত ভূমিদাস-ভিত্তিক সামন্ততন্ত্রও শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই ভূমিদাসদের উপর শোষণ যত তীব্র ও নিষ্ঠুর হতে থাকে, ভূম্যধিকারী তথা সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রামও হয়েছে তত আপসহীন, তত নির্মম। অতীতে সব দেশের ইতিহাসে অজস্র কৃষক বিদ্রোহের ও অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। কোথাও কোথাও এসব বিদ্রোহ গৃহযুদ্ধের আকারে দশকের পর দশক ধরে পরিচালিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই পুঁজিতন্ত্রের বীজ উপ্ত হতে থাকে। আর এ কাঠামোর মধ্যেই পুঁজিক অর্থনৈতিক-সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে। পুঁজিতান্ত্রিক শক্তির বিকাশের সাথে সাথে একদিকে যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হতে থাকে অন্যদিকে তেমনি শ্রমিক শ্রেণীরও জন্ম হতে থাকে। পুঁজিতন্ত্রের যত বিকাশ ঘটতে থাকে (এর সাথে সাথে বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীরও বিকাশ হতে থাকে) ততই বিদ্যমান ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বিকাশশীল পুঁজিতন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক (production relations) বিকাশশীল বুর্জোয়াদের বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার (productive forces) সম্প্রসারণের পথে কঠিন বাধা হয়ে ওঠে। তাই উদীয়মান বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের প্রাধান্য ধ্বংস করতে এবং নিজেদের সম্প্রসারণের স্বার্থে ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছে। বুর্জোয়ারা এ কাজে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক ও ভূমিদাসদের সংগ্রামগুলিকে ব্যবহার করেছে।

৫. চতুর্থ স্তর : পুঁজিতান্ত্রিক বা ধনতন্ত্রী সমাজ : পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস ব্যবস্থার মধ্যে। তেজারতি কারবারের পুঁজিই হল পুঁজির প্রাচীনতম রূপ। পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা যত প্রসারিত হতে থাকে বণিক-পুঁজিপতিরা সমাজে তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। বণিক-পুঁজিপতিরা ভূম্যধিকারীদের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ বিলাসদ্রব্যের যোগান দিতে থাকে। এতে

তাকে দেশের বাজারের বাইরে বিদেশে বাজার খুঁজতে হয়। এ কারণে উপনিবেশ দখল করতে হয়, অনুন্নত দেশের শাসনব্যবস্থা কব্জা করে শোষণের স্থায়ী ও পাকা ব্যবস্থা করতে হয়। পৃথিবীটা যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাই পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ দখলের তথা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পুঁজিতন্ত্র অনিবার্যভাবে রূপ নেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে। দেশের সর্বহারা শ্রেণীর শোষণের ব্যবস্থা শুধুমাত্র সে দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেটা বিস্তৃত হয় উপনিবেশে ও অনুন্নত দেশগুলিতে। এর ফলে দেশে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর বিরোধ ব্যাপক ও তীব্র হতে থাকে, সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন দেশগুলিতেও তেমনি বিরোধী শক্তি সৃষ্টি হয়।

পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ও অন্তর্বিরোধের প্রকাশ ঘটে ও সেটা তীব্র হতে থাকে:

(১) দেশের ভিতর মালিক ও নিঃস্ব মজুর শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ,

(২) এক দেশের মালিক গোষ্ঠীর সাথে অন্য দেশের মালিক গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বার্থ সংঘাত,

(৩) পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত দেশগুলির জনসাধারণের জাতীয় আন্দোলন।

পুঁজিতন্ত্রের অন্যতম অন্তর্বিরোধ হল, উৎপাদিকা শক্তি (productive forces) যে বিপুল গতিতে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয় এবং আরও প্রসারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, **পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা-শক্তিগুলির ঐ বিকাশ ও সম্প্রসারণের পথে এক বিরাট বাধা হয়ে শিকলের মত কাজ করে।** দিনে দিনে এ দ্বন্দ্ব তীব্রতর হতে থাকে। **পুঁজিতন্ত্রের আরও একটা অন্তর্বিরোধ** হল: শ্রম-বিভাগের ফলে **পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রটি হয় সামাজিক, অন্যদিকে উৎপাদন সম্পর্কটি থাকে ব্যক্তিগত মুনাফা ও শোষণভিত্তিক এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় পুঁজিপতির ব্যক্তিগত মালিকানায়। এই দুয়ের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এ ছাড়া আরও একটি অন্তর্বিরোধের কথা বলা যায়: পুঁজিবাদীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার** ফলে একদল পুঁজিবাদী মালিক অন্যদের দখলচ্যুত করে উৎখাত করে দেয়। এর ফলে মুষ্টিমেয় কয়েক জন পুঁজিবাদী-উৎপাদক পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সবটুকু সুযোগ-সুবিধা নিজেরাই অবৈধভাবে করায়ত্ত করে একচেটিয়া মালিকে পরিণত হয়। এরই পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকে বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির চরম দারিদ্র্য দুর্দশা ও দাসত্ব। এর বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর বিদ্রোহ ব্যাপকতর আকার নিতে থাকে। পুঁজিতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিকশ্রেণী আয়তনে ক্রমশই বড় হতে থাকে এবং সুশৃঙ্খলভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এবকমটি ঘটে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিজস্ব নিয়ম অনুসারেই। পুঁজির একচেটিয়া মালিকানা উৎপাদন পদ্ধতির উপর লৌহশৃঙ্খলের মত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মুষ্টিমেয় দানবের হাতে উৎপাদনের উপায় সমূহের কেন্দ্রীভবন ঘটতে থাকে এবং অন্যদিকে চলতে থাকে শ্রমের সামাজিকীকরণ। এর ফলে এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। প্রচলিত ব্যবস্থায় এ দুটির বিরোধের মীমাংসা ও সামঞ্জস্য বিধান রাখা আর সম্ভব হয় না, সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবের পথ আঘাত হেনে পুঁজিবাদী অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেয়। পুঁজিপতির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসে। **দখলচ্যুতকারীরা নিজেরাই দখলচ্যুত হয়**" (The expropriators are expropriated)। প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র।

৬. **পঞ্চম স্তর: সমাজতান্ত্রিক সমাজ: মার্কস ও এঙ্গেলস** বলেছেন, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বৈপ্লবিক রূপান্তর অনিবার্যভাবেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করবে। পুঁজিতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে সর্বহারা বিপ্লব। এ বিপ্লবের ফলে সর্বহারার একনায়কত্ব অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে। উৎপাদনের উপায়গুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ লোপ হয়। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না, তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক মালিকানা। উৎপাদন হয় পরিকল্পনা অনুসারে, বণ্টনও হয় পরিকল্পনা অনুসারে। সমাজতন্ত্রে যে মূলনীতি অনুসরণ করা হয় সেটি হল: সমাজের উৎপাদনে প্রত্যেকের অবদান হবে প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে, আর বিনিময়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবদানের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে সমাজ থেকে প্রতিদান (অর্থাৎ পারিশ্রমিক) নেবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হবে। দারিদ্র্য দূরীভূত হতে থাকবে। উৎপাদন ক্ষমতার সার্বিক বৃদ্ধির ফলে সমাজে প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে। এটি হবে সমাজের অর্থনীতিক সামাজিক-মানসিক বিকাশের সর্বোচ্চ একটি স্তর। এ স্তরে দারিদ্র্য সম্পূর্ণ অপসারিত হবে। এটা হবে সাম্যবাদের স্তর। সাম্যবাদী সমাজের মূলনীতি হবে: প্রত্যেকে সমাজকে দেবে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে, আর সমাজ থেকে প্রতিদান হিসাবে সব কিছু পাবে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে। সাম্যবাদী সমাজে কোনো শ্রেণীবিভাগ

থাকবে না—প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ (classless society)।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের বিলোপের পর [illegible] এই সমাজে উৎপাদন শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের [illegible]। [illegible] সমাজের গতিধারা [illegible] বলেছিলেন, সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজে [illegible] চিরকালের জন্য।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১. উন্নয়নের স্তর বলতে কি বোঝায়?
[What is meant by 'stages of development'?]
[C.U. B.A. 1984]

২. বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে উন্নয়নের স্তর ভাগ করেছেন। তাদের কয়েকটির বর্ণনা কর।
[Different economists have divided stages of development differently. Describe some of those stages.]

৩. উন্নয়নের স্তর ভাগ কলিন ক্লার্ক কিভাবে করেছেন? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।
[How has Colin Clark divided the stages of development? Explain them with examples.]

৪. হফম্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের স্তরগুলি বর্ণনা কর।
[Describe the stages of economic development from the point of view of Hoffmann.]

৫. 'উদ্বৃত্ত শ্রমিক' বলতে কি বোঝায়?
[What is meant by 'surplus labour'?]
[C.U. B.A. 1984]

৬. কৃষি থেকে 'উদ্বৃত্ত শ্রমিক'-এর একটা অংশ সরিয়ে নিলে কৃষির মোট উৎপাদনে কোনো পরিবর্তন হবে না—উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
[Removal of a part of 'surplus labour' from agriculture will not affect total production. Elucidate the statement with suitable examples.]

৭. উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দ্বারা স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি করা যায়—এ কাজে কি ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তা বিশ্লেষণ কর।
[It is possible to create fixed capital with the help of surplus labour. What problems may arise in such an effort?]

৮. কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিক সরিয়ে নিলে বাজারে বিক্রয়যোগ্য কৃষিজ পণ্যের উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়বে—এ ধারণা কি ঠিক?
[Is it correct to assume that displacement of surplus labour from agriculture will increase the marketable surplus of agricultural produce?]

৯. প্রচ্ছন্ন বেকারদের নিয়োগ করে স্থির পুঁজি খুব বেশি পরিমাণে বাড়ান সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেন—এ বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার কর।
[There are many people who think that it is not possible to increase fixed capital considerably by employing the disguised unemployed. Examine their contention.]

১০. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্বৃত্ত শ্রমিক কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে তা ব্যাখ্যা কর।
[Explain how surplus labour works in the process of economic development in a private enterprise economy.]

১১. 'দারিদ্র্যের পাপচক্র' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
[Explain the concept of the 'vicious circle of poverty'.]

১২. দারিদ্র্যের পাপচক্রের (ক) চাহিদার দিক, (খ) যোগানের দিক বর্ণনা কর।
[Describe (a) the demand side, and (b) the supply side of the vicious circle of poverty.]

১৩. 'জনসংখ্যা ফাঁদ'—ধারণাটি পরিস্ফুট কর।
[Elucidate the concept of 'population trap'.]
[C.U. B.A. 1984]

১৪. "দারিদ্র্য একই সঙ্গে পুঁজির স্বল্পতার কারণ ও পরিণাম"—এ বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।
["Poverty is at the same time the cause and the effect of shortage of capital."—Explain.]

১৫. কি কি কারণে স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও বিনিয়োগের আগ্রহ কম হয়? কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
[Explain the causes responsible for lower propensity to save and to invest in underdeveloped countries.]
[C.U. B.A. 1984]

১৬. স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগের সমস্যার সাথে জড়িত 'সীমাবদ্ধ বাজার' সংক্রান্ত পাপচক্রটি কি তা ব্যাখ্যা কর।
[Explain the vicious circle concerning the 'limited market' relating to the problem of investment in underdeveloped countries.]

১৭. "বৃহদায়তন উৎপাদন হল পরস্পর নির্ভরশীল উৎপাদন।"—এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
["Large-scale production is interdependent production."—Elucidate the statement.]

১৮. স্বল্পোন্নত দেশে প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক

দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে— এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

[The traditional socio-cultural outlook and ideas in underdeveloped countries create obstacle in the way of development.—Elucidate the statement.]

১৯. বলা হয়, উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে সেটা স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের পথে এক ধরনের বাধা সৃষ্টি করে। এ বাধাটি কিভাবে সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা কর।

[It is said that international trade between developed and underdeveloped countries creates a kind of obstacle in the way of development of underdeveloped countries. Explain how this obstacle is created.]

২০. স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের অগ্রগতি [illegible] উন্নয়নের [illegible] হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ [illegible]

[In several [illegible] foreign investments in underdeveloped countries are referred to as obstacles to their economic development. Elucidate the statement.]

২১. 'উন্নয়নের স্বয়ংপুষ্টি' বলতে কি বোঝায়?

[What is meant by 'self-sustaining development'?]

২২. বলা হয়, অগ্রগতির পথে চলতে চলতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হয়। কোন্ কোন্ উপাদান এ ব্যাপারে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে সেগুলি উল্লেখ কর।

[It is said that the process of development while going ahead becomes self-sustaining. State the factors that assist the process of development in this respect.]

২৩. সম্প্রসারণশীল বাজার কিভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় হতে সাহায্য করে, ব্যাখ্যা কর।

[Explain how an expanding market helps the process of economic development to become self sustaining.]

২৪. উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হতে পুঁজিগঠনের যে ভূমিকা থাকে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

[Describe clearly the role of capital formation in making the process of economic development a self-generating one.]

২৫. নতুন নতুন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন কিভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain how innovations and changes in technology lead to self-generating economic development.]

২৬. যে সব নেতিবাচক শক্তি বা বিষয়ের জন্য অর্থনীতিক উন্নয়ন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তাদের বর্ণনা দাও।

[Describe the negative forces that may put a limit to the process of economic development.]

২৭. বলা হয়, ব্যক্তির অতি উচ্চ আয় তার কাজের স্পৃহা কমিয়ে দিয়ে উন্নয়ন সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে। আয় উচ্চ হলে কাজের স্পৃহা কেন কমে?

[It is said that high incomes may reduce the urge of individuals to work and thus put a limit to the process of economic development. Why should high incomes reduce urge for work?]

২৮. 'উন্নয়নের আরম্ভ' বলতে কি বোঝায়, ব্যাখ্যা কর।

[Explain what is meant by 'getting started in development'?]

২৯. আধুনিক পৃথিবীর অর্থনীতিক উন্নয়নে ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

[Explain the significance of the industrial Revolution in England in the economic development of the modern world.]

৩০. ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি কি ভূমিকা পালন করেছে তা বর্ণনা কর।

[Describe the role played by technological progress in the Industrial Revolution in England.]

৩১. ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবে বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

[Explain the role of private enterprise in the Industrial Revolution in England.]

৩২. অর্থনীতিক বিকাশের রস্টো-বর্ণিত স্তরবিভাগগুলি কি কি?

[What are the stages of economic development as stated by W. W. Rostow?]

[C.U. B.A. 1984]

৩৩. বলা হয়, অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় 'টেক্ অফ্' হল একটি স্তর। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

[It is said that 'take off' is a stage in the process of economic development. Point out the features of this stage.]

৩৪. রস্টো 'টেক্ অফ্'-এর সময়-ব্যাপ্তি কি ভাবে নির্দেশ করেছেন?

[How has Rostow indicated the duration of the 'take off' stage?]

৩৫. বলা হয়, 'টেক্-অফ্'-এর পূর্বশর্ত তিনটি। সংক্ষেপে এ শর্তগুলি বর্ণনা কর।

[It is said that the stage of 'take off' has three pre-conditions. Briefly describe these pre-conditions.]

৩৬. রস্টো 'টেক্-অফ্'-এর স্তরে নীট জাতীয় আয়ের

দশ শতাংশ [illegible] ব্যয় করা [illegible] যাবে। [illegible] কথা বলেছেন। রস্টোর এ সুপারিশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

[Rostow has indicated the need for investing 10% or more of net national income at the stage of 'take off'. Explain the significance of such a recommendation of Rostow.]

৩৭ নিম্নলিখিত ধারণাগুলি পরিস্ফুট কর : (ক) প্রাথমিক উন্নয়ন ক্ষেত্র, (খ) সম্পূরক উন্নয়ন ক্ষেত্র, (গ) উদ্ভূত উন্নয়ন ক্ষেত্র।

[Elucidate the following concepts : (a) primary sector of development, (b) complementary sector of development, and (c) derived sector of development.] [C.U. B.A. 1984]

৩৮ বলা হয়, এর এক দেশে এক একটা ক্ষেত্র উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। [illegible] গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির দ্রুত উন্নয়নে, রস্টোর মতে, যে চারটি মূল উপাদান কাজ করে সেগুলি বর্ণনা কর।

[It is said that each of the sectors in its turn has played a specially important role in the economic development of a particular country. Describe the four basic factors which according to Rostow, play an important role in the said development of such sectors.]

৩৯ "টেক্-অফ" স্তরে পৌঁছাতে সমাজের মানসিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the role of the psychological, cultural and institutional structure of the society before it reaches the 'take off' state.]

৪০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া 'টেক অফ' স্তরের বৈশিষ্ট্য কি ?

[What are the features of the 'take off' stage in the process of economic development ?] [C.U. B.A. 1984]

৪১ 'জোরে ধাক্কা' তত্ত্বটির মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the main contention of the 'Big Push' theory.]

৪২ 'চাহিদার অবিভাজ্যতা' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

[Explain the concept of 'indivisibility of demand'.]

৪৩ 'সঞ্চয়-সরবরাহ অবিভাজ্যতা' কিভাবে 'বিরাট ধাক্কা' সৃষ্টিতে সাহায্য করে ব্যাখ্যা কর।

[Explain how 'savings supply indivisibility' helps create the 'Big Push'.]

রচনাত্মক প্রশ্ন

৪৪· মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদ হল উন্নয়নের প্রথম স্তর। বিশদভাবে এ স্তরটির বর্ণনা দাও।

[According to the Marxian theory, primitive tribal communism is the first stage of economic development. Describe this stage fully.]

৪৫ মার্কসীয় তত্ত্বে উন্নয়নের দ্বিতীয় স্তর হিসাবে দাস সমাজের উল্লেখ করা হয়েছে। দাস সমাজের বিশদ বর্ণনা দাও।

[Slave society has been referred to as the second stage of economic development in the Marxian theory. Describe the slave in detail.]

৪৬ অর্থনীতির বিকাশের মার্কসীয় স্তরবিভাগগুলি কি কি ?

[What are the Marxian stages of economic development ?] [C.U., B.A. 1985]

৪৭ আদিম সমাজে (ক) অনুপার্জিত আয় ও (খ) শোষণ অনুপস্থিত ছিল। কেন ?

[In the primitive society, (a) unearned income, and (b) exploitation were absent. Why ?]

৪৮ কোন্ কোন্ নতুন আবিষ্কার আদিম সমাজের বিপুল অগ্রগতি সূচিত করেছিল ?

[Which new discoveries did signify tremendous advancements of the primitive society ?]

৪৯ কোন দুটি বিশেষ আবিষ্কার সভ্যতার যুগের সূচনা করেছিল ?

[Which two discoveries did lead to the beginning of the age of civilisation ?]

৫০· 'শোষক শ্রেণী' ও 'শোষিত শ্রেণী' বলতে কি বোঝায় ?

[What are meant by an 'exploiter class' and an 'exploited class' ?]

৫১· শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি ?

[What is the unique feature of the class divided society ?]

৫২ 'অর্থনৈতিক পরিপক্কতা লাভের' প্রচেষ্টার স্তরটি রস্টো কিভাবে বর্ণনা করেছেন ?

[How has Rostow described the stage of making efforts to arrive in economic maturity ?]

৫৩ রস্টো বর্ণিত উচ্চ গণভোগের স্তরটি বিশদভাবে বিবৃত কর।

[Describe fully the stage of high mass consumption as stated by Rostow.]

৫৪ উন্নয়নের স্তরবিভাগ সম্পর্কে রস্টোর তত্ত্বের সমালোচনা কর।

[Examine critically Rostow's theory about the stages of economic development.]

৫৫. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' বলতে কি বোঝায়? এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কি কি ব্যবস্থার সুপারিশ কর?

[What mean by the 'vicious circle of poverty'? What measures do you recommend to get out of the circle?]

[B.U. B.A. III (78 79 Syll.) 1983]

৫৬. অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তরগুলি কি কি? সমাজ বিকাশ সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণকে কি এই ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক মনে হয়?

[What are the stages of economic growth? Discuss the relevance of Marx's analysis of social evolution in this context.

[B.U. B.A. III (78 79 Syll.) 1983]

৫৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসাবে 'জোরে ধাক্কা'র যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

[Discuss the case for 'big push' as a strategy for economic development.]

[B.U. B.A. II (80 ' 1 Syll.) 1983]

৫৮. পুঁজি গঠনের প্রধান উৎসগুলি উল্লেখ কর অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজি গঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

[Mention the main sources of capital accumulation. Explain its importance in economic development.]

৫৯. অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু করার সমস্যা বলতে তুমি কি বোঝ? এই প্রসঙ্গে এমন যে কোনো দুটি ধারণা বিশ্লেষণ কর যেখানে বলা হয়, উন্নয়নের গোড়ার দিকের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন।

[What do you understand by the problem of 'getting started' in economic development? Examine in this connection any two concepts that sugggest that the early phases of growth are critical and that a substantial change in the structure of the economy is required for economic development.] [C.U. B.A. II 1983]

৬০. "ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা (বা স্বল্প নিযুক্তি) হল এক বিপুল সঞ্চয় সম্ভাবনা যা এ সব দেশে পুঁজিগঠনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।" এ উক্তিটি আলোচনা কর।

["Disguised unemployment (or underemployment) in the rural areas of the underdeveloped countries like India represents vast savings potential which can be used for capital formation in these countries." Discuss the statement.] [C.U. B.Com. (Hons.) 1984]

৬১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্লাসিকাল তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। এ তত্ত্বটি কি নৈরাশ্যব্যঞ্জক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Explain the classical theory of economic development. Is it a pessimistic theory? Give reasons for your answer.] [C.U. B.A. 1985]

অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার স্থির করাই বোঝায় না। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কোনো সংস্থার দ্বারা ওই সব অগ্রাধিকার অনুযায়ী কাজ নির্বাহ করার ব্যবস্থাও বোঝায়। অর্থাৎ, রাষ্ট্র কেবল পরিকল্পনা রচনাই করবে না, তার রূপায়ণও করবে। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল এমন একটি ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করে।**

৮.২. পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

Aims and Objectives of Planning

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করা হয় কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে। নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি পরিকল্পনার রূপায়ণ, কৌশল প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে থাকে। সুতরাং নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। সুসংহত পরিকল্পনা রচনা করতে হলে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলিও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সামগ্রিক হওয়া প্রয়োজন। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ওই লক্ষ্যগুলি বেছে নিতে হয়।

সাধারণভাবে, **অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পাঁচ রকমের হতে পারে :** (ক) **জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি :** জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা দেশবাসীর ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের সরবরাহ কি পরিমাণে বেড়েছে তা পরিমাপ করা যায় এবং তা থেকে কতটা অংশ জনসাধারণের ভোগের জন্য নির্দিষ্ট করা সম্ভব এবং কতটা অংশ আবার অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনের জন্য ব্যবহার (অর্থাৎ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ) করা সম্ভব তা স্থির করা যায়। প্রথমোক্ত দ্রব্যগুলি হল ভোগ্যদ্রব্য, দ্বিতীয়োক্ত দ্রব্যগুলি হল উৎপাদকের দ্রব্য। প্রথমটির সাথে জড়িত থাকে দেশের মধ্যে আয় বণ্টন নীতি ও জনকল্যাণ নীতি। দ্বিতীয়টির সাথে জড়িত হল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নীতি। সুতরাং, কেবল জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যটি স্থির করলেই চলে না, তার সাথে জড়িত উপরোক্ত নীতিগুলি কি হবে তাও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে স্থির করতে হয়। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় স্বভাবতই এটি একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারতের প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ১১ শতাংশ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ছিল প্রতি বৎসর ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল প্রতি বৎসর ৫·৫ শতাংশ বৃদ্ধি। ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল প্রতি বৎসর ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি। সপ্তম পরিকল্পনার বার্ষিক ৫·৮ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। অবশ্য প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের বাস্তব বৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্য অতিক্রম করলেও অন্যান্য পরিকল্পনায় তা হয়নি।

(খ) **বিনিয়োগ অনুপাত বৃদ্ধি :** জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই বর্ধিত আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ যদি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা না যায় তাহলে দেশের উৎপাদন তথা আয় বৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়ে না, দারিদ্র্যও কমানো যায় না। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ গড়ে প্রতি বৎসর বিনিয়োগ হয়ে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে বিনিয়োগ আয়ের ওই অনুপাতটি লাভ করতে না পারলে উন্নত অর্থনীতির স্তরে পৌঁছান সম্ভব হবে না।

প্রথম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ আয় অনুপাতটি ছিল ৭ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৪ শতাংশ, চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৭·৫ শতাংশ এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় ছিল ১৬·৩ শতাংশ। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অনুপাতটি ২৫·১ শতাংশ করা হবে বলে স্থির হয়েছিল। সপ্তম পরিকল্পনায় লক্ষ্য ধরা হয়েছে ২৫·৯ শতাংশ।

(গ) **আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস :** সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশই কেবল যে সামগ্রিকভাবে আয় উৎপাদন ক্ষমতায় দুর্বল তা নয়, এসব দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদের বণ্টনও দারুণ বৈষম্যমূলক। ফলে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে প্রবল দারিদ্র্য রয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এসব দেশের সামগ্রিক আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যটি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করে জনকল্যাণ বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে সমাজের অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের বৃদ্ধি এবং তার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আগ্রহী না করে তুললে চলে না। এরই অঙ্গ হিসাবে সাথে সাথে দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদের তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে রয়েছে।

(ঘ) **নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার দ্বারা দেশের আয় ও সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা বাড়ানো এবং তার সাথে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের বৃদ্ধি ঘটানো। উৎপাদন বাড়াতে গেলে শ্রমিককর্মী নিয়োগ বাড়বে। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনার দ্বারা কতটা পরিমাণ নিয়োগ বা কর্মসংস্থান বাড়বে তা আবার নির্ভর করে প্রযুক্তিবিদ্যা বা উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতির উপর। অর্থাৎ, উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধানত বেশি পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের

অর্থাৎ যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করা হবে, না বেশি পরিমাণে শ্রমের উপর নির্ভর করা হবে, তার উপর। অর্থাৎ, উৎপাদন কৌশলটি কি প্রধানত পুঁজি-নির্ভর হবে, না, শ্রম নির্ভর হবে। প্রথমটিতে নতুন কর্মসংস্থান হবে অপেক্ষাকৃত কম, এবং দ্বিতীয়টিতে হবে অপেক্ষাকৃত বেশি। যে সব দেশে পুঁজির পরিমাণ কম অথচ জনসংখ্যা অর্থাৎ শ্রমের যোগান বেশি, সে সব দেশের পক্ষে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই সাধারণভাবে উপযোগী। এই কারণে, ভারতে প্রথম থেকেই পরিকল্পনায় বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে, বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মারফৎ সে আয়ের ব্যাপকতর বণ্টন ঘটে এবং তার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তার ফলে দেশে আয় এবং সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য এবং কেন্দ্রীভবনও কমে।

(৫) **অন্যান্য সহায়ক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:** উপরোক্ত চারটি উদ্দেশ্যকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য রূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু এই চারটি উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে আরও কয়েকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গ্রহণ না করলে চলে না। এই সব সহায়ক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে তিনটি হল প্রধান। যথা—(ক) **শিল্পায়ন,** (খ) **কৃষির উন্নয়ন** এবং (গ) যোগাযোগ ও পরিবহণ, তেজঃশক্তি বা বিদ্যুৎ উৎপাদন, ব্যাঙ্কিং ও ঋণদান ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের দ্বারা **অর্থনীতির উপযুক্ত অন্তকাঠামো সৃষ্টি।** এদের মধ্যে প্রথম দুটি অর্থাৎ শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব করে তোলে। আর তৃতীয়টি শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নয়নকে সম্ভব করে এবং তার মধ্য দিয়ে প্রধান উদ্দেশ্যটিকে সাহায্য করে থাকে।

৮.৩. পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Planning

যে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পাঁচটি:

(ক) অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং সমাজের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে **সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**

(খ) গৃহীত উদ্দেশ্যগুলি অনুযায়ী উৎপাদন, বিনিয়োগ, সঞ্চয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট **লক্ষ্য নির্ধারণ।**

(গ) উপরোক্ত কাজ দুটির সুষ্ঠু সম্পাদন, নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অগ্রাধিকার নির্ধারণ, পরিকল্পনা রচনা এবং তদনুযায়ী সম্পাদিত কাজকর্মের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য একটি **পরিকল্পনার সংগঠন** বা পরিকল্পনা কমিশন গড়ে তোলা।

(ঘ) গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে অর্থনৈতিক কাজগুলি যাতে যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ, সঞ্চয়, উৎপাদন, ভোগ, দরদাম, আমদানি, রপ্তানি, শিল্পসংস্থা স্থাপন ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়ে **উপযুক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা** ও তা কাজে পরিণত করার জন্য **যাবতীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।**

(ঙ) পরিকল্পনার রূপদানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় **সম্বলের বরাদ্দ বা বিনিবণ্টন।**

৮.৪. অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা
Need for Developmental Planning

১. বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (বিশেষত অনুন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশ) পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করছে। আজকাল পরিকল্পনার বিরোধীর সংখ্যা নগণ্য। **অধ্যাপক লুইস্-এর** কথায় বলা যায়, মুষ্টিমেয় উন্মাদ প্রকৃতির লোক (অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, পরিকল্পনাবিহীন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক) ছাড়া আজ আর কেউই পরিকল্পনার বিরোধী নয়। মতবাদ হিসাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (যার অন্য নাম অবাধ ধনতন্ত্র) আজ প্রায় অস্তমিত হলেও উনবিংশ শতাব্দীর এটিই ছিল প্রধান ভাবধারা। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথা হল সমাজের সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাই একমাত্র আদর্শ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার নিরঙ্কুশ প্রসারে ও ব্যবস্থাপনায় একদিকে যেমন ব্যক্তির মঙ্গল অপর দিকে তেমনি সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

২. বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়নি। কারণ, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনই এর মুখ্য লক্ষ্য এবং **প্রধান উদ্দীপক ও চালক শক্তি।** এ ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ একেবারেই গৌণ অথবা অনুপস্থিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হল সামাজিক সম্পদের অপচয় অপব্যবহার অথবা অব্যবহার এবং উৎপাদনক্ষেত্রে তুমুল বিশৃঙ্খলা। কোথাও অত্যুৎপাদন কোথাও স্বল্পোৎপাদন একদিকে বিলাসসামগ্রীর উৎপাদনের প্রাধান্য, অন্যদিকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উৎপাদনে অবহেলা। একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিপুল ধনসম্পদের কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষের গভীর দারিদ্র্য, বিভিন্ন শ্রেণীর আ

...নীর বৈষম্য। বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ...ংকার বিপর্যয় এবং বিনিয়োগ ও আর্থিক নীতির বিবেচনা ...হীন প্রয়োগ। সংক্ষেপে, এই হল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ...ক্ষণ চিত্র।

৩. বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ...স্থা অর্থাৎ অবাধ ধনতন্ত্র সম্পর্কে জনসাধারণের মোহমুক্তি ...টে থাকে। ফলে প্রায় সব ধনতান্ত্রিক দেশেরই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার উদ্ভব ঘটে ও তা প্রসার লাভ করতে থাকে। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে ১৯২৯-৩৩ সালের ...মন্দার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার ফলেই ...পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হতে আরম্ভ করে।

৮.৫ ভারতের মত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব Importance of Planning in Countries like India

১. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনার ...গুরুত্ব অপরিসীম। স্বল্পোন্নত দেশ বলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন প্রায় গতিহীন, জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের স্বল্প। বিকাশের হারও নিচু, উৎপাদনশীলতা ...কম, জনসাধারণের অধিকাংশেরই দারিদ্র্য গভীর, ...সম্পদের পরিমাণও বিপুল, কর্মপ্রার্থী অসংখ্য, ...আয় ও সম্পদের বৈষম্য, অনুপার্জিত ...সম্পত্তি ও ভোগের চিরন্তন কাঠামো ব্যবস্থা, বৈদেশিক ...বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতা, একদিকে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, অন্যদিকে এ জনশক্তিকে নিয়োগ করার মত উপযুক্ত শিল্পায়নের অভাব, কৃষির উপরে জনসংখ্যার তীব্র চাপের ফলে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা, খাদ্য, বাসস্থান ও জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা,—এক কথায় স্বল্পোন্নত অর্থনীতির ...তীয় বৈশিষ্ট্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে বর্তমান।

২. শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এতেন পশ্চাৎপদ দেশের কাম্য গতিতে উন্নয়ন সম্ভব হবে—একথা কেউ মনে করে না। এমন সমস্যাপীড়িত দেশের দ্রুত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন একমাত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারাই সম্ভব।

৮.৬. পরিকল্পনার সামাজিক-মানসিক উপাদানের ভূমিকা Role of Socio-psychological Factors in Planning

১. একমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমেই যে দেশের অগ্রগতি সম্ভব সে বিষয়ে আজ আর কোনো দ্বিমত নেই। এর জন্য চাই, উপযুক্ত পরিবেশ, এবং বহুবিধ উপাদান। সে উপাদানের সবটাই যে বস্তুগত তা নয়। তার কোনোটা অবস্তুগতও বটে। সব উন্নয়ন পরিকল্পনাই মানুষকে নিয়ে, মানুষেরই জন্য এবং সে মানুষ বিচ্ছিন্ন একক নয়, সে মানুষ সমাজবদ্ধ। তাই পরিকল্পনা সমাজকে নিয়ে, তথা সমাজবদ্ধ মানুষকে নিয়ে সমাজের উন্নয়ন যেমন পরিকল্পনার লক্ষ্য তেমনি সমাজই ব্যাপক অর্থে তার উপকরণ যোগায়। পরিকল্পিত কার্যসূচি রূপায়ণে যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম সরবরাহ করে। সমাজের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম যত নিপুণ ও কার্যকর হবে পরিকল্পনার সাফল্যও ততই সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম দিয়ে কোনো পরিকল্পনাই সফল করা যায় না। এগুলির সাথে চাই জনগণের সচেতন ও সক্রিয় সহযোগিতা। ...ব্যাপক লুইস বলেছেন, জনসাধারণের উৎসাহ পরিকল্পনার এগিয়ে চলার পথ সুগম করে, অর্থনৈতিক বিকাশের ... শক্তি সঞ্চার করে যার মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায়।

২. পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য জনসহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দেয় আরও একটা বিশেষ কারণে। পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য চাই সম্বল। এই সম্বলের প্রধানতম উৎস হল সঞ্চয় ও কর। এ দুটির সাথেই জনসাধারণ জড়িত। এখন আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হলে তবেই সঞ্চয় হয়। সমাজের মানুষ ... কত ... করবে সমাজের সঞ্চয় ও সে ... পরিমাণের উপর ... সঞ্চয় সৃষ্টির জন্য সমাজের লোকেরা তাদের ... কতটা ... হবে কিনা তা নির্ভর করে। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। ... তেমনি করের মাধ্যমে কতটুকু সম্বল সংগ্রহ করা যাবে তা নির্ভর করে জনসাধারণ অতিরিক্ত করের ভার কতটা গ্রহণ করতে ... হবে তার উপর। সাধারণভাবে অতিরিক্ত করের বোঝা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ বহন করতে চায় না। তার কারণ করের বোঝা বহন করার অর্থ হল করদাতার এক ধরনের ত্যাগস্বীকার করা। পরিকল্পনার সম্বল সৃষ্টি করতে দেশের মানুষ এভাবে কতটা ত্যাগস্বীকার করতে অগ্রণী হবে তা নির্ভর করে জনসাধারণ সম্বল সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কত গভীরভাবে উপলব্ধি করছে তার উপর। এ উপলব্ধি জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

৩. অন্যদিকে, পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। এখন, কারবারী সংস্থাগুলির ব্যবস্থাপকদের, পরিচালকদের ও শ্রমিক কর্মীদের উদ্যোগ ও কর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছাড়া কোনো বিনিয়োগ কার্যসূচি সফল করা যায় না। সর্বশ্রেণীর উৎপাদন কর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মের প্রতি নিষ্ঠার প্রশ্নটি বৃহত্তম সামাজিক পরি

প্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এক কথায় বলা যায়, পরিকল্পনার সম্পদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরের প্রতিটি কার্যসূচি রূপায়ণের জন্য চাই দেশবাসীর ত্যাগস্বীকার ও নিষ্ঠা সহকারে কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা, কারণ অকুণ্ঠ চিত্তে দায়িত্ব পালনের দ্বারাই জনসাধারণ পরিকল্পনার প্রতি তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। যথাযথ সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা গেলে জনসাধারণের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো সম্ভব হয়। এ ধরনের দায়িত্ববোধ ও ত্যাগস্বীকারের মনোভাব সৃষ্টি হলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় পরিকল্পনার সহায়ক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের ক্ষেত্রে এ উপাদানটির ভূমিকা কখনও খাটো করে দেখা যায় না।

৪. এখানে প্রশ্ন স্বভাবতই [illegible] জনগণের সহযোগিতা কি পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে? [illegible] সহযোগিতা কতটাই বা স্বতঃস্ফূর্ত ও [illegible] তাদের অংশগ্রহণই বা কতটা ব্যাপক ও গভীর? এর উত্তরে বলা যায়, সব কিছু নির্ভর করে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অভ্যাস, প্রেরণা, সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা [illegible] ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ও মূল্যবোধের উপর। [illegible] পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, তার [illegible] কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে [illegible] ও [illegible] প্রকৃতি ও গভীরতা নিরূপণে সাহায্য করে।

৫ [illegible] পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে, পরিকল্পনার দ্বারা [illegible] যদি [illegible] ব্যবস্থা করা হয়, সরকারী প্রশাসন যদি দুর্নীতিমুক্ত হয় তাহলে পরিকল্পনার অগ্রগতির সাথে সাথে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ও রীতিনীতির পরিবর্তনের ফলে, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা [illegible] হতে থাকবে। তাতে পরিকল্পনার প্রতি জনসমর্থন এবং তার সাথে সহযোগিতাও বাড়বে।

৬ উপরে বর্ণিত সব কটি উপাদান পুঞ্জীভূত হয়ে একটা দেশের জনগণের মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলে। এ উপাদানগুলি মিলিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি নির্ধারণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, ব্যক্তির মনোভাব, প্রেরণা, পছন্দ অপছন্দ —এক কথায় জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী —গড়ে ওঠে সেই সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে যার মধ্যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, লালিত হয়, বর্ধিত হয়। শেষ বিচারে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল নিরূপণে এ পরিবেশই যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্যই স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কি ভূমিকা পালন করে সেটা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, স্বল্পোন্নত দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি জনমানসের উপর প্রভাব বিস্তার করে বটে কিন্তু সেটা [illegible] এমনভাবে করে যাতে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত না হয়ে [illegible] হয়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতের কয়েকটি সামাজিক আইনগত প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হল, **বর্ণভেদ প্রথা, যৌথ পরিবার প্রথা ও উত্তরাধিকার আইন**। অতীতে [illegible] সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় এ সব প্রতিষ্ঠান [illegible] ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু [illegible] সেখানে [illegible] সাহায্য করছে।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের সনাতন **বর্ণভেদ প্রথা** শ্রমের [illegible] ও [illegible] দিচ্ছে। কারণ, [illegible] প্রথাগত [illegible] ও মানসিক প্রবণতা [illegible] এ প্রথা এক শ্রেণীর অলস পরান্নভোজী ও পরশ্রমজীবী মানুষ সৃষ্টি করেছে। [illegible] সৃষ্টি করেছে কায়িক শ্রম সম্পর্কে মানুষের মনে ঘৃণার মনোভাব। [illegible] এক কঠোর ও অনমনীয় সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে গড়ে উঠেছে [illegible] সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সম্প্রদায়। এ প্রথাই সমাজে [illegible] দীর্ঘস্থায়ী করে রাখতে সাহায্য করে। [illegible] বর্ণভেদপ্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাজে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী ও সাংস্কৃতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা সৃষ্টি করছে যা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা হিসাবেই কাজ করছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি হ্রাস করার ব্যাপারে ভারতের **যৌথ পরিবার ব্যবস্থার** অবদানও কম নয়। এ প্রথা ব্যক্তির উদ্যোগ স্তিমিত করে, কাজে উৎসাহ নষ্ট করে। যৌথ পরিবারভুক্ত, কিন্তু কর্মে নিযুক্ত নয় এমন মানুষের জন্য খাদ্য ও [illegible] সংস্থানের নিশ্চিত ব্যবস্থা করে যৌথ পরিবার প্রথা তার সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের আলস্য ও কর্মবিমুখতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। এ প্রথা শ্রমের গতিশীলতা হ্রাস করে। তার কারণ এ প্রথা পরিবারভুক্ত প্রতিটি মানুষের

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তাদের নিজগৃহে আবদ্ধ থাকতেই উৎসাহিত করে এ প্রথা পরোক্ষভাবে হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কারণ, গ্রামীণ যৌথ পরিবারগুলিতে অল্প বয়সে বিবাহের ও বহু পরিবার সৃষ্টির মত বিষয়গুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বলেই মনে করা হয়।

প্রচলিত **উত্তরাধিকার আইনগুলির** জন্যই ভারতের কৃষিজোতগুলিতে ক্রমাগত উপবিভাজন ও খণ্ডিকরণ ঘটছে। বিরামহীন উপবিভাজন ও খণ্ডিকরণের জন্যই ভারতের কৃষিক্ষেত্রে প্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৭ দেশের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নির্ধারণ করতে যেসে ভাবের জনসাধারণের [illegible] বিশ্বাস ও মনোভাব ও উল্লেখ করতে হয়। ভারতের [illegible] অধিবাসীদের 'ইহলোকের' প্রতি বিষয় ও [illegible] পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেয়। ইহলোকে অতৃপ্ত [illegible] ও [illegible] স্বাচ্ছন্দ্য লাভের প্রচেষ্টা থেকে তাব [illegible] না। 'পরলোক' সংক্রান্ত [illegible] [illegible] কিছু নির্ভর করে— [illegible] হিন্দুধর্ম [illegible] মানে রক্ষণশীল ও [illegible] [illegible] হিন্দুধর্মের [illegible] সৃষ্টি হয়। হিন্দুদের [illegible] [illegible] ও [illegible] উন্নতি সাধনের প্রয়াসকে [illegible] উৎসাহিত করে না। হিন্দুর মানসিকতা ও [illegible] জগৎ পরিবর্তনশীল [illegible] উৎপাদনের [illegible] পদ্ধতি ও উন্নত পদ্ধতি [illegible] তাদের [illegible] সীমিত [illegible] পরিবেশে। এ কথা [illegible] ভারতের [illegible] ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ প্রচলিত রয়েছে সেগুলি এমন এক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল রচনা করছে যা ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়।

৮· উপরে যে সব সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হল সেগুলি, নিঃসন্দেহে, একান্ত ভাবেই ভারতীয়। তবে এটা ঠিক যে, এ সব প্রতিষ্ঠান একত্রে যে সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সে পরিবেশ পৃথিবীর সব স্বল্পোন্নত দেশেই কম বা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা অসম্ভব। তাই অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যই স্বল্পোন্নত দেশের জনসাধারণের প্রচলিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এ সব দেশের সরকারেরই এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া দরকার।

৯· উন্নয়ন পরিকল্পনার রচনা ও তার রূপায়ণের পূর্বে এ সব দেশের সরকারকে এ সব সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিয়ে আলোচিত হল।

(ক **উন্নয়নের ইচ্ছা :** দেশের জনসাধারণের মধ্যে উন্নয়নের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ না থাকলে কোনো দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

খ) **জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী :** স্বল্পোন্নত দেশের জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার ও অলঙ্ঘনীয় বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এ সব দেশের মানুষের মধ্যে যে সাধারণ মনোভাব দেখা যায়, সেটা শুধু যে অবৈজ্ঞানিক তাই নয়, সেটা অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকারকও বটে। এ সব দেশের বেশির ভাগ লোকই এ বিষয়ে সচেতন নয় যে, দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে সরকারের অর্থনীতিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব হয় না। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনীতিক উন্নয়ন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে একমাত্র তখনই যখন উন্নয়নের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে যা করা দরকার তা হল পরিবারের আয়তন ছোট রাখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা। তাদের অযৌক্তিক বিশ্বাস, অসত্য ও ভিত্তিহীন ধারণা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবৈজ্ঞানিক নিষেধের বিরোধিতা ব্যাপক প্রচার দ্বারা করতে যথোপযুক্ত পরামর্শের মাধ্যমে জনসাধারণকে রাজি করাতে পারলে তবেই এ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ হতে পারে।

গ) **বর্ণভেদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী :** অতীতে বর্ণভেদ প্রথা যদি কোনো উপকার করেও থাকে বর্তমানে এ প্রথা যে অনেক বেশি ক্ষতিকারক এবং দেশের নিরক্ষর, অজ্ঞ ও রক্ষণশীল মানুষদের বোঝাতে হবে অর্থনীতিক উন্নয়ন যে এ প্রথার কুফলের জন্য ব্যাহত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে আর এ প্রথা বন্ধ করা যে আশু কর্তব্য সে বিষয়ে মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

ঘ) **সমাজে নারীদের সম্পর্কে মনোভাব :** স্বল্পোন্নত দেশে নারীদের বিশেষ মর্যাদার চোখে সাধারণত দেখা হয় না। দেশের জনসাধারণকে এ সত্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে যে, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ (অর্থাৎ নারী সমাজ) যেখানে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত, যে সমাজে জনসমষ্টির অর্ধাংশকে অর্থাৎ নারীদের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাদের ন্যায়সঙ্গত স্থান গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না সে দেশে উন্নয়নের কাজ কিছুতেই সফল হতে পারে না।

(ঙ) **গোজাতি সম্পর্কে মনোভাব :** হিন্দুর চোখে গোজাতি বিশেষ পবিত্র, হিন্দুর কাছে গাভী মাতৃতুল্য। গোজাতি সম্পর্কে হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত যুক্তিহীন, অসঙ্গত। তার মন ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলেই

গোজাতিকে হিন্দু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। এ মনোভাবের জন্যই এগুলি যখন জরাগ্রস্ত, পীড়িত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, হিন্দু তখনও এগুলিকে বিনাশ করতে রাজী হয় না। জরাগ্রস্ত, অকর্মণ্য এ সব প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হল সীমিত পশু খাদ্য ও চারণভূমির উপর ভয়াবহ চাপ সৃষ্টিতে সাহায্য করা। এ ধরনের অহেতুক চাপ হ্রাসের জন্য যেখানে এ প্রাণীগুলিকে ধ্বংস করা উচিত, হিন্দু সেখানে ভাবপ্রবণতার জন্য এটা কিছুতেই হতে দেয় না। পরোক্ষভাবে হলেও হিন্দুর এ মনোভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী।

১০. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যেহেতু সমাজকে নিয়েই করতে হয়, সে জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের আগে সমাজ জীবনে বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন করা সরকারের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। শুধু তাই নয়, এরই সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হয়, ভবিষ্যতে এ সব প্রতিষ্ঠানের কি ধরনের এবং কি পরিমাণ পরিবর্তন করা হবে। এ কাজে অগ্রসর হবার আগে মনে রাখতে হবে মানুষ তার পুরনো অভ্যাস, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার সহজে ত্যাগ করতে পারে না। তাই দেশের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সেটা জনগণের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই পশ্চাৎপদ অর্থনীতিতে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে সেটা খুব সতর্কভাবে করা উচিত, যাতে ঐ পরিবর্তনের ফলে বিদ্যমান সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটেও তবু সেটা যেন যতদূর সম্ভব কম হয়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলি নিজ নিজ অর্থনীতিতে কি পরিবর্তন ঘটাতে পারবে অথবা কোন পরিবর্তন আদৌ ঘটাতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এ সব দেশের প্রধান সমস্যা নয়, বস্তুতপক্ষে এ সব দেশের প্রধান সমস্যা হল কি পরিমাণ সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এ দেশগুলি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে।

৮৭. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথে বাধা

Obstacles to Planning in Underdeveloped Countries like India

১. **সম্বল সংগ্রহের অসুবিধা:** স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বিদেশী ঋণের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের কথা বলা হয়। কিন্তু বিনা শর্তে অথবা সুবিধাজনক শর্তে বিদেশী ঋণ পাওয়ার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ ঋণের কথাও সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি না হলে এই সূত্র থেকে পর্যাপ্ত সংগ্রহ করা যায় না। ভারতের মত দেশে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বল্প। অধিকন্তু, সঞ্চয় সৃষ্টির জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হয়। দারিদ্র্যের জন্য ভারতে ভোগের স্তর খুবই নিম্ন, তার উপর আরও বেশি ত্যাগস্বীকারে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে উদ্বুদ্ধ করা শক্ত। জনসাধারণকে আরও বেশি ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করা যায় যদি তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে তারাও উপকৃত হবে, পরিকল্পিত অগ্রগতির দ্বারা সৃষ্ট নতুন সম্পদের ন্যায্য অংশ থেকে তারা বঞ্চিত হবে না। এজন্য, জাতীয় সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা সামাজিক ন্যায় ও নীতিবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবেই আরো বেশি ত্যাগস্বীকারের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

২. **উপযুক্ত প্রশাসনিক সংগঠনের অভাব:** সুদৃঢ়, দক্ষ ও সৎ এবং নীতিনিষ্ঠ প্রশাসনিক সংগঠন ব্যতীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করা যায় না। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এই ধরনের কর্মকুশল প্রশাসন যন্ত্রের একান্ত অভাব। তাই পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য দক্ষ প্রশাসন-যন্ত্র অপরিহার্য। পরিকল্পনার পরিমাণ ও আকৃতি এই প্রশাসন-যন্ত্রের কর্মদক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

৩. **প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাব:** ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে প্রযুক্তিবিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা পরিকল্পনার সাফল্যের পথে বাধাস্বরূপ। এদেশে প্রচুর উৎপাদনের উপাদান থাকা সত্ত্বেও তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য।

৪. **কৃষির পুনর্গঠনের সমস্যা:** ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষি ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠন আবশ্যক। খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জমির সমস্যা, উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সমস্যা, পণ্য বিক্রয় সমস্যা, জলসেচের সমস্যা—এক কথায়, পশ্চাদপদ কৃষির যাবতীয় সমস্যাই আসলে কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠনেরই সমস্যা। স্বল্পোন্নত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই সমস্যাগুলি তীব্র আকারে বর্তমান থাকে বলে পরিকল্পনার রূপায়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

৫. **জনসহযোগিতার অভাব:** স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন গণচিত্তে তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি। দেশের নেতৃবর্গ যদি এই উৎসাহ সৃষ্টিতে অক্ষম হয় তবে পরিকল্পনাকে নির্ভর করতে হয় আমলাতন্ত্র ও ঠিকাদারের উপর। এই

অবস্থায় পরিকল্পনাকে সফল করা সম্ভব নয়। ভারতে দীর্ঘদিন গণউৎসাহ সৃষ্টি করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটি হল ভারতের পরিকল্পনার একটি প্রধান দুর্বলতা।

৬. **মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার অভাব** : মূল্যস্তরকে মোটামুটিভাবে স্থির রাখা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল সমস্যা। পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য যখন অর্থ ব্যয় বাড়তে থাকবে, দ্রব্যসামগ্রীর (বিশেষ করে খাদ্যশস্যের) উৎপাদন প্রথমদিকে সে অনুপাতে সাধারণতঃ বাড়ে না। ফলে, সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থায় মূল্যস্তর চড়া হারে বাড়তে থাকে, পরিকল্পনার খরচও সেই অনুপাতে বাড়ে। অথচ, মনে রাখতে হবে, স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এতে, একদিকে পরিকল্পনার জন্য বিপুল ব্যয়ে জনসাধারণের আয় বাড়ে, অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি যথাযথ পরিমাণে না ঘটলে দ্রব্যমূল্যস্ফীতির দরুন মূল্যস্ফীতি আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। স্বল্পোন্নত দেশে এর উপরে আর একটি অসুবিধা দেখা দেয়। শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থার ফলে এবং যোগানের অপ্রতুলতার জন্য খাদ্যশস্য ইত্যাদির ব্যাপারে মুনাফাকারী দ্রব্য নিয়ে মজুতদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশের খাদ্যদ্রব্যের জন্য জনসাধারণের মোট আয়ের বৃহত্তম অংশ ব্যয় হয় বলে এ সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দেশের সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধিকে অনেকক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

৭. **রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে উপযুক্ত পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতির অভাব** : স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনার জন্য একটি ব্যাপক ক্ষেত্রের সৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের ভূমিকা কি হবে, শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্র কি প্রকারের শিল্প গঠনের দায়িত্ব পালন করবে, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে—এ সব প্রশ্নে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারিত না হলে পরিকল্পনার অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

আলোচিত সমস্যাগুলি গুরুতর, একথা ঠিক। তবে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা রচনায় নৈপুণ্য, দূরদৃষ্টি এবং সুদূরপ্রসারী সামগ্রিক চিন্তা থাকলে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই সফল করা যায় না।

৮.৮. উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের শর্তাবলী
Conditions for the Success of Developmental Planning

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের শর্তগুলি হল :

১. **পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে স্থির করতে হবে।** এতে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। কোন ক্ষেত্রের উন্নয়ন বা কোন্ দ্রব্যের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যেমন কৃষির উন্নয়ন অথবা ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশ, কোন্‌টি অগ্রাধিকার পাবে? খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে না কি বিনিয়োগ করা হবে, না পরিবহণ ও সংসরণের জন্য অগ্রাধিকার পাবে? কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলেও প্রশ্ন থেকে যায় তুলা উৎপাদনে বেশি বিনিয়োগ করা হবে, না পাট এবং তৈলবীজ উৎপাদনে? বেশি খাদ্য উৎপাদন হবে, না বেশি সংখ্যক লোকের একই সঙ্গে প্রয়োজন মেটানো হবে? খাদ্য ও বেশি বস্ত্র উৎপাদন করতে পারলে অর্থনৈতিক জীবনে সমস্যাই সমাধান হবে। প্রশ্নটি এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে উপকরণসমূহকে নিয়োগ করলে অধিক বস্ত্র উৎপাদনে সেই উপকরণসমূহকে পাওয়া যাবে না। এ কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত হল অগ্রাধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ। লক্ষ্য অতি উচ্চে রাখলে তা পূরণ করা অসম্ভব হতে পারে। আবার লক্ষ্য খুব নিচে রেখে পরিকল্পনার সাফল্য দেখানও যুক্তিযুক্ত নয়।

২. **লক্ষ্য স্থির হয়ে গেলে বিনা দ্বিধায় ঐ লক্ষ্য পূরণ করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।** কারণ সাফল্যের জন্য পরিকল্পনাটি যেমন উৎকৃষ্টরূপে রচিত হওয়া উচিত তেমনি তার প্রত্যেকটি কার্যসূচি দৃঢ় প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের দ্বারা রূপায়িত করতে হয়।

৩. **পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী একে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে।** কারণ আজ যে পরিকল্পনা শুরু করা হল তা আগামী কয়েক বৎসরের লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে চলবে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এই সময় ঘটতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল উভয়বিধ অবস্থাই সম্ভাবিত হতে পারে। এমন অবস্থায় পরিকল্পনার কাঠামোর বা লক্ষ্যের পরিবর্তন বা নতুনভাবে পরিবিন্যাস প্রয়োজন হতে পারে।

৪. পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্য পূরণের জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হয়। পরিকল্পনার কাজ শুরু হলে জাতীয় আয় বাড়তে থাকে। জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়ে। এই বর্ধিত ক্রয়শক্তি বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশে ব্যবহৃত হতে থাকে। যে দেশের জনসাধারণের বিপুল অংশ তীব্র দারিদ্র্য-পীড়িত, সেখানে এ প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ

ভিত্তিতে নিরূপিত মূল্যব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অনুপস্থিত।]

সমাজতান্ত্রিক দেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে। বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে, উৎপাদনের উপকরণগুলি বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি নীতি অনুসারে বণ্টন করা হবে, কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে, প্রয়োজনীয় অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হবে, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে ইত্যাদি। সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হ'ল, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নির্দেশ কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালন করতে হয়। এ ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য দেখানো চলে না। এক কথায়, সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনা হল সামগ্রিক বা সর্বাত্মক পরিকল্পনা।

৭. **স্থায়ী পরিকল্পনা ও জরুরি পরিকল্পনা :** স্থায়ী পরিকল্পনাকে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা বলে বর্ণনা করা যায়। স্থায়ী পরিকল্পনার কার্যাবধি খুবই বিস্তৃত। তার কারণ হল, সাধারণত খুব উঁচু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই এ পরিকল্পনা রচিত হয়। এবং এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্বল্প-কালের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

পক্ষান্তরে, জরুরী পরিকল্পনা হ'ল স্বল্পকালীন পরিকল্পনা। সাময়িক কোনো সমস্যার—যেমন, বাণিজ্যচক্রের প্রভাবে অর্থনীতিতে মন্দার আবির্ভাব—সমাধানের জন্য জরুরী পরিকল্পনার প্রণয়ন ও রূপায়ণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেলে জরুরী পরিকল্পনাটিরও সমাপ্তি ঘটে।

৮. **সাধারণ পরিকল্পনা ও বিশদ পরিকল্পনা :** কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে সাধারণ পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ পরিকল্পনা অর্থনীতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখাটি নির্ধারণ করে দেয় এবং উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্যও স্থির করে দেয়।

বিশদ পরিকল্পনা পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণ করে এবং কোন পদ্ধতিতে পরিকল্পনার রূপায়ণ করা হবে তা'ও স্থির করে দেয়।

৮.১০. ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনা
Planning under Capitalism

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কিন্তু অর্থনীতিতে এখন আর কোনো সাময়িক ঘটনা নয়। এটি এখন একটি স্থায়ী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক, উন্নত এবং স্বল্পোন্নত, প্রায় সব দেশেই পরিকল্পনার ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কোনো না কোনো ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসৃত হচ্ছে।

২. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে, তার চারিটি মূল বিষয়—সম্পত্তির বেসরকারী মালিকানা, বেসরকারী উদ্যোগ, প্রতিযোগিতা এবং মূল্যব্যবস্থা—সম্পূর্ণ বজায় রেখে তার চৌহদ্দীর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হয়ে থাকে। এই মূল্যব্যবস্থার মারফতই পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করুক না কেন, তা সম্পাদিত হয়ে থাকে মূলত নানাভাবে কলকাঠি নেড়ে বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণ করে (manipulating the market)। অধ্যাপক লুইস্ হলেন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পরিকল্পনার অন্যতম প্রবক্তা।

৩. **ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল মূলত পরোক্ষ পরিকল্পনা** এবং তা সাধারণত দু'রকমের : (ক) সংশোধনমূলক পরিকল্পনা (corrective planning) এবং (খ) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (developmental planning)।

৪. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির **সংশোধনমূলক পরিকল্পনার** মূল কথা হল, বাণিজ্যচক্রের উন্নতি ও মন্দার বাজারের ওঠানামা যথাসম্ভব দমন করে অর্থনীতিটিকে একটি সমতার অবস্থায় বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। এ পরিকল্পনা একদিকে মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির মাঝখানে একটি মধ্যপন্থা অনুসরণ। এর সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত হ'লে দু'রকমের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। প্রথমত, জনসাধারণের ভোগব্যয় অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হয়। দ্বিতীয়ত, বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহদানের ব্যবস্থা করতে হয়।

স্বল্পকালীন সময়ে ভোগপ্রবণতা বাড়ানো সম্ভব না হলেও যেসব ব্যবস্থার সাহায্যে দীর্ঘকালীন সময়ে ভোগপ্রবণতা বাড়ানো যায় তা হল :

(১) সমাজের উচ্চ ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন মানুষের (অর্থাৎ গরীবদের) ভোগপ্রবণতা বাড়ানোর জন্য তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, পণ্যের দাম কমিয়ে ও ভরতুকি দিয়ে, স্বল্প আয়ের মানুষদের জীবনধারণের খরচ কমানোর ব্যবস্থা করে, এবং প্রগতিশীল করব্যবস্থা, উত্তরাধিকার কর, মূলধনী লাভ কর প্রভৃতি মারফত সমাজের উচ্চ আয়বিশিষ্ট জনসমষ্টির কাছ থেকে স্বল্প আয় বিশিষ্ট মানুষের কাছে ক্রয়ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

(২) মজুরি নীতি মারফত শ্রমিক-কর্মচারীদের ভোগের পরিমাণ বাড়ানো।

(৩) সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মারফত মন্দার সময়ে বেকারভাতা প্রভৃতি দ্বারা শ্রমিক কর্মীদের ভোগব্যয়ের মাত্রা বজায় রাখা।

৫. ভারতের মত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব নির্দেশ কর।

[Discuss the importance of economic planning in countries like India.]

৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

[Discuss the role of socio-psychological factors in executing an economic plan.]

৭. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা বর্ণনা কর।

[Describe the obstacles that economic planning in underdeveloped countries like India have to face.]

৮. উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কি ধরনের শর্ত পূরণ করতে হয়, তা বর্ণনা কর।

[Discuss the conditions that have to be fulfilled to make economic planning a success.]

৯. ধনতান্ত্রিক দেশে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে টীকা লেখ।

[Write a note on development planning under capitalism.]

১০. সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর।

[Indicate the characteristics of socialist planning.] [C.U. B.Com. '81]

১১. ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

[Describe any two characteristics of capitalist planning.]

১২. সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

[Mention at least two characteristics of socialist planning.]

১৩. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাকে বলে? অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কিভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়নের সহায়তা করছে? অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া কি আমাদের শিল্পোন্নয়ন সম্ভব?

[What is economic planning? In what different ways is economic planning fostering industrial development in India? Can we promote industrial development without economic planning?]

[B.U. B.A. III (80-81 Syll.) 1982]

১৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝ? "অনুন্নত দেশে পরিকল্পনার সাফল্যে কতকগুলি পূর্বশর্ত একান্ত অপরিহার্য।"—পূর্বশর্তগুলি আলোচনা কর।

[What is meant by 'economic planning'? "Some pre-requisites are essential for successful planning in underdeveloped countries"—Discuss these pre-requisites.]

[B.U. B.A. (Resources & Eco. planning) 1983]

সংক্ষিপ্ত উত্তরাভিত্তিক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান সুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

[Give the main advantages of economic planning.] [C.U. B.A. (II) 1982]

২. অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?

[What is meant by planning for economic development?] [C.U. B.A (II) 1984]

পরিকল্পনা কৌশল
Planning Technique

বিনিয়োগের হার নির্ধারণ / পঁজি-উৎপন্ন অন‌ুপাত / উন্নয়ন প্রকল্প ও উৎপাদন কৌশল মনোনয়ন / আবর্তনশীল পরিকল্পনা / বস্তুগত পরিকল্পনা বনাম আর্থিক পরিকল্পনা / বিনিয়োগের ধাঁচ ও সম্বলের বণ্টন / সম্বল সমাবেশ / অর্থনীতিক বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ / ভারতের পরিকল্পনা রচনার প্রণালী / রাজ্য / পরিকল্পনা ও স্থানীয় পরিকল্পনা / বার্ষিক পরিকল্পনা / আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

৯.১. বিনিয়োগের হার নির্ধারণ
Determination of Investment Rate

১. আয় থেকে সঞ্চয় এবং সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ করা হলে তা থেকে আবার সৃষ্টি হয় আয়ের। বিনিয়োগের ধর্ম হল আয় সৃষ্টি করা। যতটুকু বিনিয়োগ ঘটে, সাধারণত তার কয়েকগুণ আয় সৃষ্টি হয়। তাই, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি নির্ধারণের পর কাজ হল **নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি অনুযায়ী**, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের **উপযুক্ত বিনিয়োগ হার নির্ধারণ করা**। উপযুক্ত বিনিয়োগ হার নির্ধারণ করতে হলে পরিকল্পনাকারীদের প্রথমেই স্থির করতে হয় পরিকল্পনাকালে তাঁরা কি হারে জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধি (অর্থাৎ উন্নয়ন হার) চান। অর্থনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কে **হ্যারড-ডোমার** তত্ত্ব অনুযায়ী **জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন হারটি নির্ভর করে সঞ্চয়-আয় অনুপাতের** (savings-income ratio) **উপর**। [এ ক্ষেত্রে, ধরে নেওয়া হয়, যে হারে সঞ্চয় ঘটছে সে হারে বিনিয়োগও ঘটছে বা সঞ্চয়ের সবটুকু বিনিয়োগ হচ্ছে (অর্থাৎ সঞ্চয় = বিনিয়োগ)।] তারই **সাথে** দেশের শিল্পগত পরিস্থিতিটি সযত্নে অনুধাবন করে তদনুযায়ী পরিকল্পনাকারীদের **যথোপযুক্ত পঁজি উৎপন্ন অনুপাতটিও** (capital-output ratio) **স্থির করতে হয়**।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পরিকল্পনাকারীরা বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে উন্নয়ন চান এবং পঁজি-উৎপন্ন অনুপাতটি ৫ : ১ বলে নির্ধারণ করেন, তাহলে হ্যারড-ডোমার মডেল বা ছক অনুযায়ী পঁজি বিনিয়োগের হারটি হবে,

$$\frac{৪}{১০০} = বি \times \frac{১}{৫}$$

$$অথবা,\ বি = \frac{২০}{১০০} = ২০\ শতাংশ।$$

অর্থাৎ, যদি স্থির হয় যে পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি (অর্থাৎ উন্নয়ন হার) ঘটাতে হবে বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে, তাহলে প্রতি বৎসর ওই সময়ে জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (সঞ্চয় = বিনিয়োগ) করতে হবে। এ অবস্থায় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে বৎসরে জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ করে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোড়ার বৎসরে (১৯৫০-৫১ সালে) প্রারম্ভিক হার জাতীয় আয় ৫ শতাংশ ধরে নিয়ে তা ক্রমশ বাড়িয়ে পরিকল্পনাকালের শেষে ৭ শতাংশ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। প্রারম্ভিক

বিনিয়োগ ৫ শতাংশ বলে ধরে নেবার কারণ ছিল এই যে, গরিব দেশে জাতীয় আয় ও সঞ্চয়ের হার কদাচিৎ ৫ শতাংশের বেশি হয়—এই ছিল সাধারণ ধারণা।

ভারতে অভ্যন্তরীণ মোট সঞ্চয় হার প্রথম পরিকল্পনা-কাল থেকে (১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল) ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে বাজার দরে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপন্নের (GDP) ১০'৪ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে উঠেছে। ১৯৭০-৭১ সালের দামস্তরে হিসাব করলে তা ওই সময়ে ১৪'৪ শতাংশ থেকে ২০'৬ শতাংশ হয়েছে।

৩ স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নের একটি মূল প্রশ্ন হল, বিনিয়োগের আদর্শ হারটি কি হওয়া উচিত। অতীতে পশ্চিমী দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নকালে পুঁজি গঠনের নীট হার ছিল জাতীয় আয়ের ১০ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে জাপানে পুঁজি বিনিয়োগের হার ছিল ১৬ থেকে ২০ শতাংশ। সোভিয়েত রাশিয়ার গোড়ার দিকে উন্নয়ন হার ছিল ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। অতএব **স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়ন লাভ করতে হলে বিনিয়োগ হার জাতীয় আয়ের অন্তত ১৫ শতাংশ হওয়া দরকার।**

৪· উন্নয়নের অন্যতম প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল **বিনিয়োগ প্রকল্পগুলি ফলপ্রসূ হবার প্রয়োজনীয় কাল** (g station period)। সব প্রকল্পের ফলপ্রসূ হবার প্রয়োজনীয় কাল এক নয়। কোনোটার কম, কোনোটার বেশি। **প্রকল্প ফলপ্রসূ হতে সময় যত কম লাগে উৎপাদন বৃদ্ধির হার তত বেশি হয়।** প্রকল্প ফলপ্রসূ হতে সময় যত বেশি লাগে উৎপাদন বৃদ্ধির হার তত কম হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হার বা সঞ্চয়-আয় অনুপাত কম হলে অথবা পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতটি বেশি হলে, উন্নয়ন হারের উপর তার যে প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল দেখা দেয়, প্রকল্প ফলপ্রসূ হবার সময় দীর্ঘতর হলেও উন্নয়ন হারের উপর ওই একই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

৫· **হ্যারড-ডোমার মডেল** থেকে দেখা যায় **উন্নয়ন হার দু'ভাবে বাড়ানো যায় (১) পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত (capital-output ratio) কম ধার্য করে ; (২) সঞ্চয়-আয় অনুপাত (savings-income ratio) বা বিনিয়োগ হার বেশি ধার্য করে। তাই দ্রুততর অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে উচিত হল প্রধানত কম পুঁজি-প্রগাঢ় (capital intensive) শিল্পের উপর নির্ভর করা।** কারণ, যে সব শিল্পে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত কম। এই কারণেই ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর সাথে প্রয়োজন হল সঞ্চয়-আয় অনুপাতের অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগের চড়া হার। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্য ও নিচু জীবনযাত্রার মানের দরুন সঞ্চয়-আয় অনুপাত (অর্থাৎ বিনিয়োগ হার) বেশি হতে পারে না। এমন কি উন্নয়ন শুরু হবার পরও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সঞ্চয়-আয় অনুপাত (অর্থাৎ বিনিয়োগ হার) বেশি হতে পারে না। কারণ, উন্নয়নের দরুন আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বল্পোন্নত দেশের মানুষ পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির মানুষের অনুকরণে নতুন নতুন আরামদায়ক ও বিলাসদ্রব্যের ভোগব্যয় বাড়িয়ে দেয় (অধ্যাপক ডুসেনবেরীর ভাষায় 'ডেমনস্ট্রেশন এফেক্ট' বা 'প্রদর্শন প্রভাব') যার ফলে সঞ্চয় কম হয় এবং সঞ্চয়-আয় অনুপাত কম থেকে যায়। সুতরাং **স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয়-আয় অনুপাতের স্বল্পতা এসব দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সীমিত করে দেয়।**

৬· পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে গেলে, তার উপর ভিত্তি করে গোটা পরিকল্পনাকালের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগের চূড়ান্ত পরিমাণ বা স্তর (absolute level of capital investment) স্থির করা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করেছিল (৯ হাজার কোটি টাকা থেকে জাতীয় আয় বেড়ে ১০ হাজার কোটি টাকায় পরিণত হবে স্থির হয়েছিল) প্রথম পরিকল্পনায় পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত ৩ : ১ বলে ধরে নেওয়ায়, এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে, উৎপন্ন (অর্থাৎ জাতীয় আয়) ১ হাজার কোটি টাকা বাড়াতে ৩ হাজার কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

৭· সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কি বিনিয়োগ হার (বা সঞ্চয়-আয় অনুপাত) নির্ধারণে, কি পুঁজি বিনিয়োগের চূড়ান্ত স্তর নির্ধারণে, সব ক্ষেত্রেই পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৯২· পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত
Capital-Output Ratio

১· **পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত বলতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে আয় বাড়াতে হলে কি পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, তা বোঝায়।** যেমন, ১ টাকার আয় বাড়াতে যদি ৩ টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়, তাহলে পুঁজি উৎপন্ন অনুপাতটি হল ৩ : ১। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত বিভিন্ন রকমের হলেও, দেশের সমগ্র অর্থনীতির জন্য একটা গড়পড়তা পুঁজি-উৎপন্নের হার হিসাব করা যায়। সুতরাং, **পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত হল পুঁজি বিনিয়োগ ও তার দরুন**

উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের অনুপাত। অর্থনীতিক পরিকল্পনায় এর গুরুত্ব যে কি তা অধ্যাপক হ্যারড ও অধ্যাপক ডোমারের মডেল থেকে বোঝা যায়। বাস্তবিক **পক্ষে এটি তাই পরিকল্পনাকারীদের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।** একটি সুনির্দিষ্ট হারে বিনিয়োগ করা হলে তার সাহায্যে কোন্ হারে অর্থনীতির উন্নয়ন করা যেতে পারে তা পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের সাহায্যে স্থির করা যায়। **তেমনি আবার একটা সুনির্দিষ্ট হারে অর্থনীতির উন্নয়ন করতে হলে কোন্ হারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে তাও পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়। তাছাড়া অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে** (প্রাথমিক বা কৃষি, মাধ্যমিক বা শিল্প প্রভৃতি) **আলাদা আলাদা পুঁজি উৎপন্ন অনুপাতের সাহায্যে সমগ্র অর্থনীতির জন্য বিনিয়োগের ধাঁচ (pattern to investment) কি হবে, তাও পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের সাহায্যে স্থির করা সম্ভব হয়।** স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজির পরিমাণ কম। তাই অর্থনীতির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন পুঁজি উৎপন্ন অনুপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত পুঁজির প্রগাঢ়তা (capital intensity) অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পকে ক্রমিকভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় এবং তদনুযায়ী তাদের মধ্যে কোনগুলি উন্নয়নের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে তা স্থির করা যায়। যেমন, যে শিল্প যত কম পুঁজি-প্রগাঢ় (less capital intensive) উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাকে তত বেশি অগ্রাধিকার এবং যে শিল্প যত বেশি পুঁজি-প্রগাঢ় তাকে তত কম অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

২. **কিন্তু পুঁজি উৎপন্নের অনুপাতের গুরুত্ব পরিকল্পিত অর্থনীতিতে যত বেশিই হোক না কেন, কেবল তাই দিয়ে পুঁজি বিনিয়োগের সমগ্র ধাঁচ নির্ধারিত হয় না। কতকগুলি রাজনীতিক ও সামাজিক বিচার-বিবেচনাও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।** যেমন, ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, ক্ষেত্রগত পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত বিচার করলে সে অগ্রাধিকার তাদের পাবার কথা ছিল না। সুতরাং, দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগ-ধাঁচ নির্ধারণকারী অনেকগুলি বিষয়ের মাত্র একটি হল পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত। **অন্যান্য নির্ধারকের মধ্যে রয়েছে শ্রমের দক্ষতা, কারিগরী জ্ঞান, ব্যবস্থাপনাগত ও সংগঠনগত অবস্থা ও ব্যবস্থা ইত্যাদি।** সুতরাং, পুঁজি উৎপন্ন অনুপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত উন্নয়ন হারটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত নাও হতে পারে। বাস্তবে যে হারে উন্নয়ন ঘটে তা ওই নির্ধারিত উন্নয়ন হারের চেয়ে কমও হতে পারে। **তাই অনেক সময়ে, পুঁজি উৎপন্ন অনুপাতটি শুধু অপূর্ণ আশা ও সম্ভাবনায় পরিণত হয়।**

৩. স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজি-উৎপন্নের অনুপাত যে ঠিক কত তার হিসাব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞদের হিসাবে এ অনুপাত ২ : ১ থেকে ৫ : ১-এর মধ্যে। অধ্যাপক কেনেথ কুরিহারার হিসাবে এটা ৫ : ১ হওয়া সম্ভব। অধ্যাপক সিঙ্গারের অনুমান হল এটা কৃষিক্ষেত্রে ৪ : ১ এবং কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৬ : ১। অধ্যাপক রোজেনস্টাইন রোডান এই অনুপাত ৩ : ১ থেকে ৪ : ১-এর মধ্যেই থাকে বলে মনে করেন।

৪ উন্নয়নশীল স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজি উৎপন্ন অনুপাতটি যে ঠিক কত সেই হিসাব নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্যের কারণ হল, স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজি উৎপন্ন অনুপাত সঠিকভাবে হিসাব করার কোনো নিখুঁত সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড নেই। তাই এর হিসাব নিয়ে অর্থনীতিবিদরা দুটি শিবিরে বিভক্ত : একদলের মতে স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত বেশ উঁচু ; অন্যদলের মতে এ অনুপাত খুব নিচু।

৫. **যাঁদের হিসাবে এ সব দেশে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত উঁচু** (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করে অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন পাওয়া যায়) তাঁরা তাদের হিসাবের সমর্থনে যে যুক্তি দেখান সেগুলি হল :

(১) স্বল্পোন্নত দেশে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে বলে পুঁজি ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয় না। বিনিয়োজিত পুঁজির পূর্ণ ব্যবহার করা না গেলে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত উঁচু হবে এটাই স্বাভাবিক। (২) এ সব দেশে কারিগরী জ্ঞান খুবই নিম্নমানের এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ বলে নতুন ও উন্নত কারিগরী জ্ঞান আয়ত্ত করতে দীর্ঘ সময় লাগে। (৩) পরিবহণ, তেজ শক্তি গৃহ-নির্মাণ ইত্যাদি [যাদের আধুনিক কালের অর্থবিদ্যার ভাষায় 'অর্থনীতিক অন্তর্কাঠামো' (infra-structure of the economy) বা 'সামাজিক অর্থনীতিক উপরিব্যবস্থা' (social economic overheads) বলা হয়] প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে উৎপাদন বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাতে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত উঁচু থেকে যায়। (৪) স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অচলাবস্থায় (stagnancy) নূন্যন দেশে যে সব সামাজিক-অর্থনীতিক উপরিব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় না বলেও পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত উঁচুতেই থেকে যায়। (৫) অনেক স্বল্পোন্নত

দেশেই দেখা যায় প্রাকৃতিক উপকরণের ঘাটতি রয়েছে ; এ সব দেশে এ ঘাটতি পূরণ করতে বেশি পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। ফলে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতও স্বাভাবিকভাবেই উঁচু হয়। (৬) স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে চাহিদার সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এবং এমন সব দ্রব্যের চাহিদা দেখা দেয় যা উৎপাদন করতে খুব বেশি পুঁজির দরকার হয়। তাই পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতেরও উঁচু হবার প্রবণতা দেখা যায়।

৬. **যাঁরা স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতটি কম বলে মনে করেন** তাঁদের হিসাবের সমর্থনে যে যুক্তি দেখান হয় তা হল :

(১) এ সব দেশে বিপুল পরিমাণে অব্যবহৃত কিম্বা স্বল্পব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপকরণ রয়েছে। এ কারণে অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগ করে তুলনায় বেশি উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত নিচু হওয়াই স্বাভাবিক। (২) স্বল্পোন্নত দেশে সাধারণভাবে কৃষির উন্নয়ন ও কুটির শিল্পে ব্যাপক সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগুলি শ্রম-প্রগাঢ় (labour-intensive) ও দ্রুত উৎপাদনক্ষম (quick investment) শিল্প বলে এগুলির মাধ্যমে দ্রুত হারে উৎপাদন বাড়ানো যায়। এগুলির বিশেষ সুবিধা হল এগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম পুঁজির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। তাই পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত নিচু হবার সম্ভাবনা থাকে। (৩) এ সব দেশে নতুন পুঁজি বিনিয়োগের ফলে নতুন উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশ ঘটে, বিশেষ করে শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ঘটে অনেক বেশি। তাই পুঁজি-উৎপন্নের অনুপাত নিচু হওয়াই স্বাভাবিক। (৪) পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হবার সাথে সাথে আগে যে সব উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত ছিল ধীরে ধীরে সেগুলির ব্যবহারও শুরু হয়ে যায়। (৫) পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালিত হওয়ার দরুন বাণিজ্যচক্রের মন্দার হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া সম্ভব। তাই উন্নত দেশের পরিকল্পনাহীন অর্থনীতির চেয়ে স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন হার বেশি হয়। ফলে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত নিচু থাকে।

৭. **এই বিতর্কের কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা এখনো হয়নি।** তবে এ বিষয়ে সাধারণ অভিমত হল, স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার দিকে পুঁজি-উৎপন্নের অনুপাতটি কম থাকে ; উন্নয়ন প্রক্রিয়া যত এগিয়ে চলে অর্থনীতিও তার সাথে তাল রেখে উন্নয়নের উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে। এ রকম অবস্থায় পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং উন্নয়নের একটা স্তরে সেই অনুপাত স্থিতিশীল হয়।

৯৩. উন্নয়ন প্রকল্প ও উৎপাদন কৌশল মনোনয়ন Choice of Project and Technique of Production

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং পরিকল্পনায় সাফল্য লাভের জন্য তার সন্তোষজনক সমাধান করতে হয়, তার মধ্যে একটি হল উৎপাদন-কৌশল মনোনয়ন। উৎপাদন কৌশল হল দু'টি : (১) শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল এবং (২) পুঁজি-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল। প্রথমটিতে, উৎপন্ন দ্রব্যের একক পিছু পুঁজির তুলনায় বেশি শ্রম ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়টিতে উৎপন্ন দ্রব্যের একক পিছু শ্রমের তুলনায় বেশি পুঁজি ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটিতে শ্রমের উপর এবং প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে পুঁজির উপর বেশি নির্ভর করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই দু'টির মধ্যে কোন্ কৌশলটি বেশি উপযোগী তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। **অধ্যাপক নার্কসের মতে, স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে পুঁজি-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল বাঞ্ছনীয় নয়, এবং তা প্রয়োগ করা উচিত নয়। অধ্যাপক মরিস ডবের মতে, স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে পুঁজি প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা খুবই সঙ্গত।**

২. **শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন-কৌশলের সপক্ষে যুক্তি :** (১) স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণত, বিরাটসংখ্যক পূর্ণ বেকার ও প্রচ্ছন্ন বা স্বল্পনিযুক্ত আংশিক বেকার দেখা যায়। এদের কর্মসংস্থানের সমস্যা এ সব দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির অন্যতম। এ কারণে এই সমস্যাটির সমাধানকে পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার প্রয়োজন রয়েছে। শিল্পে শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলের ব্যবহার এজন্য অপরিহার্য। পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে শ্রম কম লাগে বলে, আশু বেকার সমস্যা কমানো তো যায়ই না, বরং তা বেড়ে যেতে পারে।

(২) এসব দেশে পুঁজির যোগান খুব কম। শিল্পে সাধারণভাবে শ্রম-প্রগাঢ় কৌশলটি গ্রহণ করা হলে, যে স্বল্প পরিমাণ পুঁজি রয়েছে তা কেবল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রেই নিয়োগ করা যেতে পারে যেখানে তা অপরিহার্য। এইভাবে স্বল্প পুঁজির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হতে পারে।

(৩) উন্নয়ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ে। ভোগ্যপণ্য

শিল্প শ্রম-প্রগাঢ় কৌশল গ্রহণের দ্বারা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়ানো যায়। তাতে ভোগ্যপণ্যের স্বল্প যোগান ও মুদ্রাস্ফীতির সমস্যাগুলি অনেক পরিমাণে দূর করা যায়। এতে স্থিতিশীলতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের (economic development with stability) লক্ষ্যে পৌঁছানো কিছুটা সহজ হয়।

(৪) শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশল ব্যবহারে, পুঁজিদ্রব্য অর্থাৎ যন্ত্রপাতির উপর কম নির্ভর করতে হয়। দামী আধুনিক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করার প্রয়োজন হয় না। সে জন্য বিদেশী মুদ্রাও যোগাড় এবং খরচ করতে হয় না। শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে যে সামান্য পরিমাণ যন্ত্রপাতি লাগে তা সহজেই প্রচলিত কারিগরী জ্ঞানে ও অল্প খরচে দেশেই তৈরি করে নেওয়া যায়। সুতরাং শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশল বিদেশী মুদ্রার খরচ বাঁচায়।

(৫) শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশল সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সঙ্গেই জড়িত থাকে। সুতরাং এই কৌশলের সাহায্যে শিল্প প্রসারের দ্বারা শিল্পের, কর্মসংস্থানের, আয়ের ও মালিকানার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্পকৌশল বৃহদায়তন শিল্পের সাথে জড়িত। তার মালিকানা থাকে মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে। সুতরাং, পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের উপর নির্ভরতার ফলে বৃহদায়তন শিল্পের প্রসারের মারফত আয়, অর্থনৈতিক শক্তি ও মালিকানার কেন্দ্রীভবন ঘটে ও একচেটিয়া কারবারের প্রাধান্য বাড়ে।

(৬) শ্রম প্রগাঢ় উৎপাদন-কৌশলের আর একটি সুবিধা হল, এতে খুব বেশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপরি-খরচের (economic and social overheads) দরকার হয় না। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, পুঁজি-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলের ক্ষেত্রে উপরি-খরচের পরিমাণ বিরাট হতে বাধ্য (যেমন—বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতির সম্প্রসারণে, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে উপরি-খরচ)।

৩. পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের সপক্ষে যুক্তি :

১) পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের দ্বারা, শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের তুলনায়, অনেক বেশি হারে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। কারণ, শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে, জাতীয় আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তার মধ্যে মজুরির অংশটাই বেশি হয়। এর বেশির ভাগটাই শ্রমিকেরা ভোগের জন্য খরচ করে। সুতরাং সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করার মতো উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম হয়। তাই বিনিয়োগের হারও কম হয়, এবং উন্নয়নের হারও কম হয়।

(২) পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে উৎপাদন যেমন বেশি হারে বাড়ে, তেমনি উৎপন্ন দ্রব্যগুলির উৎকর্ষ বাড়ে এবং তা কম খরচে উৎপন্ন হয় বলে কম দামে তা জনসাধারণ পেতে পারে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ানো। জিনিসপত্রের দাম কম হলেই জীবনযাত্রার মান বাড়তে পারে। তুলনায় শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হয়, উৎপাদন খরচও বেশি পড়ে। তাই বেশি দামেই তা বিক্রি করতে হয়। ফলে ক্রেতাদের ব্যয় বেশি ও সঞ্চয় কম হয়।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম লক্ষণ হল শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লে, তবেই উৎপাদনের মোট পরিমাণ তথা জাতীয় আয় দ্রুতবেগে ও উচ্চহারে বাড়তে পারে এবং তার ফলে সঞ্চয় ও পুঁজিগঠনও উঁচুহারে ঘটতে পারে। এটা পুঁজি প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের দ্বারাই সম্ভব।

(৪) **অধ্যাপক পল ব্যারানের** মতে, শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশল শেষ পর্যন্ত পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের চেয়েও বেশি পুঁজি প্রগাঢ় হয়ে উঠতে পারে। কারণ, শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের দরুন গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রমশ স্বল্পনিযুক্ত মানুষকে বা প্রচ্ছন্ন বেকারদের সরিয়ে শিল্পাঞ্চলে পাঠাতে হবে। তখন শিল্পাঞ্চলে তাদের জন্য বাড়ি-ঘর, হাসপাতাল, স্কুল, পথঘাট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেজন্য যথেষ্ট খরচ করতে হবে। এই খরচের পরিমাণটা যদি ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে, শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে উৎপন্ন সামগ্রীর একক পিছু পুঁজি খরচটা পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে যা লাগত, তার চেয়ে অনেক বেশি হয়।

(৫) পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলে আধুনিক কারিগরী জ্ঞান, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যেমন বেগবান হয় তেমনি তার গতিও থাকে অব্যাহত। শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশল নির্ভর করে পুরাতন যন্ত্রপাতি, পুরাতন কারিগরী জ্ঞান ও পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির উপর। তার ফলে দেশে অর্থনৈতিক নিশ্চলতার অবস্থাটিই আরও দৃঢ় হয়ে বসে।

৪. এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই দুটির মধ্য থেকে কোনো একটি উৎপাদন কৌশল বেছে নেওয়ার কাজটি কত কঠিন। দারিদ্র্যের পাপচক্র, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, স্বল্প আয় ও সঞ্চয়ের স্বল্পহার বিশিষ্ট স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে জনসাধারণের জীবন ধারণের মান বৃদ্ধির জন্য দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান হারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতেই হবে। পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প ছাড়া

তা সম্ভব নয়। তেমনি লক্ষ লক্ষ পূর্ণ এবং আংশিক বেকার মানুষের দুর্বহ, বেদনাময় অস্তিত্বের কথাও ভুলে থাকা সম্ভব নয় এবং তারা যতদিন থাকবে ততদিন অর্থনৈতিক অগ্রগতিও সম্পূর্ণ হবে না। একমাত্র শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলের সাহায্যেই এদের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। তাই স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশে শ্রম প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলকেও একেবারে বাদ দেওয়া কখনই সম্ভব নয়।

৫. সুতরাং, **স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে যা প্রয়োজন, তা হল এই দু'টি উৎপাদন কৌশলেরই বিচক্ষণ সংমিশ্রণ।** মাও-ৎসে-তুং-এর ভাষায় এটা হল 'দু' পায়ে হাঁটা' (walking on two legs)। দু'টি কৌশলের সংমিশ্রণ ঘটানো হবে এ ভাবে : একদিকে, বিনিয়োগের হার বাড়াতে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে হবে এবং পুঁজি-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজে সেই উদ্বৃত্ত ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে, প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা (অর্থাৎ স্বল্পনিযুক্তি) যতদিন না সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় ততদিন শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প কৌশলটিও প্রয়োগ করে যেতে হবে।

৬. **উৎপাদন কৌশল দু'টির প্রয়োগ ও প্রকল্প বাছাই :** স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজি প্রগাঢ় এবং শ্রম-প্রগাঢ় উভয় উৎপাদন কৌশলেরই প্রয়োজন রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অন্যটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। এখন প্রশ্ন হল, **কোন্ উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন্ কৌশলের উপর নির্ভর করা হবে বা করা উচিত?** এই প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতির দিক থেকে **কৃষি ও কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং ভোগপণ্য শিল্প প্রধানত শ্রম-নির্ভর।** সুতরাং এই ধরনের শিল্পে শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্য দিকে, দেশের **ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়ন ও শিল্পপ্রসারে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য মূল ও ভারী-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এ ধরনের শিল্পগুলি পুঁজি নির্ভর (capital intensive)। তাই এদের ক্ষেত্রে পুঁজি-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল অপরিহার্য। এইভাবে দুইধরনের শিল্পক্ষেত্রের উপযোগী ওই দু'রকমের উৎপাদন কৌশল পাশাপাশি গ্রহণ করা উচিত।** এই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, ধীরে ধীরে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পগুলিতে আধুনিক কারিগরী কৌশল প্রবর্তিত হতে থাকবে। সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পগুলি ধাপে ধাপে নিম্নতর উৎপাদন কৌশল থেকে উচ্চতর উৎপাদন কৌশলের স্তরে উন্নীত হতে থাকবে। এভাবে এমন একটা সময় আসবে যখন পুঁজি-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল কমবেশি সবরকম শিল্পেই প্রযুক্ত হবে। তাই শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলটিকে একটি সাময়িক ও অন্তর্বর্তী কৌশল হিসাবেই গণ্য করা উচিত।

৭ ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উপরোক্ত দু'টি কৌশলের সমন্বয় এইভাবে করা হয়েছিল। ভারী ও মূল শিল্পগুলির জন্য পুঁজি-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল এবং কুটির, ক্ষুদ্রায়তন এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পের জন্য শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। এবং তার দ্বারা একই সঙ্গে উন্নয়ন হারের এবং কর্মসংস্থানের সর্বাধিক বৃদ্ধির লক্ষ্যটি সাধিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে এই পন্থাটিই অনুসরণ করা হয়েছে।

১৪. আবর্তনশীল পরিকল্পনা Rolling Planning

১. পশ্চাৎপদ অর্থনীতিতে **আবর্তনশীল পরিকল্পনা** (rolling planning) প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন **অধ্যাপক গুন্নার মিরডাল।** আবর্তনশীল পরিকল্পনার ধারণাটিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় :

প্রত্যেক বৎসর তিনটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। একটি পরিকল্পনা হবে আলোচ্য বছরের ঠিক পরের বছরের জন্য। এই পরের বছরটিতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম কি হবে তার রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে এ পরিকল্পনায়। অপর একটি পরিকল্পনা হবে আলোচ্য বছরের পরেকার কয়েকটি বছরের জন্য [কয়েকটি বছর বলতে পাঁচ, ছয়, সাত কিংবা চার বছরও হতে পারে]। আর একটি পরিকল্পনা হবে যথানুপাতিক পরিকল্পনা (perspective plan)। সাধারণভাবে এটা হবে ১৫ বা ২০ বছরের পরিকল্পনা; তবে অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এর থেকেও বেশি বছরের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা যেতে পারে।

এ থেকে দেখা যাবে, কাল-ব্যাপ্তির দিক থেকে এ তিনটি পরিকল্পনা তিন রকমের : একটি স্বল্পকালীন অর্থাৎ এক বছরের; একটি মধ্যকালীন অর্থাৎ ৪ বা ৫ বা ৬ কিংবা ৭ বছরের; আর একটি দীর্ঘকালীন অর্থাৎ ১৫, ২০ বা ২৫ বছরের জন্য।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, ১৯৮৪-৮৯-এ পাঁচ বছরের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করা হল। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এ পরিকল্পনাটি একটি ১৫ বা ২০ বছরের যথানুপাতিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। মধ্যমেয়াদী এ পরিকল্পনার (১৯৮৪-৮৯) প্রথম বৎসরের (১৯৮৪-৮৫)

জন্য একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা রচিত হল এবং সেটিকে রূপায়িত করা হল। আলোচ্য বছরের (১৯৮৪-৮৫) শেষে ঐ বছর পরিকল্পনার কার্যসূচি যতটুকু রূপায়িত হয়েছে তার ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের (১৯৮৫-৮৬) জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হল। ইতোমধ্যে ১৯৮৪-৮৫ বছরটিকে বাদ দিয়ে ১৯৮৯-৯০ বছরটিকে যোগ করা হল। ফলে যেটা ছিল ১৯৮৪-৮৯-এর পরিকল্পনা সেটি এখন হল ১৯৮৫-৯০-এর পরিকল্পনা। দু'টো ক্ষেত্রেই পাঁচ বছর কাল-ব্যাপ্তি ঠিকই রইল। পরবর্তীস্তরে ১৯৮৫-৮৬ বছরটি যখন পার হয়ে যাবে তখন এ বছরটিকেও বাদ দেওয়া হবে। আর ১৯৯০-৯১ বছরটি এর সাথে যোগ করে নেওয়া হবে। এ ভাবে প্রতি এক বছর অন্তর পরিকল্পনার প্রথম বছরটি যেমন নতুনভাবে নির্ধারিত হতে থাকবে তেমনি শেষ বছরটিও ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতের দিকে সরে যেতে থাকবে। আবর্তনশীল পরিকল্পনার সার কথা হলো মধ্যকালীন পরিকল্পনাটিকে প্রত্যেক বছরের শেষে নবীকরণ করা হবে যদিও মোট বছরের সংখ্যা একই থাকবে।

২. আবর্তনশীল পরিকল্পনার যেমন অনেকগুলি সুবিধা আছে, তেমনি কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। সেগুলিকে এভাবে বিবৃত করা যায়ঃ

সুবিধা (merits)ঃ এ ধরনের পরিকল্পনার সব চেয়ে বড় সুবিধা হল এর নমনীয়তা। এ সুবিধাটি নির্দিষ্ট সময়ের কাঠামোতে বাঁধা পরিকল্পনায় (যেমন, ৫ বছরের পরিকল্পনা) থাকে না। আর একটি সুবিধা হল, এ ধরনের পরিকল্পনা অনেক বেশি বাস্তবানুগ হয়। তুলনা করে বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের কাঠামোতে বাঁধা পরিকল্পনায় অনেক উচ্চাশাপূর্ণ লক্ষ্য হয়তো স্থির করা হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে লক্ষ্য পূরণ করা হয়তো সম্ভব হয় না। ফলে পরিকল্পনার বেশ কিছুটা কাটছাঁট করতে হয়, গোটা পরিকল্পনাটিকে তার ব্যাপক ও বহুবিধ লক্ষ্যসূচি থেকে সরিয়ে এনে বিশেষ একটি বা দু'টি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাটির রদবদল করে নিতে হয়। আবর্তনশীল পরিকল্পনায় এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

অসুবিধা (demerits)ঃ (ক) আবর্তনশীল পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়, এর নমনীয়তা হয়তো আছে কিন্তু সে নমনীয়তা পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও একাগ্রতা সঞ্চার না করে উদ্যোগ ও উদ্দীপনা স্তিমিত করে দিতে পারে, এক ধরনের নিস্পৃহতা সৃষ্টি করতে পারে। উপরন্তু নমনীয়তা পরিকল্পনা লক্ষ্য পূরণের বিষয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে এবং যে কোনো ব্যর্থতাকেই সমর্থনযোগ্য করে তুলতে পারে। কোনো একটি বছরে যে লক্ষ্য পূরণ করা গেল না সেটি পরের বছরের লক্ষ্য তালিকায় যুক্ত করে দিয়ে তাৎক্ষণিক দায়িত্ব থেকে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে নিষ্কৃতির সুযোগ করে দিতে পারে।

এর বিরুদ্ধে বলা যায়, আবর্তনশীল পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হয়, সেটি নির্দিষ্ট সময়ের কাঠামোতে বাঁধা পরিকল্পনা সম্পর্কেও খাটে; বরং, পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সংসদের কাছে যেখানে পাঁচ বছরে একবার মাত্র জবাবদিহি করতে হয় ও সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়, আবর্তনশীল পরিকল্পনায় প্রত্যেক বছরেই কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়।

(খ) সমালোচকদের মতে, আবর্তনশীল পরিকল্পনা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, সেটা বস্তুতপক্ষে বার্ষিক পরিকল্পনারই সমতুল্য। সুতরাং, তাঁদের মতে বার্ষিক পরিকল্পনাকে আর যা-ই বলা হোক না কেন, সত্যিকারের পরিকল্পনা বলা যায় না। এটি আসলে পরিকল্পনাকে বাতিল করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এই উত্তরে বলা যায়, আবর্তনশীল পরিকল্পনা প্রত্যেক বছরেই রচিত হয় বটে তবে এটা ভুললে চলবে না যে, যেটিকে বার্ষিক পরিকল্পনা বলা হচ্ছে সেটি কিন্তু একটি মধ্যমেয়াদী (৫ বছর বা ঐ রকম সময়ের) পরিকল্পনারই অঙ্গ। শুধু তাই নয়, সেটি একটি দীর্ঘমেয়াদী (১৫ বা ২০ বছরের) পরিকল্পনারও অংশ। সুতরাং, যাঁরা মনে করেন আবর্তনশীল পরিকল্পনার অর্থ হল পরিকল্পনাকেই বাতিল করে দেওয়া, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে আবর্তনশীল পরিকল্পনা সমগ্র পরিকল্পনাটিকে নতুন করে তৈরি করতে চায়।

(গ) আর একটা অসুবিধাকে প্রশ্নের আকারে উপস্থাপন করা হয়। সেটি হল, প্রত্যেক বছর একটি করে পরিকল্পনা রচনা করার মতো সংগঠন-কাঠামো কি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের থাকে? অথবা থাকা কি সম্ভব? এ ধরনের জটিল ও সময়সাধ্য কাজ সম্পাদনের জন্য যে খুঁটিনাটি তথ্য ও পরিসংখ্যান দরকার সেগুলি কি প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের মতো স্বল্পকালের মধ্যে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায়, এগুলি সবই প্রশাসনিক সমস্যা। এ সব সমস্যার সমাধান যে করা যায় না তা নয়। প্রশাসনিক কাঠামোটিকে পুনর্গঠন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে আরো দক্ষতা, নিষ্ঠা ও উদ্যম সঞ্চার করে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়। তা ছাড়া, এ ধরনের সমস্যা আছে বলেই

আবর্তনশীল পরিকল্পনা নাকচ করে দিতে হবে এটাও কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়।

(ঘ) আরো একটি অসুবিধার কথা বলা হয়। সেটি হল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাথে রাজ্য পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় সাধন সময়মতো করা সম্ভব হবে কি? এ প্রশ্নটা ওঠে এ কারণে যে, কেন্দ্র থেকে কি পরিমাণ সাহায্য প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য পাওয়া যাবে আগেভাগে সেটা জানতে না পারলে রাজ্যের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নিজেদের বার্ষিক বা মধ্যমেয়াদী কোনো পরিকল্পনাই রচনা করতে পারে না। এ সমস্যার একটি সমাধান হল, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ বছরের পরিকল্পনার জন্য কি পরিমাণ সাহায্য দিতে পারবে বলে মনে করে সে সম্পর্কে আগেভাগেই রাজ্যগুলিকে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা দিতে পারে। তারই ভিত্তিতে রাজ্যগুলি তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করে নিতে পারবে। কেন্দ্র থেকে প্রত্যাশিত সাহায্যের কিছু হেরফের হতে পারে এ রকম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনার মধ্যে উপযুক্ত রক্ষাকবচের ও নমনীয়তার ব্যবস্থা রাখতে পারবে। তারপর চূড়ান্ত রূপ দেবার সময় পরিকল্পনার মধ্যে প্রয়োজনীয় রদবদল করে নিতে পারবে।

(ঙ) আবর্তনশীল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বার্ষিক পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে বেসরকারী ক্ষেত্রের অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়। প্রশ্নটা ওঠে এ কারণে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতি হল শিল্পায়নের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার কর্মপদ্ধতি রচনা করা। এ অবস্থায় এ নীতির সাথে আবর্তনশীল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বার্ষিক পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে সম্ভব হবে? এর উত্তরে বলা যায়, এ ক্ষেত্রেও পাঁচ বছরের শিল্পায়নের পরিকল্পনা রচিত হতে পারে এবং সে পরিকল্পনার বিনিয়োগের কার্যসূচি তৈরি করা যেতে পারে।

৩ **মন্তব্য (Comments)ঃ** সব দিক বিচার করলে ভারতে আবর্তনশীল পরিকল্পনা প্রবর্তন করা খুবই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ভারতে এ ধরনের পরিকল্পনার ধারণাটাই যে নতুন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মনে হয়, এর নতুনত্বই এর প্রয়োগের ব্যাপারে যা কিছু দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি করছে। এ দেশের পরিকল্পনার যন্ত্রটিকে আরো শক্তিশালী ও আরো বেশি দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে আবর্তনশীল পরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা যেতে পারে। তাতে ক্ষতি তো হবেই না বরং উপকারের সম্ভাবনাই বেশি।

১৫. বস্তুগত পরিকল্পনা বনাম আর্থিক পরিকল্পনা
Physical Planning Vs. Financial Planning

১. **বস্তুগত (Physical) পরিকল্পনা** বলতে বস্তুগত সম্বলের (যেমন—শ্রম, কাঁচামাল, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি) ভিত্তিতে পরিকল্পনা বোঝায়। বস্তুগত সম্বল ছাড়া কোনো পরিকল্পনার কার্যসূচি রূপায়ণ করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, একটি রেলসেতু নির্মাণের জন্য সিমেণ্ট, ইট, ইস্পাত, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি বস্তুগত সম্বলের প্রয়োজন হয়। কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে একটি বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হয়। বিষয়টি হল, পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য বস্তুগত সম্বল যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা। দেশে কি কি সম্বল আছে, সে সম্বলের কতটুকু পরিকল্পনার কাজে পাওয়া যেতে পারে—এ ধরনের হিসাবের ভিত্তিতে বস্তুগত পরিকল্পনা সঠিকভাবে রচনা করতে না পারলে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করা কখনোই সম্ভব হয় না। বস্তুগত পরিকল্পনা রচনার সময় আরো একটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। সেটি হল, কোনো উন্নয়ন প্রকল্প নির্মিত হবার পর তা থেকে যে পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হবে সেগুলি কোথায় ও কিভাবে ব্যবহার করা হবে। এ বিষয়ে আগেভাগেই সব কিছু বিবেচনা করতে না পারলে সমগ্র পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

২. **আর্থিক (Financial) পরিকল্পনা** হল, পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য কত অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং কোন্ কোন্ উৎস থেকে সেই আর্থিক সম্বল সংগ্রহ করা হবে তার পরিকল্পনা।

ধনতান্ত্রিক সমাজে আর্থিক পরিকল্পনা যে কোনো পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধনতান্ত্রিক সমাজে সব উৎপাদনের উপাদান তথা যাবতীয় বস্তুগত সম্পদ ও সেবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন। এর অর্থ হল, সমাজে কোনো সম্পদ বা সম্বল (সেটা প্রাকৃতিকই হোক বা মানবিক হোক) অবাধ (free) নয়। সম্পদ ও সম্বল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বলে এগুলির ব্যবহারের জন্য এগুলির মালিককে দাম দিতে হয়। যেহেতু পরিকল্পনার কার্যসূচি রূপায়ণে এসব উপকরণ ব্যবহার করতে হয় তাই এগুলির জন্য সমগ্র পরিকল্পনায় কত অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে তার হিসাব করতে হয় এবং সে অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে তারও বিশদ পরিকল্পনা রচনা করতে হয়।

৩. এখন প্রশ্ন হল, বস্তুগত পরিকল্পনা এবং আর্থিক পরিকল্পনা—এ দুটির মধ্যে কোন্‌টিকে প্রথমে রচনা

করতে হয়? এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য রয়েছে।

একটি মত হল, স্বল্পোন্নত দেশে প্রথমে আর্থিক পরিকল্পনাই করা উচিত। এর সপক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয় তাকে এভাবে বিবৃত করা যায়ঃ সমাজের আয় বলতে যা বোঝায় তাকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়; আর্থিক আয় (money income) ও প্রকৃত আয় (real income)। আর্থিক আয়, বস্তুতপক্ষে, প্রকৃত আয়েরই প্রতিফলন। অন্যভাবে বলা যায়, আর্থিক আয় ওপ্রকৃত আয়—এরা একই বিষয়ের দু'টি দিক। টাকা পয়সার হিসাবে যেটা সমাজের আর্থিক আয় সমাজে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সেবা প্রভৃতি বস্তুগত সম্বলের হিসাবে সেটাই প্রকৃত আয়। এর অর্থ হল, আর্থিক আয়ের পিছনে সমাজের বস্তুগত সম্বল বিদ্যমান থাকে। তেমনি সমাজের আর্থিক ব্যয় সমাজের বস্তুগত সম্বলের ভোগ বা ব্যবহার সূচিত করে। সুতরাং, বস্তুগত সম্বলের যে অংশ সমাজ ভোগ করেনি (অর্থাৎ, অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে) সেটাই হল সমাজের প্রকৃত সঞ্চয়। ঠিক সেই পরিমাণ বস্তুগত সম্বলই (তার বেশি নয়) সমাজ বিনিয়োগ করতে সক্ষম। এ থেকেই বোঝা যায় সমাজের আর্থিক সঞ্চয় প্রকৃত সঞ্চয়ের প্রতিভূ। সুতরাং, সমাজের বিনিয়োগ সমাজের সঞ্চয় থেকে কখনই বেশি হতে পারে না। এ অবস্থায় নতুন অর্থ সৃষ্টি করলে তাতে বস্তুগত সম্বল সৃষ্টি হয় না এবং এ কারণেই তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় না। বরং এর ফলে সমাজ মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্তরস্ফীতির কবলে পড়ে। তাই সমাজের উন্নয়নমূলক ব্যয় সমাজের সঞ্চয় ভাণ্ডার (saving fund)-এর আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এখন, স্বাভাবিক কারণেই স্বল্পোন্নত দেশের 'সঞ্চয় ভাণ্ডার' ছোট হয়। এ সব দেশের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের পরিমাণ যদি তাদের 'সঞ্চয় ভাণ্ডার'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তবে এ সব দেশের দ্রুত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হবে না।

৪. পূর্ব নির্ধারিত 'সঞ্চয় ভাণ্ডার' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব অর্থনীতিবিদদের অনেকেই স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে তথাকথিত 'সঞ্চয় ভাণ্ডার' একটি অবাস্তব কল্পনা মাত্র। তাই তাঁরা মনে করেন, কোনো দেশের বিনিয়োগের ক্ষমতা তার 'সঞ্চয় ভাণ্ডার' দ্বারা নির্ধারিত হয় না। অধ্যাপক মরিস ডব-এর মতে স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পায়নের মূল সমস্যাটা আর্থিক (financial) নয়; সমস্যাটা আসলে অর্থনৈতিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার। এ উক্তির তাৎপর্য হল, দেশে বিনিয়োগের সীমা বস্তুগত সম্বলের দ্বারা নির্ধারিত হয়, 'সঞ্চয় ভাণ্ডার'-এর দ্বারা নয়। দেশে যদি প্রচুর বস্তুগত সম্বল থাকে, তবে আর্থিক সম্বলের স্বল্পতা উন্নয়নের পথে তেমন কোনো বড় বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, বাস্তব সম্বলকে গতিশীল (mobilisation) করার পক্ষে দেশের বিদ্যমান আর্থিক সম্বল যদি অপর্যাপ্তও হয়, সেক্ষেত্রে নতুন অর্থ সৃষ্টি করে সমস্যার সমাধান করা যায়। এমন পরিস্থিতিতে নতুন অর্থ সৃষ্টি করা হলে সমাজের কোনো ক্ষতি হবে না; কারণ, এ অর্থের দ্বারা সমাজের অব্যবহৃত সম্বলগুলিকে গতিশীল করে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যায়। উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়বে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনাও ততই দূরে সরে যাবে।

ভারতের মতো দেশে আর্থিক সম্বল স্বাভাবিক কারণেই কম। অথচ, এ সব দেশে বিপুল বস্তুগত সম্বল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এখন ভারতের উন্নয়নের বিষয়টি যদি কেবলমাত্র 'আর্থিক সম্বল'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় তবে ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া কখনোই ত্বরান্বিত হবে না।

এ ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত স্মরণীয়। তথাকথিত পূর্ব-নির্ধারিত 'সঞ্চয় ভাণ্ডার' না থাকলেও বিপুল পরিমাণ বস্তুগত সম্বল বিদ্যমান থাকলে কিভাবে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায় সোবিয়েত রাশিয়া তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যে সোবিয়েত রাশিয়ার উদ্ভব হয় তা ছিল ভারতের মতই দরিদ্র। সুতরাং, সে সময়ে তার 'সঞ্চয় ভাণ্ডার' যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা যে অতিশয় নগণ্য ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়টিকে নিজ দেশের উন্নয়নের পথে কোনো বাধা বলেই সোবিয়েত রাশিয়া গণ্য করেনি।

বরং বস্তুগত সম্বলের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়িত করে সোবিয়েত রাশিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে পরিকল্পনার 'বস্তুগত সম্বল'-ভিত্তিক রচনা কৌশল অনেক বেশি কার্যকর।

৫. 'বস্তুগত' পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এ যুক্তি দেখান হয় যে এতে নতুন অর্থ সৃষ্টি করতে হয় বলে সমগ্র অর্থনীতি মূল্যস্ফীতির কবলে পড়ে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এ আশঙ্কা অমূলক। নতুন সৃষ্ট অর্থ যদি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তবে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে। তবু যেহেতু খাদ্য ও বস্ত্রের ন্যায় দু'টি প্রধান ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য স্বল্পোন্নত দেশের

জনসাধারণের আয়ের বিরাট অংশ ব্যয়িত হয়, সে জন্য এ দু'টি দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনাকে অনেকটাই দূর করা যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। 'বস্তুগত পরিকল্পনা' ও 'আর্থিক পরিকল্পনা' পরস্পর বিরোধী নয়। একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। বরং একটি অপরটির পরিপূরক। কোনো একটি পরিকল্পনা আলাদাভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। দু'টি পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ও পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করে সমগ্র পরিকল্পনাকে কার্যকর করা যায়।

ভারতের প্রথম পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছিল 'আর্থিক পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। কতটুকু আর্থিক সম্বল সংগ্রহ করা যাবে তার দ্বারাই প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও আয়তন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বস্তুগত সম্বলের' দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়. বস্তুগত উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এবং ঐ লক্ষ্য পূরণের জন্য অর্থসৃষ্টির ব্যবস্থাও রাখা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায়ও বস্তুগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এবং সে সব লক্ষ্য পূরণের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এ সব লক্ষ্য পূরণে আর্থিক সম্বলের স্বল্পতার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে বস্তুগত লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থসৃষ্টি করা হবে।

৯.৬. বিনিয়োগের ধাঁচ ও সম্বলের বন্টন
Pattern of Investment and Allocation of Resources

১ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের একটি কঠিন সমস্যা হল, বিনিয়োগের ধাঁচ নির্ধারণ ও তদনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পের জন্য সম্বলের বণ্টন। কারণ, কেবল বিনিয়োগের হার নির্ধারণ কিংবা বিনিয়োগের মোট পরিমাণ স্থির করাই যথেষ্ট নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল বিনিয়োগের ধাঁচটি কি হবে তা স্থির করা, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলটি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া। অধ্যাপক অস্কার ল্যাঞ্জের মতে, স্বল্পোন্নত দেশের সমস্যাটি কেবল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করাই নয়, পরন্তু দ্রুতগতিতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন যাতে সম্ভব হয় তার জন্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগধারাকে পরিচালিত করাও এর অন্য একটি সমস্যা। এজন্য পরিকল্পনা কমিশন কি কি মাপকাঠি ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করাও একটি সমস্যা।

২ **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব:** **অধ্যাপক কান** এর মতে, সীমাবদ্ধ উপকরণ থেকে সর্বাধিক ফল পেতে হলে যে মাপকাঠি দ্বারা বিনিয়োগের ধাঁচ নির্ধারণ করা ও সম্বল বণ্টন করা উচিত তা হল **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা** (marginal productivity) কিংবা, সমগ্র সমাজের দিক থেকে, **সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা** (social marginal productivity)। কিন্তু এর অসুবিধা হল, কোনো সরকারী বিনিয়োগের পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত সামাজিক প্রান্তিক উপকার পরিমাপের কোনো ত্রুটিহীন উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। তা ছাড়া, স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে গিয়ে এমন কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে যার সাথে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতিটির বিরোধ ঘটতে পারে।

৩. **বাজার বা মূল্য ব্যবস্থা:** সরকারী বিনিয়োগের ধাঁচ ও সম্বল বণ্টন নীতি স্থির করার জন্য পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে বাজারের তথা মূল্যব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। **অধ্যাপক গুন্নার মির্ডাল্** বলেছেন, নতুন শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের মুনাফার বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। ওটা হবে পরিকল্পনা বর্জনেরই নামান্তর।

৪. সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কিংবা মূল্যব্যবস্থা বা বাজারব্যবস্থা কোনোটির দ্বারাই সরকারী নিয়োগের ধাঁচ ও সম্বলের বণ্টন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। বরং তা হতে পারে কতকগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা নির্ধারিত কতকগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

৫. **ভারসাম্যবিশিষ্ট অথবা ভারসাম্যহীন উন্নয়ন (Balanced vs. Unbalanced Growth):** বিনিয়োগের ধাঁচ স্থির করতে গিয়ে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই যে মূল প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হয়, তা হল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি ভারসাম্যবিশিষ্ট হবে, না ভারসাম্যহীন হবে। **অধ্যাপক স্যুম্পিটারের** অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বের মূল কথা ছিল, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই দেশের সব শিল্পের সার্বিক ও যুগপৎ উন্নয়ন। বিশেষ কয়েকটি শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সব শিল্পের ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন হলেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া বেগবান হবে। কারণ, তা হলে উন্নয়নশীল শিল্পগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের পারস্পরিক

চাহিদা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে একে অপরের উন্নয়নে সাহায্য করবে। অতএব ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সার কথা হল, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে পরস্পরের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন। নার্কসে, লিউইস, অ্যালিন ইয়ং রোজেনস্টাইন-রোডান এবং মেয়ার ও ব্যাল্ডুইন প্রমুখ অনেকেই ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের সমর্থক। কিন্তু ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন কৌশল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক কিংবা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উপযোগী নাও হতে পারে।

৬. বরং ভারসাম্যহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়, উন্নয়ন হার প্রথমে অল্প হলেও পরে তা দ্রুত বাড়তে পারে। ভারসাম্যহীন উন্নয়নের মূল কথা হল, পুঁজিদ্রব্য শিল্প ও ভোগ্যপণ্য শিল্পের পারস্পরিক ভারসাম্যহীন উন্নয়ন ভোগ্যপণ্য শিল্পের তুলনায় পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বিনিয়োগ-যোগ্য তহবিলের বণ্টনে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সোভিয়েত পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়েছিল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা নিখুঁত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে প্রথমে পুঁজি-শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে তার মারফত পরবর্তী-কালে ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। **অধ্যাপক বেটেলহেইমের** ভাষায়, "শেষ বিশ্লেষণে, ভোগের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের উপর।" তাছাড়া ভারসাম্যহীন উন্নয়নে যে সব ভারী শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার আরোপ করা হয়, সেগুলিও পারস্পরিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে ন্যূনতম সময়ে দেশের অর্থনীতির সর্বাধিক উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হয়। তবে এই কৌশলটির একটি বিপদ আছে। তা হল, বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অধিকাংশই পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বিনিয়োগ করার দরুন দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে। তবে এই বিপদ কমানো যেতে পারে, এই 'কৌশলটি' খানিকটা পরিমাণে সংশোধন করে; অর্থাৎ একই সময়ে শ্রম-প্রগাঢ় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলিকে উৎসাহ দিয়ে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে। চীনদেশে এই ধরনের পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, এর সাথে সাময়িকভাবে, অন্তর্বর্তী-কালে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মারফত অত্যধিক ভোগ, বিশেষত জাঁকজমকপূর্ণ ভোগ (conspicuous consumption) নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হতে পারে। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা যদি সংযত করা যায়, তা হলে স্বল্পোন্নত দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে ভারসাম্যহীন উন্নয়ন কৌশলটি আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে এবং তদনুযায়ী বিনিয়োগের ধাঁচটি নির্ধারিত হতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিয়োগযোগ্য সম্বলও যথাযথভাবে বণ্টন করা যেতে পারে।

৭. **ভারী শিল্প বনাম হাল্কা শিল্প (Heavy Industry vs. Light Industry):** এই প্রসঙ্গে ভারী শিল্প বনাম হাল্কা শিল্প সংক্রান্ত বিতর্কের বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকের মতে, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার দিকে হাল্কা শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং সেই সময়ে বিদেশ থেকে ভারী শিল্পজাত দ্রব্যগুলি আমদানি করে দেশের প্রয়োজন মেটানো উচিত। তার কারণ—(১) হাল্কা শিল্পে পুঁজি কম লাগে এবং এ শিল্পে প্রয়োজনীয় শ্রমিকদের সহজে শিক্ষিত করে তোলা যায়; প্রথমে হাল্কা শিল্পে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে তা পরে ভারী শিল্প স্থাপিত হলে কাজে লাগবে; (২) হাল্কা শিল্পে বিনিয়োগের অল্পদিনের মধ্যেই উৎপাদন শুরু করা যায় এবং অল্প বিনিয়োগে বেশি উৎপাদন করা যায়; (৩) উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গ্রহণ না করে ভারী শিল্পের উন্নয়নের অগ্রাধিকার দিলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে; (৪) ভারী শিল্পের উন্নয়ন দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে দেশের উপর একটা গুরুতর সামাজিক খরচের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে।

৮. কিন্তু ভারী শিল্পের উন্নয়নের সমর্থকদের মতে,—(১) ভারী শিল্পের উন্নয়ন অল্পকালের মধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশকে উন্নত ও উন্নয়নে স্বনির্ভর করে তুলতে পারে। (২) প্রথম দিকে উন্নয়ন হার কম হলেও পরের দিকে এবং শেষ পর্যন্ত তা বেশি হয়। (৩) ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপর উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত করা হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অনেক মধ্যবর্তী স্তর এড়ানো যায় ও তাতে সময় সংক্ষেপ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ২৫ বৎসরে উন্নয়নের যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে, তা পার হতে পশ্চিমী দেশগুলির একশত বৎসরেরও বেশী লেগেছিল।

৯. উভয়পক্ষের যুক্তিগুলি বিচার করে বলা যেতে পারে, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায় পরিকল্পনা কৌশলরূপে ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপের যুক্তিটি বেশি শক্তিশালী। কারণ এটি দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম। তবে এর দুটি অসুবিধা আছে। একটি হল, স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজির স্বল্পতা, অপরটি হল মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা। কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা ভোগ কমিয়ে ও সঞ্চয় বাড়িয়ে পুঁজির যোগান বাড়ানো যেতে পারে। শ্রম-প্রগাঢ় ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা ভোগ্যপণ্যের

যোগান বাড়িয়ে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তে রাখা যেতে পারে।

১০. বিনিয়োগ-অগ্রাধিকারের রূপরেখা (Determination of Investment—Priority): ভারসাম্যহীন উন্নয়ন কৌশলটির ভিত্তিতে এবার স্বল্পোন্নত অর্থনীতির উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কিরূপ বিনিয়োগ-অগ্রাধিকার ও বিনিয়োগের ধাঁচ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা দেওয়া যেতে পারে। ধরে নেওয়া যেতে পারে তাদের সামনে সাধারণ ও মূল লক্ষ্য হল: কৃষির পুনর্গঠন, দ্রুত শিল্পায়ন, সর্বাধিক উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনীতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা।

(ক) **প্রথম পর্যায়:** স্বল্পোন্নত দেশে সাধারণত খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যায়। অথচ কৃষি একদিকে শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যদিকে জনসাধারণের খাদ্যের প্রধান উৎস। কৃষিই হল শিল্পের সম্প্রসারণের ভিত্তি। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রথম পর্যায়ে কৃষির উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আরোপ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কৃষিতে বিনিয়োগ দু'রকমভাবে প্রয়োজন হয়: প্রথমত, সেচের জন্য নদী-প্রকল্প এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প সৃষ্টিতে; দ্বিতীয়ত, পতিত জমি পুনরুদ্ধারে; সেই সঙ্গে কৃষিতে জড়িত কিছু ভারী শিল্প, যেমন—রাসায়নিক সার, সেচ ও বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি, ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। পুঁজির স্বল্পতা সত্ত্বেও, প্রথম পর্যায়েই এগুলি উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ অপরিহার্য। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়টিকে কেবল কৃষির পুনর্গঠনই নয়, ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের ভিত্তিও স্থাপন করা দরকার। এজন্য এই পর্যায়েই বিদ্যুৎ পরিবহণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। এদের পাশাপাশি, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও ভোগ্যপণ্যের অভাব দূর করার জন্য শ্রম-প্রগাঢ় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। সেই সাথে প্রয়োজন হল জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসগৃহ ইত্যাদি সামাজিক উপরি-ব্যবস্থাগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা।

(খ) **দ্বিতীয় পর্যায়:** প্রথম পর্যায়েই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবহণের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে ইস্পাত, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ভারী বৈদ্যুতিক, ভারী রাসায়নিক প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলিতে। কৃষির উপর যে অগ্রাধিকার আগে দেওয়া হয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সামাজিক উপরি-ব্যবস্থাগুলির জন্য বিনিয়োগও বাড়াতে হবে মানবশক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নও অব্যাহত রাখতে হবে।

(গ) **তৃতীয় পর্যায়:** অর্থনীতিক উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ে কৃষি ও ভারী এবং মূল শিল্পগুলির অগ্রাধিকার অব্যাহত রাখতে হবে। তবে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়ে ভারী শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। এ পর্যায়ে এমন কিছু সংখ্যক ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেগুলি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিযোগী নয়।

১১. এই তিনটি পর্যায়কে বলা যেতে পারে, পরিকল্পিত উন্নয়নের **ভিত্তিস্থাপন, সংহতকরণ ও সম্প্রসারণের** পর্যায়; এই তিনটি পর্যায়ের কার্যসূচির রূপায়ণের দ্বারা অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বনির্ভর শক্তির যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি ভবিষ্যৎ উন্নয়নের গতিবেগ আপনা থেকে ত্বরান্বিতও হবে। **অধ্যাপক বেটেলহেইমের** মতে পরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বিনিয়োগের র‍্যাশনালাইজেশন ও আধুনিকীকরণের উপরও ধীরে ধীরে জোর দিতে হবে। বেকার সমস্যা দূর হবার পরে শিল্পের র‍্যাশনালাইজেশন ও আধুনিকীকরণই হবে শ্রমের গড়পড়তা উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। **অধ্যাপক বেটেলহেইম** আরও বলেছেন, পরিকল্পনার পরের দিকে নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১২. বিকল্প ধাঁচ (An alternative pattern): উপরে বিনিয়োগের যে ধাঁচের কথা আলোচনা করা হয়েছে তার বিকল্প হিসাবে **অধ্যাপক ভাকিল ও অধ্যাপক ব্রহ্মানন্দ** প্রমুখ অনেকের মতে, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি ও ভোগ্যপণ্য শিল্পের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আরোপ করা উচিত। কিন্তু এই ধরনের অগ্রাধিকারে ভারী ও মূল শিল্পগুলি অবহেলিত থেকে যাবে এবং উন্নয়নের গতিবেগও শিথিল হয়ে পড়বে। স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

৯.৭. সম্পদ সমাবেশ
Mobilisation of Resources

১. স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করার মতো পুঁজির দু'টি মাত্র উৎস রয়েছে। তার একটি হ'ল অভ্যন্তরীণ, অপরটি বৈদেশিক।

২. অভ্যন্তরীণ উৎস সম্পর্কে একটি সমস্যা হল, বিনিয়োগ এবং ভোগব্যয়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যাবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগ মানুষের আয় সীমিত এবং জীবনযাত্রার মান নিচু। ভোগব্যয়ও তাই কম। উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করার জন্য চাই পুঁজি। সঞ্চয় থেকে পুঁজির সৃষ্টি। বেশি পুঁজি পেতে হলে বেশি সঞ্চয় দরকার। আয়ের স্তর যেখানে মোটামুটিভাবে স্থির সেখানে সঞ্চয় বাড়াতে হলে ভোগব্যয় কমাতে হয়। স্বল্পোন্নত দেশে ভোগব্যয় এত কম যে তাকে আরো কমানো প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। অথচ একমাত্র ভোগব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে তবেই এ সব দেশে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি সৃষ্টি করতে হয়। অধ্যাপক গুন্নার মিরডালের মতে, বাধ্যতামূলকভাবে ভোগব্যয় কমিয়ে জাতীয় আয়ের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ বিনিয়োগ করা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর কোনো পথ নেই। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ যে স্বল্পোন্নত দেশ গ্রহণ করেছে তাকে জাতীয় ভোগব্যয় আরও কমিয়ে তবেই সরকারী বিনিয়োগের জন্য সম্বল সংগ্রহ করতে হয়। তবে, দেখতে হবে তা করতে গিয়ে দেশবাসীর সকল শ্রেণীর ও অংশের ভোগব্যয় যেন সমানভাবে কমানো হয়। তা যদি করা যায় তাহলে জনসাধারণ ভোগব্যয় হ্রাসে আপত্তি করবে না। এবং এটাও দেখতে হবে, ঐ বিনিয়োগ সার্থক করার জন্য শিল্পগুলির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার যেন পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। যদি তা না হয়, তাহলে উৎপাদন ক্ষমতার ওই আংশিক ব্যবহার হবে অপ্রয়োজনীয় ভোগব্যয়ের মতোই অপচয়ের নামান্তর মাত্র। আরেকটি কথা, জাতীয় ভোগব্যয় ও উৎপাদনে অপচয় হ্রাসের সাথে সাথে প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিরক্ষা ব্যয়ও কমিয়ে ন্যূনতম করতে হবে। তা হলেই সম্বল সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎসটি সর্বাধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহে সক্ষম হবে।

৩. উন্নয়নের সম্বল, অর্থাৎ বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎস হল তিনটি : (১) কর; (২) সঞ্চয় এবং (৩) ঘাটতি ব্যয়।

(১) কর (Taxation) : সরকারের উদ্বৃত্ত চলতি আয় (revenue surplus) দেশের পুঁজি গঠনের অন্যতম উৎস। সরকারী বাজেটে চলতি খাতে ব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি করা যায় করের দ্বারা। স্বল্পোন্নত দেশে বাজেটে যে উদ্বৃত্ত (actual surplus) সৃষ্টি হয় তা কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের (potential surplus) মাত্রা অবশ্যই কম নয়। এবং তাও সংগ্রহের উপায় হল কর। সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশে কর ধার্য করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দু'টি। প্রথমত, করের দ্বারা যে বাস্তব অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (economic surplus) সৃষ্টি হচ্ছে শুধু সেটুকু সংগ্রহ নয়, সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের সমস্তটাই সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের সমস্ত গোপন উৎসের সন্ধান করতে হবে। অধ্যাপক পল ব্যারান ভারতের সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের দু'টি গোপন উৎসের উল্লেখ করেছিলেন। তার একটি হল, উঁচু আয়ের মানুষের অত্যধিক ভোগব্যয়। অন্যটি হল, জমিদার, মহাজন, বণিক, কমিশন এজেন্ট, প্রয়োজনাতিরিক্ত আইনজীবী, সরকারী আমলা, বিজ্ঞাপনী এজেন্ট ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল কর্মী যারা জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশে ভাগ বসায়। করের মারফত প্রথমোক্তদের অত্যধিক ভোগব্যয় বন্ধ করে ওই উদ্বৃত্ত আয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন; দ্বিতীয়োক্তদের স্থানান্তরিত করে সামাজিকভাবে উপযোগী ও উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশে জাতীয় সম্পদের বণ্টনে সাধারণত যে সামাজিক বৈষম্য দেখা যায়, করের মারফত তা কমানো দরকার। অতীতে প্রচলিত ধারণা ছিল, সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য থাকলে দেশে সঞ্চয়ের হার বেশি হয়। কিন্তু বর্তমানে (ডুসেনবেরী থিসিস অনুযায়ী) অর্থনীতিবিদদের ধারণা হল, সম্পদ বণ্টনে ব্যাপক বৈষম্য থাকলে, সমাজের ভোগপ্রবণতা বেড়ে যায় অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা কমে যায়। সুতরাং, স্বল্পোন্নত দেশে সর্বাধিক পরিমাণে সঞ্চয় সৃষ্টি সম্ভব করার জন্য, সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য কমানো প্রয়োজন এবং করের মারফত তা করা যায়।

কর দু'রকমের। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্বল সংগ্রহ ও সমাবেশের কাজে প্রধানত প্রত্যক্ষ করের সাহায্যই নেওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই উপরে আলোচিত উদ্দেশ্য দু'টি সিদ্ধ হতে পারে। সুতরাং এজন্য প্রত্যক্ষ করকে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। সমগ্র সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত প্রত্যক্ষ করের মারফত সংগৃহীত হবার পরই পরোক্ষ কর বাড়ানো উচিত। কেননা, পরোক্ষ করের বোঝাটা গরিব জনসাধারণকেই বহন করতে হয়।

তবে, উন্নয়নের জন্য সম্বল সংগ্রহের উৎসরূপে করের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে : (১) স্বল্পোন্নত দেশে ব্যাপক কর-ফাঁকির প্রবণতা ও কর-প্রদানে বিরোধিতা দেখা যায়। (২) কর আদায়ের বিধিব্যবস্থা সুদক্ষ নয়। (৩) এসব দেশে আর্থিক লেনদেন বহির্ভূত একটি ক্ষেত্র সব সময়েই থাকে যা কর আদায়ের প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা

স্পর্শ করা যায় না। এই ক্ষেত্রটিও সম্ভাব্য অর্থনীতিক উদ্বৃত্তের একটি উৎস। সমস্ত অর্থনীতিক কাজকর্মে টাকার ব্যবহারের প্রসারের দ্বারা এবং দ্রব্যসামগ্রীতে কর আদায় ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা এই সমস্যাটির সমাধান করতে হয়।

প্রথম পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে সপ্তম পরিকল্পনা পর্যন্ত পরিকল্পনার আয়তন যতই বেড়েছে, পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে করের উপর নির্ভরশীলতাও ততই বেড়েছে; পুরাতন করের হার বাড়িয়ে, নতুন কর বসিয়ে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সাহায্য নিয়ে পরিকল্পনার প্রয়োজন মেটানো হয়েছে। তবে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ কর বেড়েছে বেশি। মোট জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে করের পরিমাণ ৬.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০.২ শতাংশ হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বেড়েছে প্রায় বারো গুণ, পরোক্ষ কর বেড়েছে আটাশ গুণেরও বেশি। তবে করের বোঝার সাথে সাথে কর-ফাঁকির পরিমাণও বেড়েছে। সাম্প্রতিক হিসাবে, ভারতে মোট আদায়যোগ্য করের এক-তৃতীয়াংশই কর-ফাঁকি হিসাবে অনাদায়ী থাকে। করের পরিমাণ প্রায় সব ক্ষেত্রে বাড়লেও কৃষিক্ষেত্রে করের প্রত্যক্ষ বোঝা বিশেষ বাড়েনি বললেই হয়। অথচ কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং জমির মালিক বড় ও ধনী কৃষকদের আয় বহুগুণ বেড়েছে। ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

(২) **সঞ্চয় (Savings):** স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। চীনের অর্থনীতিক উন্নয়নেও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সে ভূমিকা নিয়েছে। এ দেশগুলির অর্থনীতিক উন্নয়নে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করা হয়নি।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উৎস হল তিনটি: (ক) ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (private savings); (খ) কোম্পানি-গুলির অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (corporate savings) এবং (গ) সরকারী সঞ্চয়। প্রথম উৎসটি সম্পূর্ণ বেসরকারী এবং স্বেচ্ছামূলক। দ্বিতীয় উৎসটিতে রয়েছে সরকারী ও বেসরকারী কোম্পানিগুলির স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়। সুতরাং এ দুটি উৎস হল সঞ্চয়ের স্বেচ্ছামূলক (voluntary) উৎস। স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে স্বেচ্ছা-মূলক সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে, সরকারকে বাধ্য হয়েই সঞ্চয়ের অন্যতম উৎসে পরিণত হতে হয় এবং সরকার এ কাজটি করে থাকে করের সাহায্যে বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির দ্বারা। সুতরাং সঞ্চয়ের এ উৎসটি হল বাধ্যতামূলক (compulsory) উৎস।

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় জনসাধারণের ভোগব্যয় কমিয়ে। কোম্পানিগুলি ব্যয় কমিয়ে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে সেই উদ্বৃত্তের সবটা লভ্যাংশের আকারে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিলি না করে তার একাংশ আবার কোম্পানির কারবারে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে। এটাই হল কোম্পানিগুলির অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। ব্যক্তিগত ও কোম্পানিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা পরিকল্পনার সম্বল বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশের মূল অসুবিধা হল: অর্থনীতিক উন্নয়নের গোড়ার দিকে দারিদ্র্যের পাপচক্রের দরুন দেশের আয়ের স্তর এত নিচু থাকে যে সঞ্চয়ের হার কম হয়। আয়ের স্বল্পতা ছাড়াও, স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয় হার অল্প হবার আরও দুটি কারণ থাকে। একটি হল, পুঁজির ও টাকার বাজারের অভাব। অন্যটি হল, সঞ্চিত টাকা চড়া সুদে খাটানোর জন্য গ্রামাঞ্চলে নানা সুযোগ (যেমন—মহাজনী, দোকানদারী, ইত্যাদি)। স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয় হার বৃদ্ধির পথে অন্যতম বাধা হল 'প্রদর্শন প্রভাব' (demonstration effect)। অধ্যাপক ডুসেনবেরী এবং নার্কসে দেখিয়েছেন, স্বল্পোন্নত দেশের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা গ্রহণ করে থাকে। ফলে ভোগব্যয় অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং সঞ্চয় হার কমে যায়। সুতরাং এসব দেশে ব্যক্তিগত সঞ্চয় হার বাড়াতে হলে যে সব বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তা হল, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিস্তার, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্প (compulsory savings schemes) প্রবর্তন, অপ্রয়োজনীয় ভোগব্যয় বন্ধ করার ব্যবস্থা এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দূর করে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা।

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে স্বল্প আয়ের স্তর সঞ্চয় বৃদ্ধির পথে বাধা হলেও এসব দেশে সঞ্চয়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসও রয়েছে। ওই দুটি উৎস কাজে লাগাতে পারলে, সঞ্চয়ের অভাবজনিত সমস্যা অনেকটা দূর করা যায়। এদের মধ্যে একটি হল, জনসাধারণের ব্যাপক দারিদ্র্য সত্ত্বেও, এসব দেশে, বিশেষত ভারতে, সোনার বিপুল প্রকাশ্য ও গোপন মজুত রয়েছে। একটি হিসাবে দেখা যায়, ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সোনার ব্যক্তিগত মজুতের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশ। এছাড়া ভারতের বড় বড় মন্দিরগুলিতেও মজুত সোনার পরিমাণ কম নয়। এই বিপুল পরিমাণ মজুত সোনা দিয়ে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম

যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা যায়। সমস্যা হল, কিভাবে এই ব্যক্তিগত সোনার মজুতে হাত দেওয়া যায়। সরাসরি তা বাজেয়াপ্ত করার অসুবিধা রয়েছে। দাম দিয়ে তা কিনে নিলে সোনার মালিকদের হাতে যে নগদ টাকা আসবে তাতে দেশে প্রবল দামস্ফীতি সৃষ্টি হবে। তাই, সোনার দাম নগদ টাকায় না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণপত্রে দিলে দামস্ফীতির বিপদ অনেকটা এড়ানো যেতে পারে।

পরিকল্পনাকালে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের হার বাজার দরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের ১·৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪·৪ শতাংশ, বেসরকারী সংগঠিত ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের হার ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ১·৬ শতাংশ, এবং পারিবারিক সঞ্চয়ের হার ৭·৭ থেকে বেড়ে ১৫ শতাংশ হয়েছে। মোট সঞ্চয় হার ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে বাজার দরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের ১০·৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৪·৫ শতাংশে পরিণত হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় অর্থনৈতিক বিকাশের সম্বল সংগ্রহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হয়েছে।

এই ক্ষেত্রটি থেকে সরকার প্রথম পরিকল্পনায় আর্থিক সম্বলের ১০ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৬·৫ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯·৬ শতাংশ, তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ১০·৬ শতাংশ, চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯·৪ শতাংশ, পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৬·৫ শতাংশ ঋণের দ্বারা সংগ্রহ করেছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ২০ শতাংশ। প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, জীবন বীমা করপোরেশন ও কর্মচারী রাজ্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড—এই তিনটির মারফতই এই ঋণ সংগৃহীত হচ্ছে।

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও পরিকল্পনার সম্বল সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসে পরিণত হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনায় এই উৎসটি থেকে সংগ্রহের লক্ষ্য পূর্ণ হয়। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম পরিকল্পনায় লক্ষ্য অপূর্ণ থাকে। চতুর্থ পরিকল্পনায় লক্ষ্যাতিরিক্ত সংগ্রহ ঘটে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই উৎসটি থেকে ৬,৪৬৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

এদেশে কিন্তু এ বিষয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা আশানুরূপ হয় নি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেল বাদে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে সম্বল সংগ্রহ করা হয়নি। সামগ্রিকভাবে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে সম্বল সংগ্রহের উৎসরূপে প্রথম ধরা হয় তৃতীয় পরিকল্পনায়। কিন্তু তখন তা থেকে আশানুরূপ সম্বল সংগ্রহ করা যায়নি। চতুর্থ পরিকল্পনাতেও একই ঘটনা ঘটে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১,৫৯৬ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল মাত্র ৬২৪ কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই উৎসটি থেকে ৯,৩৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি থেকে ১৪,২৪০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য গৃহীত হয়েছে।

(৩) **ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing)**: 'ঘাটতি ব্যয়' কথাটার মানে হল, অতীতের সঞ্চিত তহবিল থেকে খরচ করে কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ করে সরকারী বাজেটের ঘাটতি (সেটা চলতি খাতেই হোক কিংবা মূলধনী খাতেই হোক) মেটানোর ব্যবস্থা। উভয় ক্ষেত্রেই, এর ফলে নতুন টাকার সৃষ্টি হয় এবং সেটা দেশবাসীর হাতে গিয়ে পড়ে ও তাদের ক্রয়শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর আদায় ও ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে ঋণ নিয়ে যদি প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্বল যোগাড় করা না যায়, তাহলে পুঁজিগঠনের জন্য বাকিটুকু যোগাড় করতে ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। সঠিকভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে যদি এই উৎসটিকে কাজে লাগানো যায়, তাহলে স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘাটতি ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তার কারণ—(ক) স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে যে বিপুল অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে, নতুন 'সৃষ্ট' টাকা ছাড়া সেই সম্পদ ব্যবহার করা যায় না। যতকাল ওই অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত সম্পদ থাকবে ততকাল ওই নতুন সৃষ্ট টাকার সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হবে। ফলে ওই নতুন সৃষ্ট টাকার দরুন মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে না, মূল্যস্তর বাড়বে না।

(খ) স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে মোট উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বাড়তে আরম্ভ করবে। এরই সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য টাকার চাহিদাও বাড়বে। এ চাহিদা পূরণ করতে দেশে টাকার যোগানও বাড়ানো উচিত। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে এর সুরাহা করা যায়।

(গ) স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থনীতির এমন একটি ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে সরাসরি দ্রব্য ও সেবার বিনিময় প্রচলিত রয়েছে এবং টাকার ব্যবহার যেখানে হয় না বললেই চলে (non-monetised sector)। পরিকল্পিত উন্নয়ন যতই ঘটতে থাকে, ততই ওই মুদ্রা-ব্যবহার-বহির্ভূত ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হতে থাকে। তখন দেশের মধ্যে টাকার চাহিদাও বাড়তে থাকে। নতুন সৃষ্ট টাকার ওই বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন হতে থাকে।

(ঘ) স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে হাতে নগদ টাকা ধরে রাখার ইচ্ছা (liquidity preference) বা নগদ পছন্দও বাড়তে থাকে। নতুন সৃষ্ট টাকা সে প্রয়োজন মেটায়।

কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের বিপদের দিকও আছে (dangers of deficit financing) : (ক) স্বল্পোন্নত দেশে অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত মানবশক্তির পাশাপাশি অতি প্রাথমিক পুঁজিদ্রব্যেরও অভাব রয়েছে। সে কারণে, অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত মানবশক্তি যতটা পরিমাণে উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত হবে, সে অনুপাতে মোট উৎপাদন বাড়বে না। তাই ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা তার অর্থসংস্থান করার দরুন উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় অর্থের যোগান ঘটবে বেশি। তাতে মূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা খানিকটা দেখা দেবেই। অবশ্য শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন-কৌশলের সাহায্যে উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো যেতে পারে।

(খ) স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে নানান দিকে অপ্রতুলতা রয়েছে বলে, (যেমন—উপযুক্ত অন্তকাঠামোর অভাব, উপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থার অভাব) মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। তা যদি হয়, তবে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে পুঁজিগঠন করতে গিয়ে উল্টো বিপত্তি হতে পারে। নতুন পুঁজি গঠন দূরে থাকুক, তখন বরং পুঁজি ভেঙে ভোগব্যয় (capital consumption) ঘটতে পারে।

(গ) মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্সে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ নির্ধারিত খাতে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন মুনাফার হারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ফাটকাজাতীয় (speculative) খাতে বিনিয়োগের উপকরণগুলি প্রবাহিত হতে পারে। তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক বোঝাটা সমাজের স্বল্প আয়ের শ্রেণীগুলির উপর আরও ভারী হয়ে উঠতে পারে।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত বিপত্তিগুলি ঘটতে পারে যদি উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে ঘাটতি ব্যয়ের মারফত মুদ্রাস্ফীতির বাড়াবাড়ি ঘটে যায়।

ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের পদ্ধতিটি এমনিতে বিপজ্জনক কিছু নয়, কিংবা পদ্ধতি হিসাবে ঘাটতি ব্যয় মারাত্মকও হয় না, যদি সেই সঙ্গে ঘাটতি ব্যয়ের আনুষঙ্গিক কুফলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাই সরকারের উচিত হল ঘাটতি ব্যয়ের পদ্ধতিটি সাবধানতার সঙ্গে প্রয়োগ করা :

(ক) অর্থনীতি তার বর্তমান অবস্থায় ঘাটতি ব্যয়ের ধাক্কা কতটা সহ্য করতে পারবে সেটা বিচার করে সীমাবদ্ধ পরিমাণে ওই অস্ত্রটি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(খ) খাদ্য ও বস্ত্র, সাধারণ মানুষের এই নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য দু'টির দাম যাতে মোটামুটিভাবে স্থির থাকে, তা সুনিশ্চিত করা দরকার। এই পণ্য দু'টির উৎপাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে এদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংয়ের দ্বারা তা সম্ভব করা যেতে পারে।

(গ) ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা যেটুকু অর্থসংস্থান ঘটবে তা দ্রুত উৎপাদনশীল পরিকল্পের রূপায়ণে যথাসম্ভব ব্যবহার করতে হবে। এটা করার সমর্থনে যুক্তি হল, এ ধরনের পরিকল্পে বিনিয়োগ শুরু হবার পর উৎপাদন শুরু হতে সময়ের ব্যবধান (time lag) সাধারণত কম হয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম হবে, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনাও তত কম হবে।

তবে এসব সাবধানতা সত্ত্বেও, ঘাটতি ব্যয়ের দরুন স্বল্পোন্নত দেশে কিছু না কিছু মুদ্রাস্ফীতি ঘটবেই। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলেও তা হবে মৃদু ধরনের এবং সেটা ক্ষতিকর নাও হতে পারে। সেটা মজুরি বৃদ্ধির প্রণোদনা যোগাবে এবং তা স্বল্প নিযুক্তির ক্ষেত্র থেকে শ্রমশক্তিকে পূর্ণ নিযুক্তির ক্ষেত্রগুলির দিকে নিয়ে যাবে। মৃদু মুদ্রাস্ফীতি মুনাফার হার বাড়ায় বলে সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আরও বেশি পুঁজিগঠনে উৎসাহ দেয়। আর ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে গেলে ওই মৃদু মুদ্রাস্ফীতির চাপও বিলীন হয়ে যাবে। তবে, ঘাটতি ব্যয়ের নীতি অনুসরণ করা হলে, মূল্যস্তরের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধির লক্ষণ ধরা পড়লে সময় মতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ভারতে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা (Role of Deficit Financing in India) : কোনো স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষেই কিছু পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। এর কারণ হল, স্বল্পোন্নত দেশগুলি কর ও ঋণের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারে না। এজন্যই ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে ঘাটতি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার আয়তন খুব বড় ছিল না বলে ঘাটতি ব্যয়ের সমস্যাটা বিরাট আকারে দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি আয়তনে যতই বড় হতে থাকে, ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও ততই বেড়ে যেতে থাকে। এর কারণ হল, অর্থ সংগ্রহের চিরাচরিত সূত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করেও পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যায়নি।

ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট কত অর্থ ব্যয় হয়েছে, এর মধ্যে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কত, মোট ব্যয়ের কত শতাংশ ঘাটতি ব্যয়, এখানে দেওয়া তথ্য থেকে তার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে।

প্রথম পরিকল্পনা : মোট ব্যয় ১,৯৬০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ৩৩৩ কোটি টাকা (১৭ শতাংশ); দ্বিতীয় পরিকল্পনা : মোট ব্যয় ৪,৬৭২ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ৯৪৮ কোটি টাকা (২০ শতাংশ); তৃতীয় পরিকল্পনা : মোট ব্যয় ৮,৫৭৭ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় ১,১৩৩ কোটি টাকা (১৩ শতাংশ); তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা : মোট ব্যয় ৬,৭৫০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ৬৮২ কোটি টাকা (১০ শতাংশ); চতুর্থ পরিকল্পনা : মোট ব্যয় ১৬,১৬০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ২,০৬০ কোটি টাকা (১০ শতাংশ); পঞ্চম পরিকল্পনা : মোট ব্যয় ৫৩,৪১১ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ৩,৫৬০ কোটি টাকা (৬৭ শতাংশ); ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) : মোট ব্যয় ৯৭,৫০০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ১৬,১৭৪ (১৬ ৬ শতাংশ) কোটি টাকা। সপ্তম পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৯-৯০): সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ১,৮০,০০০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ১৪,০০০ কোটি টাকা (৮ শতাংশ)।

ভারতের ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Deficit Financing in India) : ১. পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য চিরাচরিত উৎসগুলির মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হবে বলে অনুমিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই অবশিষ্ট অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়।

২. ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগ বাড়িয়ে অব্যবহৃত উপকরণের পূর্ণতর ব্যবহার সম্ভব করার জন্য নতুন কর্ম সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩. ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে বিরাট অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্র (non-monetised sector) রয়েছে। অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র (monetised sector) সম্প্রসারিত হতে থাকবে এবং অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকবে। সম্প্রসারণশীল অর্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদা মেটাতে নতুন অর্থ সৃষ্টির প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে সাথে উৎপাদন-বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকবে। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে নতুন অর্থ সৃষ্টি হয়ে সে চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

৪. পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় টাকা ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা সংগ্রহ না করলে অবশিষ্ট উৎসগুলি থেকে তা করতে হত। অবশিষ্ট উৎসগুলি হল কর, জনসাধারণের নিকট থেকে ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্য। প্রতিটি পরিকল্পনায় এই তিনটি সূত্র থেকে যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে এ ভিত্তিতেই হিসাব করা হয়। এ অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচলিত করের উপরেও অতিরিক্ত কর স্থাপন করে অর্থসংগ্রহ করতে হচ্ছে। কিন্তু এর একটা সীমা আছে। প্রয়োজনীয় অর্থ শুধু কর থেকে সংগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ, নানাবিধ করে ভারাক্রান্ত ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ করপ্রদান ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছে। অর্থ-সংগ্রহের আর একটি সূত্র হল জনসাধারণের নিকট থেকে ঋণ। ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে এ সূত্রে খুব বেশি অর্থসংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন। ঘাটতি ব্যয়ের পথ পরিহার করলে এই সূত্রে আরও বেশি অর্থসংগ্রহ করতে হয়। ভারতের বর্তমান অবস্থায় এটা অসম্ভব। অর্থ-সংগ্রহের অবশিষ্ট সূত্র হল বৈদেশিক ঋণ। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কত হবে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ঘটনার দ্বারা খুব বেশি পরিমাণে নির্ধারিত হয়। তাই সূত্র হিসাবে এটা অনিশ্চিত।

সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে।

ভারতের বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি (Arguments against Deficit Financing in India) : উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয় করা দরকার—এ যুক্তি আধুনিক অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেন। সীমাবদ্ধ পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় উন্নয়নের কাজে সাহায্যই করে। কিন্তু ভারতে বিগত ৪০ বছর ধরে পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের জন্য ঘাটতি ব্যয় সমস্ত নিরাপত্তার সীমা ছাড়িয়ে গেছে কারণ, বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে সরকারের অর্থের অভাব মেটানো হয়েছে। নীতি-গতভাবে এ পদ্ধতির সমালোচনা করা হয়েছে।

কেইন্‌স্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের মতে দেশে অব্যবহৃত ও স্বল্প ব্যবহৃত উপকরণ থাকলে ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে ঐ উপকরণ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাতে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি ঘটে না। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ নীতির ভিত্তিতে ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয় তেমন খারাপ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকেই ভারতে মূল্যস্তরবৃদ্ধি প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে মাত্র ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হবে বলে

স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে ১,১৩৩ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় হয়। এ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে (অর্থাৎ ৬০-৬১ থেকে ৬৫-৬৬ সালে) ভোগ্যপণ্য মূল্যস্তর সূচক (১৯৭৯ = ১০০) ১৭৪ হয়। তারপর থেকে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে সারা দেশে মোট নগদ টাকা ও ঋণের পরিমাণ এত বেশি বেড়ে যায় যে মূল্যস্তরও প্রচণ্ডভাবে উপরের দিকে উঠতে থাকে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে মূল্যস্তরের সূচক ৩১০-এ এসে দাঁড়ায়। ১৯৭৯ ৮০-তে তা ৪৫৩-তে পৌঁছেছে। এক কথায় ভারত ঘাটতি ব্যয়ের দরুন নিদারুণ মূল্যবৃদ্ধির (hyper-inflation) কবলে পড়েছে। সমগ্র অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে।

এ ধরনের মূল্যবৃদ্ধির ফলে শুধু যে দেশের জনসাধারণই অসুবিধায় পড়েছে তাই নয়। এতে পরিকল্পনার সম্ভাব্য ব্যয়ের যে প্রাথমিক হিসাব করা হয় সে হিসাবও বানচাল হয়ে যায়। মোট যত টাকায় পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ হবে বলে হিসাব হয়, বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি টাকা লেগে যায়। তখন নতুন করে বেশি অর্থ সংগ্রহের সমস্যাও এসে পড়ে।

ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, এটা জানা কথা। **এতে দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থাটাও খারাপ হয়।** কেন না, দেশে মূল্যস্তর বাড়লে রপ্তানি সঙ্কুচিত হয়, আর আমদানি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে, লেনদেনের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হয়। প্রথম পরিকল্পনায় লেনদেন উদ্বৃত্তে ঘাটতি হয় ১৬২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১,৮১৫ কোটি টাকা আর তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ ০২৬ কোটি টাকায়। পরবর্তী তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ঘাটতির পরিমাণ হয় ৪,১০৪ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি হয় ৪.১৬৪ ৫ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় ২.৬৫৪ কোটি টাকা ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর পর্যন্ত ১৯৮২-৮৩) ঘাটতি হয়েছিল ৬,২৭০ কোটি টাকা। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের ব্যাপারে নানা ধরনের উপাদান কাজ করে। তবে এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ভারতের মুদ্রাস্ফীতি দেশের প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বিপুল পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় ভারতের অর্থনীতিতে বহু কুফলের সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ন্যূনতম করার কথা বলা হয়েছিল। তাতে সুফল হত এই যে, মূল্যস্তর বৃদ্ধি আয়ত্তের বাইরে চলে যেত না। মূল্যস্থিতির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (economic development with price stability) সম্ভব হত।

(৪) **বিদেশী ঋণ ও পুঁজি** (Foreign Debt and Capital): স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি থেকে যে সম্বলই সংগ্রহ করা হোক না কেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা কখনই পর্যাপ্ত হতে পারে না। তাই বৈদেশিক সূত্র থেকে অর্থের ঘাটতি পূরণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

নিম্নলিখিত উৎস থেকে স্বল্পোন্নত দেশের বৈদেশিক সম্বল সংগৃহীত হতে পারে:

(ক) দেশের সরকার কর্তৃক এক বা একাধিক বিদেশী সরকারের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ—এই উৎস এবং পন্থাটি বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, সচরাচর উন্নত ও ধনী দেশগুলিই স্বল্পোন্নত দেশকে এ ধরনের সরকারী অনুমোদন দিতে সক্ষম এবং সে ক্ষেত্রে, সাধারণত এমন সব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শর্তাবলী থাকে যা অনুদান-গ্রহণকারী স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক হয় না এমনকি দাতা দেশ ও গ্রহীতা-দেশের পারস্পরিক রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের পক্ষেও সুস্থ হয় না।

(খ) সরাসরি বেসরকারী বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ—উন্নত দেশের পুঁজিপতিরা স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প স্থাপনে ইকুয়িটি-শেয়ার পুঁজি হিসাবে সরাসরি বিনিয়োগ করতে চায়। স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে এ ধরনের উৎস ব্যবহারের অসুবিধা হল, সাধারণত বিদেশী পুঁজিপতিরা চড়া মুনাফার শিল্পে বিনিয়োগ করতে চায় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সে ধরনের শিল্পগুলি সাধারণত অগ্রাধিকারযুক্ত হয় না। ফলে, সে সব শিল্পে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগে সম্মতি দেওয়া হলে তা পরিকল্পিত উন্নয়নে বিকৃতি ঘটায় ও অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি করে।

(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদে ও নির্ধারিত সুদে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে কিংবা আন্তর্জাতিক ঋণদান সংস্থা থেকে স্বল্পোন্নত দেশের সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ—এ ধরনের উৎস থেকে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্বল সংগ্রহের সুবিধা হল: এই ধরনের বিদেশী ঋণ যে কোনো বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যায়। ফলে তার দ্বারা যে কোনো দেশ থেকে সুবিধামতো ও প্রতিযোগিতামূলক দামে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম কেনা যায়। তবে, সর্বক্ষেত্রেই বিদেশী ঋণ যে কোনো বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করার সুবিধা থাকে না। এবং এই ধরনের বিদেশী ঋণের সুদের হারও খানিকটা চড়া হয়ে থাকে। তাছাড়া নির্দিষ্টকাল পর পর সুদে-আসলে ঐ

ঋণ বিদেশী মুদ্রায় কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করতে হয়। এটা দেশের বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উপর একটা বোঝা হয়ে উঠতে পারে। তবে, এসব অসুবিধা সত্ত্বেও উপরোক্ত তিনটি উৎসের মধ্যে এটিই হল সবচেয়ে সুবিধাজনক।

(ঘ) অনুকূল বাণিজ্য শর্ত (Favourable Terms of Trade)—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাণিজ্যের শর্তাবলীর অনুকূল অবস্থা স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে বিদেশী সম্বল সংগ্রহের অন্যতম সূত্র হয়ে উঠতে পারে। রপ্তানী পণ্যের আন্তর্জাতিক দর যদি বেড়ে যায় তাহলে বিদেশী মুদ্রায় দেশের আয় বাড়বে। বিদেশী মুদ্রার বর্ধিত আয়ে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম কেনা সম্ভব হয়। এটাকে বলা যায় উন্নত দেশ থেকে স্বল্পোন্নত দেশে আয়ের এক ধরনের স্থানান্তরকরণ। স্বল্পোন্নত দেশের সরকারগুলি এ উদ্দেশ্যে রপ্তানী কর বসিয়ে রপ্তানী পণ্যের দাম বাড়াতে পারে। এমনকি, সরকার নিজে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া কারবারী হতে পারে। এইভাবে, এই উৎসটি থেকে লব্ধ আয় পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এর কিছু **অসুবিধাও আছে :** (ক) সাধারণত বাণিজ্যের শর্তাবলীর উপর স্বল্পোন্নত দেশগুলির কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ওই শর্তগুলি সাধারণত নানা আন্তর্জাতিক বিষয় ও অবস্থায় দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম ও ক্রুড অয়েলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। স্বল্পোন্নত আরব দেশগুলি উন্নত দেশগুলিকে চড়া দামে পেট্রোলিয়াম ও ক্রুড অয়েল কিনতে বাধ্য করছে। (খ) বাণিজ্যের শর্তাবলী দীর্ঘকাল ধরে সাধারণভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রতিকূলে রয়েছে। এই অবস্থার কোনো সামগ্রিক পরিবর্তন আশা করার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। (গ) রপ্তানী পণ্যের উপর কর ধার্য করা হলে মূল্য বৃদ্ধির দরুন বিদেশী ক্রেতারা বিকল্প উৎস বা বিকল্প দ্রব্য সন্ধান করবেই। ফলে, মোট রপ্তানির পরিমাণটা কমে যেতে পারে। তাই, স্বল্পোন্নত দেশগুলির কাছে এই উৎসটি ব্যবহারের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

(ঙ) **রপ্তানী উদ্বৃত্ত** (Export Surplus) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে রপ্তানির নীট উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে বিদেশী মুদ্রার তহবিলটি বাড়াতে পারলে তা স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের সম্বল সংগ্রহের অন্যতম উৎসে পরিণত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, রপ্তানি প্রসারে সর্ববিধ উৎসাহ, রপ্তানী ভরতুকি, নতুন বিদেশী বাজারের সন্ধান, অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় আমদানি বন্ধ, কঠোরভাবে বিদেশী মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানিকারীদের ঋণ সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯৮. অর্থনীতিক বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ
Economic Restriction and Controls

অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়োজনে স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে পছন্দমত কাজ করার স্বাধীনতার উপর সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। পছন্দমতো কাজ করার ব্যক্তি-স্বাধীনতার (individual's freedom of choice) দ্বারা এক্ষেত্রে দু'ধরনের পছন্দ বোঝায় : (ক) উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বিনিময়ের শর্তাবলী স্থির করার ক্ষেত্রে **উৎপাদকের পছন্দ** (producer's choice); (খ) পেশা, বৃত্তি ও ভোগের ক্ষেত্রে **ব্যক্তিগত পছন্দ** (personal choice)।

এই পছন্দগুলি কিন্তু পরস্পর সংশ্লিষ্ট। একটি সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রিত হলে, তা অন্যটিকে স্পর্শ না করে পারে না। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের শর্তাবলী সম্পর্কে পছন্দগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেগুলি একত্রে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। পরিকল্পনার সুষ্ঠু রচনা ও বাস্তব রূপায়ণের স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন, অন্তত ততটুকু পরিমাণে ওই সব বিষয়ে ব্যক্তিগত পছন্দগুলিকে খর্ব ও নিয়ন্ত্রণ করতেই হয়। আবার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে, ভোগ, পেশা বা বৃত্তি বাছাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যক্তিগত পছন্দগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইহেতু এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ সরকারী হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা হয় এবং এ কারণে এ সবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলা হয়। সরকারী ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সে কারণে লক্ষ্য রাখে যেন এই সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা যথাসম্ভব ন্যূনতম পরিমাণে ঘটে। কিন্তু যতটুকু পরিমাণেই তা ঘটুক, সেটা পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনিবার্য এবং সে কারণে, যত আপত্তিই থাকুক, তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ব্যক্তিগত পছন্দগুলির সরকারী নিয়ন্ত্রণ দু'রকমের হতে পারে : (১) প্রত্যক্ষ এবং (২) পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সরাসরি ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক বা নেতিবাচক সরকারী প্রত্যাদেশ জারী করা হয়। পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে সরাসরি ইতিবাচক ও নেতিবাচক কোনো রকম প্রত্যাদেশ জারী না করে, প্রত্যক্ষভাবে

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা পছন্দে হস্তক্ষেপ না করে, কোনো কাজে উৎসাহিত করতে প্রণোদনা যোগানো হয় কিংবা কোনো কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে সে কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়। যেমন সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য সরাসরিভাবে বিধিনিয়ম জারী করা হল প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু চড়া হারে সুদের ব্যবস্থা করাটা হল পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য যে ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাতে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল বলে পরিগণিত হয়।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্ত বিবিধ ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : (১) **বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ** (Investment Control) **:** যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সারবস্তুই হল পুঁজি-বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ। তাই বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা চিন্তাই করা যায় না।

তিনটি কারণে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে : (১ যে সব উৎপাদন উপকরণগুলির যোগান স্বল্প সেগুলির যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত ও ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

(২) শিল্পগুলিতে একই ধরনের কাজের অযথা পুনরাবৃত্তি এবং অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা এড়ানো।

(৩) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিল্পের কেন্দ্রীকরণ অথবা বিকেন্দ্রীকরণ সুনিশ্চিত করা।

বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ পরিমাণগত হতে পারে, আবার গুণগতও হতে পারে। পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আগে থেকেই বিনিয়োগের মোট পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া। গুণগত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ের মধ্যে মোট বিনিয়োগের যুক্তিযুক্ত (rational) বিলিবন্টন সুনিশ্চিত করা হয়। এটা করতে গিয়ে কতকগুলি শিল্পে বিনিয়োগ কমানো হতে পারে (যে সব শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি) ও অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো হতে পারে (অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পগুলি)। বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ সরাসরি অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে করা হতে পারে আবার পরোক্ষভাবেও করা যেতে পারে। তবে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কেবল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ওই নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ রাখলে চলে না। তার সাথে, বিদেশী মুদ্রা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (foreign exchange control), ব্যাঙ্কিং ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও খানিক পরিমাণে পুঁজিদ্রব্য শিল্পের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণটি হল সুদূরপ্রসারী।

(২) **উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ** (Production Control) **:** উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পরিকল্পিত অর্থনীতি অর্থহীন। পরিকল্পনার নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কতকগুলি শিল্পে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা অথবা স্থিতিশীল রাখা কিংবা কতকগুলি শিল্পে উৎপাদন সর্বাধিক করার জন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ নামক হাতিয়ারটি ব্যবহার করা হতে পারে। অর্থাৎ পরিকল্পনার ধরন অনুযায়ী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যটি স্থির হয়ে থাকে। দ্রুত শিল্পায়নের পরিকল্পনায় হাল্কা ভোগ্যপণ্য শিল্পের পরিবর্তে ভারী পুঁজিদ্রব্য শিল্প অগ্রাধিকার পায় এবং সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আবার সামাজিক কল্যাণ পরিকল্পনায় অন্যান্য শিল্পের পরিবর্তে হাল্কা ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি পরিচালিত হয়। প্রয়োজনে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি এমন বিশদ হতে পারে যে, বিভিন্ন শিল্পসংস্থার উৎপাদন কোটা ও কাঁচামালের কোটা, শ্রমিকদের মজুরির হার ও তৈরী পণ্যের দাম এবং বিভিন্ন বাজারে তাদের বিক্রি পরিমাণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ হতে পারে।

(৩) **ভোগ নিয়ন্ত্রণ** (Consumption Control) **:** পরিকল্পিত অর্থনীতিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাশাপাশি ভোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভোগ নিয়ন্ত্রণ দু'ধরনের হতে পারে : (ক) সঙ্কোচনমূলক এবং (খ) সম্প্রসারণমূলক।

সাধারণত, সঙ্কোচনমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই অধিকাংশ পরিকল্পিত অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য একটি বা একাধিক হতে পারে : (১) সঞ্চয় হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভোগব্যয় হ্রাস করা ; (২) কতকগুলি পণ্যের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে কার্যকর হয় তা সুনিশ্চিত করা ; এবং (৩) কতকগুলি স্বল্পলভ্য দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য সুনিশ্চিত করা।

যে সব স্বল্পোন্নত দেশ অল্পকালের মধ্যে দ্রুত শিল্পায়ন চায়, তাদের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সঙ্কোচন-মূলক ভোগ নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অনতিপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে অতিপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিকে স্থানান্তরিত করার জন্য এই ধরনের ভোগ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

সঙ্কোচনমূলক ভোগ নিয়ন্ত্রণ দু'রকমভাবে করা যায় : (ক) পরোক্ষ এবং (খ) প্রত্যক্ষ। মূল্যবৃদ্ধি উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা, আমদানী শুল্ক আরোপ করা কিংবা পণ্যের উৎকর্ষ হ্রাস করা—এগুলি হল সঙ্কোচনমূলক ভোগ-নিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ উপায়। প্রয়োজনের পক্ষে এই পরোক্ষ

উপায়গুলি যথেষ্ট না হলে যে সব প্রত্যক্ষ উপায় গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রেশনিং।

সঙ্কোচনমূলক ভোগ নিয়ন্ত্রণ গুণগত এবং পরিমাণগত, উভয় প্রকারেরই হতে পারে। রেশনিং হল পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের উপায়। বিলাসদ্রব্য ও মদ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদি ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার ব্যবস্থাগুলি হল গুণগত নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত।

কোনো কোনো পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব করার উদ্দেশ্যে তাদের ভোগব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হয়, তা হল সম্প্রসারণমূলক ভোগনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। সাধারণত, দেশে মন্দা ও ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দিলে এ জাতীয় ভোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৪) **বিদেশী মুদ্রার বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ** (Foreign Exchange Control) **:** পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় : (ক) বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশী মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ ; (খ) পুঁজির চলাচল, বিদেশী দেনা পরিশোধ, বিদেশী মুদ্রার বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ ; (গ) বিদেশী মুদ্রার অথবা বৈদেশিক সম্পত্তির মালিকানার নিয়ন্ত্রণ ; এবং (ঘ) মূল্যবান ধাতুপিণ্ড, মুদ্রা, কাগজের নোট ও লগ্নিপত্রের আমদানি রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ।

প্রথমটির দ্বারা বিদেশের অর্থনৈতিক ওঠানামা, চড়তি ও মন্দার প্রকোপ থেকে দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত করা যায়। তা না হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। প্রয়োজনবোধে মুদ্রার অবমূল্যায়ন (devaluation) ও অধিমূল্যায়ন (revaluation) দ্বারা এ উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করা যায়।

দ্বিতীয়টির দ্বারা দেশ থেকে বিদেশে পুঁজির বহির্গমন বন্ধ করা যায়। দেশে করের বোঝা বেড়ে গেলে, পুঁজিপতিরা দেশ থেকে তাঁদের পুঁজি বিদেশে সুবিধাজনক স্থানে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তার ফলে দেশের মধ্যে পুঁজির অভাব দেখা দেয় এবং দেশের অর্থনীতিতে সংকট এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এ কারণে দেশ থেকে বিদেশে পুঁজির বহির্গমন বন্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

তৃতীয়টির দ্বারা বেসরকারী মালিকানাধীন বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী সম্পত্তিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে এনে কেন্দ্রীয় বিদেশী মুদ্রার তহবিলটি বাড়ানো যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে প্রায়ই বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি ঘটে। এইভাবে তা দূর করা যায়।

চতুর্থটি দরকার হয় প্রথমটি ও দ্বিতীয়টির প্রয়োজনে।

(৫ **বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ** (Foreign Trade Control) **:** বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করতে হয়। তার কারণ হল বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশ থেকে বিদেশী পুঁজির বহির্গমন বন্ধ করে দিলেও, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা না হলে, দেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাবদ পাওনা বৈদেশিক মুদ্রা রপ্তানিকারীরা বিদেশেই বিনিয়োগ করতে পারে। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য মারফত দেশ থেকে পুঁজি বিদেশে চলে যেতে পারে।

(৬) **মূল্য নিয়ন্ত্রণ** (Price Control) **:** পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মূল্যব্যবস্থার কাজ হল পরিকল্পনার নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে সহায়তা করা। অতএব, মূল্যস্তরের এমন ওঠানামা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যায় না যা পরিকল্পনায় নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রাধিকারকে বিকৃত করতে পারে। কিংবা মূল্যস্তর অথবা মজুরিস্তরেরও এমন পরিবর্তন ঘটতে দেওয়া যায় না যা পরিকল্পনায় নির্ধারিত প্রকৃত আয়ের বণ্টনে ওলটপালট ঘটাতে পারে। পরিকল্পনায় যদি কেবল খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয় অথচ খাদ্যশস্যের দাম যদি এমন স্তরে ধরে রাখা না যায় যাতে খাদ্য-উৎপাদনকারী কৃষকদের হাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কেনার মতো পয়সা আসে, তাহলে খাদ্যশস্যের নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্য কোনোমতেই পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। কিংবা অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের দাম যদি বাড়তে থাকে, তাহলে জাতীয় আয়ে স্থির আয়বিশিষ্ট শ্রেণীগুলির অংশ কমে যাবে এবং দেশের মধ্যে আয়ের অধিকতর সমবণ্টনের লক্ষ্য যদি পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা বিফল হবে এবং তার বিপরীত জিনিসই ঘটবে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে গেলে উপযুক্ত মূল্যনীতি (Price policy) নির্ধারণ এবং তা বজায় রাখার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করাটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেটা না করে মূল্যস্তরকে বাজারের খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেওয়া হলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু সুনির্দিষ্ট মূল্যনীতি গ্রহণ করাই সব নয়। তার সাথে এমন সব বিধিব্যবস্থা এবং উপায়ও গ্রহণ করা দরকার যার দ্বারা মূল্যস্তর ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রীর দরদামকে বাঞ্ছিত দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। সুস্পষ্টভাবে মূল্যনীতি সংক্রান্ত উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণের পর সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারকে তার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মারফত যে সব উপায় ও বিধিব্যবস্থা

গ্রহণ করতে হতে পারে তা হল : (ক) বিধিবদ্ধ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ (statutory price control); (খ) করধার্য ও ভরতুকি (tax and subsidy); (গ) সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মূল্যনির্ধারণ ক্ষমতা; (ঘ) বিধিবদ্ধ মজুরি নিয়ন্ত্রণ (statutory wage regulation); ঙ) সরকারী নিয়োগে মজুরির হার নির্ধারণ; এবং (চ) বাজার প্রবণতার বিরোধী বেচাকেনার ব্যবস্থা। মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সারকথা হল, এজন্য কেবল একটি উপযুক্ত মূল্যনীতিই নয়, উপরন্তু এমন একটি দৃঢ় সংকল্পও চাই যাতে ওই মূল্যনীতিটি কার্যকর হতে পাবে।

(৭) **শিল্প লাইসেন্স নীতি** (Industrial Licensing Policy) : অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়, এর জন্য চাই উপযুক্ত শিল্পনীতি (Industrial Policy) ও উপযুক্ত শিল্প লাইসেন্স নীতি (Industrial Licensing Policy)। দেশের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের সহাবস্থান থাকলে উপরোক্ত বিষয় দুটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। শিল্পনীতির দ্বারা পরিকল্পিত শিল্পায়নের 'স্ট্র্যাটেজী' অর্থাৎ সামগ্রিক রণনীতি নির্দিষ্ট হয়, আর লাইসেন্সের নীতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয় 'ট্যাকটিক' (tactic) অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে ওই সামগ্রিক নীতির অন্তর্গত আপাত কৌশল যার দ্বারা বিভিন্ন শিল্পে। সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বেসরকারী ক্ষেত্রে অবস্থিত শিল্পগুলির উন্নয়ন ও বিকাশ সম্বন্ধের বা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হাতে শিল্প লাইসেন্সিং নীতিটি নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিল্প লাইসেন্সিং নীতির দুটি দিক থাকে। একটি হল ইতিবাচক, অন্যটি হল নেতিবাচক। পরিকল্পনায় ও শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পগুলিকে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠায় ও সম্প্রসারণে সহায়তা করা হল এর ইতিবাচক দিক। আর, পরিকল্পনার নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অনুযায়ী, যেমন আয়বৈষম্য হ্রাস, একচেটিয়া অর্থনীতিক ক্ষমতা হ্রাস ও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, প্রভৃতি বিষয় অনুযায়ী—বাছবিচার করে, যে সব লাইসেন্স-প্রার্থীদের অনুমতিপত্র দিলে তা ওইসব উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হতে পারে, তাদের আবেদন নামঞ্জুর করা হল লাইসেন্সিং পলিসির নেতিবাচক দিক।

এইভাবে অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচি গ্রহণ করা হলে, স্বল্পোন্নত দেশে নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও প্রবর্তন করতে হয়। তা না হলে পরিকল্পনার রূপায়ণ সুনিশ্চিত করা যায় না। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি প্রবর্তন করা হলে তাতে ফল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি কি রকম কাজ করছে সেদিকেও সর্বদা তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রয়োজন মতো সে সবের রদবদল করতে হয়। প্রয়োজন হলে পুরাতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন এবং আরও উপযোগ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়।

৯.৭. ভারতে পরিকল্পনা রচনার প্রণালী Technique of Planning in India

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে যে প্রণালী অবলম্বন করা হয় তাকে এভাবে বর্ণনা করা যায় :

১ প্রথমে সমগ্র অর্থনীতির অবস্থা নিরূপণ করার জন্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও বিশদ পরিসংখ্যান পরিকল্পনা রচনার পক্ষে এক অপরিহার্য উপাদান। প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় : (ক) বিগত দিনে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ধরনের কাজকর্ম হয়েছে সে সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা। (খ) অর্থনীতির গুরুতর সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা। পরিসংখ্যান যাতে নির্ভুলভাবে প্রণয়ন করা যায় তার জন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

গৃহীত ব্যবস্থাগুলি এভাবে বর্ণনা করা যায়—(ক) জাতীয় হিসাব প্রণয়ন ব্যবস্থা : এ কাজে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন। ১৯৪৮ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় আয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত আছে। জাতীয় সঞ্চয় ও জাতীয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় পরিসংখ্যান সংকলন করছে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন ও ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। (খ) কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান যাতে আরো নিখুঁত ভাবে তৈরী করা যায় তার জন্য সব রকমের চেষ্টা চালান হচ্ছে। (গ) বেসরকারী ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান সযত্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি সঠিকভাবে সংকলনের ব্যবস্থা হচ্ছে। (ঘ) পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন রিসার্চ প্রোগ্রাম কমিটি পরিকল্পনার সামাজিক, অর্থনীতিক ও প্রশাসনিক দিকগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আর্থিক অনুদান দিচ্ছে। এ ছাড়াও, পরিকল্পনা কমিশনের প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশান অর্গানাইজেশন (Programme Evaluation Organisation) অর্থনীতির সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ

করে। প্রধানত সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও কৃষিতে উন্নয়ন কার্যসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করাও এ সংস্থার কাজ।

অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা থেকে সংকলিত এ সব তথ্য পরিকল্পনার নীতি ও কার্যসূচির পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এগুলি ছাড়াও, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার কয়েকটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। যেমন, দি সেণ্ট্রাল ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন, দি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, দি ব্যুরো অব মাইনস্, দি অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন, দি কমিটি অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস্ ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান সমীক্ষার মাধ্যমে যে সব তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি পরিকল্পনা রচনার কাজে কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে শক্তি ও সম্বল কি পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়। কোনো একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে কমপক্ষে ২ বা ৩ বৎসরের প্রস্তুতির দরকার হয়। প্রস্তুতি পর্বে কয়েকটি বিষয়ের বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হয়। যেমন—জনসংখ্যা ভবিষ্যতে কি হারে বৃদ্ধি পেতে পারে তার অনুমান, উন্নয়নের কাম্য হার কি কি হবে তা নির্ধারণ করা, উন্নয়নের ব্যাপারে কোন্ কোন্ ক্ষেত্র অগ্রাধিকার পাবে তা স্থির করা। পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নে এ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

৩. উন্নয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য স্থির করা হয়। এ ব্যাপারে তিনদিক থেকে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। (ক) সময় সংক্রান্ত অসুবিধা: যেমন, কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন্ লক্ষ্যের কতটুকু পূরণ করা যাবে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব; (খ) মানবিক ও বস্তুগত সম্বল সংক্রান্ত অসুবিধা: যেমন, পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণে যথেষ্ট সম্বল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চয়তার অভাব; (গ) লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে অসুবিধা: যেমন—স্বল্পকালীন, মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন লক্ষ্যসমূহ অনেক সময় পরস্পর বিরোধী হতে পারে। আবার অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলির সাথে অর্থনৈতিক নয় এমন লক্ষ্যগুলির বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি পরিকল্পনার যে দু'টি লক্ষ্য—অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ—তাদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিতে পারে। কেন না, এর মধ্যে যে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দিলে অপরটি অবহেলিত হতে পারে।

ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে উন্নয়ন কৌশল হিসাবে দু'টি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: (ক) কৃষির উন্নয়ন ও (খ) ভারী এবং বুনিয়াদী শিল্পের প্রসার। কৃষির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করার মূলে উদ্দেশ্য হল খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংভরতা অর্জন ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়ানো। দ্রুত হারে শিল্পায়নের জন্য শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সুবন্দোবস্ত অত্যাবশ্যক। ভারতের পরিকল্পনায় এসব বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়।

৪. প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ: বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদন লক্ষ্য নিধারণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত ভিন্ন ভিন্ন কর্মী দল। এসব কর্মীদল পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। কখনো কখনো এ ব্যাপারে সংগঠিত জনমতেরও পরামর্শ নেওয়া হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার কারণ সঙ্গতি না থাকলে অর্থনীতিতে ক্ষেত্রগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। পরিকল্পনার চূড়ান্ত-রূপ দেবার আগে গোটা পরিকল্পনাটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গতি রাখা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন নিশ্চিন্ত হবার জন্য সব কিছু মিলিয়ে দেখে।

৫. আর্থিক সম্বলের ব্যবস্থা: পরিকল্পনার খসড়া কাঠামো তৈরি করার আগে সম্ভাব্য আর্থিক সম্বলের আনুমানিক হিসাব প্রণয়নে দু'টি দিক আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। এ দু'টি দিক হল: (ক) অভ্যন্তরীণ সম্বলের সূত্র, ও (খ) বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের অবস্থা।

অভ্যন্তরীণ সম্বলের হিসাবে সরকারী ও বেসরকারী এ দু'টি ক্ষেত্রেরই হিসাব আলাদাভাবে করতে হয়। সরকারী ক্ষেত্রের হিসাব প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সম্বলের হিসাবও আলাদাভাবে করতে হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে সম্বলের হিসাবে সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় শিল্প-ক্ষেত্রেরই হিসাব পৃথকভাবে করতে হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের হিসাবে পরবর্তী পাঁচ বৎসরে লেনদেন উদ্বৃত্তের সম্ভাব্য অবস্থা বিচার করা হয়। এ ছাড়া, কি পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ঐ পাঁচ বৎসরে পাওয়া যেতে পারে তার হিসাবও করা হয়।

৬. সরকারী ক্ষেত্রের সম্বল: পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে কি পরিমাণ আর্থিক সম্বল পাওয়া যেতে পারে তার আনুমানিক হিসাব তৈরি করা হয় দু'টি বিষয়কে ভিত্তি করে। বিষয় দু'টি হল:

(ক) পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় যে হারে

বাড়বে বলে ধরা হয়েছে ঠিক সে হারেই সেটা বাড়বে এমন অনুমানের উপর।

(খ) সরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করবে বলে ধরা হয়েছে, তারা ঠিক সেই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে পারবে এবং ঐ সব পণ্যের জন্য নির্ধারিত দামে ঐ সব পণ্য বিক্রয় করা যাবে, এ অনুমানের উপর।

সরকারী ক্ষেত্রের সম্বলের উৎসগুলি হল :

১ চলতি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত
(এটা হিসাব করা হয় পরিকল্পনা যে বৎসর শুরু হবে ঠিক তার আগের বৎসরে করের হার যা ছিল তার ভিত্তিতে।)

২ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উদ্বৃত্ত
(ক) রেলপথ থেকে আয়
(খ) অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত

৩ জনসাধারণের নিকট থেকে ঋণ
(ক) বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ
(খ) ক্ষুদ্র সঞ্চয়

৪ মূলধনখাতে প্রাপ্তি
(ক) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড
(খ) স্টীল ইকুয়ালাইজেশন ফাণ্ড
(গ) পরিকল্পনা বহির্ভূত

৫ অতিরিক্ত কর ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ব্যবস্থা

৬ বৈদেশিক সাহায্য

৭ ঘাটতি ব্যয়

৮. বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্বল সংগ্রহ : বেসরকারী ক্ষেত্রের সংগঠিত ও অসংগঠিত এ দুটি অংশ আছে। অসংগঠিত অংশের মধ্যে আছে কৃষি, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি। এ অংশের সম্বল সংক্রান্ত অনুমান ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রণয়ন করে। এটা করা হয় এ অংশের পূর্বেকার সম্বল বিষয়ক তথ্যের ভিত্তিতে। অতীতে ঠিক কি ছিল এবং ভবিষ্যতে কি হতে পারে এ সব বিচার করে সম্বল সংগ্রহের সম্ভাবনার হিসাব রাখা হয়। সংগঠিত অংশের আনুমানিক হিসাব প্রণয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পরিকল্পনা কমিশন, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় প্রভৃতি সংস্থা একযোগে কাজ করে।

যে সব উৎস থেকে বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার আর্থিক সম্বল সংগৃহীত হবে বলে হিসাবে ধরা হয় সে উৎসগুলি হল :

১ ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

২ কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারসমূহের নিকট থেকে ঋণ

৩ নতুন মূলধন সৃষ্টি

৪ ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ

৫ বিদেশ থেকে প্রত্যক্ষ ঋণ

৯ বৈদেশিক মুদ্রা সম্বল : পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি কি হবে তার চার ধরনের হিসাব করা হয়। এগুলি হল :

(ক) পরিকল্পনায় যে সব প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেগুলির রূপায়ণের জন্য কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার দরকার হবে তার একটা হিসাব তৈরি করতে হয়। পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের সময় এ হিসাবটি হয় কাল্পনিক। পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। প্রতি বৎসর আসল ও সুদ নিয়ে মোট যে পরিমাণ অর্থ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতে হবে তার হিসাব করতে হয়। কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা কত সঞ্চিত আছে তার উপর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নির্ভর করবে। বিদেশ থেকে যে কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য আমদানি করতে হবে তার জন্য কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা লাগবে তারও হিসাব করতে হয়।

(খ) সমগ্র পরিকল্পনার জন্য পাঁচ বৎসরে মোট কি পরিমাণ এবং কি কি দ্রব্য আমদানি করতে হবে এবং তার জন্য কত অর্থ ব্যয় করতে হবে তার হিসাব করতে হয়।

(গ) রপ্তানি থেকে আয় : পরিকল্পনাকালে রপ্তানি থেকে কত আয় হতে পারে তার সঠিক অনুমান অনেকগুলি অনিশ্চয়তার জন্য করা সহজ হয় না। যেমন—আগে থেকেই অনুমান করা সম্ভব নয় আমদানিকারী দেশগুলিতে আলোচ্য সময়ে রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি হবে, ঐ দেশগুলির শিল্পনীতি কি হবে, অন্যান্য রপ্তানিকারী দেশগুলির সাথে নিজ দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিযোগিতা কতটা তীব্র হবে, রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা পেলেও দেশ যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি করার মতো পণ্যের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারবে কিনা ইত্যাদি।

(ঘ) বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ পরিকল্পনাকালে কত হতে পারে তারও একটা অনুমানিক হিসাব করতে হয়। কিন্তু এ ধরনের হিসাব করা শক্ত এ কারণে যে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কি হবে সে সাহায্যের ধরন কি হবে, কোন্ কোন্ উৎস থেকে সে সাহায্য পাওয়া যাবে—এ বিষয়গুলির সব কয়টিই অনিশ্চিত।

৯ ১০ রাজ্য পরিকল্পনা ও স্থানীয় পরিকল্পনা
State Plans and Local Plans

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সর্বভারতীয় কাঠামোর মধ্যেই

প্রতিটি রাজ্য তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। যে বিষয়গুলি রাজ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, সেচ, শক্তি, পথ নির্মাণ, পথ পরিবহণ, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা।

মোটামুটিভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনাগুলির মোট ব্যয় সর্বভারতীয় পরিকল্পনার সরকারী ক্ষেত্রের মোট ব্যয়ের প্রায় অর্ধাংশ।

একদিকে যেমন রাজ্য পরিকল্পনা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে স্থানীয় পরিকল্পনা। স্থানীয় পরিকল্পনা রচিত হয় জিলা, উন্নয়ন ব্লক ও গ্রামের জন্য। বস্তুতপক্ষে, স্থানীয় পরিকল্পনাকে 'তলা থেকে পরিকল্পনা' (planning from below) বলে অভিহিত করা হয়। এটা 'উপর থেকে পরিকল্পনা' (planning from above) ও 'তলা থেকে পরিকল্পনা',—এ দুটি পরিকল্পনা কৌশলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চায়। তবে ভারতের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'তলা থেকে পরিকল্পনা'র কৌশল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোথাও খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

গ্রাম স্তরে কৃষির উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হয় ব্লক স্তরের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে। গ্রাম স্তরের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য থাকে গ্রামের সব কৃষককে কৃষি উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রচেষ্টায় বিজড়িত করা এবং স্থানীয় উপকরণগুলিকে উৎপাদনের কাজে আরও বেশি করে নিয়োগের চেষ্টা করা। এ সব বিষয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত হয়।

এ ছাড়া, রাজ্যের অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়। আঞ্চলিক পরিকল্পনাগুলি রাজ্য পরিকল্পনার মূল কাঠামোর মধ্যেই রচিত হয়।

৯.১১ বার্ষিক পরিকল্পনা / Annual Plans

বার্ষিক পরিকল্পনা সর্বপ্রথম রচিত হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আরম্ভে। প্রতি বৎসর বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের আগেই বার্ষিক পরিকল্পনা' রচনার কাজ শুরু হয়ে যায়।

প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশনের নিকট থেকে রাজ্য সরকারগুলির কাছে পরবর্তী বৎসরে রাজ্যপরিকল্পনায় রাজ্যগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেবে সেই মর্মে নির্দেশ আসে। তা ছাড়া, রাজ্য সরকারগুলি তাঁদের নিজ নিজ পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে কি পরিমাণ সাহায্য পাবে বলে আশা করতে পারে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে সেটাও জানিয়ে দেয়। আর, তাদের নিজ নিজ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাঠামোর মধ্যে তাদের বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া পাঠাতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারগুলি তাদের পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত-সম্বল সংগ্রহের বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায় সে সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠাতে রাজ্য সরকারগুলিকে বলা হয়। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলির সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হয়। তার কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধন বাজেট (capital budget) প্রণয়নে রাজ্যগুলির বার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ বিশেষভাবে জড়িত থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলি যে অর্থ অনুমোদন করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরের বাজেটে অর্থের সংস্থান করা হয়। তা ছাড়া, বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখেই লেনদেন উদ্বৃত্ত, বণ্টন কার্যসূচি ও বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বাজেট তৈরী করতে হয়।

অন্য দিকে উন্নয়ন পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বেসরকারী ক্ষেত্রের বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়।

এভাবে বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১ জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের উপযোগী বিনিয়োগ হার নির্ধারণ করতে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

[What factors have to be taken into consideration in determining the rate of investment considered to be appropriate for national economic development ?]

২. স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগের আদর্শ হার কি হওয়া উচিত?

[What should be the ideal rate of investment in an underdeveloped country ?]

৩ উন্নয়ন হার কিভাবে বাড়ানো যায়? এ সম্পর্কে হ্যারড্-ডোমার মডেলটি ব্যাখ্যা কর।

[How can the rate of economic growth be accelerated ? In this connection discuss the Harrod-Domar model for development.]

৪ অর্থনীতিক পরিকল্পনায় পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the importance of the concept of capital-output ratio in economic planning.]

৫. অর্থনীতিক পরিকল্পনার রচনায় ও রূপায়ণে সঠিক উৎপাদন-কৌশল নির্বাচনের বিষয়টি আলোচনা কর।

[Analyse the problem of making the right choice of technique of production in formulating and implementing an economic plan.]

[C.U. B.Com. (Pass) 1983]

৬ ভারতে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য শ্রম-নিবিড় উৎপাদন-কৌশল গ্রহণ করা কি উচিত?

[Should India adopt the labour-intensive technique of production to ensure a rapid rate of economic development?]

[C.U. B.Com. '84]

৭. পুঁজি-নিবিড় শিল্প কৌশলের পক্ষে যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা কর।

[Explain the arguments in favour of capital-intensive technique of production.]

[C.U. B Com. '80]

৮. স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কোন্ উৎপাদন-কৌশলটি পুঁজি প্রগাঢ় অথবা শ্রম-প্রগাঢ়—গ্রহণ করা দরকার?

[Which technique of production—the capital-intensive or the labour-intensive—should be adopted in the economic development of underdeveloped countries?]

৯ অর্থনীতিক পরিকল্পনা কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কি কি?

[What is economic planning? What are its objectives?] [C.U. B.Com. (Pass 1980]

১০ "পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের একটি কঠিন সমস্যা হল বিনিয়োগের ধাঁচ নির্ধারণ ও শিল্পের জন্য সম্বলের বণ্টন।"—এ বক্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

["A difficult problem that the planning authority has to solve is the determination of the pattern of investment and the allocations of resources for the industries."—Discuss the statement.]

১১. বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি কি?

[What are the internal sources from which investible funds are generally raised?]

১২. স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নে সম্বল সংগ্রহের উৎস হিসাবে করের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। এ উৎসটির সীমাবদ্ধতাও বর্ণনা কর।

[Explain the role of taxation as a source of finance for economic development of underdeveloped countries. Describe the limitations of this source.]

[C.U. B.Com. (Pass) 1985]

১৩. অর্থনীতিক পরিকল্পনার জন্য সম্বল সংগ্রহের উৎস হিসাবে সঞ্চয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

[Analyse the role of savings as a source of finance for economic planning.]

১৪ "স্বল্পোন্নত দেশে বিরাট সঞ্চয় সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তার গ্রামাঞ্চলের প্রচ্ছন্ন বেকারী তথা স্বল্পনিয়োগের মধ্যে।" এ বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

["Disguised unemployment (or underemployment) in the rural areas of the underdeveloped countries represents tremendous saving potential." Discuss the statement.]

১৫. প্রচ্ছন্ন বা আংশিক বেকার বাহিনীর বিপুল বোঝাকে কি ভাবে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদে পরিণত করা যায়?

[How can the huge burden of disguised unemployment (or underemployment) be converted into investible resources?]

১৬. ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে সম্বল সংগ্রহের উৎস হিসাবে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the role of deficit financing as a source of developmental finance.]

[C.U B.Com. (Pass) '81, '84]

১৭. অর্থনীতিক উন্নয়নের কি রাজনৈতিক এবং/অথবা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে?

[Can an economic plan have political and/or social objectives?]

[C.U. B.Com. (Pass) 1982]

১৮. স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে বিদেশী ঋণ ও পুঁজির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the roll that foreign loans and

foreign capital can play in the development of an underdeveloped country.]

১৯. পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয় কেন ?

[Why is the need for controlling investment in economic development through planning felt ?]

২০. "পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভোগ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।"—এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

["Consumption control is an essential characteristic of a planned economy." Explain why this is so]

২১ পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কেন অপরিহার্য হয় তার কারণ দেখাও।

[Discuss why exchange control becomes indispensable in a planned economy.]

২২. পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain the need for controlling prices in a planned economy.]

[C U. B.Com. (Pass) 1985]

২৩. ভারতের পরিকল্পনা রচনার প্রণালী সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

[Write a note on the technique of planning in India.] [C.U. B.Com. (Pass) 1985]

২৪ পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন-কৌশলের অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

[Mention the disadvantages of the capital-intensive technique of production.]

[C.U. B.Com. (Pass) 1980, '82]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমার ধারণা পরিস্ফুট কর : (ক) সঞ্চয়-আয় অনুপাত (খ) পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাত।

[Discuss the following concepts : (a) Saving-income ratio, (b) Capital-output ratio] [C.U. B.Com. (Pass) 1985]

২. পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন কেন ?

[Why is a central authority deemed essential in planning ?]

[C.U. B.Com. (Pass) 1982]

৩. শ্রম-নিবিড় উৎপাদন-কৌশল বলতে কি বোঝায় ?

[What is meant by labour-intensive technique of production ?]

[C.U.B.Com. (Pass) 1985]

৪. পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন-কৌশল কাকে বলে ?

[What does capital-intensive technique of production mean ?]

৫. অর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রধান সুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

[What are the main advantages of economic planning ?]

[C.U. B.Com. (Pass) 1984]

৬. ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার দু'টি ধরনের নাম উল্লেখ কর।

[Name two types of capitalist planning.]

[C.U. B.Com (Pass) 1982

৭. ভারতের পরিকল্পনা রূপায়ণে দু'টি প্রধান অন্তরায় নির্দেশ কর।

[Indicate two major obstacles to the implementation of plans in India.]

[C.U. B.Com (Pass) 1982]

৮. পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কোন্ ভিত্তিতে উৎপাদন-কৌশল বেছে নেওয়া হয় ?

[Mention the criteria governing the choice of technique in a planned economy ?]

[C.U. B Com. (Pass) 1983]

৯. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কি ? উত্তরে তোমার যুক্তিগুলি বল।

[Is planning necessary in a capitalist economy ? Give reasons for your answer.]

[C.U. B.Com. (Pass) 1984]

ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনা
Economic Planning In India

১০.১. ভারতের পরিকল্পনা-সংস্থার সংগঠন
Organization of the Planning Machinery of India

১. পরিকল্পনা কমিশনের উদ্ভব (Genesis of the Planning Commission) : ১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে গৃহীত ভারত সরকারের এক প্রস্তাবানুসারে দেশের সম্বলের সুষম ও সার্থক ব্যবহার কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন বস্তুতপক্ষে একটি পরামর্শদাতা (advisory) প্রতিষ্ঠান। এ কারণে পরিকল্পনার কার্যসূচি রূপায়ণ সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয় নি। ১৯৮৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনে জাতীয় মোর্চা সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরিকল্পনা কমিশনকে একটি সাংবিধানিক রূপ দেবার নীতি গৃহীত হয়েছে। এছাড়া নতুন করে কমিশন পুনর্গঠিতও হয়েছে।

২. পরিকল্পনা কমিশনের কাজ (Functions of the Planning Commission) :

(১) দেশের বস্তুগত সম্পদ, মানবিক সম্পদ ও পুঁজি কি পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে তা নিরূপণ করা এবং দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যে সব সম্পদ অপ্রতুল সেগুলির পরিমাণ কি ভাবে বাড়ানো সম্ভব তা খতিয়ে দেখা,

(২) দেশের সম্পদের কার্যকর ও সুসমঞ্জস ব্যবহার সম্ভব করার জন্য পরিকল্পনা রচনা করা,

(৩) যে সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা রূপায়িত হবে সেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা, এবং পর্যায়গুলির গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে সেগুলির রূপায়ণের জন্য সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া,

(৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসাবে যে সব উপাদান কাজ করে সেগুলিকে সঠিকভাবে নির্দেশ করা এবং দেশের বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য কি কি শর্ত থাকা দরকার সেগুলি নির্ধারণ করা,

(৫) পরিকল্পনার প্রত্যেকটি পর্যায়ের কার্যসূচি সফল ভাবে রূপায়ণের জন্য কি ধরনের কলাকৌশল অবলম্বন করা দরকার তা নির্ধারণ করা,

(৬) পরিকল্পনার প্রত্যেকটি পর্যায়ের কার্যসূচি রূপায়ণে কতটুকু অগ্রগতি হয় সময়ে সময়ে তার মূল্যায়ন

করা এবং সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরিকল্পনার অনুসৃত নীতি ও কার্যপদ্ধতির কোনো পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে সে সম্পর্কে সুপারিশ করা,

(৭) দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, উন্নয়নের কাজে অনুসৃত নীতি, গৃহীত ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে উন্নয়ন কি ভাবে সম্ভব করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করা,

(৮) কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারগুলি কোনো বিশেষ সমস্যা পরিকল্পনা কমিশনের কাছে মতামতের জন্য উপস্থাপন করলে সেই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে উপযুক্ত সুপারিশ করা।

৩ পরিকল্পনা কমিশনের প্রশাসনিক সংগঠন (Administrative Organization of the Planning Commission) : ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা ১১। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এর ডেপুটি চেয়ারম্যান। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কমিশনের সদস্য। এ ছাড়া আরও সাতজন ব্যক্তি এই কমিশনের সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। কমিশনের সচিব একজন। প্রশাসনের সাথে মন্ত্রিপরিষদের সংযোগ রক্ষার সূত্র হিসাবে মন্ত্রিপরিষদের সচিবকেই পরিকল্পনা কমিশনের সচিব নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া, একজন অতিরিক্ত সচিব নিয়োগ করা হয় যাঁর কাজ হল কমিশনের বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং কমিশনের প্রশাসনিক দিকটি দেখাশোনা করা। উপরন্তু, কমিশনের উপসচিব স্তরের (deputy secretary) কয়েকজন প্রবীণ কর্মচারী রয়েছেন যাঁদের কাজ হল রাজ্যগুলিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ কিভাবে এবং কতদূর রূপায়িত হচ্ছে সেটা দেখা।

পরিকল্পনা সংস্থা একটা যৌথ সংস্থা (collective body) হিসাবে কাজ করে এবং এর দায়িত্বও যৌথ। তবে কাজের সুবিধার জন্য এক একজন সদস্যের উপর একাধিক বিষয়ের বা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন—কোন সদস্যের দায়িত্বে থাকে শিল্প, শ্রম, পরিবহণ ও শক্তি ; আর একজন দেখাশোনা করে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ, অপর একজনের দায়িত্বে থাকে সর্বাংশে যথানুপাত অনুযায়ী পরিকল্পনা (perspective planning) ; এবং আর একজনের হাতে থাকে শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সমাজসেবা প্রভৃতি বিভাগ।

পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সংসদের কাছে জবাবদিহি করার সব দায়িত্ব পরিকল্পনা মন্ত্রীর।

৪ পরিকল্পনা কমিশনের অভ্যন্তরীণ সংগঠন (Internal Organization) : সুষ্ঠুভাবে কার্য-সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন তার অভ্যন্তরে অনেকগুলি বিভাগ (division) সৃষ্টি করে নিয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের দৈনন্দিন কাজের দায়িত্বে থাকেন কমিশনের সর্বক্ষণের সদস্যবৃন্দ, যদিও কমিশন একটি অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবেই কাজ করে এবং বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ ভাবেই পরামর্শ দিয়ে থাকে।

যে সব বিভাগের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা কমিশন কাজ করে সেগুলিকে নিম্নলিখিত **ছয়টি** শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (ক) সাধারণ বিভাগ, (খ) বিষয় বিভাগ, (গ) সমন্বয় বিভাগ, (ঘ) বিশেষ উন্নয়ন কার্যসূচি বিভাগ, (ঙ) মূল্যায়ন বিভাগ, (চ) অন্যান্য সংস্থাসমূহ।

(ক) **সাধারণ বিভাগ (General Division) :** এ বিভাগটি সমগ্র অর্থনীতির সাথে জড়িত কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণের কাজে নিযুক্ত থাকে। এ বিভাগের মধ্যে রয়েছে (১) অর্থনৈতিক বিভাগ—এটি আবার পাঁচটি উপবিভাগের সমষ্টি হিসাবে কাজ করে। উপবিভাগ পাঁচটি হল, আর্থিক সম্বল সংক্রান্ত ; অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত, মূল্যনীতি সংক্রান্ত এবং আন্ত-শিল্প তথ্যানুসন্ধান সংক্রান্ত। (২) সর্বাংশে যথানুপাতিক পরিকল্পনা (perspective planning) বিভাগ, (৩) শ্রম ও কর্মসংস্থান বিভাগ, (৪) পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা বিভাগ, (৫) সম্বল ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ।

(খ) **বিষয় বিভাগ (Subjects Division) :** এ বিভাগে রয়েছে (১) কৃষি বিভাগ, (২) সেচ ও শক্তি বিভাগ, (৩) ভূমি সংস্কার বিভাগ, (৪) শিল্প ও খনিজ ও সরকারী উদ্যোগ বিভাগ, (৫) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ, (৬) পরিবহণ ও যোগাযোগ বিভাগ, (৭) শিক্ষা বিভাগ, (৮) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, (৯) গৃহ নির্মাণ ও নগর উন্নয়ন বিভাগ (১০) সমাজ কল্যাণ বিভাগ।

(গ) **সমন্বয় বিভাগসমূহ (Co-ordination Divisions) :** পরিকল্পনা কমিশনের দু'টি সমন্বয় বিভাগ আছে। (১) কার্যসূচি প্রশাসন বিভাগ—এ বিভাগের কাজ হল, রাজ্যগুলির পরিকল্পনার উপর নজর রাখা ও তাদের মধ্যে সমন্বয় আনা এবং প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়া, (২) পরিকল্পনা সমন্বয় বিভাগ—এ বিভাগের কাজ হল কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

(ঘ) **বিশেষ উন্নয়ন কার্যসূচি বিভাগ (Special Development Programme Division) :** এ

বিভাগের দু'টি অংশ : (১) গ্রামীণ কর্মসংস্থান বিভাগ, (২) জনসহযোগিতা বিভাগ। গ্রামীণ কর্মসংস্থান বিভাগের কাজ হল, স্থানীয় ভাবে স্বনির্ভর কার্যসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে কি ভাবে স্থানীয় জনসম্পদের সদ্ব্যবহার করা যায় তা দেখা। জনসহযোগিতা বিভাগের কাজ হল, জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণে জনসহযোগিতা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কার্যসূচি প্রণয়ন করা।

(ঙ) **মূল্যায়ন বিভাগ** (Evaluation Divisions) : এ বিভাগের দু'টি অংশ আছে। (১) প্রকল্প মূল্যায়ন (Project Appraisal) বিভাগ—এটি সরকারী বিনিয়োগ পর্যদের সচিবালয় হিসাবে কাজ করে। এ বিভাগ প্রত্যেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্য কোনো উৎকৃষ্টতর বিকল্প হতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখে, এবং প্রতিটি প্রকল্পের কার্যকারিতা ও সম্ভাবনা পরীক্ষা করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে যথোচিত পরামর্শ দেয়। (২) মূল্যায়ন বিভাগ—এ বিভাগ পরিকল্পনার যাবতীয় কার্যসূচির মূল্যায়ন করে তার উপর প্রতিবেদন রচনা করে কমিশনের কাছে উপস্থাপন করে। অধুনা এ বিভাগের প্রধান কাজ হল গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যসূচির মূল্যায়ন করা।

(চ) **অন্যান্য সংস্থাসমূহ** (Other Bodies) : পরিকল্পনার প্রণয়ন ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে আরও কয়েকটি সংস্থা যুক্ত থাকে। যেমন—(১) জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, (২) গবেষণা কার্যসূচি কমিটি, (৩) উপদেষ্টা সংস্থাসমূহ এবং (৪) বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য কর্মিগোষ্ঠী।

১. জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) : ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। সব যুক্তরাষ্ট্রেই একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কিছু সংখ্যক রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকার থাকে। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেরই সৃষ্টি এবং পরিকল্পনা কমিশনের কাজ সারা দেশের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা। দেশটা যদি এককেন্দ্রিক হত অর্থাৎ দেশে একটি মাত্র সরকার বিরাজ করতো সে ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন যে পরিকল্পনা রচনা করতো তাতে আপত্তি বা মতবিরোধের কোনো প্রশ্নই থাকতো না। কিন্তু ভারতে শুধুমাত্র একটি কেন্দ্রীয় সরকারই নেই, তার পাশাপাশি বহুসংখ্যক রাজ্য সরকারও রয়েছে। তাই যে কোনো দেশজোড়া পরিকল্পনায় স্বাভাবিক কারণেই রাজ্যসরকারগুলির সক্রিয় অংশ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ কারণে পরিকল্পনা কমিশন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে পরিকল্পনা রচনায় সহযোগিতার ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কাজ সম্পাদিত হয় জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে।

(ক) **জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের গঠন** (Composition) : ভারতের প্রধান মন্ত্রী, ভারতের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। উন্নয়ন পরিষদের সভাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রী অংশ গ্রহণ করে থাকেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পরিকল্পনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

(খ) **জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কার্যাবলী** (Functions) : পরিষদের প্রধান কাজ হল : (১) মাঝে মাঝে জাতীয় পরিকল্পনার সম্পাদিত কাজের পুনর্বিচার করা ; (২) জাতীয় উন্নয়নের সাথে জড়িত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির বিবেচনা করা ; (৩) জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যথাযথ সুপারিশ করা ; (৪) পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা সুনিশ্চিত করা ; (৫) পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কাজকর্মের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ; (৬) জনসাধারণের পশ্চাৎপদ অংশের ও দেশের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির পূর্ণতম বিকাশ সুনিশ্চিত করা ; এবং (৭) জাতীয় উন্নয়নের জন্য সঙ্গতি সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

(গ) **জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মূল্যায়ন** (Evaluation) : জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বাস্তব ক্ষমতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

(১) জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ বস্তুতপক্ষে একটি পরামর্শমূলক (consultative) প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কোনো সংবিধিবদ্ধ কর্তৃত্ব (statutory authority) নেই। এর কাজ কেবলমাত্র পরামর্শ বা উপদেশদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

(২) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কোনো পরিকল্পনার খসড়া রচিত হবার পর সে খসড়া অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের একটি অথবা দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আচার পালন বা নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া এ সব সভার আর কোনো গুরুত্ব বা বাস্তব মূল্য নেই বলেই অনেকে মনে করেন। তার কারণ, প্রায়শই দেখা যায়, এ সব সভায় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের প্রকল্পগুলির জন্য আরও বেশি অর্থসাহায্য মঞ্জুর করার দাবিতে

সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য আরও বেশি সম্বল যাতে বরাদ্দ করা হয় তার জন্য সভাকে প্রবলভাবে অনুরোধ করে থাকেন। তাই অনেকের মতে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ একটা আলোচনার মঞ্চ ছাড়া আর কিছু নয়। খসড়া পরিকল্পনার সামান্যতম পরিবর্তন সাধন করার কোনো আইনগত ক্ষমতাই পরিষদের নেই। এ কারণে বলা হয়, জাতীয় পরিকল্পনা রচনায় রাজ্যগুলির কোনো মতামত বা বক্তব্য রাখার সুযোগ ভারতের বর্তমান পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখা হয়নি। এ ব্যাপারে সামান্য ক্ষমতা যেটুকু রাজ্যগুলি ভোগ করে তা হল তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের পরিকল্পনা রচনা করে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পাঠাতে পারার সুযোগ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যগুলি কর্তৃক প্রেরিত রাজ্যপরিকল্পনাগুলি পরিকল্পনা কমিশনকে গ্রহণ করতেই হবে তেমন কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা কমিশনের নেই।

২. **গবেষণা কার্যসূচি কমিটি** (Research programmes Committee)**:** প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে অগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদ ও গবেষক বিজ্ঞানীদের নিয়ে গবেষণা কার্যসূচি কমিটি স্থাপিত হয়। উন্নয়নের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিকগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রকল্পের সূচনা করে এ সব কাজের জন্য কমিটি প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেয়। এ কমিটির পক্ষে যে সব প্রতিষ্ঠান গবেষণার দায়িত্ব নেয়, সেগুলির মধ্যে আছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ, ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ, ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লায়েড্ ম্যানপাওয়ার রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউনসিল অব সোস্যাল সায়েন্সস্ রিসার্চ ইত্যাদি।

৩ **উপদেষ্টা সংস্থাসমূহ** (Advisory Bodies)**:** পরিকল্পনা কমিশনের কাজে উপদেষ্টা সংস্থাসমূহের এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়। যে সব বিষয়ে এরা সাহায্য দেয় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শক্তি উৎপাদন প্রকল্প, কৃষি, ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, আবাসন, আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রভৃতি। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে ১৮ জন বিশেষজ্ঞ যুক্ত আছেন। এ ছাড়া রয়েছে সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত পরামর্শদাতা কমিটি (Consultative Committee of Parliament) এবং প্রধানমন্ত্রীর বিধিবহির্ভূত পরামর্শদাতা কমিটি (Informal Consultative Committee)। উপরন্তু, পরিকল্পনা কমিশন কোনো পরিকল্পনা রচনার আগে ও পরে শিল্প ও কারবারের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি, ভারতীয় বণিক সভা, অখিল ভারত উৎপাদক সংস্থা প্রভৃতি ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ আলোচনা করে।

৪ **কর্মিগোষ্ঠী** (Working Groups)**:** পরিকল্পনা রচনার প্রাক্কালে কমিশন কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মিগোষ্ঠী গঠন করে। কর্মিগোষ্ঠীগুলি কৃষি, জ্বালানি, সার, উপকরণ, শিক্ষা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তথ্যানুসন্ধান করে প্রতিবেদন তৈরী করে। এই প্রতিবেদনসমূহ পরিকল্পনা রচনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ষষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ২১টি কর্মিগোষ্ঠী নিয়োগ করা হয়েছিল।

পরিকল্পনা সংস্থার সম্পাদিত কার্য: মূল্যায়ন (Working of the Planning Machinery**:** An Appraisal)**:** সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন যে স্থানে অধিষ্ঠিত সেটি বস্তুতপক্ষে অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। পরিকল্পনা রচনার মত অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এই কমিশনের উপরেই ন্যস্ত। সরকারের কার্যসূচি প্রণয়নে ও নীতি নির্ধারণের বিষয়ে এ প্রতিষ্ঠান বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কার্যসূচি ও নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারেও কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এমন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী যে পরিকল্পনা কমিশন, সেই কমিশনের গঠন বা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভারতের সংবিধানে কোনো কথাই নেই। এমন কি ওই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পিছনেও সংবিধানের অনুমোদন বলে কিছু নেই বা তেমন অনুমোদনের প্রয়োজনও কোনো স্তরেই অনুভূত হয় না।

সাফল্য (Achievement)**:** পরিকল্পনা কমিশন ৩৬ বৎসরের কার্যকালে বহুক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে কমিশনের সাফল্যের বর্ণনা নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যায়:

(ক) অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক রচিত সাতটি পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ভারতের নিশ্চল অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে। অর্থনীতির প্রায় সব কয়টি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের অভূতপূর্ব উন্নয়ন, শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ, অর্থনীতির অন্তর্কাঠামোর (infra-structure) দেশজোড়া

ব্যাপ্তি এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর তার প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল উৎকর্ষলাভ—এগুলি যে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(খ) পরিকল্পনা কমিশনের হস্তক্ষেপের ফলেই বিভিন্ন পরিকল্পনায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তা নির্ধারিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অর্থ কি অনুপাতে বণ্টিত হবে, কোন্ ক্ষেত্র কতটা অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কমিশন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষেত্রগত ভারসাম্য (sectoral balance) স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহায্য করেছে।

(গ) পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির উন্নয়নকল্পে রচিত গ্যাডগিল্ সূত্র (Gadgil Formula) উদ্ভাবনে পরিকল্পনা কমিশনের খুব বড় অবদান ছিল। এই সূত্র প্রবর্তনের ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু পরিকল্পনা ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়েছে।

(ঘ) পরিকল্পনা কার্যসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মূল্যায়ন বিভাগ, প্রকল্প সমীক্ষা বিভাগ, কার্যসূচি মূল্যায়ন সংস্থা ইত্যাদি।

(ঙ) সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে গবেষণায় উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রিসার্চ প্রোগ্রামস্ কমিটি স্থাপন কমিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এ কমিটি সারা দেশে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

কমিশনের উপরে বর্ণিত সাফল্য সত্ত্বেও কমিশনকে নিম্নলিখিত ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য সমালোচনাও করা হয়েছে।

সমালোচনা (Criticism)ঃ (১) পরিকল্পনা কমিশন সংবিধান অনুসারে বিধিবদ্ধ কোনো সংস্থা নয়। ১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি প্রস্তাবে এ কমিশন স্থাপিত হয়। সমালোচকেরা কমিশনকে 'সমান্তরাল মন্ত্রিসভা', 'গাড়ির পঞ্চম চাকা', 'অতি মন্ত্রিসভা' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন একটি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান এবং এর কোনো আইনসম্মত মর্যাদাও (status) নেই। তৎসত্ত্বেও এর যাবতীয় পরামর্শ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মতই গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকসমূহ ও রাজ্য সরকারগুলিকে সেই সব পরামর্শ রূপায়িত করতে হয়। এই পরিকল্পনা কমিশন এমনই ক্ষমতাশালী যে এর পরামর্শে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ফাইন্যান্স কমিশনের মত সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের উপদেশও পরিবর্তন করে।

(২) পরিকল্পনা কমিশনের গঠনের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় না। যেমন—কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত হবে, সদস্যদের গুণাবলী ও যোগ্যতার মান কি হবে, তাদের কার্যকলাপের ব্যাপ্তিই বা কি হবে—এ সব বিষয়ে কোনো সঠিক ও সুস্পষ্ট নীতি অদ্যাবধি নির্ধারিত হয় নি। কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নয় বলে এর গঠন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপর। তার ফলে কমিশন সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অংশ হয়েই বিরাজ করছে, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে অর্থনীতির লক্ষ্য নির্ধারক ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

(৩) পরিকল্পনা কমিশনের একটা বড় ত্রুটি হল, এটি শুধু পরিকল্পনা রচনার কাজেই যুক্ত থাকে, পরিকল্পনার রূপায়ণে এর কোনো ভূমিকাই থাকে না; সে ভূমিকা নেয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। এর অর্থ হল, ভারতের পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণ দুটি আলাদা কর্তৃত্বের উপর ন্যস্ত। এটা সমগ্র পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটা বড় দুর্বলতা।

(৪) ইদানীং একটা কারণে পরিকল্পনা কমিশনকে সমালোচনা করা হচ্ছে। প্রথমদিকে বেশ কয়েকটি কমিশন বিভিন্ন উপদেষ্টা দল ও বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর সাথে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে পরিকল্পনা রচনা করত। এটাই ছিল সাধারণ রীতি। কিন্তু ডি. আর গ্যাডগিল কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়ে এ রীতিটি বাতিল করে দেন। এর ফলে দেশের বেসরকারী মতামতের ও চিন্তাধারার সাথে কমিশনের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। এ কারণে, কমিশন আজ একটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না।

(৫) পরিকল্পনা কমিশন সংবিধিবদ্ধ (statutory) প্রতিষ্ঠান নয় বলে পরিকল্পনার রূপায়ণে সাফল্য বা ব্যর্থতা কোনোটিরই দায়িত্ব কমিশনের উপর বর্তায় না। এর ফলে এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে ক্ষমতা ভোগের সাথে দায়িত্ব পালনের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এর কুফল হল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যর্থতার জন্য অন্যের উপর দোষারোপ করে রেহাই পাবার চেষ্টা করে।

(৬) পরিকল্পনা কমিশনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ হল, জাতীয় পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে, পরিকল্পনা কমিশনের গঠনের ব্যাপারে অথবা কমিশনের দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে রাজ্যগুলির মতামত জানাবার বা বক্তব্য রাখার কোনো সুযোগ নেই। বস্তুতপক্ষে কমিশন সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অধীন। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতির বিরোধী।

(৭) রাজ্যগুলিকে দেয় আর্থিক সাহায্য ও অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করার ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সেটা খুবই ত্রুটিপূর্ণ, অসন্তোষজনক পক্ষপাতমূলক—এই অভিযোগে কমিশনকে সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে সব রাজ্য তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে স্ফীত করে দেখায় তারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুরূপ (matching) অনুদান পায়। আবার, যে সব রাজ্য যত বেশি রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে সব রাজ্য আর্থিক সাহায্য বা অনুদানও সেই পরিমাণে পায়। এ পদ্ধতি আর যাই হোক না কেন ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এটা যে অক্ষম সে বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই।

(৮) ভারতের পরিকল্পনা সংস্থার (planning machinery) প্রধান ত্রুটি হল ভারতে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যস্তরে কোথাও এমন কোনো সুসম্বদ্ধ সমীক্ষা ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (monitoring system) নেই যার সাহায্যে কমিশন পরিকল্পনার কার্যসূচির রূপায়ণে সাফল্য বা ব্যর্থতা বা প্রকল্পগুলির অগ্রগতি বা সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ নির্দেশ ও উপদেশ দিতে সক্ষম হয়। কমিশন প্রথম দুটি পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের (mid-term appraisal) ভিত্তিতে প্রতিবেদন রচনা করেছিল। পরবর্তীকালে আর কোনো পরিকল্পনার এ ধরনের মধ্যবর্তী প্রতিবেদন তৈরী করা হয় নি। তার ফলে নিয়মাবদ্ধ (statutory) মূল্যায়ন ও সতর্কীকরণের যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে কার্যসূচি রূপায়ণের ত্রুটি ও দুর্বলতা নির্দেশ করা যাচ্ছে না, পরিকল্পনার মধ্যে অসঙ্গতি দূর করে সামঞ্জস্য বিধানের কার্যকর পন্থাও উপস্থাপন করা যাচ্ছে না।

গঠনমূলক সুপারিশ (constructive suggestions) **:** ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে পরিকল্পনা কমিশনের কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কি করা উচিত সে সম্পর্কে প্রশাসন সংস্কার কমিশন (Administrative Reforms Commission) এবং কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্ ও বিশেষজ্ঞ কিছু কর্মপন্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। তাঁদের সুপারিশগুলি এভাবে বর্ণনা করা যায় :

(ক) একটি সংবিধিবদ্ধ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিকল্পনা কমিশনকে গড়ে তুলতে হবে। কমিশনের সদস্যরা হবেন সর্বক্ষণের কর্মী এবং তাদের কার্যকাল হবে নির্দিষ্ট। একটি সত্যিকারের পরিকল্পনা কমিশনের যে কাজ হওয়া উচিত ভারতের পরিকল্পনা কমিশনকেও সেই কাজেই নিযুক্ত থাকতে হবে। যেমন—কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ হিসাবে কাজ না করে কমিশন কতকগুলি পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে, ক্ষেত্রগত ভারসাম্য স্থাপনের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কার্যসূচি প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনা রূপায়ণের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে।

(খ) পরিকল্পনা রচনার পর কমিশনের অন্যতম কাজ হবে পরিকল্পনা রূপায়ণে কতটুকু সাফল্য অর্জিত হল সে সম্পর্কে নিরীক্ষা করা, প্রয়োজনে সতর্ক করে দেওয়া, মূল্যায়ন করা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনার কোনো পরিবর্তনসাধন উচিত কিনা সে সম্পর্কে সুপারিশ করা।

(গ) পরিকল্পনা কমিশনের কর্তব্য হবে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহের জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। কমিশনের অপর একটি অপরিহার্য কাজ হবে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, সমাজ-বিজ্ঞানী, শিল্প, বাণিজ্য ও কারবার প্রভৃতি পেশা ও বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজনীতিক দলের সদস্য এবং সংসদ সদস্য প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী ও মর্যাদা-সম্পন্ন মানুষদের পরিকল্পনার কাজে গভীরভাবে বিজড়িত করা।

(ঘ) রাজ্যগুলির উন্নয়ন বাবদ কি পরিমাণ অনুদান দেওয়া হবে পরিকল্পনা কমিশন তা নিয়েই মাথা ঘামাবে, উন্নয়ন-বহির্ভূত অনুদানের বিষয়ে কমিশন নিজেকে জড়াবে না।

(ঙ) পরিশেষে, পরিকল্পনার ব্যাপারে রাজ্যগুলিরও কিছু করণীয় আছে। প্রত্যেক রাজ্যে পরিকল্পনা কমিশনের মত একটি করে রাজ্য পরিকল্পনা পরিষদ (State Planning Board) স্থাপন করা দরকার। এ সব পরিষদের সদস্যরা হবে সর্বক্ষণের কর্মী, এবং এদের কার্যকাল থাকবে নির্দিষ্ট। এ সব পরিষদের কাজ হবে রাজ্যস্তরে পরিকল্পনা রচনা করা এবং প্রয়োজনমত সেটা পুনরীক্ষণ করা। এ কাজের উদ্দেশ্য হবে পরিকল্পনা কমিশনকে সাহায্য করা। রাজ্যস্তরে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে জেলাস্তরে এবং গ্রামস্তরে প্রসারিত করতে হবে যাতে স্থানীয় প্রয়োজন, স্থানীয় উপকরণ ও স্থানীয় অসুবিধাগুলি বিশেষভাবে বিবেচিত হতে পারে।

১০.২. ভারতে পরিকল্পনা রচনার প্রক্রিয়া The Indian Planning Process

১. ভারতে পরিকল্পনার রচনা প্রক্রিয়া কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। এ স্তরগুলি অতিক্রম করে পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপ লাভ করে। পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপটি ভারতীয় সংসদের অনুমোদন লাভ করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তিত হয় এবং তার রূপায়ণের কাজ শুরু হয়।

২. **প্রথম স্তর:** চূড়ান্ত আকারে পরিকল্পনা রচিত হবার তিন বছর বা ঐ রকম সময়ের আগেই এ স্তরটি শুরু হয়। এ স্তরে পরিকল্পনা কমিশন দেশের অর্থনীতির বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে সব রকমের তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে। যে সব সামাজিক, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে সে সব দুর্বলতা কিভাবে দূর করা যায় সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি সুপারিশ সহ একটি প্রতিবেদন পরীক্ষা ও বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের[১] নিকট পেশ করে। পরিষদ প্রতিবেদনটি গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে পরিকল্পনাকালে অর্থনীতিক উন্নয়নের হার কতটা হওয়া সম্ভব এবং কতটা হবে বলে অনুমান করা হবে, পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ লক্ষ্যগুলি বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে—এ সব প্রশ্নে পরামর্শ দেবে। এ স্তরে পরিকল্পনার আয়তন কি হবে সে সম্পর্কে পরিষদ সুনির্দিষ্ট কোনো সুপারিশ করে না।

৩ **দ্বিতীয় স্তর:** এই স্তরে পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভিন্ন ভিন্ন কর্মিগোষ্ঠী তৈরী করে। এ সব কর্মিগোষ্ঠীর প্রধান কাজ হল পরিকল্পনার বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্পর্কে বিচার করা। এ উদ্দেশ্যে অর্থনীতির এক একটি ক্ষেত্রের দায়িত্ব এক একটি কর্মিগোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত করা হয়। [উদাহরণ: তৃতীয় পরিকল্পনার রচনাপর্বে আর্থিক সম্বল, কৃষি, সেচ, শক্তি, ইস্পাত, জ্বালানি, সাধারণ শিক্ষা, প্রযুক্তিবিদ্যাগত শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, আবাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমাজের পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ—এ সব বিষয়ের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন কর্মিগোষ্ঠীর উপর অর্পণ করা হয়। কর্মিগোষ্ঠীর অন্যতম কাজ হল অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা নির্ধারণ করা, কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি বা দুর্বলতা দেখা গেলে সেগুলি নির্দেশ করা।

কেন্দ্রের কর্মিগোষ্ঠীর মতো নিজ নিজ কর্মিগোষ্ঠী গঠন করতে রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়। রাজ্যস্তরে কর্মিগোষ্ঠীর প্রধান কাজ হল নিজ রাজ্যে পরিকল্পনার রূপ কেমন হবে সে সম্পর্কে বিবরণ তৈরী করা।

কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে একদিকে যেমন কর্মিগোষ্ঠীর কাজ চলতে থাকে অন্য দিকে তেমনি পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও কর্মী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্যানেল তৈরী করে। প্যানেলের বিশেষজ্ঞ ও কর্মীরা কেউই সরকারী পদাধিকারী নয়। [উদাহরণ: তৃতীয় পরিকল্পনা রচনায় অর্থনীতিবিদদের প্যানেল, বৈজ্ঞানিকদের প্যানেল, কৃষি, ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও সামাজিক কল্যাণ—এগুলির প্রত্যেকটিতে পরামর্শ দেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যানেল তৈরী করা হয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায়ও এ ধরনের অনেকগুলি প্যানেল তৈরী করা হয়। উপরন্তু, একটি জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদও (National Development Council) গঠন করা হয়েছিল। এই পরিষদ গঠিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে। কাজের সুবিধার জন্য এই পরিষদ ১২টি স্টাডি গ্রুপ স্থাপন করে। চতুর্থ পরিকল্পনার উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা সমস্যা নিয়ে স্টাডি গ্রুপগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে অনেক মূল্যবান সুপারিশ করে।

এ সব কর্মিগোষ্ঠী ও প্যানেলসমূহের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশন খসড়া স্মারকপত্র তৈরী করে। তাতে পরবর্তী পরিকল্পনার আয়তন সম্পর্কে পূর্বাভাষ থাকে। যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণের জন্য উচ্চপর্যায়ের আলোচনা দরকার সে বিষয়গুলির উল্লেখ ঐ স্মারকপত্রে করা হয়। পরিকল্পনার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমস্যার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে—সে সম্পর্কেও প্রতিবেদন দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খসড়া স্মারকলিপিতে বেসরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো আলোচনা থাকে না, থাকে শুধু এ ক্ষেত্রের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন লক্ষ্য ও ব্যয় বরাদ্দের তালিকা।

বিস্তৃত আলোচনার জন্য খসড়া স্মারকলিপিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করা হয়। এর পর জাতীয়

---

[১] ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্য সরকার সমূহের মুখ্যমন্ত্রিগণ ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

উন্নয়ন পরিষদের নিকট স্মারকপত্রটি উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের নতুন কোনো প্রস্তাব বা মন্তব্য থাকলে সেই প্রস্তাব ও মন্তব্যাদির ভিত্তিতে পরিকল্পনার একটি খসড়া রূপরেখা তৈরী হয়। খসড়াটি তৈরী করে স্বয়ং পরিকল্পনা কমিশন।

৪. **তৃতীয় স্তর :** পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা প্রণয়নের সাথেই তৃতীয় স্তরের শুরু। এ খসড়াটি স্মারক-পত্রের খসড়া থেকে আরো অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে, অনেক বেশি খুঁটিনাটি নিয়ে রচিত। পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী—সব কিছুই সুস্পষ্ট রূপ পায় ঐ খসড়ায়। পরিকল্পনার খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে তাদের পর্যালোচনা ও মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিচার-বিবেচনার পর খসড়াটি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে পাঠানো হয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন লাভ করার পর খসড়াটি জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা ও তাদের মতামতের জন্য প্রকাশ করা হয় এবং সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছ থেকে খসড়া পরিকল্পনার উপর মতামত আহ্বান করা হয়। খসড়ার উপর আলোচনা যাতে জিলাস্তর পর্যন্ত হতে পারে সে জন্য রাজ্য সরকারগুলি জিলা উন্নয়ন পরিষদের ও ঐ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আলোচনার ব্যবস্থা করে। জাতীয় স্তরে আলোচনা হয় সংসদের উভয়কক্ষে। সংসদে ঐ আলোচনা প্রথম হয় সাধারণভাবে, পরে ভিন্ন ভিন্ন সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে বিশদভাবে।

৫ **চতুর্থ স্তর :** সারা দেশে বিভিন্ন স্তরে যখন খসড়া পরিকল্পনার আলোচনা চলতে থাকে সেই সময় প্ল্যানিং কমিশন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনায় রত হয়। যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলি হল, রাজ্যগুলির পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের সূত্র, অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহের প্রস্তাবাদি, উন্নয়নের যাবতীয় বিশদ কার্যসূচি। প্রতিটি রাজ্যের পরিকল্পনার বিষয়গুলি ঐ সব রাজ্যের বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

৬. **পঞ্চম স্তর :** এ স্তরে প্ল্যানিং কমিশন রাজ্যগুলির সাথে আলোচনা করে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মতামত নিয়ে, বিভিন্ন কর্মিগোষ্ঠী ও প্যানেলসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে একটি নতুন স্মারকলিপি তৈরী করে। এ স্মারকলিপিতে পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য-গুলি তুলে ধরা হয় এবং কোন্ নীতির উপর জোর দেওয়া হবে ও কোন্ বিষয়গুলির সম্পর্কে আরো বেশি আলোচনা হওয়া দরকার—এ সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়।

তারপর, নতুন স্মারকপত্রটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে তাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।

৭. **ষষ্ঠ স্তর :** জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেয়। চূড়ান্ত পরিকল্পনায় তার লক্ষ্য, কার্যসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়। এর উপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলির ও রাজ্য সরকারগুলির মতামত ও অতিরিক্ত সুপারিশ (যদি কিছু থাকে) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের নিকট শেষবারের মতো উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন পাবার পর পরিকল্পনাটিকে প্রকাশ করা হয় এবং এটিকে সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের উভয় কক্ষের অনুমোদন লাভের পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি চূড়ান্তরূপ প্রাপ্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, পরিকল্পনা কমিশনের মূল দায়িত্ব হল পরিকল্পনা রচনা করা। তাই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে কমিশনের কোনো ভূমিকা থাকে না। এ ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়-সমূহের ও রাজ্য সরকারগুলির। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারগুলি পরিকল্পনার কার্যসূচি কতটা রূপায়িত করতে পারলো সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন সব সময় দৃষ্টি রাখে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি অনুরোধ করলে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা রূপায়ণের বিষয়ে পরামর্শও দেয়।

১০ ৩. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)
The First Five-Year Plan (1951-56)

১. **প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives) :** প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুটি : (১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে অর্থনীতির যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে তার পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং (২) একই সঙ্গে জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য সুষম ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন কর্মপ্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

২. **পরিকল্পনার ব্যয় (Outlay) :** প্রথমে এই পরিকল্পনায় ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে ধরা হয়েছিল। পরে সংশোধিত হিসাবে ২,৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে

বলে স্থির হয়। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় প্রকৃত ব্যয় হয় ১,৯৬০ কোটি টাকা।

	অনুমিত ব্যয় কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতকরা ভাগ	প্রকৃত ব্যয় কোটি টাকা
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৫৪	১৪'৯	২৯০
সেচ ও শক্তি	৬৭৭	২৭'২	৫৭০
শিল্প ও খনিজ	১৮৮	৭'৯	১১৭
পরিবহণ ও সংসরণ	৫৭১	২৪'০	৫২৩
সমাজসেবা	৫৩২	২২'৪	৪৫৯
বিবিধ	৮৬	৩'৬	
	২,৩৭৮	১০০'০	১,৯৬০

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ এবং শক্তি উৎপাদনের উপরে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়। পরিবহণ ও পুনর্বাসনের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইগুলির উপরে গুরুত্ব আরোপ করার ফলে স্বভাবতই শিল্পের জন্য অধিক বিনিয়োগ সম্ভব হয়নি। ফলে শিল্প সম্প্রসারণের ভার প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

৩ **অর্থ সংগ্রহের সূত্র** (Sources) ঃ প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়ের পরিমাণ ১,৯৬০ কোটি টাকা। এই টাকা কিভাবে সংগৃহীত হয় তা নিচে দেওয়া হল।

	কোটি টাকা	শতকরা
বর্তমান রাজস্ব ও রেলপথ থেকে উদ্বৃত্ত	৭৫২	৩৮
বাজার থেকে ঋণ	২০৫	১১
স্বল্প সঞ্চয়	৩০৪	১৬
মূলধনী খাতে অন্যান্য প্রাপ্তি	১৭৮	৯
বিদেশ থেকে সাহায্য	১৮৮	১০
ঘাটতি ব্যয়	৩৩৩	১৬
	১,৯৬০	১০০

১০.৪ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) The Second Five Year Plan (1956-61)

১. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** (Aims and Objectives) ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ঃ (১) দেশে জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। (২) শিল্পায়নের দ্রুততর গতি অর্জন, বিশেষ করে বুনিয়াদী ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপরে প্রধান গুরুত্ব আরোপ। (৩) কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি। (৪) আয় এবং সম্পদ ভোগে অসাম্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টন।

২. **বরাদ্দ ব্যয়** (Outlay) ঃ প্রথমে সরকারী ক্ষেত্রে মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের লক্ষ্য নিয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরু হয়। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই প্রতিকূল অবস্থার দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনার দারুণ সংকট দেখা দেয়। এই অবস্থায় সরকার দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়। নিচের মূল বরাদ্দ ও সংশোধিত বরাদ্দ দেখানো হল ঃ

	মূল বরাদ্দ কোটি টাকা	সংশোধিত চূড়ান্তরূপ কোটি টাকা
কৃষি	৫৬৮	৫৩০
সেচ ও শক্তি	৯১৩	৮৬৫
শিল্প ও খনিজ	৮৯০	৯০০
পরিবহণ ও সংসরণ	১,৩৮৫	১,৩০০
সামাজিক সেবা	৯৪৫	৮৫০
বিবিধ	৯৯	
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প		১৭৫
	৪,৮০০ (কোটি টাকা)	৪,৬০০ (কোটি টাকা)

৩ **অর্থ-সংস্থান** (Financing Pattern) ঃ বরাদ্দ ব্যয়ের মত অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রেও মূল পরিকল্পনা ও প্রকৃত সংগ্রহে কিছু পার্থক্য ঘটে ঃ

	প্রথম হিসাব (কোটি টাকায়)	প্রকৃত হিসাব (কোটি টাকায়)
চলতি রাজস্ব থেকে	৩৫০	−৫০
রেলপথ	১৫০	১৫০
জনসাধারণ থেকে ঋণ	৭০০	৭৮০
স্বল্প সঞ্চয়	৫০০	৪০০
বিবিধ মূলধনী খাতে ও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে	২৫০	২৩০
অতিরিক্ত কর	৪৫০	১,০৫২
বিদেশী ঋণ সাহায্য	৮০০	১,০৯০
ঘাটতি আয়	১,২০০	৯৪৮
আরও সংগ্রহ করতে হবে	৪০০	
	৪,৮০০	৪,৬০০

১০.৫. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) Third Five-Year Plan (1961-66)

১ **লক্ষ্য** (Aims) ঃ (১) জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ হারে বাৎসরিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের এই হার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও যাতে বজায় থাকে সেভাবে

বিনিয়োগ করা। (২) খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার মত কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধিসাধন। (৩) যাতে আগামী দশ বৎসর বা ঐ রকম সময়ের মধ্যে দেশের নিজস্ব সম্পদ দ্বারাই শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, জ্বালানি ও শক্তি উৎপাদনকারী মূল শিল্পের সম্প্রসারণ এবং যন্ত্র-নির্মাণ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা। (৪) দেশের মানবিক সম্পদের যথাসম্ভব পূর্ণতম ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের অধিকতর সম্প্রসারণ। (৫ সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে অধিকতর সাম্য আনয়ন এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের হ্রাস ও অর্থনীতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টন।

২ **সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ও ব্যয় বণ্টন** (Pattern of outlay : Public sector) :

	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	শতাংশ	প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১,০৬৮	১৪	১,১০৩
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১,৬৬২	২২%	১,৯১৯
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৮	৪%	২২০
সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	১,৫২০	২০%	১,৭৩৫
পরিবহণ ও সংসরণ	১,৪৮৬	২০%	২,১১৬
সমাজসেবা ও অসুবিধা	১,৩০০	১৭%	১,৫০২
অন্যান্য	২০০	৩%	১১৬
মোট ব্যয়	৭,৫০০	১০০%	৮,৬৩১

মোট ব্যয়, ৭,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয় (investment) ৬,৩০০ কোটি ও চলতি ব্যয় (current outlay) ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে ধরা হয়।

৩. **বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ও ব্যয় বণ্টন** (Pattern of outlay : Private sector) :

		মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১.	কৃষি (সেচ সহ	৮৫০	৮০০
২.	শক্তি	৫০	৫০
৩	পরিবহণ ও সংসরণ	২৫০	২৫০
৪.	গ্রামীণ ও কুটির শিল্প	৩২৫	২৭৫
৫.	বৃহৎ, মাঝারি আয়তন শিল্প ও খনিজ	১,১০০	১,০৫০
৬.	গৃহনির্মাণ ইত্যাদি	১,১২৫	১,০৭৫
৭.	মজুত দ্রব্য	৬০০	৬০০
	মোট	৪,৩০০	৪,১০০

৪. **সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় : অর্থসংস্থানের ধাঁচ** (Public sector outlay : Financing pattern) : সরকারী ক্ষেত্রে মোট ৭,৫০০ কোটি টাকা সংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। কিন্তু পরে পরিকল্পনা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৫৭৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং ঐ পরিমাণ অর্থসংস্থান করতে হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থসংস্থানের লক্ষ্য কি ছিল এবং প্রকৃত পক্ষে তা থেকে কত টাকা সংগৃহীত হয়েছিল তা নিচে দেখান হল :

	প্রাথমিক হিসাব (কোটি টাকায়)	প্রকৃত আদায় (কোটি টাকায়)
চলতি রাজস্ব থেকে	৫৫০	−৪১৯
সরকারী কারবারের আয়	৪৫০	৩৭৩
রেলপথ	১০০	৬২
অতিরিক্ত কর	১,৭১০	২,৮৯২
জনসাধারণ থেকে ঋণ	৮০০	৮২৩
স্বল্পসঞ্চয়	৬০০	৫৬৫
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বিবিধ মূলধনী খাতে আদায়	৫৪০	৭২৫
মোট আভ্যন্তরীণ উৎস	৪,৭৫০	৫,০২১
বিদেশী ঋণ সাহায্য	২,২০০	২,৪২৩
ঘাটতি ব্যয়	৫০০	১,১৩৩
সর্বমোট	৭,৫০০	৮,৫৭৭

১০.৬. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬৯-৭৪) The Fourth Five Year Plan (1969-74)

১ তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সময়ে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা এবং টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের দরুন চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তখন স্থির হয় যে ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮ ৬৯ সাল, এই তিন বৎসর, একটি একটি করে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ হবে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হবে। ইতোমধ্যে ১৯৬৭ সালে পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত হয়, এবং নতুনভাবে চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হয়।

২. সরকারী ক্ষেত্রে ১৫,৯০২ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৮,৯৮০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ২৪,৮৮২ কোটি টাকার বরাদ্দ নিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনা রচিত হয়।

৩. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives) :** দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে ক্রমাগত অগ্রগতি এবং একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়। বলা হয়, এজন্য দেশের সম্পদের সুদক্ষ ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষ ও বিশেষত সমাজের দুর্বলতর অংশগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে জনসাধারণের জীবনধারণের মান বাড়াতে হবে।

৪. **ব্যয়বরাদ্দ (Outlay) :** পরিকল্পনার জন্য মোট ২৪,৮৮২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। তার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ১৫,৯০২ কোটি টাকা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ৮,৯৮০ কোটি টাকা ধরা হয়। সরকারী মোট ব্যয় ১৫,৯০২ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয় ১৩,৬৫৫ কোটি টাকা আর ২,২৪৭ কোটি টাকা চলতি খরচ।

বিভিন্ন খাতে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ

খাত	কোটি টাকায়	শতাংশ	তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয় (কোটি টাকায়)
কৃষি	২,৭২৮	১৭.১	১,০৮৮.৯
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১,০৮৭	৬.৮	৬৬৪.৭
শক্তি	২,৪৪৭	১৫.৪	১,২৫২.৩
গ্রাম্য ও কুটির শিল্প	২৯৩	১.৮	২৩৬.০
শিল্প ও খনিজ	৩,৩৩৮	২১.০	১,৭২৬.৩
পরিবহণ ও সংসরণ	৩,২৩৭	২০.৩	২,১১১.৭
শিক্ষা	৮২৩	৫.২	৫৮৮.৭
বৈজ্ঞানিক গবেষণা	১৪০	০.৯	৭১.৬
স্বাস্থ্য	৪৩৫	২.৭	২২৫.৯
পরিবার পরিকল্পনা	৩১৫	২.০	২৪.৯
পানীয় জল ও জনস্বাস্থ্য	৪০৬	২.৬	১০৫.৭
গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়ন	২৩৭	১.৫	১২৭.৬
অনুন্নত শ্রেণীগুলির কল্যাণ	১৫২	০.৯	১০০.৪
সামাজিক কল্যাণ	৪২	০.৩	১৯.৪
শ্রমকল্যাণ ও কারিগরী শিক্ষণ	৪০	০.৩	৫৫.৮
অন্যান্য	১৯২	১.২	১৭৩.১
মোট	১৫,৯০২	১০০	৮,৫৭৩

চতুর্থ পরিকল্পনায় (১) কৃষি ও সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ২) শিল্প ও খনিজ এবং (৩) পরিবহণ ও সংসরণ খাতেই সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রথমটির জন্য মোট ব্যয়ের ২৩.৯ শতাংশ, দ্বিতীয়টির জন্য ২১ শতাংশ ও তৃতীয়টির জন্য ২০.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয় এবং এই তিনটি মিলে মোট বরাদ্দের ৬৫.২ শতাংশ হয়।

৫. **অর্থসংস্থান (Sources of Finance) :** সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় বরাদ্দ ১৫,৯০২ কোটি টাকা ও প্রকৃত সংগ্রহের তথ্য নিচে দেওয়া হল :

উৎস	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	প্রকৃত সংগ্রহ (কোটি টাকা)
১. অভ্যন্তরীণ উৎস (চলতি রাজস্ব, সরকারী কারবারগুলির উদ্বৃত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফা, বাজার থেকে সরকারী ঋণ, স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য মূলধনী খাতে সংগৃহীত অর্থ)	৮,৭৩৪	৬,৯০০
২. অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত সংগ্রহ (অতিরিক্ত কর প্রভৃতির দ্বারা)	৩,১৯৮	৪,২৮০
৩. জীবনবীমা ও অন্যান্য সরকারী কারবার থেকে ঋণ	৫০৬	৮৩৩
অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মোট	১২,৪৩৮	১২,০১৩
৪. বৈদেশিক সাহায্য (পি-এল ৪৮০ ও অন্যান্য)	২,৬১৪	২,০৮৭
৫. ঘাটতি ব্যয় (অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে)	৮৫০	২,০৬০
সর্বমোট	১৫,৯০২	১৬,১৬০

এই মোট ব্যয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগ্রহ লক্ষ্য ছিল ৯,২৯৬ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকারগুলির সংগ্রহ লক্ষ্য ছিল ৬,৮০৬ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ৭৮.২ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, ১৬.৫ শতাংশ বিদেশী সাহায্য থেকে এবং ৫.৩ শতাংশ ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা সংস্থান করা হবে বলে স্থির হয়।

১০.৭. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯) The Fifth Five-Year Plan (1974-79)

(ক) **উদ্দেশ্য (Objectives)**: পঞ্চম পরিকল্পনার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—১. দারিদ্র্য দূর করা এবং ২. স্বনির্ভরতা লাভ করা। এই দুটি উদ্দেশ্য সফল করতে হলে চাই—৩. উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ৪. জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আয়-বৈষম্য হ্রাস, এবং ৫. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হারের যথেষ্ট বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে হলে প্রয়োজন হবে উচ্চতর মাত্রায় বিনিয়োগের এবং উচ্চতর স্তরের দক্ষতার। স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করতে হলে চাই উচ্চতর মাত্রায় বিনিয়োগের পাশাপাশি উচ্চতর এবং তুলনীয় মাত্রায় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। আয় বণ্টনে বৈষম্য কমাতে হলে চাই সমাজের দরিদ্র অংশের ভোগের মাত্রার উন্নতি। সে কারণে প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের বেশিটুকুই সংগ্রহ করা প্রয়োজন সমাজের সচ্ছল অংশের কাছ থেকে।

(খ) **সম্বল সংগ্রহ (Financial Resources)**: পঞ্চম পরিকল্পনার সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩৭,২৫০ কোটি টাকা সম্বল সংগ্রহের হিসাবটি এই:

	উৎস	(কোটি টাকায়)
১	কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির চলতি আয়ের উৎস (১৯৭৩-৭৪ সালের করের হারে)	৭,৩৪৮
২.	সরকারী সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত	৫,৯৮৮
৩.	অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ	৬,৮৫০
৪.	বাজার থেকে ঋণ	৭,২৩২
৫.	স্বল্প সঞ্চয়	১,৮৫০
৬.	প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	১,২৮০
৭.	অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মেয়াদী ঋণ	৮৯৫
৮.	ব্যাঙ্কগুলি থেকে বাণিজ্যিক ঋণ	১,১৮৫
৯.	ঋণ, আমানত জমা ও অন্যান্য	১,৩০৮
১০.	ধাতু, মুদ্রা প্রচলন	৮১
১১	ট্রেজারী বিল রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ (ঘাটতি ব্যয়)	১,০০০
১২,	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে	৯০
১৩.	বিদেশী ঋণ	২,৫৪৩
	সব মোট	৩৭,২৫০

(গ) **ব্যয় বরাদ্দ (Outlay)**: পঞ্চম পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দ হল ৫৩,৪১১ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৩৭,২৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে সরকারী ক্ষেত্রের জন্য এবং বাকি ১৬,১৬১ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য। সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ৩৭,২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৩১,৪০০ কোটি টাকা হ'ল বিনিয়োগ ব্যয় এবং বাকি ৫,৮৫০ কোটি টাকা হ'ল চলতি খরচ। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ৩৭,২৫০ কোটি টাকা নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়:

	খাত	কোটি টাকায়	মোট বরাদ্দের শতাংশ হিসাব
১	কৃষি	৪,৭০০	
২.	সেচ	২,৬৮১	২০ ৭
৩.	বিদ্যুৎ	৬,১০০	১৬.৩
৪	খনি ও শিল্প	৮,৯৩৯	২৪
৫.	নির্মাণ	২৫	০ ১
৬.	পরিবহণ ও সংসরণ	৭,১১৫	১৯.২
৭.	ব্যবসায় ও গুদাম করণ ব্যবস্থা	২০৫	০.৬
৮.	গৃহাদি নির্মাণ ও স্থাবর সম্পত্তি	৬০০	১.৬
৯.	ব্যাঙ্কিং ও বীমা	৯০	০.২
১০.	প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৯৮	০.৩
১১	অন্যান্য	৫,৭৯০	১৫.৫
	ক. শিক্ষা	১,৭২৬	৪.৬
	খ. স্বাস্থ্য	৭৯৬	২.১
	গ পরিবার পরিকল্পনা	৫১৬	১.৪
	ঘ পুষ্টি	৪০০	১.১
	ঙ শহর উন্নয়ন	৫৪৩	১.৫
	চ. জল সরবরাহ	১,০২২	২.৮
	ছ. সমাজ কল্যাণ	২২৯	০.৬
	জ. পশ্চাৎপদ শ্রেণীর কল্যাণ	২২৬	০.৬

খাত	কোটি টাকায়	মোট বরাদ্দের শতাংশ হিসাব
ঝ. শ্রমিক কল্যাণ	৫৭	·০১
ঞ বিবিধ	২৭৫	০·১
১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা	৫০৭	১·১
১৩ পার্বত্য ও উপজাতি এলাকা	৫০০	১৩
সর্বমোট	৩৭,২৫০	১০০

১০·৮ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০ ৮৫)
The Sixth Five Year Plan (1980-85)

১ পঞ্চম পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৭৮ ৭৯ সালে ষষ্ঠ পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন ঘটে। কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী, অগ্রাধিকার, পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রভৃতিরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। পঞ্চম পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরেই পঞ্চম পরিকল্পনা সমাপ্ত করে দেশে ষষ্ঠ পরিকল্পনা রচনা ও প্রবর্তন করা হয়। জনতা সরকারের ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময়কাল ছিল ১৯৭৮ ৭৯ থেকে ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসর। এ পরিকল্পনার দুবৎসর শেষ হবার আগেই ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এক নতুন সরকার গঠিত হয়। এ সরকার নতুন একটি ষষ্ঠ পরিকল্পনা রচনা ও প্রবর্তন করে। এর সময়কাল হল ১৯৮০ ১৯৮৫ সাল।

২. **বৈশিষ্ট্য** (Features): (১) **উদ্দেশ্য** (Objectives): (ক) উচ্চহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং তার সাথে সম্বলসমূহের ব্যবহার এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা; (খ) অর্থনীতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সর্বত্র আধুনিকীকরণের উদ্যম সৃষ্টি করা; (গ) দারিদ্র্যের ও কর্মহীনতার তীব্রতা হ্রাস করা, (ঘ) দেশীয় শক্তি-উৎসগুলির দ্রুততর গতিতে উন্নয়ন সাধন এবং এ বিষয়ে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে শক্তি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ও শক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, (ঙ) জনসাধারণের, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ অংশের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করা, এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি অঞ্চলই যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়নের একটা ন্যূনতম স্তরে এসে পৌঁছাতে পারে তার জন্য জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাবার কার্যসূচি গ্রহণ করা; (চ) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সরকারী নীতি ও কাজকর্মের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনা যাতে সমাজের দরিদ্র শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হয়, (ছ) উন্নয়নের গতি এমনভাবে নির্ধারণ করা যাতে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পায় এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সুফল ভোগের ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করা যায়, (জ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জনসাধারণ যাতে নিজ নিজ পরিবারের আয়তন ছোট রাখার নীতি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করা; (ঝ) উন্নয়নের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন কর্মসূচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা; এ উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও যাবতীয় পরিবেশগত সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান করা: (ঞ) উন্নয়নের কাজে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা, এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত, সংবাদ আদান-প্রদান সংক্রান্ত ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন সাধন করা।

৩ **ব্যয়বরাদ্দ** (Outlay): ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মোট ১,৭২,২১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ৯৭,৫০০ কোটি টাকা (৫৬·৬ শতাংশ) সরকারী ব্যয় এবং ৭৪,৭১০ কোটি টাকা (৪৩ ৪ শতাংশ) বেসরকারী ব্যয়। ৯৭,৫০০ কোটি টাকা মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয় ৮৪,০০০ কোটি টাকা এবং চলতি উন্নয়ন ব্যয় ১৩,৫০০ কোটি টাকা। সরকারী ব্যয় বরাদ্দের ১১ ৩ শতাংশ ধরা হয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য।

খাত	মোট ব্যয় বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	শতাংশ হিসাব
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্য ও গ্রামীণ উন্নয়ন	১১,০৫৯	১১ ৩
বিশেষ অঞ্চলের কার্যসূচি	১,৪৮০	১ ৫
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১২,১৬০	১২ ৫
শক্তি	২৬,৫৩৫	২৭·২
শিল্প ও খনি	১৫,০১৮	১৫ ৪
পরিবহণ ও সংসরণ	১৫,৫৪৬	১৬·০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা	৮৬৫	০·৯
সমাজসেবা	১৪,০৩৫	১৪·৪
অন্যান্য	৪০২	০·৪
মোট	৯৭,৫০০	১০০·০০

৪ **সম্বল সংস্থান** (Sources of finance): সরকারী ক্ষেত্রে মোট ৯৭,৫০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের সংস্থান কিভাবে হবে তা নিচে দেখান হল :

	বিভিন্ন উৎস	কোটি টাকায়
১.	১৯৭৯-৮০ সালের করের হার অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর আদায়	১৪,৪৭৮
২	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত আয়	৯,৩৯৫
৩.	সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ঋণ সংগ্রহ	১৯,৫০০
৪	ক্ষুদ্র সঞ্চয়	৬,৪৬৩
৫.	রাজ্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	৩,৭০২
৬	অর্থসংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মেয়াদী ঋণ	২,৭২২
৭.	বিবিধ মূলধনী আয়	৪,০০৯
৮.	বিদেশী সাহায্য ও ঋণ	৯,৯২৯
৯.	বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার	১,০০০
১০.	অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ	২১,৩০২
	মোট	৯২,৫০০
১১.	সম্বলের ঘাটতি	৫,০০০
	সর্বমোট	৯৭,৫০০

অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ, ২১,৩০২ কোটি টাকার মধ্যে ১২,২৯০ কোটি টাকা তোলার ভার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আর রাজ্যগুলির তোলার কথা ছিল ৯,০১২ কোটি টাকা। তা ছাড়া ৫,০০০ কোটি টাকার সম্বলের ঘাটতি পূরণের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নেওয়ার কথা ছিল।

বিনিয়োগ ও সম্বলের সংস্থান (Investment and Resource Mobilization): ষষ্ঠ পরিকল্পনার সরকারী ও বেসরকারী এ দুটি ক্ষেত্রের মোট ব্যয় বরাদ্দ ১,৭২,২১০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয় ১,৫৮,৭১০ কোটি এবং সরকারী ক্ষেত্রের চলতি উন্নয়ন খাতে ১৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে ধরা হয়। ১,৫৮,৭১০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দুটি উৎস থেকে আসবে : (ক) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে আসবে ১,৪৯,৬৪৭ কোটি টাকা; (খ) বৈদেশিক উৎস থেকে পাওয়া যাবে ৯,০৬৩ কোটি টাকা। এ তথ্য থেকে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় প্রকট হচ্ছে। সেটি হল : মোট বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্বলের ৯৪'৩ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই সংগৃহীত হবে। অর্থাৎ সম্বল সংগ্রহের ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা থাকবে তুলনামূলকভাবে অতি সামান্য (৫'৭ শতাংশ)।

ন্যূনতম প্রয়োজনের কার্যসূচী (Minimum Needs Programme): এ কার্যসূচি অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। যদিও পঞ্চম পরিকল্পনায় এ কার্যসূচি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল, তবে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ কার্যসূচির রূপায়ণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কার্যসূচির মধ্যে রয়েছে : (১) প্রাথমিক শিক্ষা; (২) গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য; (৩) গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ; (৪) গ্রামাঞ্চলে সড়ক নির্মাণ; (৫) গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণ; (৬) ভূমিহীন শ্রমিকদের গৃহনির্মাণ (৭) শহরের ঘিঞ্জি ও নোংরা অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন; (৮) পুষ্টি

কর্মসংস্থান (Employment): কর্মহীনতার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য ও এ সমস্যার সমাধানের উপযোগী কার্যসূচি উদ্ভাবনের জন্য পূর্ণনিযুক্ত (full-time employed) ব্যক্তির সংখ্যা হিসাব করার একটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। ধরা হয়েছিল, দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসাবে যে ব্যক্তি ২৭৩ দিন কাজে নিযুক্ত আছে সে ব্যক্তি হবে পূর্ণ নিযুক্ত ব্যক্তির নমুনা (standard person years employed)। বিচারের এ মানদণ্ডে হিসাব করে দেখা গেছে পুঁজি প্রগাঢ় শিল্পে ও পুঁজি-প্রগাঢ় অন্তর্কাঠামো-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অধিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। ফলে যে ক্ষেত্রে ও যে সব কর্মকাণ্ডে অধিক পরিমাণ কর্মসংস্থান হতে পারে সেগুলি হল, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, নির্মাণ শিল্প, জন প্রশাসন ও অন্যান্য সেবা। এ ভিত্তিতে কর্মসংস্থান ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কি পরিমাণ বাড়বে সে সম্পর্কে আনুমানিক হিসাব দেওয়া হয়েছিল। এ হিসাব পূর্ণ নিযুক্ত ব্যক্তির হিসাবেই করা হয়েছে। তাতে ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ নমুনাব্যক্তি-বছর (standard person years employed) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হয়েছিল।

১০.৯. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

The Seventh Five-Year Plan (1985-90)

১৯৮৫ সালের ৯ই নভেম্বর সরকারীভাবে সপ্তম পরিকল্পনার দলিল প্রকাশিত হয়। এ পরিকল্পনার কার্যকাল ১৯৮৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।

১. **সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** (Aims and

objectives) : ভারতের অর্থনীতিক বিকাশের বর্তমান পর্যায়কে এক দীর্ঘমেয়াদী (১৫ বৎসরের) প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তিনটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে সপ্তম পরিকল্পনা ভারতের সমসাময়িক কেন্দ্রীয় সমস্যা বলে বিবেচনা করেছে। এ তিনটি সমস্যা হল—দারিদ্র্য, কর্মহীনতা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা। সপ্তম পরিকল্পনার অর্থনীতিক বিকাশের রণনীতির আক্রমণের মূল লক্ষ্য এ তিনটি সমস্যা। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি সে রণনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়।

২. **ব্যয় বরাদ্দ** (Outlays) : সপ্তম পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩,৪৮,১৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে (private sector) ব্যয়ের পরিমাণ ১,৬৮.১৪৮ কোটি টাকা এবং সরকারী ক্ষেত্রে (public sector) ১,৮০,০০০ কোটি টাকা। ১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে হিসাব করে এই ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। মোট সরকারী ব্যয়ের ২৫,৭৮২ কোটি টাকা খাতে এবং বাকি ১,৫৪,২১৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ খাতে বরাদ্দ করা হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ষষ্ঠ পরিকল্পনার তুলনায় ৮৫ শতাংশ বেশি হবে বলে হিসাব করা হয়েছিল।

হিসাব করা হয়েছিল সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ১,৮০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৯৫,৫৩৪ কোটি টাকা খরচ হবে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে এবং বাকি ৮৪,৪৬৬ কোটি টাকা খরচ হবে রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৫৩ শতাংশ কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে এবং ৪৭ শতাংশ রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে খরচ করা হবে।

সপ্তম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ লক্ষ্য ছিল ৩,২২,৩৬৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ১,৫৪,২১৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ১,৬৮,১৪৮ কোটি টাকা। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৪৮ শতাংশ ও ৫২ শতাংশ। [তুলনায় ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই অনুপাত ছিল ৫৩ ও ৪৭ শতাংশ।]

নিচে বিভিন্ন খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের হিসাব দেওয়া হল।

	খাত	মোট ব্যয় বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	শতাংশ হিসাব
১	কৃষি	১০.৫৭৪	৬'০
২.	গ্রামীণ উন্নয়ন	৯,০৭৪	৫'০
৩.	বিশেষ অঞ্চল কার্যসূচী	৩,১৪৫	২'০
৪.	সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১৬,৯৭৯	১'০
৫.	শক্তি	৫৪,৮২১	৩১'০
৬.	শিল্প ও খনি	২২,৪৬১	১৩'০
৭	পরিবহণ ও সংসরণ	২৯,৪৪৩	১৬'০
৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা	২,৪৬৬	১'৫
৯	সমাজসেবা	২৯,৩৫০	১৬'০
১০.	অন্যান্য	১,৬৮৭	০'৫
	মোট	১,৮০,০০০	১০০ ০০

৫. **সম্বল সংগ্রহ** (Mobilization of resources) : সরকারী ক্ষেত্রে মোট, ১,৮০,০০০ কোটি টাকার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থান কি ভাবে হবে নিচে তা দেখান হল :

	বিভিন্ন উৎস	কোটি টাকায়
১.	১৯৮৪ ৮৫ সালের করের হার অনুযায়ী চলতি রাজস্ব উদ্বৃত্ত	(—) ৫,২৪৯
২.	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত আয়	৩৫,৪৮৫
৩.	ঋণ সংগ্রহ (নীট)	৩০,৫৬২
৪	ক্ষুদ্র সঞ্চয়	১৭,৯১৬
৫	রাজ্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	৭,৩২৭
৬	অর্থ সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়া মেয়াদী ঋণ	৪,৬৩৯
৭	বিবিধ মূলধনী আয় (নীট)	১২,৬১৮
৮.	অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ	৪৪,৭০২
৯.	বিদেশী সাহায্য ও ঋণ	১৮.০০০
১০.	ঘাটতি ব্যয়	১৪,০০০
	মোট	১,৮০.০০০

১০.১০ সপ্তম পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা
Critical Appraisal of the Seventh Plan

১. সপ্তম পরিকল্পনাকালে সামগ্রিক ও ক্ষেত্রগত উন্নয়ন হার নির্ধারিত লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তবে বিভিন্ন বৎসরে তাতে বিলক্ষণ ওঠানামা ঘটেছে। গড়পড়তা বার্ষিক উন্নয়ন হার প্রায় ৫ শতাংশ হলেও কোনো বৎসরে তা ৩ ৬ শতাংশে নেমেছে, কোনো বৎসর ৯ শতাংশে উঠেছে।

কৃষিক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। প্রথম বৎসরে উন্নয়ন হার ছিল মাত্র ২'৪ শতাংশ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে

তা নেমে −৩'৭ শতাংশ ও −২'১ শতাংশ হয়। চতুর্থ বৎসরে তা ১৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। এর প্রধান কারণ ছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে দেশের ভয়াবহ খরার পরিস্থিতি। তার দরুন প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উৎপাদন ও পরোক্ষ ভাবে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উৎপাদন কমে যায়। কমে যায় তার ফলে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদাও।

তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন হার কিছুটা বেশি হয়েছে, গড়পড়তা বার্ষিক ৮ শতাংশের অধিক।

২. কিন্তু গুরুতর দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে পুঁজি গঠন ও সঞ্চয়, অর্থসংস্থানের ধাঁচ এবং ব্যালান্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে। বাস্তবিক পক্ষে অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন ও সঞ্চয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য যথাক্রমে ২৫'৯ শতাংশ ও ২৪'৫ শতাংশ বাস্তবে লাভ করা সম্ভব হয়নি। সেই সঙ্গে পুঁজি গঠন ও সঞ্চয়ের মধ্যে ব্যবধানও বেড়ে গেছে। ফলে ফাঁক পূরণের জন্য বাইরে থেকে পুঁজি আনতে হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, সরকারী ক্ষেত্রে পুঁজিগঠন ও সঞ্চয়ের লক্ষ্যও পূর্ণ হয়নি। এর প্রধান কারণ অ-উন্নয়ন খাতে সরকারী ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি। এর একটি বড় অংশ হ'ল সরকারী ঋণের, বিশেষত বিদেশী ঋণের সুদ ও ভরতুকি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি। তা ছাড়া প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক প্রশাসন খাতেও ব্যয় বৃদ্ধি। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল সরকারী সঞ্চয়ের ঋণাত্মক পরিণতি (negative savings or dis-savings)। ১৯৮৪-৮৫ সালে এটা প্রথম ঘটে (—৯৬৩ কোটি টাকা)। পরবর্তী বৎসরগুলিতে ক্রমাগত বেড়েছে। সরকারী বি-সঞ্চয়ের হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১'৫ শতাংশে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট পুঁজি গঠন ও মোট সঞ্চয় হারের ব্যবধানটি অভ্যন্তরীণ ঋণ, বিদেশী পুঁজি ও বাজেট ঘাটতি বা ঘাটতি অর্থসংস্থানের দ্বারা পূরণ করা হতে থাকে।

৩. পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি ঘটেছে। এজন্য পরিকল্পনায় 'নিজস্ব সম্পদের' উপর যতটা নির্ভর করার কথা বলা হয়েছিল, ততটা বাস্তবে ঘটেনি। 'নিজস্ব সম্পদের' ঘাটতিটা মেটানো হয়েছে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ঋণ এবং ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা। এই দুর্বলতা দূর না হলে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের স্তর ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

৪. শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়ন হার কিছুটা সন্তোষজনক বলে মনে হলেও, এক্ষেত্রে দুটি নিদারুণ সমস্যা বেড়েছে। একটি হ'ল কর্মসংস্থানের সবিশেষ বৃদ্ধির অভাব ও বেকার সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। অপরটি হ'ল রুগ্ন কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি।

৫ আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হ'ল বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্সের ঘাটতি। এক্ষেত্রে সপ্তম পরিকল্পনার দলিলে সমস্যা যতটা দেখা দেবে বলা হয়েছিল বাস্তবে তা অনেক বেশি হয়েছে। বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল ব্যালান্স ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের −১'৩ শতাংশ থেকে বেড়ে সপ্তম পরিকল্পনায় ১৯৮৬-৮৭ সালে −২ শতাংশে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে তা আরও বেড়ে গেছে। বিদেশী ঋণ ও পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রতি বৎসর সুদ পরিশোধে ব্যয়ের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে সরকারী চলতি আয়ের শতাংশ রূপে সুদ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ১২'১ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮৭-৮৮ সালে ২৪ শতাংশে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা আরও বেড়ে গেছে।

সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনার ফলাফলকে এক কথায় সন্তোষজনক বলে গণ্য করা যায় না। বরং দেশের প্রধান ও কঠিন সমস্যাগুলিকে তা প্রশমিত করতে পারেনি।

[ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট সরকার নূতন করে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছেন। নূতন পরিকল্পনা কমিশন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অষ্টম পরিকল্পনা রচনায় হাত দিয়েছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে আলোচনা সংযোজিত হবে।]

১০.১১. ভারতে পরিকল্পনার চার দশক
Four Decades of Planning in India

১. ভারতে অর্থনীতিক বিকাশের উদ্দেশ্যে অর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও অনুসরণের সিদ্ধান্তটি স্বাধীনতা লাভের পর গৃহীত হবার পর ১৯৫১-৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত পর পর মোট সাতটি অর্থনীতিক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। মাঝখানে ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্থগিত ছিল এবং ওই তিন বৎসর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা চালু ছিল। ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত এই চার দশক ধরে সামগ্রিক ভাবে অর্থনীতিক পরিকল্পনাগুলির দ্বারা কি কি উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে, কি কি রণনীতি (strategy) ও রণকৌশলের (tactics) দ্বারা, কি কি পরিমাণে ব্যয়ের দ্বারা কতটা পরিমাণে বিনিয়োগ ঘটেছে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোন্ কোন্ উৎস থেকে কতটা করে সম্বল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্যগুলির কতটা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে বাধাবিপত্তি ও সাফল্যের

অভিজ্ঞতাগুলিও কি কি তাও ভবিষ্যতের দিশারীরূপে জানা প্রয়োজন। এই কথাগুলি মনে রেখে এখানে পরিকল্পনার সাড়ে তিন দশক সম্পর্কে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

২. **পরিকল্পনার উদ্দেশ্য** (Objectives)ঃ অর্থনীতিবিদ প্রমিত চৌধুরী ভারতের সমস্ত পরিকল্পনাগুলির গৃহীত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলিকে তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথমটি হল, গোটা অর্থনীতির দিক থেকে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যগুলি যথা (ক) জাতীয় আয়ের স্তরের উন্নতি; (খ) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (গ) জাতীয় আয়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অনুপাত বাড়িয়ে অধিকতর পরিমাণে সম্বল সংগ্রহ; (ঘ) মূল্যস্তর স্থিতিশীল করা; এবং (ঙ) বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্স দেশের অনুকূল করা।

দ্বিতীয়টি হল, দেশের কিছু কিছু নির্দিষ্ট অংশকে বিশেষ সুবিধা দানের উদ্দেশ্যগুলি, যথা—(ক) দেশের আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যহ্রাস; (খ) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস; (গ) কৃষির উন্নয়ন; (ঘ) শিল্পায়ন, এবং (ঙ) বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত বজায় রাখা।

তৃতীয়টি হল, অর্থনীতির কাঠামোর পরিবর্তনের উদ্দেশ্যগুলি, যথা—(ক) কৃষিক্ষেত্রে (agricultural sector) বর্তমান উপকরণগুলির মালিকানা ও ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ, তথা বর্তমান সম্পদের পুনর্বণ্টন; (খ) অকৃষি ক্ষেত্রে (non agricultural sector) উপকরণগুলির উপর অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হ্রাস।

বিকল্পভাবে আবার বিভিন্ন পরিকল্পনার অনুসৃত উদ্দেশ্যগুলিকে নিচের সাতটি প্রধান ভাগেও বিভক্ত করা যায়।

(ক) **জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি** (increase in national income)ঃ এই লক্ষ্যটিকে এ পর্যন্ত পরিকল্পনাগুলিতে এইভাবে পরিমাণগতরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে—যথা, প্রথম পরিকল্পনায় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২'২ শতাংশ থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ৫ শতাংশে তোলা হয়েছিল। এই লক্ষ্যটিই আবার মাথাপিছু আয়ের লক্ষ্য রূপে ভিন্নভাবে পরিমাণগতরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। **এই লক্ষ্যটি হল অর্থনীতির 'স্বনির্ভর উন্নয়ন' (self sustained growth)-এর গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটির কেন্দ্রীয় বিষয়।**

(খ) **ক্রমবর্ধমান হারে বাস্তব বিনিয়োগ** (actual investment) **পরিকল্পিতভাবে সম্ভব করে তোলা** (achieving longer and planned rate of investment within a given period)ঃ বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন পরিকল্পিতভাবে বাড়াতে হলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো দরকার এবং ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হলে প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে পুঁজিদ্রব্য সমষ্টি (capital stock) পরিকল্পিত স্তরে আনা দরকার—এই দুটি কারণে এই লক্ষ্যটি গ্রহণের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।

গ) **আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস** (reducing inequalities in the distribution of income and wealth)ঃ পরিকল্পনার এটি অন্যতম মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। তবে, এ উদ্দেশ্য সফল করা হবে, বর্তমান আয়ের পুনর্বণ্টন করে নয়, পরিকল্পনাকালে যে অতিরিক্ত আয় ও সম্পদ সৃষ্টি হবে তা ক্রমশ স্বল্প আয়ের মানুষ ও অঞ্চলগুলির দিকে প্রবাহিত করে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হলে বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথ ক্যাচাও কমবে।

(ঘ) **উপকরণগুলির উপর মালিকানার ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হ্রাস** (reducing concentration of economic power of ownership and control over resources)ঃ ভারতে একথাও সর্বজনস্বীকৃত যে, দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উপকরণগুলির (ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত বা বেসরকারি) মালিকানার ও নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীভবন দেশের সামগ্রিক স্বার্থের বিচারে অবাঞ্ছিত। তাই এটিও পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত এই লক্ষ্যলাভের জন্য যে প্রধান উপায় অনুসৃত হয়েছিল তা হল বৃহৎ বেসরকারি কারবারি গোষ্ঠীগুলির সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা। সপ্তম পরিকল্পনায় এই উপায়টি অনেকটা পরিমাণেই বর্জন করা হয়েছে। উপরোক্ত উপায়টির অন্যতম অঙ্গ ছিল পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ। এটিও সপ্তম পরিকল্পনায় খর্ব করা হয়েছে।

(ঙ) **অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি** (creating additional employment)ঃ জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের অনুষঙ্গী হল অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যটি। কারণ উৎপাদন না বাড়লে আয় বাড়বে না এবং কর্মসংস্থান না বাড়লে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ এদেশে একদিকে যেমন বিরাট পরিমাণ খোলাখুলি কর্মহীনতা রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা। প্রাকৃতিক উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করতে হলে মানবিক উপকরণটিরও সদ্ব্যবহার দরকার। তা করার পথ হল নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এর মারফত পুরাতন ও নতুন কর্মপ্রার্থীদের উৎপাদন কর্মে নিয়োগ ঘটবে।

(চ) **কৃষির উৎপাদন, শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা ও বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্সের উন্নতি** (raising agri-

cultural production, industrial productivity and improving balance of payments) : কৃষিক্ষেত্র দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জীবিকার সংস্থান করছে, সারা দেশের খাদ্য যোগাচ্ছে, যোগাচ্ছে শিল্পের দরকারী কৃষিজাত কাঁচামাল। শিল্পক্ষেত্র যোগায় যাবতীয় দরকারী অকৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী এবং সৃষ্টি করে কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্ভাবনা। এই ক্ষেত্র দু'টি পরস্পরের সম্পূরক। এই দু'টি মিলে হল অর্থনীতির সমগ্র অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র (domestic sector)। বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেন নিয়ে হল অর্থনীতির বৈদেশিক ক্ষেত্র (external sector)। এর উদ্দেশ্য হল একটি চলনক্ষম (viable) লেনদেনের ব্যালান্স বজায় রাখা, শুধু নিছক অনুকূল উদ্বৃত্ত নয়। দেশের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়লে আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে। লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সংকট দূর হবে। সুতরাং এই তিনটি ক্ষেত্র এবং উদ্দেশ্য হল পরস্পরের সম্পূরক। এই তিনটি ক্ষেত্রের উন্নতির অভাব দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক বিকাশের গতিবেগ বৃদ্ধিতে বাধা (bottleneck) দেয়।

(ছ) **দারিদ্র্য দূরীকরণ** (removal of poverty) : তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই ধরা পড়েছিল, অর্থনীতিক বিকাশের সুফলগুলি আপনা থেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিবদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। সত্তরের দশকে সমস্যাটি অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। 'গরিবী হঠাও'-এর রাজনৈতিক ধারণার মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়। ফলে 'গরিবী হঠাও' পঞ্চম পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 'ক্রমশ দারিদ্র্য দূরীকরণ' অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়। সপ্তম পরিকল্পনাতে তার পুনরুক্তি করা হয়েছে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক অর্থনীতিক বিকাশের পরিকল্পনার উপরোক্ত মূল উদ্দেশ্যগুলি যেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, তেমনি আবার সেগুলি সামগ্রিকও। তবে এক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলির প্রধান ত্রুটি এই যে, জাতীয় আয় ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যগুলি ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরব্ধ পরিমাণগত লক্ষ্যরূপে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, পরিমাণগতরূপে লক্ষ্যগুলি নির্দিষ্ট না করায় ওই সব উদ্দেশ্যগুলির কোনটা কতটা পরিমাণে বাস্তবসাধ্য বা সঙ্গতিপূর্ণ তা কখনও খতিয়ে দেখা হয়নি।

৩. **পরিকল্পনার রণনীতি** (Strategy of the Plans) : **যে কোনো সমস্যার মোকাবিলায়—তা কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করা হবে, কোন্ সময়ে** তা করা হবে **এবং কি ভাবে** তা করা হবে, এই তিনটি বিষয়ে যে সিদ্ধান্তগুলি বেছে নেওয়া হয় তাকে এক কথায় বলে **রণনীতি** (Strategy)। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেটা হল পরিকল্পনার রণনীতি (Strategy of planning)। অর্থনীতিক বিকাশের পরিকল্পনার প্রথম সমস্যাই হল পরিকল্পনার রণনীতি নির্ধারণ করা।

প্রথম পরিকল্পনার দলিলে কোন্ রণনীতি অনুসরণ করা হবে সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। কর্মসূচিগুলির মধ্যেই প্রথম পরিকল্পনার রণনীতিটি লুকিয়ে ছিল। সেই অন্তর্নিহিত রণনীতিটি ছিল, কৃষির বিকাশ-সম্ভাবনা বাড়ানো, যার ফলে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে শিল্প ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ তৈরী হতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এই ধরনের রণনীতি বিশেষ উপযুক্ত। স্বল্পোন্নত দেশে গ্রামীণ এলাকায় যে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি রয়েছে তা সে দেশের একটি উপকরণের সম্ভাব্য সঞ্চয় (saving potential)। শিল্পায়নের কাজে তা সমাবেশ ও ব্যবহার করা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় এই সঠিক অর্থনীতিক যুক্তির উপর নির্ভর করেই মূল রণনীতিটি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তার পরিপূরক কৌশল (technique) রূপে গ্রামীণ সম্প্রসারণ প্রকল্প, সেচ, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও আয়ের স্তরের উন্নতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে রণনীতি রচিত হয় তা ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সমস্ত পরিকল্পনার মূল রণনীতিরূপে কাজ করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল রণনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি। একটি হল, শিল্পায়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। অন্যটি হল, শিল্পক্ষেত্রে ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর অগ্রাধিকার দানের কারণগুলি ছিল : (ক) কৃষির তুলনায় শিল্পের উৎপাদনশীলতা বেশি; (খ) শিল্পায়নের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব; (গ) শিল্পায়নের দরুন অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত উপকরণের নানাবিধ নতুন নতুন ব্যবহারের উপায় সৃষ্টি হবে; (ঘ) কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরতার দরুন অর্থনীতিতে যে বিকৃতি ঘটেছে শিল্পায়নের দ্বারা তার প্রতিকার হবে; (ঙ) শিল্পোন্নয়নের দরুন কৃষি, পরিবহণ প্রভৃতি অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নতি ও বিকাশ ঘটবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির বদলে শিল্পের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও তার মানে এই নয় যে, তার ফলে কৃষি অবহেলিত হয়েছিল। বরং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির একটি নতুন ভূমিকা নির্দিষ্ট

হয়েছিল। সেটি হল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি ও শিল্পের পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকা। এ থেকে অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারসাম্যহীন বিকাশের (unbalanced growth) রণনীতি নেওয়া হয়নি, নেওয়া হয়েছিল ভারসাম্যবিশিষ্ট, বিকাশের (balanced growth) রণনীতি। শিল্পকে গণ্য করা হয়েছিল অর্থনীতিতে দ্রুত স্বনির্ভর উন্নয়ন পথের পুরোগামী ক্ষেত্ররূপে। সমস্ত ক্ষেত্রগুলি পরস্পর নির্ভরশীলরূপে বিবেচনা করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে বুনিয়াদী বা পুঁজিদ্রব্য শিল্প (basic or capital goods industries) ক্ষেত্রটির বিকাশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল; হাল্কা পুঁজিদ্রব্য শিল্প কিম্বা ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিকাশমান দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য চাই ভারী, বুনিয়াদী বা পুঁজিদ্রব্য। হয় তা উৎপাদন করতে হবে, নয়তো আমদানি করতে হবে। ভারতের পক্ষে বিদেশী মুদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করে আমদানি করা পুঁজিদ্রব্যের দাম মেটানো সম্ভব ছিল না। তাই ভারতের পক্ষে একমাত্র পথ ছিল স্বনির্ভরতা লাভের জন্য নিজের দরকারী পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পগুলি স্থাপন করা।

উপরোক্ত কারণগুলির দরুন অর্থনৈতিক বিকাশের ভারী শিল্পভিত্তিক যে রণনীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছিল তার তাৎপর্য ছিল দুটি: (ক) ভারী শিল্পের উন্নয়নে যে বিপুল পুঁজি দরকার হবে তার সম্বল সংগ্রহের জন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার যথেষ্ট বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল এবং সেজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে নতুন আয় সৃষ্টি হবে তা কর ব্যবহার সাহায্যে সংগ্রহ করার সুপারিশ করেছিলেন মহলানবিশ কমিটি। যদি তা যথেষ্ট না হয় তাহলে বৈদেশিক সঞ্চয়ের অর্থাৎ বিদেশী ঋণের আশ্রয় নেবার পরামর্শও মহলানবিশ কমিটি দিয়েছিলেন।

(খ) ভারী শিল্প স্থাপনের পর তার উৎপাদিত যন্ত্রপাতিগুলি অন্যান্য শিল্পে খরিদ করে ব্যবহার করা শুরু হলে তবে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ে। সুতরাং ভারী শিল্পের দ্বারা আশু দেশের উৎপাদন বা আয় সৃষ্টি বাড়ে না, বাড়তে সময় লাগে (time lag)। যদিও পরবর্তীকালে উৎপাদনের গতিবেগ যথেষ্ট বাড়ে। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদে ভারী শিল্পের দ্বারা উন্নয়নের হার যথেষ্ট বাড়ানো গেলেও স্বল্পকালীন সময়ে তাতে উন্নয়ন হারের বৃদ্ধিটা হয় কমই। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক বিকাশের যে রণনীতি গৃহীত হয়েছিল তাতে দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গীটাই ছিল প্রধান। আশু সময়ে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল।

এই রণনীতির দরুন অনিবার্যভাবে চার-পাঁচটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং পরিকল্পনা রচয়িতারা সে বিষয়ে সচেতনও ছিলেন। সে সমস্যাগুলি ছিল: (১) বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ব্যয়ের ফলে দেশের মধ্যে আয় ও ক্রয়শক্তি বিপুল পরিমাণে বাড়বে এবং তা দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাকে সাংঘাতিক বাড়িয়ে দেবে; ওই দ্রুত বর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য **ভোগ্যদ্রব্যের** (consumer goods) উৎপাদন ও যোগান বাড়ানোর প্রয়োজন হবে, তা না হলে মূল্যস্তর দ্রুত বাড়বে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনটি উপায় নির্দিষ্ট হয়েছিল—প্রথমত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ; দ্বিতীয়ত, কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তার; তৃতীয়ত, ভোগের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী।

(২) মহলানবিশ কমিটির অভিমত ছিল, ভারী শিল্পগুলির উপর অগ্রাধিকারদান ও তাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করার রণনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রধান ভূমিকার দরুন সরকারের সীমাবদ্ধ ব্যবস্থাপনাগত ও সাংগঠনিক কাঠামো উপকরণের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। **প্রশাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ** ও সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

(৩) তা ছাড়া, ভারী শিল্পভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচিতে নানা স্তরের ও নানা ধরনের দক্ষ, সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল শ্রমশক্তি দরকার হবে। কমিটির সুপারিশ ছিল এই ধরনের শ্রমশক্তি গড়ে তোলার জন্য মানবিক উপকরণের বিকাশের জন্য **শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ** করা প্রয়োজন।

(৪) ভারী শিল্পভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের জন্য দরকার হবে যথেষ্ট পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার। সুতরাং বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয়ের জন্য **আমদানি পরিবর্তের** (import substitution) নীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রথম পরিকল্পনায় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গোড়ার দিকে বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাড়ানোর জন্য রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষের দিকে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি তীব্র হয়ে উঠলে, আমদানি পরিবর্তের নীতির পাশাপাশি **রপ্তানি প্রসারের নীতিও** গৃহীত হয়। সেই থেকে এখন অবধি ভারতের উন্নয়ন রণনীতিতে এই দুটি নীতিও সংযোজিত হয়ে রয়েছে।

(৫) ভারী শিল্প স্থাপনে বিপুল পরিমাণ পুঁজি

বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, উৎপাদন শুরু হতে সময় লাগে, এবং মুনাফার হার কম হয়। ভারতে পুঁজির স্বল্পতাও রয়েছে। তাই বেসরকারী উদ্যোগের দ্বারা ঐসময় ভারী শিল্প স্থাপন সম্ভব ছিল না। এই কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের পিছনে আরেকটা যুক্তি ছিল। সেটি হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সরকারী সঞ্চয় সমাবিষ্ট করার পক্ষে একটি উপযুক্ত হাতিয়ার বিশেষ এবং শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে ও তা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য সিদ্ধিতে সাহায্য করবে।

শিল্পক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুরূপে ভারী শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছিল।

৪ **পরিকল্পনাগুলির আয়তন** (Size of the Plans) **:** নিচে প্রথম থেকে সপ্তম পরিকল্পনা পর্যন্ত পরিকল্পনাগুলির প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ থেকে আয়তন জানা যাচ্ছে।

(ক) নিচের সারণিতে প্রথম ছয়টি পরিকল্পনার প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ এবং সপ্তম পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ

পরিকল্পনা : প্রকৃত ব্যয় : কোটি টাকায়

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম (১)
মোট ব্যয়	৩,৭৬০	৭,৭৭২	১২,৬৭৭	২৪,৭৫৯	৬৬,৪৭৪	১,৮৪,৬৬০	৩,২২,০৬৬
সরকারী ক্ষেত্র	১,৯৬০	৪,৬৭২	৮,৫৭৭	১৫,৭৭৯	৩০,৪২৬	১,০৯,৯৫০	১,৫৪,২১৮
বেসরকারী ক্ষেত্র	১,৮০০	৩,১০০	৪,১০০	৮,৯৮০	২৭,০৪৮	৭৪,৭১০	১,৬৮,১৪৮
মোট বিনিয়োগ	৩,৩৬০	৬,৮৩১	১১,২৮০	২২,৬৩৫	৬৩,৭৫১	১,৫৮,৭১০	৩,২০,৪২৬
সরকারী ক্ষেত্র	১,৫৬০	৪,৭৩১	৭,১৮০	১৩,৬৫৫	৩৬,৭০৩	৮৪,০০০	১,৫৪,২৭৮
(মোট বিনিয়োগের শতাংশরূপে)	(৪৬·৪)	(৫৪·৬)	(৬৩·৭)	(৬০·৩)	(৫৭·৬)	(৫২·৯)	(৪৮·০)
বেসরকারী ক্ষেত্র	১,৮০০	৩,১০০	৪,১০০	৮,৯৮০	২৭,০৪৮	৭৪,৭১০	১,৬৬,১৪৮
(মোট বিনিয়োগের শতাংশরূপে)	(৫৩·৬)	(৪৫·৪)	(৩৬·৩)	(৩৯·৭)	(৪২·[illegible])	(৪৭·১)	(৫২·০)

(১) ব্যয় বরাদ্দ।

সরকারী ক্ষেত্রে

ব্যয়ের বণ্টন	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম
কেন্দ্র	৭০৬	২,৫৩৫	৪,২১২	৭,৮২৬	১৯,৯৫৪	৪৭,২৫০	৯৫,৫৩৪
রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	১,২৫৪	২,১৩৮	৪,৩৬৬	৭,৯৫২	১৯,৩৪৯	৫০,২৫০	৮৪,৪৬৬
রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য	(তথ্য পাওয়া যায়নি)	১,০৫৮	২,৫১৫	৩,৫৭৫	৬,০০০	১৫,৩৫০	২৯,৭৫৭ (২)

(২) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাদে কেবল রাজ্যগুলির জন্য।

সূত্র : Statistical Outline of India, 1984 ; Economic Times, 12th November, 1985.

সংক্ষেপে ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি গৃহীত হয়েছিল এবং তার সূত্রপাত হয়েছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনায়। তাতে সরকারী

থেকে সাতটি পরিকল্পনার ক্রমবর্ধমান আয়তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রথম পরিকল্পনা থেকে পরিকল্পনার আয়তন ক্রমশ বেড়ে সপ্তম পরিকল্পনায় মোট

আয়তন (প্রকৃত মোট এবং বরাদ্দ ব্যয়) ৯৩ গুণ, সরকারী ক্ষেত্রে ৯২ গুণ, বেসরকারী ক্ষেত্রে ৯৩ গুণ, মোট বিনিয়োগ ৯৫ গুণ, সরকারী বিনিয়োগ ৯৯ গুণ এবং বেসরকারী বিনিয়োগ ৯২ গুণ বেড়েছে।

(খ) কিন্তু মনে রাখা দরকার এবং পর এক পরিকল্পনার আয়তন বৃদ্ধির প্রধান কারণ দেশে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্তর বৃদ্ধি—প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করতে পারে নি।

সরকারী ক্ষেত্রে আর্থিক ও প্রকৃত ব্যয় (in real terms)

	আর্থিক ব্যয় কোটি	১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরে প্রকৃত ব্যয় টাকা	শতকরা বৃদ্ধি আর্থিক ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
প্রথম পরিকল্পনা	১,৯৬০	১,৮০৫	—	—
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৪,৬৭২	৩,৬৪৯	১৩৮.৪	১০৩.৮
তৃতীয় পরিকল্পনা	৮,৫৭৭	৫,৪০৪	৮৩.৬	৪৬.০
চতুর্থ পরিকল্পনা	১৫,৭৭৯	৬,০৯১	৮৩.৪	১২.৭
পঞ্চম পরিকল্পনা	৩০,৪২৬	৯,৬৮৫	৯৩.০	৫৭.৪

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে, পরিকল্পনার আর্থিক আয়তন (চলতি মূল্যস্তর) থেকে তার প্রকৃত আয়তনটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর থেকে চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়, উভয়ের বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমলেও, আর্থিক ব্যয়ের বৃদ্ধির তুলনায় প্রকৃত ব্যয়ের বৃদ্ধির হার অনেক বেশী কমেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার পর থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় যথেষ্ট বাড়লেও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব করা হলে একই প্রবণতা ধরা পড়বে।

(গ) পরিকল্পনাগুলির আয়তনের বিশ্লেষণের তথ্য থেকে দেখা যায়, মোট বিনিয়োগের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়লেও মোট বিনিয়োগের মধ্যে ওদের দুটি বিনিয়োগের অনুপাতের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

মোট বিনিয়োগে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের অনুপাত

	সরকারী বিনিয়োগ শতাংশ	বেসরকারী বিনিয়োগ শতাংশ
প্রথম পরিকল্পনা	৪৬.৪	৫৩.৬
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৫৪.৬	৪৫.৪
তৃতীয় পরিকল্পনা	৬৩.৭	৩৬.৩
চতুর্থ পরিকল্পনা	৬০.৩	৩৯.৭
পঞ্চম পরিকল্পনা	৫৭.৬	৪২.৪
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	৫২.৯	৪৭.১
সপ্তম পরিকল্পনা	৪৮.০	৫২.০

কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যেও একটি প্রত্যাবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পরিকল্পনা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৩.৭ শতাংশে ওঠার পর চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে সপ্তম পরিকল্পনায় তা আবার আগেকার প্রথম পরিকল্পনার বিনিয়োগের অনুপাতের প্রায় সমস্তরে নেমে গেছে। অন্যদিকে প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাতটি ৫৩.৬ শতাংশ থেকে ক্রমশ কমে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৬ শতাংশে নেমে যাবার পর চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে ক্রমশ বেড়ে সপ্তম পরিকল্পনায় ৫২ শতাংশে উঠেছে। 'সমাজতন্ত্র', 'গরিবী হঠাও', 'অর্থনৈতিক বৈষম্যের দূরীকরণ' ইত্যাদি ঘোষিত সরকারী নীতির পাশাপাশি চতুর্থ পরিকল্পনা কাল থেকেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গুরুত্বের ধারাবাহিক বৃদ্ধির প্রবণতাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৫. **ব্যয়ের বণ্টনের ধাঁচ** (allocation pattern of expenditure) : যে কোনো অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনার স্ট্র্যাটেজী বা রণনীতি প্রতিফলিত হয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টনের ধাঁচের মধ্যে। ভারতে প্রথম পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টনের ধাঁচ থেকে পরবর্তী পাঁচটি পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টনের ধাঁচ সুস্পষ্টভাবেই আলাদা। আবার সপ্তম পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টনের ধাঁচটি অনেকটা ভিন্নতর। নিচে প্রথম ছয়টি

পরিকল্পনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের শতাংশ রূপে পাঁচটি প্রধান খাতে ব্যয় বণ্টনের ধাঁচটির তথ্যগুলি দেওয়া হল।

উন্নয়নের খাত	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম
১। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৩৭ ০	২০ ৯	২০ ৫	২৩ ০	২৩ ৩	২৫'৩৩	২২'০৯
২। বিদ্যুৎ	৭ ৬	৯ ৭	১৫ ৬	১৮'৬	১৯ ০	২৭ ২১	৩০'৪৫
৩। শিল্প	৪'৯	২৪ ১	২২ ৯	১৯ ৭	২৫'০	১৫ ৭০	১২ ৪৮
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	২৬ ৪	২৭ ০	২৪ ৬	১৯ ৫	১৭ ৪	১৫'৯৭	১৬ ৩৬
৫। সমাজসেবা ও অন্যান্য (১)	২৪ ১	১৮ ৩	১৭'৪	১৮ ৯	১৬ ০	১৬'১২	১৮'৬২
	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

১ এই খাতে ব্যয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে।

ব্যয় বণ্টনের ধাঁচ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় (ক) প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় বণ্টনের ধাঁচে ... বৈশিষ্ট্যগুলি ... ভাবে বর্ণনা করা যায় কৃষি, পরিবহণ ও সংসরণ এবং সমাজসেবা, এই তিনটি প্রধান খাতে ... মোট ব্যয় যথাক্রমে ৩৭ শতাংশ, ২৬ ৪ শতাংশ এবং ২৪ ১ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছিল। তুলনায় শিল্পের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ৪ ৯ শতাংশ। কৃষির উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের যুক্তিটি ছিল, প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের সবিশেষ বৃদ্ধি না ঘটলে শিল্প বিকাশের অগ্রগতি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং প্রথমে অর্থনীতির ভিত্তিটিকে (অর্থাৎ কৃষিকে শক্তিশালী করা এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদনের তথা প্রাচুর্যের অবস্থা সৃষ্টি করাই হল প্রধান কাজ। তা না হলে শিল্পোন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। অতএব ওই বিঘ্নটি (bottleneck) অপসারণ করতে হবে।

বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও সংসরণের উপর দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দানের যুক্তি ছিল, এইসব ক্ষেত্রে বিকাশগুলি হল মৌলিক চরিত্রের এবং এই সব ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটলে তা গুণক (multiplier effect) প্রতিক্রিয়া ও ত্বরক (multiplier effect and accelerator co-efficient) মারফত কৃষি ও শিল্পে উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবে ও উৎপাদনশীল কার্যকলাপের বিস্তার ঘটাবে।

সমাজসেবা খাতেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কারণ পরিকল্পনা রচয়িতাদের বক্তব্য ছিল, মানবিক উপকরণের উন্নতির জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না। তাই শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য ব্যয় করা হয়েছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় যে স্ট্র্যাটেজী গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে শিল্পবিকাশের কার্যসূচীর কোন স্থান ছিল না। এই কারণে প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য মাত্র ৪৯ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছিল। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কৃষিক্ষেত্রের সাধারণ বিকাশের কর্মসূচি রূপায়ণে ও প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা দূরীকরণে গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশের উপর যে গুরুত্ব প্রথম পরিকল্পনায় আরোপ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। এই ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনায় যে মাত্র ৪৮ কোটি ব্যয় করা হয়েছিল তা সব দিক থেকেই ছিল কম।

(খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে পঞ্চম পরিকল্পনা পর্যন্ত ব্যয়ের ধাচটি ছিল মোটামুটি একই। প্রথম পরিকল্পনায় অর্থনীতিক বিকাশের মূলভিত্তি স্থাপনের পর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের সাহসী ও উচ্চকাঙ্ক্ষামূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পরিকল্পনা পর্যন্ত শিল্পায়ন খাতে মোটামুটি মোট ব্যয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ খরচ করা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার যে অনুপাতটি ১৯৭ শতাংশে ও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তা আরও কমে ১৫ ৪ শতাংশে পরিণত হয়।

কিন্তু প্রথম থেকে পর পর পরিকল্পনাগুলিতে এ পর্যন্ত যে খাতটিতে ব্যয় বেড়েছে তা হল বিদ্যুৎ। এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনায় ৭'৬ শতাংশ থেকে ক্রমশ বেড়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ২৭ ২১ শতাংশে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হল, শিল্পবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েছে তেমনি সাধারণভাবে অর্থনীতিক বিকাশের ফলেও অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে চলেছে। সে বৃদ্ধিটা এমন যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি তার তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। তার উপর রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অনুপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের দরুন

উৎপাদন ও যোগানে প্রায়শ বিভ্রাট। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার যেমন হচ্ছে না, তেমনি লোড শেডিং এর দরুন শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের দারুণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরিবহণ, সংসরণ ও বিদ্যুৎ হল শিল্পের অতি দরকারি পরিকাঠামো বা অন্তঃকাঠামো (intra-structure)। বিদ্যুতের কথা আগেই বলা হয়েছে। পরিবহণ ও সংসরণের দরুন প্রথম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল বলে ব্যয়ের অনুপাত ছিল ২৬.৫ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা বেড়ে সর্বোচ্চ (২৭ শতাংশ) হবার পর ক্রমশ কমতে থাকে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৫.৯৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এর একটি কারণ হল, প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় বিপুল বিনিয়োগের পর পরবর্তী কালে আর সে প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

কৃষি খাতে ব্যয়ের অনুপাত প্রথম পরিকল্পনায় এক তৃতীয়াংশের বেশি হলেও এবং পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি শিল্প খাতের উপর গুরুত্ব আরোপ সত্ত্বেও, ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত কখনও ২০ শতাংশের নিচে নামেনি এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তা বেড়ে এক চতুর্থাংশে উঠেছে। এটি ভারতের পরিকল্পনার স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

শেষ কথা, সমাজসেবা খাতে ব্যয় প্রথম পরিকল্পনায় ২২ শতাংশ থেকে ক্রমাগত কমে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৬.১২ শতাংশে নেমে এসেছে। সমাজসেবা খাতে ব্যয়ের এই ধারাবাহিক হ্রাস, বিশেষত শিক্ষার জন্য ব্যয়ের স্বল্পতা বিগত ছয়টি পরিকল্পনায় মানবিক উপকরণের প্রতি অবহেলার পরিচয় দিচ্ছে। এর ফলে অর্থনৈতিক বিকাশও নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

৬. **অর্থসংস্থানের ধাঁচ** (Pattern of financing the plans) **:** বিগত সাতটি পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের মূল ধাঁচটি নিচের তথ্যগুলি থেকে লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের উৎস
(শতাংশ হিসাবে)

উৎস	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম*	ষষ্ঠ*	সপ্তম
১. কর, ঋণ ও সঞ্চয়	৭৩	৫৬	৫৯	৭৪	৮১.৮	৮৩.৬	৮২.৩
২. ঘাটতি ব্যয়	১৭	২০	১৩	১৩	৩.৪	৪.২	৭.৭
মোট অভ্যন্তরীণ উৎস	৯০	৭৬	৭২	৮৭	৮৫.২	৮৭.৮	৯০.০
৩. বৈদেশিক সাহায্য	১০	২৪	২৮	১৩	১৪.৮	১২.২	১০.০
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
(কোটি টাকা হিসাবে)	(১,৯৬০)	(৪,৬০০)	(৮,৬৩০)	(১৬,০৬০)	(৩৯,৩০৩)	(৯৭,৫০০)	(১,৮০,০০০)

* পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার তথ্যগুলি নির্ধারিত লক্ষ্য। প্রথম থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার তথ্যগুলি প্রকৃত খরচের অনুপাত।

উপরের তথ্যগুলি থেকে লক্ষণীয় বিষয়গুলি এবার আলোচনা করা যেতে পারে:

(১) প্রথম পরিকল্পনায় ধরে নেওয়া হয়েছিল অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই অর্থসংস্থান করা সম্ভব হবে। এ পরিকল্পনাটি আয়তনে ছোটই ছিল। পরিকল্পনাকালের শেষ দিকে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার পরিমাণও মাত্র ১০ শতাংশের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাই প্রথম পরিকল্পনা থেকে অর্থসংস্থানের ধাঁচটি ধরা পড়ে না।

(২) পরিকল্পনাগুলির অর্থসংস্থানের মূল ধাঁচ পেতে হলে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি লক্ষ্য করতে হবে। তা থেকে একটি ধাঁচ লক্ষ্য করা যায় যা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা ও পরবর্তী তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত (১৯৫৬-৬৯) অব্যাহত ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনা কাল থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত আরেকটি ধাঁচ লক্ষ্য করা যায়।

(৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারী শিল্পের উপর অগ্রাধিকার দানের রণনীতির দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে ভারী শিল্পে যে বিপুল বিনিয়োগ ঘটতে থাকে তার ফলে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন অত্যন্ত বেড়ে যায়, অথচ এই সময়ে রপ্তানির তেমন বৃদ্ধি না ঘটায় প্রচণ্ড বিদেশী মুদ্রার সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৫৬-৬৯ সাল পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেড়েছে। এই কারণে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে বিদেশী সাহায্যের অনুপাত ২৪ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশ ও তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে। এই সময়ে অর্থসংস্থানের প্রয়োজনে

অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির মধ্যে করের বোঝা বাড়ানো হতে থাকে প্রথম পরিকল্পনায় অতিরিক্ত করের দ্বারা ১৩'৫ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২২'৫ শতাংশ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৩'৬ শতাংশ আদায় করা হয়। এই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তও কিছু পরিমাণে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে সাহায্য করতে আরম্ভ করে। তার অনুপাত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩ ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪'৯ শতাংশ এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ৬ শতাংশে পরিণত হয়। এই সময়ে অর্থসংস্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠে ঘাটতি ব্যয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রচয়িতাদের ধারণা ছিল, বেশ কিছুটা পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করা হলে তাতে মূল্যস্তর কিছুটা বাড়বে এবং তাতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের মুনাফা বাড়বে ও তারা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে। এর দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা পরিকল্পনার ব্যয়ের ১০ শতাংশের সংস্থান করা হয়। কিন্তু তার ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধির যে প্রবল ঝোঁক দেখা দেয় তাতে নিরুৎসাহিত হয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা ও পরবর্তী তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা অর্থসংস্থানের অনুপাতটি ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়।

(৪) পরিকল্পনার প্রথম দুই দশকের শেষে চতুর্থ পরিকল্পনার শুরু। পরিকল্পনার দুটি দশকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থসংস্থানের পলিসিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। এখন থেকে গুরুত্ব আরোপ করা শুরু হয় সরকারী ও বেসরকারী সঞ্চয় বৃদ্ধি, অতিরিক্ত কর রাজস্ব ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আয় বাড়িয়ে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি থেকে অর্থসংস্থানের। ঘাটতি ব্যয়ের উপর নির্ভরতা এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা চলে পরবর্তী দেড় দশকে ষষ্ঠ পরিকল্পনা কালের শেষ অবধি, যদিও সে চেষ্টা যে সর্বদা ফলবতী হয়েছে তা নয়। এজন্য দেখা যায় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থানের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ঘাটতি ব্যয়ের অনুপাত ক্রমশ কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতাও কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত থেকে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের অনুপাত ৯'৬ শতাংশে উঠেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ঋণ এবং স্বল্পসঞ্চয় থেকে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের অনুপাত তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৭'৬ শতাংশ থেকে বেড়ে চতুর্থ পরিকল্পনায় ২৭'৯ শতাংশে, পঞ্চম পরিকল্পনায় ২৮'৩ শতাংশে ও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ৩০'৪ শতাংশে উঠেছে। কিন্তু ঘাটতি ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনায় ১,১৩৩ কোটি টাকা থেকে তা বেড়ে চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,০৬০ কোটি টাকায়, পঞ্চম পরিকল্পনায় ৩,৫৬০ কোটি টাকায় ও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তা ৫,০০০ কোটি টাকায় উঠেছে। বিগত শেষ চারটি পরিকল্পনাতেই ঘাটতি ব্যয়ের অনুপাত নির্ধারিত লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। তেমনি অতিরিক্ত করের অনুপাতও নির্ধারিত লক্ষ্যের অনেক বেশি হয়েছে।

৭. **অগ্রগতির মূল্যায়ন** (Assessment of the achievements) :

(ক **উন্নয়নের হার** (growth rate) : ভারতের অর্থনীতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব অনুধাবন করতে হলে পরিকল্পনাকালে উৎপাদনের প্রাথমিক বা কৃষি, মাধ্যমিক বা শিল্প এবং তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্রে (primary, secondary and tertiary sectors of the economy) ও সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয়ের গড়পড়তা বার্ষিক বৃদ্ধির হারটি লক্ষ্য করা দরকার। এজন্য চলতি মূল্যস্তরের চেয়ে স্থির মূল্যস্তরের constant prices) ভিত্তিতে তৈরী হিসাবটিই বেশি সঠিক। ১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরকে এখন পর্যন্ত স্থির মূল্যস্তর রূপে অধিকাংশ সরকারী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরাও ১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরকে স্থির মূল্যস্তর ধরে তার ভিত্তিতে তৈরী হিসাব নিয়েই আলোচনা করব।

পরবর্তী পৃষ্ঠার তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনার ৩০ বৎসরে নীট জাতীয় উৎপন্ন ১৮৪ শতাংশ বেড়েছে। এই সময়ে জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ৮৫ শতাংশ বেড়ে ৬৫ কোটি ৪০ লক্ষ হয়েছে। ফলে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৫০ শতাংশ। **চলতি মূল্যস্তরে ঐ ৩০ বৎসরে নীট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৮'৪ শতাংশ ও ৬'৮ শতাংশ হলেও ওটা যে বিভ্রান্তকারী তা বোঝা যায় ১৯৭০ ৭১ সালের মূল্যস্তরের হিসাবে ঐ উন্নয়নহার যথাক্রমে ৩'৫ শতাংশ ও ১'৪ শতাংশ দেখে।**

পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকের প্রথম দশকটিতে নীট জাতীয় উৎপন্ন বৃদ্ধির হার তথা উন্নয়ন হার (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১) হয়েছিল সবচেয়ে বেশি, ৩'৮ শতাংশ, পরের দুটি দশকে (১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭০ ৭১ থেকে ১৯৮০-৮১) তা কমে ৩ ৫ ও ৩'৪ শতাংশ হয় এবং তিনটি দশক মিলে ৩০ বৎসরে বার্ষিক গড়পড়তা উন্নয়ন হার হয় ৩'৫ শতাংশ। এবং ওই ৩০ বৎসরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় বার্ষিক ১'৪ শতাংশ। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন হার খানিকটা বাড়লেও সেটা ৫ শতাংশের নিচেই রয়ে গেছে।

উপাদান খরচের ভিত্তিতে নীট জাতীয় উৎপন্ন

	চলতি মূল্যস্তরে		স্থির (১৯৭০-৭১ সালের) মূল্যস্তরে	
	মোট (কোটি টাকা)	মাথাপিছু (টাকা)	মোট (কোটি টাকা)	মাথাপিছু (টাকা)
১৯৫০-৫১	৮,৮১২	২৪৬	১৬,৭৩১	৪৬৬
১৯৮০-৮১	১,০৬,১৭৫	১,৫৬৪	৪৭,৫০৭	৭০০
১৯৮৩-৮৪	১,৫৯,৫৯৮	২,২০১	৫৪,২৭৬	৭৪৯
	উন্নয়ন হার (চলতি মূল্যস্তর)		উন্নয়ন হার (১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তর)	
প্রথম পরিকল্পনা	১'০ —)	০'৮	৩'৬	১'৮
দ্বিতীয় ,,	৭'৪	৫'৩	৪'০	১'৯
তৃতীয় ,,	৯'২	৬'৮	২'২	০'০
৩টি বার্ষিক ,,	১১'৬	৮'৯	৪'২	১'৬
চতুর্থ ,,	১২'০	৯'৫	৩'১	১১'
পঞ্চম ,,	৮'২	৬'৪	৪'০	২'৩
১৯৫০-৫১ থেকে				
১৯৮০-৮১ ,,	৮'৪	৬ ৪	৩'৫	১'৪

(খ) **কৃষি, শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার (rates of growth in agriculture, industry and service sectors) :** কৃষি ও শিল্প তথা অর্থনীতির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক **ক্ষেত্র হল** অর্থনীতির প্রধান **পণ্য-উৎপাদন ক্ষেত্র** (commodity-producing sector)। একটা দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন প্রধানত নির্ভর করে তার পণ্য-উৎপাদন ক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর। অর্থনীতির যে ক্ষেত্রটিতে পণ্য-উৎপাদন ঘটে না (non-commodity-producing sector) সে ক্ষেত্রটি অর্থনীতির উন্নয়নে উদ্দীপনা যোগায় না (non-stimulant to economic growth)। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়নের অভাব হেতু অর্থনীতিতে পণ্য অনুৎপাদন ক্ষেত্রটির (non-commodity-producing sector) অংশ ক্রমশ বাড়ছে। **এইটিই হল** ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নের তথা জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির স্বল্প হারের (slow rate of growth) মূল কারণ।

নিম্নের তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনার প্রথম দশকে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন হার ছিল মাত্র বার্ষিক ৩'০ ; তা পরবর্তী দেড়দশকে কমে ১'৬ শতাংশে পরিণত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে অবশ্য পরিকল্পনার প্রথম আড়াই দশকে সে হারটি হয়েছিল ২'১ শতাংশ। তুলনায় শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়ন হারটি বেশি হলেও, কৃষির মতো এক্ষেত্রেও উন্নয়ন হারটি পরিকল্পনার প্রথম দশকে ৫'৪ শতাংশ থেকে পরবর্তী দেড় দশকে তা কমে ৫'০ শতাংশে নামে এবং প্রথম আড়াই দশকে শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন হারটি ৫ ১ শতাংশে পরিণত হয়। তুলনায়, পরিবহণ, যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং, বীমা ও সরকারী প্রশাসনের সম্প্রসারণের ফলে পরিকল্পনার প্রথম দশকে সেবাক্ষেত্রের উন্নয়ন হারটি সর্বাধিক হয়েছিল। পরবর্তী দেড় দশকে অবশ্য অন্য দু'টি ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও উন্নয়ন হারটি নেমে ৪'৬ শতাংশ হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র আড়াই দশকের উন্নয়ন হারটি এক্ষেত্রে ৫'১ শতাংশ অর্থাৎ শিল্প ক্ষেত্রের সমান হয়েছিল।

উপাদান খরচের ভিত্তিতে ভারতের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন হার

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র	১৯৫০ ৫১ থেকে ১৯৬০ ৬১	১৮৬০-৬১ থেকে ১৯৭৬-৭৭	১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭৬-৭৭
১। প্রাথমিক ক্ষেত্র (কৃষি)	৩'০	১'৬	২'১
২। মাধ্যমিক ক্ষেত্র (শিল্প)	৫'৪	৫'০	৫'১
৩। তৃতীয় ক্ষেত্র (সেবা)	৫'৯	৪'৬	৫ ১
মোট : নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন	৩'৮	৩'২	৩ ৪

সূত্র : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার শ্বেতপত্র ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস (১৯৭০ ৭১ থেকে ১৮৭৬ ৭৭), ১৯৭৯, জানুয়ারী।

(গ) **ভারতের অর্থনীতিক কাঠামোর পরিবর্তন (changes in the economic structure of India) :** পরিকল্পনার বিগত সাড়ে তিন দশকে অর্থনীতির বিবিধ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দরুন সামগ্রিকভাবে ভারতের অর্থনীতির কাঠামোটিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

উপাদান খরচের ভিত্তিতে নীট জাতীয় উৎপন্নের আনুপাতিক বণ্টন (১৯৭০-৭১-এর মূল্যস্তরে।

বিবিধ ক্ষেত্র	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৭০-৭১	১৯৮৩-৮৪
১। প্রাথমিক ক্ষেত্র (কৃষি)	৬১'৩ শতাংশ	৫৬'৬ শতাংশ	৫০ শতাংশ	৩৯'৭ শতাংশ
২। মাধ্যমিক ক্ষেত্র (শিল্প)	১৪'৫ ,,	১৭'১ ,,	১৯'৮ ,,	২১'১ ,,
৩। তৃতীয় ক্ষেত্র (সেবা)	২৪'২ ,,	২৬'৩ ,,	৩০'২ ,,	৩৯'০ ,,
মোট : নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র : জাতীয় পরিসংখ্যান হিসাব (১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৯-৮০) ১৯৮৩ ফেব্রুয়ারি ও ১৯৮৩-৮৪-র প্রাথমিক হিসাব।

উপরের তথ্যগুলি থেকে পরিকল্পনায় প্রথম সাড়ে তিন দশকের মধ্যে ধীরে ধীরে মোট জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপন্নে অর্থনীতির তিনটি ক্ষেত্রের অবদানের আনুপাতিক যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তা দেশের অর্থনীতির কাঠামোর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। নীট অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপন্নে কৃষির অংশ ৬১'৩ শতাংশ থেকে ক্রমশ কমে ১৯৮৩-৮৪ সালে, অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিকল্পনা কালের শেষের দিকে ৩৯'৭ শতাংশে পরিণত হয়েছে এবং প্রথম দুই দশকের তুলনায় পরবর্তী দেড় দশকে সে পরিবর্তনের হারটি বেশি হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রের অবদান ওই সময়ে ১৪'৫ শতাংশ থেকে ক্রমশ বেড়ে ২১'১ শতাংশে পরিণত হয়েছে এবং বৃদ্ধির হারটি ধীরগতিতে চলেছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, দ্রুত পরিণতি ঘটেছে কৃষি ছাড়া তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রটির অবদান ২৪'৩ শতাংশ থেকে পরিকল্পনার প্রথম দশকে যে হারে বেড়েছে দ্বিতীয় দশকে তার থেকে উচ্চতর হারে এবং অবশেষে সাড়ে তিন দশকের শেষ দিকে আরও উচ্চতর হারে বেড়ে অবশেষে ৩৯ শতাংশে (কৃষির প্রায় সমান) পরিণত হয়েছে। এর কারণ হল, ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহণ, যোগাযোগ, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং সরকারী প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এবং বিবিধ অর্থনীতিক ও সমাজসেবা মূলক কাজের দ্রুত সম্প্রসারণ। দেশের অর্থনীতিক কাঠামোর এই পরিবর্তনটি অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা প্রবর্তিত অর্থনীতিক উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। এটি যেমন ভারতের অর্থনীতিক কাঠামোর প্রকৃতির গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহ তেমনি পশ্চাৎপদ ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিক কাঠামো থেকে শিল্প ও সেবা ভিত্তিক এক অগ্রসর অর্থ-নীতিক কাঠামোতে রূপান্তরেরও পরিচায়ক।

(ঘ) **কর্মসংস্থান (employment) :** অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের মতোই ভারতও বিপুল সংখ্যক বেকার কর্মপ্রার্থীর ভারে অবসন্ন। ১৯৮১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী দেশের শতকরা ৭৭ ভাগ মানুষই (৬৮ কোটি ৫০ লক্ষের মধ্যে ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ) গ্রামে বাস করে বলে, গ্রামাঞ্চলে বেকাররাই সংখ্যায় সর্বাধিক। এদের মধ্যে দুটি প্রধান ধরনের বেকার সমস্যা দেখা যায় : (ক) প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা (disguised unemployment) ও (খ) মরসুমী কর্মহীনতা (seasonal unemployment)। শহরাঞ্চলের কর্মহীনদের মধ্যে দু'ধরনের বেকাররাই প্রধান : (ক) শিক্ষিত বেকার এবং (খ) গ্রাম থেকে আগত শিল্পে কর্মপ্রার্থী বেকার ও ছাটাই শ্রমিক।

ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রার্থী বাহিনীর জন্য কর্মস্থান সৃষ্টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। বিবিধ উন্নয়ন কর্মসূচির দ্বারা বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, কৃষি ও সেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ মারফত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে যে পরিমাণে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

পরিকল্পনার প্রথম দশকে (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১) নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ। ওই সময়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা ১ কোটি ৬০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান ঘটে এবং ৫০ লক্ষ বেকার অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় দশকে (১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭০-৭১) কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৪ কোটি ; তার মধ্যে ২ কোটি বেকারের কর্মসংস্থান ঘটে এবং অবশিষ্ট বেকার থেকে যায় ২ কোটি। পরিকল্পনার তৃতীয় দশকে (১৯৭০-৭১থেকে ১৯৮০-৮১) মোটকর্মপ্রার্থী কত ছিল এবং তাদের মধ্যে কতজনের কর্মসংস্থান ঘটেছে তার সরকারী হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে অনেকের অনুমান তৃতীয় দশকের শেষে অন্ততঃ ৩ কোটি কর্মপ্রার্থী বেকার থেকে গেছে।

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের হারের স্বল্পতা এবং

পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বিনিয়োগের আধিক্যকে কর্মসংস্থানের স্বল্পতার কারণরূপে গণ্য করা হয়। এজন্য ভারী শিল্পের উন্নয়নের যে পরিকল্পনাগত স্ট্র্যাটেজী গ্রহণ করা হয়েছে তাকেই অনেকে দায়ী বলে মনে করেন। কিন্তু এটা তার আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র।

(৬) **অর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণ** (removal of economic disparities) : বিপুল জনসমষ্টির দারিদ্র্য দূরীকরণ, আয় ও সম্পত্তির বণ্টনে কেন্দ্রীভবন হ্রাস ও বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতিক উন্নয়নের বৈষম্যহ্রাস, এই তিনটি হল ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রথম সমস্যা, দারিদ্র্য দূর করণের বিষয়ে পরিকল্পনায় ধরে নেওয়া হয়েছিল, ১৯৭৭-৭৮ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ ও শহরবাসীদের ৪১ শতাংশ, মোট ২৯ কোটি ভারতবাসী দারিদ্র্যরেখার নিচে ছিল। গ্রামে মাসে মাথাপিছু ৬১.৮ টাকা ও শহরে মাসে মাথাপিছু ৭১.৩ টাকা ভোগব্যয়ের অক্ষমতাকে দারিদ্র্যরেখা বলে ধরা হয়েছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আশা করা হয়েছিল, ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যা কমে ৩০ শতাংশ বা ২১ কোটি ৫০ লক্ষ দাঁড়াবে। পরিকল্পনাকালের শুরুতে (১ ৫১) মন্টেক আলুওয়ালিয়ার মতে, গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫৪.১ শতাংশ দারিদ্র্যরেখার নিচে ছিল। সপ্তম ফিন্যান্স কমিশনের মতে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে দেশে ৫২ শতাংশ ছিল দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যা। সুতরাং প্রথম পাঁচটি পরিকল্পনাকালে দেশে দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার বিশেষ হেরফের হয়নি বলা যায়। ভারত সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন দাবি করছেন, ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে গরিবদের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যরেখার উপরে উঠেছে এবং বর্তমানে দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যা কমে ৬.৩ শতাংশ হয়েছে (১৯৮৪-৮৫)। সপ্তম পরিকল্পনার শেষে তা আরও কমে ২৫.৮ শতাংশে নামবে (১৯৮৯-৯০)। অধ্যাপক টেণ্ডুলকর, সুন্দরম, বসন্ত গুমস্তে, রাজকৃষ্ণ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌ পরিকল্পনা কমিশনের এই দাবি মানতে রাজী নন। এঁদের মতে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যা সামান্য কমে বর্তমান মোট জনসংখ্যার ৪৬.৫ শতাংশ থেকে ৪৮.৪ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে দেখা যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার ২০ শতাংশের মোট আয় হল সারা দেশের মোট আয়ের মাত্র ৯ শতাংশ এবং অন্যদিকে দেশের গ্রাম ৫ শতাংশ মানুষের মোট আয় হল দেশের মোট আয়ের ১৭ শতাংশ।

আয়, বেকারসমস্যা ও দারিদ্র্য কৃষির উৎপাদনশীলতা, শিল্পায়ন, পরিকাঠামোর (infra-structure) বিস্তার, সামাজিক সেবা প্রভৃতির মানদণ্ডের বিচারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজ্যের মধ্যে গভীর এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ধরা পড়ে। অন্ধ্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা, ভারতের এই আটটি রাজ্যে রয়েছে সারা দেশের দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থিত মানুষের ৮৩ শতাংশ। উপরোক্ত প্রথম ৫টি রাজ্যে বেকারদের হারও বেশি।

পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও গুজরাটে মাথাপিছু আয় সত্তরের দশক থেকে সর্বোচ্চ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম। তেমনি বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান রয়েছে একেবারে নিচের দিকে। বিহারের স্থান সর্বনিম্নে। কৃষির উৎপাদনশীলতায় পঞ্জাব সর্বোচ্চে এবং বিহার সর্বনিম্নে রয়েছে। শিল্পের উৎপাদনশীলতায় সর্বোচ্চে রয়েছে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ৬টি বৃহৎ রাজ্যের অর্ধেকের বেশি গ্রামে ১৯৭৭-৭৮ সালেও পানীয় জলের সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পাঁচটি রাজ্যে গ্রামগুলির এক-তৃতীয়াংশে ছিল এই অবস্থা। পঞ্জাব, হরিয়ানা কেরালা ও তামিলনাড়ুতে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার মতো রাজ্যের গ্রামগুলির মাত্র এক তৃতীয়াংশে তা প্রসারিত হয়েছে। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে সড়কের বিস্তার ঘটেছে সবচেয়ে বেশি; রাজস্থান ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। এমন কি পরিকল্পনার বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। বেশি অগ্রসর রাজ্যগুলিকে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলিকে করা হয়েছে ক্রমাগত অবহেলা। পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলি পেয়েছে অগ্রাধিকার। উত্তরপ্রদেশ, আসাম, বিহার পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে অবহেলিত।

কৃষিক্ষেত্রে জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটলেও, জমির মালিকানার উপর সিলিং ধার্য হলেও, সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবসান হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোথাও উদ্বৃত্ত জমির সবিশেষ পুনরুদ্ধার ঘটেনি, ভূমিহীন ও গরিব চাষীদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমির বণ্টন হয়নি। একই সময়ে ঘটেছে সবুজ বিপ্লব, এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ, (অর্থাৎ পুঁজিবাদী কৃষির প্রসার), ভূমিহীন খেতমজুরের

সংখ্যা বৃদ্ধি। কৃষিতে যে উন্নতি ঘটেছে তা সাধারণ চাষীর অবস্থার উন্নতি না ঘটিয়ে বাড়িয়ে চলেছে ধনী চাষীর সমৃদ্ধি, বড় বড় জোতদারদের ঐশ্বর্য। এই একই সময়ে শিল্পে সরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটলেও সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে বেসরকারী ক্ষেত্রের এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে বেড়ে চলেছে আয় ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন।

চ **স্বনির্ভরতা (self reliance):** বিগত সাড়ে তিন দশক ধরে অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে পর পর পরিকল্পনাগুলি পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম লক্ষ্যটি হল বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি। বিগত ২০ বৎসরে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দূর হয়েছে; ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পগুলি স্থাপিত হওয়ায় বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানির প্রয়োজন আর হচ্ছে না। বিমান, ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বহু রকমের যন্ত্রপাতি, হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য ভারত নিজেই তৈরী করেছে এবং রপ্তানিও করছে। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য ভারত বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সম্বলের গড়পড়তা ১০ শতাংশের সংস্থানের জন্য ভারতকে এখনও বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্স নিয়ে দুশ্চিন্তার কাল এখনও শেষ হয়নি।

(ছ) **মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা (price stability):** মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতাসহ অর্থনীতিক উন্নয়ন (growth with stability) হল ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনাগুলির ঘোষিত উদ্দেশ্য। ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ধীর গতিতে বর্ধমান মূল্যস্তর উন্নয়নের সহায়ক বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু মূল্যস্তরের বৃদ্ধিটা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, বৃদ্ধিটা যদি চড়া হারে, দ্রুতগতিতে এবং একটানা ঘটতে থাকে, তাহলে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন, সব কিছুই ক্ষুণ্ণ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে ভারতে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি শুরু হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে বার্ষিক গড়পড়তা ৫-৬ শতাংশ হারে মূল্যস্তর বেড়েছে। ১৯৭২-৭৫ সালের মধ্যে অত্যন্ত চড়াহারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তার পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৭৯-৮১ সালে। তখন পাইকারী মূল্যস্তরের বৃদ্ধিটা ছিল মাসিক গড়পড়তা ১·৫ শতাংশ হারে। এখনও বার্ষিক গড়পড়তা ৬ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। এর ফলে অর্থনীতিক উন্নয়ন হার সামান্য থেকেই যাচ্ছে।

উপসংহার (conclusions: পরিকল্পনাকালের বিগত ৪০ বৎসরে পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য এবং রূপায়ণে ব্যবধান থেকে গেলেও, যে অগ্রগতি ঘটেছে তা অল্প নয় এবং তা দেশের সামাজিক অর্থনীতিক কাঠামোতে পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছে। সাফল্য সীমাবদ্ধ হলেও অর্থনীতির কাঠামোটি এখন আগের তুলনায় সম্ভাব্য উন্নতির ভার বহনের অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠেছে।

১০.১২. ভারতের অর্থনীতিক সংকট
Economic Crisis in India

১. ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ভারতে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজ চলছে। এ উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের দ্রুত বৃদ্ধিসাধন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে কর্মহীনতা দূর করা, উন্নয়নের ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থনীতিক ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়া এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা।

২. সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর ধরে পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ দেশের অর্থনীতিক জীবনে এমন কতকগুলি বাস্তব তথ্য ও সত্য প্রকট হয়েছে যেগুলিকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না এবং যেগুলি দেশের অর্থনীতিক দুর্বলতা ও সংকটের কথাই ঘোষণা করে। তথ্যগুলি হল: (ক) ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এই ১৩ বৎসরে (১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরে) জাতীয় আয় গড়ে বাৎসরিক ৩. বেড়েছে এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে মাত্র ১ হারে। আবার বর্ধিত জাতীয় আয়ের বেশির ভাগই সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, দরিদ্রশ্রেণী এর থেকে বিশেষ কোনো উপকার পায়নি। (খ) বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া দূরে থাক, প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে কর্মহীনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ বিপুল অর্থের বেশির ভাগই অপচয় হয়েছে, এবং ঠিকাদার ও আমলাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়িয়েছে। এ অর্থ কর্মহীনের কর্মসংস্থানের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করতে পারে নি। (গ) শিল্পায়নের লক্ষ্য সাধনে সরকারী ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল সরকারী ক্ষেত্র প্রচুর উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারবে আর সেই উদ্বৃত্ত পুনর্বিনিয়োগ করে শিল্পায়নের কাজ ত্বরান্বিত করা যাবে। প্রত্যাশা ছিল সরকারী ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ও প্রসার বন্ধ করবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি। তার কারণ, প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত

সৃষ্টি হয়নি, বেসরকারী ক্ষেত্রের মুষ্টিমেয় শিল্পপতির হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন বন্ধ করা যায়নি এবং এক-চেটিয়া কারবারের প্রসারও প্রতিহত হয়নি। বরং সরকারী ক্ষেত্রের উদ্যোগে অর্থনীতির অন্তর্কাঠামোর (infra-structure) যে ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বেসরকারী ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়েছে ও বিপুল আর্থিক শক্তি অর্জন করেছে। (ঘ) ২০টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থনীতির যে সব ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ঋণ যোগানের সুবন্দোবস্ত করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল, কার্যত তেমন কিছু হয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে মূল্যস্তর ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। খরা বন্যা বা অন্য কারণে ফসলহানি হলে মূল্যস্তর বাড়তে পারে, এ যুক্তি বোঝা যায়। কিন্তু যে ঘটনার ব্যাখ্যা করা সহজ নয় তা হল যে বছর ভাল ফসল হয়েছে সে বছরেও মূল্যস্তর কমেনি বরং বেড়েছে। অর্থনীতির সূত্র অনুসারে এটাই স্বাভাবিক যে, মূল্যস্তর বাড়তে আরম্ভ করলে উৎপাদনও বাড়ে। কিন্তু ভারতের অর্থনীতিতে যে বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে তা হল মূল্যস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন খুব একটা বাড়েনি অথবা বাড়লেও সামান্য বেড়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতিতে 'স্ট্যাগ্‌ফ্লেশন' (stag flation) বা নিশ্চলতা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। (ঙ) জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারী রাজস্বের পরিমাণও বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এদিকে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকার ঘাটতি ব্যয়ের উপর প্রবলভাবে নির্ভর করছে এবং অর্থের যোগান ভয়াবহ পরিমাণে বেড়েই চলেছে। জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীরাও মাহিনা ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে সংঘটিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মাহিনা ও ভাতা বাড়াতে হয়েছে। এর ফলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। তাতে জিনিসের মূল্যও আবার বেড়েছে। এ ভাবে মজুরি ও উৎপাদন ব্যয় পরস্পর পরস্পরকে ঠেলে উপরের দিকে নিয়ে চলেছে। মূল্যস্তরও সমানে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। (চ) কর আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে 'কালো টাকা' সৃষ্টি হচ্ছে। 'কালো টাকা'র সঠিক পরিমাণ জানা না গেলেও, এটা ঠিক যে, 'কালো টাকা' ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি 'সমান্তরাল অর্থনীতি' (parallel economy) সৃষ্টি করেছে। 'কালো টাকা'র সর্বনাশা আধিপত্য নির্মূল করা যেখানে সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেখানে 'কালো টাকা'কে 'সাদা টাকা'য় পরিণত হতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সরকারের 'বেয়ারার বণ্ড' চালু করার মাধ্যমে। এতে কালো টাকার রাজত্ব আরো জোরদার হবে। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনবে। ভয়াবহ মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করে দেবে।

৩. ভারতীয় অর্থনীতির যে সংকটের বর্ণনা উপরে দেওয়া হল, সেটা মূলত পরিচালনা ও রূপায়ণ সংক্রান্ত সংকট। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি, কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পপ্রসারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বেসরকারী ক্ষেত্রের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী ক্ষেত্রের কাজে দক্ষতা আনয়ন—এ সব ব্যাপারে উপযুক্ত নেতৃত্ব, সুদক্ষ পরিচালনা ও কার্যসূচির রূপায়ণ—এর কোনোটাই প্রয়োজন মতো করা যায়নি বলেই ভারতের অর্থনীতি সংকটের কবলে পড়েছে।

১০.১৩. ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : কয়েকটি বৈশিষ্ট্য
Planning in India : Some Salient Features

(ক) ভারতে যে পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে সেটি সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়। অবশ্য আকৃতিতে গণতান্ত্রিক হলেও এ পরিকল্পনা ভারতের ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই রচিত।

ভারতে যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান সেটি হ'ল গণতান্ত্রিক ধাঁচের। এ ধরনের কাঠামো কয়েকটি বিশেষ মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; যেমন, ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাধীনতা, নীতি নির্ধারণে ও কার্য সম্পাদনে জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভরতা, সব কিছুর উপরে জনকল্যাণের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের কাঠামো বিদ্যমান থাকলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকারের পরিকল্পনা রচনার নীতি ও রূপায়ণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে দেশের জন-সাধারণ তাদের মতামত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। বস্তুতপক্ষে ভারতের পরিকল্পনা একটা বড়ো ধরনের পরীক্ষা যার কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া শক্ত। পরিকল্পনার কার্যসূচি রূপায়ণে জনসমর্থন সংগ্রহের প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—উভয় সরকারই যত্নবান থাকে।

(খ) ভারতের পরিকল্পনা ব্যাপক পরিকল্পনা নয়। তুলনা করে বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক

দেশের পরিকল্পনা। তার কারণ এ সব দেশের সমগ্র অর্থনীতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকেই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতের অর্থনীতির সব কয়টি ক্ষেত্র পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় না—বহু ক্ষেত্রই পরিকল্পনার বাইরে থাকে। বস্তুতপক্ষে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মূলক কর্তৃপক্ষের যাবতীয় উন্নয়ন-মূলক কার্যসূচিই হল ভারতের পরিকল্পনার বৃহত্তম অংশ। উন্নয়নমূলক কার্যসূচিগুলির বেশির ভাগেরই হল সামাজিক উপরি-কাঠামো (social overhead) সৃষ্টি এবং / অথবা সম্প্রসারণ করা ; এর উদাহরণ হল সড়ক পরিবহণ, সংসরণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, রেলপথ ও জলপথ পরিবহণ, গবেষণা ও শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, ভারতের অর্থনীতির খুব ছোট একটা অংশই সরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। তবে একথা ঠিক যে, সরকারী ক্ষেত্র আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও গুরুত্বের দিক থেকে বেশ বড়ো একটা ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরই পাশাপাশি এক বিরাট ক্ষেত্রে বিরাজ করছে ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ বেসরকারী ক্ষেত্র। এই বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, নির্মাণ শিল্প, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প প্রভৃতি। বর্তমানে ভারতের অর্থনীতিতে বেসরকারী ক্ষেত্র সমগ্র অর্থনীতিতে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে যে পরিকল্পনা রচিত হয় সেটা সাধারণভাবে মূল্য বিচার (estimates) ও পূর্বাভাষ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এসব কাজ শিল্পের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই করা হয়। অবশ্য, পরিকল্পনার রচয়িতারা বেসরকারী ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কার্যসূচি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে থাকে।

(গ) ভারতের পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের পরিকল্পনা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ ও সমাজতন্ত্র এক বস্তু নয়। পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকৃতির দিক থেকে এদুটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর রাষ্ট্রের (তথা সমাজের) পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। তাই এসব দেশে, সমগ্র অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভারতের অর্থনীতিক কাঠামো ধনতান্ত্রিক। উন্নয়ন পরিকল্পনাও ধনতান্ত্রিক কাঠামোটিকে অপরিবর্তিত রেখেই রূপায়িত করার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে আর যাই হোক সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা রূপায়ণ করা যায় না। ধনতান্ত্রিক কাঠামোটিকে অটুট রেখে খুব বেশি হলে যা করা যায় তা হল কিছু জনকল্যাণমূলক কার্যসূচির রূপায়ণ ও সামাজিক উপরি-কাঠামোর সম্প্রসারণ। ভারতের পরিকল্পনা রচয়িতারা এ ধরনের কিছু জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের কার্যসূচি গ্রহণ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে যে অর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা তাঁরা লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখেছেন তাকেই তারা বর্ণনা করেছেন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বলে।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বলে এ ধারণাটি উদ্ভাবিত হয় ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে। এ ধরনের সমাজ গঠনের জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের কথা বলা হয়। যেমন—(১) দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির সূচক হবে সামাজিক লাভ, ব্যক্তিগত মুনাফা নয় ; (২) জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন বাড়াতে হবে তেমনি আয় ও সম্পদ বণ্টনে আরো বেশি সমতা আনতে হবে। (৩) অর্থনীতিক উন্নয়নের যাবতীয় উপকার যাতে অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষেরাই বেশি করে পেতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। (৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, সাধারণ মানুষের জন্য আরো বেশি সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে আরো বেশি একাত্মবোধের জাগরণ ও যৌথ কর্মে উদ্যোগী হয়ে অংশগ্রহণের উপযোগী মানসিকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা।

বাস্তবক্ষেত্রে এ সবের অনেক কিছুই রূপায়িত হয়নি।

(ঘ) ভারতের পরিকল্পনা একদিকে যেমন কেন্দ্রীকৃত অন্যদিকে তেমনি বিকেন্দ্রীকৃতও বটে।

ভারতের শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয়। একটি কেন্দ্রীয় সরকার আর কয়েকটি রাজ্য সরকার নিয়ে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রের ও রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও কর্মপরিধি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। 'অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা'র বিষয়টি যুগ্মতালিকাভুক্ত হওয়ার ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই এ বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে। তাই এ বিষয়গুলি নিয়ে পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির। তবে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের আলাদাভাবে তৈরী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে

এ ছাড়া, পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে তাদের পরিকল্পনা রচনার কাজে প্রযুক্তি সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করে।

বৃহদায়তন শিল্প, রেলপথ পরিবহণ, জাতীয় সড়ক, বৃহৎ বন্দর, জাহাজ পরিবহণ, অসামরিক বিমান চলাচল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ও অর্থসংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনার কার্যসূচি নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখা হয়েছে। এভাবে ভারতীয় পরিকল্পনায় একই সঙ্গে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এনীতি অন্যরূপেও ভাবতে পারা হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী সহাবস্থানে যে মিশ্র অর্থনীতি ভারতে গড়ে উঠেছে তার মধ্য দিয়ে এ নীতি কার্যকর হচ্ছে। সরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পনার কাজে কেন্দ্রীকরণের নীতি আর বেসরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পনার কাজে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে।

১০. ৪. ভারতীয় পরিকল্পনা : অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ
Indian Planning : Past Experiences and Future Prospect

ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৪০ বৎসরেরও বেশিকাল যাবৎ চলেছে। সুতরাং পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের অতীত অভিজ্ঞতা ও লব্ধ শিক্ষার আলোচনা প্রয়োজন। অতীতের ত্রুটি পরিহার ও বাঞ্ছিত পথে পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ ও অগ্রগতির জন্য এটা অপরিহার্য।

মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রথম পরিকল্পনা ছোট আয়তনের হলেও বেশ কিছু সাফল্য লাভ করে। এতে উৎসাহিত হয়ে বড় আকারের দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনা করে তাকে কাজে রূপ দেবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কৃষির ফলনহ্রাস, মূল্যস্তর বৃদ্ধি এবং বিদেশী মুদ্রা সংকটের মধ্যে পড়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়নও ছাঁটকাট করতে হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য লাভ হয়েছে বটে তবে এই সময়ে বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নেয়, আর তার সাথে মূল্যস্তর কেবলই বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থায় তৃতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। এতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি মূল্যস্তরকে স্থির রাখা এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করা যায়নি। এর উপর আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য এতটুকু না কমে আরো তীব্র হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে পর পর দুই বৎসরই দেশে ভীষণ মন্দা দেখা দেয়। তারপর কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে নতুন কৌশল ও কার্যক্রম অনুসরণ করে বেশ কিছুটা সাফল্যলাভ করাতে দেশের সামগ্রিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। এতে দেশ খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়েছে। কিন্তু বেকার সমস্যার কোনো সুরাহা হবে বলেও কোনো ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না।

স্বাভাবিক কারণেই পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন জেগেছে। এর ত্রুটি-বিচ্যুতি কি এবং কিভাবে তা দূর করা সম্ভব এ নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা চলেছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা এই :

(১) এ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে উন্নয়নের সামাজিক লক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবেই সম্মুখে রাখা হয়েছে; কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার কোনো সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয়নি, কি উপায়ে এ সকল লক্ষ্য পূরণ করা হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি অথবা তার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। প্রতিটি পরিকল্পনায় আমাদের সামাজিক লক্ষ্যগুলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। ঐ গুলিকে কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থাগুলিও সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

(২) পরিকল্পনাগুলিতে ঘোষিত উদ্দেশ্য ও নীতির সাথে বাস্তবে অনুসৃত নীতির অসঙ্গতি ও ব্যবধান দেখা দেয়। অনভিজ্ঞতার দরুন কার্যক্ষেত্রে পরিকল্পনায় গৃহীত নীতির সাথে বাস্তবে অনুসৃত নীতির বিরোধিতা দেখা দেওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু এর ফলে একদিকে যেমন পরিকল্পনার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয় তেমনি বাস্তব সমস্যাগুলিও থেকেই যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে যাতে বাস্তবে অনুসৃত নীতি পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্দেশ্য ও নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি যথাসম্ভব প্রয়োজনের কথা মনে রেখে রচিত হয় তা দেখা আবশ্যক।

(৩) রাজ্য সরকারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনায় নির্ধারিত অগ্রাধিকার মেনে চলেনি এবং যে সকল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছে তার সদ্ব্যবহার করেনি। এতে পরিকল্পনার লক্ষ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাজ্য সরকারগুলি যাতে এরূপ অবাঞ্ছিত পন্থা গ্রহণ না করতে পারে তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

(৪) অনেক সময় ভালোমত ভেবে-চিন্তে লক্ষ্য নির্ধারিত হয় না, ফলে কর্ম সম্পাদনের পর দেখা যায় যে লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে অত্যধিক

উচ্চ লক্ষ্য ধার্য হয়ে যায়। এর পুনরাবৃত্তি বন্ধ হওয়া আবশ্যক। এজন্য সকল ক্ষেত্রেই শুধু আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্য নয়, এর সম্পাদনযোগ্য কার্যের বস্তুগত লক্ষ্য (physical target) নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

(৫) পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রকল্পগুলির রূপ দিতে গিয়ে তার লোকবল ও অন্যান্য উপকরণগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ব্যবস্থাপনা সংগঠনের এ দুর্বলতা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন।

(৬) জনসাধারণ যাতে অবিচ্ছিন্নভাবে সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য প্রকল্পগুলি এরূপভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে স্বল্পকালীন ফলপ্রসূ short gestation period) এবং দীর্ঘকালীন ফলপ্রসূ long gestation period) প্রকল্পগুলির মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় থাকে।

(৭) মানসিক শক্তি, প্রশাসনিক ও কারিগরী শক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও উপযুক্ত সংযোজন (co-ordination) পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন উন্নয়নক্ষেত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে পরিকল্পনাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সংযোজিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও বাস্তবে এই উপলব্ধির যথেষ্ট প্রকাশ ঘটেনি।

অদ্যাবধি পরিকল্পনায় যে নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে সে সম্পর্কেও নানারূপ অভিযোগ উঠেছে এবং কি করণীয় সে বিষয়েও নানারকমের আলোচনা হচ্ছে। যেমন—

(ক) ভারতে কৃষকেরা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। অর্থাৎ তারা যে দামে ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হয় সে দামে তাদের লোকসানই হয়। সুতরাং, কৃষকের মনে আশা ও উৎসাহ সৃষ্টির জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য যাতে তারা পায় তার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্তব্য। তা ছাড়া এ দ্রব্যমূল্য যাতে সাধারণভাবে স্থির থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। এ ব্যাপারে সাফল্য নির্ভর করে ভূমিসংস্কার, নিয়ন্ত্রিত বাজার, যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থার বিস্তার, কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার, কৃষিপদ্ধতির উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর। বলাই বাহুল্য, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোনো উপযুক্ত প্রকল্প রচনা করা সম্ভব নয়।

(খ) অঞ্চলগুলির স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচিত হয় না। সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র এমন ভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত যাতে জনসাধারণের উদ্যোগ ও সক্রিয় সমর্থন কোনোটাই তার পক্ষে যথাযথ ভাবে কাজে লাগান সম্ভব হয় না। বস্তুত পক্ষে ভারতের পরিকল্পনা রচনার কাঠামো পুরোপুরি আমলাতন্ত্রের করায়ত্ত। পঞ্চায়েতীরাজ ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে বটে তবে তাতে বিশেষ কিছু হেরফের ঘটেনি। বিভিন্ন প্রকল্প রচনার কাজে বেসরকারী ব্যক্তিদের সাথে সাধারণভাবে পরামর্শও করা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দরকার।

(গ) ভূমিসম্পদের অবহেলা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান ত্রুটি। কর্ষণের অযোগ্য ভূমি ভারতের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ভূমি সম্পদ। অথচ এ জমিতে বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি উৎপাদনের দ্বারা যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল করা যায় তেমনি শিল্পের ভিত্তিকেও প্রশস্ত করা যায়। এজন্য ব্যাপক অনুসন্ধান, গবেষণা প্রভৃতি প্রয়োজন। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল করতে হলে যেমন কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে তেমনি গ্রামীণ উপকরণের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থাও করতে হবে। কৃষির মতই এ সকল শিল্পের উন্নয়নকে প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হবে।

(ঘ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশল হিসাবে প্রধানতঃ ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পেই বিনিয়োগ করা হবে ঠিক করা হয়। এরই সাথে এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে, ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির উৎপাদনশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার ও ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পগুলির বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ান হবে আর এভাবে গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনতার কিছুটা উপশম করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি। অতএব ঐ দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। অথচ বর্তমানেও শিল্পায়নের গতিপথ (route) অথবা তার কৌশল (technique) সম্পর্কে কোনো সামগ্রিক সুস্পষ্ট চিন্তাধারা আমাদের নেই।

(ঙ) বিদেশী সাহায্য আমাদের পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে অনেক বিষয় ভালো করে বিবেচনা করতে হয়, যেমন, বিদেশী সাহায্য সময়মত নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে কিনা, বিদেশী ঋণ পরিশোধের ভার আমাদের অর্থনীতি কতটা বহন করতে পারে, আমাদের দেশীয় মুদ্রার কতটা আমরা একটি বিদেশী সরকারের হাতে তুলে দিতে পারি ইত্যাদি। আবার দেশী-বিদেশী সহযোগিতা (foreign collaboration) সম্পর্কেও ভাবা দরকার যে, ভবিষ্যতে কি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রায় বিদেশী দায় মেটাবার

প্রয়োজন দেখা দেবে, আমাদের বিজ্ঞানী ও কারিগরদের উপর এটা কতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং আমাদের সমগ্র অর্থনীতির উপর এর কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। এ সব কিছু সম্পর্কে সুচিন্তিত নীতি থাকা দরকার।

(চ) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আয়-বণ্টনের যে কাঠামো বিদ্যমান তার কথা না হয় বাদই দেওয়া হল, এমন কি পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্গের মধ্যে আয় বণ্টনের যে কাঠামো রয়েছে, ভারতে তাও অনুপস্থিত। সমগ্র পরিকল্পনাকালে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য স্থিতিকরণের কর্মসূচি গ্রহণে ও রূপায়ণে কেমন যেন একটা দৃঢ় সংকল্পের অভাব ছিল, এবং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এতে সরকারী নীতির দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনের প্রভাব বাড়ছিল। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলির অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে এমন কোনো সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। কর্মহীনতার সমস্যাটি বিরাট বলে সেটা ক্রমাগত এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ন্যূনতম মজুরি ও যৌথ দরকষাকষির ব্যবস্থা (যা ইউরোপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে) এদেশের শ্রমিকদের সর্বাধিক অসুবিধাগ্রস্ত ও আর্থিক দিক থেকে দুঃস্থ অংশকে স্পর্শ করতে পারেনি। দিন মজুর ও কৃষি-শ্রমিকদের রক্ষার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে পরিকল্পনাগুলি এমনভাবে রূপায়িত হচ্ছিল যার ফলে কারবারীরাই অধিক উপকৃত হচ্ছিল। পুঁজি মঞ্জুরি, আমদানির অনুমতি, রপ্তানির বিশেষ প্রণোদনা, ঋণমঞ্জুর, বিদেশী পুঁজির সাথে যুক্ত প্রচেষ্টার চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছিল।

(ছ) শিল্প পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ করতে গিয়ে স্বভাবতই কতকগুলি স্থান নির্বাচন করতে হয়। তাতে বৃহৎ শহরের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। এটা সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে (socio-economic overheads) বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটায়। এতে দেশের বাকি অঞ্চল অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা ছাড়া দেশের সঞ্চয় ও করনীতি শহরাঞ্চলের অধিবাসী উদ্যোক্তা ও শিল্পপতিদের আরও বেশি উদ্বৃত্ত কবায়ত্ত করবার সুযোগ দিচ্ছে। কার্যত, কর্মসংস্থানের বিষয়টিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয় না বলে অদক্ষ শ্রমিক-সংখ্যা বাড়ছে ও তাদের মজুরি কমছে। অপরদিকে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সে সব ক্ষেত্রে ঐসব কর্মীদের অত্যন্ত উচ্চ হারে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এর নিয়ন্ত্রণ বা যুক্তিসম্মত সংস্কারের কোনো সরকারী চেষ্টাই নেই। এর ফলে, দেশের উৎপাদন কাঠামোতে বিকৃতি ঘটেছে। মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ও অত্যুচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজনে বিলাস-দ্রব্য উৎপাদনের প্রবণতা বাড়ছে। বিলাস-বহুল হোটেল নির্মাণে সরকারী উৎসাহদান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিকৃতির পরিচয় বহন করছে।

এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল, ভারতের মত জনবহুল বিরাট দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত করার জন্য যেরূপ সুসমন্বিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজন ছিল, পরিকল্পনাকারীরা তার গুরুত্ব ঠিকমতো উপলব্ধি করেন নি। দেশে আয় ও ধনবৈষম্য বৃদ্ধি, খাদ্য সংকটের আবির্ভাব, কর্মহীনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি এরই ফল।

বর্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হচ্ছে ও হবে। আগামী পরিকল্পনার অপরিহার্য কর্তব্য হবে: (ক) গ্রামীণ অর্থনীতিতে শক্তি সঞ্চার; (খ) একটি ন্যূনতম জাতীয় জীবনযাত্রার মান প্রতিষ্ঠা; এবং (গ) শিল্পায়নের গতিপথ ও কৌশল নির্ধারণ। দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে বলে পরিকল্পনার প্রয়োজনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্য মেনে বেসরকারী ক্ষেত্রকে চলতে হবে। কর্মসংস্থানের কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য হবে। ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহণ ও সংসরণের প্রসারের উদ্দেশ্যে বৃহৎ পরিকল্পনার সাথে আঞ্চলিক শিল্পায়নের পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

অব্যবহৃত ও অবহেলিত সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের উপর ও মানবিক শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এজন্য পরিকল্পনা রচনার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন ও পরিকল্পনা রূপায়ণে ভিন্নতর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। একাজে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্দীপনাপূর্ণ অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

১০.১৫. নয়া অর্থনৈতিক নীতি
The New Economic Policy

১৯৮৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তাঁর সরকারের নয়া অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করেন। একই সময়ে সপ্তম পরিকল্পনা শুরু হবে বলে, নয়া অর্থনৈতিক নীতির কাঠামোর মধ্যেই সপ্তম

পরিকল্পনা রূপায়িত হতে শুরু করে। নয়া অর্থনীতির মূলকথা হল : উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার এবং উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি লাভের জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ। এই উদ্দেশ্যগুলির অনুসরণে রচিত নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রধান অঙ্গগুলি হল : (১) শিল্প ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণগুলির শিথিলকরণ বা প্রত্যাহার সহ উদারীকরণ নীতি ;

(২) প্রতিযোগিতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ;

(৩) ফিসক্যাল নীতির পুনর্বিন্যাস ;

(৪) অতি আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে শিল্পের আধুনিকীকরণ ; এবং

(৫) বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃহত্তর ভূমিকা।

নয়া অর্থনৈতিক নীতির অনুসারী নয়া রপ্তানি-আমদানি নীতিও ১৯৮৫ সালে ঘোষিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হল :

(১) আমদানির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ;

(২) আমদানির নিরবচ্ছিন্নতা এবং রপ্তানি-আমদানি নীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ;

(৩) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের ভিত্তিটি শক্তিশালী করা ; এবং

(৪) প্রযুক্তির উন্নতি সুনিশ্চিত করা।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি ও নয়া রপ্তানি আমদানি নীতি অনুযায়ী শিল্পগুলির উপর থেকে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি, দ্রব্য সামগ্রী ও কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থার আমদানির উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়েছে ও হচ্ছে।

এই সব পদক্ষেপের সঙ্গে সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদী ফিসক্যাল পলিসিও ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণা অনুসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থাগুলির সংস্কার করা হচ্ছে। এর মূল কথা হল, কর ব্যবস্থা সহজ করা, করের আদায় বাড়ানো, কর ফাঁকি বন্ধ করা এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যে প্রধান হল 'MODVAT' ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন। এর মূলকথা হল, বর্তমানে শিল্পের নানা প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর অত্যধিক অন্তঃশুল্ক রয়েছে। ধীরে ধীরে কাঁচামালের অন্তঃশুল্কের বোঝা কমিয়ে উৎপাদিত পণ্যের উপর অন্তঃশুল্ক বাড়ানো হবে। তাতে উৎপাদকদের খরচ বৃদ্ধির অসুবিধা কমবে, অন্তঃশুল্কের জটিলতা কমবে। মোট অন্তঃশুল্ক প্রায় একই থাকবে কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উৎপন্ন সামগ্রীর উপর শুল্ক ধার্য করার আধুনিক ব্যবস্থাটি (অন্যান্য দেশে VAT or Value Added Tax নামে যা পরিচিত) ভারতে প্রবর্তন করা সম্ভব হবে।

নয়া অর্থনৈতিক নীতির মূল্যায়ন : নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কমানো এবং শিথিল করা হচ্ছে বলে, শিল্পপতিরা এই নীতিকে স্বাগত জানিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে একাধিপত্য কমিয়ে বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও তার জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করায় তারা নয়া অর্থনৈতিক নীতিকে সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৫৬ সালের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউশন-এর শিথিলকরণকে তারা অভিনন্দন জানিয়েছে। নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে এম. আর. টি. পি. আইন ও ফেরা আইনের প্রয়োগও সঙ্কুচিত করায় তারা অত্যন্ত খুশি। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এবং বহুজাতিক করপোরেশনগুলি এতে আনন্দিত হয়েছে। ফলে এখন বিদেশী সহযোগিতার চুক্তি উল্লেখযোগ্য এবং অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়ছে।

কিন্তু এই নীতির সমালোচকদের মতে, এই নীতিটি এতদিন ধরে দেশের অনুসৃত অর্থনৈতিক ও শিল্পনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের চাপে এই নীতি গ্রহণ করে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক করপোরেশনগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। তাদের মতে এই নীতি হল আসলে রেগান ও মার্গারেট থ্যাচারের 'সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস্'-এর অনুকরণ। এই নীতি ভারতে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তা ঘটবে তা ভারতের পক্ষে সামাজিক দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় হবে না। ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতার নামে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির গোষ্ঠীগুলির আধিপত্য বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, এই নীতির ফলে আমদানি করা যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে শিল্পায়ন ঘটবে। যথেচ্ছ আমদানির দরুন অন্যান্য নতুন সমস্যা দেখা দেবে। শিল্পায়নের গতি প্রকৃতির উপর দেশের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

তৃতীয়ত, এই নীতিতে সমাজের বিত্তশালী অংশের মধ্যে ভোগবাদ (consumerism) উৎসাহ পাবে। সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন বাড়বে না।

চতুর্থত, এই নীতিতে ধনীরা আরও ধনী এবং গরিবরা আরও গরিব হবে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে তাই নয়া অর্থনৈতিক নীতি একটা জুয়া খেলার মতো। দেশের কোটি কোটি গরিব মানুষ এই নীতিতে উপকৃত হবে না।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১. ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অর্থ-সংগ্রহের মূল উৎসগুলি নির্দেশ কর। এই প্রসঙ্গে ঘাটতি ব্যয় ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ কর।

[Indicate the main sources of financing the five-year plans of India. Analyse in this connection the role played by deficit financing in planned economic development in India.]

[C.U. B.A. (Pass) 1957]

২. ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রধান ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the principal defects of the five year plans of India.] [B.U. B.Com.(Pass) 1988]

৩. ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের উৎস হিসাবে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা আলোচনা কর।

[Discuss the role of deficit financing as a source financing in five-year plans of India.]

[B.U. B A. Pass) 1988]

৪. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি কি কি? [V.U. B.A. (Pass) 1988]

৫. ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মূল উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the principal objectives of the five-year plans of India.]

[C.U. B.A. (Pass) 1985]

৬. "বিগত ৪০ বৎসর ধরে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও সঙ্কট সূচিত করে এমন কিছু বাস্তব তথ্য ও সত্য প্রকট হয়েছে।"—উক্ত বাস্তব তথ্য ও সত্যগুলি বিবৃত কর।

["In spite of the developmental efforts of the last 40 years the Indian economy has revealed some facts pointing to its weaknesses and difficulties."—State the facts referred to in this statement.]

৭. ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রণয়ন ও রূপায়ণ সম্পর্কে যে সব সমালোচনা করা হয়েছে সেগুলি বর্ণনা কর।

[The Five-year Plans of India have been subjected to criticism for the way they have been formulated and executed. Elaborate the various points of criticism.]

৮. ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের প্রণয়ন ও রূপায়ণে যে সব ত্রুটি ও বিচ্যুতি ধরা পড়েছে সেগুলি সংশোধনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?

[What measures should be adopted to rectify the defects and distortions in regard to the formulation and implementation of the Five-year Plans of India?]

৯. ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

[Mention some of the special features of economic planning in India.]

তৃতীয় খণ্ড

অর্থনীতিক বিকাশের নির্দেশকসমূহ
INDICATORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

জাতীয় আয় ও আয়ের বণ্টন
National Income And Income Distribution

জাতীয় আয় / ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপে অনুসৃত পদ্ধতি / ভারতের জাতীয় আয় হিসাবের অসুবিধা / ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব / ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব / ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ, বৃদ্ধি ও বৈশিষ্ট্য / ভারতের জাতীয় আয়ের গঠন / ভারতের উন্নয়ন হারের বৈশিষ্ট্য / জাতীয় আয়ের বিবিধ উৎসের উন্নয়ন হারের পার্থক্য / জাতীয় আয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী ক্ষেত্রের অবদান / অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য / বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ / আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাসের ব্যবস্থা / মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট (১৯৬০)/ একচেটিয়া কমিশন / শহরাঞ্চলের সম্পত্তির ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ / শহরাঞ্চলের জমির সিলিং আইন / দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ / আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

১১.১. জাতীয় আয়
National Income

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনও বিভিন্ন পরিকল্পনায় জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। কারণ, জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য জাতীয় আয়, তথা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ছাড়া অন্য পথ নেই।

২. **জাতীয় উৎপন্ন বা আয় হল, দেশের শ্রমশক্তি পুঁজি ও দেশের** প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দ্বারা প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রকারের যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কাজের সৃষ্টি হয় তার মোট পার্থিব মূল্য। মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনের [illegible] খাতে (depreciation) **বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্ন** (Net National Income or Product) পাওয়া যায়।

৩. সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়: (১) দেশের অধিবাসীরা কোনো বিশেষ সময়ে (ধরা যাক এক বৎসরে) যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কাজ উৎপাদন করে তার পার্থিব মূল্যের সমষ্টিই হল জাতীয় আয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি** (Output or Final Products Total), (২) কোনো বিশেষ সময়ে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ (যথা ভূমি, শ্রম, পুঁজি এবং সংগঠন) যে পার্থিব আয় উপার্জন করে তার যোগফল হল জাতীয় আয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **উপাদান-পারিশ্রমিকের সমষ্টি** (Factor Payments Total) **বা আয়-সমষ্টি পদ্ধতি** (Income Total Method)।

১১.২. ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপে অনুসৃত পদ্ধতি
Methods of Measuring National Income in India

১. ভারতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য জাতীয় আয় পরিমাপে উপরোক্ত পদ্ধতি দুটির কোনোটিই সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য এদেশে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে আয়-সমষ্টি বা উপাদান-পারিশ্রমিক সমষ্টির পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫১ সালের জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়। পরবর্তী কাল থেকে **কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন** (Central Statistical Organisation) ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব প্রকাশ করে চলেছে।

১১.৫. ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব
Estimation of India's National Income: Importance

১. সব দেশেই জাতীয় আয় পরিমাপের প্রয়োজন হয়। কারণ, জাতীয় আয়ের হিসাব ও তথ্য দেশের সমগ্র অর্থনীতির ছবি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, অর্থনীতির সমস্যাগুলির প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে এবং অর্থনীতির অগ্রগতি নির্দেশ করে। ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের বিষয়টিও নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

২. জাতীয় আয়ের তথ্য থেকে ভারতের অর্থনীতিতে কি পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন হয়েছে তা বোঝা যায়। এ ছাড়া শিল্পের উৎপাদন, সঞ্চয়, পুঁজি গঠন কিভাবে কোন্ দিকে চলেছে তারও হদিশ মেলে। এর থেকে সরকার প্রয়োজন মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতে পারে।

৩. জাতীয় আয়ের হিসাব জানা থাকলে ভারতের মত দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কি পরিমাণ সাহায্য-অনুদান দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৪. জাতীয় আয়ের তথ্যই হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি। কারণ, এই তথ্য থেকেই দেশে কি পরিমাণ সম্বল ও উপকরণ রয়েছে তা জানা যায় এবং অর্থনীতির কোন্ ক্ষেত্রে কি ধরনের ঘাটতি বা অপূর্ণতা রয়েছে তা ধরা যায়। এ সব সুবিধার জন্যই ভারতের জাতীয় আয়ের তথ্য জানা দরকার।

৫. কোনো আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোন্ দেশের উপর কি পরিমাণ আর্থিক দায় চাপান সম্ভব তা নির্ণয় করা যায় জাতীয় আয়ের তথ্যের মাধ্যমে। কেননা জাতীয় আয়ের তথ্যের মাধ্যমেই বিশেষ বিশেষ দেশের দায় পরিশোধ ক্ষমতার পরিমাপ করা যায়। ভারতেও জাতীয় আয়ের হিসাব এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে বিভিন্ন বৎসরে কি পরিমাণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে তারও চিত্র জাতীয় আয়ের তথ্যের সাহায্যে বোঝা যায়।

৭. অন্যান্য দেশের মত ভারতেও জাতীয় আয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করেই বাৎসরিক বাজেটের খসড়া রচনা করা হয়।

এ সব কারণে আমরা বলতে পারি, জাতীয় আয়ের

সারণি ১১-২ঃ ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়

উপাদান খরচে নীট জাতীয় উৎপাদ

বৎসর	১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরে: নীট জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরে: মাথাপিছু আয়	চলতি মূল্যস্তরে: নীট জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	চলতি মূল্যস্তরে: মাথাপিছু আয়
১৯৫০-৫১	১৬,৭৩১	৪৬৬	৮,৮১২	২৪৫.৫
১৯৫৫-৫৬	১৯,৯৫৩	৫০৭.৭	৯,২৬২	২৩৫.৭
১৯৬০-৬১	২৪,২৫০	৫৫৮.৮	১৩,২৬৩	৩০৫.৬
১৯৬৫-৬৬	২৭,১০৩	৫৫৮.৮	২০,৬৩৭	৪২৫.৫
১৯৭০-৭১	৩৪,২৩৫	৬৩২.৮	৩৪,২৩৫	৬৩২.৮
১৯৭৫-৭৬	৪০,২৭৪	৬৬৩.৫	৬২,৩০২	১,০২৬.৪
১৯৮০-৮১	৪৭,৮১৪	৬৯৮.৩	১,০৫,৭৪৩	১,৫৫৭.৩
১৯৮৫-৮৬	৬০,১৪৩	৭৯৭.৭	১,৯৫,৭০৭	২,৫৯৫.৬
চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক উন্নয়ন হার				
প্রথম পরিকল্পনাকাল	৩.৬	১.৭	১.০	(—)০.৮
দ্বিতীয় "	৪.০	১.৯	৭.৪	৫.৩
তৃতীয় "	২.২	—	৯.২	—
তিনটি বার্ষিক "	৪.০	১.৮	১১.৫	৯.১
চতুর্থ "	৩.৪	১.১	১২.০	৯.৫
পঞ্চম "	৫.২	২.৯	১০.০	৭.৬
ষষ্ঠ "	৫.৩	৩.১	১৪.৫	১২.০

সূত্র: Economic Survey, 1986-87.

তথ্য থেকেই ভারতের অর্থনীতির এক সাধারণ চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

১১.৬. ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ, বৃদ্ধি ও বৈশিষ্ট্য

India's National Income : Measurement, Growth and Features

১. ভারতে মোট **জাতীয় আয় বাড়ছে।** ১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরে, ১ম পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে বাৎসরিক ৩·৬ শতাংশ হারে, ২য় পরিকল্পনায় বাৎসরিক ৪ শতাংশ হারে, ৩য় পরিকল্পনায় বাৎসরিক ২·২ শতাংশ হারে। পরবর্তী তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনা বৃদ্ধির হার ছিল ২·৪ শতাংশ। ৪র্থ পরিকল্পনা ও ৫ম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বেড়েছে যথাক্রমে ৩·১ শতাংশ ও ৪ শতাংশ হারে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা কালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার প্রকৃত পক্ষে ৪ শতাংশের মতো। সপ্তম পরিকল্পনার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৫ শতাংশ। সমগ্র পরিকল্পনার ৩৯ বছরে জাতীয় আয় প্রতি বছর গড়ে ৩·৫ শতাংশ হারে বেড়েছে।

২ **মাথাপিছু আয়ও বাড়ছে।** প্রথম পরিকল্পনায় মাথাপিছু আয় শতকরা ১·৮ ভাগ ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার শতকরা ১·৯ ভাগ বেড়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মাথাপিছু আয় বাড়েনি। পরবর্তী তিন বৎসরে বেড়েছে শতকরা ৫·১ ভাগ। চতুর্থ পরিকল্পনায় বেড়েছে ৬ শতাংশ এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় বেড়েছে ১ শতাংশ হারে। পরিকল্পনার ৩৯ বৎসরে গড়পড়তা বৎসরে ১·৪ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বেড়েছে।

৩. পরিকল্পনার গত ৩৯ বৎসরে মোট জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরিকল্পনার প্রয়োগ সত্ত্বেও **অর্থনীতিক উন্নয়নের গতি সুষম হয়নি এবং আয় বৃদ্ধির হার** এখনই স্থির থাকেনি, **বারে বারে ওঠানামা** করেছে। অর্থনীতিক

সারণি ১১-৩ : জাতীয় আয়ে বিভিন্ন উৎসের অবদান

(১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরে, শতাংশ হিসাবে)

	১৯৫০-৫১	১৯৭০-৭১	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৬-৮৭
প্রাথমিক ক্ষেত্র	৬১·৩	৫০·০	৩৯·৭	৩৯·০
কৃষি	৫৮·৭	৪৭·২	৩৭·২	৩৬·৬
বন	১·৩	১·২	০·৫	১·২
মাছধরা	০·৬	০·৭	০·৬	
খনি	০·৭	০·৯	১·৫	১·২
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	১৪·৫	১৯·৮	২১·১	২১·০
প্রস্তুতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	১০·০	১৩·৬	১৫·৯	
নির্মাণ ও পূর্ত	৪·৩	৫·৩	৪·৫	
বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল	০·২	০·৯	০·৭	
তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্র	২৪·২	৩০·২	৩৯·০	৪০·০
ব্যবসায়, পরিবহণ ইত্যাদি	১১·৬	১৫·৮	১৯·০	
অর্থ সংস্থান ও বাস্তুসম্পত্তি	৩·৫	৪·৮	৬·৯	
সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত সেবা	৯·১	৯·৫	১৩·১	
নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

সূত্র : **National Accounts Statistics (1970-71 to 1979-1980). February, 1983 also quick estimates for 1983-84 and Statistical Outline of India, 1986-87.**

সারণি ১১.৫ : জাতীয় আয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী ক্ষেত্রের অবদান
(শতাংশ হিসাবে)

	১৯৬০-৬১	১৯৭৯-৮০
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	১০.৭	২০.৭
বেসরকারী ক্ষেত্র	৮৯.৩	৭৯.৩
মোট	১০০.০	১০০.০

সূত্র : National Accounts, Statistics G S O February 1982

২ ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎপন্নে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অবদান ১০.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০.৭ শতাংশে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এর মধ্যে সরকারী প্রশাসনিক কার্যাবলীর অংশ হল ৮ শতাংশ, বিভাগীয় সংস্থাগুলির অংশ হল ৩.৯ শতাংশ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অংশ হল ৮.৮ শতাংশ।

৩ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনের অংশ বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপন্নে বেসরকারী ক্ষেত্রের অংশ এই সময়ে ৮৯.৩ শতাংশ থেকে কমে ৭৯.৩ শতাংশ হয়েছে।

১১.১১ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য

Economic Inequality and Poverty

১ ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা। পরিকল্পনার ফলে সেই অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য কমেছে কিনা বর্তমানে এই প্রশ্ন উঠেছে। পরিকল্পনার প্রথম দশকের শেষদিকে মহলানবিশ কমিটি বলেছিল, পরিকল্পনার ফলে দেশে [illegible] সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই দেশের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি কুক্ষিগত করে ফেলেছে। ১৯৬২ সালে অধ্যাপক গ্যাডগিল বলেছিলেন পৃথিবীর মধ্যে যে দেশগুলির আয় সর্বাপেক্ষা কম, ভারত তাদের অন্যতম, আবার যে সব দেশে আয় বণ্টনে সর্বাপেক্ষা বেশি বৈষম্য রয়েছে ভারত তাদেরও অন্যতম।

২ ১৯৬২ সালে অধ্যাপক গ্যাডগিল প্রমুখ ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরে) মাসিক মাথাপিছু অন্তত ২০ টাকা ভোগব্যয় প্রয়োজন বলে গণ্য করে (এ ২০ টাকার ভোগব্যয়ের স্তরই এখনকার হিসাবে দারিদ্র্য রেখা) বলেছেন, ঐ সময়ে ভারতের গ্রামবাসীর ৪০ শতাংশের ও শহরবাসীর ৫০ শতাংশের ঐ পরিমাণ ব্যয় করার ক্ষমতা ছিল না। ১৯৬৪-৬৫ সালে গ্রামের ৪৫ শতাংশ মানুষ ও শহরের ৫১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে ছিল। একটি হিসাবে দেখা যায় ১৯৬৭-৬৮ সালে দেশবাসীর ৪৯ শতাংশ দারিদ্র্য রেখার নিচে ছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থিত গ্রামের মানুষের অনুপাত বেড়ে ৫৪ শতাংশে পরিণত হয়। সপ্তম ফিন্যান্স কমিশনের মতে এখনও দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ দারিদ্র্য রেখার নিচে রয়েছে।

৩. জমির মালিকানা সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, একদিকে গ্রামাঞ্চলের ৫ শতাংশ পরিবার আবাদী জমির ৩৭ শতাংশের মালিক, আর অন্যদিকে ২০ শতাংশ পরিবারের কোনো জমি নেই। শহরাঞ্চলে একদিকে ৫ শতাংশ পরিবার ৫২ শতাংশ সম্পত্তির মালিক, আর অন্যদিকে ২০ শতাংশ পরিবারের কোনো সম্পত্তি নেই।

৪ জাতীয় আয় বণ্টনের তথ্য থেকে দেখা যায় দেশের একদিকে ১ শতাংশ মানুষ জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ মানুষ জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশেরও বেশি ভোগ করে। অন্যদিকে, ৫০ শতাংশ মানুষ পায় জাতীয় আয়ের মাত্র ২০ শতাংশের মত।

৫. জাতীয় ভোগ (national consumption) সম্পর্কে নমুনা সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, দেশের ১০ শতাংশ মানুষ জাতীয় ভোগের ৩০ শতাংশ নেয়, আর অন্যদিকে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ পায় মাত্র জাতীয় ভোগের ২০ শতাংশ।

৬ ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের (১৯৬৭-৬৮) তথ্য দেখিয়ে দিচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু বার্ষিক গড়পড়তা ভোগব্যয়ের পরিমাণ হল মাত্র ২৬১ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা মাত্র। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের মধ্যে উচ্চবর্গের পক্ষে তাও সম্ভব হয় না। গ্রামীণ মানুষের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি মানুষের দৈনিক ভোগব্যয় ৬৭ পয়সারও কম। শহরাঞ্চলের মানুষের অবস্থাও এর চেয়ে বিশেষ ভাল নয়। শহরের মানুষের মাথাপিছু মাসিক ভোগব্যয় মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে। কোথাও কোথাও তারও কম। শহরের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষের দৈনিক ভোগব্যয় ৬৭ পয়সারও কম। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ১৯৬৭-৬৮ সালে জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগেরই ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার সঙ্গতি ছিল না।

৭. এ ছাড়া দেশে ক্রমবর্ধমান ধন ও আয় বৈষম্য, মুষ্টিমেয় মানুষের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের আরও পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর নতুন ধনী দেখা দিয়েছে যাদের সমৃদ্ধি গড়ে ওঠার পেছনে আছে দেশের অভাব ও অনটনের অবস্থা। সরকারী কর, ভরতুকি

* Planning and Economic Policy in India . D R Gadgil ,2nd Ed, 1962

ব্যবস্থার দাক্ষিণ্য, পরিকল্পনার বিপুল ব্যয় ও তার মাধ্যমে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা এবং সরকারী অর্থনীতিক নীতিগুলির আশীর্বাদে এরা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি অল্প আয়ের চাষীদের ও গ্রামের ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কোনো উপকারেই আসেনি কারণ, সুবিধার সবটুকুই ভোগ করেছে ধনী ও বড় চাষীরা। এমনকি কৃষির যে ভরতুকি ও সহায়ক মূল্যব্যবস্থা (subsidy and price support measures) প্রবর্তিত হয়েছে, তাও উপকার করেছে বৃহৎ ধনী-চাষী ও বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনকারীদের। প্রকৃত ভূমিসংস্কার প্রবর্তনে ব্যর্থতা দেশের ধন ও আয় বৈষম্যকে তীব্র ও তীব্রতর করে তুলেছে। জমি থেকে ভাগচাষী উচ্ছেদের সংখ্যা অগণিত। সর্বোপরি, ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যস্তরের বৃদ্ধি এই বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রামের ক্ষেতমজুরদের অন্তত ১০ শতাংশ সম্পূর্ণ বেকার। অন্যদিকে শহরাঞ্চলের বেকার সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। আর দ্রব্যমূল্যস্তর বৃদ্ধি অল্প ও স্থির আয়ের মানুষের প্রকৃত আয় কমাচ্ছে। বৃহৎ চাষী, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও শিল্পমালিক এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধিকে আকাশছোঁয়া করে তুলেছে। দেশে কালো টাকার পালটা অর্থনীতি এই অবস্থারই আর একটি লক্ষণ মাত্র।

৮. সারা দেশে মাথাপিছু আয়ের গড় যাই হোক, শহরাঞ্চলের তুলনায় কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু গড় আয় কম। ১৯৭০-৭১ সালের একটি হিসাবে দেখা যায় সে সময় দেশে মাথাপিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন ছিল ৬৩৮ টাকা ; কিন্তু সে সময় গ্রামাঞ্চলে নীট অভ্যন্তরীণ মাথাপিছু উৎপন্ন ছিল ৪৯৯ টাকা ও শহরাঞ্চলে ১,২০১ টাকা। অথচ সে সময় নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের প্রায় ৬৩ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল। এই মাথাপিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নকে যদি আয় ধরা যায়, তাহলে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের মানুষের অবস্থা প্রায় আড়াইগুণ ভালো।

শ্রমিকপিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন (value added) বিচারে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা প্রায় তিন গুণ বেশি। এর কারণ গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগের স্বল্পতা, পুরাতন কারিগরী কৌশল ও ব্যাপক গ্রামীণ অনুন্নতি।

সারণি১১-৬ : গ্রাম ও শহরের নীট অভ্যন্তরীণ মাথাপিছু উৎপন্ন (১৯৭০-৭১)

	মোট উৎপন্ন	গ্রামীণ	শহরাঞ্চলীয়	মোট উৎপন্নের শতাংশ রূপে গ্রামীণ উৎপন্ন
মোট উৎপন্ন (কোটি টাকায়)	৩৪,৫১৯	২১,৬৭২	১২,৮৪৭	৬২ ৮
জনসংখ্যা (কোটি)	৫৪'১	৪৩'৪	১০ ৭	
বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন (টাকায়)	১৭ ৮	১৪'৭	৩ ১	
	৬৩৮	৪৯৯	১,২০১	
শ্রমিক পিছু মূল্য সংযোজন	১,৮৪৪	১,৪৪৩	৩,৯৩০	

সূত্র : National Accounts Statistics, G.S O. January. 1981

৯. কেবল ব্যক্তি এবং শ্রেণীতে নয়, রাজ্যগুলির মধ্যেও ভারতে আয়ের, নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন এবং মাথাপিছু রাজ্য আয় বৃদ্ধির হারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

১১.১২. বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ

Causes of Increase in Inequality

ধনবৈষম্য হ্রাসের জন্য সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্য ও গৃহীত নীতি সত্ত্বেও ফল কেন বিপরীত হল তার কারণ হিসাবে নিচের বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে :

১. **ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামো :** যে সব সরকারী আমলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হিসাবে সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োগ করে, তারা দেশের সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলিকে কখনই সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে শেখেনি। সরকারের দৃষ্টিতে এরাই সর্বজ্ঞ ; তাই সরকারও কখনই জনসাধারণের উপর নির্ভর না করে এইসব কর্মচারীর উপরেই নির্ভর করে। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিণাম হয় ব্যর্থতা।

২. **ধনিকশ্রেণীর প্রভাব :** দেশের পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সাধারণত ধনিক, বণিক এবং সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। পরিকল্পনার রূপায়ণের দায়িত্ব প্রধানত এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপরেই দেওয়া হয়। এ কারণে ভারতের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়নি।

৩. **একচেটিয়া মালিকানা :** পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শিল্পক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর ফলে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে বিপুল

২. দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্র অর্থনীতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিক কেন্দ্রীভবনের অপর দৃষ্টান্ত। ১৯৫৯ সালে ভারতের ৩৬৩টি ব্যাঙ্কের মোট আমানতের ৭৮% ছিল ২৫ কোটি টাকার অধিক আমানত বিশিষ্ট ১৫টি ব্যাঙ্কের করায়ত্ত। দেশের বড় ও মাঝারি আয়তনের কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রধানত ব্যাঙ্কঋণের দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন, ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ও জীবনবীমা করপোরেশনের মতো সরকারী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পেয়ে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করে নিয়েছে; এতে বৃহদায়তন কোম্পানিগুলি আরো বড় হবার সুবিধা পেয়েছে বেশি। অন্যদিকে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োজনীয় ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বৃহদায়তন কোম্পানিগুলির মালিকের হাতে অর্থনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে, দেশী ও বিদেশী সম্মিলিত উদ্যোগে যুক্ত প্রতিষ্ঠান (Collaboration) স্থাপন। এর মাধ্যমে বিদেশী পুঁজি ও শিল্পকৌশল এদেশে আসছে। এর সুযোগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আরও বড় হবার সুযোগ পাচ্ছে। ভারতের অর্থনীতিতে এ প্রবণতা আশঙ্কার কারণ হয়ে পড়েছে। এর প্রতিকারের জন্য কিছু কিছু সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত হলেও ফল তেমন কিছু হয়নি। বরং আগের চেয়ে কেন্দ্রীভবনের ঝোঁক আরো বেড়েছে।

৪. তবে বৃহদায়তন শিল্পগোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটেছে বলে তার দ্বারা সমাজবিরোধী নীতি গৃহীত হচ্ছে এটা বোঝায় না। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী বৃহদায়তন উৎপাদনের সুফলগুলিই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সাহায্য করেছে।

৫. কমিটি এই মত প্রকাশ করে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ জাল কিরূপ বিস্তৃত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি অনুসন্ধানকারী কমিটি বা কমিশন নিয়োগের প্রয়োজন। কমিটি আরও বলে যে, অর্থনীতিক ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবনের বিরোধী এবং অর্থনীতিক উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

১১.১৫. মনোপলিজ কমিশন

The Monopolies Commission

১. মহলানবিশ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রী কে. সি. দাসগুপ্তকে সভাপতি করে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে কমিশন তাদের বিবরণ পেশ করে।

২ কমিশন ভারতে একচেটিয়া কারবারের বিপুল প্রভাব দেখতে পেয়েছে এবং তাদের নানারূপ অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করেছে। একচেটিয়া কারবারের এই সব অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ দমন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশন একটি স্থায়ী 'একচেটিয়া কারবারী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' স্থাপনের সুপারিশ করে। ভারত সরকার এই সুপারিশ অনুসারে একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতা নিরোধী কারবারী কার্যকলাপ খর্ব করার জন্য 'মনোপলিজ অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাস করে সে আইনটি কার্যকর করার ভার দিয়ে একটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করেছে। এই কমিশনের বিবরণের বিস্তারিত আলোচনা 'ভারতের শিল্পায়ন' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১১.১৬ শহরাঞ্চলের সম্পত্তির ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ

Fixation of Ceiling on Urban Property

১. ১৯৭৬ সালে শহরাঞ্চলে জমির মালিকানার উপর সিলিং ধার্য করে পার্লামেণ্টে একটি আইন পাস হয়েছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল।

২. **পক্ষে যুক্তি:** ১. সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন যেখানে ভারত সরকারের লক্ষ্য, সেখানে শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর ঊর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দেওয়াই কর্তব্য। ২. সমাজে অর্থনীতিক অসাম্য দূর করা ও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন বন্ধ করার জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। অল্পসংখ্যক লোক শহরাঞ্চলে বিপুল সম্পত্তি ভোগ করবে এবং এই সম্পত্তি থেকে আয়ের উপরেই জীবিকা নির্বাহ করবে, অপরদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ সম্পত্তির বিন্দুমাত্র ভাগও পাবে না—এটা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং জনমনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করতে থাকবে। দেশের রাজনীতিক স্থিতির দিক থেকে এটা খুবই প্রয়োজনীয়। ৩. সম্পত্তির ঊর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দিলে যে সম্পত্তি উদ্বৃত্ত হিসাবে গণ্য হবে সেটা সম্পত্তিহীনদের মধ্যে হস্তান্তরিত করলে তার সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে, উৎপাদনের কাজে আরো ভালোভাবে তাকে নিয়োগ করা যাবে। ৪. গ্রামাঞ্চলের জোত-জমির

মালিকানার উপর যেখানে ঊর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে শহরাঞ্চলের সম্পত্তির মালিকানা বেঁধে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৩. **বিপক্ষে যুক্তি**: ১. গ্রামাঞ্চলের জোত-জমির মালিকানার উপর উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়া আর শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়া, এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। একটা বিষয় দিয়ে অপর বিষয়কে সমর্থন করা যায় না। ২. এদেশে ব্যক্তিগত আয়ের উপর উচ্চতম প্রান্তিক আয়করের হার ৭০ শতাংশ এবং সম্পদকরের উপর করের হার হল ১৫ শতাংশ। এ হার পৃথিবীর অন্য সব দেশ থেকেই বেশি। এত উচ্চহারে কর বস্তুতপক্ষে ব্যক্তির আয়ের উপর এক ধরনের সীমা বেঁধে দেওয়া। এর উপর, শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর সীমা বেঁধে দিলে এ শ্রেণীর লোকের উপর অবিচার করা হবে। ৩. শহরাঞ্চলের বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরা বাসগৃহ ও আবাসবাড়ি তৈরি করে সমাজের উপকারই করেছে। তারা বৃহৎ অট্টালিকা তৈরি করে শহরাঞ্চলের গৃহ সমস্যা সমাধানের পথে সাহায্য করছে। একাজে বিনিয়োগও করছে প্রচুর পরিমাণে। এ ক্ষেত্রে উচ্চতম সীমা বেঁধে দিলে এ কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। ৪. বিভিন্ন করের ক্ষেত্রে যেমন কর ফাঁকির প্রবণতা দেখা দেয়, তেমনি শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর উচ্চতম সীমা বেঁধে দিলে সেটাকে এড়িয়ে যাবার সব রকমের চেষ্টা হবে। বেনামীতে সম্পত্তি ধরে রাখার চেষ্টা হবে। তাতে আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। ৫. উচ্চতম সীমার ঊর্ধ্বে যে সম্পত্তি উদ্বৃত্ত হিসাবে পাওয়া যাবে সেটা অধিগ্রহণ করতে হলে সরকারের যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করাই এক সমস্যা হবে। ৬. এ আইন চালু করতে হলে এক বিরাট প্রশাসনিক সংস্থা স্থাপন করতে হবে এবং তার কাজও হবে খুব জটিল। তাই এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে কতদূর সম্ভব সে সম্পর্কে প্রশ্ন থাকবে।

সব দিক বিচার করে বলা যায়, শহরাঞ্চলে সম্পত্তির উপর উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত।

১১.১৭. দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ
Measures to Reduce Poverty : Causes of Failure

১. ভারতের অর্থনীতিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনার সূত্রপাত থেকেই জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি সাধনকে অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সাধারণ গরিব মানুষের বাঁচার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার বলা হয়েছিল সাধারণ মানুষের এবং সমাজের গরিব ও দুঃস্থ অংশের অবস্থার উন্নতির জন্য জাতীয় ন্যূনতম বাঁচার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা পরিকল্পনার জন্য খরচের পর পঞ্চম পরিকল্পনায় অর্থাৎ ২৮ বৎসর পরিকল্পনার পর বলা হল এখন দেশে আনুমানিক ২২ কোটি মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে রয়ে গেছে! আরও বলা হল, বেকারী, প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা এবং কোটি কোটি চাষীর সম্বলের অভাবটাই হল দারিদ্র্যের মূল কারণ। ঘোষণা করা হল, কেবল উন্নয়ন হার বাড়ালেই এ গরিবী ঘুচবে না, তাই পঞ্চম পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা, প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ও বিরাট জনসমষ্টির দুঃস্থ অবস্থা দূর করার জন্য সরাসরি আক্রমণ চালাতে হবে!! তারপর ষষ্ঠ পরিকল্পনায় হিসাব করা হল, ১৯৭৯-৮০ সালে গ্রামাঞ্চলে ২৫ কোটি ৯৬ লক্ষ (অর্থাৎ গ্রামীণ জনসমষ্টির ৫০.৭ শতাংশ) ও শহরাঞ্চলের ৫ কোটি ৭২ লক্ষ (অর্থাৎ শহরবাসীর ৪০.৩ শতাংশ), অর্থাৎ সারা দেশে মোট ৩১ কোটি ৬৮ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ৪৮.৪ শতাংশ) নাকি দারিদ্র্য রেখার নিচে থেকে গেছে!!! তবে ষষ্ঠ পরিকল্পনাতে এই আশ্বাসও আমাদের দেওয়া হয়েছে যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে ১৯৮৪-৮৫ সালে দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থিত ওই জনসংখ্যাটা নাকি গ্রাম, শহর ও সারা দেশে ৩০ শতাংশ নেমে আসবে।

২. প্রশ্নটা হল, অর্থনীতিক পরিকল্পনা ভারতে দারিদ্র্যের সমস্যা দূর করা দূরে থাকুক, তার তীব্রতা এতটুকু কমাতেও পারল না কেন? শহরাঞ্চলে, শিল্পাঞ্চলে, এমনকি গ্রামীণ মানুষের একটি মুষ্টিমেয় অংশের বিপুল ঐশ্বর্যের পাশাপাশি জনজীবনে দারিদ্র্যের অন্ধকার এত গভীর ও পরিব্যাপ্ত হচ্ছে কেন? এর কারণ হল, দেশের পলিসি নির্ধারকরা ধরে নিয়েছিলেন, বিনিয়োগের দ্বারা অর্থনীতির উন্নয়ন হার বাড়লে আপনা থেকেই আয়ের বৃদ্ধিটা দেশের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে; তার সাথে দেশের কর ব্যবস্থা ও সরকারী ব্যয় নীতির সামান্য পরিবর্তন করে নিলেই কর্মসংস্থান ও মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। অর্থাৎ, ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবশেষগুলির উপর ইংরেজ আমল থেকে যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক কাঠামোর বনিয়াদ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল, দেশের ভাগ্যবিধাতারা সেটি অক্ষুণ্ণ রেখে, পরিকল্পনাকালে তারই সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করলেন। ফলে ভারতে অর্থনীতিক বিকাশ ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করল। স্পষ্টতই, ধনতান্ত্রিক পথে

কেবল শুভেচ্ছা, ও গালভরা বুলি দিয়ে, শুধু কর ব্যবস্থা ও সরকারীব্যয়ের এদিকে সেদিকে পরিবর্তন করে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করা যায় না। কারণ বেকার সমস্যা এবং জনসাধারণের মধ্যে আয় বণ্টনে ব্যাপক বৈষম্যের উপরই ধনতন্ত্রের বুনিয়াদটি রচিত। ধনতন্ত্র বজায় রেখে, তার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য দূর করা এখনও সম্ভব নয়, বিশেষতঃ আজকের স্বল্পোন্নত দুনিয়ায়।

৩ সমাজের পুরাতন অর্থনীতির কাঠামোটি হল সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবশেষগুলির উপর রচিত উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্ক দিয়ে তৈরি। এই কাঠামোতে উৎপাদনের যতটুকু বৃদ্ধি ঘটবে তার সবটুকু না হোক অন্ততঃ বেশির ভাগই যে মালিক-শ্রেণী আত্মসাৎ করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং নতুন বিনিয়োগের দ্বারা সৃষ্ট আয় জনসাধারণের মধ্যে, উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী [illegible] মানুষদের মধ্যে সবিশেষ পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে না। বরং তা একচেটিয়া মালিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। মুনাফার সম্ভাবনা কম হলে ওই মুনাফা থেকে নতুন বিনিয়োগ করে তারা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয় না। [illegible] পরিকল্পনাকালে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার [illegible] বেড়েছে, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন হার [illegible] বাড়েনি। [illegible] উন্নয়ন হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি, দারিদ্র্য কমেনি। ভূমি সংস্কার মারফৎ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক বিলোপের [illegible] চেষ্টা [illegible] করা হয়েছে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোনো রাজ্যে [illegible] সরকারগুলি তা কার্যকর করতে উৎসাহ বোধ করেনি। ফলে সারা ভারতে মোট [illegible] জমির ১ শতাংশও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টিত হয়নি এবং যেটুকু বণ্টিত হয়েছে তার অর্ধেক ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে।

৪. সুতরাং সমাজের বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কটি যতক্ষণ না পরিবর্তিত হচ্ছে, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক স্থাপিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতে বেকার সমস্যা, প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। এর সাথে চাই উৎপাদনের এমন অন্তর্বর্তীকালীন প্রযুক্তিবিদ্যা (intermediate technologies) যার সাহায্যে একদিকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধা গ্রহণ করা যায় এবং অন্যদিকে শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণও সবিশেষ বাড়ানো সম্ভব হয়।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের জাতীয় আয় হিসাব করার ব্যাপারে কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain the nature of the difficulties that are faced in estimating the national income of India.]

২ ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

[Explain the importance of estimating national income of India.]

৩. ভারতের জাতীয় আয়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

[State the features of India's National Income.]

৪. ভারতের জাতীয় আয়ের গঠন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলি বর্ণনা কর।

[State the notable facts relating to the composition of India's national income.]

৫ ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হারের মধ্যে তুলনা করলে কোন্ বিশেষ প্রবণতা উদ্ঘাটিত হয়?

[What special trends are indicated through a comparison between the growth rates of national income and per capita income in India.]

৬. ভারতের উন্নয়নের হারের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

[Indicate the features of the growth rate of Indian economy.]

৭ ভারতের উন্নয়নের হারের যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সে বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্ধারণ কর।

[The rate of economic growth in India reveals certain traits. Explain the causes why such traits manifest themselves.]

৮. "ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল অর্থনীতির বৈষম্য হ্রাস ও জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে অর্থনীতিক বৈষম্য ও জনসাধারণের দারিদ্র্য কমেছে কিনা বর্তমানে এ প্রশ্ন উঠেছে।" যথাযথ যুক্তি ও তথ্য সহযোগে এ প্রশ্নের উত্তর দাও।

["The two main objectives of economic

planning in India were reduction of economic inequality and elimination of poverty of the people. Doubts are being expressed if there has been any success in achieving these goals." Give your opinion on this question stating relevant arguments and facts.]

৯. পরিকল্পনাকালে ভারতের অর্থনীতিতে ধনবৈষম্য বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা কর।

[Explain why there has been an accentuation of income inequality in India during the plan period.]

১০. ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে যে বৈষম্য বর্তমানে প্রকট হয়েছে, সেটা হ্রাস করার জন্য তুমি কি পন্থা সুপারিশ করবে?

[What programme of action would you prescribe so that the prevailing inequality in income and wealth distribution may be reduced?]

১১. ভারতে আয় ও ধনবৈষম্য হ্রাসের জন্য সরকার কর্তৃক কি কি ব্যবস্থা ও নীতি গৃহীত হয়েছে?

[What measures and policies have been adopted by the government of India to reduce inequality in the distribution of income and wealth?]

১২. ভারতে আয়বণ্টন ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ১৯৬০ সালে গঠিত মহলানবিশ কমিটির রিপোর্টের উপর একটি টীকা লেখ।

[Write a note on the report of the Mahalanobis Committee of 1960 about income distribution and standard of living in India.]

১৩. শহরাঞ্চলে জমির মালিকানার উপর সিলিং ধার্য করার সমর্থনে কি কি যুক্তি দেখান হয়?

[What arguments are given in support of fixation of ceiling on the ownership of urban land?]

১৪. শহরাঞ্চলে জমির মালিকানার উপরে সিলিং ধার্য করার বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি দেখানো হয়?

[What arguments are put forward against fixation of ceiling on the ownership of urban land?]

১৫. পরিকল্পনার যুগে ভারতের জাতীয় আয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের আপেক্ষিক অবদানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখাও। এই পরিবর্তনের তাৎপর্য কী?

[Show how the relative contributions of the primary and the secondary sector to India,s national income have changed during the plan period. What is the significance of this change?] [B.A., C.U. 1985]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের জাতীয় আয় কি হারে বেড়েছে তা উল্লেখ কর।

[Indicate the rates of growth of India's national income in different 5-year plans.]

২. বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারতের মাথাপিছু আয় কি হারে বেড়েছে?

[Mention the rates at which per capita income in India rose during the plan period.]

৩. কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র থেকে ও শিল্পক্ষেত্র থেকে ভারতের জাতীয় আয়ের কত শতাংশ পাওয়া যাচ্ছে?

[What percentages of India's national income are yielded by the agriculture and allied sector and the industrial sector?]

৪. ভারতে জাতীয় আয়ের কত অংশ কৃষির দ্বারা উৎপন্ন হয়?

[What percentage of India's national income is contributed by agriculture?] [B.A., C.U. 1985]

৫. ভারতের জনগণের কত শতাংশ প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করে?

[What percentage of the population of India depends on the primary sector for livelihood?] [B.A., C.U. 1983, 1986]

১২

কর্মসংস্থান
Employment

পরিকল্পনাকালে ভারতে কর্মসংস্থান / ভারতে কর্মহীনের হিসাব / অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত জনশক্তি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন / ভারতে কর্মহীনতার ধরন, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি / কৃষি ও গ্রামীণ কর্মহীনতা / শিল্প ও শহরাঞ্চলের কর্মহীনতা / শিক্ষিত কর্মহীনের সমস্যা / ভগবতী কমিটির রিপোর্ট / সরকারী নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ / আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

১২.১ পরিকল্পনাকালে ভারতে কর্মসংস্থান
Employment in India during the Plan Period

১. অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থনীতিক বিকাশের সাথে সাথে জাতীয় উৎপন্ন বা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থানও বাড়বে, এই হল অর্থনীতিক বিকাশের তত্ত্ব। ভারতে অর্থনীতিক পরিকল্পনার আরম্ভ থেকে পলিসি নির্ধারক ও পরিকল্পনা রচয়িতারা ধরে নিয়েছিলেন মোট জাতীয় উৎপন্ন (GDP) বা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের হারও নিজ থেকেই আনুপাতিকভাবে বাড়বে। তাই প্রথম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো স্বতন্ত্র লক্ষ্য নির্ধারিত হয়নি। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে অবশ্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্যতম লক্ষ্য রূপে গৃহীত হয়। গোটা পরিকল্পনাকালে দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে, কিন্তু তার কোনো সম্পূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়নি কিংবা সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কর্মসংস্থান সম্পর্কে আংশিক কিছু তথ্য মাত্র পাওয়া যায়। তবে, গোটা পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান যেমন বেড়েছে, তার চাইতে বেশি বেড়েছে কর্মহীন বা বেকার জনসংখ্যা। তার একটি কারণ যেমন, দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন শ্রমের যোগান হার বৃদ্ধি, তেমনি আরেকটি কারণ হল, ষাটের দশক থেকে দেশের অর্থনীতিতে "নিশ্চলতা-স্ফীতি' বা 'Stagflation' (economic stagnation and inflation)-এর আবির্ভাব। এই কয়েকটি কথা মনে রেখে, ১৯৫১-৫২ সাল থেকে অর্থনীতিক পরিকল্পনার আরম্ভ থেকে বর্তমানকাল অবধি ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির একটি হিসাব এখানে উপস্থিত ও আলোচনা করা হল।

২. প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় মোট ৩ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ঘটেছিল। পরবর্তী তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ৪ লক্ষ থেকে ১৪ লক্ষ কর্মপ্রার্থীর কর্মসংস্থান ঘটেছিল। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলির কর্মসংস্থানের কোনো সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয়নি।

৩. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬১ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ভারতের সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে (organised sector) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির একটি পরিসংখ্যান তৈরি করে। এই হিসাবে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং ১০ জন বা তার বেশি কর্মী নিয়োগকারী ও অকৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত বেসরকারী সংস্থাগুলিকে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৫·৯ শতাংশ, বেসরকারী ক্ষেত্রে ৬·২ শতাংশ এবং সর্বমোট ৬ শতাংশ। পরবর্তী তিন বৎসরে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাকালে একদিকে কৃষিতে খরা বা অন্যদিকে শিল্পে মন্দার দরুন বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কমে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ২·৬ শতাংশ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ছাঁটাইয়ের দরুন মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ১ শতাংশ হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মোট হার বেড়ে ৪ শতাংশ হলেও, তা পঞ্চম পরিকল্পনায় কমে ২·[illegible] শতাংশ এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে [illegible] ২·[illegible] শতাংশ হয়। এই সময়ে বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হারের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হারটি বেশিই ছিল, যদিও প্রথমটির হার সামান্য ক্রমবর্ধমান ও দ্বিতীয়টির ছিল সামান্য ক্রমহ্রাসমান। উল্লেখ্য, ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার একই (১·৫ শতাংশ) ছিল। এই হারের তুলনায় ভারতে শ্রমের যোগান বৃদ্ধির বার্ষিক হারটি বেশি।

৪. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে (রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারী ও যুগ্ম ক্ষেত্র) মোট নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা হল ৭২·৫ লক্ষ।

প্রচলিত উন্নয়ন তত্ত্বে আমাদের শেখানো হয়, বিনিয়োগ বাড়লে, উৎপাদন বাড়বে এবং তার সাথে বাড়বে কর্মসংস্থান। কিন্তু ভারতে এবং অন্যত্র ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হল, উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়তে পারে, কিংবা না-ও বাড়তে পারে। কতটা বাড়বে তা আবার নির্ভর করে নানা বিষয়ের উপর। ভারতের মতো প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগ নির্ভর অর্থনীতিতে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে উৎপাদন ৩২ শতাংশ বাড়লেও কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ১৩ শতাংশ। তার আগে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে উৎপাদন ১৫ শতাংশ বাড়লেও কর্মসংস্থান বেড়েছিল মাত্র ৯ শতাংশ। এর মূল কারণটি হল, ভারতে, বিশেষ করে সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী ক্ষেত্রে, পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের দরুন কর্মসংস্থান ও উৎপন্নের অনুপাতটি ক্রমশই কমছে। অর্থাৎ পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন কৌশল অনুসরণের দরুন বৃহদায়তন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ কমে যাচ্ছে।

উৎপাদনের উন্নততর উপকরণ, কারখানার উন্নততর বিন্যাস, উন্নততর যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান না বাড়িয়েও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। ফলে উচ্চতর বিনিয়োগ, বর্ধিত উৎপাদন, উচ্চতর অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে কর্মহীনতার অস্তিত্ব ধনতন্ত্রী অর্থনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ওই অর্থনৈতিক কাঠামো এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত থাকতে বাধ্য বলেই প্রমাণিত হচ্ছে।

৫. ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে বৃহদায়তন সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ আরও একটি কারণে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তা হল, প্রায় সমস্ত শ্রেণীর বৃহদায়তন শিল্পেই অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে এবং তা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শিল্প মালিকেরা এই ক্ষমতা ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে পারে কিন্তু তাতে কর্মসংস্থান সামান্যই বাড়বে।

৬. সংগঠিত বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় ভারতে যে চিরাচরিত কুটির এবং হস্ত ও কারুশিল্পগুলি গ্রামে গ্রামে সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পরিকল্পনাকালে এসব শিল্পের আধুনিকীকরণ সহ নতুন নতুন যেসব ক্ষুদ্র শিল্প সৃষ্টি হয়েছে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাদের গুরুত্ব কম নয়; ভবিষ্যতেও এই গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৭৯-৮০ সালে এই সব শিল্পে ২ কোটি ৩৫ লক্ষেরও বেশি কর্মী নিযুক্ত ছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই ক্ষেত্রটিতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেড়ে ৩ কোটি ২৬ লক্ষে পরিণত হবে বলে লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

১২.২ ভারতে কর্মহীনের হিসাব
Estimates of Unemployment in India

১. ভারতে যেমন কর্মসংস্থানের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, তেমনি কর্মহীন জনসংখ্যার বা বেকার সংখ্যার সঠিক কোনো হিসাবও বিংশ শতাব্দীর এই অষ্টম দশক অবধি এদেশে সংগ্রহ ও প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। যা কিছু হিসাব সবই আংশিক, ধারণাগত এবং অসংলগ্ন। তবুও হাতের কাছে যেটুকু পাওয়া যায় তার সাহায্যেই এখানে খানিকটা আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে দেখা যায়, পরিকল্পনার দুই দশকের শেষে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা (Labour force) ১৮'৫০ কোটি থেকে বেড়ে ২২ কোটি হয়েছে, তেমনি কর্মপ্রার্থী বা বেকার সংখ্যাও ৫৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ২২২ কোটিতে পরিণত হয়েছে। ফলে কর্মক্ষম ব্যক্তির শতাংশ হিসাবে বেকারদের অনুপাতও প্রথম পরিকল্পনার শেষে ২'৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৯ সালে ৯'৬ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

২. পরবর্তীকালে একটি হিসাব পাওয়া যায় ভগবতী কমিটি বা কর্মহীনতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটির (Committee of Experts on Unemployment) রিপোর্টে। ভগবতী কমিটির হিসাব থেকে দেখা যায় ১৯৭১ সালে ভারতে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের অনুপাত হিসাবে বেকারদের সংখ্যা আরও বেড়ে ১০'৪ শতাংশ হয়েছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনার দলিলে মোট বেকার ও সম্ভাব্য কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির যে হিসাব দেওয়া হয়েছিল তা থেকে দেখা যায় ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ১৯৮০-৮৫ সালের মধ্যে মোট বেকার সংখ্যা হবে আনুমানিক ৪'৬২ কোটি। এই সময়ে যদি সরকারী আশানুযায়ী ৩'৪২ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়ও, তাহলে ১৯৮৫ সালে ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে দেশে ১'২০ কোটি পুরাতন কর্ম-প্রার্থী বেকার থেকেই যাবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে প্রতি ৪ জন কর্মপ্রার্থী পিছু এক জন শেষ পর্যন্ত বেকার থাকবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে দেশে ৯২ লক্ষ ২০ হাজার বেকার থেকে গেছে বলে সপ্তম পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে (১৫-৩০ বৎসর বয়স্ক)। সপ্তম পরিকল্পনা-কালে দেশে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ নতুন কর্মপ্রার্থী দেখা দেবে এবং বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ঘটবে অর্থাৎ ৪ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে সপ্তম পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ৩'৫ শতাংশ হারে ও শিল্পক্ষেত্রে ৪'৫ শতাংশ হারে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১২-১ : ১৯৭১ সালে ভারতে বেকার সংখ্যা (কোটিতে)

	গ্রামীণ	শহরাঞ্চল	মোট
১. মোট কর্মক্ষম ব্যক্তি	১'৪৪৪	৩'২০	১৮'০৪
২. মোট বেকার সংখ্যা	১'৬১	০'২৬	১'৮৭
৩. মোট বেকার সংখ্যা মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির শতাংশ রূপে	১০'৯	৮'১	১০'৪

সূত্র : Report of the Committee of Experts one Unemployment.

সারণি ১২'২ : ১৯৮০-৮৫ সালে ভারতে পুরাতন বেকার সংখ্যা ও কর্মপ্রার্থী জনসংখ্যার বৃদ্ধি

	(কোটি)
১. ১৯৮০ সালে পুরাতন বেকার	১'২০
২. ১৯৮০-৮৫ সালে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে নতুন কর্মপ্রার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	৩ ৪২
৩. মোট বেকার	৪'৬২
৪. ১৯৮০-৮৫ সালে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৩'৪২
৫. ১৯৮৫ সালে ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে সম্ভাব্য অবশিষ্ট বেকার সংখ্যা	১'২০

সূত্র : Sixth Five Year Plan (1980-85).

৩. উপরোক্ত হিসাবগুলির কোনোটাতেই প্রচ্ছন্ন বেকারদের বা স্বল্পনিযুক্তিকে (underemployment) ধরা হয়নি। এদের সম্পর্কে ভগবতী কমিটি একটি হিসাব করেছেন। হিসাবটি ১৯৭১ সালের। ওই বৎসরের প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা সম্পর্কে অধ্যাপক রাজকৃষ্ণও একটি হিসাব করেছেন।

সারণি ১২-৩. ভারতে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের হিসাব (১৯৭১)

সপ্তাহে কাজের ঘণ্টা	প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের সংখ্যা (কোটি)	মোট কর্মক্ষমদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের শতাংশ
১৪ ঘণ্টার কম		
গ্রামীণ	০'৮৪৬	৫'৭
শহরাঞ্চল	০'১২৯	৪'০
মোট	০'৯৭৫	
২৮ ঘণ্টার কম		
গ্রামীণ	২'৩৫২	১৫'৯
শহরাঞ্চল	০'৩৩৭	১০'৫
মোট	২'৬৮৯	

সূত্র : Report of the Committee on Unemployment, 1973.

ভগবতী কমিটি হিসাব করেছেন, ১৯৭১ সালে সপ্তাহে ১৪ ঘণ্টারও কম সময়ের জন্য কাজে নিযুক্ত হবার

সুযোগ পায় এরকম গ্রামীণ মানুষের সংখ্যা ৮৪ লক্ষ ৬০ হাজার ও শহরবাসীর সংখ্যা হল ১২ লক্ষ ৯০হাজার, মোট ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার বা প্রায় এক কোটি। এদের স্বল্পনিযুক্তি এত বেশি যে, ভগবতী কমিটি এদের পূর্ণ বেকার বলে গণ্য করেছেন। এছাড়া, সপ্তাহে ২৮ ঘণ্টার কম কাজ পায় এমন মানুষের সংখ্যা গ্রামে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ, ও শহরে ৩৩ লক্ষ মোট ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯০ হাজার। ভগবতী কমিটির মতে, মোট কর্মক্ষম মানুষের প্রায় ১৫ শতাংশ হল প্রচ্ছন্ন কর্মহীন।

১২.৩. অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত জনশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন
Unutilized and Underutilized Manpower and Economic Growth

১. পৃথিবীর সব স্বল্পোন্নত দেশেই (বিশেষ করে এ সব দেশের গ্রামাঞ্চলে) বিপুল মানবিক শক্তি রয়েছে যাকে সাধারণভাবে 'প্রচ্ছন্ন কর্মহীন' বা 'স্বল্পনিযুক্ত' বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই সেদিনও অর্থনৈতিক তত্ত্বে কিংবা, তার প্রয়োগে এ বিপুল অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত মানবিক শক্তির কোনো গুরুত্বই স্বীকার করা হত না, বরং এটাকে দেশের পক্ষে বোঝা বলেই মনে করা হত।

২. কিন্তু এখন অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিপুল অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত মানবিক শক্তি অর্থাৎ পূর্ণ কর্মহীন ও প্রচ্ছন্ন কর্মহীন বা স্বল্পনিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্ভাব্য শ্রমশক্তি আসলে এক বিরাট সঞ্চয় উৎস। সমাজে পুঁজি সৃষ্টির কাজে এ সম্ভাব্য সঞ্চয় এক মহামূল্যবান সম্পদের কাজ করতে পারে।

৩. কোনো দেশে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিযুক্তি আছে কিনা এটা বোঝাতে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যে জমিতে এখন পাঁচজন কাজ করছে, সেখান থেকে একজন চাষীকে সরিয়ে নিলেও ঐ জমির মোট উৎপাদনের পরিমাণ যদি না কমে বা সামান্য কমে তবে বুঝতে হবে সেখানে চারজন চাষীরই পূর্ণনিযুক্তি হতে পারে, আর একজনের নিযুক্তির কোনো স্থান নেই—এই পঞ্চম ব্যক্তিই প্রচ্ছন্ন কর্মহীন বা স্বল্পনিযুক্ত। ঐ জমির মোট উৎপাদনে এ ব্যক্তির কোনো অবদান নেই, বা থাকলেও তা সামান্য। চাষের কাজে তার থাকা বা না থাকার মধ্যে কোনো তফাত নেই। এ ব্যক্তিকে চাষের কাজ থেকে সরিয়ে নিলেও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে কোনো হেরফের হবে না। অধ্যাপক নারুক্সের মতে স্বল্পোন্নত দেশগুলির গ্রামীণ মানুষদের ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ হল এরকম প্রচ্ছন্ন কর্মহীন বা স্বল্পনিযুক্ত।

৪. এই প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের যদি জমি থেকে সরিয়ে দিয়ে সেচ, সড়ক তৈরী, জলনিকাশী নালা খনন, রেলপথ স্থাপন, গৃহনির্মাণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, বনরচনা প্রভৃতি মূলধনী প্রকল্পে নিয়োগ করা যায় তাহলে কৃষিপণ্যের বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমবে না। অথচ, এই সরিয়ে-নেওয়া প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের খাদ্য যোগাতে বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না। কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই দেশে অতিরিক্ত মূলধন গঠন করা যাবে।

৫ এ ধারণাটিকে এ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ঐ প্রচ্ছন্ন কর্মহীনেরা যখন জমিতে কাজ করত, তখন তাদের প্রান্তিক উৎপাদন হত শূন্য। এ কারণে তারা বস্তুতপক্ষে, তাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনের উপরই নির্ভর করত খাদ্যের জন্য। এবার তাদের কৃষি থেকে সরিয়ে নতুন কাজে লাগিয়ে পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে তাদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্য নিয়ে এখন তারা যেখানে কাজ করছে সেখানে যদি তাদের সরবরাহ করা যায় তাহলে বিনা খরচে তাদের খাদ্যের সমস্যা মেটান যায়। এটা যদি সফলভাবে করা যায় তবে এই নতুন পুঁজি সৃষ্টির কাজটি তার 'আপন খরচেই' সম্ভব হবে। অর্থাৎ, এর জন্য সমাজের বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না।

৬. কিন্তু এর একটি বড় অসুবিধা হল, নতুন কাজে যোগ দেবার পর আগেকার প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের খাদ্যের চাহিদা আগের চাইতে বেশি হতে পারে। কারণ, নতুন কাজে হয়তো তারা বেশি পরিশ্রম করছে। আবার এমনও হতে পারে এরা এদের পূর্বেকার বাসস্থান ও পরিবার ছেড়ে চলে আসার পর ঐ পরিবারের লোকেরা আগের চেয়ে বেশি খাদ্য খাওয়া শুরু করতে পারে। আগে সবাই মিলে খেতো বলে ভাগাভাগি করে সবাই হয়তো কম খেতো। এখন, যারা জমির কাজেই নিযুক্ত রইল, তাদের মেহনত বেড়েছে বলে বেশি খাদ্যের দরকার হতে পারে। এ কারণে সারা দেশে যোগানের তুলনায় খাদ্যের মোট চাহিদা বেড়ে যেতে পারে। এ রকম অবস্থায় দেশের মোট খাদ্যের যে অংশটুকু নতুন পুঁজি-গঠনের কাজে নিযুক্ত প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের ভোগে লাগানো যেত তার কিছুটা এখন পুঁজিগঠনের কাজে আর লাগানো যাবে না। কারণ, পুঁজিগঠনের কাজে নিযুক্ত নয় এমন লোকেদের ভোগেই ঐ খাদ্যের একটা অংশ চলে যাবে। এটাকেই 'ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অবাঞ্ছিত বহির্গমন' (leakage) বলা হয়। এই বহির্গমন (লিকেজ) বন্ধ করার উপর পুঁজিগঠন নির্ভর করবে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এ 'ছিদ্র' সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এর প্রতিকারের

জন্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উদ্বৃত্ত ফসলটা সংগ্রহ বা দখল করে নিতে পারে। তাতেও যদি ঘাটতি দূর না হয় তবে আমদানির সাহায্যে খাদ্যের বাড়তি চাহিদা মেটানো সম্ভব হতে পারে।

৭. নতুন কাজে প্রাক্তন প্রচ্ছন্ন কর্মহীনরা যে সব যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও সরঞ্জাম ব্যবহার করবে সেগুলি যতদূর সম্ভব সহজ সরল হওয়া উচিত। আর সেগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে শ্রমিকেরা নিজেরাই প্রয়োজনমতো তা তৈরি করে নিতে পারে। কিংবা, কৃষির পুনর্গঠনের দরুন কৃষির উদ্বৃত্ত যন্ত্রপাতি থেকেও তা সরবরাহ করা যেতে পারে।

৮. ভারতের মত বিরাট সংখ্যক প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য এইভাবে অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত জনশক্তিকে কাজে লাগানোর পক্ষে ডঃ জে. জে. আনজারিয়া প্রমুখ অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। চীনের অর্থনীতিক উন্নয়নে ঠিক এই পদ্ধতিটিই প্রয়োগ করা হয়েছে বলে অধ্যাপক টমাস ব্যালোগ, অধ্যাপিকা জোন রবিনসন প্রমুখ খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদরা বলেছেন। অতএব, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত জনশক্তি (সম্পূর্ণ কর্মহীন, বা প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের বিরাট বাহিনী) যে একটি অতিশয় মূল্যবান বিনিয়োগযোগ্য উপকরণ তাতে কোনো দ্বিমত নেই। সুপরিকল্পিত ও সুদক্ষভাবে এই উপকরণটি কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন হার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব।

১২.৪. ভারতে কর্মহীনতার সমস্যার ধরন, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

Unemployment in India: Pattern, Features and Nature

ভারতের মরসুমী, সংঘাতজনিত, প্রযুক্তিবিদ্যাগত, প্রচ্ছন্ন এবং কারবারীচক্রজনিত প্রভৃতি সব ধরনের কর্মহীনতাই দেখা যায়।

১. **মরসুমী কর্মহীনতা :** ৪০ বৎসরের পরিকল্পনা সত্ত্বেও ভারতের কৃষি এখনও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল বলে এদেশে ব্যাপকভাবে মরসুমী কর্মহীনতা দেখা যায়। বৎসরে গড়ে ৩ থেকে ৯ মাস কৃষকেরা এখনও বেকার থাকতে বাধ্য হয়। এই সমস্যা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর গরিব ও ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। একটি হিসাবে দেখা যায় কৃষকদের ৩৩ শতাংশ গড়ে বৎসরে ৪ মাসের জন্য এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ৫০ শতাংশ গড়ে বৎসরে ৬ মাসের জন্য বেকার থাকে। বিভিন্ন জীবিকাতে এবং শিল্পক্ষেত্রেও মরসুমী কর্মহীনতা রয়েছে। তবে জীবিকা, বৃত্তি, পেশা এবং ক্ষুদ্র শিল্পেই এ ধরনের কর্মহীনতা তীব্রতর।

২. **প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিযুক্তি :** অবিভক্ত ভারতে ১৯০১ সালে কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে বেড়ে বিভক্ত ভারতে ১৯৮১ সালে হয়েছে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ। অথচ দেশভাগের ফলে জমির পরিমাণ অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। পুঁজির অভাবে কৃষিতে এখনও অতি প্রাচীন সাজ-সরঞ্জাম ও পুরানো পদ্ধতিতেই উৎপাদন পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ কৃষিতে নিযুক্ত রয়েছে। অল্প লোকের কাজে বহু লোক অযথা লেগে থাকছে। ফলে শ্রমশক্তি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। জাতীয় নমুনা জরীপের (৭ম) হিসাবে ক্ষুদ্র চাষীদের ১৮ শতাংশ এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে পুরুষদের ৪১ শতাংশ ও নারীদের ৫৯ শতাংশের পূর্ণনিযুক্তি নেই। শিল্পক্ষেত্রেও নানা জীবিকা, পেশা ও বৃত্তিতেও প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিযুক্তি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। পুঁজির অভাব, উৎপাদনের পুরাতন যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতি ও পুরাতন কারিগরী ও কর্ম-কৌশল প্রভৃতির ফলে দেশের শিল্পে ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের শ্রমশক্তি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

৩. **কাঠামোগত বা প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মহীনতা :** আধুনিক বৃহদায়তন, যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি যতই প্রসারিত হচ্ছে, ততই নতুন নতুন শিল্প ও জীবিকা সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে দেশের কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পুরানো জীবিকা, পেশা ও বৃত্তি থেকে মানুষ ক্রমাগত কর্মচ্যুত হচ্ছে, কিন্তু নতুন নতুন শিল্প, পেশা ও বৃত্তিতে তাদের অনেকেরই স্থান হচ্ছে না তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে। ফলে এই পুরানো জীবিকাচ্যুত মানুষের অধিকাংশই বাধ্য হয়ে কৃষিতে যোগ দিচ্ছে। এইভাবে দেশে কাঠামোগত বা প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত কর্মহীনতা কৃষিতে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার কৃষিতে ট্রাক্টর, কলের লাঙল ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে কৃষি থেকেও মানুষের কর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গ্রাম থেকে বেকারদের বাহিনী কাজের খোঁজে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে এসে ভীড় করছে। আবার র‍্যাশনালাইজেশন, অটোমেশন, শ্রমিক ছাঁটাই, প্রভৃতির ফলেও শহর ও শিল্পাঞ্চলে কর্মহীনের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। দেশে বর্তমানে যে শিক্ষিত বেকার সমস্যা

প্রবলভাবে বেড়েছে তাও কাঠামোগত কর্মহীনতার সমস্যা। কারণ, যে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থা আগের দিনের উপযোগী ছিল তা এখনও টিকে রয়েছে। ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যখন শ্রমের বাজারে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে তারা যে ধরনের শিক্ষা পেয়েছে সে শিক্ষা অনুযায়ী কাজের প্রয়োজনীয়তা কম। পুঁজি ও কারিগরী জ্ঞানের অভাবে দ্রুত হারে শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন ঘটিয়ে নানা ধরনের নতুন নতুন জীবিকা, বৃত্তি ও পেশা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই কৃষি, শিল্প ও অন্যত্র বেকার সমস্যা এত প্রবল হয়ে উঠেছে। মরসুমী কর্মহীনতার পশ্চাতেও এই কারণটি রয়েছে। সুতরাং ভারতের মত বিকাশমান দেশে বর্তমান পর্যায়ে কাঠামোগত বা প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত কর্মহীনতাই হল বর্তমান বেকার সমস্যার মূল চরিত্র বা প্রকৃতি।

৪. **সেকুলার বা দীর্ঘকালীন কর্মহীনতা :** আর একটি উল্লেখযোগ্য ধরনের বেকার সমস্যা এখানে দেখা যায়। তা হল দীর্ঘকালীন বা 'সেকুলার' বেকার সমস্যা। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, পুঁজির স্বল্পতার জন্য, এবং কৃষি ও শিল্পের উপযুক্ত বিকাশের অভাবে দেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দীর্ঘকাল ধরেই দেখা যাচ্ছে। এটি প্রকাশ পেয়েছে দেশে কর্মে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার মধ্যে। ১৯৮১ সালের লোকগণনাতে দেখা যায় ভারতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৩৩·৪ শতাংশ মানুষ কর্মে নিযুক্ত রয়েছে।

৫. **বাণিজ্য চক্রজনিত কর্মহীনতা :** এ ছাড়া, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে বাণিজ্য চক্রজনিত কর্মহীনতা, তাও বর্তমানে এ দেশে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে। ষাটের দশক থেকে দেশে যে প্রবল অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে তার প্রভাব লোক-নিয়োগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে। দেশে যে ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে, ধনতান্ত্রিক জগতের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের সাথে তা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সমাধান : ভারতের কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে : (১) দ্রুতহারে শিল্পায়ন। এর মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর বেশি জোর দিতে হবে, কারণ এগুলি শ্রম-প্রগাঢ়। (২) কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ। (৩) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে কারিগরী ও বৃত্তিমুখী করা দরকার। শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের বিশেষ অঞ্চলের প্রতি আকর্ষণ থেকে মুক্ত করা দরকার। (৪) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যাতে 'জনবিস্ফোরণ' (population explosion) না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (৫) শ্রমের সচলতা (mobility) সৃষ্টির জন্য সারা দেশে 'কর্মসংস্থান কেন্দ্র' স্থাপন করতে হবে। (৬) গ্রামাঞ্চলের জনবহুল স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানে জনস্থানান্তর (transfer of population) করতে হবে। (৭) সারা দেশে কৃষি-মজুরদের নিয়ে ভূমি সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে। (৮) কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ করতে হবে। (৯) সাময়িক মন্দার দরুন যখন কর্মহীনতার সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে তখন সরকারী উদ্যোগে সাময়িক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ করতে হবে। (১০) কারিগরী শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। (১১) সবশেষে, কৃষির মৌলিক পুনর্গঠন অবশ্যই করতে হবে।

১২.৫. কৃষি ও গ্রামীণ কর্মহীনতা
Agricultural and Rural Unemployment

ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মহীনতার মধ্যে তীব্রতা, ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক দিয়ে কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যাই সর্বপ্রধান। কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা—কৃষিক্ষেত্র, বাগিচা শিল্প, কুটির এবং গ্রামীণ শিল্প।

বৈশিষ্ট্য : ১. গ্রামের মোট অধিবাসীদের ২৯ শতাংশ উপার্জনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১১ শতাংশ উপার্জনকারী হয়েও পরনির্ভরশীল এবং বাকি ৫৯ শতাংশ উপার্জনহীন, পরনির্ভরশীল। অর্থাৎ, গ্রামীণ জনসাধারণের প্রতি একশত জনের মধ্যে ৭১ জন আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মহীন। এই প্রকার ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ কর্মহীনতাকে দীর্ঘমেয়াদী কর্মহীনতা (সেকুলার) বলা যায়।

২. কৃষিগত কর্মহীনতার অপর দিক হচ্ছে মরসুমী কর্মহীনতা। বিভিন্ন হিসাবে দেখা গেছে যে, কৃষকরা গড়ে বৎসরে ৩ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত কর্মহীন অবস্থায় থাকেন।

৩. কৃষিগত কর্মহীনতার তৃতীয় দিক হল প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা। কৃষকদের বা ক্ষেতমজুরদের পূর্ণ কর্মশক্তি ব্যবহৃত হয় না। মরসুমী কর্মহীনতার মত এই সমস্যাও ক্ষুদ্র চাষী এবং কৃষিমজুরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীব্র।

অন্যান্য জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে কৃষিনির্ভর ব্যক্তির, বিশেষত ক্ষেতমজুরের সংখ্যা এত বাড়ছে যে, কারো কারো ধারণা, এরকম চললে আর কিছুদিনের মধ্যেই কৃষিক্ষেত্রেও শহরাঞ্চলের মত ভয়াবহ প্রকাশ্য কর্মহীনতা দেখা দেবে। পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম যুগে যে কর্মহীন কৃষকবাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতে তার সূচনা দেখা যাচ্ছে।

গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে কর্মহীনতা : গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত কারিগর ও শিল্পীদের মধ্যে কর্মহীনতার সমস্যা কম তীব্র নয়। দেশের মোট ৭০ লক্ষ গ্রাম্য কারিগর ও শিল্পীর মধ্যে কর্মহীনের সংখ্যা ২৩ লক্ষের মত। মরসুমী এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা, উভয়ই এই শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়।

বাগিচা শিল্পে কর্মহীনতা : চা-বাগিচা, রবার বাগিচা ও কফি বাগিচাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কর্মহীনতা তত তীব্র নয়। একটি হিসাবে দেখা যায়, বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তুলনায় কর্মহীনের অনুপাত প্রায় ৬ শতাংশ মাত্র।

মূল কারণ ও সামগ্রিক প্রকৃতি : ঋতুনির্ভর কৃষি, উপযুক্ত পার্শ্বজীবিকার অভাব, শিক্ষা ও পুঁজির অভাবে কৃষিকার্যের কারিগরী ও সাংগঠনিক পশ্চাৎপদ অবস্থা, যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবনতি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা—এই পাঁচটিকেই কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তেজী মন্দার ফলে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্রজনিত কর্মহীনতা একেবারেই যে সৃষ্টি হয় না তা নয়। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে পুঁজির অভাবই হচ্ছে কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী, একটানা মরসুমী এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার মূল কারণ। ফলে কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম সৃষ্টি করা যাচ্ছে না।

অতএব, এক কথায় বলা যায়, **কৃষির ও গ্রামীণ কর্মহীনতার মূল সমস্যা হল কারিগরী বা কাঠামোজনিত কর্মহীনতা এবং স্বল্পনিযুক্তির সমস্যা।**

প্রতিকার : কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনতা মূলগতভাবে ভারতের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিক কাঠামোর পুঁজি, কারিগরী ও সাংগঠনিক বিষয় সংক্রান্ত দুর্বলতার ফল। একথা মনে রাখলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি সহ সমগ্র অর্থনীতিক কাঠামোর মৌলিক রূপান্তর ও ব্যাপক শিল্পায়ন ছাড়া এ সমস্যার স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব নয়; তবে সাথে সাথে অন্যান্য কার্যক্রমও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন :

১. **সাময়িক কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত :** গ্রামাঞ্চলে পতিত জমির পুনরুদ্ধার, খাল খনন, স্থানীয় বাঁধ নির্মাণ, জলনিষ্কাশন, বনসৃজন, পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি বিবিধ কর্মে স্থানীয়ভাবে কিছু পরিমাণ কর্ম সৃষ্টি করা যায়।

২ **গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন :** শহরের মত গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করে কর্মহীনদের তালিকা প্রণয়ন ও কোথায় লোকের প্রয়োজন আছে সে তথ্য সংগ্রহ করে অলস ঋতুতে গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনদের জন্য শিল্পাঞ্চলেও কর্মের সংস্থান করা যেতে পারে।

৩. **জনস্থানান্তর :** গ্রামাঞ্চলের জনবহুল স্থান থেকে সংগঠিতভাবে অরণ্য অধ্যুষিত ও খনি সন্নিহিত জনবিরল অঞ্চলে কিংবা নবস্থাপিত শিল্প নগরীগুলিতে মানুষের আগমন ঘটলে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতার সমস্যা দূর হতে পারে ও নতুন স্থানে কর্মহীন ব্যক্তিগণের নিয়োগ ঘটতে পারে।

৪. **নিবিড় চাষ :** ভারতে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ ভারতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় এখানে প্রগাঢ় কৃষির গুরুত্ব অধিক। প্রগাঢ় কৃষিতেও অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, এর দ্বারা প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্প নিযুক্তির সমস্যা অনেকাংশে দূর হতে পারে।

৫ **ভূমি সেনা :** সারা দেশে কৃষি মজুরদের দ্বারা একটি 'ভূমি সেনাবাহিনী' গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষেতমজুরদের স্থায়ী কর্মসংস্থান ঘটবে এবং পরিকল্পিতভাবে কৃষি উন্নয়নের কাজে এরা অংশগ্রহণ করতে পারে।

৬ **কৃষি ভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ :** কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ও সংশ্লিষ্ট বিবিধ ক্ষুদ্র শিল্প যথা, ঢেঁকি, গমভাঙাকল, ঘানি, হাঁসমুরগী পালন, মৎস্যচাষ, পশুপালন, চাটাই মোড়া ও চাটনি তৈয়ার, ফল টিনে ভর্তিকরণ, মৌমাছি পালন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা দূর ও নতুন কর্মসৃষ্টি করা সম্ভব।

৭ **গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন :** এর দ্বারা গ্রাম্য শিল্পী ও কারিগরদের প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা দূর করা ও গ্রামের নতুন নতুন কর্মপ্রার্থীর জন্য নতুন কর্মসৃষ্টি করা সম্ভব।

৮. **গ্রামীণ ঋণদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গুদাম নির্মাণ, পথঘাটের সম্প্রসারণ, কৃষি ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়পদ্ধতির উন্নতি**, পরিবহণের উন্নতি, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, একদিকে যেমন কৃষিকার্য, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পসমূহের উন্নতির সহায়ক হবে তেমনি নতুন কর্মসৃষ্টিও করতে পারবে।

কিন্তু যে দুটি বিষয়ের উপর এই সমস্যার মূল সমাধান নির্ভর করে তা হল—

১. **কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন :** প্রকৃত ভূমিসংস্কার, ক্ষুদ্র ও গরিব কৃষকদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সমবায় খামার ও অন্যান্য নানা ধরনের কৃষি সমবায় গঠন, সেচ, সার, ঋণ, উচ্চ ফলন-ক্ষমতাসম্পন্ন বীজের পর্যাপ্ত

সরবরাহ, সুগঠিত বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা কৃষি-ব্যবস্থার পুনর্গঠন হল কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যা সমাধানের মূল পদক্ষেপ। এর ফলে পথঘাট, পরিবহণ ও সেচের উন্নতির সর্বাধিক সুবিধা আদায় করা সম্ভব হবে। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো ও কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হবে।

১০. যন্ত্রশিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ: দেশে যন্ত্রশিল্প যতই উন্নতি লাভ করবে ততই কৃষি ও গ্রামাঞ্চল থেকে অধিকতর সংখ্যায় বেকারদের শিল্পে নিয়োগের সুযোগ সম্ভাবনা বাড়বে। এভাবে প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থান ঘটবে। ভারতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে বটে, কিন্তু শিল্পোন্নতির হার যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষিগত কর্মহীনতার ভার তা প্রশমিত হয়নি।

১২.৬. শিল্প ও শহরাঞ্চলের কর্মহীনতা
Industrial and Urban Unemployment

কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শিল্প ও শহরাঞ্চলের বেকারদের তথ্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কারণ শহর ও শিল্পাঞ্চলের অনেক স্থানে সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্র আছে। এ সকল কেন্দ্রে প্রতি বৎসর কর্মপ্রার্থীর নাম ও অন্যান্য বিবরণ তালিকাভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া জাতীয় নমুনা জরীপ দেশের কর্মহীনতার সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে তা থেকে আমরা শিল্প ও শহরাঞ্চলে কর্মহীনতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই:

ফলে এরা চিরাচরিত জীবিকা থেকে বিচ্যুত কিন্তু নতুন শিল্পের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে এরা কর্মহীন।

তালিকাভুক্ত অভিজ্ঞ কর্মচারী ও শ্রমিকদের অনুপাত মোট ২০ শতাংশ এবং পরিচালন ও উচ্চতর পর্যায়ের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুপাত মাত্র ৪ শতাংশ; বাকি ৭৮ শতাংশই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাহীন কর্মপ্রার্থী।

৩. **ব্যাপক স্বল্পনিযুক্তির অস্তিত্ব:** ভগবতী কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শহরাঞ্চলের মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির ১০'৫ শতাংশই হল প্রচ্ছন্ন বেকার।

৪. **শিক্ষিত কর্মহীনদের সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি:** নিচের তথ্য থেকে দেখা যাবে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ২২ বৎসরে রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হলেও চাকরি প্রাপ্তির সংখ্যাটা মাত্র ২৫ শতাংশের মতো বেড়েছে। ফলে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারদের মোট সংখ্যায় চাকরি প্রাপ্তদের শতাংশটা ১২'৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। এর অনিবার্য তাৎপর্য হল এই সময়ে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বেড়েছে।

কারণ: ১. গ্রামাঞ্চলের জমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে এবং জীবিকার অভাবে এরা ক্রমাগত শিল্পাঞ্চলে ভিড় করছে।

২. যে হারে কর্মপ্রার্থীর ভিড় বাড়ছে সে তুলনায় শিল্পায়নের হার যথেষ্ট নয়।

৩. গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারণ সুষমভাবে ঘটেনি। কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেই অত্যধিক পরিমাণে শিল্পের কেন্দ্রীভবন হয়েছে। অন্যদিকে দেশের

সারণি ১২-৪: এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রিকরণ ও চাকরি প্রাপ্তির তথ্য

	রেজিস্ট্রেশন	চাকরিপ্রাপ্তি	রেজিস্ট্রেশনের শতাংশ হিসাবে চাকরিপ্রাপ্তির সংখ্যা	রেজিস্ট্রীকৃত বেকার সংখ্যা
	(হাজার)			
১৯৬১	৩,২৩০	৪০৪	১২.৫	১,৮৩৩
১৯৭১	৫,১৩০	৫০৭	৯.৯	৫,১০০
১৯৮১	৬,২৭৭	৫০৪	৮.০	১৭,৮৩৮
১৯৮৩	৬,৭৫৫	৪৮৫	৭.১	২১,৯৫৩

সূত্র: Director General of Employment and Training.

বৈশিষ্ট্য: ১. কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

২. এটা আসলে কাঠামোগত বা প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মহীনতা: তালিকাভুক্ত কর্মহীনদের প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যক্তির শিল্পকার্যে কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নেই। অর্থাৎ এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে আগত ক্ষেতমজুর ও গ্রাম্য কারিগর। উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনের পরিবর্তনের

সুবিস্তৃত অংশে কোনো শিল্পবিকাশই হয়নি। এই অসম শিল্পপ্রসার দেশের কর্মহীনতার সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে।

৪. ভারতে শিল্পগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশি। এর কারণ পুরনো যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির ব্যবহার এবং শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব। উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায়

বাজারের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এজন্য যখনই মন্দা দেখা দেয় তখন উৎপাদন হ্রাস ও শ্রমিক ছাঁটাই করা ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় থাকে না।

৫. প্রধানত উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ার জন্যই ভারতের রপ্তানী শিল্পগুলিও বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারছে না। ফলে রপ্তানী শিল্পে সংকোচন ঘটে ও তাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। ফলে দেশের বাজারে অন্যান্য দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়, ঐ সকল শিল্পেও উৎপাদন হ্রাস ও শ্রমিক ছাঁটাই ঘটে। এভাবে দেশের মধ্যে মোট কর্মসংস্থান হ্রাস পায়।

৬. বর্তমানে দেশের সুতী বস্ত্র ও পাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পে যে শিল্পসংস্কারের প্রচেষ্টা চলছে, সেটাও দেশে কর্মহীনতার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কারণ, শিল্পসংস্কারের প্রত্যক্ষ ফল হয় শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি।

৭. দেশে বর্তমানে যে মুদ্রাস্ফীতি চলেছে তার দরুন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে শিল্পে মজুদ পণ্যের পরিমাণ বাড়ছে। এর দরুন উৎপাদন সংকোচন ও শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি ঘটেছে।

৮. সর্বোপরি, কৃষিতে নিযুক্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির আয় ও ক্রয়-ক্ষমতা এখনও অত্যন্ত কম বলে যন্ত্র-শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। ফলে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তজ্জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না।

প্রতিকার: ভারতে কর্মহীনতার **মূল চরিত্র হল কাঠামোগত** বা **প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মহীনতা।** অর্থাৎ, উপযুক্ত পুঁজিদ্রব্য, কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবই এই কর্মহীনতার মূল কারণ। অবশ্য কোনো কোনো সময়ে বাজারের তেজী-মন্দার চক্রাকার গতির জন্যও বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পসমূহে কর্মহীনতার সমস্যা সৃষ্টি হয়। তবে এর প্রকোপ তুলনায় কম। শহর ও শিল্পাঞ্চলের বেকার সমস্যার সমাধানগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১. বিশেষ বিশেষ শিল্পে **সাময়িক মন্দার দরুন যখন কর্মহীনতার সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে তখন সরকারী উদ্যোগে বিবিধ সাময়িক কর্মসূচি,** যথা —গৃহাদি নির্মাণ, রাজপথ তৈয়ারি, বাঁধ নির্মাণ ও সেচের সম্প্রসারণ প্রভৃতি দ্বারা সাময়িকভাবে কর্মহীন ব্যক্তির কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

২ **দ্রুতহারে শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা** এবং ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করাই হল দেশে স্থায়িভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (অটোমেশন) প্রবর্তনের দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে সমস্যা আরও বাড়বে।

৩ শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য **পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি, ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পরিবর্তন, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি** প্রভৃতির দ্বারা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও উৎপন্নের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা উচিত। এর ফলে শিল্প গুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়বে। তাতে দেশ ও বিদেশের বাজারে আরও বেশি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়ানো সম্ভব হবে, দেশে কর্মসংস্থান বাড়ানো যাবে।

৪ শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য **কারিগরী শিক্ষা ও শিক্ষণব্যবস্থার প্রসারের** দ্বারা কর্মপ্রার্থীদের শিল্পে কর্মলাভের যোগ্যতা বাড়াতে হবে। তাতে কর্মসংস্থান সহজ হবে।

৫ একদিকে **বৃহৎ শিল্প এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করে** পরস্পরের মধ্যে উৎপাদন-ক্রমের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এর ফলে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশও ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা স্বল্পব্যয়ে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। ফলে সব রকম শিল্পের সুষম প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়বে।

৬ **দেশের যে সকল অঞ্চলে জনবসতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান অথচ কোনোরূপ শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, সেখানে আঞ্চলিকভাবে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা** আঞ্চলিক কর্মহীনতার সমাধান করা যায়। শুধু তাই নয়, এর ফলে আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটলে আঞ্চলিক বাজারেরও উন্নতি ঘটবে। এরই সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বাড়বে।

১২.৭. শিক্ষিত কর্মহীনের সমস্যা
Problem of Unemployment Among the Educated

ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে কর্মহীনতা লক্ষ্য করা যায় তা বিশেষভাবেই শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমস্যা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এবং বিশেষত দেশ-বিভাগের পর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত কর্মহীনদের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে।

সারণি ১২-৫ : ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বেকার-সংখ্যা

(১)	১৯৮০ সালের অবশিষ্ট বেকার	১·২০২ কোটি
(২)	১৯৮০-৮৫ সালে নতুন কর্মপ্রার্থী ..	৩·৪২৪ "
(৩)	মোট বেকার [(১)+(২)] ..	৪·৬২৬ "
(৪)	১৯৮০-৮৫ সালে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান .	৩·৪২৮ "
(৫)	১৯৮৫ [(৩)-(৪)] অবশিষ্ট বেকার	১·১৯৮ "

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনার হিসাব থেকে।

সারণি ১২-৬ : সপ্তম পরিকল্পনায় শিক্ষিত বেকার এবং শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান (হাজার)

শিক্ষার স্তর	১৯৮৫		১৯৯০		১৯৮৫-৯০
	মোট শিক্ষিত মানব শক্তি	সক্রিয় বা কর্মে নিযুক্ত মানব শক্তি	মোট শিক্ষিত মানব শক্তি	সক্রিয় বা কর্মে নিযুক্ত মানব শক্তি	নতুন কর্মপ্রার্থী
১. বি. ই. ও এম. ই. ডিগ্রী	৩৭২·৬	৩২৪·২	৪৫৪·৪	৩৯৫·৩	৭৯·১
২. এম. বি. বি. এস. ও এম. ডি. এম. এস.	২৫৮·৭	২২৫·১	৩০২·৪	২৬৩·১	৩৮·০
৩. বি. ডি. এস ও তদূর্ধ্ব	৯·৫	৮·৩	১২·০	১০·৪	২·১
৪. বি. এস্‌সি. (নার্সিং)	৩·৭	৩·৭	৫·৫	৫·৪	১·৭
৫. বি. এস্‌সি. ও এম. এস্‌সি. (কৃষি)	১৩৩·২	১০৪·০	১৬২·৮	১২৭·০	২৩·০
৬. বি. ভি. এস্‌সি. ও এম. ভি. এস্‌সি.	২৮·৩	২৪·৬	৩৩·৪	২৯·১	৪.৫
৭. বি. এ.	২৫৫৩·০	১৯৯১·৩	৩১৬৯·৬	২৬৭২·১	৪৮১·০
৮. এম. এ.	১৪৪০·৯	১১২৩·৯	১৯৫১·১	১৫২১·৭	৩৯৮·০
৯. বি. এস্‌সি.	১১৩৮·৩	৮৮৭·৯	১৩৩৯·৪	১০৪৪·৭	১৫৬·৮
১০. এম. এস্‌সি.	৩৫০·৩	২৭৩·২	৪১৯·৭	৩২৭·৪	৫৪·২
১১. বি. কম.	১২২৬·১	৯৫৬·৪	১৫৯০·৬	১২৪০·৭	২৮৩·৩
১২. এম. কম.	২০৭·৪	১৬১·৮	৩০২·৭	২৩৬·১	৭৪·৩
১৩. বি. এড. এবং এম. এড.	১১২২·৭	৮৭৫·৩	১৩৭৯·৪	১০৭৫·৯	২০০·২
১৪. অন্যান্য স্নাতক	৮৮·৩	৬৯·৯	১৩১·৩	১০২·৪	৩৩·৫
১৫. ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত	৫৬৪·২	৪৯০·১	৭৩৪·৮	৬৩৯·৩	১৪৮·৪
১৬. দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী পাস	৩৮২২৬·৪	২৩৩১৮·১	৫২৪০০·১	৩১৯৬৪·১	৮৬৪৬·০

সূত্র : সপ্তম পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা ১২৩, দ্বিতীয় খণ্ড।

কারণ : ১. দেশে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।

২. শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীরা যে ধরনের শিক্ষালাভ করছে তা কর্মক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। বর্তমানে শিক্ষাদান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুঁথিগত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শুধু কয়েক ধরনের চাকরির উপযোগী শিক্ষাই

লাভ করে। বাস্তব কর্মজগতে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা পায় না। সুতরাং এদের অধিকাংশই পরীক্ষা পাসের পর চাকরির সন্ধানে ব্যস্ত হয়।

৩. দেশে যে হারে চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, সেই অনুপাতে চাকরির সংখ্যা বাড়ছে না।

৪. কিন্তু মূল কারণ হল, কৃষিতে প্রকৃত ভূমিসংস্কার দ্বারা কৃষির পুনর্গঠনের অভাব ও অর্থনীতিক উন্নয়ন হারের স্বল্পতা। প্রকৃত ভূমিসংস্কার না হওয়ায় ও অর্থনীতিক উন্নয়নের হার প্রয়োজনের তুলনায় ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের তুলনায় স্বল্প হওয়ায় দেশের অর্থনীতিক বিকাশ যথেষ্টরূপে ঘটছে না বলেই মানুষের হাতে আয়, ক্রয়-ক্ষমতা ও দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ছে না। এ কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগও যথেষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে না। কি শহরাঞ্চলের, কি গ্রামাঞ্চলের, কি শিক্ষিত বেকারের—সব ক্ষেত্রেই এই মূল কারণটি বর্তমান।

প্রতিকারঃ ১. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তন দরকার। অর্থাৎ নিছক তত্ত্বগত শিক্ষার পরিবর্তে **বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার চাই**। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতরা চাকরির পরিবর্তে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করে উপার্জনক্ষম হতে পারবে। তবে, এই সমস্যার সমাধান হিসাবে শুধুমাত্র বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়।

২. **ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার শিক্ষিত** কর্মহীনদের সমস্যার অন্যতম সমাধান। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগদান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় তাদের আত্মনিয়োগ, ছোট-খাটো নানাপ্রকারের যন্ত্রপাতি তৈয়ার ও মোমবাতির কারখানা স্থাপন, শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কর্মহীন শিক্ষিতদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ, জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে যত বেশি সম্ভব শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগ, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষিত কর্মহীনতার সমস্যা অনেকখানি দূর করা যায়। দেশের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হলে যথেষ্ট নতুন কর্ম-সংস্থান হতে পারে। এক কথায়, **তৃতীয় পর্যায়ের অর্থ-নীতিক কার্যাবলী দেশে যতই বিস্তার লাভ করবে ততই শিক্ষিতদের কর্মহীনতা কমবে।**

৩. **কিন্তু প্রকৃত কৃষি সংস্কারের ভিত্তিতে দ্রুতহারে শিল্পায়ন ও অর্থনীতিক** উন্নয়ন হল দেশের শিক্ষিত কর্ম-হীনতার সমাধানের প্রধান উপায়। ভারতের মোট জন-সংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এ অবস্থাতেই যখন শিক্ষিত কর্মহীনতার সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন বুঝতে হবে **অর্থনীতিক কাঠামোর ত্রুটিই সেজন্য দায়ী, শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নয়।** প্রকৃতপক্ষে আজ দেশে আরও অধিক শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন। শুধু তাই নয়; অর্থনীতিক উন্নয়ন যতই ঘটবে ততই শিক্ষাও প্রসার লাভ করবে। সুতরাং দ্রুততর গতিতে শিল্পায়ন ছাড়া শিক্ষিত কর্মহীনের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়।

১২.৮. ভগবতী কমিটির রিপোর্ট

Report of the Bhagawati Committee

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বেকার সমস্যা সম্পর্কে একটি কমিটি (ভগবতী কমিটি) দেশে বেকার সমস্যা দূর করার জন্য যে সব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল ঃ

১. শ্রমিকনিয়োগ পরিসংখ্যান, অর্থনীতিক বিশ্লেষণ, কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থ ও সম্বল পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে **কর্মসংস্থান ও মানবশক্তি পরিকল্পনা বিষয়ক জাতীয় কমিশন** নামে একটি কমিশন নিয়োগ করতে হবে। কর্মসংস্থান ও মানবশক্তি সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে এই কমিশন সামগ্রিক মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী ও নীতি-সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেবেন।

২. কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী দপ্তরের বর্তমান কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বিভাগটি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সেক্রেটারিয়েটে যে কর্মসংস্থান ও মানবশক্তি বিভাগটি আছে, সে দুটি বিভাগকে একত্রিত করে কেন্দ্রে **কর্মসংস্থান ও মানবশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর** নামে একটি সংস্থা স্থাপন করতে হবে। যে ধরনের কর্মসূচিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে তা রচনা করা এবং কি কি অবস্থায় ব্যাপক-ভাবে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে তার উপর নজর রাখা হবে এই দপ্তরের কাজ।

৩. গ্রামাঞ্চলের বেকারদের কাজের সংস্থানের জন্য **সেচ, গ্রামের বৈদ্যুতিকরণ, সড়ক নির্মাণ ও গ্রামীণ গৃহ-নির্মাণ** সম্পর্কে বিরাট আকারের কর্মসূচি নিতে হবে।

৪. **কৃষিতে নির্বিচারে যন্ত্রের ব্যবহার নিরুৎসাহিত** করতে হবে।

৫. পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ঐ সকল অঞ্চলের অর্থনীতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে **আঞ্চলিক উন্নয়ন করপোরেশন** নামে পৃথক সংস্থা স্থাপন করতে হবে। উপযুক্ত অঞ্চল বাছাই করা, উন্নয়নের পরি-কল্পনা রচনা করা এবং উন্নয়নে সাহায্য করাই হবে এসব করপোরেশনের মুখ্য কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে এ

করপোরেশনগুলি নিজেরাও শিল্পের উদ্যোক্তারূপে কাজ করবে। রাজ্য সরকারগুলি যাতে এ ধরনের আঞ্চলিক উন্নয়ন করপোরেশন স্থাপন করতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

৬. যে সব শিল্পে পুঁজির তুলনায় বেশি পরিমাণে শ্রমিক লাগে (শ্রমনিবিড় শিল্প), সে সব শিল্পের **উৎপাদিত বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে আংশিক কর রেহাই**-এর সুবিধা দিতে হবে। ফলে ঐ সকল দ্রব্যের রপ্তানি ও উৎপাদন বাড়বে এবং সে সব শিল্পে লোক-নিয়োগ বাড়বে।

৭. **কর্মহানি বীমা** ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৮. শিল্পে নিযুক্ত **নারী শ্রমিক কর্মীদের বর্তমান অনুপাতটি অন্তত যাতে বজায় থাকে সেজন্য মালিক অর্থাৎ নিয়োগকর্তাদের কিছুটা প্রণোদনা** বা আর্থিক উৎসাহ দিতে হবে।

৯. শিল্পে অতি আধুনিক জটিল যন্ত্রপাতি বা **স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে।**

১০. বড় বড় শহর এলাকা **থেকে শিল্পগুলিকে সরিয়ে নিয়ে মফঃস্বল অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে।**

১১ বৃহৎশিল্পগুলির সহযোগী নানান ধরনের শিল্প সংস্থা যাতে বেশি সংখ্যায় স্থাপিত হতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. মহারাষ্ট্রের মত সর্বত্র **'সুনিশ্চিত গ্রামীণ কর্ম সংস্থান স্কীম'** প্রবর্তন করতে হবে।

১৩. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পগুলিকে উৎসাহ দানের জন্য কর কেটে নেবার আগে মুনাফার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত জমিয়ে একটি **বিশেষ বিনিয়োগ সঞ্চিত তহবিল** সৃষ্টি করতে দিতে হবে। এ তহবিলের অর্থ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পে বা সুনির্দিষ্ট ধরনের বিনিয়োগের জন্য কিংবা বাছাই করা পশ্চাৎপদ অঞ্চলের শিল্পে বিনিয়োগ করতে হবে।

১৪. শিল্পে দুই শিফ্‌ট ও যেখানে সম্ভব সেখানে তিন সিফ্‌ট চালু করতে হবে।

১৫ প্রত্যেক শিল্পে উৎপাদনের ভিত্তিতে ইঞ্জিনীয়ার ও টেকনিশিয়ানদের কাজ সুনিশ্চিত করার জন্য আইন পাস করতে হবে।

১৬. দশম শ্রেণী পর্যন্ত হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা-সহ সাধারণ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীগুলির জন্য নানা ধরনের কাজের উপযোগী (job-oriented) পাঠক্রম প্রবর্তন করে **বৃত্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।** উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে, অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ৫০ শতাংশ ছাত্রকে বৃত্তি-গত শিক্ষাধারায় স্থানান্তরিত করার দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে **প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কাজের সংস্থান** করতে হবে।

১৮. প্রাইমারী স্কুলে প্রতি বৎসর ১.৫ লক্ষ শিক্ষক ও ১,২০০ সরকারী ইন্সপেক্টর নিয়োগ করতে হবে।

১৯. কল-কারখানায় সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা কাজ ও ৭ দিনই কাজের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

২০. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরুষের বিবাহের বয়স ২১ বৎসর এবং নারীদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর ধার্য করতে হবে।

মন্তব্য ঃ ভগবতী কমিটির সুপারিশগুলি জনীতি ধারা অনুসরণ করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে। কমিটির মতে, এজন্য বেশি বিনিয়োগ-এর বরাদ্দের ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সরকারী সাংগঠনিক উন্নতির বন্দোবস্ত করেই সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। তা ছাড়া, সুপারিশগুলিতে বেসরকারী উদ্যোগের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আর্থিক এবং সরকারি আয় ব্যয় (fiscal) সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

কাজ সৃষ্টির জন্য যে সব স্কীমের সুপারিশ করা হয়েছে তা প্রধানত তিন প্রকারের —১ কতকগুলি ব্যবস্থা সরকারি আয় ব্যয় অর্থাৎ ফিসক্যাল বা বাজেট সংক্রান্ত নীতির উপর নির্ভরশীল, ২. কতকগুলি ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসাহায্যের উপর নির্ভরশীল, এবং ৩. কতকগুলি ব্যবস্থা ভর্তুকি প্রণোদিত বেসরকারী শিল্প-উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল।

এ বিধিব্যবস্থা-গ্রহণের দ্বারা কিছু পরিমাণ কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি অবশ্যই সম্ভব হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তা কতদূর পর্যন্ত যাবে? এ পর্যন্ত যে সব স্কীমে নতুন কর্মসংস্থানের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ অল্প হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থের ৮০ শতাংশও খরচ হয়নি। দ্বিতীয়ত, নতুন কর্মসংস্থান যেটুকু সৃষ্টি হয়েছে তাতে দারিদ্র্য-রেখার উপর যারা রয়েছে, সমাজের সেই অংশই প্রধানত উপকৃত হয়েছে। দারিদ্র্য রেখার নিচে যারা রয়েছে তারা ঐ সব স্কীমের কোনো সুবিধা ভোগ করতে পারেনি।

তা ছাড়া, ভগবতী কমিটি কর্মহানির বীমা (অর্থাৎ যাদের কাজ আছে তাদের কাজ চলে গেলে আংশিক আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা।) প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে বটে, কিন্তু বেকাররা যতদিন কাজ না পাচ্ছে

ততদিন তাদের কোনোক্রমে ভরণ-পোষণ যাতে চলতে পারে সে উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বেকারভাতার সুপারিশ করেনি।

ভগবতী কমিটির রিপোর্টের সাথে দ্বিমত ব্যক্ত করে ডঃ অশোক মিত্র বলেছিলেন, ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েই বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে; কর্মসংস্থানকে সেখানে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরই ফলে পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মন্থর হয়েছে। তাঁর মতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম হওয়ার আরেকটি কারণ হল শিল্পসংস্কার ও আধুনিকীকরণের নামে শিল্পে পুঁজি নিবিড় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন। তা ছাড়া ডঃ অশোক মিত্র আরও উল্লেখ করেছেন, ভারতে পুঁজি গঠনের স্বল্পহার কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম কারণ। পরিকল্পনাকালে, অকৃষিক্ষেত্রে গড়পড়তা সঞ্চয়ের হার হল ১৫ শতাংশ এবং করের হার হল ২৫ শতাংশ। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে সবুজ-বিপ্লবের দরুন আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও করের হার ৭ শতাংশের বেশি হয়নি। সঞ্চয়ের হার আরও কম। ফলে কৃষিতে উচ্চ আয়ের পরিবারগুলিকে সঞ্চয় বাড়াতে বাধ্য না করার ফলে কৃষিতে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায় নি।

ডঃ অশোক মিত্র সুপারিশ করেছিলেন, শিল্প মালিক, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা প্রতিবৎসর একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান তহবিল' (Central Employment Fund) স্থাপন করুক। ওই তহবিলটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং সমস্ত সক্ষম ও কর্মেচ্ছু ব্যক্তিদের কাজের অধিকার সরকারকে মেনে নিয়ে তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২.৯. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ও কর্মহীনতার প্রতিকারে সরকারী নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ Growth of Employment Opportunities: Government Policies & Measures

১. **সরকারী নীতি:** প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে না হলেও শেষ দিক থেকে পরিকল্পনাগুলিতে কর্মসংস্থানের তথা কর্মহীনতার সমস্যা সমাধানের উপর বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যদিও পরিকল্পনাগুলিতে কর্মসংস্থান কৌশলটি এবং তৎসংলগ্ন প্রকল্পগুলি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির সাথে যেমনভাবে সুগ্রথিত হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। এই বিষয়ে সর্বশেষ ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ষষ্ঠ পরিকল্পনা। কারো কারো মতে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকে মূলত কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনা বলে গণ্য করা যায়। এই পরিকল্পনায় আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যা দূর করার এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা সবিশেষ পরিমাণে হ্রাস করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে; এবং এজন্য প্রতিবৎসর ৫'৩ শতাংশ হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সরকারী নীতি হিসাবে উৎপাদনে কৃৎকৌশল (skill) বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে এবং তৃতীয়ত, প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলেও, কাজ ও উপযুক্ত কর্মীর মিলনের দ্বারা উৎপাদনের সর্বাধিক বৃদ্ধি সম্ভব হবে এবং উপযুক্ত কাজে নিয়োগের দ্বারা শ্রমিক কর্মীরা উৎসাহিত হবে। এই হল পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান সম্পর্কে সরকারী নীতির সারমর্ম।

২. **ব্যবস্থা:** পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাধারণ ব্যবস্থা: দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাধারণ উপায় হিসাবে গৃহীত সরকারী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা, সম্ভবপর ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল প্রবর্তনে উৎসাহদান (বিশেষত গ্রামীণ, কুটির ও ক্ষুদ্র-শিল্পে), গ্রামীণ, ক্ষুদ্র, কুটির শিল্পে ও পরিবহণ ও নানান বৃত্তিতে স্বনিয়োগ (self employment) উৎসাহ ও সাহায্য দান, শিল্পের অন্তর্কাঠামো গড়ে তোলার জন্য নানান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, শুষ্ক কৃষি কৌশল প্রবর্তনে উৎসাহ ও সাহায্য দান। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য হল চতুর্থ পরিকল্পনাকালে শুরু করা ক্ষুদ্র চাষী, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষেতমজুরদের এবং খরাপ্রবণ এলাকার চাষীদের জন্য নানান প্রকল্প, যথা—SFDA, MFLA, DPAP, Crash Schemes প্রভৃতি।

এই সব প্রকল্পগুলির বৈশিষ্ট্য হল গ্রামীণ মানুষের দরিদ্রতম অংশকে সাহায্য করাই এদের লক্ষ্য; এই প্রকল্পগুলি স্বল্পকালমধ্যে ফলদায়ী এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যদানে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম; এদের দ্বারা আর্থিক ও অন্যান্য, উভয় প্রকারের সাহায্যই দেওয়া হয়।

(খ) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা: এ ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষিতের মধ্যে বেকার সমস্যা হ্রাসের জন্য ব্যবস্থা। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার অভাবে এক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করছে, যদিও অর্থনীতিক পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত

অর্থনীতিক বিকাশের সাথে উচ্চ শিক্ষার বিকাশটিও গ্রথিত করা মোটেই কঠিন নয় এবং দেশের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানীর সংখ্যা মোটেই অতিরিক্ত নয়। কিন্তু সরকারী নীতিতে অর্থনীতিক বিকাশের সাথে শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার বিকাশের সামঞ্জস্য সাধনের বিষয়টি অবহেলিত হওয়ায় তথাকথিত শিক্ষিত বেকার সমস্যাটি অনেকটা কৃত্রিমভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন করে সামগ্রিকভাবে মানবশক্তি পরিকল্পনার (manpower planning) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(গ) চাকরির সংস্থান ঃ এটি হল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফত রেজেস্ট্রিকৃত বেকারদের চাকরিতে বহালের ব্যবস্থা। এখানে লক্ষণীয় ; ১৯৬১ সালের তুলনায় বর্তমানে রেজিস্টার্ড বেকার সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে সে তুলনায় চাকরির সংস্থানের হার অত্যন্ত নগণ্য (সারণি ১২·৪ দ্রষ্টব্য)। এর মূল কারণ হল, প্রতিবৎসর যে হারে দেশে শ্রমের যোগান বাড়ছে (২·৫ শতাংশ) এবং তার ফলে রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, তার তুলনায় অর্থনীতির উন্নয়ন বা বিকাশের হারটি কম হওয়ায়, যেমন সাধারণভাবে বেকার সংখ্যা বাড়ছে, তেমনি তার অংশ হিসাবে রেজিস্টার্ড বেকার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে কর্মহীনতার সমস্যার পরিমাণগত দিকটি বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the quantitative aspect of the problem of unemployment in India.]

২. উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে 'প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা'র ধারণাটি পরিস্ফুট কর।

[Explain the concept of 'disguised unemployment' with the help of suitable examples.]

৩. 'অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন, পূর্ণ কর্মহীন, প্রচ্ছন্ন কর্মহীন বা স্বল্পনিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্ভাব্য শ্রমশক্তি আসলে একবিরাট সঞ্চয়-উৎস।'—এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

['In the opinion of the econmists the potential labour power of the fully unemployed and the disguised unemployed (or the underemployed) is a vast source of saving.' Discuss the statement.]

৪. বলা হয়, দেশের 'প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের' সাহায্যে কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই অতিরিক্ত মূলধন গঠন করা যায়।—এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

[It is said that without any additional expenditure capital formation in a country can be increased with the help of 'disguised unemployment'. Discuss the statement.]

৫. প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের নতুন পুঁজি সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও এ কাজে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। এ অসুবিধাগুলি কি ?

[It is true that additional capital can be created with the help of 'disguised unemployment' but then, a number of difficulties have to be faced in this matter. Elaborate the dfficulties referred to in the statement.]

৬. কর্মহীনতা কত প্রকারের হতে পারে ? বর্ণনা কর।

[Describe the various forms of unemployment.]

৭. ভারতে মরসুমী কর্মহীনতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the features of seasonal unemployment in India.]

৮. বলা হয়, ভারতে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ব্যাপক আকারে বিদ্যমান। এ ধরনের কর্মহীনতার পরিমাণ ও কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

[It is said that disguised unemployment in India is widespread. Indicate its magnitude and discuss the causes of such unemployment.]

৯. ভারতে প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মহীনতা সম্পর্কে তোমার ধারণা পরিস্ফুট কর।

[Elaborate your views on technological unemployment in India.]

১০. ভারতের কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তির সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব ?

[What measures should be adopted to solve the problems of unemployment and underemployment in India ?]

১১. ভারতের গ্রামীণ কর্মহীনতার সমস্যাটি বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the problem of rural unemployment in India.]

১২. ভারতের কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার প্রধান কারণগুলি উল্লেখ কর।

[Mention the main causes of unemployment in the agricultural and the rural sectors in India.]

১৩. কৃষি ও গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতার প্রতিকার নির্দেশ কর।

[Suggest remedies for the problem of unemployment in the agricultural and the rural sectors.]

১৪. শিল্প ও শহরাঞ্চলের ব্যাপক কর্মহীনতার কারণ নির্দেশ কর।

[Indicate the reasons for widespread industrial and urban unemployment.]

১৫. ভারতের বেকার সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা কর। এর প্রতিকার নির্দেশ কর।

[Discuss the nature of the problem of unemployment in India and suggest remedies.]

[B.A., C.U. 1985]

১৬. ভারতে শিক্ষিত বেকারত্বের সমস্যার চরিত্র পর্যালোচনা কর। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব দাও।

[Examine the nature of the problem of educated unemployment in India. Suggest some measures to solve this problem.]

[B.A., C.U. 1983]

১৭. ভারতে বেকার সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

[Write a note on the nature and extent of the unemployment problem in India.]

[B A., C.U. 1982]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ: (ক) প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা; (খ) মরসুমী কর্মহীনতা; (গ) প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মহীনতা; (ঘ) স্বল্প নিযুক্তি।

[Write short notes on: (a) Disguised unemployment; (b) seasonal unemployment [B.A., C.U. 1985]; (c) structural or technological unemployment [B.A., C.U. 1981] and (d) underemployment.]

চতুর্থ খণ্ড

অর্থনৈতিক নীতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ

ECONOMIC POLICIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT

মূল্যস্তর ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Price Level And Economic Development

১৩.১. ভারতে মূল্যস্তরের প্রবণতা
Price Trends in India

১. পরিকল্পনাকালে বিগত ৪০ বৎসরে, মাঝে মাঝে মূল্যস্তরের খানিকটা সাময়িক নিম্নগতি দেখা গেলেও প্রতি দশকে তার উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। সারণি ১৩-১-এ তা দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই মূল্যবৃদ্ধির সূত্রপাত ঘটে প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর থেকে।

সারণি ১৩-১ঃ ভারতে মূল্যস্তরের প্রবণতা (১৯৫১-১৯৮২)

বৎসর	(১৯৬১-৬২-এর পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা=১০০)
১৯৫০-৫১	৯১
১৯৬০-৬১	১০০
১৯৭০-৭১	১৮১
	(১৯৭০-৭১-এর মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা=১০০)
১৯৭০-৭১	১০০
১৯৮০-৮১	২৭১
১৯৮১-৮২	২৭৭
১৯৮৬-৮৭	৩৮০

সূত্রঃ The Pocket Book of Economic Information 1972, and Economic Survey, 1981-82, 1982-83, 1986 87.

২. ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধির শুরু হয় ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে। ১৯৪১-৪৩ সালে তা খোলাখুলি দামস্ফীতিতে পরিণত হয়। দামস্ফীতি বিরোধী আর্থিক ও ফিসকাল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে 'রেশনিং' ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন ১৯৪৫ সালে মূল্যস্তর নেমে আসে ও কিছুটা স্থিতিশীল হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর সরকারী বিনিয়ন্ত্রণ নীতি আবার দামস্ফীতি সৃষ্টি করে। পরে দামস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা তা খানিকটা প্রশমিত হয়। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে আবার আন্তর্জাতিক বাজারে তেজী অবস্থা দেখা দেয়; ভারতেও আবার মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতি দেখা দেয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন অবশেষে মূল্যস্তর নামে কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর থেকে মূল্যস্তরের যে উর্ধ্বগতি দেখা দেয় তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

৩. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাইকারী মূল্যস্তর বাড়ে ৩০ শতাংশ, খাদ্য মূল্যস্তর বাড়ে ২৭ শতাংশ, শিল্পের কাঁচামালের মূল্যস্তর বাড়ে ৪৫ শতাংশ ও যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের মূল্যস্তর বাড়ে ২৫ শতাংশ। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার খরচ বাড়ে ২৪ শতাংশ।

৪. তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর বাড়ে ৫০ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী তিন বৎসরে শিল্প ক্ষেত্রে মন্দা সত্ত্বেও মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। এই অবস্থাটাকে অর্থবিদ্যায় বলা হচ্ছে নিশ্চলতা স্ফীতির (stagflation) অবস্থা।

৫. চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর বাড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ।

৬. যে প্রচণ্ড দামস্ফীতির হার নিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনা শেষ হয় তা পঞ্চম পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমদিকে কমে আসে। কিন্তু ১৯৭৬-এর মার্চ মাসের পর থেকেই ফের শুরু হয় মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি এবং দামস্ফীতি নিয়েই পঞ্চম পরিকল্পনা শেষ হয়।

৭ ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে মূল্যস্তর ২৫ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে এবং দামস্ফীতির চাপ অব্যাহত রয়েছে।

৮. এই মূল্যবৃদ্ধি সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রেই কতটা করে ঘটেছে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে সারণি ১৩-২ থেকে।

সারণী ১৩-২ : পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা (১৯৭০-৭১=১০০)

	১৯৭১-৭২	১৯৮০-৮১	১৯৮৩-৮৪
১. প্রাথমিক উৎপন্ন	১০১	২৫৭	৩০৪
খাদ্যদ্রব্য	১০১	২০৮	২৮৩
অন্যান্য দ্রব্য	৯৯	২১৮	২৮৩
খনিজ দ্রব্য	১১৫	১,১১০	৯১৩
২. জ্বালানি, তেজশক্তি, আলো ও লুব্রিক্যাণ্ট	১০৬	৩৫৪	৪৯০
৩. প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য	১১০	২৫৭	২৯৫
খাদ্য	১১৮	৩০৯	২৯৯
কাপড়	১১০	২১৩	২৪৯
রাসায়নিক দ্রব্য	১০২	২৪১	২৭৯
বুনিয়াদী ধাতু ও ধাতব দ্রব্য	১০৫	২৭২	৩৮১
যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ সরঞ্জাম	১০৫	২৩৯	২৮৯
৪. যাবতীয় দ্রব্য	১০৫'৬	২৫৭'৩	৩১৭

সূত্র : Report on Currency and Finance 1981. Economic Survey, 1981-82 and 1982-83, Statistical outline of India, 1984.

৯. সারণী ১৩-৩ আভাস দিচ্ছে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে এই মূল্যস্তরের বৃদ্ধি কিরকম দুর্বিষহ বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সারণী ১৩-৩ : সর্বভারতীয় ভোগ্যদ্রব্য মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা

	১৯৫১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১	১৯৮৪-৮৫	
১. খাদ্যদ্রব্য মূল্যস্তর					
১৯৪৯ = ১০০	—	২২৬	৫০৬	—	
১৯৬০ = ১০০	—	১৯৫	৪৩৭	—	
১৯৭০-৭১ = ১০০	—	১০০	২১০	—	
	১৯৫১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৭ (ডিসেম্বর)
২. সাধারণ মূল্যস্তর					
১৯৪৯ = ১০০		২২৪	৫১০		—
১৯৬০ = ১০০		১৮৪	৪২০		—
১৯৭০-৭১ = ১০০	৫০'৯	১০০	২৭১	৩৪৩	৪১৩

সূত্র : Economic Survey, 1981-82 : Statistical outline of India, 1984. Tata Service Ltd, Department of Economics and Statistics ; Economic Survey, 1984-85, 86-87.

সারণি ১৩-৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০-৭১ সালের দামস্তরে ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা ১৯৫১ সালে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ৫০·৯ থেকে ক্রমশ বেড়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে, অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ৩৪৩-এ পৌঁছেছে। অর্থাৎ, পরিকল্পনার ৩৪ বৎসরে দামস্তর অন্ততঃ ৬ গুণ বেড়েছে। সপ্তম পরিকল্পনা কালে তা আরও বেড়ে চলেছে। ১৯৮৭ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার হয়েছে ৯·২ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর মালহোত্রার আশঙ্কা ১৯৮৭ ৮৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ১১ শতাংশে উঠতে পারে।

১৩২. পরিকল্পনাকালে ভারতে মূল্যস্তরের বৃদ্ধির কারণ Causes of rising price-level in India in the plan period

১. পরিকল্পনাকালে ভারতে যে ক্রমাগত মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটেছে তা এককথায় দামস্ফীতিগত মূল্যস্তরের বৃদ্ধি (inflationary rise in prices) বলে গণ্য করা হয়।

২. অর্থবিদ্যায় দামস্ফীতির আধুনিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, চাহিদার বৃদ্ধি (demand pull) কিংবা যোগানের উপযুক্ত বৃদ্ধির অভাব ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি (cost push) অথবা এই দু'টি কারণেই মূল্যস্তরের দামস্ফীতিগত বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এই দু'টি কারণসহ, সরকারী মূল্যনীতির ব্যর্থতাও ভারতে মূল্যস্তরের দামস্ফীতিগত বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

৩. **চাহিদা বৃদ্ধির চাপ :** (ক) জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, (খ) সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, (গ) ঘাটতি ব্যয়, (ঘ) টাকার যোগান ও কালোটাকার পরিমাণ বৃদ্ধি—এই চারটি উপাদান পরিকল্পনাকালে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে মূল্যস্তরের উপর নিদারুণ চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

(ক) **জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি :** ১৯৫১-৮২ সালের মধ্যে ৩০ বৎসরে ভারতে প্রতি বৎসর গড়পড়তা ২·১ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। ফলে জনসংখ্যার মোট পরিমাণ এই সময়ে ৩৬ ১ কোটি থেকে বেড়ে ৬৮·৪ কোটিতে উঠেছে। প্রতি দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণটি এর ফলে ক্রমশ বাড়ছে।

সারণী ১৩-৪ : পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

বৎসর	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির গড় হার
১৯৫১	৩৬·১ কোটি	—	—
১৯৬১	৪৩ ৯ "	৭·৮ কোটি	২·০
১৯৭১	৫৪·৮ "	১০·৯ "	২·২
১৯৮১	৬৮·৪ "	১৩·৬ "	২·১

সূত্র : Causes Report, 1951-81,

(খ) **সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** পরিকল্পনার সাড়ে তিন দশকে (১৯৫১-৮৫) প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মোট ব্যয় ও পরিকল্পনার প্রয়োজনে বিনিয়োগ ব্যয় অবিরাম বেড়ে চলেছে। বিনিয়োগ ব্যয়ের ফলে একদিকে যেমন সরকারী ও বেসরকারী এই দুই ক্ষেত্রেই পুঁজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের (Capital goods and intermediate goods) চাহিদা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনই সরকারী ব্যয়ের ফলে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে সমাজের মোট চাহিদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে দামস্তরের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

সারণি ১৩-৫ : পরিকল্পনাকালে মোট সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের বৃদ্ধি

বৎসর	মোট সরকারী ব্যয় (১) (কোটি টাকা)	মোট বিনিয়োগ ব্যয় (২) (কোটি টাকা)
১৯৫০-৫১	৯৫৩	–
১৯৫১-৬১		১০,০০০
১৯৬১-৭১	—	২০,০০০
১৯৭১-৮১	-	৭০,০০০
১৯৮৪-৮৫	৬৮,৯১৬	—

সূত্র : (1) Central and State Government Budgets, 1950-51 to 1984-85 ; (2) Five Year plans

সরকারী বিনিয়োগ ও সাধারণ ব্যয়ের যে অংশের অর্থসংস্থান কর রাজস্ব থেকে হয় না, তা জনসাধারণের হাতে ব্যয়যোগ্য নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে দামস্ফীতিতে ইন্ধন যোগায়।

(গ) **ঘাটতি ব্যয় :** ঘাটতি ব্যয় ভারতে প্রথম পরিকল্পনা থেকেই অর্থসংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে এবং তার পরিমাণ অবিরাম বেড়ে চলেছে।

সারণি ১৩-৬ : পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয়

বৎসর/পরিকল্পনা		ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)
প্রথম পরিকল্পনা	(১৯৫১-৫৬)	৩৩০
দ্বিতীয় "	(১৯৫৬-৬১)	৯৪৮
তৃতীয় "	(১৯৬১-৬৬)	১,১৩৩
চতুর্থ "	(১৯৬৯-৭৪)	১,০০৬
পঞ্চম "	(১৯৭৪-৭৮)	৪,১৭২
ষষ্ঠ "	(১৯৮০-৮৫)	১৫,৯৯০

সূত্র : Five-year plans

ঘাটতি ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধির ফলে বিপুল পরিমাণে নগদ টাকা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনিবার্যভাবে তা চাহিদা

বাড়িয়ে দিয়ে প্রচণ্ড দামস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং মূল্যান্তর বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই ঘটনাটি প্রতিফলিত হয়েছে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে।

সারণি ১৩-৭ : পরিকল্পনাকালে জনসাধারণের হাতে টাকার যোগানের বৃদ্ধি

বৎসর	জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা (কোটি টাকা)	জনসাধারণের হাতে চলতি আমানত (কোটি টাকা)	জনসাধারণের হাতে মেয়াদী আমানত (কোটি টাকা)	টাকার মোট যোগান (কোটি টাকা)	টাকার যোগান বৃদ্ধির বার্ষিক হার (শতাংশ)
১৯৫০-৫১	১,৪১০	৬১০		২,০২০	
১৯৬০-৬১	২,১০০	৭৭০		২,৮৭০	৪ ২
১৯৭০-৭১	৪,৩৭০	২,৯৫৫	৩ ৬৩৭	১০,৯৫৮	২৮·২
১৯৮০-৮১	১৩ ৪৬৪	৯,৬৫৩	৩২,২৪১	৫৫,৩৫৮	৪০·৫
১৯৮৩-৮৪	১৯ ৫৭৩	১৩ ৪৫৩	৪২,৫৪১	৮৫,৫৬৭	১৮ ২
১৯৮৭ (জানুয়ারি)	৪৯ ৪০০			১ ৩৭,৩০০	—

সূত্র : Reports on Currency and Finance, Reserve Bank of India

পরিকল্পনার বিগত ৪০ বৎসরে ভারতে টাকার যোগান বৃদ্ধির সবটাই যে ঘাটতি ব্যয়ের জন্য হয়েছে তা নয়। অংশত ঘাটতি ব্যয় ও অংশত ব্যাঙ্ক ঋণের সম্প্রসারণ এজন্য দায়ী। কিন্তু নিঃসন্দেহে ঘাটতি ব্যয় ও টাকার যোগানের বিপুল বৃদ্ধি চাহিদার বিরাট বৃদ্ধি ঘটিয়ে দামস্ফীতিগত মূল্যবৃদ্ধির একটি প্রধান কারণে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) **কালোটাকা :** ভারতের অর্থনীতিতে কালো টাকার সৃষ্টি ও লেনদেন শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রধানত কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে। বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ ও কারবারী সংস্থা তাদের আয় ও লেনদেনের যে হিসাব সরকারের কাছে দাখিল করে সেই **হিসাব বহির্ভূত আর্থিক আয় হল কালোটাকা এবং তার লেনদেন হল কালো লেনদেন** (black or unaccounted money and transactions)। কালোটাকার বা হিসাব বহির্ভূত লেনদেনের মোট সমষ্টি হল **অর্থনীতির হিসাব বহির্ভূত বা কালো ক্ষেত্র** (black sector of the economy)। এটিকে অনেক সময় সমান্তরাল বা **পাল্টা অর্থনীতিও** (parallel economy) বলা হয়। স্বাধীনতার পর দেশে অর্থনীতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির এই কালো বা সমান্তরাল ক্ষেত্রটি এমন প্রসারিত হয়েছে যে, তা রাষ্ট্রীয় কর্মনীতিগুলি প্রভাবিত করছে। অর্থনীতির গঠন ও উৎপন্ন দ্রব্যের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, দামস্তর বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং দেশে এমন একটি শ্রেণীকে লালন পালন করছে যারা কালোটাকার বিপুল ক্ষমতার জোরে একটি অতিশয় সুবিধাভোগী অংশে পরিণত হয়েছে।

কালোটাকার পরিমাণ নির্ধারণের দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একটি হল যে কোনো বৎসরে বেতন ও মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা এবং স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের আয়, জাতীয় আয়ের এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে, বেতন ও মজুরি বাদে অন্যান্য আয়গুলি থেকে আয়করের ছাড় বাদ দিলে যা থাকে এবং ওই সব আয়গুলির মধ্যে আসলে যতটুকুর উপর আয়কর দেওয়া হয়, এই দু'য়ের পার্থক্যটাই, অর্থাৎ কর ফাঁকি দেওয়া আয়ের পরিমাণটাই হল ওই বৎসরে সৃষ্ট কালো আয় বা কালো টাকার পরিমাণ। এটা কালোটাকা পরিমাপের **ক্যালডরের পদ্ধতি**। **এডগার ফীগ** (Edgar L. Feige) নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক আমানতের অনুপাতের (currency-deposit ratio) ভিত্তিতে লেনদেনগত আয়ের (transaction-income) হিসাব করে তার সাহায্যে কালোটাকার পরিমাপ করেছেন। ভারতে কেউ কেউ প্রথম এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে কালোটাকার হিসাব করেছেন।

ভারতে প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি (Direct Tax Enquiry committee) বা ওয়াঞ্চু কমিটি সর্বপ্রথম কালোটাকার হিসাব করেছিলেন। কমিটির মতে, ১৯৬১-৬২ সালে কর ফাঁকি দেওয়া আয়ের পরিমাণটা ছিল ৮৫০ কোটি টাকা। ১৯৬৫-৬৬ সালে কর ফাঁকি দেওয়া আয়ের পরিমাণটা ছিল ২,৩৫০ কোটি টাকা। পরবর্তীকালে

কালোটাকার পরিমাণটা বেড়ে কোথায় দাঁড়িয়েছে তার একটা ধারণা পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্মীরা ১৯৮২-৮৩ সালে ভারতের কালো টাকার যে পরিমাপ করেছেন তা থেকে। **আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ওই সমীক্ষায় বলা হয়েছে ১৯৮২-৮৩ সালে ভারতে কালো-টাকার পরিমাণ ছিল ওই বৎসরের ভারতের জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ।** জাতীয় আয় সে বৎসর ছিল চলতি মূল্যস্তরে ১,৪৫,১৪১ কোটি টাকা; সুতরাং তখন কালো টাকার পরিমাণ ছিল অন্ততঃ ৭২,০০০ কোটি টাকা।

এই বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি দেওয়া আয় বা কালো টাকার পরিমাণ সরকারকে প্রাপ্য কর থেকে বঞ্চিত করছে; দেশের মধ্যে কালোটাকা ধনীদের আয় ও সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে ধনবৈষম্য ও আয়-বৈষম্য তীব্র করে তুলছে, সোনা দানা জহরতের জন্য ধনীদের বিলাস ব্যয় বাড়ছে; বিদেশী মুদ্রার কারচুপির মারফত দেশ থেকে বিদেশে গোপন আয় স্থানান্তরে সাহায্য করছে; দেশের কারবারী মহলে 'ব্ল্যাক-মানি কালচার'-এর জন্ম দিয়েছে যা প্রতিফলিত হচ্ছে কালো টাকার কারবারীদের দ্বারা সমাজবিরোধী, দালাল, স্মাগলার এবং সরকারী কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী কর্মীদের (PR men) পোষণে; রাজনৈতিক মহলে দুর্নীতির বিস্তারে এবং কালো কারবারীদের হাতে বিরাট নগদ তহবিলের মারফত মূল্যস্তরের বৃদ্ধিতে।

৪. **টাকার যোগান ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি:** একদিকে যখন দ্রুতবেগে ও সরকারী বিনিয়োগ ও চলতি ব্যয়, টাকার যোগান এবং কর ফাঁকি দেওয়া আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে অন্যদিকে তখন ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অক্ষমতা এবং উৎপাদন খরচের ক্রমাগত বৃদ্ধি দামস্ফীতিজনিত মূল্য-বৃদ্ধিকে পরিপুষ্ট করেছে।

যোগানের দিক থেকে ক্রমাগত মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বল্পহার। সারণি ১৩-৮ থেকে নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারটি লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট হবে।

এই সময়ে চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় যোগান বৃদ্ধির স্বল্প হারের সঙ্গে দ্বিতীয় যে কারণটি মূল্যস্তরের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করেছে সেটি হল উৎপাদন খরচের বৃদ্ধি। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির জন্য দায়ী কারণগুলির মধ্যে রয়েছে সরকারী কর, শুল্ক ও মাশুলের ক্রমাগত বৃদ্ধি, ডিজেল ও পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি, কয়লার দাম বৃদ্ধি, মজুরির হার বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে মুনাফা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় উৎপাদকদের দ্বারা পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও মজুতদারী প্রভৃতি।

সারণি ১৩-৮: জাতীয় আয়, উৎপাদন, জনসংখ্যা ও মূল্যস্তরের বৃদ্ধির হার (১৯৫০-৭৬-৮২) (শতাংশ)

		১৯৫০-৭৬	১৯৫০-৮২
১.	১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরে জাতীয় আয়	৩.৪	৩.৫ (১৯৫১-৮১)
২.	জনসংখ্যা	২.১	২.৮
৩.	মজুরি-দ্রব্যের (wage goods) যোগান	২.৫	—
৪.	বুনিয়াদী দ্রব্যের (basic goods) যোগান	৩.০	—
৫.	শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সূচকসংখ্যা	৬.০ (১৯৫০-৭৭)	(১৯৭৫-৮২) ৫.৩ (১৯৭৭-৮১)
৬.	কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সূচক সংখ্যা	২.১ (১৯৫০-৭৭)	২.০ (১৯৭১-৮৩)
৭.	নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (NDP)	৩.৪	৪.৪ (১৯৭০-৮৫)
৮.	টাকার যোগান	৮.০	৫৭.৬ (১৯৭৬-৮৫)
৯.	পাইকারী মূল্যস্তর	৫.৩	১৭

সূত্র: P. R. Brahmananda, The Falling Economy and How to Revive it, National Accounts Statistics (1970-71 to 1976-77) January 1979 and Statistical Outline of India, 1984 Tata Service Limited, Deptt. of Econ. and Statistics; Report on Currency and Finance 1984.

৫. গত কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভূতপূর্ব খরার দরুন খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হওয়ায় মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে বহুলাংশে ইন্ধন জুগিয়েছে। বিগত কয়েক বৎসরে সারা দেশে প্রায় ২ লক্ষ ছোট, মাঝারি ও বড় কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ার ঘটনা শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়েরই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

৬. **সরকারী মূল্যনীতির ব্যর্থতা:** মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা সহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভারতে পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলেও, সরকারী মূল্যনীতি (price policy) এই লক্ষ্য পূরণে বিফল হয়েছে। সরকারী মূল্যনীতির এই ব্যর্থতা দামস্ফীতিগত মূল্যবৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে মূল্যবৃদ্ধি দমনে

হলেও তার হার অল্প ছিল বলে বিশেষ কোনো সরকারী নজর সেদিকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ষাটের দশকের গোড়া থেকে মূল্যবৃদ্ধি প্রকট হতে শুরু করলে, মূল্যস্তরের বৃদ্ধিটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার ভারটা প্রধানত দেওয়া হয় রিজার্ভ ব্যাংকের উপর। তখন থেকে প্রধানত বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতির (selective credit controls) দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংক মূল্যস্তরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সত্তরের দশকের মাঝামাঝি মূল্যস্তরের বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠলে সরকার তখন দামস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। এই ব্যবস্থাগুলিকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (measures for demand management) এবং (২) যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা (measures for supply management)।

(১) ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে **চাহিদা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে দামস্ফীতি বিরোধী সরকারী মূল্যনীতির মূল হাতিয়ারগুলি হ'ল,**—(ক) কর সংক্রান্ত ব্যবস্থা (fiscal measures), যার মূলকথা ছিল কর বৃদ্ধি, কম্পালসারি ডিপজিট ও সরকারী ব্যয় ছাঁটাই প্রভৃতি, যার ফলে জনসাধারণের হাতে ব্যয়যোগ্য আয় (disposable income) কমে গিয়ে মোট চাহিদা কমে যাবে; এবং (খ) আর্থিক ব্যবস্থা (monetary measures), যার উদ্দেশ্য হল ব্যাংকঋণের পরিমাণগত ও গুণগত নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করে ফটকাবাজী ও মজুদদারীর উদ্দেশ্যে এবং যে সব ঋণ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াতে পারে সে সব ঋণ বন্ধ করা। কিন্তু সত্তরের দশকে এই দু'টি নীতির কোনোটিই বিশেষ সফল হয়নি। ১৯৮০ সাল থেকে ব্যাংক ঋণের আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে একদিকে জনসাধারণের হাতে নগদ টাকার যোগান না বাড়ে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঋণের যোগানও না কমে।

(২) **যোগানের ব্যবস্থাপনার নীতির অঙ্গগুলি হ'ল**—(ক) খাদ্যশস্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্য দ্রব্যের (কাপড়, চিনি, বনস্পতি ইত্যাদির) সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ ও দামনিয়ন্ত্রণ; (খ) চিনি, কাগজ, সিমেন্ট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের দুই প্রস্থ দাম নির্ধারণ (system of dual prices)—কম দামে গরিবদের জন্য এবং উচ্চতর দামে খোলা বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটি বিশেষ ফলদায়ী হয়নি; (গ) খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও সরকারী ক্রয় বৃদ্ধির মারফত দেশে খাদ্যের ঘাটতি দূর করা ও বাজারে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করা। বর্তমানে খাদ্যের রেকর্ড উৎপাদন ও সরকারী মজুতভাণ্ডারে রক্ষিত বিপুল পরিমাণ মজুদ শস্যের দ্বারা একদিকে খাদ্য ঘাটতি দূর হয়েছে, খাদ্য আমদানী বন্ধ হয়েছে ও অন্যদিকে বাজারে খাদ্যশস্যের দাম হঠাৎ পড়ে গিয়ে চাষীর ক্ষতি যাতে না হয় সে ব্যবস্থা হয়েছে; (ঘ) খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ন্যায্য দামে সাধারণ মানুষের কাছে অনুমোদিত দোকান মারফত বিক্রির ব্যবস্থা (public distribution system) প্রবর্তিত হয়েছে। সারা ভারতে ২,৫০,০০০ ন্যায্য দামের দোকান মারফত ৪৫ কোটি মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মারফত প্রধান প্রধান নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বল্প এবং একই দামে সারা ভারতে বিক্রি করার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ভারত সরকার এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়নি; (ঙ) খাদ্যশস্যে বেসরকারী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে নানা প্রকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে খাদ্যশস্যে পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাবে তা ব্যর্থ হলে ১৯৭৪ সালে এটি পরিত্যক্ত হয়।

সুতরাং মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের সরকারী ব্যবস্থাগুলি শেষ পর্যন্ত বিশেষ সফল হয়নি।

১৩.৩. দামস্ফীতিতে ফলাফল
Effects of Price Inflation

১. উৎপাদনের ও উন্নয়নের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া: (ক) অত্যধিক দামস্ফীতিতে দেশের উৎপাদন কিভাবে ক্ষুণ্ণ হয় ভারত তার একটি দৃষ্টান্ত। তৃতীয় পরিকল্পনার শুরু থেকে দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার কি ভাবে ক্রমশ কমছে সারণি ১৩-১ এ তা দেখান

সারণি ১৩-১: ভারতীয় শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার

(মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতাংশ)

	প্রস্তুতকরণ শিল্প	বুনিয়াদী শিল্প	পুঁজিদ্রব্য শিল্প	মধ্যবর্তী দ্রব্য শিল্প	ভোগদ্রব্য শিল্প
১৯৬১-৬৫	৮৭.৯	৮৮.২	৮২.৯	৮৯.২	৮৮.৫
১৯৭৬-৭৮	৭৪.৭	৬৯.৬	৭০.৮	৭৫.৬	৭৮.৪

সূত্র: Reserve Bank of India Bulletin: September, 1978.

হল। স্বল্পোন্নত দেশে এই ঘটনা কেবল সম্ভাব্য উৎপাদনের মাত্রাই যে কমিয়ে দিচ্ছে তা নয়, এটি পুঁজির অপচয়েরও একটি দৃষ্টান্ত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশ ছোঁয়া দামের দরুন সাধারণ মানুষের সামান্য আয়ের অধিকাংশই তা কিনতে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং জিনিসপত্রের দাম যত বাড়ছে তাতে আগে যতটা কেনা হত তা কেনা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে তাতে আয়ের সবটা নিঃশোষিত হওয়ায় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর কেনাকাটাও কমিয়ে দিতে হচ্ছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃত চাহিদা ও বিক্রির পরিমাণ কমে যাওয়ায় শিল্পগুলিতে উৎপাদনও কমাতে হয়েছে। কিছু কিছু শিল্পে এজন্য মন্দাও দেখা দিয়েছে। ফলে শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যে উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা ক্রমশ স্বল্পতর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) ক্রমাগত দামস্ফীতি বিনিয়োগকেও আঘাত করেছে। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা একান্তই দরকার। ক্রমাগত দামস্ফীতি তা কঠিন করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, চড়া হারে মুনাফার লোভে পুঁজি আকৃষ্ট হচ্ছে নিতান্তই স্বল্পকালীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলিতে, অথবা ফাটকা জাতীয় লগ্নিতে কিংবা স্থাবর সম্পত্তি বা সোনা রুপোয়। ফলে বিনিয়োগের বিকৃতি ঘটছে এবং পুঁজি গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তৃতীয়ত, ক্রমাগত দামস্ফীতিগত মূল্যবৃদ্ধির দরুন টাকার দাম বা ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে বলে, পরিকল্পনাগুলিতে যে বিনিয়োগ লক্ষ্য নির্ধারিত হচ্ছে, টাকার অঙ্কে তা পূর্ণ করা হলেও প্রকৃত বিনিয়োগ কম হচ্ছে ও বিনিয়োগ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃত বিনিয়োগ লক্ষ্য পূর্ণ হচ্ছে না। প্রকৃত বিনিয়োগ লক্ষ্য পূর্ণ করতে হলে আর্থিক বিনিয়োগ যে পরিমাণে বাড়াতে হয় সে পরিমাণে অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আর্থিক বিনিয়োগ হারের তুলনায় প্রকৃত বিনিয়োগ হার কম হচ্ছে।

(গ) দামস্ফীতি সঞ্চয়কেও আঘাত করছে। মূল্যবৃদ্ধির হার সুদের হারের চাইতে বেশি হলে সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত হওয়ার কারণ থাকে না। সুদের হার তখন বাড়িয়ে তার সাময়িক প্রতিকার করা যেতে পারে বটে কিন্তু দামস্ফীতি যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলতেই থাকে তখন সুদের হার সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যায় এবং সঞ্চয়কারীরা মার খায়। আর্থিক সঞ্চয় যে হারে ঘটে প্রকৃত সঞ্চয়ের হার তার চাইতে কম হয় এবং সঞ্চয়কারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এমনিভাবে ভাবতে ক্রমাগত দামস্ফীতি উৎপাদন, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়কে ক্ষুণ্ণ করে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে গুরুতর সংকট সৃষ্টি করেছে।

২. **দামস্ফীতি দেশের বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করেছে** ঃ ক্রমবর্ধমান দামস্ফীতি দেশের বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্যে পরিবর্তন করে বাণিজ্যের শর্তের (terms of trade) পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। অকৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তরের বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় অকৃষি ও কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে বাণিজ্যের শর্ত কৃষির খানিকটা অনুকূল হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এটা অতীতে কৃষির প্রতি অবহেলার খানিকটা প্রতিকার এবং কৃষকের আয়বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী বড় ধনী চাষীরা ছাড়া অন্যেরা এতে উপকৃত হয়নি। বরং ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক ও ছোট চাষী এবং গ্রামীণ গরিবদের, অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়েছে। এদের বিক্রি করার মতো উদ্বৃত্ত ফসল বিশেষ নেই, এবং বাজার থেকে চড়া দরে খাদ্যশস্য কেনার ক্ষমতাও এদের কম বা একেবারেই নেই। বড় চাষীরা এখন পর্যন্ত বিশেষ কর দেয় না, দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে অবদানও এদের এখন পর্যন্ত বিশেষ নেই। বরং এদের উদ্বৃত্ত আয়ের কিছুটা আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য খরচ হলেও বিলাসবহুল জীবন যাপনেই তার বেশির ভাগ ব্যয় হচ্ছে। সেটা আবার বিলাস উপকরণের উৎপাদনে স্বল্প উপকরণগুলির নিয়োগের মারফত শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটাচ্ছে।

৩. **আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি** ঃ (ক) ধনতন্ত্রী ও মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি সরাসরিভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের আয় সমানভাবে বাড়ায় না। সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপাদানের মালিক শ্রেণীগুলির, কারবারী, ফাটকাবাজ, চোরাকারবারীদের আয় অত্যধিক বাড়িয়ে দেয়, কমিয়ে দেয় শ্রমিক, কর্মচারী, পেনসন ও সুদভোগী এবং খাজনাভোগীদের আয়। ফলে দেশের মধ্যে আয় বৈষম্য ও ধনবৈষম্য আরও তীব্র হয়।

যাদের আয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রির উপর নির্ভর করে, মূল্যস্তরের প্রতিটি বৃদ্ধির দরুন তাদের আয় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। ফাটকাবাজ ও মজুতদারেরা এতে উৎসাহিত হয়। এদের হাতে দেশের আয়ের বৃহত্তর অংশ এসে জমতে থাকে। অন্যদিকে সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দোলনের দ্বারা খানিকটা পরিমাণে বর্ধিত হারে মজুরি, বেতন ও মহার্ঘ ভাতা আদায়ে সক্ষম হলেও সেটা সব সময়ই মূল্যস্তরের বৃদ্ধির তুলনায় কমই হয়ে থাকে। অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীরা সে সুবিধাটুকুও

পায় না। তেমনি শোচনীয় অবস্থা হয় পেনসন, সুদ ও খাজনাভোগীদের মতো অন্যান্য স্থির আয় উপার্জনকারীদের। দামস্ফীতির দরুন এদের সকলের ভাগে জাতীয় আয়ের অংশটা কমতে থাকে।

(খ) এইভাবে দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় দামস্ফীতির সমান অনুপাতে বাড়ে না বলে, এবং অনেকের আয় মোটেই বাড়ে না বলে, অথচ দামস্ফীতির দরুন টাকার ক্রয় ক্ষমতা ক্রমাগত কমতে থাকে বলে, এদের সকলেরই প্রকৃত আয় সাধারণভাবে কমে যায়। ফলে দামস্ফীতির দরুন জনসাধারণের ভোগের পরিমাণ ও মান কমছে। অন্যদিকে করের মারফত দেশবাসীর উপর উন্নয়নের যে বোঝা চাপানো হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান আয়ের দরুন ধনীরা যেমন উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে, তেমনি তাদের আয়ের তুলনায় বর্ধিত করের বোঝা অনেক কমই হচ্ছে। তুলনায় যে বিপুল সংখ্যক দেশবাসী উন্নয়নের উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বল্প আয়ে ও ব্যাপক বেকার সমস্যার মধ্যে রয়েছে তাদের উপরই পরোক্ষ করের বিপুল বোঝাটা পড়ছে।

সুতরাং ভারতে ক্রমাগত দামস্ফীতির বোঝা ও উন্নয়নের বোঝা গরিবদেরই বহন করতে হচ্ছে, তাদের জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির বিনিময়ে। কেবল আয় বণ্টনে বৈষম্যই নয়, উন্নয়নের বোঝা বণ্টনেও ভারতে বৈষম্য তীব্রতর হচ্ছে।

৪ **বিদেশী মুদ্রা উপার্জন ঃ** ভারতের ক্রমবর্ধমান দামস্ফীতি রপ্তানি দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির পথে যেমন অন্যতম বাধা সৃষ্টি করছে, তেমনি, অনেক ভারতীয় দ্রব্যের তুলনায় বিদেশী পণ্য সস্তা হওয়ায় তার চাহিদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে ভারতে বিদেশী মুদ্রার উপার্জন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না, কিন্তু আমদানি বৃদ্ধির দরুন বিদেশী মুদ্রার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজন মতো বিদেশী মুদ্রা উপার্জনে অভ্যন্তরীণ দামস্ফীতি প্রবল বাধা হয়ে উঠেছে।

১৩.৪ অর্থনীতিক উন্নয়ন ও দামস্ফীতি
Economic Growth & Price Inflation

১. ধনতন্ত্রে উন্নয়ন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হল, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর অর্থনীতিক উন্নয়নের সহগামী হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ যতই এগিয়ে চলে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির মধ্যে মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা ততই প্রকট হয়ে ওঠে। এসব দেশে যখন ব্যাপক শিল্পায়ন, কৃষির উন্নয়ন আর পরিবহণ সংসরণের উন্নতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হতে থাকে তখন পুঁজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের (intermediate goods) চাহিদা খুব বেশি রকমে বেড়ে যায়। স্বল্পোন্নত দেশে ঐ সব দ্রব্যের যোগানের তুলনায় চাহিদা অত্যধিক হয়ে পড়ায় এদের দাম চড়ে যায়। চড়া দামে কেনা এ সব পুঁজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্য ব্যবহার করে যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় সে দ্রব্যের দামও স্বভাবতই বেশি হতে বাধ্য। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের এটা হল এক দিক। এ ছাড়া, উন্নয়নের কাজে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের ফলে সমাজের মোট আর্থিক আয় (money income), অর্থাৎ, মোট ক্রয়শক্তি বা কার্যকর চাহিদা (effective demand) প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। যে গতিতে আর্থিক আয় বাড়তে থাকে তার সাথে সমান তালে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। এক কথায়, চাহিদা মেটাবার মত দ্রব্যের উপযুক্ত যোগান থাকে না। ফলে মূল্যস্তর বাড়তে থাকে। মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল স্বল্পোন্নত দেশে এ ব্যাপারটা একটা বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়। সেটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। স্বল্পোন্নত দেশের সামনে মূল সমস্যা দ্রুতহারে শিল্পায়ন। শিল্পায়নের দু'টা দিক আছে। এক দিকে হল, মৌলিক বুনিয়াদী ও পুঁজি নিবিড় (capital-intensive) ভারী শিল্প আর অন্যদিকে হল, মাঝারি ও ছোট আকারের পুঁজি লঘু (capital-light) ভোগ্যপণ্য শিল্প। শিল্পায়নের দুটো দিক একই সঙ্গে সমান তালে চলতে পারলে স্বল্পোন্নত দেশের অনেক সমস্যাই সহজ হয়ে যেত। কিন্তু সেটা কিছুতেই সম্ভব হয় না বলেই যত সমস্যা। এটা সম্ভব না হবার কারণ হল, স্বল্পোন্নত দেশে পুঁজির প্রাচুর্য নেই। প্রাচুর্য নেই বলেই প্রশ্নটা দাড়ায়, যে সামান্য পুঁজি দেশে আছে শিল্পায়নের কোন্ দিকে সে পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে। শিল্পায়নের দিক-নির্বাচন অর্থাৎ বিনিয়োগের ধাঁচ (pattern of investment) ঠিক করাই হল স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম সমস্যা। সমস্যা এজন্য যে, সীমিত পুঁজি একদিকে বিনিয়োগ করলে অন্য দিকটি অবহেলিত থেকে যায়। বুনিয়াদী, পুঁজি-নিবিড়, ভারী শিল্প গঠনে সব পুঁজি লগ্নি করলে, ভোগ্যপণ্য শিল্পে বিনিয়োগের জন্য কিছু থাকে না ; আবার ভোগ্যপণ্য শিল্পে প্রসারে বেশি জোর দিলে বুনিয়াদী শিল্পগঠন ব্যাহত হয়। স্বল্পোন্নত দেশ তাহলে কোন্ পথে এগোবে ?

২. ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার গোড়ার দিকে ঠিক এ সমস্যাই দেখা দিয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় এ সমস্যা আদৌ আসেনি। তার কারণ, ভগ্নদশা থেকে ভারতের কৃষিকে কিছুটা উন্নত করে তৎকালীন খাদ্য-সমস্যার সমাধান ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার অন্যতম

লক্ষ্য। শিল্পায়নের ব্যাপক কোনো কার্যসূচী সে পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়নি। তাই সে সময় সমস্যা-টাও তেমন বড় আকারে আসেনি। শিল্পায়নের দিক নির্বাচন ও বিনিয়োগের ধাঁচ কি হবে সে সম্পর্কে সমস্যাটা দেখা দেয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে। এ পরিকল্পনায় বুনিয়াদী, পুঁজি-নিবিড়, ভারী-শিল্প বিকাশের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বলা হয়, দ্রুতগতিতে শিল্পো-ন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। বুনিয়াদী, ভারী শিল্প যত বেশি গঠিত হবে, শিল্পভীত্তিও ততই দৃঢ় ও ব্যাপক হবে। একবার এ ধরনের ভিত্তি স্থাপিত হলে ভবিষ্যতে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে, দেশ কৃষিভিত্তিক স্বল্পোন্নতির অবস্থা থেকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। একথা সত্য, এভাবে এগোলে ভোগ্যপণ্য শিল্প গঠন করা সম্ভব হয় না। ভোগ্যপণ্যোৎপাদনও খুব বেশি বাড়তে পারে না। অপর পক্ষে, জনসাধারণের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দেশের সীমিত পুঁজি ভোগ্যপণ্য শিল্পগঠনে বিনিয়োগ করা হলে, তাতে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন অবশ্যই বাড়বে, দেশে ভোগের পরিমাণও পূর্বাপেক্ষা বেশি হবে, কিন্তু দেশের অর্থনীতি কোনো দিনই যথার্থ শিল্পোন্নত হতে পারবে না ; শুধু তাই নয়, নতুন ভোগ্যপণ্য শিল্পও খুব বেশি সংখ্যায় স্থাপন করা যাবে না। তার কারণ, নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম তৈরি করার জন্য যে বুনিয়াদী, ভারী শিল্প গঠন করা দরকার, সবটুকু পুঁজি ভোগ্যপণ্য শিল্পে বিনি-য়োজিত হওয়ার ফলে বুনিয়াদী শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, দেশের অর্থনীতি এ অবস্থায় এক ধরনের নিচুস্তরের শিল্পায়নেই চিরদিন আবদ্ধ থাকে।

৩. এই কৌশল নিলে উৎপাদন শুরু হতে সুদীর্ঘ সময় লাগে (long gestation period)। অর্থাৎ, শিল্পটি উৎপাদন করার মত অবস্থায় আসার অনেকদিন (বহু বৎসরও হতে পারে) আগে থেকেই অর্থ বিনিয়োগ হতে থাকে। দিনে দিনে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এই বিনিয়োজিত অর্থে উৎপাদন তৎক্ষণাৎ বাড়ে না, কিন্তু সমাজের আর্থিক আয় বিপুল পরিমাণে বাড়ে। সীমিত দ্রব্যসামগ্রীর (পুঁজিদ্রব্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ভোগ্যপণ্য) উপর এই বর্ধিত আয় প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। চাহিদা অনুযায়ী যোগান না থাকায় মূল্যস্তর অনিবার্যভাবে বাড়তে থাকে। অবশ্য বিনিয়োগ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে শিল্পটি উৎপাদন করার অবস্থায় আসতে যদি অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে (short gestation period) সেক্ষেত্রে উন্নয়ন-মূলক বিনিয়োগের ফলে সমাজের বর্ধিত আয়ের চাপ মূল্যস্তরের উপর ততটা তীব্র নাও হতে পারে। কারণ, বিনিয়োগের কাজ আরম্ভ হবার স্বল্পকালের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হলে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে যোগানও বাড়বে, মূল্যস্তরও মোটামুটিভাবে স্থির থাকবে।

৪. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বাড়তে থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ায় মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ১৯৫১-৬১ সালের মধ্যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০,১০০ কোটি টাকা। ১৯৬১-৭১ সালের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগ হয় ২০,০০০ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের বিনিয়োগের পরিমাণ হল ১৫,০০০ কোটি টাকা। এই বিশাল অর্থ প্রধানত পুঁজি-দ্রব্য শিল্পেই বিনিয়োজিত হয়। এর পাশাপাশি ভোগ্য-পণ্য শিল্প যথেষ্ট সংখ্যায় গড়ে ওঠেনি, তাই বিপুল পরিমাণ আর্থিক আয় দেশের সীমিত ভোগ্যপণ্যের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে। দামস্তরও ক্রমাগত উপরের দিকে উঠতে থাকে। তাই দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর ৩০ শতাংশ আর তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। পরবর্তী তিন বৎসর মূল্যস্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচবৎসরের মূল্যস্তর ৫০ শতাংশ বাড়ে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর গড়ে ৬ শতাংশ হারে আর তৃতীয় ও চতুর্থ পরি-কল্পনায় গড়ে বৎসরে ৯-১০ শতাংশ হারে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটেছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে।

৫ কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নকালে এমন একটি পরিস্থিতি থাকলে সব দিক থেকে ভাল, যে পরিস্থিতিতে মূল্যস্তর সামান্য হারে ধীরে ধীরে বাড়বে। এর পিছনে যুক্তি হল, এভাবে মূল্য বাড়তে থাকলে বিনিয়োগকারীদের মুনাফাও বাড়বে। বেশি মুনাফার সম্ভাবনায় বিনিয়োগ বাড়বে, শিল্প প্রসারিত হবে, শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান বাড়বে, নতুন কর্মসংস্থান হবে। প্রচ্ছন্ন বেকারী বা স্বল্পনিযুক্তি ক্রমে ক্রমে দূর হতে থাকবে। অন্যদিকে কৃষিজ পণ্যের দামও একটু একটু করে বাড়তে থাকলে কৃষির উৎপাদন বাড়াবার কাজে কৃষক উৎসাহিত হবে। ক্রমে ক্রমে কৃষি ও শিল্পের মোট উৎপাদন বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা দূর হবে। এভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হবে। অনেকটা এ যুক্তিতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা কাল থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর পর্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ৬ শতাংশ হারে যে মূল্যস্তর বেড়েছিল তা সকলে এক রকম মেনেই নিয়েছিল।

কিন্তু তারপর থেকে মূল্যবৃদ্ধির হার যে রকম বেড়ে

গেছে তাতে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর উন্নয়নের সহায়ক বলে কোনোমতেই মনে করা যাচ্ছে না। গত কয়েক বছর ধরে মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য দূর করার যে লক্ষ্য নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল তা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতিটা সাধারণ দামস্ফীতির স্তর ছাড়িয়ে **অতি দামস্ফীতির** পর্যায়ে চলে গিয়েছে। প্রতিবার মূল্যবৃদ্ধি পরবর্তী স্তরে মূল্যবৃদ্ধির সূচনা করছে এবং তার গতিবেগটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় মজুদদারী, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরীর প্রবৃত্তি ব্যাপক হয়ে উঠেছে। মজুরি ও বেতনবৃদ্ধি কোনোদিনই মূল্যবৃদ্ধির সাথে সমান তালে চলতে পারে না, সব সময় পিছিয়েই থাকে। তাই এ অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ও দামস্ফীতির দরুন দেশের মধ্যে আয়-বণ্টনে বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে। এটা স্পষ্টতই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের বিরোধী।

শুধু তাই নয়, এই অতি-দামস্ফীতি প্রতিটি পরিকল্পনাকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছে এবং সপ্তম পরিকল্পনার পথেও বিরাট বাধা সৃষ্টি করেছে। দামস্ফীতির দরুন টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে বলে, মোট আর্থিক বিনিয়োগের তুলনায় প্রকৃত বিনিয়োগ কম হচ্ছে। অর্থাৎ বিনিয়োগের আর্থিক লক্ষ্য পূরণ হলেও প্রকৃত লক্ষ্য পূর্ণ হচ্ছে না এবং সেই পরিমাণে পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। টাকার অঙ্কে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়লেও এটাকে আসলে বিনিয়োগের হ্রাস বলে গণ্য করতে হয় এবং এর দরুন অর্থনীতিতে মন্দা গভীর হতে থাকে।

১৩.৫ 'স্ট্যাগ-ফ্লেশন' বা 'নিশ্চলতা-স্ফীতি'
Stag-flation

১. ষাটের দশকে শিল্পে ও কৃষিতে উন্নয়নের যে নিম্নহার দেখা দিয়েছিল তা সত্তরের পুরো দশক জুড়েই অব্যাহত ছিল। আশির দশকে এসে এখনও তা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার এখনও ৪ শতাংশ অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ পরিকল্পনার প্রথম দশক বাদ দিলে পরবর্তী আড়াই দশক ধরে মূল্যস্তরের ক্রমাগত দামস্ফীতিগত বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। একদিকে উন্নয়ন হারের ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়া বা যথেষ্ট না হওয়া অর্থাৎ নিশ্চলতা (stagnation) এবং অন্যদিকে দামস্ফীতিগত মূল্যবৃদ্ধি (inflation) এই দু'টি পরিস্থিতির পাশাপাশি অবস্থানের ঘটনাকেই 'স্ট্যাগফ্লেশন' বা 'নিশ্চলতা-স্ফীতি' বলা হয়।

২. প্রশ্ন উঠতে পারে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ছে না কেন? দেশে যদি পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকে তবে মূল্যস্তর বাড়লে উৎপাদন বাড়ারই কথা। অথচ এখানে এখন তা হচ্ছে না। তা না হওয়ার কারণ হল: (১) কৃষিজাত কাঁচামালের ও খাদ্যশস্যের অত্যন্ত চড়া দরের ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎশক্তির যোগানে স্বল্পতা ও আমদানি-করা অতি-প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব, (২) খাদ্যশস্যের চড়া দামের ফলে খাদ্য কিনতে মানুষের আয়ের বেশির ভাগ খরচ হওয়ায় শিল্পজাত পণ্য কেনার ক্ষমতার অভাবে শিল্পজাত পণ্যগুলির চাহিদা হ্রাস, (৩) মুদ্রা-স্ফীতি-বিরোধী কঠোর সরকারী বিধি-ব্যবস্থার ফলে বিনিয়োগকারীদের উদ্যম হ্রাস; এবং (৪) উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমানোর পরিবর্তে একশ্রেণীর শিল্পপতিদের উৎপাদন কমিয়ে দাম চড়া রাখার মনোবৃত্তি। এইসব কারণে, মূল্যস্তরের বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্পের উৎপাদন অতি ধীর গতিতে বাড়ছে এবং শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত পড়ে থাকছে।

৩. এই মুদ্রাস্ফীতির দরুন দেশে আয়ের বণ্টনেও বৈষম্য বাড়ছে। মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে উৎপাদকের, বিশেষত বড় চাষীদের এবং বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফা ও আয় দ্রুত বাড়ছে আর স্থির আয়ের মানুষদের বিশেষত মজুরি ও বেতনভোগীদের এবং ক্রেতাদের ক্ষতি হচ্ছে। কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বড় কৃষক বেচাকেনা ও মজুদদারী ও সংশ্লিষ্ট লেনদেনগুলি গোপন করছে। এই গোপন লেনদেনগুলি থেকে কালোটাকার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা আবার গোপন লেনদেনে খাটছে। বিপুল পরিমাণ কালোটাকাকে 'সাদা টাকা'-তে পরিণত করার চেষ্টায় তা শহরাঞ্চলে জমি, বিলাসবহুল আধুনিক ফ্ল্যাট তৈরি ও কেনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। চোরাই চালানী কারবার থেকেও কালোটাকা জমাচ্ছে এবং তা উপরোক্তভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কর আদায় এবং কর ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত কড়াকড়ি এবং নানা রকম সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও, কালো টাকার পরিমাণ যে বেড়েই চলেছে তার প্রধান কারণ হল, 'সাদা' ও 'কালো' টাকার লেনদেনগুলি এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে তা আলাদা করে ধরা কঠিন হয়ে পড়েছে। 'সাদা' অর্থাৎ আইনসম্মত লেনদেনগুলি থেকে 'কালো' অর্থাৎ বেআইনী লেনদেনগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা খুবই কঠিন। একারণে প্রচলিত নগদ টাকার একাংশ বাজেয়াপ্ত (de-monetization) না করলে কালোটাকা দমন করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৪. উত্তম ফসল সত্ত্বেও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং দামস্ফীতি সত্ত্বেও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির স্বল্পতা বা ধীর গতির এই পরিস্থিতিকেই আধুনিক অর্থনীতির

ভাষায়, 'স্ট্যাগ ফ্লেশন' অর্থাৎ 'নিশ্চলতা-দামস্ফীতি' বা সংক্ষেপে 'নিশ্চলতা-স্ফীতি' বলে। ভারত বর্তমানে এই 'নিশ্চলতা-স্ফীতি' কবলেই পড়েছে।

১৩ ৬. সরকারের মূল্যনীতি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা Price Policy of the Government and Remedial Measures

১. মূল্যনীতি: প্রথম পরিকল্পনার গোড়া থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দেশে মূল্যস্তর বৃদ্ধির সমস্যাটি দেখা দেয়নি বলে, সরকারী মূল্যনীতির গুরুত্ব তেমন করে উপলব্ধি করা যায়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারের একটা ঘোষিত মূল্যনীতি ছিল। সে মূল্যনীতিটি ছিল মূল্যস্তর মোটামুটি স্থিতিশীল রাখার নীতি। প্রথম পরিকল্পনায় তো মূল্যস্তর খানিকটা কমই ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সবেমাত্র বৃদ্ধিটা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তার পরিমাণটি ছিল সামান্য। মূল্যস্তরের সামান্য বৃদ্ধিটা উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, এমন একটা ধারণা মেনেও নেওয়াও হয়েছিল। ব্যাঙ্কঋণের বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই মূল্যস্তর যথাসম্ভব স্থিতিশীল রাখা যাবে এই ধারণায়, মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের ভারটা দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর। কিন্তু মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার গুরুত্বটা এবং মূল্যনীতির প্রয়োজনটা দেখা দিল তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময়। তখন প্রয়োজন হল একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে পুঁজি ও অন্যান্য উপকরণের সুষ্ঠু আবণ্টনের এবং এজন্য মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার। তারপর থেকে দেশে ধ্বনিটা ওঠে দামের স্থিতিশীলতাসহ উন্নয়নের। কিন্তু প্রায় ওই সময় থেকেই দেখা দেয় দামস্ফীতির দানব। আর গত চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় পরিস্থিতি এমন হয় যে সরকার দামস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তো সুস্পষ্ট করেই মূল্যনীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অঙ্গীভূত ব্যবস্থাদি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সম্ভবমতো মাত্রায় খাদ্যমূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাটাই হল প্রধান লক্ষ্য।

২. গৃহীত ব্যবস্থা: তৃতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে এ পর্যন্ত সরকারী মূল্যনীতির অনুসরণে যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সে সব মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল, চাহিদার ব্যবস্থাপনা (demand management), অন্যটি হল যোগানের ব্যবস্থাপনা (supply management)।

৩. চাহিদার ব্যবস্থাপনা: ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ভারত সরকারের মূল্যনীতির একটি লক্ষ্য হল দ্রব্য ও সেবার অত্যধিক চাহিদা খর্ব করা। এই লক্ষ্যে নিযুক্ত উপায়গুলি চাহিদার ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত। জনসাধারণের হাতে ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ কমানো গেলেই দ্রব্য ও সেবার অত্যধিক চাহিদা খর্ব হবে। এই ধারণায়, আর্থিক ও ফিসক্যাল ব্যবস্থার দ্বারা এই উদ্দেশ্যটি সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ফিসক্যাল ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কম্পালসরি ডিপজিট স্কীম, কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা। উপর বিধিনিষেধ জারী, এবং অ্যাডিশন্যাল এমোলিউমেন্টস অর্ডিন্যান্স। আর্থিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যাঙ্কঋণের সাধারণ ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রয়োগ, ঘাটতি ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা, ব্যাঙ্কঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ প্রভৃতি।

৪. যোগানের ব্যবস্থাপনা: দ্রব্য ও সেবার যোগান ও বণ্টনের উন্নতি হল যোগানে ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য। প্রধান চারটি ব্যবস্থার মারফত এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে: প্রথমত, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক সাধারণ সময়ে কারবারে যে পরিমাণ মজুত সঞ্চারের প্রয়োজন হয় তা। বেশি মজুত না রাখা; তৃতীয়ত, ঘাটতি হলে খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করা; এবং চতুর্থত, দ্রব্য ও সেবার বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

যোগানের উন্নতির জন্য সরকার আরও যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল, মজুতদারী ও ফাটকাবাজী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যের ন্যূনতম খরিদ দর, এবং সর্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় দর বেঁধে দেওয়া, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট ইত্যাদি কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে গরিব ক্রেতাদের সুবিধার জন্য উৎপাদনের একটি অংশ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং বাকি অংশ বাজার দর অনুযায়ী বেচাকেনার ব্যবস্থা করা (এটি দ্বৈত মূল্যনীতি নামে পরিচিত)।

বণ্টনব্যবস্থার উন্নতির জন্য সারা দেশে আড়াই লক্ষ ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত খাদ্যশস্য, চিনি, পাম অয়েল প্রভৃতি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি যে যথেষ্ট ফলদায়ী হয়নি দামস্ফীতির অব্যাহত গতিবেগই তার সবচাইতে বড়ো প্রমাণ।

৫ অবস্থার প্রতিকারের জন্য আরো যা প্রয়োজন: তা হল আশু ব্যবস্থা হিসেবে—(১) অতি কঠোরভাবে রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করা; (২) খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা; (৩) আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার বজায় রখা; (৪) খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কাপড়ের

মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ; (৫) চাষীদের জন্য ন্যায্য দরে রাসায়নিক সার বণ্টনের ব্যবস্থা করা ; (৬) কালোটাকা বাজেয়াপ্ত করা ; (৭) ফাটকাবাজ, মজুতদার ও মুনাফাখোরদের এবং ভেজালদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; (৮) কর ফাঁকি বন্ধ করা এবং (৯) কঠোরভাবে ব্যাঙ্কঋণের অপব্যবহার বন্ধ করা।

দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে দরকার হল : (ক) কৃষিতে প্রকৃত ভূমি সংস্কার সম্পাদন করা ও সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে তা বিলি করা ; (২) শিল্পে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা ; (৩) বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং (৪) ছোট ও মাঝারি চাষীদের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে কৃষির উন্নত বীজ, উন্নত পদ্ধতি, কীটনাশক রাসায়নিক সার, সেচ ও ঋণ সরবরাহ এবং ফসল বিক্রির সুবন্দোবস্ত করা।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। ভারত সরকার মূল্যস্তর ধরে রাখার জন্য কি কি ব্যবস্থা সুপারিশ করেছে ?

[Analyse the causes of the recent rise in the price level in India. What measures have been recommended by the Government of India to hold the price-line ?]

২. ভারতের অর্থনীতিতে মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলাফল পর্যালোচনা কর।

[Examine the effects of the rise in the price level on the Indian economy.]

৩. ভারতের সাম্প্রতিক দামস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তোমার মতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ?

[What measures, in your opinion, should be taken to control the current price inflation in India ?] [C.U.B.Com. (Hons.) 1984]

৪. "ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহগামী"—দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে ভারতে মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে এ উক্তিটির যথার্থতা সম্পর্কে মন্তব্য কর।

["A continuously rising price level always accompanies economic development." Comment on the validity of this statement in the context of the rise in price level since the beginning of the Second Plan.]

৫. ভারতে যে দামস্ফীতি চলেছে তার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি কতদূর দায়ী তা নির্দেশ কর : (ক) সরকারের ঘাটতি ব্যয় ; (খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদান ; (গ) খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি।

[Indicate how far the following factors are responsible for the price inflation in the Indian economy : (a) Government's deficit financing ; (b) Creation of credit by the commercial banks ; (c) Deficit in food production.]

৬. নিম্নলিখিত আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী পরিস্থিতিগুলি ব্যাখ্যা কর : (ক) কৃষির প্রচুর ফলন সত্ত্বেও কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ; (খ) পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও শিল্পজাত উৎপাদনের ধীরতর গতি ; (গ) বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও কালো টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি।

[Explain the following apparently self-contradictory situations : (a) rise in the prices of agricultural produce even though there has been an increase in agricultural production ; (b) slow rise in the production of industrial goods even though there has been a rise in the price level ; (c) increase in the volume of black money even though there has been greater control over the private sector.]

৭. মূল্যস্তর বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা বিচার কর।

[Examine the measures that have been adopted by the Government of India to check price-inflation.]

৮. ভারতে বর্তমান দামস্ফীতিজনিত পরিস্থিতির প্রকৃতি আলোচনা কর।

[Discuss the nature of the current inflationary situation in India.]

৯. তোমার মতে ভারতে দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণগুলি কি কি ? দামবৃদ্ধি রোধের জন্য কি কি ব্যবস্থার সুপারিশ কর ?

[What, in your opinion, are the reasons for the rising trend of price-level in India ? What measures do you recommend for arresting the price rise ?]

[B.U.,B.A. (III, Pass), 1983]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. 'স্ট্যাগফ্লেশন' কথাটা কি বোঝায় ?

[What does 'stagflation' mean ?]

আর্থিক নীতি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Monetary Policy And Economic Development

উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিতে-একটি পার্থক্য হল, উন্নত দেশগুলির তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে টাকার ব্যবহার কম। উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থা বাজারনির্ভর। সুতরাং ভোগী ও ব্যবহারকারীরা বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে প্রয়োজন মিটায়। সেখানে যাবতীয় কেনাবেচার কাজে টাকার ব্যবহার হয় বলে দেশের সব উৎপাদনক্ষেত্রেই বিশেষায়ণ বাড়ে। আধুনিক অর্থনীতির সকল অঙ্গ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে প্রাক্-ধনতন্ত্রী উৎপাদন সম্পর্ক ও সমাজব্যবস্থার ভগ্নাবশেষগুলি কম বেশি পরিমাণে রয়ে গেছে বলে, উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর এবং উৎপাদনের একাংশের এখনও সরাসরি বিনিময় ঘটে থাকে। সুতরাং বাজারে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করার মত সামগ্রীর পরিমাণ অল্প। ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে টাকার প্রচলন ও ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকে। তাতে উৎপাদনের বিকাশ, আর্থিক সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও সংগ্রহ, অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদনের বিশেষায়ণ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে না। ভারতে ইংরেজ আমলে, গত শতাব্দী থেকে আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রাগত বিনিময় ও লেনদেন প্রসারের এখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আধুনিক মুদ্রাগত ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপ ও মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে বহু অসুবিধা দেখা দেয়।

১৪·১· ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
The Indian Currency System : A Brief History

১. ১৮৩৫ সালের মুদ্রা আইন : ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ ভূভাগে শাসনকার্যে শৃঙ্খলা আনতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে, কোম্পানির রাজত্বে ১৮৩৫ সালে মুদ্রা আইন প্রবর্তিত হয়। এ আইনের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অংশে একই ধরনের এক ওজনের রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তিত হয়। এজন্য এই আইনটি রৌপ্যমুদ্রার একীকরণ আইন নামেও পরিচিত। কর্ণওয়ালিসের সময় ইংরেজ রাজত্বে যে রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তিত হয়, সেটাই সমগ্র ইংরেজ

শাসিত ভারতে একমাত্র মুদ্রায় পরিণত হয়। এই রৌপ্য-মুদ্রা মান ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রুপোর টাকার সাথে সোনার মোহরও চালু রাখা হয় এবং এই ব্যবস্থাটাকে দ্বিধাতুমান নাম দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রুপোর টাকার প্রচলনটাই বেশি থাকে।

২. কাগজের মুদ্রার প্রচলন : আঠারো শতকের শেষ-ভাগে ভারতে কয়েকটি বেসরকারী ইউরোপীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের নিজস্ব কাগজের মুদ্রার বা নোটের প্রবর্তন করলেও তাদের প্রচার সামান্যই ছিল। ১৮০৬ সালে ব্যাংক অব ক্যালকাটা (যা ১৮০৯ সালে ব্যাংক অব বেঙ্গল এ রুপান্তরিত হয়) সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ঐ ব্যাংক নিজ নামে নোট প্রচলন করে। সরকার সেটাকে স্বীকৃতি দেয়। পরে ১৮৪০ সালে বোম্বাই এবং ১৮৪৩ সালে মাদ্রাজে যথাক্রমে ব্যাংক অব বোম্বে ও ব্যাংক অব মাদ্রাজ অনুরূপভাবে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। এরাও নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ নোট প্রবর্তন করে। কাগজের মুদ্রা বা নোটের প্রবর্তনের এই পরীক্ষা সফল হওয়ায় অবশেষে ১৮৬১ সালে ভারত সরকার ঐ ব্যাংকগুলির নিকট থেকে নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকার নিজ হাতে তুলে নেয়।

৩. স্বর্ণ বিনিময় মান : ১৮৭৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দাম কমতে থাকে। এতে ভারতের রৌপ্যমুদ্রার মূল্যও কমতে থাকে। অনেক দেশ রৌপ্য-মুদ্রামান পরিত্যাগ করে। ভারতেও স্বর্ণমুদ্রামান প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা হয়। ১৮৯২ সালে এ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হার্শেল কমিটি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ভারতের উপযোগী স্বর্ণমুদ্রামান নির্ধারণের জন্য ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি নামে আর একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ভারতে স্বর্ণবিনিময় মান প্রবর্তনে সুপারিশ করে। এই প্রস্তাবে ভারতের অভ্যন্তরে রৌপ্যমুদ্রা বজায় রাখবার সুপারিশ করা হয়। ভারতে তার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেশের বাইরে ভারতীয় মুদ্রাকে ইংলন্ডের স্বর্ণমুদ্রার সাথে বিনিয়োগযোগ্য করার এবং ভারতের রৌপ্যমুদ্রার সাথে ইংলন্ডের পাউন্ডের বিনিময় হার ১ শি. ৪ পে. রাখবার পরামর্শ দেওয়া হয়। ফলে বস্তুতপক্ষে দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন ছাড়াই এই মুদ্রামান স্বর্ণমানে পরিণত হয়। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এটা প্রচলিত থাকে।

৪. স্বর্ণ পিণ্ডমান : ১৯১৭ সালে মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিশৃংখলার জন্য স্বর্ণবিনিময় মান পরিত্যক্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে রৌপ্যমূল্যের বৃদ্ধি ও ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের দরুন ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হার বেড়ে যায়। ফলে, সরকারী বিনিময় হার (১টাকা = ১ শি ৪ পে.) অকেজো হয়ে পড়ে। মুদ্রাবিনিময় ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশৃংখলা চলতে থাকে। অবশেষে ১৯২৫ সালে ভারতের উপযুক্ত মুদ্রামান সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য হিল্টন-ইয়ং কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশন ভারতে স্বর্ণপিণ্ডমান প্রবর্তনের সুপারিশ করে। তার সংখ্যা-গরিষ্ঠ সদস্যরা ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য ১ টাকা = ১ শি. ৬ পে. ধার্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক নামে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব তার সুপারিশগুলির অন্যতম। ১৯২৭ সালে ভারত সরকার স্বর্ণপিণ্ডমান প্রবর্তন করে। তা ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বজায় ছিল। দেশের মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা ও কাগজের নোট প্রচলিত থাকে। শুধু বৈদেশিক লেনদেনের প্রয়োজনে ভারতের টাকাকে ইংলন্ডের পাউন্ডে ভাঙানোর ব্যবস্থা হয়। পাউন্ড সে 'সময় স্বর্ণ-মানে ছিল। সুতরাং ভারতীয় টাকাকে পাউন্ডে ভাঙালে স্বর্ণমানের সুবিধা পাওয়া যেত।

৫. স্টার্লিং বিনিময় মান : ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মন্দার চাপে ইংলন্ড থেকে স্বর্ণ বাইরে চলে যেতে থাকে। স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ করার জন্য ইংলন্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। ভারতের মুদ্রামানের গাঁটছড়া স্টার্লিং (অর্থাৎ পাউন্ড স্টার্লিং)-এর সাথে বাঁধা ছিল। সেজন্য ভারতও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। পাউন্ডের সাথে টাকার বিনিময় হার অবশ্য অপরিবর্তিত রাখা হয়। তখন ভারতের অভ্যন্তরে অবশ্য রৌপ্যমুদ্রা ও কাগজের নোটই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাউন্ডের সাথে বিনিময়হার নির্দিষ্ট থাকায় বৈদেশিক প্রয়োজনে টাকাকে পাউন্ড-স্টার্লিংয়ে ভাঙান যেত। এজন্য এসময়ের ভারতীয় মুদ্রা-মান স্টার্লিং বিনিময় মান নামে পরিচিত। পাউন্ড তখন কাগজের মুদ্রামানে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থা ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা এই সময়ের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। রিজার্ভ ব্যাংক আইনগতভাবে দেশে মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়। টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় হার বজায় রাখা ও টাকার বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ভার এর উপর অর্পিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকরূপে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয়।

৬. স্টার্লিং পাওনা : ভারতে প্রচলিত কাগজের মুদ্রার জন্য জমা হিসাবে কিছু পরিমাণ স্টার্লিং পাওনা ইংলন্ডে রাখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জামিন হিসাবে ছাড়া তার

আর কোনো গুরুত্ব ছিল না। ১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ডে অবস্থিত এই স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ ছিল ৬৬.৯৫ কোটি টাকা। অথচ ৬ বছর পরে ১৯৪৫-৪৬ সালে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের প্রাপ্য স্টার্লিংয়ে পরিমাণ বেড়ে ১,৭৩৩ কোটি টাকা হয়। মিত্রশক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতে যুদ্ধের জন্য যে বিরাট পরিমাণ সামরিক ও বেসামরিক দ্রব্য কিনেছিল তার মূল্য স্টার্লিংয়ে পরিশোধ করে এবং তা ইংলণ্ডে জমা রাখে। ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের যুদ্ধ বাবের একাংশ বহন করতে রাজী হয়। ভারতীয়দের হাতে ডলার ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা (স্টার্লিং বাদে) যা সঞ্চিত ছিল তার সবটাই (ব্রিটিশ) 'সাম্রাজ্য ডলার তহবিল'-এ জমা দেওয়া হয়। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে তখন যে অনুকূল উদ্বৃত্ত হয়েছিল তাও ইংলণ্ডে জমা রাখা হয়। এ সকল কারণে ইংলণ্ডের কাছে ভারতের বিপুল পরিমাণ স্টার্লিং পাওনা জমে।

এদিকে ইংলণ্ডে যতই স্টার্লিং পাওনা জমা হতে থাকে ততই ভারতে তার ভিত্তিতে কাগজের টাকার প্রচলন বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে অতিরিক্ত কাগজের টাকা সৃষ্টি করে মিত্রশক্তি ভারতে তাদের সমস্ত যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করে। এর ফলে ভারতে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ও তারফলে ভারতবাসী অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করে।

যুদ্ধের পর ভারতের নিকট ইংলণ্ডের এই দেনা পরি-পরিশোধের প্রশ্ন ওঠে এবং ইংলণ্ডের দিক থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ অনিচ্ছা দেখা যায়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ও ১৯৪৮ সালে দুটি চুক্তির দ্বারা স্টার্লিং দেনা পরিশোধের পদ্ধতি স্থির হয়। প্রথম চুক্তিতে স্থির হয় যে, কিস্তিতে এই দেনা শোধ করা হবে। এজন্য ব্যাংক অব ইংলণ্ডের নিকট ১নং ও ২নং হিসাব নামে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুটি হিসাব খোলা হয়। প্রথমটি চলতি হিসাব। তাতে স্টার্লিং পাওনার মধ্যে ৬২ কোটি পাউণ্ড জমা করা হয় এবং স্থির হয় যে তখন থেকে চলতি বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্ত এতে জমা হবে এবং ঐ হিসাব থেকে ভারত প্রয়োজনমত টাকা তুলবে। আর দ্বিতীয় হিসাবে বাদবাকি স্টার্লিং পাওনা জমা করা হয়। স্টার্লিং পাওনার এই অংশ অবি-লম্বে তোলা যাবে না বলে স্থির হয়। দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা ১৯৫১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৪ বৎসরে ১৬ কোটি পাউণ্ড তোলার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫১ সালের জুন মাসে পুনরায় একটি চুক্তি দ্বারা ১৯৫৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২নং হিসাব থেকে ১নং হিসাবে ৩৫ কোটি পাউণ্ড স্থানা-ন্তরিত করার ব্যবস্থা হয়। এও স্থির হয় যে, ১৯৫৭ সালের জুন মাসের পর ২নং হিসাবের বকেয়া অর্থ ১নং হিসেবে স্থানান্তরিত হবে।

স্টার্লিং পাওনা থেকে পাকিস্তানের প্রাপ্য, ব্রিটিশ কর্ম-চারীদের পেনসন, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত সাজ-সরঞ্জামের মূল্য প্রভৃতি বাদে, ভারত সরকারের প্রাপ্য অংশ দাঁড়ায় প্রায় ১,০১০ কোটি টাকা। তা থেকে টাকা তোলার ফলে স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ কমে প্রথম পরি-কল্পনার গোড়ায় দাঁড়ায় ৮৮৪ কোটি টাকা। প্রথম পরি-কল্পনার ব্যয়ের দরুন, পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭১৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি ও প্রচুর পুঁজিদ্রব্য আমদানি ও লেনদেনের ঘাটতির ফলে মুদ্রাসংকটের দরুন, স্টার্লিং পাওনা তোলা হতে থাকে। ফলে ১৯৬১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১৩৫ কোটি টাকায় পরিণত হয়। বর্তমানে এর অংশবিশেষ কাগজের টাকার অন্যতম জামিনে পরিণত হয়েছে। এভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দুই দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অবসান ঘটেছে।

১৪.২. বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা
The Present Currency System

১৯৪৬ সালের ১লা মার্চ ভারত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সদস্য হবার ফলে ভারতের মুদ্রামানে একটি পরিবর্তন ঘটে। এর দ্বারা টাকার সাথে স্টার্লিংয়ের দীর্ঘ-কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভারত স্বাধীন হবার পূর্বেই ঐ তারিখ থেকে ভারতীয় মুদ্রা আইনের দৃষ্টিতে একটি স্বাধীন মুদ্রায় পরিণত হয়। ভারতের বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এই :

১. কাগজের মুদ্রাব্যবস্থা : ১ টাকার কাগজের নোট ও ১ টাকার ধাতুমুদ্রাকে দেশের আইনসঙ্গত মুদ্রা ও মানমুদ্রা বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান ভারতীয় মুদ্রা-মানকে কাগজের মুদ্রামানব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয়।

২. অন্যান্য দেশের মুদ্রায় বিনিময়যোগ্যতা : আন্ত-র্জাতিক মুদ্রা তহবিলের উদ্দেশ্য তার সদস্য দেশগুলির পরস্পরের মুদ্রার অবাধ বিনিময় প্রবর্তন করা। তবে, যতদিন পর্যন্ত এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, ততদিন সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে তার সদস্যদেশগুলি নিজেদের মুদ্রারবৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তদনুযায়ী ভারতের মুদ্রাও অন্যান্য সদস্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্যতা লাভ করেছে। এজন্যই স্টার্লিংয়ের কঠিন বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় বৈদেশিক বিনিময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

৩. কাগজের (নোট) মুদ্রা : দেশের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে কাগজের টাকার পরিমাণই বেশি। বর্তমানে ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০ ও ১০০ টাকা দামের নোট প্রচলিত

হয়েছে। এদের মধ্যে ১ টাকার কাগজের নোট ভারত সরকারের অর্থদপ্তর প্রচার করে। অন্যান্য নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচার করে। ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ১ টাকার মুদ্রাব ও খুচরা মুদ্রার প্রচলিত মোট পরিমাণ ছিল ৭৩১ কোটি টাকা। প্রচলিত নোটের মোট পরিমাণ ছিল ২১,৭৩৩ কোটি টাকা।

৪. **কাগজের মুদ্রার জন্য জমার পদ্ধতি:** ভারতের বর্তমানে কাগজের টাকার জমার পদ্ধতি পরিবর্তনের ঘটেছে। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা ভারতে আনুপাতিক জমা তহবিল পদ্ধতি পর্বার্তত হয়েছে। এতে নিয়ম ছিল যে, মোট প্রচলিত নোটের ৬০ শতাংশ ভারত সরকারের ঋণপত্র, হুন্ডি ও রৌপ্যমুদ্রায় জমা রাখতে হবে। বাকি ৪০ শতাংশ জমা রাখতে হবে স্বর্ণ ও স্টার্লিং পাওনা বা ঋণপত্রে। তার মধ্যে স্বর্ণের মূল্য ৪০ কোটি টাকার কম হবে না। ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের সদস্য হবার ফলে নোটের জামিন হিসাবে অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা গ্রহণযোগ্য নয়। তদনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদেশী মুদ্রা সংকটের দরুন ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করে কাগজের নোটের আনুপাতিক জমা পদ্ধতির পরিবর্তে ন্যূনতম জমা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় ও নোটের জামিন হিসাবে ১১৫ কোটি টাকার সোনা ও ৪০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার ন্যূনতম জমা রাখার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনী দ্বারা বিদেশী মুদ্রার জমার পরিমাণ ৮৫ কোটি টাকা করা হয়। অর্থাৎ সোনা ও বিদেশী মুদ্রায় মোট ২০০ কোটি টাকা (১১৫ কোটি টাকা + ৮৫ কোটি টাকা) জামিন রাখার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১১৫ কোটি টাকার সোনা জমা রাখতে গিয়ে নতুন করে সোনা কিনতে হয়নি। আগের জমা তহবিলে যে সোনা ছিল সেটাই তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাজার দরে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সমান বলে নির্ধারিত হয়েছে। জামিনের বাকি অংশটা রাখতে হয় 'রুপী সিকিউরিটি' বা ভারতীয় টাকার দাবিপত্রে। এ সংশোধনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী সুবিধামত মুদ্রা-প্রচলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। কারণ, প্রচলিত নোটের পরিমাণ যাই হোক না কেন এ পদ্ধতিতে জমার পরিমাণ বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। এতে ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার সম্প্রসারণশীলতা বেড়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় ইচ্ছামত পত্রমুদ্রা প্রচলনের সুবিধা হল বলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বেড়েছে, অনেকে এরূপ সমালোচনা করেছেন।

৫. **দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা:** বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এটা দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা। আগে ১৯০৬ সালের মুদ্রাঙ্কন আইন অনুসারে ভারতে ১ টাকার মুদ্রার নিচে ৮ আনা, ৪ আনা, ২ আনা, ১ আনা, ২ পয়সা, ১ পয়সা, ১ পাই প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এ সবই হল প্রতীক মুদ্রা (token money) অর্থাৎ এদের লিখিত মূল্য অপেক্ষা ধাতু মূল্য কম। ১৯৫৭ সালে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা ঐ সকল প্রতীক মুদ্রার পরিবর্তে টাকাকে ১০০ ভাগে ভাগ করে তার এক একটি অংশকে এক পয়সা নাম দেওয়া হয়েছে। এবং পুরাতন স্বল্প মূল্যের প্রতীক মুদ্রার স্থলে ১ প., ২ প, ৩ প. ৫ প., ১০ প, ২০ প, ২৫ প. ও ৫০ পয়সার নতুন প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তিত হয়েছে। এতে মুদ্রাব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে ও হিসাবকার্যের সুবিধা হয়েছে।

৬ **টাকার বৈদেশিক মূল্য:** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার ফলে ভাণ্ডারের নিয়ম অনুযায়ী ভারতকে টাকার ডলার মূল্য অথবা স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করতে হয়েছিল। তখন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় টাকা একটি স্বাধীন মুদ্রায় পরিণত হলেও পাউন্ডস্টার্লিংয়ের সাথে তার নির্দিষ্ট বিনিময় হারের বন্ধনটি অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার সোনার সরকারী দর তুলে দেয় এবং তার গঠনতন্ত্র থেকে সোনা সম্পর্কে সমস্ত উল্লেখ বাদ দিয়ে দেয়। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্যদেশগুলির আর কোনো ঘোষিত এবং নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য বা ডলার-মূল্য থাকল না। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার পাউন্ডের নির্দিষ্ট সরকারী বিনিময় হার বাতিল করে দিয়ে বাজারের অবস্থার উপর পাউন্ডের বিনিময় হার ছেড়ে দেয়। তখনও পাউন্ডের সাথে ভারতীয় টাকার আগের নির্দিষ্ট বিনিময় হার অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাউন্ডের বৈদেশিক বিনিময় হার ক্রমাগত কমতে থাকায় ভারত সরকার ১৯৭৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পাউন্ডের সাথে টাকার সুদীর্ঘকালের নির্দিষ্ট বিনিময় হারের বন্ধনটি ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। ফলে এখন ভারত সরকার সরকারীভাবে একই সঙ্গে মার্কিন ডলারে, ব্রিটিশ পাউন্ডে, পশ্চিম জার্মান মার্কে ও জাপানী ইয়েন-এ টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেছে।

১৪৩. পরিকল্পনা ও টাকার যোগান
Planning and Money Supply

১. সরকারী কাগজের নোট ও খুচরো মুদ্রা অর্থাৎ এককথায় 'কারেন্সী' (বা সরকারী টাকা বা নগদ টাকা) এবং ব্যাঙ্কের আমানত জমা (বা 'ব্যাঙ্কমানি' বা 'ব্যাঙ্ক

ক্রেডিট' বা 'ডিপোজিট মানি') ও স্থির আমানত এই তিনে মিলে হয় টাকার মোট যোগান। টাকার এই মোট যোগান নিয়েই দেশের কাজ কারবার, উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। এই সব কারণে দেশে টাকার প্রয়োজন বাড়লে টাকার যোগানও বাড়ানো দরকার হয়। সুতরাং, সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে দেশে টাকার যোগান বেড়ে যেতে থাকে। তা না হলে বিপত্তি ঘটে। কিন্তু দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় যদি টাকার যোগান বেশি বেড়ে যায় তাহলেও বিপদ ঘটে। দেশে তখন দামস্ফীতি ঘটে গিয়ে মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িয়ে দেয় ও অনেক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে।

২. ১৯৫০-৫১ সালে যখন প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয় তখন দেশে টাকার মোট যোগান ছিল ২,০২০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে তা দাঁড়ায় ২,৮৭০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রথম দশকে টাকার যোগান বাড়ে ৪২ শতাংশ বা প্রতি বৎসর ৪.২ শতাংশ করে। ১৯৭০-৭১ সালে টাকার যোগান দাঁড়ায় ১০,৯৭৮ কোটি টাকা। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে তা দাঁড়ায় ১,৩৭,৩০০ কোটি টাকায়।

৩. টাকার যোগানের এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধির একটা বড় অংশ পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের কাজে লেগেছে এবং ঘটেছে ঘাটতি ব্যয়ের মধ্য দিয়ে। এটাই হল পরিকল্পনা-কালে টাকার যোগান বৃদ্ধির অবাঞ্ছিত দিক। ফলে তা অনিবার্যভাবেই দেশের মধ্যে দামস্ফীতির প্রবল চাপ সৃষ্টির ও মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রধান কারণে পরিণত হয়েছে।

৪. প্রথম পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয় হয়েছিল ৩৩০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হয়েছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় তা দাঁড়ায় ১,১৩০ কোটি টাকায় এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে দাঁড়ায় ১,৯৬০ কোটি টাকায়। পঞ্চম পরিকল্পনায় দাঁড়ায় ৪,১৭২ কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় হয়েছে ১৫,৯১০ কোটি টাকা। সপ্তম পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই ১৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

৫. এর ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাইকারী মূল্যস্তর বাড়ে ৩৮ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনা-চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে তা বাড়ে ৮১ শতাংশ। পাইকারী মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা ১৯৬১-৬২-তে ১০০ থেকে ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে ৩৩১-এ ওঠে। মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। ১৯৭০-৭১-এর মূল্যস্তরকে ১০০ ধরে, সূচক সংখ্যা ১৯৭৯-র অক্টোবরে ২৫০-তে ওঠে। ১৯৮৭-তে হয়েছে ৩৮০। সুতরাং টাকার মোট যোগান যাতে অতীতের মতো ঘাটতি ব্যয় মারফত দ্রুত না বাড়ে সেজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। সরকারী নীতি এই লক্ষ্যেই পরিচালিত হওয়া দরকার।

১৪.৪. অর্থনীতিক উন্নয়ন ও মূল্যস্থিতি
Economic Growth and Price Stabilization

১. স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু হবার সাথে সাথেই বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ হতে আরম্ভ করে। প্রধানত সরকারী ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিনিয়োগের দায়িত্ব বহন করে। তার সাথে অবশ্য বেসরকারী ক্ষেত্রও পরিকল্পিত উন্নয়নের কার্যসূচির মধ্যে নানাদিকে সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। বিনিয়োগের জন্য অর্থ যদি দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে সংগ্রহ করা যেত তা হলে বিশেষ কোনো সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু, স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয় খুবই কম। তাই সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগের প্রয়োজনে একদিকে যেমন নতুন অর্থ প্রচুর পরিমাণে সৃটি করতে হয় তেমনি ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণে ঋণ সৃষ্টিরও প্রয়োজন দেখা দেয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার আয়তন যদি বড় হয়, নগদ অর্থ ও ঋণ সৃষ্টির পরিমাণও বিশাল হতে বাধ্য। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে (অর্থাৎ নতুন অর্থ সৃষ্টি করে) সরকার তার পরিকল্পনার প্রয়োজন মেটায়। আর ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতে ঋণ সৃষ্টি করে চলে। এদিকে ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে নতুন অর্থ সৃষ্টি হয় তার একটা অংশ ব্যাংকে জমা পড়লে ব্যাংকের মোট মজুদের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই মজুদের পরিমাণ যত বেশি হবে, সাধারণভাবে ব্যাংকগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও তত বেশি হবে। এতে দেশের মোট অর্থের (অর্থাৎ নগদ ও ঋণ) পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে। এরই ফলে সমাজে মানুষের মোট আয়ও বেড়ে যাবে। এ হল একটা দিক। অন্যদিকে পরিকল্পনার প্রকল্পগুলি ফলপ্রসূ হতে (অর্থাৎ তাদের নতুন উৎপাদন বাজারে আনতে) যদি সুদীর্ঘ সময় লেগে যায় (long gestation period) তাহলে জনসাধারণের বিপুল আয় সীমিত দ্রব্যসামগ্রীর উপরই ব্যয় হবে। মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হবে। আর পরিকল্পনায় প্রকল্পগুলি স্বল্পকালের মধ্যে ফলপ্রসূ হলে (short gestation period) স্বল্পকালের মধ্যেই উৎপাদন বাড়তে থাকবে, মূল্যস্তরের উপর বর্ধিত আয় প্রবল চাপ দিতে পারবে না, মূল্যবৃদ্ধি মোটামুটিভাবে প্রতিহত হবে।

২. এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে

মুদ্রাস্ফীতিই হল কঠিন সমস্যা। মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকলে সঞ্চয় কমে যায়, উৎপাদনশীল বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। ফাটকা কারবারে অর্থ নিয়োগের প্রবণতা বাড়ে। এভাবে বিনিয়োগের ধাঁচে এক ধরনের বিকৃতি আসে। জনসাধারণের ভোগের পরিমাণ কমে যায়, জীবনযাত্রার মানও খুব নিচু হয়ে যায়। সমাজে আয় বৈষম্য বাড়ে। এ অবস্থা কোনো রকমে কাম্য হতে পারে না। তাই স্বল্পোন্নত দেশের সমস্যা হয়, কিভাবে মূল্যস্তরে স্থিতি রক্ষা করে উন্নয়ন করা যায়। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থা কঠোরভাবে অবলম্বন করতে হয়। এক কথায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে সাহায্য করার জন্য একদিকে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে দেশের ব্যাংকগুলি যাতে বিপুল পরিমাণ ঋণ সৃষ্টি করে মূল্যস্তরের বিপর্যয় না ঘটায় তার জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করবে। একেই বলা হয় নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ (controlled expansion)-এর আর্থিক নীতি। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল থেকে এ নীতি অনুসরণ করছে।

১৪৫. ভারতে টাকার বাজার
Money Market in India

১. **টাকার বাজার কাকে বলে ঃ** কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বদাই স্বল্পমেয়াদের ঋণের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আছে যারা স্বল্পমেয়াদে ঋণ দিয়ে উপার্জন করতে ইচ্ছুক। স্বল্পমেয়াদী ঋণের এই আদান-প্রদান নিয়ে দেশের টাকার বাজার গঠিত। সুতরাং **টাকার বাজার বলতে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আদান-প্রদান বোঝায়।** স্বল্পমেয়াদী ঋণগ্রহণকারীরা এই বাজারে চাহিদার দিক। স্বল্পমেয়াদী ঋণদাতারা এর যোগানদার। সাধারণ কৃষক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এর চাহিদার দিক ও ব্যাংকগুলি এর যোগানদার। দেশে উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় যতই বাড়ে ততই স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন বাড়ে। সুতরাং ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে টাকার বাজারের সম্প্রসারণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

২. **ভারতের টাকার বাজারের সদস্যরা ঃ** ভারতের টাকার বাজারের সদস্যরা দুই ধরনের, যথা—ঋণের যোগানদার ও ঋণের চাহিদাকারী।

ঋণের যোগানদারদের মধ্যে রয়েছে—ভারতীয় যৌথ-মূলধনী ব্যাংকগুলি, বিদেশী (বা বিনিময়) ব্যাংকগুলি, রিজার্ভ ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, সমবায় ও জমি উন্নয়ন ব্যাংকগুলি, পোস্ট অফিস, সেভিংস ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং দেশীয় ব্যাংকাররা। ভারতীয় ব্যাংকসমূহ, বিদেশী ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়।

ঋণের চাহিদার দিকে রয়েছে,—বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ট্রেজারী বিলের কারবারী, শেয়ার ও অন্যান্য লগ্নিপত্রের কারবারী প্রভৃতি।

ভারতের টাকার বাজারে দেশী ও বিদেশী ব্যাংকগুলি একাধারে ঋণের যোগানদার ও চাহিদাকারী। স্টেট ব্যাংকের ভূমিকা প্রধানত যোগানদারের। এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণ ছাড়াও বর্তমানে কৃষি, গ্রামীণ ও শিল্পঋণদান কার্যে অংশ নিচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাছে শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসাবে। টাকার বাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে ঋণ দেয় তা নিয়ন্ত্রণের ভার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর রয়েছে। দেশী ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংক নিয়ে ভারতের আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গঠিত।

৩. **টাকার বাজারের লগ্নিপত্র ঃ** টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আদান-প্রদান কতকগুলি দলিলের ভিত্তিতে হয়। এদের ঋণের বাহক বলা হয়। ভারতে এই প্রকার দলিল হল—ট্রেজারী বিল, স্বল্পমেয়াদী সরকারী ঋণপত্র, বেসরকারী কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র এবং মেয়াদী কৃষিবিল।

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) ভারতের টাকার বাজার এতদিন দু-ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল বাণিজ্যিক ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংক প্রভৃতি নিয়ে গঠিত আধুনিক টাকার বাজার। অপরটি ছিল দেশীয় সাহুকার, পোদ্দার প্রভৃতি নিয়ে গঠিত ভারতের প্রাচীন টাকার বাজার। এদের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। এজন্য ভারতের টাকার বাজারটি সুসংগঠিত ছিল না। (২) কিন্তু, গত ৩০ বছর ধরে নানারূপ বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে টাকার বাজারটির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং আধুনিক টাকার বাজারটি প্রসারিত হয়েছে। সমগ্র টাকার বাজারটি এর অধীনে এসেছে এবং প্রাচীন টাকার বাজারটি এখন অবলুপ্তির পথে। (৩) ভারতের টাকার বাজার কোনো একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত নয়। বোম্বাই ও কলিকাতা, ভারতের দুই বৃহৎ টাকার বাজার। এদের মধ্যে বোম্বাই প্রধান। তাছাড়া আবার কতকগুলি আঞ্চলিক টাকার বাজার রয়েছে। ভারতের মত বৃহৎ দেশে যোগাযোগ ও অর্থ স্থানান্তরের সন্তোষজনক ব্যবস্থার অভাবে টাকার বাজার বিকেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। (৪) এতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুদের হারের তারতম্য ছিল। বর্তমানে

যোগাযোগ ও অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় সুদের হারের আঞ্চলিক পার্থক্য অনেকটা কমেছে। (৫) রিজার্ভ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলেও এর বয়স অল্প বলে অন্যান্য দেশের মত টাকার বাজারের সব অংশে এর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমানে এই অবস্থা দূর হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক এখন টাকার বাজারের একচ্ছত্র নেতা। (৬) ভারতে বিদেশী ব্যাংকের প্রভাব ছিল টাকার বাজারের অপর একটি দুর্বলতা। এটি এখন দূর হয়েছে। (৭) আগে টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার অভাব ছিল, এখন তা অনেকটা দূর হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মত এখানে বিল বাজারের 'ইস্যু হাউস', 'ডিসকাউণ্ট হাউস' প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ছিল না। বর্তমানে সরকারের উদ্যোগে নতুন নতুন সংস্থা স্থাপন ও বিধিব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা এই অভাব দূর করা হয়েছে। (৮) টাকার বাজারের বেচাকেনার জন্য বিল বা উপযুক্ত দলিলের বা লগ্নিপত্রের অভাব ছিল। বর্তমানে বিল ও অন্যান্য লগ্নিপত্র ব্যবহারে উৎসাহ দিয়ে সরকার এই অভাব দূর করেছে।

১৪.৬. ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
Features of the Indian Banking System

সব স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতেও আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত ও উন্নত ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকে ব্যাংক ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও এটা অগ্রসর দেশগুলির অনেক পিছনে রয়েছে।

১. ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার বিস্তৃতি এখনও সীমাবদ্ধ : ১৯৮৬ সালে ভারতে মাথাপিছু ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ছিল ১,১৮০ টাকা এবং গড়ে ১৭,৫০০ জন ব্যক্তির জন্য একটি করে ব্যাংক অফিস ছিল। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ৭,০০০ জন, ইংলণ্ডে ৪,০০০ জন ও জাপানে ১৫,০০০ ব্যক্তি পিছু একটি করে ব্যাংক অফিস আছে। ভারতে মোট ব্যাংক-আমানত বর্তমানে জাতীয় আয়ের ১৮ শতাংশ। তুলনায় জাপানের মোট ব্যাংক-আমানত হল জাতীয় আয়ের ২৪ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬ শতাংশ ও কানাডাতে ৫৯ শতাংশ।

২. ব্যাংক কার্যালয়গুলি দেশের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয় : তামিল নাড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও মহীশূরে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা অনেক বেশি, অন্যত্র কম। আবার অধিকাংশ ব্যাংক অফিসই রাজ্যের রাজধানী ও বড় শহরগুলিতে অবস্থিত। এই ত্রুটি দূর করার জন্য বর্তমানে সারা দেশে ব্যাংকের শাখা অফিস স্থাপিত হচ্ছে।

৩. ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের শাখার বিস্তার ঘটেছে : এদেশে ব্যাংক ব্যবস্থায় যে প্রসার ঘটেছে তা প্রধানত ব্যাংকের শাখা কার্যালয়ের বৃদ্ধির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের সংখ্যা তুলনায় অল্প। ১৯৬৯ সালে ভারতে ব্যাংকগুলির শাখা কার্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮,৩২০, ১৯৮৬ সালের জুন মাসে হয়েছে ৫৩,২৭০। অন্যদিকে, তপসিল-বহির্ভূত ব্যাংকের সংখ্যা ১৯৬০ সালে ছিল ২৫৬, তা ১৯৮৬ সালে কমে গিয়ে হয়েছে মাত্র ৪।

৪. ভারতে ব্যাংকগুলির মোট আমানত ক্রমাগত বাড়ছে : ১৯৬৯ সালের জুন মাসে তপসিলভুক্ত ব্যাংকগুলির মোট আমানত ছিল ৪,৬৪৬ কোটি টাকা। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে তা বেড়ে ১১৮,০৫০ কোটি টাকা হয়েছে।

৫. রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ১৯৪৭ সালে 'রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয়করণ আইন' দ্বারা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই জাতীয়করণ আধুনিক কালের ব্যাংক জগতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৬. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক : ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ভারতের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের ও ভারতের কতিপয় ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যের ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাংক স্থাপিত হয়। এর ফলে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকজগতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। ১৯৭০ সালে ভারতের সর্ববৃহৎ ১৪টি দেশীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও পরে আরও ৬টি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করে ব্যাংকজগতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রটি বর্তমানে সম্প্রসারিত হয়েছে ও সর্ববৃহৎ ব্যাংক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

৭. ব্যাংকগুলির উপর ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ : ১৯৪৯ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইন ও পরবর্তীকালে উক্ত আইনের বিভিন্ন সংশোধন দ্বারা এবং রিজার্ভ ব্যাংক আইনের ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এতে রিজার্ভ ব্যাংক মারফত ব্যাংকজগতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। তা ছাড়া, ব্যাংক ব্যবসায়ের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন সংশোধন করে ১৯৬৮ সালে একটি ব্যাংক সংশোধন আইন পাস করা হয়েছে। ১৯৭০ সালে ১৪টি ও পরে আরও ৬টি সর্ববৃহৎ ভারতীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে ব্যাংকজগতে রাষ্ট্রের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে।

৮. রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকে ঋণের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে : পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রসার ও ঘাটতি-মুদ্রানীতির ফলে দেশে ঋণের ও মুদ্রার স্ফীতি

হচ্ছে। ব্যাংকঋণের পরিমাণ যাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ব্যাংকরেট বৃদ্ধি, উপদেশ দান ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নানাপ্রকার পদ্ধতির সাহায্যে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকঋণ নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে।

৯. **বিলবাজার কর্মসূচী:** ভারতে ব্যাংকঋণের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অনুকরণে একটি বিলবাজার স্থাপন করে। ১৯৭০ সালে একটি নতুন বিলবাজার স্কীম চালু করা হয়েছে। তাতে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়তার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ প্রতি বৎসর বাড়ছে।

১০. **বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ঋণ নিচ্ছে:** সাম্প্রতিক কালে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে ক্রমবর্ধমান ঋণের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট অধিক পরিমাণে ঋণগ্রহণ করেছে। তাতে রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অন্যান্য ব্যাংকগুলির নির্ভরতা বাড়ছে।

১১ **বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বেশি পরিমাণে ঋণ দিচ্ছে:** পরিকল্পনাকালে দেশে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক কার্যাবলী, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে একদিকে ব্যাংকের নিকট মোট আমানত যেমন বাড়ছে তেমনি অপরদিকে ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে তপসিলভুক্ত ব্যাংকগুলি ঋণ দিয়েছিল মোট ৩,৫৯৯ কোটি টাকা। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে তা বেড়ে ৭০,৫৪০ কোটি টাকা হয়।

১২. **বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কর্তৃক শিল্পে ঋণদানে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ:** সম্প্রতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে ঋণদান কার্যে অংশগ্রহণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, পরিবহণ, খুচরা ও ছোট ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির মানুষ ও শিক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি অবহেলিত ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণদান বাড়ছে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে এই সব ক্ষেত্রে তপসিলভুক্ত ব্যাংকগুলির ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৪০·৯ কোটি টাকা। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১১,৩২১ কোটি টাকা।

১৩. **আমানত বীমা করপোরেশন:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তে ভারতে ব্যাংকগুলির আমানতের বীমা করার জন্য সম্প্রতি ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী আমানত বীমা করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে ব্যাংক ব্যবস্থা ফেল পড়লেও প্রধানত ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আমানত নিরাপদ হয়েছে। এতে ব্যাংক ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়েছে ও তার ভিত্তি মজবুত হয়েছে।

১৪.৭. ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি
Defects of the Indian Banking System

১. ভারতে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা অল্পকাল হল গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর মধ্যেই বারবার তা সংকটে পড়েছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাংক-সংকটের মধ্যে ১৯১৩-১৫ সালের সংকট ১৯২২-২৩ সালের সংকট ও ১৯৪৭-৫১ সালের সংকট প্রধান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের সংকটে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে ১৮৬টি ব্যাংক ফেল পড়ে। এই ব্যাংক-সংকটে প্রধানত ক্ষুদ্র আমানতকারীরাই অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ব্যাংক-সংকটগুলি ভারতের ব্যাংকব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতার পরিচয়। ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে ছিল এই—

(১) ব্যাংকগুলির পুঁজি ও সম্বলের স্বল্পতা। (২) তাদের সঞ্চয় তহবিলের স্বল্পতা। (৩) শেয়ার ও লগ্নিপত্রে ফাট্‌কা লগ্নি। (৪) ডিরেক্টারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার ও লগ্নিপত্রে বেশি লগ্নি এবং শেয়ার বাজারে ক্রয়বিক্রয়ের দর উল্লিখিত হয় না এরূপ শেয়ার ও লগ্নিপত্রে লগ্নি। (৫) সরকারী ঋণপত্রে লগ্নির স্বল্পতা। (৬) সামান্য সম্পত্তি। (৭) মোট সম্বলের অনুপাতে অত্যধিক ঋণদান। (৮) বিনা জামিনে ঋণদান। (৯) স্থাবর সম্পত্তির জামিনে ঋণদান। (১০) অল্প কয়েকজন ঋণগ্রহণকারীকে অত্যধিক পরিমাণে ঋণদান। (১১) ডিরেক্টারবর্গ, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অধিক ঋণদান। (১২) সুশিক্ষিত কর্মীর অভাব ইত্যাদি।

এই সকল ত্রুটি দূর করে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ১৯৪৯ সালে ভারতের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাস করা হয়। ঐ আইনে ব্যাংকগুলির উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ ও এদের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইনের সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা আরও বাড়ানো হয়েছে।

২. **প্রতিকার:** এই সকল ত্রুটি দূর করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে: (১) রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক দোষী ব্যাংকগুলি সম্পর্কে প্রথম থেকেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। (২) ১৯৪৯ সালের ব্যাংক আইনের বারবার সংশোধনের পরিবর্তে নতুন করে একটি সামগ্রিক ব্যাংক আইন প্রণয়ন করা দরকার। (৩) ব্যাংককর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। (৪) দেশী-বিদেশী সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি বিতর্কমূলক হলেও ইন্দি-

রিয়াল ব্যাঙ্ক ও ১৪টি বৃহৎ ভারতীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়-করণ দ্বারা এ নীতি আংশিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির দোষত্রুটি সংশোধনে অনেকটা সফল হয়েছে। কিন্তু তার আরও তৎপরতা বৃদ্ধির প্রয়োজন।

১৪৮. ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার
Reforms of the Banking System

১. ভারতের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতি ও কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন ও ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার শক্তি-বৃদ্ধি দ্বারা দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন কার্যে উপযুক্ত সহায়তার জন্য, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে ১৯৪৯ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য **ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইন নামে একটি আইন** প্রথম প্রণীত হয়।

২. পরবর্তীকালে এই আইনটি নানাভাবে সংশোধিত হয়েছে। বর্তমানে এই আইনটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইন (Banking Regulating Act) নামে পরিচিত। এই আইনে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম আর্থিক সম্বল নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য ব্যাঙ্ক গজিয়ে উঠতে না পারে। ব্যাঙ্কগুলি সম্পত্তির তারল্য (liquidity) বজায় রাখার জন্য এ আইনে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠী যাতে ব্যাঙ্কগুলিকে নিজের কুক্ষিগত করে ফেলতে না পারে তার জন্য এ আইনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ আছে। ফাট্‌কা ব্যবসা ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কার-বারের সাথে কোনোও ব্যাঙ্ক যাতে জড়িত হতে না পারে সেজন্য এই আইনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইনে আরো বলা হয়েছে, একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ একাধিক ব্যাঙ্কের পরিচালক হতে পারবে না ও পরি-চালকরা তাদের স্বার্থজড়িত কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারবে না। আইনে আরো বলা হয়েছে তপসিলভুক্ত বা তপসিল-বহির্ভূত সমস্ত ব্যাঙ্ককেই চলতি ও স্থায়ী আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে।

৩. ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা হল: (১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় ব্যাঙ্কের বিদেশী শাখা এবং তাদের অধীনে বিদেশী ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র বই খাতা ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারবে; (২) নিয়মিতভাবে বা মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কগুলিকে বিবিধ বিষয়ে বিবরণ ও তথ্য পেশ করার নির্দেশ দিতে পারবে; (৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের গুণগত ও বিচার-মূলক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাসম্পন্ন হবে; (৪) ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ডিরেক্টার, জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, অপসারণ ও বেতনাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে; (৫) তপসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক-গুলির পরিচালক পর্ষদের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে পারবে; (৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শর্তাধীনে কোনো ব্যাঙ্ক কোম্পানিকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালানোর জন্য অনুমতিপত্র দিতে পারবে; (৭) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যাঙ্ক তার সম্পত্তির কোনোরূপ সাময়িক দায়বন্ধ (ফ্লোটিং চার্জ) করতে পারবে না; (৮) ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তাদের ঋণদান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের বিশেষ ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়েছে (১৯৬২ সালের সংশোধনী); (৯) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সব অবস্থায় কোনো ব্যাঙ্কের কারবার গুটানোর উদ্যোগ নিতে পারে তা নির্দেশ করা হয়েছে এবং ঐচ্ছিকভাবে কারবার গুটানো সম্পর্কে যে সব বিধিনিষেধ আছে তা সমস্ত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে (১৯৫৯ সালের সংশোধনী)।

৪. এই আইনটির উদ্দেশ্য দুটি: (১) আমানত-কারীদের স্বার্থরক্ষা এবং (২) যে সব প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক না হয়েও ব্যাঙ্কের মতই আমানত গ্রহণ করছে (স্থির বা মেয়াদী আমানত) এবং কতকটা ব্যাঙ্কের মতই কাজ কারবার চালাচ্ছে তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা। এরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় এদের হাতেও আমানতকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং এদের কাজকর্মের দ্বারা সুদের হার প্রভাবিত হচ্ছিল। অতএব ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে এদেরও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৪৯. অ-ব্যাঙ্ক সংস্থাগুলির আমানত নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব
Importance of Regulating the Deposits of Non-Banking Institutions

১. ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান, ভাড়া-ক্রয় কারবারে অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান, দালান বাড়ি নির্মাণকারী সোসাইটি ইত্যাদি সংস্থাগুলি ব্যাঙ্ক না হলেও ব্যাঙ্কের মত নানা মেয়াদের আমানত গ্রহণ করছে এবং কতকটা ব্যাঙ্কের মত কাজ কারবার চালাচ্ছে। দিনের পর দিন জনসাধারণের কাছ থেকে এদের আমানত গ্রহণের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে এদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের

গুরুত্ব ও প্রয়োজনও বেড়ে চলেছে। এ কারণে ১৯৬৩ সালের ব্যাংক নিয়মাবলী (বিবিধ বিষয়) আইনটি সংশোধন করে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম এদের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়। এদের মোট আমানত কতটা হয়েছে এবং কি পরিমাণে বাড়ছে তা থেকেই এদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে। ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ এদের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮৬ কোটি টাকা। তা বেড়ে ১৯৮৪ সালের ৩১শে মার্চ ৯১৬ কোটি টাকা হয়।

২. **১৯৬৩ সালের ব্যাঙ্কিং নিয়মাবলী (বিবিধ বিষয়) আইন দ্বারা দেশের ব্যাংক ও ব্যাংকের মত আমানতগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের** উপরে রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। এর দ্বারা ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনের এবং ১৯৪৯ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশোধন করা হয়েছে।

১৪.১০. ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক
The Reserve Bank of India

১. **গঠন:** ১৯৩৪ সালে প্রণীত রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুযায়ী ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ৫ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হয়। এর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ২২০,০০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করে। বাকী সমস্ত শেয়ার বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট বিক্রয় করা হয়। এভাবে মূলত বেসরকারী শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর জাতীয়করণ হয়। ভূতপূর্ব শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভারত সরকার এর সমস্ত শেয়ার কিনে নেয়। তিনটি কারণে এর জাতীয়করণ ঘটে—(১) এর অধিকাংশ শেয়ার মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হস্তগত হয়ে পড়েছিল। ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। (২) জাতীয়করণের ফলে সরকারের অর্থনৈতিক ও অর্থসংক্রান্ত নীতির অধিকতর সমন্বয় সম্ভব হবে। (৩) ভারতের পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর যে অতিরিক্ত দায়িত্ব পড়বে, তা যথাযোগ্যভাবে পালনের জন্য জাতীয়করণ অত্যাবশ্যক।

২. **ব্যবস্থাপনা:** একটি কেন্দ্রীয় এবং চারটি স্থানীয় বোর্ডের উপর এর ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় বোর্ডের সদস্য ১৫ জন। এদের সকলে সরকার কর্তৃক মনোনীত। এদের একজন গভর্নর এবং তিনজন ডেপুটি গভর্নর। এদের প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ডের পাঁচজন সদস্য। এরাও সরকার কর্তৃক মনোনীত।

৩. **উদ্দেশ্য:** রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল: (১) দেশে একটি সুস্থ ও সবল বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (২) পরিমাণগত, গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নীতিগুলি কার্যকর সংযোজনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (৩) গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (৪) শিল্পে ঋণদানের ব্যবস্থা করা; এবং (৫) ভারতীয় টাকার বাজারকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা।

৪. **কার্যাবলী:** ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংক নিম্নলিখিত কাজ করে:

(১) **নোট প্রচলন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী** হিসাবে এ ব্যাংক নোট প্রচার করে। এর জন্য নোট প্রচার দপ্তর নামে এর একটি পৃথক দপ্তর আছে। ১৯৫৭ সালের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী আইন অনুযায়ী বর্তমানে ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাকার বিদেশী পাওনা, মোট ২০০ কোটি টাকার ন্যূনতম জমার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

(২) **কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যাংক** রূপে কাজ করে। সরকারের আয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ এর নিকট জমা থাকে। সরকারের হয়ে এ ব্যাংক ঐ অর্থ ব্যয় করে ও সরকারী ঋণ পরিশোধ করে। প্রয়োজন মত সরকারকে ঋণ দেয়। সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে সরকারী ঋণ সংগ্রহ করে।

(৩) **রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ব্যাংকার** হিসাবে তাদের আমানতের নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ অনুসারে ব্যাংকগুলি তাদের চলতি আমানতের ৫·২০ শতাংশ ও স্থায়ী আমানতের ২·৮ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখে। তার পরিবর্তে এরা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে নানাভাবে ঋণ নেবার সুবিধা পায়। আপৎকালে রিজার্ভ ব্যাংক তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

(৪) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে ঋণ দেয় রিজার্ভ ব্যাংক তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকরেট, খোলাবাজারী কারবারী, জমার অনুপাত পরিবর্তন, উপদেশ এবং গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রভৃতি অনুসরণ করে। এর উদ্দেশ্য টাকার অভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখা।

(৫) রিজার্ভ ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সহযোগিতায় টাকার বিনিময় হার বজায় রাখে। টাকার বিনিময় মূল্য স্থির রাখার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক বিদেশী মুদ্রার সাথে টাকার বিনিময় হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় [illegible]।

(৬) রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য [illegible]

কাজ করে। এর মারফত সহজেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে দেনাপাওনা নিষ্পত্তি হতে পারে।

(৭) কৃষিঋণের বিশেষ ভার এর উপর প্রথম থেকেই ন্যস্ত হয়েছিল। এজন্য এর একটি কৃষি দপ্তর আছে। এর মারফত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয়। সম্প্রতি, সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার পরামর্শে এর অধীনে কৃষিঋণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিরীকরণ—এই দু'টি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের জন্যও ব্যাঙ্ক ঋণদান করেছে।

(৮) সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদে ঋণদানের জন্য নানারূপ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছে।

(৯) এছাড়া মাসিক বুলেটিন, বাৎসরিক রিপোর্ট, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমীক্ষা পরিচালনা, অর্থনীতিক গবেষণা প্রভৃতির মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-নীতিক তথ্য দেশবাসী ও সরকারের নিকট উপস্থিত করে বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করছে ও সরকারী নীতি নির্ধারণে সাহায্য করছে।

(১০) পরিশেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিশেষের নিকট থেকে বিনা সুদে আমানত গ্রহণ ও ভিন্ন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের নিকট আমানতী হিসাব খুলে এবং তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকে।

৫ **ক্ষমতা:** ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইন ও তার সংশোধনী এবং ১৯৫৬ ও ১৯৬৩ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনী এবং ১৯৬৮ সালের ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইন দ্বারা সম্প্রতি ব্যাঙ্ক জগতের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য অনুমতি দান ও অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারে। (২) ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী তদারক ও তাদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে পারে। (৩) তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র এবং বিবরণ তলব করতে পারে। (৪) তাদের ঋণদান নীতি স্থির করতে পারে। (৫) জমার অনুপাত পরিবর্তন করতে পারে। (৬) ব্যাঙ্করেট হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে। (৭) ঋণের জামিনের 'মার্জিন' নির্ধারণ ও পরিবর্তন করতে পারে। (৮) গুণগত বিচারকমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ করে কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হবে বা হবে না, বা কতটা দেওয়া হবে তা স্থির করতে পারে। (৯) অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করতে পারে। (১০) কোনো ব্যাঙ্ক কারবার গোটানোর আবেদন করলে তাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন আবশ্যক হয়। (১১) ব্যাঙ্কসমূহের একীকরণের প্রস্তাব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হয় না। (১২) ব্যাঙ্কগুলির শাখা স্থাপন, কার্যালয়ের স্থান পরিবর্তন, প্রয়োজনীয় পুঁজি প্রভৃতি বিষয়েও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি আবশ্যক হয়। (১৩) ব্যাঙ্ক নয় এমন বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও তদুপরি প্রদত্ত সুদের হার, তাদের হিসাবপত্র দাখিল করা এবং রেজিস্ট্রীভুক্ত হওয়া সম্পর্কে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। এগুলি হল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা।

১৪.১১. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের মূল্যায়ন Working of the Reserve Bank: An Evaluation

১ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। এর বিভিন্ন কার্যকলাপ বিচার করলে নিম্নোক্ত সাফল্য ও ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়—

২. **সাফল্য:** (১) ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা ক'রে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ও নামমাত্র ব্যয়ে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ক'রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমিয়েছে (৭.৮% থেকে ৩.৪%), সুদের হারের অত্যধিক ওঠানামা বন্ধ করেছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদের হারের মধ্যে মোটামুটি সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। (২) সরকারী ঋণ পরিচালনার দক্ষতা দেখিয়েছে। (৩) ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী ও নীতি নিয়ন্ত্রণ ক'রে ও ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির বহু ত্রুটি দূর ক'রে ব্যাঙ্ক-ফেলের প্রকোপ কমিয়েছে ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে অধিকতর সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী করেছে। (৪) ব্যাঙ্ক-গুলির কার্যাবলী ও ব্যাঙ্কঋণ নিয়ন্ত্রণ ক'রে ভারতের টাকার বাজারে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। (৫) নানা-প্রকার পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে। (৬) কৃষিঋণ প্রসারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। (৭) সম্প্রতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদে ঋণদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত নানাপ্রকার সংস্থা ও কর্মসূচিতে উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ করে দেশে শিল্পঋণের কাঠামো সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। (৮) টাকার বিনিময় মূল্য বজায় রাখতে বিদেশী লেনদেন সংক্রান্ত কাজকর্ম দক্ষতার সাথে সম্পাদন করছে। (৯) ভারতে বিলবাজার স্থাপন করে ঋণব্যবস্থাকে স্থিতিস্থাপক করে তুলেছে। (১০) উন্নয়নমূলক অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাতে সফল হয়েছে। (১১) দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ করে ব্যাঙ্কিং ও

অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জনসাধারণ ও সরকারকে ওয়াকিবহাল করেছে। সুতরাং এ সকল কাজে সাফল্যের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংক তার সার্থকতা প্রমাণ করেছে।

৩. **ব্যর্থতা :** (১) রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের পুরাতন দেশীয় ব্যাংকারদের নিজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এনে আধুনিক ও প্রাচীন—এই দুই প্রকার ব্যাংক ব্যবসায়ের সমন্বয় ও সংহতি ঘটাতে পারে নি। (২) ১৯৫১ সালের আগে রিজার্ভ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখায় নি। (৩) ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপনের পর ভারতে বহু ব্যাংক ফেল পড়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক তখন তা বন্ধ করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়নি। বরং সে সময় রক্ষণশীল মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়েছে। এতে ব্যাংক-সংকট তখন আরও তীব্র হয়েছিল। (৪) প্রথম থেকেই রিজার্ভ ব্যাংক কৃষিঋণদানে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও ১৯৫১-৫২ সালের সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সে সময় পর্যন্ত সমবায় সমিতি মারফত প্রদত্ত রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষিঋণ কৃষকদের মোট প্রয়োজনের ৩ শতাংশ মাত্র ছিল। (৫) ১৯৪৯ সাল থেকে ব্যাংকিং কোম্পানি আইনের ও তার বিভিন্ন সংশোধনী দ্বারা ব্যাংকগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ব্যাংক ত্রুটিমূলকভাবে ঋণদান করেছে। রিজার্ভ ব্যাংক সে সকল অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারেনি। (৬) ঋণনিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে নানাবিধ ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্তর স্থির রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। (৭) ভারতে অবস্থিত বিদেশী ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনলেও ভারতের ব্যাংক ব্যবসায়ে তাদের প্রভাব খর্ব করতে পারেনি। (৮) ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার হিসাবে ওদের আপৎকালীন প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহে রিজার্ভ ব্যাংক অতীতে অনিচ্ছা দেখিয়ে অনেক ব্যাংকের সর্বনাশের কারণ হয়েছে।

৪. **মন্তব্য :** তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, রিজার্ভ ব্যাংকের ত্রুটিগুলি অধিকাংশই পরিকল্পনার আগের যুগের। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকসমূহের উন্নয়নের ও সকল প্রকার ঋণের সম্প্রসারণের সহায়তামূলক মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এতে অতীতের ত্রুটি দূর হয়েছে। বর্তমানে এর উদ্যোগ ও সাফল্য ভারতে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ও ব্যাংক কার্যাবলীর মান যথেষ্ট উন্নত করেছে।

১৪.১২. রিজার্ভ ব্যাংক এবং ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি সমূহ
The Rerserve Bank and Its Credit Control Policies & Methods

১. স্বল্পমেয়াদী ঋণের অভাবে যাতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ না হয়, অথবা অত্যধিক ঋণের ফলে যাতে অযথা মূল্যস্তর না বাড়ে, সেজন্য ব্যাংকঋণের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু অতীতে রিজার্ভ ব্যাংক নানা কারণে একাজে বিশেষ সফল হয়নি।

২. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ ও ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানি আইনের পর থেকে ধীরে ধীরে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ও রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়েছে। তার ফলে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে, বিশেষত পরিকল্পনার বিগত দশকে ভারতে ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে।

৩. **রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য** বর্তমানে যে সকল অস্ত্র রয়েছে ও ব্যবহৃত **হচ্ছে তা হল**— (১) ব্যাংকরেট পদ্ধতি। (২) খোলাবাজারী কারবার। (৩) জমার অনুপাতের পরিবর্তন। (৪) অনুরোধ। (৫) বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। (৬) বিলবাজার কর্মসূচিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কর্তৃক গৃহীত ঋণের সীমা নির্দিষ্টকরণ। সুতরাং বলা যায়, অন্যান্য আধুনিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সকল পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, রিজার্ভ ব্যাংকও সে সব পদ্ধতির সাহায্যে ভারতের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. **রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি ও লক্ষ্য :** পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা যাতে লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বৃদ্ধি ঘটে সেজন্য দেশের টাকার যোগানও পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হয়। ব্যাংক ঋণের প্রসারে সহায়তা করতে হয়। তেমনি আবার ঋণের যোগান বৃদ্ধি যাতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না করে সেজন্যও সতর্ক হতে হয়। সে কারণে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতির মূল লক্ষ্য হল : (১) দেশে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ; (২) কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ঋণের পরিমাণগত, গুণগত ও বিচারমূলক নীতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা ; এবং (৩) ভারতের টাকার বাজারের উন্নতি ঘটান।

এই নীতি অনুসারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদাতা ও তাদের ঋণের নিয়ন্ত্রণকারীরূপে রিজার্ভ ব্যাংক যে সব অস্ত্র বিশেষভাবে ব্যবহার করছে তা হল ব্যাংকরেট, পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত এবং বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

৫. **ব্যাংকরেট নীতি :** প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক ব্যাংকঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কমানো-বাড়ানো

জন্য দেশের টাকার বাজার বা ঋণ পরিস্থিতি এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংকরেট হল একটি সুপরিচিত অস্ত্র।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্যিক বিল বাট্টা করে তাকে বলে ব্যাংকরেট। তা বাড়লে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বাট্টার হারে এবং অন্যান্য ঋণের সুদের হারও বাড়ে, ব্যাংকঋণের দাম বেড়ে যায় ও ঋণপ্রার্থীরা নিরুৎসাহিত হয়। ফলে ঋণের যোগানে টান ধরে। তাতে মজুতদার ও ফাটকাবাজরা বেশি পরিমাণে ব্যাংকঋণ নিয়ে দ্রব্যসামগ্রী কিনে বেশি মুনাফার আশায় সেগুলিকে মজুত করতে পারে না। এভাবে ব্যাংকরেট নীতি মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী অস্ত্র হিসাবে কাজ করে।

তবে ব্যাংকরেট বাড়লে তার ফলে ব্যাংক বীমা কোম্পানি ও অন্যান্য লগ্নিকারী সংস্থাগুলির লগ্নি করা সম্পত্তির মূল্য কমে যায় ও তার ফলে তাদের লোকসান হয়। কিন্তু স্যামুয়েলসন প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে, এই সব লগ্নিকারীরা যদি হিসাব করে স্বল্পমেয়াদী লগ্নিপত্রে তাদের অধিকাংশ টাকা লগ্নি করে, তাহলে তারা সে লোকসান সহজে এড়াতে পারে। সে লগ্নির টাকা অল্পদিনের মধ্যে ফিরে এলে তা চড়া সুদে নতুন লগ্নিপত্রে খাটিয়ে সহজেই তারা আয় বাড়াতে পারে এবং লোকসান পুষিয়ে নিতে পারে। অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মত রিজার্ভ ব্যাংকও এই প্রাচীন অস্ত্রটি ঘন ঘন ব্যবহার করছে। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একটানা ১৬ বৎসর এই অস্ত্রটি ফেলে রেখে অল্প সুদে পর্যাপ্ত ঋণদানের নীতি ('চীপ মানি পলিসি') অনুসরণের পর ১৯৫১ সালে (নভেম্বর মাসে) দেশে মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী ব্যবস্থারূপে রিজার্ভ ব্যাংক এ অস্ত্র প্রয়োগ করে এবং ব্যাংকরেট ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩·৫ শতাংশ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে) ঋণের প্রয়োজন মেটাতে বিল মার্কেট কর্মসূচি চালু করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একদিকে পরিকল্পনার উচ্চ বিনিয়োগ লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে অন্যদিকে সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিচার করে রিজার্ভ ব্যাংক 'ঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ' (Controlled expansion of credit) নীতি গ্রহণ করে। এ কারণে বিপুল ঘাটতি ব্যয় ও বিপুল কর-বৃদ্ধির দরুন সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতির-বিরুদ্ধে ব্যবস্থারূপে ১৯৫৭ সালে (মে মাসে) ব্যাংকরেট বাড়িয়ে ৩·৫ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ করে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৬৩ সালে ব্যাংকরেট ৪ শতাংশ থেকে ৪·৫ শতাংশ করে। ১৯৬৪ সালে ব্যাংকরেট ৪·৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ করা হয়। তারপর **'ঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ' নীতির পরিবর্তে ব্যাংক 'চড়া সুদে ঋণের নীতি'** (dear money policy) **গ্রহণ করে।** ১৯৬৫ সালে (ফেব্রুয়ারী) ব্যাংকরেট ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করে। কিন্তু ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে মন্দা দেখা দেওয়ায় ঋণের যোগান বাড়াতে **মন্দাবিরোধী আর্থিকনীতি গ্রহণ করে রিজার্ভ ব্যাংক** ১৯৬৮ (মার্চ) সালে ব্যাংকরেট ৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করে। এর সাথে সাথে মন্দাবিরোধী ফিসক্যাল ব্যবস্থারূপে বাজেটে কর কমানো প্রভৃতি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তারপর ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে আর্থিক সম্প্রসারণ ও মূল্যস্তর বৃদ্ধির কাল আবার নতুন করে শুরু হয়। মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে রিজার্ভ ব্যাংকও আবার ঋণ সংকোচনের এবং চড়া সুদের হারের নীতিতে ফিরে যায়।

ব্যাংকরেট ৫% থেকে বাড়িয়ে ১৯৭১ সালে ৬%, ১৯৭৩ সালে ৭% এবং ১৯৭৪ সালে ৯% করা হয়। এরই সাথে ব্যাংকঋণ মঞ্জুরির সর্বোচ্চ মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়, সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট ও ফিক্সড্ ডিপোজিটের সুদের হার, ব্যাংকঋণের সুদের হার বাড়ান হয় এবং অন্যান্য বাধানিষেধ ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮১ সালে ব্যাংকরেট ১০% করা হয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি দমনের কাজে ব্যাংকরেট নীতি খুব একটা সফল হতে পারেনি। তার একটি কারণ হল এই সময়ে সরকারী অনুৎপাদনশীল ব্যয় কমেনি এবং কঠোর আর্থিক শৃংখলা বলবৎ করা যায়নি। আরেকটি কারণ হল কালো টাকা। মজুতদার ও ফাটকাবাজরা চড়া সুদে ব্যাংকঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হলেও এবং তাদের হাতে সহজে যাতে ব্যাংকঋণ না যায় সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও কালো টাকার সাহায্যে তারা কিন্তু কারবার চালিয়েছে। ব্যাংকরেট নীতি কালো টাকাকে শায়েস্তা করতে পারে নি।

৬. **পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত:** ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইন সংশোধন করে পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত প্রবর্তিত হয়। এতে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে প্রত্যেক তফসিলভুক্ত ব্যাংকের মেয়াদী আমানতের কমপক্ষে ২ শতাংশ ও সর্বাধিক ৮ শতাংশ এবং চলতি আমানতের কমপক্ষে ৫ শতাংশ ও সর্বাধিক ২০ শতাংশ জমা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং এই সীমার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে ঐ দুই প্রকার আমানতের জমার হার পরিবর্তন করার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংককে দেওয়া হয়েছে। এটাই পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত পদ্ধতি এবং ঋণনিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। এর সাথে যে কোনো

নির্দিষ্ট তারিখে ব্যাঙ্কের মোট আমানতের অতিরিক্ত আমানতের যে কোনো অংশ বা তার সবটুকু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখার নির্দেশ দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই অতিরিক্ত আমানত জমার পরিমাণ ব্যাঙ্কের মোট আমানতের মেয়াদী ও চলতি আমানতের যথাক্রমে ৮ শতাংশ ও ২০ শতাংশের বেশি হবে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে ঋণের অতিরিক্ত সম্প্রসারণ ও মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী ব্যবস্থা রূপে ১৯৬০ সালে (মার্চ) এই অস্ত্রটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে চলতি আমানতের ৫শতাংশ ও অতিরিক্ত আমানতের ২৫ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে বিধিবদ্ধ জমা হিসাবে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে অতিরিক্ত আমানতের ৫০ শতাংশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে টাকার বাজারে টান দেখা দিলে ঐ নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৬২ সালের সংশোধনী আইন পাসের পর থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে ব্যাংকগুলি তাদের মেয়াদী ও চলতি আমানতের ৩ শতাংশ জমা রাখে। ১৯৭৩ সালের ১লা জুন থেকে এ অনুপাত ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হয়।

৭. গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি : ভারতের মত বিকাশমান দেশে ব্যাংকঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুণগত বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর কারণ : (১) এইসব দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দেশে মোট আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন যেমন বাড়তে থাকে তেমনই টাকার যোগানও বাড়তে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির হার টাকাব যোগান বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম হয়। ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। এ সময় ব্যাংকরেট এবং খোলাবাজারী কারবারের অস্ত্র কিছুটা বিচারমূলকভাবে প্রয়োগ করেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নি। (২) এসব দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী বিনিয়োগ ব্যয় বেড়েই চলে। সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাংকঋণ সম্প্রসারণের প্রয়োজনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে কাঁচামাল, খাদ্যশস্য এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদার তুলনায় যোগানে স্বাভাবিকভাবেই টান পড়ে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা এবং উৎপাদকরা অতি মুনাফার লোভে মজুতদারী ও ফাটকাবাজী শুরু করে। তার ফলে মূল্যস্তর আরও বাড়ে এবং অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে অসঙ্গতি ও টানাটানির সৃষ্টি হয় এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিপন্ন করে।

এই পরিস্থিতিতে, উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কঋণের যোগান কম না করে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মজুতদারী ফাটকাবাজী বন্ধ করার জন্য, অবস্থানুযায়ী সঠিক অস্ত্রের ব্যবহার বিশেষ কার্যকর হতে পারে। ভারতের মত বিকাশমান দেশে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতির উপযোগিতা এইখানেই।

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণের গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক তা প্রথম প্রয়োগ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬ সালে) তখন থেকে আজ অবধি রিজার্ভ ব্যাংক এই পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

১৯৫৬ সালে ধান, চাল, ছোলা, ডাল এবং তুলা বস্ত্রের জামিনে ঋণদান সংকুচিত করার জন্য তফসিলভুক্ত এবং রাষ্ট্র-সংশিলষ্ট তফসিল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক এদেশে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের সূচনা করে।

১৯৬৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক 'ঋণের বিচারমূলক সম্প্রসারণ' নীতি ঘোষণা করে। এর ফলে বিচারমূলকভাবে বিশেষ বিশেষ ঋণের সম্প্রসারণের সাহায্য করা হতে থাকে।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে ঋণ নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা হয়। ১৯৭৪ সালে সে কঠোরতা আরও বাড়ানো হয়। কিন্তু তাতেও মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি রোধ করতে না পেরে অবশেষে ১৯৭৪ সালে সাধারণভাবে ঋণ সংকোচন নীতি অনুসরণ করা হয়। তবে উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির কাজে যাতে ঋণের যোগান কম না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

নির্দিষ্ট দলিলপত্রের জামিনে ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মার্জিন, কতকগুলি উদ্দেশ্যে ঋণের উপর ঊর্ধ্বসীমা প্রয়োগ এবং কয়েক ধরনের ঋণের উপর পার্থক্যমূলক সুদের হার —এই তিনটি উপায়ে বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ-নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

৮. মন্তব্য : (১) ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকঋণের যে গুণগত বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে তার দ্বারা মূলত ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যাংকঋণই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলি কলকারখানা ও শিল্প মালিকের কিংবা পণ্য চলাচলে সাহায্য করার জন্য কিংবা রপ্তানিকারীদের যে ঋণ দেয় সেসব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। শুধু, ১৯৬৩-৬৪ সালে গুদামরসিদের জামিনে ঋণের উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে, এখানে এখন পর্যন্ত গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সীমাবদ্ধভাবেই প্রয়োগ করা হচ্ছে বলা চলে। (২) গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের নানান পদ্ধতির মধ্যে ঋণের মার্জিন পরিবর্তন পদ্ধতির উপরই প্রধানত নির্ভর করা হচ্ছে। (৩) গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কঠোর থেকে কঠোরতর করা সত্ত্বেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর নানা কারণের মধ্যে উপরোক্ত কারণ দু'টি ছাড়াও আরেকটি কারণ হল, ব্যাংকগুলি সবসময় গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ মান্য করে চলেনি। বিশেষ করে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অনেক ব্যাংকই অতীতে লঙ্ঘন করেছে। (৪) কিন্তু এদেশে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পূর্ণ সফল না হওয়ার প্রধান কারণ হল, সাধারণভাবে সমগ্র ব্যাংকঋণের মোট পরিমাণটি যদি শাসনের মধ্যে রাখা না হয় তাহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। অতীতে যে এই পদ্ধতি অর্থনীতির স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক ক্ষেত্রগুলিকে চাপমুক্ত করতে পারেনি এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারেনি, এটাই হল তার মূল কারণ।

১৪.১৩. রিজার্ভ ব্যাংক ও টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ Reserve Bank and Control of Money Market

১. রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকরূপে ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে সকল ক্ষমতা থাকা উচিত সে সমস্ত ক্ষমতাই রিজার্ভ ব্যাংককে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভারতের টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাংক নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অবশ্য এর কতকগুলি কারণ ছিল: (১) রিজার্ভ ব্যাংক তখন সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাংকগুলির অধিকাংশই এর থেকে পুরাতন ও অভিজ্ঞ। সুতরাং তারা রিজার্ভ ব্যাংকের নেতৃত্ব পছন্দ করেনি। (২) ভারতের ব্যাংক জগতে তখন বিদেশী প্রাধান্যপূর্ণ ইম্পিরিয়াল ব্যাংকই ছিল সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংককে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত। (৩) তখন টাকার বাজার ছিল দ্বিধাবিভক্ত ও অসংগঠিত। তাই রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে টাকার বাজারে কর্তৃত্ব কায়েম করা সম্ভবপর হয়নি। (৪) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত নিজেদের হাতে বেশি নগদ টাকা রাখে ও প্রয়োজন হলে অধিকাংশ সময়ই একে অপরের নিকট থেকে ঋণ নেয়। এ কারণে তাদের রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয় না। (৫) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অধিকাংশই আকারে ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও স্বল্পসম্বলযুক্ত। (৬) সর্বোপরি, রিজার্ভ ব্যাংকের নীতিও ছিল রক্ষণশীল। (৭) টাকার বাজারে ঋণপত্রেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। বাণিজ্যিক বিল এখানে জনপ্রিয় হয়নি।

২ কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য ভারতের টাকার বাজারের একটি অংশ (যেমন সাহুকার, পোদ্দার প্রভৃতি দেশীয় ব্যাংকাররা) এখনও রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসেনি। তবে অপর অংশের অর্থাৎ আধুনিক সংগঠিত টাকার বাজারের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও তারই উদ্যোগে ভারতের আধুনিক সংগঠিত টাকার বাজারের বিস্তার ঘটেছে। এর কারণ হল:

(১) ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয়করণ হলে ব্যাংকব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংকের মারফত সরকারের হস্তক্ষেপ সূচিত হয়। ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়।

(২) ১৯৪৯ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন ও তৎপরবর্তী বহু সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতিপত্র দেওয়া থেকে আরম্ভ করে তাদের নীতি নির্ধারণ, কাজকর্মের তদারকি, কাগজপত্র পরীক্ষা, শাখা-স্থাপন, স্থান-পরিবর্তন, এমন কি একীকরণ ও কারবার গোটানো পর্যন্ত—সব কিছুতেই রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত হয়। এ আইনের পরবর্তী সংশোধনগুলির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা এদের অভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তার করা হয়েছে। ফলে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হয়েছে।

(৩) ১৯৫২ সালে বিলবাজার কর্মসূচি গ্রহণের পর থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের কাজে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির দেনার পরিমাণ বাড়ছে। দেশে বাণিজ্যিক ঋণের প্রসার ঘটছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের উপর বেশি পরিমাণে নির্ভর করছে।

(৪) ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের পুরাতন ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর (অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের) অন্তর্ধান ও তার সহায়ক প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ স্টেট ব্যাংকের) আবির্ভাব ঘটায় টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রভাব বেড়েছে।

(৫) ১৯৫১ সাল থেকে ব্যাংকরেটের ব্যবহারে ও ১৯৫৬ সাল থেকে বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ১৯৬০ সালে

থেকে অন্যান্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োগে ভারতের টাকার বাজার ও ব্যাংকগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

(৬) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে একটি স্থিতি-স্থাপক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করে রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের টাকার বাজার ও ব্যাংকঋণ সাফল্যের সাথে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৭) সব শেষে, ২০টি সর্ববৃহৎ ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণের ফলে ভারতের টাকার বাজার সরকার তথা রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলা যায়। অবশ্য এর ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের দায়িত্বও অনেক বেড়েছে।

৩ টাকার বাজার ও রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নীতি ঃ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে উৎপাদনের উপকরণগুলির দ্রুত ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। তার জন্য উৎপাদনের নানা ক্ষেত্রে টাকার যোগান বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা দরকার, অথচ এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং তা আবার দমন করা ও আয়ত্তের মধ্যে রাখার জন্য ঋণ ও টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কাল থেকে রিজার্ভ **ব্যাংক ব্যাংকঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ** (Controlled expansion of credit) নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে এই নীতিরই সামান্য রদবদল করে রিজার্ভ ব্যাংক যে নীতি গ্রহণ করে তার নাম দেওয়া হয় **ঋণের বিচারমূলক উদারীকরণ নীতি।** এই নীতিতে প্রতিরক্ষা, রপ্তানি, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি অর্থ-নীতির কতকগুলি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেখানে ঋণের উদার সরবরাহ এবং অগ্রাধিকার বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণ সংকোচন করা হতে থাকে। এই কাজে ঋণের গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি সাহায্য করছে। সম্প্রতি অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি দমনের প্রয়োজন থেকেই এই নীতির উদ্ভব হয়েছে। এই নীতি 'ক্রেডিট স্কুইজ' বা 'কঠোর ঋণ সংকোচন' নামে পরিচিত।

১৪.১৪. বিলবাজার কর্মসূচী
The Bill Market Scheme

'বিল' কথাটির দ্বারা বাণিজ্যিক বিল বা বাণিজ্যিক হুণ্ডি বোঝায়। ব্রিটেনে পণ্যসামগ্রীর বাকীতে বেচাকেনায় বিক্রেতা একটি কাগজে পণ্যের মূল্য বাবদ পাওনা টাকা ক্রেতা কবে দেবে তা লিখে ক্রেতাকে দিয়ে সই করিয়ে নেয়। তাতে উপযুক্ত স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিলে সেটা ঋণের স্বীকারোক্তি এবং প্রাপ্য টাকা পরিশোধের আইনসম্মত প্রতিশ্রুতি বলে গণ্য হয়। বিক্রেতা সেটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার কাছে উপস্থিত করে প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারে। কিংবা, এর আগেই টাকার প্রয়োজন হলে বিক্রেতা বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট বা বিলের কারবারীদের নিকট সেটা বিক্রয় করতে (একে বিল বাট্টা করা বলে) পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি এটা কিনে নিয়ে ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয়। পরে বাণিজ্যিক ব্যাংকে টাকার টান পড়লে ঐ বিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে পুনরায় বিক্রয় (অর্থাৎ পুনবাট্টা) করতে পারে। এভাবে বাণিজ্যিক বিল পুনবাট্টা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের মারফত ব্যবসায় জগৎকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ যোগান দেয়। পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডনের বিলবাজার সর্বাপেক্ষা উন্নত। এটা লণ্ডনের টাকার বাজারকে শক্তিশালী করেছে ও ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক অফ ইংলণ্ড'-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এরূপ বিল প্রচলিত ছিল না। এদেশে হুণ্ডি নামে যা প্রচলিত তা বাণিজ্যিক বিল থেকে ভিন্ন। বাণিজ্যিক বিল ও বিলের বাজারের অভাবে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংকগুলির ঋণদানে অসুবিধা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক-গুলিকেও বিলের মত ঋণপত্রের অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ দিতে পারেনি। ফলে ভারতের টাকার বাজার সীমাবদ্ধ ছিল। এই ত্রুটি দূর করার জন্য ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক একটি বিলবাজার স্কীম চালু করে।

বিলবাজার স্কীম ঃ ১. ১৯৫২ সালে প্রবর্তিত বিল-স্কীমে প্রথমে দশ কোটি টাকা বা তার বেশি আমানত জমাবিশিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে বিল বাট্টার সুবিধা দেওয়া হয়। বিল বাট্টার ব্যবস্থাটা ছিল এই রকম ঃ তারা খাতকদের কাছ থেকে যে সব 'চাহিবামাত্র প্রদেয় হুণ্ডি' নিয়ে তাদের ঋণ দিত, সেগুলির ভিত্তিতে সমপরিমাণ টাকার ৯০ দিনের মেয়াদী হুণ্ডি তৈরি করে ঐ দু'রকম হুণ্ডি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে জমা রেখে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিত। রিজার্ভ ব্যাংক বিল বাট্টা করার অভ্যাসে উৎসাহ দেবার জন্য এরকম ক্ষেত্রে ব্যাংকরেটের চেয়ে ½% কম সুদ নিত। 'চাহিবামাত্র প্রদেয় হুণ্ডি'কে এভাবে মেয়াদী হুণ্ডিতে পরিণত করার জন্য যে স্ট্যাম্প খরচ হত, প্রথম অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংক তার অর্ধেকও নিজে বহন করত।

আশানুরূপ ভাল ফল হওয়ায় ১৯৫৩ সালে মোট ৫ কোটি ও তার বেশি আমানত জমা সম্পন্ন তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলিকেও এই স্কীমের অধীনে আনা হয়। ১৯৫৪ সালে অন্যান্য তফসিলভুক্ত ব্যাংকও এই সুবিধা পায়। এই ব্যবস্থায় যে ন্যূনতম পরিমাণ টাকা কোনো ব্যাংক

রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ধার পেতে পারত এবং কোনো একটি বিল বাট্টা করে ন্যূনতম টাকা ঋণ পাওয়া যেত তার পরিমাণ যথাক্রমে ২৫ লক্ষ টাকা কমিয়ে ৫ লক্ষ টাকা ও ১ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। ফলে ছোট ছোট ব্যাংকগুলিও এই সুযোগ পায়।

কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর থেকে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেওয়ায় এবং ব্যাংকঋণ বাড়তে থাকায় রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ব্যাংকরেটের ½% কম হারে সুদ নিয়ে বিল বাট্টা করা বন্ধ করে দেয়। পরে নভেম্বর মাসে তা আরও ½% বাড়িয়ে দিয়ে বিল বাট্টার সুদের হার ৩½% করে। তাছাড়া স্ট্যাম্প ডিউটির যে অর্ধেক রিজার্ভ ব্যাংক বহন করত তাও তুলে দেয়। ১৯৫৭ সালে যখন ব্যাংকরেট বাড়িয়ে ৪% করা হয় তখন বিল বাট্টার হারও ৪% করা হয়।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রপ্তানি বিলগুলিকেও বিলবাজার স্কীমের সুবিধা দেওয়া শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে এই সুবিধাটাই আরও প্রসারিত করার জন্য 'এক্সপোর্ট বিল ক্রেডিট স্কীম' প্রবর্তন করা হয়।

কিন্তু বিলবাজার স্থাপনের এই স্কীমটি মরসুমের বাজার ঋণ সম্প্রসারণের যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তা কেবল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাও আবার ছিল আসলে তারা যে নগদ ঋণ ('ক্যাশ ক্রেডিট') দিত সে ঋণের পুনঃসংস্থানের উপায়মাত্র। তাই এই স্কীমটিকে মেকী বিলবাজার স্কীম বলে সমালোচনা করা হয়। শেষে ১৯৭০ সালে রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক হুণ্ডি ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং একটি উপযুক্ত বিল-বাজার সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য একটি স্টাডি টীম নিয়োগ করে। এই টীমের রিপোর্ট (১৯৭০ সাল) অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক বিলবাজারের একটি নতুন স্কীম চালু করে।

২. ১৯৭০ সালে বিলবাজারের যে নতুন স্কীম চালু হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য হল: ১. এই স্কীমে কয়েক ধরনের বাণিজ্যিক হুণ্ডিকে রিজার্ভ ব্যাংকের পুনর্বাট্টাযোগ্য করা হয়েছে। ২. এই পুনর্বাট্টাযোগ্য বিলগুলি পণ্যসামগ্রীর প্রকৃত লেনদেনের ভিত্তিতে সৃষ্ট খাঁটি বিল হওয়া চাই। ৩. তাতে লেনদেনের প্রকৃতিটির এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলের উল্লেখ থাকা চাই। ৪. রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে যখন যে বিল পুনর্বাট্টার জন্য দাখিল করা হবে সেই সময় তার মেয়াদ ১২০ দিনের বেশি থাকলে চলবে না। ৫. বিলে অন্তত দু'টি উত্তম পক্ষের সই থাকতে হবে। তার একটি হবে একটি লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সই। ৬. যাতে কম টাকার বিল বেশি সংখ্যায় পুনর্বাট্টার সুবিধা পায় সেজন্য যে কোনো একটি বিলের টাকার ন্যূনতম অংক ৫ হাজার টাকা করা হয় (১৯৭১ সালে এই শর্তটি তুলে দেওয়া হয়) এবং একসঙ্গে অন্তত ৫০ হাজার টাকার বিল রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে পুনর্বাট্টার জন্য দাখিল করতে হবে।

৩. ১৯৭১ সালে রিজার্ভ ব্যাংক এই নতুন বিলবাজার কর্মসূচিতে বিলের পুনর্বাট্টার পদ্ধতি অনেকটা সহজ ও সরল করে দিয়েছে। আগে কেবল বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ ও নয়া দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাংক বিল পুনর্বাট্টার সুবিধা দিত। এখন থেকে নিয়ম করা হয় হায়দারাবাদ, নাগপুর, পাটনা, কানপুর ও বাঙ্গালোরেও এই সুবিধা দেওয়া হবে। বিলের ন্যূনতম টাকার অংক যে ৫ হাজার টাকা ছিল তা তুলে দেওয়া হয়। আরও নিয়ম করা হয় যে, ২ লক্ষ টাকা বা তার কম অংকের বিল হলে তা পুনর্বাট্টার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে দাখিল করার প্রয়োজন হবে না। রিজার্ভ ব্যাংকের তরফে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তা নিজের কাছে রাখলেই চলবে।

৪. **মন্তব্য:** পুরানো বিলবাজার স্কীমটির তুলনায় নতুন বিলবাজার স্কীমটি যে ভাল তাতে দ্বিমত নেই। বিগত বৎসরগুলির চেষ্টায় রিজার্ভ ব্যাংক যে ধীরে ধীরে এদেশে একটি আধুনিক বিলবাজার প্রতিষ্ঠায় অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছে তা কম কথা নয়। তবে এটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে আরও খানিকটা সময় নেবে।

১৪.১৫. ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা
Role of the Reserve Bank of India in India's Economic Growth

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল দেশের ব্যাংকজগতের বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক; ব্যাংক সমাজ ও টাকার বাজারের একচ্ছত্র নেতা ও নিয়ন্ত্রণকারী; দেশে মুদ্রার যোগান ও তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিময় মূল্যের স্থিতিরক্ষাকারী; দেশের সরকারী টাকার একমাত্র যোগান-দার ও ব্যাংকঋণের উৎস এবং নিয়ন্ত্রণকারী। সুতরাং সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আর্থিক ও মুদ্রাজগতে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। এটা কিছু নতুন নয়। এ সকল কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আরও কিছু বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকরূপে রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে সমগ্র ব্যাংকজগতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ১৯৪৮ সাল থেকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। নোটের জন্য ন্যূনতম জমার পদ্ধতি

গৃহীত হওয়ায় প্রয়োজনমত টাকার যোগান বাড়াবার অগাধ ক্ষমতা তার হাতে এসেছে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের নানা রকমের অস্ত্র তার হাতে কেন্দ্রীভূত। এতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-জগৎ ও টাকার বাজারে একচ্ছত্র নিয়ন্তা হয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের চাকা চালু রাখছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী যে পরিমাণ টাকার যোগান দেশে থাকা উচিত বলে মনে করছে তাই যোগান দিচ্ছে। কিন্তু এই চিরাচরিত ক্ষেত্র ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও অনেক নতুন কর্মক্ষেত্রে বিশেষত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

২ কৃষিঋণ প্রথম থেকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কিন্তু পরিকল্পনাকালে পুরাতন কৃষিঋণ দপ্তরের কাজকর্ম প্রসার, সমবায় মারফত কৃষিঋণ বৃদ্ধি, গ্রামীণ ঋণ কাঠামোতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ এবং কৃষিঋণ পুনঃসংস্থান করপোরেশন স্থাপনে ও তার পরিচালনার প্রধান অংশগ্রহণ কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি প্রধান স্তম্ভে পরিণত করেছে। তেমনি ১৯৪৮ সাল থেকে ক্ষুদ্রায়তন, কুটির, মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্পের স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও পুঁজির সংস্থানের জন্য যে একের পর এক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে তাতেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাভাবে অংশগ্রহণ করে সবলের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তিরূপে কাজ করছে। বস্তুতপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে যার তুলনা কমই পাওয়া যায়। রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারে ঋণের সংস্থানের জন্যও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবদান কম নয়। এ সকল বহুবিধ ও বহুমুখী কর্তব্য সম্পাদনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য একা নয়। রাষ্ট্রাধীন স্টেট ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ২০টি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এ সকল কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহকর্মী আর ভারতের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে ঋণ-দানকারী সংস্থাগুলি তার সাথী। এদের সমন্বয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবল সংকীর্ণ ব্যাঙ্ক জগৎ ও টাকার বাজার নয়, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে সরকারের সর্বপ্রধান শক্তিশালী হাতিয়াররূপে কাজ করছে। এটা বেসরকারী ও সরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও বিকাশে সরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্গত সর্বপ্রধান সংস্থা এবং ভারতের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থনীতিক কর্ম প্রচেষ্টার চাবিকাঠি।

১৪.১৬. আমানত বীমা করপোরেশন
Deposit Insurance Corporation

১. কোনো ব্যাঙ্ক কারবার গুটালে তার দরুন আমানতকারীরা বিশেষত ছোট আমানতকারীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করে যাতে ব্যাঙ্কের উপর তাদের আস্থা বাড়ানো যায়, ব্যাঙ্কের উন্নতি ঘটে, এর ফলে জনসাধারণের ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস বাড়ে, যাতে দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্কের কার্যালয় স্থাপন করে দেশের সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করা যায়, এবং ব্যাঙ্ক-গুলি এভাবে শক্তিশালী হয়ে আরো বেশি করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়তা করতে পারে—এসব উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক আমানতের বীমাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২. **স্থাপনা**: ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী পার্লামেণ্টে পাস করা আইন অনুযায়ী আমানত বীমা করপোরেশন স্থাপিত হয়।

৩ **বৈশিষ্ট্য**: ১ **পুঁজি ও পরিচালনা**: এর অনুমোদিত পুঁজির পরিমাণ এক কোটি টাকা। এর সবটাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়েছে। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ করবার ক্ষমতা করপোরেশনকে দেওয়া হয়েছে। করপোরেশনের পরিচালনার ভার ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক সভার উপর ন্যস্ত রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এর চেয়ারম্যান।

৪. **কর্মসূচী**: (ক) ভারতের প্রতিটি ব্যাঙ্কই আমানত বীমা করপোরেশনে রেজিস্ট্রীভুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতের সব নতুন ব্যাঙ্কও করপোরেশনের আওতায় আসবে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও এর অধীনে আনা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রত্যেক আমানতকারীর ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত আমানত বীমা করা হয়েছে। করপোরেশন প্রয়োজন মনে করলে বীমাযোগ্য আমানতের সীমা বাড়াতে পারে।

(খ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আমানত, কোনো বিদেশী সরকারের আমানত ও ব্যাঙ্কিং কোম্পানির আমানত করপোরেশনের কাছে বীমা করা যাবে না।

(গ) প্রতি ১০০ টাকার আমানত বীমার জন্য বৎসরে ১৫ পয়সা পর্যন্ত প্রিমিয়াম আদায়ের ক্ষমতা করপোরেশন-কে দেওয়া হলেও বর্তমানে প্রতি ১০০ টাকার বীমার উপর বৎসরে ৫ পয়সা প্রিমিয়াম ধার্য হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি বৎসরে চারটি কিস্তিতে করপোরেশনকে প্রিমিয়াম জমা দেয়। সময় মত জমা না দিলে ব্যাঙ্কগুলির উপর অনধিক ৮% হারে করপোরেশন সুদ আদায় করে।

(ঘ) কোনো ব্যাঙ্কের উপর কারবার গোটানোর নির্দেশ জারি হলে বা তার প্রসমাপক (লিকুইডেটর) নিযুক্ত হলে অনধিক তিন মাসের মধ্যে তাকে ঐ ব্যাঙ্কের আমানত-কারীদের ও তাদের আমানতের পরিমাণের (তাদের কাছে ব্যাঙ্কের কোনো পাওনা থাকলে তা বাদে) একটি তালিকা আমানত বীমা করপোরেশনের কাছে পেশ করতে হয়।

এই তালিকা পেশের অনধিক দু'মাসের মধ্যে আমানত বীমা করপোরেশন আমানতকারীদের অনধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আমানতের টাকা ফেরত দেবে।

৫. **মন্তব্য ঃ** আমানত বীমা করপোরেশনের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। এবং ব্যাংকগুলির কার্যাবলী ত্রুটিমুক্ত ও আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতে এর প্রবর্তনের দ্বারা বর্তমানে প্রতি ৫ জন আমানতকারীর মধ্যে ৪ জনের আমানত ও মোট ব্যাংকে আমানতের ২৪ শতাংশ নিরাপদ করা হয়েছে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রে এটা কম কথা নয়।

১৪.১৭. স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া
State Bank of India

১. ১৯৫১-৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষিঋণ দপ্তরের উদ্যোগে ভারতের গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার অনুসন্ধান ও উন্নতির পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি, গ্রামীণ ঋণ কাঠামো পুনর্গঠনের অঙ্গ হিসাবে গ্রামাঞ্চলে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রসারের ভার নেবার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় একটি বড় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল। এজন্য ভারতের সর্ববৃহৎ ব্যাংক ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করতে বলা হয়। সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ করে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই স্টেট ব্যাংক স্থাপন করে। ২০ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি ও ৫.৬ কোটি টাকা আদায়ীকৃত পুঁজি নিয়ে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই থেকে স্টেট ব্যাংক কাজ আরম্ভ করে।

২. **কার্যাবলী ঃ** সংক্ষেপে, স্টেট ব্যাংকের কাজ হল ঃ (১) আমানত গ্রহণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে ঋণ দিয়ে ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কার্যধারা অক্ষুণ্ণ রাখা। (২) দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসারে সহায়তা করা। এজন্য ১৯৬০ সালের মধ্যে ব্যাংক নিজে গ্রামাঞ্চলে নতুন ৪০০টি শাখা স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করে। (৩) গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় সংগ্রহের চেষ্টা করা। (৪) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থ স্থানান্তরের জন্য অধিকতর সুবিধা দেওয়া। (৫) গ্রামাঞ্চলে ঋণব্যবস্থা সম্প্রসারণের শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে কাজ করা এবং এজন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি ও মজুদকরণ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য দেওয়া। (৬) ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৭) যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যালয় নেই সেখানে তার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা। সম্প্রতি স্টেট ব্যাংক; 'মারচেন্ট ব্যাংকিং' বিভাগ নামে একটি নতুন দপ্তর খুলেছে। এর কাজ হল নব স্থাপিত কোম্পানিগুলির শেয়ার বিক্রয় দায়গ্রহণ করা, তাদের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিদেশী মুদ্রায় ঋণ সংগ্রহ করে দেওয়া, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি।

৩. **কার্যকলাপ ও সাফল্যের বিবরণ ঃ** বর্তমানকাল পর্যন্ত ব্যাংকের কার্যকলাপ ও সাফল্যের আলোচনাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা—১. ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। ২. ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদান। ৩. কৃষি ঋণদান।

(১) **ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঃ** ১৯৫৫ সালের ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয়করণ আইনে স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াকে দেশে, বিশেষত গ্রামীণ ও আধাশহর এলাকায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত, বিগত ২৭ বৎসর ধরে স্টেট ব্যাংক এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথেই পালন করে চলেছে। ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাংকের মোট অফিসের সংখ্যা ছিল ৪৬৬ টি। ১৯৮৪ সালের ৩০শে জুন সে সংখ্যা বেড়ে মোট ৬,৪০০ হয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে স্টেট ব্যাংকের সহযোগী ব্যাংকগুলিও দেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিস্তারের কাজে অংশ নিতে আরম্ভ করে। এরাও এই কার্যক্রমে আজ অবধি ২,৬১৬টি শাখা খুলেছে। ১৯৮৬-এর ৩০শে জুন সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট ব্যাংকিং অফিসের সংখ্যা ছিল ৫৩,০৯০। তার মধ্যে স্টেট ব্যাংক ও তার সহযোগী ব্যাংকগুলির অফিসের মোট সংখ্যা ছিল ১০,৮১৭ বা প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। নতুন ব্যাংকিং অফিস বা শাখাগুলির ৪৮ শতাংশের বেশি গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকায় স্থাপিত হয়েছে।

স্টেট ব্যাংক ও তার অধীন ব্যাংকগুলি শাখা অফিস-গুলির মারফত গ্রামীণ, আধা-শহর ও শহর এলাকার মানুষের নানান অংশের এবং শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা ও বৃত্তির আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে।

(২) **ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদান ঃ** ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ঋণের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে স্টেট ব্যাংক ও তার অধীন ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে সমবায় ঋণদান সমিতি, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন প্রভৃতি সংস্থা কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে নয়টি বাছাই করা কেন্দ্রে যে 'পাইলট' স্কীম চালু করা হয়েছিল তার প্রাথমিক সাফল্যের পর অন্যান্য কেন্দ্রেও তা প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে স্টেট ব্যাংকের সমস্ত শাখাতে ঐ সংযোজিত ঋণ সংস্থানের স্কীমটি চালু করা হয়েছে। এর ফলে সাহায্যপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার সংখ্যা উল্লেখ-যোগ্যরূপে বেড়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিতে উদারভাবে ঋণদানের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (১) ঋণের জামিন সম্পর্কে উদার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার যে কোনো সময় বিক্রয়যোগ্য কাঁচামালসহ অনেক নতুন পণ্য জামিনরূপে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে। (২) ১৯৬৯ সালে ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা স্কীমটি উদার করা হয়েছে। একক মালিকানা সংস্থার ঋণের সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। একাধিক ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত সংস্থার ঋণের সীমা ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। (৩) গ্রামীণ শিল্প পরিকল্পের অধীন গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় নগদ ঋণের ('ক্লীন লোন') পরিমাণ অনধিক ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। (৪) ১৯৬০ সালে ২১টি বাছাই করা জেলায় পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রবর্তিত **ক্রেডিট গ্যারাণ্টি স্কীমটি** উদার করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী থেকে এটিকে স্থায়ী ও উদার করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ঋণগ্রহণকারী ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি ঋণ শোধে অপারগ হলে ঋণদান-কারী ব্যাংকগুলির যাতে কোনো লোকসান না হয় তার ব্যবস্থা করা। ভারত সরকার এই ঋণের জামিনদার হন এবং স্কীমটি রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। স্টেট ব্যাংকগোষ্ঠী ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদানের ব্যাপারে এই স্কীমটি পুরো সুযোগ নিচ্ছে। ফলে এখন স্টেট ব্যাংক-গোষ্ঠী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা-গুলিতে বেশি করে ঋণ দিতে উৎসাহিত হচ্ছে।

স্বল্পমেয়াদী ঋণ ছাড়াও স্টেট ব্যাংক গোষ্ঠী ক্ষুদ্র-শিল্প সংস্থাগুলিতে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য মাঝারি মেয়াদের ঋণ দিচ্ছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের শিল্প সংস্থাগুলিকে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ১৯৬২ সাল থেকে কিস্তিবন্দী শর্তেও ঋণ দিচ্ছে।

(৩) **কৃষি ঋণদান :** 'কৃষির অর্থসংস্থান' অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৪.১৮ ব্যাংক জাতীয়করণ আইন, ১৯৭০
Nationalisation of Banks Act, 1970

১. ১৯৭০ সালের ২৬শে মার্চ পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করে ভারত সরকার ৫০ কোটি টাকা অথবা ততোধিক আমানতবিশিষ্ট ১৪টি সর্ববৃহৎ ভারতীয় যৌথ মূলধনী বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করে। পরে আরো ৬টি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

২. **উদ্দেশ্য :** কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির কর্তৃত্বমূলক উচ্চ স্থানগুলি (কম্যানডিং হাইট্স অব দি ইকনমি) নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের ব্যাংকগুলির উপর 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' জারী করা হয় এবং তার ভার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পণ করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে এ ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলি কৃষি এবং কুটির শিল্প ও ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলিকে ক্রমশ বেশি করে ঋণ দেওয়ার পথ গ্রহণ করবে এবং দেশের বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই প্রধানত তাদের ঋণদান সীমাবদ্ধ রাখার নীতি ত্যাগ করবে। ফলে দেশে একচেটিয়া কারবারের বিস্তার কিছুটা কমবে এবং কৃষি ও শিল্পে নতুন উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবে এবং উদার ব্যাংক-ঋণের সাহায্যে অর্থনীতিক কার্যাবলীর বিস্তার ঘটবে। কিন্তু ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল দেখে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এটা উপরোক্ত উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণে ভারত সরকার ব্যাংক জাতীয়করণ আইন পাস করে।

৩. কিন্তু জাতীয়করণের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে এই ব্যাংক জাতীয়করণ আইনটির এই বলে সমালোচনা করেছেন : (১) ২০টি সর্ববৃহৎ একচেটিয়া মালিকানাধীন ব্যাংকের সাথে ভারতে অবস্থিত বিদেশী ব্যাংকগুলিরও জাতীয়করণ করা উচিত ছিল। বিদেশী ব্যাংকগুলিকে বাদ দেওয়ায় দেশের অর্থনীতি ও বিশেষত আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের উপর এদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে। এটা অবাঞ্ছিত। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বিদেশী ব্যাংকগুলির অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বেশি বলে এদের জাতীয়করণ করা হলে ভারত তা থেকে বঞ্চিত হত এবং ভারতস্থ বিদেশী ব্যাংক জাতীয়করণ করা হলে বিদেশস্থ ভারতীয় ব্যাংকগুলিকেও বিদেশীরা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারে। কিন্তু সরকারের এই যুক্তি দুর্বল।

(২) ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে (৮৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা) তা অত্যধিক। এই সকল ব্যাংকের মালিক বৃহৎ একচেটিয়া কারবারীগোষ্ঠী এই ১৪টি ব্যাংকে পুঁজি হিসাবে ২১ কোটি টাকা খাটাচ্ছিল। বর্তমানে তাদের নিয়োজিত পুঁজির প্রায় ৪ গুণ ক্ষতি-পূরণ দান করা হয়েছে। এটা অত্যধিক উদারতা।

৪. **মন্তব্য :** যাই হোক, সব দিক বিবেচনা করলে সরকারের এ ব্যবস্থাটি যে বাঞ্ছনীয় হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি কৃষি, কুটির শিল্প এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পে উদার হাতে ঋণ দিয়ে দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

১৪.১৯ ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি
Case for Nationalisation of Banks in India

ক. জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি : ১. ব্যাংক জাতীয়-

করণের ফলে ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্বল সরকারের হাতে আসবে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় আর্থিক সম্বলের অভাব ব্যাংক জাতীয়করণের দ্বারা অনেকাংশে দূর করা যাবে।

২. ব্যাংক শিল্পের মধ্যে একচেটিয়া মালিকানা ও কর্তৃত্বের ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছিল এবং তার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জাতীয় সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতার অবাঞ্ছিত কেন্দ্রীভবন ঘটছিল। ১৯৭০ সালে যে ১৪টি ভারতীয় সর্ববৃহৎ ব্যাংকের জাতীয়করণ করা হয় তাদের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল সমস্ত ভারতীয় ব্যাংকের মোট আমানতের ৭২ শতাংশ এবং তারা যে ঋণ দিত তা ছিল সমস্ত ভারতীয় ব্যাংকের দেওয়া ঋণেব ৬৫ শতাংশ। এই একচেটিয়া ক্ষমতা শিল্পক্ষেত্রের সুস্থ ও কল্যাণকর সম্প্রসারণের পথে, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে উঠেছিল।

৩. বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কারসাজির ফলে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার এক বিপুল অংশ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা ফাঁকি দিচ্ছিল। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে এই দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে।

৪ ব্যাংক জাতীয়করণের দ্বারা সমাজবিরোধী ফাটকা ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ বন্ধ হবে। ফাটকা কারবারীরা ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে দ্রব্যসামগ্রী মজুত করে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে প্রভূত পরিমাণে মুনাফা লাভ করে। উচ্চহারে সুদ পাবার লোভে ব্যাংক এই ঋণ দিত। একমাত্র জাতীয়করণের দ্বারাই ব্যাংকগুলির এরূপ কাজ বন্ধ করা সম্ভব।

৫. ব্যাংক জাতীয়করণের দ্বারা কর ফাঁকি দেওয়া কমান সম্ভব। কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য একই ব্যক্তি উপার্জিত অর্থ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যাংকে স্বনামে বা বেনামীতে আমানত রাখে। এতে সঠিক আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। ব্যাংক জাতীয়করণ হলে আইনের সাহায্যে এটা বন্ধ করা যাবে।

৬. জাতীয়করণের ফলে ব্যাংক বিপর্যয়ের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে দূর হবে। বিনিয়োগকারী জনসাধারণের মনে আস্থার সৃষ্টি হবে, জাতীয় সঞ্চয় বাড়বে, জনসাধারণের ব্যাংকের মারফতে কাজকারবারের অভ্যাস বাড়বে, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আসবে।

৭. ব্যাংক জাতীয়করণের মাধ্যমে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ফলপ্রসূ হবে। একথা সকলেরই জানা যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহযোগিতা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংকের কোনো নীতিই সাফল্য লাভ করতে পারে না। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যক্রম ও নীতি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিকমত পালন করত না। বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক বিশেষ কোনো সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ব্যাংক জাতীয়করণ এই অসুবিধা দূর করবে।

৮. ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে গিয়ে পক্ষপাতিত্ব করত। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ পেত না; নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত ঋণপ্রার্থীরাই বেশি ঋণ পেত। ব্যাংকের মালিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থপরতাই এর কারণ। জাতীয়করণের দ্বারা এই দুর্নীতি দূর হবে, প্রয়োজন এবং যোগ্যতা অনুসারে ঋণের বিতরণ ঘটবে ও ব্যাংকের সম্প্রসারণ ঘটবে।

৯. অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের ফলে ব্যাংক ব্যবসায় অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করেছে। ব্যাংকসমূহের আমানত, ঋণ, আগাম, বিনিয়োগ সব কিছুই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক বেশি হারে বেড়েছে। সরকারী বিনিয়োগ ও ব্যয়েব ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উপকৃত ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম। বেসরকারী ব্যাংক ব্যবসায়ের নবলব্ধ সম্বল ও ব্যাপক বিনিয়োগের ফলেই নানাবিধ অবাঞ্ছিত ফলাফলের উদ্ভব হয়েছে। এই কারণেই ব্যাংক শিল্পের জাতীয়করণ এত বেশি প্রয়োজন।

১০. এতকাল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের একচেটিয়া শিল্পপতিরাই দেশের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারীদের সম্বল কাজে লাগিয়েছে। ব্যাংক জাতীয়করণের মাধ্যমে এই সম্বল সরকারী ক্ষেত্রের এবং কৃষি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনে লাগান যাবে।

ভারত সরকারের বিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের লক্ষ্যকে সফল করার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানার ক্রমসম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। ব্যাংকশিল্পের জাতীয়করণ ঐ বিঘোষিত লক্ষ্যের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ এবং ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৪.২০. ব্যাংক জাতীয়করণের সাফল্য
Nationalisation of Banks: Achievements

(রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং ক্ষেত্রের অগ্রগতি: ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মুহূর্তে ১৪টি প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২,৬২৬ কোটি টাকা। এটা ছিল সে সময় দেশের মোট

ব্যাংক আমানতের ৫৬ শতাংশ। এই ১৪টি ব্যাংকের মোট অফিসের সংখ্যা ছিল তখন ৪,১৩৪টি। সেটা ছিল দেশের মোট ব্যাংক-অফিসের প্রায় ৫০ শতাংশ। তা ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাংক ও তার অধীন সংস্থাগুলির আমানতের মোট পরিমাণ তখন ছিল দেশের মোট ব্যাংক আমানতের প্রায় ২৭ শতাংশ এবং অফিসের সংখ্যা ছিল দেশের মোট ব্যাংক-অফিস সংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ।

১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ১৪টি প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংক ও তার অধীন সংস্থাসহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং ক্ষেত্রের মোট আমানত জমার পরিমাণ দাঁড়ায় দেশের মোট ব্যাংক-আমানতের প্রায় ৮৩ শতাংশ এবং এদের মোট ব্যাংক অফিসের সংখ্যা দাঁড়ায় দেশের মোট ব্যাংক অফিসের প্রায় ৮০ শতাংশ।

১ **ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ :** ১৯৬৯ সালে ১৪টি, পরে আরও ৬টি সবচেয়ে বড় ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণের পর সব দিক দিয়ে দেশে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সারা দেশে বিরাটভাবে, বিশেষত যে সব অঞ্চলে এ পর্যন্ত কোনো ব্যাংকের শাখা ছিল না বা থাকলেও খুব কমই ছিল সে সব অঞ্চলে ব্যাংক শাখার জাল বিস্তার। ফলে ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে ১৯৮৮ সালের জুন পর্যন্ত দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা অফিসের সংখ্যা ৮,২৬০ থেকে বেড়ে মোট ৫৫,৪১০ হয়েছে।

নব স্থাপিত শাখা অফিসের ৫৬ শতাংশ খোলা হয়েছে গ্রামীণ কেন্দ্রগুলিতে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে সারা দেশে ব্যাংকগুলির গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ছিল ১,৮৬০। এ সংখ্যা ১৯৮৮ সালের জুন মাসে ৩০,৮০০-তে পেঁছায়। এই বিপুল শাখা বিস্তারের পর এখন দেশে ব্যাংক-অফিস পিছু জনসংখ্যা ১২,০০০ হয়েছে।

২. **আমানত জমার বৃদ্ধি :** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি আমানত জমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ১৯৬৯ সালের জুন থেকে ১৯৮২-র ৮ই জানুয়ারীর মধ্যে তাদের মোট আমানত জমার পরিমাণ ৩,৮৯৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮৪,৭১৯ কোটি টাকা হয়েছে। আমানত বৃদ্ধির ২৫ শতাংশ ঘটেছে নতুন শাখাগুলিতে।

৩. **ব্যাংক ঋণের সম্প্রসারণ :** দেশের মোট ৭৪টি তফসিলভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে ২০টি ব্যাংক হল রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থাৎ ২০টি ব্যাংক নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ক্ষেত্রটি গঠিত। দেশের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার কাজ-কারবারে এদের অংশ হল ৮৫ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে ঋণ দিয়েছে তার পরিমাণ ১৯৬৯-এর জুন থেকে ১৯৮২-এর ৮ই জানুয়ারীর মধ্যে ৩,০৩৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫৫,৫০৬ কোটি টাকা হয়েছে।

৪ **লীড ব্যাংক স্কীম :** ১৪টি দেশীয় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণের পর ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে এই স্কীমটি প্রবর্তিত হয়। এই স্কীমে, ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং তিনটি বাছাই করা বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে, কলকাতা, বৃহত্তর বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, চণ্ডীগড়, গোয়া, দমন ও দিউ বাদে দেশের সমস্ত জেলাগুলিকে ভাগ করে প্রত্যেক ব্যাংককে তার নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক তার নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য ব্যাংক ও ঋণদানকারী সংস্থাগুলির নেতৃত্ব দেবে। নিজ নিজ নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে এই স্কীমের অধীন প্রত্যেক ব্যাংককে তার নির্দিষ্ট এলাকার জেলাগুলির একটি করে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা করার ভার দেওয়া হয়। তদনুসারে ৩৩৬টি জেলায় সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। এই সমীক্ষার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নে যে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে তা দূর করা সহজ হবে।

৫ **অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণ :** ১৪টি ব্যাংক জাতীয়করণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য অগ্রাধিকারযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের সম্প্রসারণ করা। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির অগ্রগতির হিসাবটি হল এই :

ক **কৃষি ঋণ :** ১৯৬৯ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং ক্ষেত্র থেকে মোট কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছিল ১৬২'৩৩ কোটি টাকা। ১৯৮৭-র জুন মাসে তার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১০,৬৭০ কোটি টাকা।

খ. **ক্ষুদ্রশিল্প ক্ষেত্রে ঋণ :** ১৯৬৯-এর জুন থেকে ১৯৮৭-র জুন মাসের মধ্যে ক্ষুদ্রশিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং ক্ষেত্রের ঋণের পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯,৩০০ কোটি টাকা হয়েছে। এর মধ্যে—**সড়ক ও জল পরিবহণ শিল্পে :** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ঋণের পরিমাণ ৫'৪৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯১৫ কোটি টাকা হয়েছে। খুচরা ব্যবসায়ীর ও ছোট কারবারে ঋণের পরিমাণ ১৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭৫৫ কোটি টাকা হয়েছে।

গ. **অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে :** পেশা ও বৃত্তিজীবী এবং স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের ঋণের পরিমাণ ৬'৯১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২১১ কোটি টাকা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ৮০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৩ কোটি টাকা হয়েছে।

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সবগুলি ক্ষেত্র মিলিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে দেওয়া ঋণের মোট পরিমাণ ৪৪০ কোটি টাকা থেকে ১০,২৪০ কোটি টাকা হয়েছে। এটি তাদের প্রদত্ত মোট ঋণের (২৬,২৫১ কোটি টাকার) ৩৯ শতাংশ।

ছ. রপ্তানী ঋণ: ১৯৬৯ সালের জুন থেকে ১৯৮২-এর ডিসেম্বরের মধ্যে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে রপ্তানিকারীদের যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ ১,০৪৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫৩৭'৮৫ কোটি টাকা হয়েছে।

সুতরাং, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যগুলির সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের কাজকর্মের অগ্রগতির খতিয়ানটি মিলিয়ে দেখলে জাতীয়করণের সাফল্য এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সার্থকতাই প্রমাণিত হয়।)

১৪২১. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ : একটি মূল্যায়ন
Nationalisation of Banks : An Evaluation

(ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ একটি বাস্তব ঘটনা। এ ঘটনাকে অস্বীকার করা আজ আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অনেক সুফল ভারতের অর্থ-নীতি ভোগ করছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে আরও বেশি সুফল যে পাওয়া যাবে সে কথাও নিশ্চিত করে বলা যায়। তবুও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উৎসাহী সমর্থক এমন কিছু ব্যক্তি জাতীয়করণের পরবর্তী ২০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জাতীয়করণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু কিছু বিপদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। সেগুলিকে এভাবে বিবৃত করা যায়:

(১) যে সব ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে বহু ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক সমূহের জরুরি কাজের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া, সাধারণভাবে ব্যাঙ্কগুলিতে কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে এবং কাজ-কর্মে উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(২) যেসব ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলির পরিচালক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোনয়ন নিয়োগের ব্যাপারে এবং ঋণমঞ্জুরের বিষয়ে রাজনীতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যার ফলে প্রচলিত বিধি অনুসারে ঋণ পাবার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ-প্রার্থীদের অনুচিত ভাবে ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

(৩) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কৃষিক্ষেত্রে সহজ শর্তে উদারভাবে ঋণের ঢালাও ব্যবস্থা করা যাতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকেরা উপকৃত হয়। ক্ষুদ্র কৃষকদের দারিদ্র্য নিরসনের উপায় হিসাবে এ ধরনের ঋণের ব্যবস্থা করা যে বিশেষ কর্তব্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঢালাও ভাবে ঋণ বিতরণ করা হলে সে ঋণ আদায় করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সর্বাধুনিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ এত বেশি যে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক ভিত্তি ইতোমধ্যেই দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণদান ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করার জন্য সারা দেশে বহু শাখা স্থাপন করা হয়েছে যেগুলি বস্তুতপক্ষে অ-লাভজনক।

(৪) শ্রী আর. কে. সিন্‌হাব নেতৃত্বে গঠিত ভারতেব লোকসভার এস্টিমেট্‌স্ কমিটি ব্যাঙ্ক জাতীয়কবণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান যায় নি বলে অভিমত প্রকাশ কবেছে। কমিটি বলেছে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঋণ দেবার এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ব্যাপক-তর সম্প্রসারণের যে লক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল তার কোনোটাই পূরণ করা যায় নি। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের ঋণের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণেব কার্যসূচি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের ১৮ বৎসর পরেও সাহায্য পাবার যোগ্য দরিদ্র শ্রেণীকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

বড় বড় ঋণপ্রার্থীদের ঋণ দেবার বিষয়ে সঠিক নীতিও অনুসরণ করা হয়নি বলে এস্টিমেট্‌স্ কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বড় ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের পরিমাণ সীমিত করার নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক বলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রাক্কালে বলা হয়েছিল কিন্তু, এস্টিমেট্‌স্ কমিটির মতে, বর্তমানে বড় ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের ন্যায্য প্রয়োজন মিটানো ব্যাঙ্ক-সমূহের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

উপরন্তু, জনসাধারণের যে অর্থ ব্যাঙ্কঋণের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে সেই অর্থ যথার্থই উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সেটা সুনিশ্চিত করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা ব্যাঙ্কগুলি করতে পারে নি। এস্টিমেট্‌স্ কমিটি তাই সুপারিশ করেছে, ব্যাঙ্কগুলি বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহকে ঋণ দেবার ব্যাপারে যে নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করছে সেগুলির পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিবেচনা করা হোক।)

১৪২২. ব্যাঙ্কিং কমিশনের রিপোর্ট
Report of the Banking Commission

(কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আর. জি. সরাইয়ার সভাপতিত্বে

নিযুক্ত ব্যাঙ্কিং কমিশন ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে রিপোর্ট পেশ করে। এদেশের ব্যাঙ্ক শিল্পের সমগ্র কাঠামো সম্পর্কে অনুধাবন করে কমিশন ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে।

১. কমিশন কতকগুলি নতুন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করে। কমিশনের মতে এর ফলে ব্যাঙ্কিং কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি ঘটবে। এগুলি হল :

ক. গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : কতকগুলি ঘনসংবদ্ধ গ্রাম নিয়ে (জনসংখ্যা ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার কিংবা জনসংখ্যা কম হলে) একটা গোটা উন্নয়ন ব্লকের জন্য একটি করে **গ্রামীণ ব্যাঙ্ক** (রুরাল ব্যাংক) স্থাপন করতে হবে। এই ব্যাংকগুলি মূলত সমবায় চরিত্রের হলেও সাধারণ ব্যাঙ্কের মত আমানত জমার মারফত স্থানীয় সঞ্চয় সংগ্রহ করবে এবং ছোট ও মাঝারি চাষীদের ঋণ দেবে। তাছাড়া ঋণ ঠিকমত কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা দেখবে, আনুষঙ্গিক ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করবে, নিজেদের গুদাম তৈরি করবে ও তার কাজকর্ম চালাবে, কৃষির যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে এবং নিজ এলাকার গ্রামগুলির সামগ্রিক উন্নয়নে সাহায্য করবে। গ্রামীণ ব্যাংক পরিকল্পনাকে এক কথায় সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুবিধাগুলির সংমিশ্রণ এবং সমবায় ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর সম্প্রসারণ বলা যায়।

খ. গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অর্থসংস্থানের জন্য একটি দুই তলা সংগঠন স্থাপন করতে হবে। জেলা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে থাকবে স্থানীয় গৃহনির্মাণ-অর্থসংস্থানকারী সংস্থা। এটি হবে নিচের তলার সংগঠন। তার উপর থাকবে জাতীয় স্তরে গৃহনির্মাণ-ঋণদানকারী সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংস্থা।

গ. ভাড়া-ক্রয় ঋণের সংস্থানের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য দেশের পূর্বাঞ্চলে এ জাতীয় ঋণের অভাব রয়েছে বলে এখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ও তাদের মালিকানায় **বিশেষ ভাড়া-ক্রয় কোম্পানি** স্থাপন করা যেতে পারে।

ঘ. পুরানো দেশীয় ব্যাঙ্কারদের ব্যবসায়কে প্রতিষ্ঠানগত রূপ দিতে হবে। কমিশনের মতে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সাথে প্রত্যক্ষভাবে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে পরোক্ষভাবে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশীয় ব্যাঙ্কারদের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সাথে কাজ কারবার পরিচালনার আইনগত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-কাঠামোর পুনর্গঠন করতে হবে : কমিশনের মতে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোর মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য ও গরমিল আছে। তা দূর করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং তাদের দুটি বা তিনটি সর্বভারতীয় ব্যাংক এবং পাঁচটি কি ছয়টি আঞ্চলিক ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করতে হবে।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের পরিধি বিস্তার ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে —(১) ক্রেডিট গ্যারাণ্টি স্কীমটির সুযোগ ক্ষুদ্র শিল্প ও ছোট কারিগরদেরও দিতে হবে। (২) কৃষিঋণ আদায়ের ব্যবস্থাটি নমনীয় হওয়া উচিত। যতটা সম্ভব, ঋণগ্রহণকারী যেন একটি মাত্র ঋণদানকারী সংস্থা থেকেই তার যাবতীয় ঋণের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। (৩) ৫০ হাজার জনসংখ্যাবিশিষ্ট স্থানে যেখানে ৩টি বা ৪টির বেশি ব্যাঙ্ক রয়েছে সেখানে ব্যাঙ্কের নিকাশ ঘর (ক্লীয়ারিং হাউস) খোলার প্রয়োজনীয়তা বিচার করে দেখা উচিত। (৪) ব্যাঙ্কগুলির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অযথা বিলম্বের কারণগুলি দূর করতে হবে। (৫) ব্যাঙ্কসহ দেশের সমস্ত ঋণদানকারী সংস্থাগুলিকে ঋণসংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য একটি পৃথক **ক্রেডিট ইন-টেলিজেন্স ব্যুরো** প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

সুপারিশগুলি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত : (১) ব্যাঙ্কগুলির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কে ব্যাঙ্কিং কমিশন যে সব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে দুটি বাদে আর সমস্ত সুপারিশই সরকার গ্রহণ করেছে। (২) সরকার ব্যাঙ্কিং কমিশনের যে সব সুপারিশ গ্রহণ করেছে তা কাজে পরিণত করতে গিয়ে আইনের যে যে পরিবর্তন দরকার তা সম্পাদন করা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইতোমধ্যেই এই কারণে ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ ধারা সংশোধন করা হয়েছে। তা ছাড়া একই উদ্দেশ্যে ঐ আইনের আরও কিছু ধারা সংশোধনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। একই কারণে স্টেট ব্যাঙ্ক আইনও সম্প্রতি সংশোধন করা হয়েছে। এ ছাড়া, সরকার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশটি গ্রহণ করে তার রূপায়ণ শুরু করেছে।

১৪-২০. ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার পর্যালোচনা : চক্রবর্তী কমিটি
Review of the Working of the Monetary System : Chakravorty Committee Report

১৯৮২ সালে অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তীকে সভাপতি করে ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার পর্যালোচনার জন্য একটি

কমিটি গঠিত হয়। অতীতে ১৯২৫ সালে এই উদ্দেশ্যে হিলটন-ইয়ং কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে।

চক্রবর্তী কমিটির রিপোর্টের মূল বক্তব্য ও সুপারিশগুলি হল :

(১) দেশে সঞ্চয় সংগ্রহ এবং সংগৃহীত সঞ্চয়ের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব করার জন্য পরিকল্পনার অগ্রাধিকারগুলির সঙ্গে দেশের মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের পদ্ধতি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে তা মুদ্রাস্ফীতিতে সাহায্য না করে। এজন্য : (ক) আরো বেশি করে জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হবে ; (খ) রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সঞ্চয় বাড়াতে হবে ; (গ) রাজস্ব সংগ্রহে এবং সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে হবে।

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। তবে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বলতে স্থির মূল্যস্তর বোঝায় না। পাইকারী মূল্যস্তরের বার্ষিক ৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্য সরকারকে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে টাকার যোগান ও টাকার সংরক্ষিত তহবিলের সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৩) টাকার যোগান, উৎপাদন ও মূল্যস্তরের মধ্যে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। গত ১৫ বছর ধরে 'রিজার্ভ মানি' ও টাকার যোগান বেড়েছে প্রধানত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভারত সরকার বেশি করে ঋণ নেওয়ায়। ফলে ঋণটা টাকায় পরিণত হয়েছে। সরকারকে এই ঋণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং অর্থের প্রয়োজনে সরকারকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে বাদ দিয়ে মানুষের সঞ্চয় বেশি করে সংগ্রহ করতে হবে কিংবা করের রাজস্ব বাড়াতে হবে অথবা অন্যান্য সূত্র থেকে ঋণ করতে হবে।

(৪) বাজেট ঘাটতির সংজ্ঞার পরিবর্তন করতে হবে। কারণ বর্তমান সংজ্ঞায়, শুধু বকেয়া ট্রেজারি বিলের স্তরের পরিবর্তনের মধ্যেই ঘাটতির পরিমাণটি আবদ্ধ থাকায় সরকারের ফিসক্যাল কার্যকলাপের মুদ্রাগত ফলাফলের চিত্রটি পাওয়া যায় না। মুদ্রাগত প্রভাববিশিষ্ট যে মেয়াদী লগ্নিপত্র সরকারের হাতে থাকে বর্তমানে ঘাটতির সংজ্ঞাতে তা ধরা হয় না। এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মুদ্রাগত প্রভাববিশিষ্ট যে ট্রেজারি বিলের পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের হাতে অবস্থিত মুদ্রাগত প্রভাবহীন ট্রেজারি বিলের পরিমাণ বৃদ্ধির পার্থক্য করা হয় না।

(৫) সুদের হারের সমর্থনমূলক ভূমিকার সপক্ষে চক্রবর্তী জোর সুপারিশ করেছেন। মেয়াদী লগ্নিপত্র ও ট্রেজারি বিলের সুদের হার এমন হওয়া উচিত যেন তা নতুন ঋণদাতাদের আকৃষ্ট করতে পারে এবং ব্যাঙ্কগুলির মুনাফাযোগ্যতা বাড়ে। তা ছাড়া ঋণের কার্যকর ব্যবহারের এবং স্বল্পমেয়াদী মুদ্রাগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুদের হার সংক্রান্ত নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও আছে। সুদের হার এমন হওয়া উচিত যেন দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় থেকে সঞ্চয়কারীরা একটা যুক্তিসঙ্গত আয় উপার্জন করতে পারে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণগ্রহণকারীদের জন্য কমিটি কেবল দুরকমের কনসেসন্যাল হারের সুপারিশ করেছেন। একটি হল ন্যূনতম সুদের বেসিক হার, অন্যটি হল ন্যূনতম সুদের বেসিক হারের কিছুটা কম। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি কেবল অগ্রাধিকারযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ দেয় বলে কমিটি বলেছে, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের উচিত এদের বিশেষভাবে সাহায্য করা।

(৬) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখে কমিটি বলেছে : (ক) ঋণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত ; (খ) ক্যাশ ক্রেডিটের পরিমাণ কমিয়ে এনে ঋণ ও বিল বাট্টার মারফত কার্যকর পুঁজি সরবরাহ করা উচিত ; এবং (গ) বিল বাট্টার মারফত অর্থসংস্থানে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(৭) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত একটি সুদক্ষ টাকার বাজার গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করা। এই পুনর্গঠিত টাকার বাজারে ট্রেজারি বিলের বাজার, কল মানি বাজার, বাণিজ্যিক বিল বাজার এবং আন্তঃকোম্পানির তহবিল বাজার, এই চারটি অংশে টাকার বাজার ন্যূনতম বিলম্বে ও ন্যূনতম লেনদেন খরচে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিলের উপযুক্ত আবণ্টন ঘটাতে সক্ষম হবে বলে কমিটি আশা করেছে।

চক্রবর্তী কমিটির সুপারিশগুলি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। তবে ইতোমধ্যেই কমিটির সুপারিশমতো বাজেট ঘাটতির সংজ্ঞা সরকার পরিবর্তন করেছে। সামগ্রিক ভাবে কমিটির সুপারিশগুলি নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে এই সব সুপারিশ করা হচ্ছিল।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের বর্তমান মুদ্রামানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [C.U. B.Com. (Hons) '84]

[Discuss the chief features of the present currency system of India.]

২. ভারতে প্রবর্তিত আমানত বীমা কার্যক্রমের

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। এটা দেশে ব্যাঙ্কগুলির ফেল পড়ার কতটা প্রতিকার করতে পারবে বলে তুমি মনে কর ?

[Analyse the chief features of the Deposit Insurance Scheme that was introduced in India. How far, in your opinion, will this scheme be able to prevent bank failures ?]

৩. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায়গুলির তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the relative importance of the various weapons of credit control that the Reserve Bank of India applies.]

৪ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরু থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির পর্যালোচনা কর।

[Evaluate the monetary policy that the Reserve Bank of India adopted during and after the Second plan period.]

৫. প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা বাঞ্ছিত লক্ষ্য কতদূর সফল হয়েছে ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

[C.U. B.Com. (Hons) '84 ; C.U. B.A. III, '83]

[How far have the desired objectives been achieved as a result of the nationalisation of the major commercial banks in India.]

৬. ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আর্থিক নীতি কতটা সহায়ক হয়েছে আলোচনা কর। [C.U. B.Com. (Hons) 1985]

[Discuss how far the monetary policy of the Reserve Bank of India has been conductive to the economic development of India.]

৭. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতির উপর টীকা লেখ।

[Write a note on the credit control policy of the Reserve Bank of India.]

৮. ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ কতটা সাহায্য করেছে ?

[Examine how far the financial needs of the small-scale and the medium sized industries have been met as a result of nationalisation of the major commercial banks in India.]

৯ কৃষিঋণের ক্ষেত্রে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা আলোচনা কর।

[Discuss the role of the Reserve Bank of India and the State Bank of India in regard to agricultural finance.]

১০. বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সব পরীক্ষা চালিয়েছে সে বিষয়ে একটি টীকা লেখ।

[Write a note on the experiments that the Reserve Bank of India has made in regard to Selective Credit Control.]

১১. ভারতে শিল্প বিকাশের জন্য আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের কাজকর্মের পর্যালোচনা কর। [B.U. B.A. '80-'81 Syll. 1983]

[Evaluate the performance of the nationalised bank in financing the needs of industrial growth in India.]

১২ ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিরূপে ঋণের পরিমাণগত ও গুণগত নিয়ন্ত্রণ করে ?

[B.U. B.A. II, '78-'80 Syll. 1982]

[How does the Reserve Bank of India control the quantity and quality of credit.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতে এক টাকার নোট ও বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলন করার দায়িত্ব কার ?

[Who is responsible for the issue of one rupee notes and coins in India ?]

২. ভারতের টাকার বাজারের সদস্য কারা ?

[Who are the members of the Indian Money Market ?]

লেনদেনের উদ্বৃত্ত ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Balance Of Payments And Economic Development

১৫১. লেনদেনের উদ্বৃত্ত
Balance of Payments

১. আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত হল দেশের সাথে বহির্বিশ্বের বৈষয়িক লেনদেনের প্রতিবিম্ব। দ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদান ছাড়াও দেশের সাথে বহির্বিশ্বের আরও অন্যান্য লেনদেনও চলে। পণ্য আমদানিতে যেমন বিদেশের কাছে দেনা হয়, তেমনি বিদেশী পুঁজির উপর প্রদেয় সুদ ও লভ্যাংশ, বিদেশে দূতাবাসের খরচ ও শিক্ষার্থীদের ব্যয়-ভার, সুদে আসলে বিদেশী ঋণ পরিশোধ, বিদেশী জাহাজ ব্যবহারের মাশুল, বিদেশী বীমা কোম্পানির প্রাপ্য প্রিমিয়াম ও বিদেশী বিমান পরিবহণ ইত্যাদি ব্যবহারের মাশুল এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রাপ্য পারি-শ্রমিক প্রদান প্রভৃতি কারণে দেশের দায় বা দেনা সৃষ্টি হয়। বিদেশীদের কাছে দেনার প্রথম কারণটি হল দৃশ্য (দ্রব্যসামগ্রী আমদানি), দ্বিতীয় কারণটি হল অদৃশ্য (বিদেশী সেবা গ্রহণ)।

২. অন্যদিকে বিদেশে পণ্য রপ্তানির দরুন যেমন দৃশ্য কারণে বিদেশীদের কাছে পাওনা হয়, তেমনি দেশের কাছ থেকে উপরোক্ত বিবিধ সেবা গ্রহণের অদৃশ্য কারণেও বিদেশীদের কাছে দেশের পাওনা হয়।

৩. এই সব দৃশ্য ও অদৃশ্য কারণে দেশের দেনা পাওনার উদ্বৃত্তকে বলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত। দৃশ্য ও অদৃশ্য কারণে মোট দেনার চেয়ে মোট পাওনা বেশি হলে তাকে বলে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত। মোট পাওনার চেয়ে মোট দেনা বেশি হলে তাকে বলে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি।

৪. লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হলে নীট বিদেশী মুদ্রা উপার্জিত হয় এবং দেশের বিদেশী মুদ্রা তহবিল বাড়ে। তাতে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ক্রয়শক্তি বাড়ে, দেশের টাকার আন্তর্জাতিক ক্রয়শক্তি বাড়ে। সেটা দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আর আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হলে বিদেশের কাছে দেশের দেনা মেটাতে দেশের বিদেশী মুদ্রার তহবিল কমে। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ক্রয়ক্ষমতা কমে। প্রতিকূল উদ্বৃত্ত একটা সাময়িক ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত চলতে থাকলে

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশীয় অর্থনীতির ভারসাম্যের অভাব বোঝায় এবং তা দেশের অর্থনীতিক দুর্বলতার লক্ষণ বলে গণ্য হয়।

৫. বহির্বিশ্বের সাথে লেনদেনে ভারতের বর্তমান সমস্যা এই যে, সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক লেনদেনে ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটছে।

১৫.২. যুদ্ধোত্তর যুগে লেনদেনের অবস্থা : ১৯৪৬-৫৬ Balance of Payments in the Post-War Period : 1946-56

১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের আমদানি খুবই কম ছিল, কিন্তু মিত্রশক্তিকে সহায়তার জন্য তাদের নিকট যুদ্ধশেষে ভারতের মোট ১,৭০০ কোটি টাকা পাওনা হয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধকালে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্তই ছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যুদ্ধশেষে ভোগ্যপণ্য আমদানি বৃদ্ধি, দেশভাগের দরুন কাঁচা পাট ও কাঁচা তুলা আমদানি, কলকারখানার পুরাতন যন্ত্রপাতি রদবদলের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি ইত্যাদি কারণে ভারতের দেনা বাড়ে এবং অন্যদিকে রপ্তানি কমে যায়। এর ফলে ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ঘাটতির পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায়।

২. আমদানি নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা, মুদ্রাস্ফীতি দমনের নানা ব্যবস্থা, বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি এবং ১৯৪৯ সালে টাকার সরকারী বিনিময়মূল্য কমিয়ে দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দূর করার চেষ্টা করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে পরবর্তী দু' বৎসরে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। কিন্তু একমাত্র সরকারী নীতির ফলেই যে এ উন্নতি সম্ভব হয়েছে তেমন কথা বলা যায় না। কেননা, সে সময় কোরীয় যুদ্ধের আবহাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামাল ও পণ্যমজুদের হিড়িকে ভারতের রপ্তানি বেশ কিছু বেড়েছিল। কিন্তু পরের বৎসরই পুনরায় লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বেড়ে যায়। ইতোমধ্যে ভারতের প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। ভারত সরকার প্রথম পরিকল্পনাকালে অধিক পরিমাণে রপ্তানি, জাতীয় স্বার্থ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত দ্রব্য বাদে অন্যান্য আমদানি বন্ধ করায় এবং দেশের বিদেশী মুদ্রার তহবিলের সীমার মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার ফলে প্রথম পরিকল্পনার পরবর্তী চার বৎসরে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। সুতরাং লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত নিয়েই প্রথম পরিকল্পনার কাল শেষ হয়।

১৫.৩. টাকার অবমূল্যায়ন : ১৯৪৯ Devaluation of the Rupee : 1949

১. ভারতে কাগজের মুদ্রামান প্রচলিত রয়েছে। এই কারণে দেশী মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার সরকারকে বেঁধে দিতে হয় এবং সেটা বজায় রাখার জন্য দেশী মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এবং সরকার ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত দেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমাতে বা বাড়াতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেনে ঘাটতি চলতে থাকলে তার প্রতিকারের জন্য অনেক সময় দেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমান হয়। এতে বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশী মুদ্রা সস্তা হয় এবং বিদেশী মুদ্রার দর বাড়ে। সুতরাং একই পরিমাণ দেশী জিনিস বিদেশীরা কিনলে তার দাম বাবদ আগের তুলনায় তাদের অল্প পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা লাগে। অর্থাৎ বিদেশীদের নিকট দেশী পণ্য সস্তা হয়। ফলে দেশের রপ্তানি বাড়ে। অপরপক্ষে দেশী মুদ্রার হিসাবে বিদেশী মুদ্রার দর বাড়ে বলে এই পরিমাণ বিদেশী দেনা শোধ করতে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ দেশী মুদ্রা লাগে। অর্থাৎ আগের মত একই পরিমাণ বিদেশী জিনিস আমদানি করলে তার দাম দিতে বেশি দেশী মুদ্রা লাগে। অতএব আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়ে ও আমদানি কমে। এভাবে রপ্তানি বাড়িয়ে ও আমদানি কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ও লেনদেনের ঘাটতি দূর করার জন্য দেশী মুদ্রার সরকারী বিনিময় হার হ্রাস বা অবমূল্যায়ন একটি সুপরিচিত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতি সাময়িক ফল দেয় মাত্র।

২. অন্যান্য দেশে মুদ্রার বিনিময় হার একাধিকবার হ্রাসের ঘটনা দেখা গেলেও ভারতে ১৯৪৯ সালে যে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয় তা ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার ইতিহাসে প্রথম। ১৯৪৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর টাকার ডলার (মার্কিন) মূল্য ৩০.২২৫ সেণ্ট থেকে ২১ সেণ্ট-এ এবং স্বর্ণমূল্য ০.২৬৮৬০১ গ্রাম থেকে ০.১৮৬৭২১ গ্রামে হ্রাস করা হয়। সে সময়ে স্টার্লিংয়ের মূল্য একই অনুপাতে হ্রাস করাতে টাকা ও স্টার্লিংয়ের পূর্বের হার বিনিময় (অর্থাৎ ১ টাকা=১ শি. ৫ পে.) অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ টাকার ডলার মূল্য ও স্বর্ণমূল্য ৩০.৫ শতাংশ কমান হয়।

৩. কারণ : সরকারের মতে নিম্নোক্ত কারণে টাকার অবমূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়েছিল : ১৯৪৬ সাল থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষত ডলার এলাকার সাথে বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছিল। ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডের

বৈদেশিক লেনদেনেও বিশেষত ডলার এলাকার সাথে ইংলণ্ডের বাণিজ্যেও ঘাটতি দেখা দেয়। উপায়হীন হয়ে ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড পাউণ্ডের ডলার মূল্য ৩০.৫ শতাংশ কমিয়ে দেয়। ইংলণ্ড পাউণ্ডের বিনিময় মূল্য হ্রাস করায়, স্টার্লিং এলাকার সাথে বাণিজ্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য ভারত সরকারও টাকার ডলার মূল্য ৩০.৫ শতাংশ হ্রাস করে। তা না হলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হত। এতে ডলার এলাকায় ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব হবে বলেও সরকার ভেবেছিল।

৪. **ফলাফল :** ১৯৪৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর টাকার মূল্য হ্রাসের দরুন অনুকূল ও প্রতিকূল দুই প্রকার ফল দেখা যায়। ডলার অঞ্চলে রপ্তানিসহ ভারতের মোট রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ভারতের সূতীবস্ত্র রপ্তানি উল্লেখনীয় রূপে বাড়ে। কিন্তু এই অনুকূল প্রতিক্রিয়াগুলি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। কারণ ১৯৫০ সালের দ্বিতীয় তিন মাসেই পুনরায় বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। কিন্তু ডলার অঞ্চল থেকে খাদ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য বাবদ খরচ অত্যধিক বাড়ে। পাকিস্তান তখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করেনি। ফলে তার নিকট থেকে কাঁচা পাট ও তুলা প্রভৃতি আবশ্যকীয় কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ডলার এলাকার মতই দাম বেশি পড়তে থাকে। এদিকে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের মূল্যস্তর বেড়ে যায়।

১৫.৪ টাকার দ্বিতীয় বার অবমূল্যায়ন : ১৯৬৬
Second Devaluation of the Rupee

১৯৬৬ সালের ৫ই জুন ভারত সরকার ভারতীয় টাকার সরকারী বিনিময় মূল্য হ্রাস করে এক ঘোষণা জারী করে। ভারতে এটা মুদ্রামূল্য হ্রাসের দ্বিতীয় ঘটনা। প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন টাকার বিনিময় হার ৩০.৫% কমানো হয়েছিল। এইবার ৩৬.৫% মূল্য হ্রাসের ফলে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য হয় ৭.৫০ টাকা এবং পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য হয় ২১ টাকা।

১. **কারণ :** (১) সরকার মনে করেছিল যে এই অবমূল্যায়নের ফলে ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কাল থেকে যে তীব্র বিদেশী মুদ্রা সংকট দেখা দিয়েছে তার সুরাহা হবে। পরিকল্পনাকালে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়লেও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট ক্রমাগত তীব্রই হতে থাকে। কারণ, একদিকে আমদানি যেমন বিপুল গতিতে বেড়েছিল, অন্যদিকে ভারতের মোট রপ্তানির দ্বারা আমদানির মূল্য শোধ করা যাচ্ছিল না। ফলে বৈদেশিক লেনদেন খাতে ঘাটতিও বেড়ে যায়। অতীতে লেনদেনের ব্যাপারে ভারত নিজস্ব স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের উপর নির্ভর করতে পারত। কিন্তু এ সময়ে সেটা কমে সামান্য অঙ্কে পরিণত হয়। এ কারণে সরকারী বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ৭৬১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২৩,৫১০ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

(২) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নিতে হয়েছে অর্থাৎ নোট ছাপাতে হয়েছে অধিক পরিমাণে। ফলে বিগত দশ বৎসরে মূল্যস্তর ৮০% বেড়েছে। অথচ যে সকল দেশ আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের ক্রেতা সে সব দেশে মূল্যস্তর এত বেশি বাড়েনি। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের মুদ্রার সাথে অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বাস্তবতা বর্জিত এবং অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। ঐ অবস্থায় বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্য কঠিন বাধা পাচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে টাকার সরকারী বিনিময় হার হ্রাসের মাধ্যমেই বহির্বিনিময় হারের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে সরকার সিদ্ধান্ত করে।

২. **উদ্দেশ্য : সরকার আশা করেছিল :** (১) এই ব্যবস্থার ফলে রপ্তানি বাড়বে। কারণ অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্য সস্তা হবে। ভারতেও রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে। টাকার মূল্য হ্রাসে এটাই সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল।

(২) টাকার অবমূল্যায়নের ফলে আমদানী পণ্যের দাম বাড়লে আমদানি কমবে। আমদানি কমলে দেশে এর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে দেশী শিল্পগুলি উৎপাদন বাড়াতে সুযোগ ও উৎসাহ পাবে।

(৩) সরকার মনে করেছিল, অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করার অনুকূল পরিবেশ পাবে। ফলে চতুর্থ যোজনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য টাকার হিসাবে বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে।

(৪) সোনার আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টাকার ৩৬.৫% হ্রাস করার ফলে স্বর্ণের চোরাকারাবার ও গোপন আমদানি বন্ধ হবে বলে আশা করা হয়েছিল। দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার জন্য টাকার মূল্য হ্রাসের সাথে একযোগে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম আমদানির উপর কঠোর বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে বলে সরকার ঘোষণা করে। প্রত্যাশা ছিল, বর্ধিত উৎপাদন দেশের মুদ্রাস্ফীতিকে কিছু প্রশমিত করতেও সাহায্য করবে।

৩. **ফলাফল :** কিন্তু ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার অবমূল্যায়নের বাস্তব ফলাফল সরকারের আশা পূর্ণ

করেনি। অবমূল্যায়নের যে দু'টি প্রধান ফল আশা করা হয়েছিল অর্থাৎ রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস, তা সে সময় ঘটেনি। বরং ১৯৬৬ সালে রপ্তানি আগের বৎসরের তুলনায় ৬ শতাংশ কমে গিয়েছিল এবং আমদানির পরিমাণ আরও বেড়েছিল। এর ফলে ১৯৬৬-৬৭ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ৪০ শতাংশের বেশি বেড়ে যায়।

রপ্তানি না বাড়ার কারণ দু'টো : (১) একদিকে সরকার অবমূল্যায়নের সাথে পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি রপ্তানী পণ্যের উপর রপ্তানী কর ধার্য করে। অন্যদিকে আমাদের প্রতিযোগীরা তাদের রপ্তানিকারীদের ভরতুকি দিয়ে তাদের রপ্তানী পণ্যের দাম কমাতে সাহায্য করে। ফলে আমাদের ঐসব পণ্যের রপ্তানি বাড়ানো যায়নি। এদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ও আমাদের অন্যান্য নতুন পণ্যের গুণ ও মান সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং বিশ্ববাজারে তাদের প্রবল প্রতিযোগী থাকায়, ঐ সকল পণ্যের রপ্তানিও বাড়ানো যায়নি।

(২) রপ্তানী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার বিদেশী কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম আমদানির অনুমতি দেওয়ায় এই সময়ে আমদানির পরিমাণ দারুণ ভাবে বাড়ে। কিন্তু দেশে তখন অর্থনীতিক মন্দার দরুন ঐ আমদানি করা কাঁচামাল ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো যায়নি। অথচ অবমূল্যায়নের ফলে দেশে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এই সময় খাদ্যসংকট এবং মন্দার দরুন শিল্পোৎপাদন কমে গিয়ে মূল্যস্তরকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

৪ অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও বিদেশী মুদ্রা সংকট দূর হয়নি কেন : মুদ্রার অবমূল্যায়নের একমাত্র অর্থনীতিক যুক্তি হল 'মৌলিক ভারসাম্যহীনতা' দূর করার যুক্তি। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য দেশের মূল্যস্তরের সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের উপায় হিসাবে মুদ্রার অবমূল্যায়নের আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু, শুধু সেটাই যথেষ্ট নাও হতে পারে। তারই সাথে দেশের অর্থনীতির জন্য অন্যান্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার হতে পারে। তা না হলে অবমূল্যায়নের সুফলগুলি পুরোপুরি পাওয়া যায় না। টাকার অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও দেশের বিদেশী মুদ্রার সংকট দূর হয় না কেন তা বুঝতে হলে এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

৫. দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে দেশের মূল্যস্তর বাড়ে ৩০ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বাড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ। তার পরেও এই মূল্যবৃদ্ধি চলতে থাকে। দেশে মুদ্রাস্ফীতির দরুন উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমে যায়, যার ফলে ভারতের রপ্তানিও কমে যায়। অন্যদিকে আবার বিদেশী পণ্য আমদানির চাহিদাও বেড়ে যায়। ফলে সে সময় দেশের রপ্তানি বাড়ানো ও আমদানি কমানো কঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে চোরাই আমদানিও বেড়ে যায়। এর প্রতিকারের জন্য আমদানী শুল্ক বাড়ানো হয়, রপ্তানিকারীদের নানাভাবে আর্থিক উৎসাহ দানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এ সবই ব্যর্থ হয়। তখন ওই 'মৌলিক ভারসাম্যহীনতা'র অবস্থা দূর করার জন্য ভারত সরকার ১৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়ন করে।

৬. সরকারের আশা ছিল, টাকার অবমূল্যায়নের ফলে, বিদেশের বাজারে ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ফিরে আসবে এবং বাড়বে ; রপ্তানী শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়বে ; বর্ধিত উৎপাদন রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৭. কিন্তু এ আশা পূর্ণ হয়নি। ফলে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বেড়ে যায়। এই ঘটনা থেকে একটি শিক্ষা পাওয়া গেল যে, রপ্তানী শিল্পগুলি এবং সে সব শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি সম্পর্কে নতুন করে পরিকল্পনা করা না হলে, শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব করে তোলা না হলে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর স্থির রাখা না হলে কেবল অবমূল্যায়ন ও সেই সাথে আমদানির উদারীকরণ ও ভরতুকি ইত্যাদির দ্বারা রপ্তানি বাড়ানো কঠিন হয়।

৮. ইতোমধ্যে নানা কারণে ভারতের বিদেশী মুদ্রা সংকট তীব্র হতে থাকে। এরকম পরিস্থিতি দেখা দেওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রধান হল : আন্তর্জাতিক তৈল সংকটের দরুন ক্রুড অয়েল ও পেট্রোল এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের নিদারুণ মূল্যবৃদ্ধি ; দেশের মূল্যস্তরের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মন্দা।

৯. এর সাথে আরও একটি কারণ দেশের বিদেশী মুদ্রার সংকটকে জীইয়ে রাখছে। তা হল বিদেশী ঋণের কিস্তি শোধের প্রয়োজনীয়তা। আসল ও সুদ মিলিয়ে এর পরিমাণও কম নয়। বিদেশী মুদ্রার সমস্যাটা তাই থেকেই যায়। এর একমাত্র প্রতিবিধান হল সবিশেষ পরিমাণে আরও রপ্তানি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।

১৫.৫ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও লেনদেন উদ্বৃত্ত
India's Five-year Plans and Balance of Payments

১. প্রথম পরিকল্পনাকালে : ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির (trade deficits) পরিমাণ ছিল ৫৪২ কোটি টাকা এবং নীট অদৃশ্য (net invisibles) হয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা। এর ফলে পরিকল্পনার পাঁচ বছরে প্রতিকূল লেনদেন

উদ্বৃত্তের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২ কোটি টাকায়। এই সামান্য পরিমাণ ঘাটতি ভারতের বিদেশী মুদ্রার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি।

২. **দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঃ** লেনদেন ঘাটতি তীব্র সংকট সৃষ্টি করে। এর অন্যতম কারণ ছিল ঃ (ক) পরিকল্পনার জন্য প্রচুর বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কিনতে হয়। (খ) পরিকল্পনাকালে পর পর দুই বছর কৃষির ফলন কম হওয়ায় বিপুল পরিমাণে খাদ্য আমদানি করতে হয়। (গ) বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রচুর কাঁচা তুলা আমদানি করতে হয়। (ঘ) তৎকালীন সুয়েজ-সংকটের জন্য জাহাজী মাশুলও অত্যধিক হারে দিতে হয়। (ঙ) আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন আমদানী পণ্যের খুব বেশি দর দিতে হয়। (চ) রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারে ব্যর্থতা। এ সব কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৩৩৯ কোটি টাকায় এবং নীট অদৃশ্য আয় হয় ৬১৪ কোটি টাকা। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয় ১,৭২৫ কোটি টাকা।

৩ **তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঃ** লেনদেন পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পিছনে তিনটি প্রধান কারণের উল্লেখ করা হয়। (ক) ঐ সময় খাদ্য ও রাসায়নিক সার ইত্যাদি বিপুল পরিমাণে আমদানির দরুন মোট আমদানি অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। (খ) পর পর দু'টো যুদ্ধের দরুন অধিক পরিমাণে সামরিক দ্রব্য আমদানি করতে হয়। (গ) ভারতে অবস্থিত বিদেশী কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা, বিদেশী জাহাজের ভাড়া ও বিদেশী ঋণের সুদ প্রভৃতি বাবদ বিপুল পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এ সব কারণে এ সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হয় ২,৩৮২ কোটি টাকা এবং নীট অদৃশ্য আয়ের পরিমাণ হয় ৪৩১ কোটি টাকা। ফলে মোট প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫১ কোটি টাকায়।

[এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংকটের তীব্রতা লাঘবের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতীয় টাকার দ্বিতীয় বার অবমূল্যায়ন করা হয়।]

৪ **তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঃ** লেনদেন উদ্বৃত্তের বিপুল ঘাটতি তীব্র সংকটের সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী কারণগুলি হল ঃ (ক) দেশের খাদ্য সংকট দূর করার জন্য বিপুল পরিমাণে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা, (খ) রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যর্থতা, (গ) বিদেশী ঋণের সুদ সহ বাৎসরিক কিস্তি শোধের বাধ্যবাধকতা, (ঘ) টাকার দ্বিতীয় অবমূল্যায়নের ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থতা যায় ফলে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হ্রাস হবার পরিবর্তে আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ঐ তিন বৎসরে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয় ২,০৬৭ কোটি টাকা এবং নীট অদৃশ্য আয় হয় মাত্র ৫২ কোটি টাকা। এতে মোট লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০১৫ কোটি টাকায়।

৫. **চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ঃ** উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এতকালের প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের অনুকূল লেনদেন উদ্বৃত্তে পরিণত হওয়া। এ ধরনের উন্নতি ঘটার পিছনে কিছু কারণও ছিল। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, আমদানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আমদানি করা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানি-পরিবর্ত (**import substitution**) পণ্য দেশেই উৎপাদন করা। আর একটি লক্ষ্য ছিল, ব্যাপক প্রচেষ্টার সাহায্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করা। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় ঃ আমদানি হ্রাস পায় এবং রপ্তানিও বাড়ে। এ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয় ১,৫৬৪ কোটি টাকা এবং নীট অদৃশ্য আয় হয় ১,৬৬৪ কোটি টাকা। এর ফলে মোট অনুকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ কোটি টাকায়। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হবার পর একমাত্র চতুর্থ পরিকল্পনাকালেই সর্বপ্রথম (পরিমাণে যৎসামান্য হলেও) অনুকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

৬. **পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ঃ** লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিস্থিতির খুবই সন্তোষজনক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ পাঁচ বৎসরে একদিকে যেমন আমদানির বিপুল বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অন্যদিকে তেমনই রপ্তানি আয়েরও অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ঐ সময়ে আমদানি-মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। অন্যদিকে বিপুল পরিমাণে নীট অদৃশ্য আয় বৃদ্ধির কারণগুলি ছিল ঃ (ক) দেশে চোরাই আমদানি ও চোরাই চালান বন্ধের কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; (খ) পর্যটন বাবদ বিপুল আয়; (গ) প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শদান সংক্রান্ত সেবার জন্য আয়; (ঘ) বিদেশে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকগণ কর্তৃক ভারতে প্রচুর অর্থ প্রেরণ। এ সব কারণে, পঞ্চম পরিকল্পনাকালে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৩,১৭৯ কোটি টাকা এবং নীট অদৃশ্য আয়ের পরিমাণ ছিল ৬,২২১ কোটি টাকা। এর ফলে ভারতের অনুকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,০৮২ কোটি টাকায়। ১৯৫১ সাল থেকে শুরু করে সমগ্র পরিকল্পনাকালে এমন বিশাল আয়তনের

অনুকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত ভারত আর কখনোই সৃষ্টি করতে পারে নি।

৭. **ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে :** ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। সমগ্র পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ভারত যেখানে খুব বড় আকারের অনুকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানে ষষ্ঠ পরিকল্পনা শুরু হবার ঠিক আগের বছরে (অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সালে) লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হতে আরম্ভ করে। নিচের সারণিতে ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরের এবং সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরের লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থা দেখান হল :

(কোটি টাকায়)

বৎসর	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত	নীট অদৃশ্য আগম	লেনদেন উদ্বৃত্ত
১৯৭৯-৮০	−৩,৩৭৪	+৩,১৪০	−২৩৪
১৯৮০-৮১	−৫,৯৬৭	+৪,৩১০	−১,৬৫৭
১৯৮১-৮২	−৬,১২১	+৩,৮০৪	−২,৩১৭
১৯৮২-৮৩	−৫,৭৭৬	+৩,৪৮০	−২,২৯৬
১৯৮৩-৮৪	−৫,৮৭১	+৩,৬০৯	−২,২৬২
১৯৮৪-৮৫	−৬.৭২১	+৩,৮৬৯	−২,৮৫২
১৯৮৫-৮৬	−৯,৫৮৬	+৩,৬৩০	−৫,৯৫৬
১৯৮৬-৮৭	−৯,৩৫৪	+৩,৮৪১	−৫,৫১৩

এ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (balance of trade) ও নীট অদৃশ্য আয়ের (invisibles) মধ্যে ব্যবধান ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে দারুণ ভাবে বাড়তে আরম্ভ করে। ১৯৮০-৮১ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৫,৯৬৭ কোটি টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে ৬,১২১ কোটি টাকা, ১৯৮২-৮৩ সালে ৫,৭৭৬ কোটি টাকা এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ৫,৮৭১ কোটি টাকা, ১৯৮৪-৮৫ সালে বেড়ে ৬,৭২১ কোটি টাকা, ১৯৮৫-৮৬ সালে ৯,৫৮৬ কোটি টাকা এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে ৯,৩৫৪ কোটি টাকার পরিণত লেনদেন উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবার মূল কারণ হল, ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে আমদানির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং তার সাথে রপ্তানির তাল রাখতে না পারা। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে নীট অদৃশ্য বিপুল আয়ের সাহায্যে আমদানি মূল্যের সাথে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে এ ভাবে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সমতা রক্ষা করা আর সম্ভব হয় নি। চলতি খাতে লেনদেন উদ্বৃত্তের ঘাটতি ১৯৭৯-৮০ সাল থেকেই শুরু হয় এবং ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে) অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা ঐ সময়ের বিপুল ঘাটতি মিটানো ভারতের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই ভারতকে IMF থেকে SDR তুলে নিয়ে দেনা পরিশোধ করতে হয়েছে। তা ছাড়া বিশ্বব্যাংক থেকেও ভারতকে বিপুল ঋণ নিতে হয়েছে।

৮. **সপ্তম পরিকল্পনাকালে** (১৯৮৫-৯০) **:** মোট রপ্তানির ৬০,৭০০ কোটি টাকা এবং আমদানির পরিমাণ ৯৫,৪০০ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এর ফলে এ পাঁচ বৎসরে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩৪,৭০০ কোটি টাকা হবে। আবার এ পাঁচ বৎসরে নীট অদৃশ্য আয় (net invisibles) ১৪,৭০০ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বের বাজারে ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের দাম আমদানী দ্রব্যের দামের থেকে আগেকার তুলনায় কিছুটা কম হবার জন্য (অর্থাৎ পূর্বে আমদানী দ্রব্যের দাম হিসাবে যে পরিমাণ রপ্তানী দ্রব্য পাঠিয়ে ভারত আমদানী দ্রব্যের দাম শোধ করত, এ পাঁচ বৎসরে আমদানির দাম শোধ করতে অনেক বেশি রপ্তানির প্রয়োজন হবে বলে) এ পাঁচ বছরে আরও ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এর ফলে সপ্তম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে (৩৪,৭০০ + ৯০০ − ১৪,৭০০) = ২০,৯০০ কোটি টাকা। এই ২০,৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি মিটাতে IMF, IDA এবং IBRD প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ ও সাহায্য নেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছে।

১৯৫০-৫১ সাল থেকে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থা (চলতি খাতে)

India's Balance of Payments Since 1950-51

(কোটি টাকায়)

	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত	নীট অদৃশ্য পাওনা	লেনদেন উদ্বৃত্ত
প্রথম পরিকল্পনা	−৫৪২	+৫০০	৪২
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	−২,৩৩৯	+৬১৪	−১,৭২৫
তৃতীয় পরিকল্পনা	−২,৩৮২	+৪৩১	−১,৯৫১
বার্ষিক পরিকল্পনা	−২,০৬৭	+৫২	−২,০১৫
চতুর্থ পরিকল্পনা	−১,৫৬৪	+১,৬৬৪	+১০০
পঞ্চম পরিকল্পনা	−৩,১৭৯	+৬,২২১	+৩,০৮২
১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪-৮৫	−৩০,৪৫৬	+১৯,০৭২	−১১,৩৮৪

১৯৫১-৮৪ পরিকল্পনার এই ৩৪ বৎসরে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

(ক) এই ৩৪ বছরের মধ্যে দু'টি বছর ছাড়া বাকি ৩২ বছর ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (চলতি খাতে) প্রতিকূল অবস্থায় থেকেছে। মধ্যেকার মাত্র দু'টি বছর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কিছুটা অনুকূল ছিল।

(খ) চতুর্থ পরিকল্পনাকাল ছাড়া আর সব কয়টি পরিকল্পনায় প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একমাত্র চতুর্থ পরিকল্পনাকালেই নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভাবে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(গ) ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের ঘাটতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এ সময় থেকে বাৎসরিক ঘাটতির পরিমাণ ৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি হতে দেখা যাচ্ছে।

(ঘ) এই ৩৪ বৎসরে অদৃশ্য সূত্রে নীট পাওনা (invisibles) সাধারণভাবে অনুকূল হয়েছে। তবে ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে অদৃশ্য সূত্রে নীট পাওনার পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তের অনুকূল হওয়ার একমাত্র কারণ হল প্রবাসী কর্মরত ভারতীয় নাগরিকগণ কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতে প্রেরণ।

(ঙ) ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মোট পরিমাণ ছিল ৩০,৪৫৬ কোটি টাকা। ঐ সময়ে নীট অদৃশ্য সূত্রে পাওনা হয়েছিল ১৯,০৭২ কোটি টাকা। এরই সাহায্যে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১১,৩৮৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম বৎসর থেকেই লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে। ঐ পরিকল্পনার প্রথম দু' বৎসরে (অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ ও ১৯৮৬-৮৭) প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫,৯৫৬ ও ৫,৫১৩ কোটি টাকায়।

১৫.৬. লেনদেন ঘাটতির সমস্যা : সমাধান
Problem of Deficit in the Balance of Payments : Solution

কোনো দেশের লেনদেন ঘাটতির সমস্যাটা স্বল্পকালীন হলে দেশের অর্থনীতির পক্ষে সেটা বিশেষ কোনো আশঙ্কার কারণ হয় না। সমস্যাটি সাময়িক হলে তার সমাধানের জন্য দেশের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করা হয়, কখনও কখনও IMF থেকে ঋণ নেওয়া হয়, আবার তেমন প্রয়োজন হলে বিদেশী সরকারের কাছ থেকেও ঋণ এবং/অথবা অনুদান সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সমস্যাটা দীর্ঘকালীন (chronic) হলে অর্থনীতি বিপদের মধ্যে পড়ে কেননা দীর্ঘকালীন সমস্যার ক্ষেত্রে এ সব ব্যবস্থা খুব একটা কার্যকর হয় না। লেনদেনের ঘাটতি ক্রমাগত হতে থাকলে অর্থনীতি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এ পরিস্থিতিতে (ক) দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে : (খ) IMF থেকে যে পরিমাণ অর্থ ন্যায্যত ও স্বাভাবিক নিয়মে দেশ পেতে পারে সে রকম অর্থেরও কোনো অবশিষ্ট থাকে না ; (গ) জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য IMF থেকে বিশেষ ঋণ পাবার সম্ভাবনাও থাকে না ; (ঘ) বৈদেশিক সরকারগুলি আর কোনো ঋণ দিতে আগ্রহী হয় না। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন পুরাতন ঋণের সুদ সহ আসলের বাৎসরিক কিস্তি শোধ করতে অপারগ হয়ে দেশ পুরাতন কিস্তি শোধের জন্য বিদেশ থেকে নতুন ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এ ধরনের শোচনীয় অবস্থা মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে দেখা দিয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে অবস্থা এখনো খারাপ হয় নি। তবে ভবিষ্যতে যে হবে না এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তাই ভারতের আমদানি-রপ্তানি নীতির ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, ভারতের লেনদেন ঘাটতির সমস্যাটা মূলত বিপুল বাণিজ্য ঘাটতিরই সমস্যা। এর অর্থ হল, ভারত যে পরিমাণ দৃশ্য আমদানি করে তার তুলনায় দৃশ্য রপ্তানি করে খুবই কম। বেশ কিছুকাল ধরে ভারতের আমদানি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে আর তারই পাশাপাশি রপ্তানি বাড়ছে খুবই কম হারে। বাণিজ্য ঘাটতির এটা একটা কারণ। লেনদেন ঘাটতি সমস্যার স্থায়ী সমাধান যে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির মধ্যেই নিহিত আছে সে বিষয়ে সকলেই একমত। ভারতের লেনদেন ঘাটতির সমস্যাকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করা দরকার।

এর অর্থ হল, অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে ভারতের আমদানী নীতি ও রপ্তানী নীতি উভয়েরই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো।

(ক) **আমদানী নীতির পরিবর্তন :** এ বিষয়ে মূল কথাটি হল, ভারতের বিপুল আমদানির পরিমাণ যে ভাবেই হউক কমাতে হবে। এবং এটা করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। প্রথমত, খাদ্যশস্যের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার। দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এটা করতে হবে। আগে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি হত ইদানীংকালে সে তুলনায় আমদানির পরিমাণ অনেক কমে গেলেও সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব হয় নি ; তার প্রমাণ হল ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪-৮৫ এ পাঁচ বৎসরে ভারতকে

প্রতি বৎসর গড়ে ৩২০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতে গমের সংগ্রহমূল্য (procurement price) বাড়িয়ে দিয়ে গম উৎপাদকদের মধ্যে অধিক গম ফলাবার উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা খরচ করে গম আমদানির নীতি থেকে বহুগুণে ভাল।

দ্বিতীয়ত, ধনিক শ্রেণীর শখ মিটাতে বিদেশ থেকে ভিডিও, রঙীন টিভি প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার।

তৃতীয়ত, দেশের বিদ্যমান লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে লৌহ ও ইস্পাত আমদানি বন্ধ করে এ বাবদ বাৎসরিক ১,০০০-১,৩০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়।

চতুর্থত, দেশে সার, কাগজ, সিমেন্ট প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বহু কোটি টাকা মূল্যের আমদানি কমানো সম্ভব। এখানে উল্লেখযোগ্য বিদেশ থেকে সার আমদানির জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০০ ৭০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়।

পঞ্চমত, অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আমদানিও বহুল পরিমাণে হ্রাস করা যায় যদি এ সব জিনিসের উৎপাদনেও দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা যায়।

ষষ্ঠত, দেশে জ্বালানি তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, তেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে এবং কঠোর ব্যবস্থার মাধ্যমে তার অপচয় বন্ধ করে বিদেশ থেকে তেল আমদানির পরিমাণ অন্তত ৩০ শতাংশ হ্রাস করা সম্ভব। এ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আমদানি বাবদ ভারত প্রতি বৎসর অন্তত ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে-পারে।

রপ্তানি বৃদ্ধি : প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের সমস্যার সমাধান শুধু আমদানি হ্রাস করলেই হবে না। এর পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধির সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। একদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ও হস্তশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেমন প্রচুর অন্যদিকে তেমনি চিরাচরিত রপ্তানি-পণ্যের সম্প্রসারণও ব্যাপকভাবে করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে রপ্তানিকারকদের মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা দরকার। এ ছাড়া, যে সব পণ্য বাইরে রপ্তানি করা যায় সেগুলির অভ্যন্তরীণ ভোগ নিয়ন্ত্রণ করাও উচিত। এটা করার যুক্তি হল, দেশে ঐ সব পণ্যের ভোগের পরিমাণ হ্রাস করা হলে প্রচুর রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা যাবে। এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার, রপ্তানি বৃদ্ধির প্রশ্নটি উৎপাদন খরচের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার কারণ হল, উৎপাদন খরচ কম হলে বিদেশের রপ্তানিবাজারে সাফল্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা যায়। তাই রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর সব রকমের চেষ্টা করা দরকার।

অন্যান্য ব্যবস্থা : এ সম্পর্কে ভারতীয় মুদ্রার অর্থাৎ টাকার অবমূল্যায়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার কঠোর নিয়ন্ত্রণ—এ দু'টি পদ্ধতির কথা বলা যায়। তবে এ ব্যাপারে অতীতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। ১৯৬৬ সালের টাকার অবমূল্যায়নের দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান যায়নি। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ফলও ভারতের অর্থনীতির পক্ষে মোটেই শুভ হয়নি।

১৫.৭. ভারত ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার
India and the International Monetary Fund

১. প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পৃথিবীর প্রধান দেশগুলিতে স্বর্ণমান চালু ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নানা কারণে স্বর্ণমান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বহুবিধ পরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর সব প্রধান দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে ও কাগজের মুদ্রামান গ্রহণ করে। তার ফলে প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ মুদ্রার বিনিময় মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। এতে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি হয়। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করে আন্তর্জাতিক লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতামূলকভাবে নিজ নিজ মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করতে থাকে। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে যাতে এই তিক্ত ও অস্বস্তিকর অবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং বিভিন্ন দেশের কাগজের মুদ্রামান থাকা সত্ত্বেও যাতে সব দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্যের একটা স্থিরতা বজায় থাকে ও তারা সহজেই পরস্পরের সাথে বিনিময়যোগ্য হয় এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে, সেজন্য যুদ্ধকালেই মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। এর নাম 'আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার'। এর উদ্দেশ্য পাঁচটি : (১) আন্তর্জাতিক মুদ্রাগত সহযোগিতা বৃদ্ধি। (২) সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিরতা সুনিশ্চিত করা ও মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় মূল্যহ্রাস নীতি পরিহার। (৩) মুদ্রার বহুমুখী বিনিময়যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা। (৪) মুদ্রার বহুমুখী বিনিময়যোগ্যতা

প্রতিষ্ঠার দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। (৫) সদস্য দেশগুলি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সাময়িক অসুবিধায় পড়লে তাদের সাহায্যদান।

২. প্রত্যেক সদস্য দেশ থেকে নির্দিষ্ট চাঁদা সংগ্রহ করে এটা একটা বিবিধ মুদ্রার ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে নিজ চাঁদার এক-চতুর্থাংশ অথবা তার নিজস্ব স্বর্ণভাণ্ডারের এক-দশমাংশের মধ্যে যেটি কম, তা দেয় চাঁদার অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে জমা দিতে হয়। বাকি অংশ নিজস্ব মুদ্রায় দেওয়া চলে। কোনো সদস্যরাষ্ট্রের চলতি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি হলে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের কাছ থেকে সে রাষ্ট্র নিজ চাঁদার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা কিনতে পারে। তা ছাড়া প্রয়োজন হলে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ করে বেশিও কিনতে পারে। তবে মোট ক্রয়ের পরিমাণ চাঁদার ২০০ শতাংশের বেশি হবে না। এইরূপ বিদেশী মুদ্রা কিনতে হলে, দেশীয় মুদ্রায় দাম দিতে হয়। তা ছাড়া, সদস্য হবার সময় প্রত্যেক দেশকে তার মুদ্রার স্বর্ণ অথবা ডলার মূল্য ঘোষণা করতে হয় এবং সেটা বজায় রাখতে হয়। অবশ্য প্রয়োজন হলে, কোনো সদস্যরাষ্ট্র নিজের মুদ্রার সরকারী বিনিময় হার, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতি ছাড়া, দশ শতাংশ পরিমাণ পর্যন্ত একতরফাভাবে কমাতে পারে। এর বেশি হলে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতি নিতে হয়।

৩. ভারত এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। এর আগে ভারতের চাঁদার পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ডলার সম্প্রতি এর সদস্যদের চাঁদা ৫০ শতাংশ বাড়ান হয়েছে। ফলে ভারতসহ সকল দেশের পক্ষেই এর নিকট থেকে বেশি পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা কেনা সম্ভব হয়েছে।

৪. সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নগদ অর্থের টান পড়ায় IMF-এর সদস্যদের মধ্যে লেনদেনের নিষ্পত্তি করতে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় IMF স্পেশ্যাল ড্রয়িং রাইটস বা SDR নামে এক কাল্পনিক মুদ্রা সৃষ্টি করেছে। এর স্বর্ণমূল্য স্থির করে তার স্থিরতা সম্পর্কে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এজন্য একে পরিহাস করে 'পেপার গোল্ড' বা 'কাগজে সোনা' বলা হয়। কোনো দেশই বৎসরে তার ভাগের SDR-এর ৭৫ শতাংশের বেশি তুলে ব্যবহার করতে পারবে না। IMF থেকে দরকার মত যে বিদেশী মুদ্রা ঋণস্বরূপ তোলার ব্যবস্থা আছে তার সাথে SDR-এর পার্থক্য হল, প্রচলিত ব্যবস্থায় ঋণ শোধ দিলে তা মিটে যায়, কিন্তু SDR একবার সৃষ্টি করা হলে তা বজায় থাকবে এবং তা পরিশোধের পরও ঐ পরিমাণ SDR আন্তর্জাতিক নগদ মুদ্রা হিসাবে গণ্য হয়ে IMF-এর আন্তর্জাতিক নগদ তহবিলে জমা হবে।

৫. **IMF-এর সংকট :** ১৯৭১ সালের শেষ ভাগে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার এবং মার্কিন অর্থনীতির যে গভীর মন্দা দেখা দেয় এবং তার ফলে খোলাবাজারে ডলারের বিনিময় হার ক্রমাগত কমতে থাকায় সেটা প্রতিরোধ করার জন্য ডলারকে সোনায় ভাঙ্গাবার ব্যবস্থাটি মার্কিন সরকার প্রত্যাহার করে। কিন্তু ডলারের মূল্যমান না কমিয়ে মার্কিন দেশ আমদানির উপর ১৫ শতাংশ সারচার্জ ধার্য করে পরোক্ষে সাময়িকভাবে ডলারের মূল্য হ্রাস করে এবং জাপান, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি অন্যান্য দেশের উপর তাদের মুদ্রার সরকারী বিনিময় হার বাড়াবার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিছু কিছু ছোট দেশ এটা স্বীকার করলেও প্রধান প্রধান দেশগুলি তাতে রাজী হয় না। ফ্রান্স প্রভৃতি কিছু দেশ তাদের মুদ্রার ডলার বিনিময় হার খোলাবাজারের উপর ছেড়ে দেয়।

৬ অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দশটি দেশের মধ্যে একটি বৈঠকে এ বিষয়ে যে মীমাংসা ঘটে তা 'মুদ্রাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আপসরফা' নামক অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের মধ্যে আলোচনার দ্বারা এই মীমাংসা ঘটেনি। মীমাংসা হয়েছে এর বাইরে এবং ঐ মীমাংসার ফলাফল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারকে এড়িয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টাকে অনেকে সমালোচনা করেন।

৭. কিন্তু ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় মন্দাজনিত সংকট ১৯৭৩ সালের শেষ ভাগ থেকে পুনরায় তীব্র হয়ে ওঠে এর ফলে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদন এক বছর আগের তুলনায় ১০-১৫ শতাংশ কমে যায়। ১৯৭৫-এর শেষ ভাগে অবস্থার অংশিক উন্নতি দেখা দিলেও ব্যাপক বেকার সমস্যা ও তীব্র মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে সে সংকটের অস্তিত্ব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই সংকটের ধাক্কায় বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ কমে যায়। তবে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমলেও মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন আমদানি-রপ্তানির মূল্যে খানিকটা বাড়ে। এই সংকটের বোঝা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অনেকটা পরিমাণেই স্বল্পোন্নত দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সে কারণে বাণিজ্যের শর্তাবলী (terms of trade) স্বল্পোন্নত দেশগুলির আরো প্রতিকূলে ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আরো অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে।

৮. **আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের প্রস্তাবিত সংস্কার :**

আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রী সংকটের দরুন চলতি লেনদেনের নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ব্যবস্থার মারফত যে বন্দোবস্তটি রচিত হয়েছিল তা টলমল করেই চলেছে। ১৯৭১ সালের আপসরফা শেষ পর্যন্ত টেকেনি। ১৯৭৬-এর জানুয়ারি মাসে জামাইকা বৈঠকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের এজন্য একটি চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েছে ও সে জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের লেনদেন নিষ্পত্তির বিধি-ব্যবস্থায় একযোগে কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (package reforms)। প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি হল:

(১) শর্ত সাপেক্ষে সদস্যদেশগুলি তাদের মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনশীলতা বজায় রাখতে পারবে, তবে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে; (২) SDR-এর কিংবা সদস্যদেশগুলির মুদ্রার কোনো স্বর্ণমূল্য থাকবে না, সোনার কোনো আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কর্তৃক নির্দিষ্ট দর থাকবে না (সদস্যদেশগুলি তাদের ইচ্ছামত সোনার দর ধার্য করতে পারবে), এবং সদস্যরা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারকে কিংবা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার সদস্যদের সোনার ঋণ শোধ করতে বা ঋণ দিতে বাধ্য থাকবে না; (৩) SDR-ই হবে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের মূল সম্পত্তি এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসারিত করা হবে ও তার লেনদেনের পদ্ধতি সরল করা হবে; (৪) ভাণ্ডারের গভর্নর পর্ষৎ 'দি কাউন্সিল' নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ স্থাপন করতে পারবেন।

৯. সদস্য হবার পর থেকে ভারত ভাণ্ডারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রভূত বিদেশী মুদ্রা কিনেছে অর্থাৎ সাহায্য পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বিদেশী মুদ্রার সংকটের সময় ভারতকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার-এর দেওয়া সাহায্য এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী মুদ্রার সাময়িক ঘাটতি সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা করা ছাড়াও, ভারতের বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কারিগরী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে তাদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে সদস্য হওয়ার ফলে ভারতের মুদ্রামান স্টার্লিংয়ের অধীনতামুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মুদ্রামানে পরিণত হয়। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হবার ফলে ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হতে পেরে নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্যপদ গ্রহণের দ্বারা ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নানা প্রকার সুবিধা ভোগে সক্ষম হয়েছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. পরিকল্পনাকালে ভারতের লেনদেনের উদ্বৃত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

[State the chief features of India's balance of payments during the plan period.]

২. ১৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়ন কেন করা হয়েছিল?

[Explain why the Indian rupee was devalued in 1966.]

৩. ভারতের সাম্প্রতিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থার বিবরণ দাও। কিরূপে এই লেনদেন-উদ্বৃত্তের উন্নতিসাধন সম্ভব?

[Give an account of the position of India's balance of payments in recent years. How is it possible to improve the balance of payments?]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতে টাকার প্রথম অবমূল্যায়ন কখন করা হয়?

[In which year did the first devaluation of the Indian rupee take place?]

২. ভারতীয় টাকার দ্বিতীয় অবমূল্যায়ন কোন্ সালে করা হয়েছিল?

[In which year did the second devaluation of the Indian rupee take place?]

৩. ভারত কবে থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হয়েছে?

[Since when has India been a member of the IMF?]

ফিসক্যাল নীতি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Fiscal Policy And Economic Development

১৬.১. ফিসক্যাল নীতি তথা রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় নীতির গুরুত্ব
Importance of Fiscal Policy

আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের বিষয়টি সব দেশেই গুরুত্ব লাভ করেছে। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের বিশেষ কোনো গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে, সমাজ জীবন রক্ষার খাতিরে ন্যূনতম যতটুকু আয় ও ব্যয়ের প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যেই রাষ্ট্র নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে। সে যুগের চিন্তায় রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়কে যথাসাধ্য ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে রেখে উভয়ের মধ্যে সমতা আনাই ছিল সর্বজন-স্বীকৃত নীতি। কিন্তু বর্তমান যুগে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। সমাজের বহুমুখী অর্থনীতিক ও সামাজিক কাজে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থনীতিক দিক থেকে অগ্রসর অথবা অনগ্রসর এই উভয় প্রকার দেশেই নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনীতিক লক্ষ্যসাধনে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের নীতি সার্থকরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। অগ্রসর দেশের বাণিজ্যিক চক্রের প্রতিরোধে, বেকার সমস্যার সমাধানে, মুদ্রাস্ফীতি নিবারণে এবং স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার লক্ষ্যসাধনে, আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য দূরীকরণে ও অর্থনীতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন হ্রাসে, রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয় ফলপ্রসূ কার্যক্রম হিসাবে অনুসৃত হচ্ছে।

১৬.২. ফিসক্যাল নীতি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Fiscal Policy and Economic Development

১. অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে স্বল্পোন্নত দেশগুলি আজকাল ফিসক্যাল নীতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে। এ কাজে আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতি এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যাতে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

২. প্রথমে আয়ের দিকটা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় আয় অর্থাৎ সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সরকার কয়েকটি উৎসের উপর নির্ভর করে। এ উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম হল কর, ঋণ ও নতুন অর্থসৃষ্টি। রাজস্ব সংগ্রহে এরা যেমন উপযোগী, তেমনি এদের প্রয়োগে অর্থনীতিতে নানা সমস্যাও দেখা দেয়। যেমন, করের মাধ্যমেই প্রত্যেক রাষ্ট্রে আজকাল রাজস্বের সব থেকে বড় অংশ আসে। কর

দু'রকমের হয়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কর খুব বেশি হারে বসান হলে কর্মে উৎসাহ, সঞ্চয় সৃষ্টির আগ্রহ ও বিনিয়োগের ইচ্ছা দমিত হতে পারে। অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্পোন্নত দেশে এ তিনটি জিনিসেরই খুব দরকার। আবার প্রত্যক্ষ করের কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে বিনিয়োগকে যেমন কাম্য পথে উৎসাহিত করা যায়, তেমনি অবাঞ্ছিত বা সমাজের পক্ষে এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় নয় এমন বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা যায়। এতে অর্থনীতিক উপকরণসমূহের সর্বাপেক্ষা কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়, সমগ্র সমাজ তাতে উপকৃত হয়। তাই স্বল্পোন্নত দেশের সরকারকে অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে হয়। পরোক্ষ করের ভূমিকাও এক্ষেত্রে বিচার্য। পরোক্ষ কর সমাজের ভোগের পরিমাণ হ্রাস করে। এতে সঞ্চয় সৃষ্টিতে সাহায্য হয়। আবার, আরামপ্রদ ও বিলাসদ্রব্যের উপর উচ্চহারে পরোক্ষ কর বসিয়ে সমাজের ধনীব্যক্তিদের কাছ থেকে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। তা ছাড়া, এ ধরনের কর বসিয়ে ধনীদের আড়ম্বরপূর্ণ ভোগব্যয়ও কিছুটা পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া যায়। সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা এতে বাড়ে। অন্যদিকে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর বসালে দেশের সাধারণ মানুষের খুবই অসুবিধা হয়। তাই পরোক্ষ করের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশের সরকারকে ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়।

৩ রাজস্ব সংগ্রহের আর একটি উৎস হল সরকারী ঋণ। দেশের মানুষের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করলে দেশের অব্যবহৃত মজুত অর্থ বিনিয়োগের কাজে লাগানো যায়। তাতে উন্নয়নমূলক কার্যসূচি রূপায়ণে বিশেষ সুবিধা হয়। করের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করলে জনসাধারণের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ঋণের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহে তেমন কিছুর সম্ভাবনা প্রায় নেই বলা যায়। তবে বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে উন্নয়নের কাজ করলে তাতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটি অর্থনীতির মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই অপরিহার্য না হলে বিদেশী ঋণ বর্জন করাই যুক্তিযুক্ত—এ সব দেশের সরকারের ঋণের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়টি এ কারণে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হয়।

৪. রাজস্ব সংগ্রহের অপর একটি উৎস হল ঘাটতি ব্যয় (deficit financing)। নতুন অর্থ সৃষ্টি করে (অর্থাৎ নোট ছাপিয়ে) সরকারের বাজেটে ঘাটতি মিটানোর চেষ্টা আধুনিক কালে প্রায় সব দেশের সরকারই করে থাকে। রাজস্বের উৎস হিসাবে এটি খুবই কার্যকর এবং এর প্রয়োগও সহজ। তাই স্বল্পোন্নত দেশে উপযুক্ত পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার নীতি সমর্থিত হয়। পুঁজির যোগান যেখানে কম অথচ নানা উপকরণের প্রাচুর্য রয়েছে এরকম স্বল্পোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয় উন্নয়নের সহায়তা করতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির উপর এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয় দামস্ফীতি সৃষ্টি করে, তাতে জনসাধারণের কষ্ট বেড়ে যায় এবং সমগ্র অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। তাই স্বল্পোন্নত দেশের সরকারকে এ উৎসটি সম্পর্কে সচেতন হতে হয়।

৫. সরকারী ব্যয়সংক্রান্ত নীতিও আধুনিককালে গুরুত্ব পাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশে অঞ্চলগত অনগ্রসরতা বা ভারসাম্যহীনতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার অনগ্রসরতা। তাই স্বল্পোন্নত দেশের সরকারকে অঞ্চলের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। সরকারী ব্যয়নীতির মাধ্যমে এ অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে শিল্প স্থাপনের এবং যানবাহনের সম্প্রসারণের জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করতে পারে। এ ছাড়াও দেশে বিশেষ বিশেষ শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, নবগঠিত শিল্পগুলিকে কিছুকালের জন্য কর রেহাইয়ের (tax-holiday) সুযোগ দিতে পারে। এটাও এক ধরনের সরকারী ব্যয় বলে ধরা যায়। আবার দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতেও পারে। উপরন্তু, যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারগুলিকে বাজেটে-ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদানের (grant-in-aid) মাধ্যমে অর্থ সাহায্য করতে পারে। এভাবে স্বল্পোন্নতি থেকে উন্নতির পথে অর্থনীতিকে পরিচালিত করতে সরকারী ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরে বর্ণিত কারণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় নীতি আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

১৬৩. ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থা
India's Federal Finance

১. বর্তমানে পৃথিবীতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দু'ধরনের রাষ্ট্র দেখতে পাওয়া যায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় একটি কেন্দ্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ঐ সকল রাষ্ট্রের সমস্যা প্রধানত আয়বৃদ্ধি এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার ও বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দু'ধরনের সরকার থাকে বলে

তাদের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশ এক, সরকার দুই শ্রেণীর, রাজস্ব সংগ্রহের উৎসগুলি মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ এবং ব্যয় বহুমুখী—এমন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে এক বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়। তা হল : রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে রাজস্বের উৎসসমূহের বণ্টন অথবা কেন্দ্র এবং অঞ্চলের মধ্যে কোনো বিশেষ সূত্র থেকে সংগৃহীত রাজস্বের বণ্টন।

২. কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক বা রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎস ও বিবিধ উৎস থেকে লব্ধ রাজস্বের বণ্টন একটি অতি কঠিন কাজ। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের বণ্টন সম্পর্কে দু'টি নীতি আছে। তা হল (১) প্রশাসনিক সুবিধা (administrative convenience), (২) রাজ্যের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য (fiscal independence)। রাজস্বের উৎসগুলি উভয় সরকারের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে সুবিধা, ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা—এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তেমনি ঐগুলি এমনভাবে বণ্টন করা উচিত যেন তা থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের দ্বারা উভয় প্রকার সরকারই নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং কাউকে অপরের নিকট কৃপা ভিক্ষা করতে না হয়। তবেই তাদের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকতে পারে। তেমনি রাজস্ব সংগ্রহের উৎসগুলি উভয় সরকারের মধ্যে এরূপভাবে বণ্টন করা উচিত যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক রাজস্ব আদায় করতে পারে। তবে বাস্তবক্ষেত্রে সর্বত্র এই নীতিগুলি পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা কঠিন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রে আয়-ব্যয় বণ্টন ব্যবস্থা কমবেশি পরিমাণে ঐতিহাসিক কারণ ও বাস্তব সুবিধা—এই দু'টি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়।

৩. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রচলিত সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা এবং বিশেষত কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎস ও সংগৃহীত রাজস্বের বণ্টন ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত। সংবিধানের বিশেষ ধারাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের রাজস্ব সংক্রান্ত ধারার প্রায় অনুরূপ। বর্তমান ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল :

(১) **রাজস্বের উৎস বণ্টন :** ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিলে রাজস্বের উৎসগুলিকে মূলত দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দু'টি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যথা—(ক) **কেন্দ্রীয় তালিকা** (Union list), (খ) **রাজ্য তালিকা** (State list)। সাধারণত একাধিক রাজ্যসংশ্লিষ্ট উৎসগুলি কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং স্থানীয় উৎসগুলি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে করগুলি হল : (১) কৃষি আয় বাদে অন্যান্য ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর ; (২) কোম্পানি আয়-কর ; (৩) আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ; (৪) মদ ও ওষুধ এবং প্রসাধনী দ্রব্যে ব্যবহৃত মাদকদ্রব্য বাদে অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন শুল্ক (excise duties) ; (৫) কৃষি জমি বাদে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর (estate and succession duties) ; (৬) ব্যক্তি ও কোম্পানির মালিকানাধীন কৃষি জমি বাদে অন্যান্য সম্পত্তির মূলধনী মূল্যের উপর (capital value of assets) কর ; (৭) স্ট্যাম্প ডিউটি ; (৮) স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ারের আগামবাজারের লেনদেনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাদে অন্যান্য কর ; (৯) সংবাদপত্র বিক্রি ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের উপর কর ; (১০) রেলের যাত্রী ভাড়া ও মাশুলের উপর কর ; (১১) রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহণে যাত্রী ও দ্রব্যের উপর কর (terminal taxes) ; এবং (১২) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে মাল বেচাকেনার উপর কর।

রাজ্যসরকারের এক্তিয়ারে করগুলি হল (**সপ্তম তফসিলের দ্বিতীয় তালিকা**) : (১) ভূমি রাজস্ব ; (২) সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের বেচাকেনার উপর কর ; (৩) কৃষি আয়ের উপর কর ; (৪) জমি ও বাড়ির উপর কর ; (৫) কৃষি জমির উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির উপর কর ; (৬) মদ ও মাদকদ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক ; (৭) চুঙ্গি কর (taxes on entry of goods) ; (৮) সংসদের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে খনিজ দ্রব্যের উপর কর (৯) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর কর ; (১০) গাড়ি, পশু ও নৌকার উপর কর ; (১১) আর্থিক দলিল বাদে অন্যান্য দলিলের উপর কর ; (১২) বাস ও অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবাহিত যানের যাত্রীদের ও মালের উপর কর ; (১৩) প্রমোদ, বাজিধরা ও জুয়ার উপর কর ; (১৪) পথ ও সেতু ব্যবহারের উপর কর (toll tax) ; (১৫) বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও নিয়োগের উপর কর ; (১৬) মাথা পিছু প্রদেয় শুল্ক (capitation fee) ; এবং (১৭) সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন বাদে অন্যান্য বিজ্ঞাপনের উপর কর।

এছাড়া রাজ্য ও যুগ্ম তালিকায় যার উল্লেখ নেই, তেমন বিষয়গুলির উপরও কেন্দ্রীয় সরকার কর বসাতে পারে।

(২) **রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বণ্টন :**

রাজস্বের বিভিন্ন উৎসের উপর কর ধার্য করার অধিকার উপরোক্ত দু'টি তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য-সমূহের রাজস্বের উৎসগুলি তাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসগুলি সম্প্রসারণশীল। এইজন্য রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কেন্দ্রীয় রাজস্বের বণ্টনের নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে ঃ

(ক) স্ট্যাম্পকর, ভেষজ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতির উপর ধার্য কর এবং এ ধরনের আরও কয়েকটি কর কেন্দ্র কর্তৃক ধার্য হয়, কিন্তু ঐগুলি রাজ্য সরকারও ভোগ করে।

(খ) অ-কৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, পরিবহণের সীমা কর, রেলমাশুলের উপর ধার্য রাজ্যকর ইত্যাদি কয়েকটিকে কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব সংশ্লিষ্ট সরকার ভোগ করে।

(গ) অ-কৃষি আয়কর প্রভৃতি কয়েকটি কর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করে কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত হিসাব অনুসারে বণ্টিত হয়।

(ঘ) তামাক, দিয়াশলাই প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ধার্য, সংগ্রহ এবং ভোগ করতে পারে অথবা প্রয়োজনবোধে এ রাজস্বের একাংশ কিংবা সবটুকুই রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করতে পারে।

(৩) **কেন্দ্রীয় অনুদান** (Grants-in-aid) ঃ রাজ্য সরকারগুলির বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে প্রতি বৎসর আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(৪) **ফিন্যান্স কমিশন নিয়োগ ঃ** উপরোক্ত ব্যবস্থা-গুলিছাড়া সংবিধানের ২৮০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবিধান প্রবর্তিত হবার দু'বৎসরের মধ্যে এবং তার পরবর্তীকালে প্রতি ৫ বৎসর অন্তর ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি করে ফিন্যান্স কমিশন নিয়োগ করবে। ঐ কমিশনের কাজ হবে ঃ

(ক) কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করা। (খ) কেন্দ্রীয় অনুদানের জন্য রাজ্য সরকারগুলির আবেদনপত্র বিবেচনা করা। (গ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা ও সে সম্পর্কে সুপারিশ করা।

কমিশনের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণভাবে অংশত গ্রহণ, পরিবর্তন বা বর্জন করতে পারেন।

১৩.৪. ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সমস্যা
Problems of India's Federal Finance

১ ভারতের বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির হাতে রাজস্বের যে উৎস দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত অস্থিতিস্থাপক ও সীমাবদ্ধ। এর দরুন রাজ্য সরকারগুলির চলতি ব্যয় নির্বাহ করাই কঠিন। এর উপর রয়েছে রাজ্যের অর্থনীতিক উন্নয়নের এবং রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যয়ের প্রয়োজন। এ কথা ঠিক যে, পাঁচ বৎসর অন্তর নিযুক্ত ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কর-রাজস্বের অংশ বণ্টন করে দিচ্ছে এবং এর উপর অনুদানেরও ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তাতে রাজ্য সরকারগুলির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটছে না। সেজন্য রাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে খুব বেশি পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রায় সকল রাজ্যই এভাবে কেন্দ্রের নিকট ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এমন কি ১১টি রাজ্য বর্তমানে কেন্দ্র থেকে যে ঋণ পাচ্ছে তার থেকে বেশি অর্থ সুদে-আসলে কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ বাবদ দিতে বাধ্য হচ্ছে। তাই, বর্তমানে রাজ্যগুলির তরফ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার রদবদলের বা সংশোধনের দাবি উঠেছে।

২. বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থায় কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির হাতে অর্থ হস্তান্তরের বিষয়ে যে সমস্যা-গুলি দেখা দিয়েছে তা হল ঃ (১) রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে বণ্টনের নীতি ও হার কেন্দ্রই স্থির করে। রাজ্যগুলির মতামতকে মূল্য দেওয়া হয় না। (২) এ যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, আয়কর ও কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের যে অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় তার অনুপাত আর বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ এই বাবদে প্রাপ্ত অর্থ রাজ্য সরকারগুলির বাজেট-ঘাটতি মেটাবার পক্ষে কখনই যথেষ্ট নয়। (৩) কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে যে অনুদান দেয় তার কিছু অংশ শর্তাধীন। এভাবে শর্তাধীন অনুদানের মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলির অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ করে বলে অভিযোগ করা হয়। (৪) কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে যে ঋণ দিচ্ছে তার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৫১ সালে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯৫ কোটি টাকা। ১৯৮৪-৮৫-এর বাজেটে এটা দাঁড়ায় ৫,৩৬৫ কোটি টাকায়। ঋণের জন্য কেন্দ্রের উপর এ ধরনের নির্ভরতা রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করছে। (৫) রাজ্যের ঋণ ও অনুদানের ব্যাপারে পরি-কল্পনা কমিশনের সুপারিশই সব বিষয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে। তাই সংবিধানের অর্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। একদিকে ফিন্যান্স কমিশনের বিধিবদ্ধ অনুদান

আর অন্যদিকে পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়নমূলক অনুদান রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

৩. **সম্ভাব্য প্রতিবিধান :** *এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত প্রতিবিধান গ্রহণ করা যেতে পারে,—*

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব-হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন থাকবে। কেন্দ্র থেকে হস্তান্তরিত রাজস্বের পরিমাণ কমান যাবে না বলেই মনে হয়। এ অবস্থায় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশে রাজস্ব বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ না করে স্থায়ী ভিত্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের মূল নীতি ও হার নতুন করে স্থির করা উচিত।

(২) দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় অনুদানের প্রশ্নটির বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

(৩) রাজ্যগুলির উন্নয়নের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে কেন্দ্রের নিকট রাজ্যগুলির ঋণের প্রশ্নটি পুনর্বিচার করা প্রয়োজন।

(৪) বর্তমানে অনুদানের ব্যাপারে ফিন্যান্স কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে যে দ্বৈত কর্তৃত্ব রয়েছে তার অবসান হওয়া উচিত। রাজ্যের মোট অর্থের প্রয়োজন নির্ধারণে উভয় কমিশনের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৬.৫. কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক
Centre-State Relations

১. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তেইশটি রাজ্য সরকার নিজ নিজ রাজ্যে কাজ করছে আর সর্বোপরি রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে এবং যুক্তরাষ্ট্র যাতে সহজ ও সাবলীলভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যেকার আর্থিক সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যাতে এই দুয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা না দেয়, বরং উভয় ধরনের সরকার কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করে যেতে পারে।

২. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিগত কয়েক বৎসর ধরে আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে নানাধরনের দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

৩. ভারতের সংবিধানের লক্ষ্য যাই হোক না কেন, এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে আর্থিক দিক থেকে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন এক কেন্দ্রীয় সরকার, আর অন্যদিকে তেইশটি কমবেশি দুর্বল রাজ্য সরকার। সংবিধানের ব্যবস্থা হল, অঙ্গরাজ্যগুলির অসুবিধার সময় কেন্দ্র অনুদান (grants) ও ঋণ দিয়ে এদের সাহায্য করবে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে অর্থনীতিক অসমতা রয়েছে তা দূর করে এক সুষম উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে। ফলে রাজ্যগুলিকে আজ চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যগুলিতে কোথাও কোথাও আর্থিক দায়িত্বহীনতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে এবং কেন্দ্র থেকে পাওয়া অনুদান ও ঋণের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আজ নতুন করে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা ও পুনর্মূল্যায়নের দাবি ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই মাথা তুলছে। এ দাবির মূল কথা হল : রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর আর্থিক ও রাজনীতিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা অর্পণ, আর এরই পাশাপাশি কেন্দ্রের প্রবল ক্ষমতার হ্রাস। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান প্রধান বিষয়গুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় :

(১) ভারতের সংবিধান এমনভাবে রচিত যাতে কেন্দ্র প্রবল শক্তিমান হয় আর রাজ্যগুলি দুর্বল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এ অবস্থা, রাজ্যগুলির মতে, আর চলতে দেওয়া উচিত নয়।

(২) বৈচিত্র্যময় ভারতে ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যগুলির হাতে আরো বেশি স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা অর্পণ করলে রাজ্যগুলির নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ সম্ভব।

(৩) সংবিধান প্রবর্তিত হবার পর থেকেই কেন্দ্র তার কাজের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। এর ফলে রাজ্যগুলি উত্তরোত্তর কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

(৪) কেন্দ্র এমন কতকগুলি বিভাগের কাজ নিজের হাতে রাখছে বা ক্রমাগত সম্প্রসারিত করে চলেছে যে কাজ বস্তুতপক্ষে রাজ্যগুলিরই করা উচিত।

(৫) আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত রাজ্যের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্র এ ব্যাপারে ক্রমশই ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করছে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (CRP) বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF), এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (ISF) প্রভৃতির মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্যগুলির স্বাভাবিক ও সংবিধানসম্মত কাজে হস্তক্ষেপ করছে। যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি এতে দুর্বল হচ্ছে।

(৬) কেন্দ্রকে যতটুকু দায়দায়িত্ব পালন করতে হয় তার তুলনায় অনেক বেশি আর্থিক সম্বল কেন্দ্রের হাতে রয়েছে; অথচ যথোপযুক্ত সম্বলের অভাবে রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে পারছে না।

(৭) কেন্দ্রীয় রাজস্বের উৎসগুলি খুব বেশি রকমের স্থিতিস্থাপক, কিন্তু রাজ্যগুলির আয়ত্তাধীন উৎসগুলি তুলনায় অস্থিতিস্থাপক। ফলে, কেন্দ্রের উপর নির্ভর করা ছাড়া রাজ্যগুলির কোনো গত্যন্তর থাকে না।

৪ যে আর্থিক বন্দোবস্ত (financial arrangements) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরাজ করছে সেটা যে সন্তোষজনক নয় তার অন্যতম প্রমাণ হল এই যে, গত চল্লিশ বছর ধরে রাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে ঋণ ও অনুদানের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে রাজ্যগুলি আর্থিক দিক থেকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়াও এমন কতকগুলি বিষয় আছে যার জন্য কেন্দ্রের কার্যপদ্ধতি ও নীতিগতি সম্পর্কে রাজ্যগুলি সন্দিহান হয়ে পড়ছে। রাজ্যগুলির অভিযোগ হল ঃ

(ক) প্রথম থেকেই রাজ্যগুলি কোম্পানি করের (Corporation tax) কোনো অংশই পায় না। রাজ্যগুলি এতে ক্ষুব্ধ। কারণ, রাজ্যে রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (Corporate sector) স্থাপনের ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন, শিল্পের জন্য শক্তি, জল, কাঁচামাল, জমি, পরিবহণ ইত্যাদি। তাই কোম্পানি করের একটা অংশ রাজ্যগুলির পাওয়া উচিত।

(খ) বর্তমানে এমন কয়েকটি দ্রব্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি আগে রাজ্য অন্তঃশুল্কের অধীন ছিল। এতে রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহের উৎস সংকুচিত হয়েছে।

(গ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশের পরিমাণ খুবই কম। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলির অসন্তোষের বিশেষ কারণ আছে। তারা দেখছে মূল অন্তঃশুল্কের উপর যে অতিরিক্ত শুল্ক বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করে তার থেকে একটি পয়সাও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় না। এর সবটুকুই কেন্দ্র নিজের হাতে রাখে। তা ছাড়া, মূল অন্তঃশুল্কের মাত্র ২০ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় (পূর্বে ৪০ শতাংশ বণ্টিত হত)।

(ঘ) পূর্বে রেলযাত্রী করের (Railway passenger tax) একটা অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হত। কিছুকাল আগে এ ব্যবস্থা কেন্দ্র রদ করে দেয়। তার পরিবর্তে কেন্দ্র অনুদানের (grant) ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অনুদানের পরিমাণ কেন্দ্র একতরফাভাবে ঠিক করেছে। রাজ্যগুলির সাথে এ ব্যাপারে কোনো পরামর্শ করেনি। রাজ্যগুলি অনুদান বাবদ যে পরিমাণ অর্থ পাচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি অর্থ পূর্বেকার রেলযাত্রী করের অংশ হিসেবে তারা পেত।

(ঙ) আয়করের উপরে যে সারচার্জ বসানো হয় রাজ্যগুলির ভাগে সেই সারচার্জের কিছুই জোটে না। আয়কর রেহাইয়ের ন্যূনতম সীমা অনেক বাড়িয়ে দেওয়ায় রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য আয়করের অংশ (divisible pool) অনেক কমে গেছে।

৫ রাজ্যগুলির মোট রাজস্বের ৬০ শতাংশ আসে বিক্রয় কর থেকে। অথচ কেন্দ্র বিক্রয় কর রদ করতে চাইছে। এ ছাড়া চুক্তি কর ও রাজ্য অন্তঃশুল্ক উঠিয়ে দেবার কথাও কেন্দ্র ভাবছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে রাজ্যগুলির রাজস্বের উৎস ক্রমশই সংকুচিত হয়ে আসছে।

৬ এরই সাথে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঃ আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর জন্য রাজ্যগুলির বহু অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় অনুদান ছাড়া রাজ্যগুলির পক্ষে পরিকল্পনার কার্যসূচি রূপায়ণের কোনো সম্ভাবনা নেই। এর উপর রয়েছে দেশে মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের সরকারী নীতি। সারা দেশে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করা হলে রাজ্যগুলির রাজস্ব যেমন কমে যাবে তেমনি মাদক বর্জন আইনকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে রাজ্য সরকারের বহু অর্থ ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়া আরো একটি কথা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতিক, ফিসক্যাল ও মুদ্রানীতি দেশের মূল্যস্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এসব নীতির ফলে সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে ও জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচুর সম্বল আছে, তার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বর্ধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া সম্ভব হলেও রাজ্য সরকারের সীমিত সম্বলের উপর নির্ভর করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বর্ধিত হারে ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে কঠিন সমস্যা দেখা দেয়।

৭. কেন্দ্রীয় অনুদান ও ঋণের ব্যাপারে কেন্দ্র বিশেষ বিশেষ রাজ্যের প্রতি কৃপণ অথবা উদার হতে পারে। এতে রাজ্যগুলির বাজেট প্রণয়নে দারুণ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

৮. কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের রামফ্রন্ট সরকার কয়েকটি সুপারিশ ও প্রস্তাব দেশের সামনে রেখেছে। সেগুলি হল ঃ

(১) কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হোক। প্রয়োজন হলে এর জন্য সংবিধানের সংশোধন করতে হবে।

(২) কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক,

বৈদেশিক বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুদ্রা ও অর্থনীতির সমন্বয়সাধন—কেবলমাত্র এ কয়টি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় ক্ষমতা ও কাজ রাজ্যগুলির হাতে থাকবে। রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করবে না বা কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে না।

(৩) ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (IAS) ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (IPS), সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (CRP), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF) এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (ISF), কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এ সব সংগঠন (যার মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্যগুলির কাজে-কর্মে হস্তক্ষেপ করে) রদ করতে হবে।

(৪) প্ল্যানিং কমিশন ও ন্যাশন্যাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

(৫) কেন্দ্রীয় রাজস্বের ৭৫ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের জন্য হস্তান্তরিত করতে হবে। রাজ্যগুলির মধ্যে এ রাজস্ব কি নীতিতে বণ্টন করা হবে সেটা নির্ধারণ করবে ফিন্যান্স কমিশন।

৯. কেন্দ্রের বক্তব্য : (১) কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে যে আর্থিক সম্পর্ক বিরাজ করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্ররা এ সম্পর্কের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হোক এটা চান না। তাঁদের মতে যে ব্যবস্থা চলছে সেটাই চলুক, তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে—কিন্তু সে পরিবর্তন কখনই মৌলিক হবে না। (২) উপরের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন হলে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে এবং ঐক্যবদ্ধ বর্তমান ভারত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে। এ ধরনের চিন্তার পেছনে তাঁদের যুক্তি হল, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। এ দলগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল। এদের সর্বভারতীয় কোনো ভিত্তি নেই, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দর্শনের দিক থেকে উল্লেখ-যোগ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য বক্তব্যও কিছু নেই। এগুলি সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। আঞ্চলিক স্বার্থ ছাড়া এরা বিশেষ কিছুই ভাবতে পারে না। এ দলগুলির পেছনে কায়েমী স্বার্থ কাজ করে। সুতরাং কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলে এ রাজ্যগুলি নিজ নিজ আঞ্চলিক দলের প্রভাবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এটা হবে সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। (৩) এ ছাড়া কেন্দ্র আরো যুক্তি দেখায় যে, রাজ্যগুলির হাতে যে সব আর্থিক ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, কোনো রাজ্যই সে সব ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করছে না বা করতে পারছে না। এ অবস্থায় আরো বেশি ক্ষমতা পেলেও রাজ্যগুলি যে তার সদ্ব্যবহার করতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কেন্দ্র আরো যুক্তি দেখায় যে, রাজ্যগুলির রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ বিভিন্ন সময়ে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। যেমন, রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছে, কৃষি আয়কর প্রবর্তন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে। কিন্তু এ কর প্রবর্তনের ব্যাপারে কোনো রাজ্যই বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখায় নি।

১০. উপসংহার : ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের বিষয়টি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বেশির ভাগ রাজ্যই পুরাতন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পরি-বর্তন হোক এটা চাইছে। সুতরাং আজ হোক কাল হোক এ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পরি বর্তন সাধন করলেই জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবে এমন আশঙ্কা অমূলক। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের এমন পরিবর্তন আনা সম্ভব যাতে জাতীয় ঐক্যের সাথে সাথে রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখা যেতে পারে।

১৬.৬ নবম ফিন্যান্স কমিশনের প্রথম রিপোর্ট
First Report of the Ninth Finance Commission.

এন্. কে. পি. সালভেকে সভাপতি করে গঠিত নবম অর্থকমিশনের প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। কমিশন ১৯৮৯-৯০ সালে রাজ্যগুলির নিকট ১৩,৬৬২ কোটি টাকা হস্তান্তরের সুপারিশ করেছে। কোন্ কোন্ উৎস থেকে কি পরিমাণ অর্থ হস্তান্তরিত হবে সে সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ

১	কর ও শুল্ক বাবদ—	
	(ক) আয়কর	২,৯৯০ কোটি টাকা
	(খ) অন্তঃশুল্ক	৭,২১০ ,, ,,
	(গ) অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক	১,৪৯০ ,, ,,
	(ঘ) রেলযাত্রী ভাড়ার উপর কর	৯৫ ,, ,,
	মোট	১১,৭৮৫ ,, ,,
২.	পরিকল্পনা বহির্ভূত অনুদান	১,৮৭৭ ,, ,,
	সর্বমোট	১৩,৬৬২ কোটি টাকা

যে ভিত্তিতে করলব্ধ অর্থ ও শুল্কের হস্তান্তর করা হবে সে সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ হল ঃ

(ক) আয়কর রাজস্বের ৮৫ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন বর্তমানে যে ব্যবস্থা চালু আছে ঠিক সেই ব্যবস্থা অনুসারেই করতে হবে। এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের ৪৫ শতাংশ সব কয়টি রাজ্যের মধ্যে আর ৫ শতাংশ ১৩টা ঘাটতি রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

রাজ্যগুলির মধ্যে কর-লব্ধ অর্থ ও অন্তঃশুল্ক বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের বণ্টন সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ হল—

(ক) অষ্টম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমানে যে ব্যবস্থা চালু আছে সে ব্যবস্থা অনুসারেই আয়কর রাজস্বের ৮৫ শতাংশ ও কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের ৪৫ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের বণ্টনযোগ্য ৪৫ শতাংশের মধ্যে ৪০ শতাংশ সব কয়টি রাজ্যের মধ্যে আর অবশিষ্ট ৫ শতাংশ ১৩টি ঘাটতি রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

নবম ফিনান্স কমিশন ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য ৪,৩৫২ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করেছে। এই অনুদান নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া হবে।

(ক) ১৩টি রাজ্যের পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্বখাতে অনুদানের পরিমাণ হবে ৯৮৪ কোটি টাকা।

(খ) রাজ্যস্তরে পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যগুলিকে যে অনুদান দেওয়া হবে তার পরিমাণ হবে ২,৪৭৫ কোটি টাকা।

(গ) ত্রাণের কাজে সরকারী ব্যয়ের ব্যাপারে অষ্টম ফিনান্স কমিশন যে নীতিগ্রহণের সুপারিশ করেছিল নবম ফিনান্স কমিশন তার কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি।

(ঘ) সরকারী ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নবম কমিশন জনসাধারণের কোনো কোনো অংশের জন্য বিশেষ সুবিধাদানের সুপারিশ করেছে। খরা-পীড়িত অঞ্চলের ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে বিশেষ ধরনের সুবিধা পাবে। কমিশন ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও বিশেষ সাহায্যের সুপারিশ করেছে। কমিশন পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য ৮৫ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্যের সুপারিশ করেছে। অন্যদিকে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও ২০ কোটি টাকা বিশেষ অনুদানের সুপারিশ করেছে।

(ঙ) কমিশন সুতীবস্ত্র, চিনি ও তামাক—এ তিনটি জিনিসের উপর আরোপিত অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ৯৮% রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের সুপারিশ করেছে। বাকী ২% কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে বণ্টনের কথা বলা হয়েছে।

নবম ফিনান্স কমিশনের অনুদান-বণ্টনের ধাঁচ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, গোয়া ও সিকিম প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে মোট অনুদানের বৃহত্তর অংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব রাজ্যের বিশেষ ধরনের সমস্যার জন্যই যে এদেরকে অধিক পরিমাণে অনুদান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা বলাই বাহুল্য। বড় বড় রাজ্যগুলি মোট অনুদানের যে অংশ পেয়েছে সেটা ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে প্রদেয় অনুদানের তুলনায় অনেক কম।

নবম ফিন্যান্স কমিশনের হিসাবে দেখানো হয়েছে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির হাতে অনুদান ও অন্যান্য ধরনের অর্থ স্থানান্তরের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৮৯-৯০সালের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৭,৯৯৪ কোটি টাকায়। এটা হবে ঐ বছরের মোট জাতীয় উৎপাদনের ১.৯২ শতাংশ।

অন্যদিকে ঘাটতি রাজ্যগুলির বাজেট ঘাটতির মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৪৪৩ কোটি টাকা। এটা হবে ঐ বছরের মোট জাতীয় উৎপাদনের ০.৩ শতাংশ।

মন্তব্য ঃ ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশগুলি যে রাজ্যগুলির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য অর্থের ভাগবাটোয়ারা হয়ে থাকে ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নিযুক্ত এক একটি ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নতুন করে ঐ ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে থাকে এবং এক একটি ফিন্যান্স সুপারিশ কমিশনের সুপারিশ পাঁচ বৎসরকাল বলবৎ থাকে। ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশগুলির ভিত্তিতে বরাদ্দ অর্থের উপরই রাজ্যগুলির নিজস্ব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপদান নির্ভর করে।

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্রের প্রাধান্য ও আধিপত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকছে না।

রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য কেন্দ্রীয় তহবিলটি কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের একটি সুনিশ্চিত ব্যবস্থারূপেই সংবিধানে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিফল হয়েছে এবং যে সব নীতি অনুসরণ করে এ যাবৎ একের পর এক ফিন্যান্স কমিশন ঐ তহবিলের গঠন

ও তার অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের সুপারিশ করে এসেছে তাতে ধনী রাজ্যগুলি আরও ধনী এবং গরিব রাজ্যগুলি আরও গরিব হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক রাজ্যের পক্ষ থেকে এ দাবি ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে যে কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কটি পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং রাজ্যগুলিকে আরও বেশি আর্থিক ক্ষমতা দিতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার দাবি করেছে কেন্দ্রীয় রাজস্বের ৭৫ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তাতে কেন্দ্রের দুর্বল হবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না, অথচ রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশি অর্থাগমের ফলে কেন্দ্রের উপর সদা নির্ভরশীল রাজ্যগুলি আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং রাজ্যগুলির কেন্দ্র-নির্ভরতাও বহুলাংশে হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে শক্তিশালী কেন্দ্র ও শক্তিশালী রাজ্যগুলির সমন্বয়ে এক পরাক্রমশালী ভারতের ভিত্তি স্থাপন হতে পারে।

১৬.৬. ভারতের কর কাঠামোর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
Nature and Features of the Indian Tax System

সারণি ১৬-১ : ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির মোট কর রাজস্বের পরিমাণ (১৯৫০-৫১ সা থেকে ১৯৮৭-৮৮ সাল)

বৎসর	কর রাজস্ব প্রত্যক্ষ কর	(কোটি টাকায়) পরোক্ষ কর	মোট	মোট রাজস্বের শতাংশ প্রত্যক্ষ কর	পরোক্ষ কর	জাতীয় আয়ের শতাংশ
১৯৫০-৫১	২৩০	৪৩০	৬৬০	৩৫	৬৫	৬
১৯৬০-৬১	৪২০	১,০৪০	১,৪৬০	২৯'৮	৭০'২	১০
১৯৭০-৭১	১,১০১	৩,৫৯০	৪,৬০০	২১'২	৭৮'৮	১৪
১৯৮০-৮১	৩,৬৯০	১৬,১০০	১৯,৭৯০	১৬'৫	৮৩'৫	১৭
১৯৮৭-৮৮	৬,২৪০	৪০,৩৩০	৪৬,৫৭০	১৩	৮৭	১৮

সূত্র : Economic Survey, 1951-52 to 1985-86 ; Reports on Currency and Finance.

২. কর রাজস্বের বিপুল ও ক্রমাগত বৃদ্ধি : সারণি ১৬-১ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত ৩৭ বৎসরে ভারতে মোট কর রাজস্ব ৭০ গুণেরও বেশি বেড়ে ৬৬০ কোটি টাকা থেকে ৪৬,৫৭০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে।

৩. জাতীয় আয়ে কর রাজস্বের অনুপাতের ক্রমশ বৃদ্ধি : মোট কর রাজস্বের বিপুল বৃদ্ধির দরুন ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে কর রাজস্বের অনুপাতটি ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৮ শতাংশে পরিণত হয়েছে (সারণি ১৬-১)। তুলনায় ব্রিটেনের কর রাজস্ব জাতীয় আয়ের ৩৭'৭ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ শতাংশ, ডেনমার্কে ৩০'৩ শতাংশ এবং হল্যান্ডে ২৯'৭ শতাংশ অস্ট্রেলিয়ায় ৩০'৩ শতাংশ ও অস্ট্রিয়ায় ৩২'২ শতাংশ (১৯৬৯)।

৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অনুপাত : অধোগতিশীল করকাঠামো : ভারতে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে কেবল যে মোট কর রাজস্বই বেড়েছে তা নয়, প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ কর বেড়েছে অনেক বেশি এবং মোট কর রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অনুপাতটি কমেছে ও পরোক্ষ করের অনুপাতটি বেড়েছে। সারণি ১৬-১ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ২৩০ কোটি টাকা থেকে ২৭ গুণ বেড়ে ৬,২৪০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে ; পরোক্ষ করের পরিমাণ ৪৩০ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৯৩ গুণ বেড়ে ৪০,৩৩০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে ; এবং মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত ১৯৫০-৫১ সালে ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১৩ শতাংশে এবং পরোক্ষ করের অনুপাত ৬৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৭ শতাংশ হয়েছে। এর ফলে ভারতের কর কাঠামোটি (tax structure) ক্রমশ অধোগতিশীল (regressive) হয়ে উঠেছে। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে কর রাজস্বের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ করের দ্বারা সংগৃহীত হয়।

এর তাৎপর্য হল, ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিপুল পরিমাণে যে কর ভার বেড়ে চলেছে তার অধিকাংশ বোঝাই বহন করতে হচ্ছে দেশের গরিব ও নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিকে। তুলনায় উচ্চবিত্ত ও ধনীদের উপর করের বোঝা কম।

৫. কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত আয়ের উপর কর : ভূমি রাজস্ব এবং কৃষি আয়কর কৃষিজীবীরা কেবল এই দু'টি প্রত্যক্ষ কর দেয়। দু'টিই হল রাজ্যসরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত

এবং ভারতের সমস্ত রাজ্যেই এই দুটি করের পরিমাণ অতি অল্প। সুতরাং অকৃষিজীবীদের তুলনায় কৃষিজীবীদের উপর প্রত্যক্ষ করের বোঝা তুলনামূলকভাবে ভারতে অল্প। ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতসরকারের একটি সমীক্ষা অনুসারে নগরবাসী পরিবারগুলির মাথাপিছু মাসিক কর ছিল ৫ টাকা ৮০ পয়সা ; তুলনায় গ্রামবাসী পরিবারগুলির মাথাপিছু মাসিক কর ছিল মাত্র ২ টাকা। গত ২৫ বৎসরে এই অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

৬. **সম্পত্তির উপর স্বল্প করভার :** ১৯৫০-৫১ সালের সাথে ১৯৮৮-৮৯ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের তুলনা করলে দেখা যায়, ৩৮ বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বে আয়করের অনুপাত ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ১৬

সারণি ১৬-২ : কেন্দ্রীয় কর রাজস্বে আয়কর, সম্পত্তিকর ও পণ্যকরের আনুপাতিক অংশ (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮৮-৮৯)

কর	১৯৫০-৫১	১৯৮৮-৮৯
নীট আয়কর	৩৫	১৬
সম্পত্তিকর	১	১
পণ্যকর	৬৪	৮৩
	১০০	১০০

সূত্র : Budgets, 1950-51 and 1988-89.

শতাংশ এবং পণ্যকর রাজস্বের অনুপাত ৬৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৩ শতাংশ হলেও সম্পত্তির উপর করের অনুপাতটি আগাগোড়াই ১ শতাংশ থেকে গেছে। এই রাজস্বের আদায়ের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে মাত্র ১৩০ কোটি টাকা হয়েছে। ভারতীয় করব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকরা যে আজ পর্যন্ত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী হয়ে রয়েছে, এটি তারই প্রমাণ। ভারতের কর কাঠামোর অধোগতিশীল চরিত্রের এটি একটি নির্দেশক।

৭. **অস্থিতিস্থাপক ও জটিল করকাঠামো :** ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে চলতি মূল্যস্তরে জাতীয় আয় প্রায় ৮ গুণ বাড়লেও ওই সময়ের মধ্যে আয়-কর দাতাদের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র দেড়গুণ এবং তাদের প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৬ গুণের মতো। এটি নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কর কাঠামোর অস্থিতিস্থাপক চরিত্রের প্রমাণ। সম্পত্তির উপর করের অনুপাতটিও সুদীর্ঘকাল ধরে অতি সামান্য এবং অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সুতরাং ভারতের করকাঠামোটির ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ। মাঝে মাঝে এর ভিত্তিটি প্রসারিত করতে গিয়ে করকাঠামোটিকে জটিল করে তোলা হয়েছে। এর একটি প্রমাণ হল, করকাঠামোটির পুনর্বিচারের উদ্দেশ্যে একাধিক কমিশন ও কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে এবং তারাও অনেক সুপারিশ করেছেন। ১৯৮৫-৮৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ ও আলোচনা করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সমগ্র করকাঠামোর পুনর্গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন ও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এর আগে এ জাতীয় চেষ্টা বিশেষ করা হয়নি।

৮. **মোট রাজস্বে কর-রাজস্বের অনুপাত :** ১৯৫০-৫১ সাল বা তারও আগে থেকে সরকারের মোট রাজস্ব যেমন বাড়ছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে, মোট রাজস্বে কর-রাজস্বের

সারণি ১৬-৩ : কেন্দ্রীয় রাজস্বে কর-রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্বের অনুপাত

রাজস্ব	১৯৫০-৫১	১৯৮৫-৮৬
নীট কর-রাজস্ব	৮৮	৭১
করবহির্ভূত রাজস্ব	১২	২৯
	১০০	১০০

অনুপাত কমছে এবং করবহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ এবং অনুপাত বাড়ছে। সারণি ১৬-৩ থেকে দেখা যায়, ১৯৫০-৫১ সালে মোট রাজস্বের ৮৮ শতাংশ ছিল কর-রাজস্ব এবং মাত্র ১২ শতাংশ ছিল করবহির্ভূত রাজস্ব।

১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে কর-রাজস্বের অনুপাত কমে হয়েছে ৭১ শতাংশ এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের অনুপাত বেড়ে হয়েছে ২৯ শতাংশ। ১৯৫০-৫১ সালে কর-রাজস্ব ছিল ৩৫৭ কোটি টাকা ; ১৯৮৫-৮৬ সালের ধরা হয়েছে ১৮,৯২২ কোটি টাকা (নতুন কর ৩১১ কোটি টাকা বাদে)। অপরদিকে ১৯৫০-৫১ সালে কর-বহির্ভূত রাজস্ব ছিল ৪৯ কোটি টাকা ; ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট ধরা হয়েছে ৭,৮৫১ কোটি টাকা। এটি করকাঠামোতে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।

১৬.৮. কিভাবে ভারতের কর ব্যবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে

Suggested Measures to Improve the Indian Tax System

১. ভারতের কর-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানত তিনটি লক্ষ্য সম্মুখে রেখে এর সংস্কার সাধন করতে হবে। লক্ষ্যগুলি হল : (ক) কর-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত ও গতিশীল করা। (খ) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কার্যসূচির রূপায়ণের জন্য অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করা। (গ) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক লক্ষ্যসমূহের পূরণ সুনিশ্চিত করা।

২. এই জন্য : (১) কর-ব্যবস্থার ভিত্তি আরও প্রশস্ত করতে হবে যাতে জনসংখ্যার আরও বেশি অংশ কর দিতে বাধ্য হয়। (২) কর-প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা ও পরিমাণ হ্রাস

করার জন্য কর পরিচালনা ব্যবস্থার অমূল পরিবর্তন সাধন করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। (৩) কর-ব্যবস্থা যাতে ধন-বণ্টনে অসাম্য হ্রাস করতে পারে তার জন্য পরোক্ষ করের সংখ্যা হ্রাস করে প্রত্যক্ষ করের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। (৪) কর-অনুসন্ধান কমিশনের মতে, উন্নয়ন-মূলক কার্যসূচির রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থায় গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে। এ কারণে একদিকে যেমন বিলাস-দ্রব্যাদির উপরে উচ্চহারে কর বসাতে হবে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের ভোগ্যদ্রব্যের উপরে করের হার কমাতে হবে। (৫) কর-ব্যবস্থার এমন পুনর্গঠন করতে হবে যাতে উৎপাদনের কার্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়। এই উদ্দেশ্যে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন অবপূর্তিজনিত বিনির্দিষ্ট অর্থের উপরে কর রেহাই, নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কর রেহাই, বিশেষ সময়ের জন্য করছুটি (tax holiday) ঘোষণা ইত্যাদি। (৬) মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত কর-অব্যাহতির সীমা অতি উচ্চে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সীমা আরও নিচে নামিয়ে আনতে হবে। ফলে আরও অনেক ব্যক্তিকে এই করের আওতায় আনা যাবে। (৭) বিক্রয় করকে আরও বেশি গতিশীল করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিলাস দ্রব্যের উপরে উচ্চতর হারে বিক্রয় কর-ধার্য করতে হবে।

৩. ভারতের কর-নীতির লক্ষ্য : একটি উত্তম কর-ব্যবস্থার কয়েকটি লক্ষ্য থাকে। ভারতের কর-ব্যবস্থারও সে লক্ষ্যগুলি সামনে থাকা উচিত। যেমন, (১) সমাজের আয় ও সম্পদ বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতি, (২) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করা, (৩) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে সহায়তা করা, এবং (৪) অর্থনীতির ভিত্তিতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আনা।

৪. সমাজের ও আয় সম্পদ বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতি করের মাধ্যমে অর্থনীতিক বৈষম্য হ্রাস করা এবং বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও উৎপাদনের প্রবাহে কোনো প্রকারের বাধা সৃষ্টি না করা —এই দুটি লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করে কর-নীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য। ভারতের মত দেশে অর্থনীতিক বৈষম্য হ্রাস করা সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হলেও বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যই প্রধান গুরুত্ব লাভ করবে। ঊর্ধ্বতম স্তরের আয়ের উপর অধিকতর হারে কর বসাতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উদ্যোগ ব্যাহত না হয়। এর পাশাপাশি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য খাতে সমাজসেবামূলক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। কর প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী কর নির্ধারণ করা নীতি হিসাবে অবশ্যই সমর্থন-যোগ্য কিন্তু ভারতের মত দেশে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের জন্য সব ক্ষেত্রেই এই নীতি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটবে।

৫. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করা—ভারতের মত দেশে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এটাই স্বাভাবিক প্রবণতা। এ প্রবণ-তাকে প্রতিরোধ করতে কর-ব্যবস্থাকে আরও বেশি গভীর ও ব্যাপক করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিলাসের উপকরণ, জনসাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদির উপরে কর বসাতে হবে। অনেকের মতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য অর্থসংগ্রহ করের মাধ্যমে না করে ঋণের মাধ্যমেই করা উচিত। কমিশন মনে করে যে সরকারী বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে এই সকল কার্যক্রমকে রূপায়ণ করা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি। অন্য পদ্ধতি হল ঘাটতি ব্যয়। কমিশনের মতে কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ঘাটতি-ব্যয় জনিত বিপদ দূর হয়।

৬ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের কাজে সহায়তা করা —এই উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়। ভারতের সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রয়োজন হল অধিক পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা। এর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের করের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রব্যসামগ্রীর উপরে কর বৃদ্ধি করলে ভোগ হ্রাস পায়। অপরদিকে প্রত্যক্ষ করের হার অধিকতর গতিশীল করা হলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় ভারতে এমন কর বসাতে হবে যাতে অধিক আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর ভোগ হ্রাস পায়। কিন্তু এই কর বসাবার ব্যাপারে আতিশয্য বর্জন করতে হবে। নইলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হবে। শুধু তাই নয়, শিল্প বিকাশে উৎসাহ দানের জন্য কর রেহাই (tax concessions)-এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের মধ্যে অনুপাত কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সঠিক কোনো হিসাব করা সম্ভব নয়, তবে কমিশন মনে করে যে, যতই বেশি রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন হবে ততই প্রত্যক্ষ করের উপর বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে হবে। তা ছাড়া, করবহির্ভূত রাজস্ব (non-tax-revenue) বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে—এ কথাও কমিশন বলেছে।

৭. অর্থনীতির ভিত্তিতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আনয়ন—এর জন্য কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে তার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিজনিত বা মুদ্রাসঙ্কোচনজনিত—এই

দুই অবস্থাতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থায় সমাজের মোট ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত-বাজেট নীতি গ্রহণ, রপ্তানিকর আরোপ, অতিরিক্ত লাভ-কর প্রবর্তন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। মুদ্রাসংকোচনজনিত অবস্থায় রপ্তানি করের বিলোপসাধন, অন্তঃশুল্কের ভার হ্রাস, সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি—ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

[ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে এদেশের সমগ্র কর-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারত সরকার এজন্য ১৯৫৩ সালে একটি কর অনুসন্ধান কমিশন গঠন করে। ১৯৫৫ সালে ঐ কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। তাতে কিছু সুপারিশ করা হয়। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ঐ সুপারিশের ভিত্তিতেই আলোচিত হল।]

১৬৯ ভারতীয় কর ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্যালডর Kaldor's Views on the Indian Tax System

১ ভারতীয় কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালডর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন এবং এর সংস্কারের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। ক্যালডরের মূল বক্তব্য ছিল, ভারতের কর ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব গতিশীল করা যাতে করভার সমাজে সুষমভাবে বণ্টিত হয়। ভারতের বর্তমান প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থা একদিকে যেমন দক্ষতাহীন অন্যদিকে তেমনি অন্যায্য। এটা দক্ষতাহীন, কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায় করদাতারা তাদের আয়ের অসম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করতে পারে। উপরন্তু, সম্পত্তি বেচাকেনা এবং সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থাই বর্তমানে নেই। এতে কর-প্রবঞ্চনা সহজ হয় এবং একে প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব। এটা অন্যায্য, কারণ প্রচলিত আইনে কর ধার্য করার জন্য আয়ের যেভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর করদাতা হিসাবের কারচুপি করে প্রকৃত আয় গোপন রাখতে পারে। ফলে কর দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে অল্প কর দিয়ে তারা করভার এড়িয়ে যেতে পারে। প্রচলিত কর-ব্যবস্থার এ সুযোগ বিশেষভাবে বর্তমান বলে এটা অন্যায্য, কারণ জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ পরোক্ষ করকে এভাবে এড়াতে পারে না।

২. ক্যালডরের অন্যতম সুপারিশ ছিল কর ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করা। এর জন্য তিনি নতুন ৪টি কর প্রবর্তনের পরামর্শ দেন: করগুলি হল: ক. মূলধনীলাভের উপরে কর (tax on Capital Gains), খ. ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপরে কর (tax on Personal Expenditure), গ. সাধারণ দানের উপর কর (Tax on General Gifts), ঘ. সম্পদের উপরে বাৎসরিক কর (Annual Tax on Wealth)। প্রচলিত আয়কর ও এই চারটি কর—অর্থাৎ এই পাঁচটি কর একই সঙ্গে আরোপ করে দেয় করের পরিমাণ হিসাব করতে হবে। এতে আয় গোপন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ, এই ৫টি কর সামগ্রিকভাবে এমন একটি ত্রুটিহীন ব্যবস্থার সৃষ্টি করবে যাতে প্রত্যেকটি কর অপরটির হিসাবের সত্যতা যাচাই করতে সাহায্য করবে।

৩. ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক উচ্চহারে কর ধার্য করার ফলে সঞ্চয়েচ্ছা, কর্মোদ্যোগ এবং বিনিয়োগের উৎসাহের উপরে যে ক্ষতিকরপ্রভাব পড়ে, ব্যক্তিগত ব্যয়কর এবং সম্পদ কর প্রবর্তন করলে ঐ ক্ষতিকর প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস করা যায়।

৪. ক্যালডরের মতে ত্রুটিশূন্য নিম্নহারের কর-ব্যবস্থা (যে ব্যবস্থায় কর প্রবঞ্চনা বন্ধ করা যায়) খবং ভাল, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অতিরিক্ত গতিশীল বলে মনে হয় অথচ সাফল্যের সাথে কার্যকর করা যায় না, এমন কর-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনই প্রধান কর্তব্য। তাই তিনি উচ্চতম ধাপের আয়করের হারকে (৯৭২%) হ্রাস করে ৪৫%-এর অধিক না করার সুপারিশ করেছেন। কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর ন্যায্য এবং করভার যাতে নির্বিচারে জনসাধারণকে নিষ্পিষ্ট করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার কথা তিনি বলেছেন। এই উদ্দেশ্যে সমহারে টাকায় সাত আনা হিসাবে কোম্পানির সমগ্র আয়ের উপরে কর ধার্য ক তে হবে।

৫. কর ফাঁকি রোধ করার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা আয় হলে বাধ্যতামূলক হিসাব পরীক্ষার সুপারিশও ক্যালডর করেছেন।

৬. ক্যালডর আয়ের উর্ধ্বতন ধাপগুলিতে অত্যধিক হারে কর ধার্য করার বিরোধী। তাঁর মতে গতিশীল কর-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিক থেকে পশ্চিমী দেশগুলির ন্যায় ভারতও একটি পাপচক্রের (vicious circle) মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে।

৭. **পাপচক্রটি হ'ল:** উচ্চহারে কর ধার্য করার ফলে কর-প্রবঞ্চনা অধিক হয়। কর-প্রবঞ্চনা যত অধিক হয় ততই সরকারের রাজস্ব আয় কমে যায়—রাজস্ব আয় যত কমতে থাকে ততই আয় বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি হারে কর ধার্য করতে হয়,—এতে কর-প্রবঞ্চনার পরিমাণ আরও বেড়ে যায় —এইভাবে পাপচক্রটি আবর্তিত হতে থাকে।

৮. ব্যক্তির উপর কর ধার্য করার অন্যতম উদ্দেশ্য হল করভার বণ্টনে সাম্য ও ন্যায্যতা আনয়ন। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ক্রমাগতই

বাড়ছে এবং সম্পদ-বণ্টনে অসাম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালীর উপরে দক্ষতাসহকারে পরিচালিত গতিশীল কর-ব্যবস্থা আরোপিত না হলে দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কিন্তু বেশির ভাগ দেশেই দেখা যায় গতিশীল করনীতি অর্থনীতিক ও সামাজিক অসাম্য দূর করতে পারেনি। বরং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশার লোকের উপর অন্যায় রকমের করভার চাপিয়ে গতিশীল করকে প্রকৃতপক্ষে অধোগতিশীল করা হয়েছে।

৯. গতিশীল কর অসাম্য কমাতে পারে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে নিচের কারণগুলির উল্লেখ করা যায়ঃ

১০. কর-ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে হলে তিনটি প্রধান বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়ঃ (ক) ন্যায্যতা, (খ) অর্থনীতিক ফলাফল, (গ) পরিচালনার দক্ষতা।

১১. ন্যায্যতার দিক থেকে যে কোনো কর-ব্যবস্থাকে সব সময়েই বিশেষ বিশেষ করদাতাশ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে হয়। অর্থনীতিক ফলাফলের দিক থেকে কর-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগ ক্ষুন্ন না হয়। দক্ষতার দিক থেকে কর-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে কর-প্রবঞ্চনার সব ছিদ্রপথ বন্ধ করা যায়। এইসব লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই ক্যালডর ফলপ্রসূ কর-ব্যবস্থার জন্য ৫টি করকে একই সঙ্গে আরোপ করে হিসাব করার কথা বলেন। কর অনুসন্ধান কমিশন ও ক্যালডরের সুপারিশগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার কর-ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার করেছে এবং কয়েকটি নতুন কর প্রবর্তন করেছে (এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হল)।

১৬.১০. ভারত সরকারের বাজেট : রাজস্বের উৎস
Budget of the Government of India : Sources of Revenue

১. কেন্দ্রীয় রাজস্বকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—কর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব।

২. কর-রাজস্বের উৎসগুলি হল ঃ

(১) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কঃ কেন্দ্রীয় সরকরের রাজস্বের সর্বপ্রধান উৎস হল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক। (২) ব্যক্তিগত আয়কর ও কোম্পানি করঃ অ-রেজিস্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠান, অবিভক্ত হিন্দু-পরিবার ও উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর আয়কর ধার্য করা হয়; কোম্পানি কর (বা কর্পোরেশন কর) হল বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর আরোপিত কর। (৩) বাণিজ্য শুল্কঃ বাণিজ্য শুল্ক বলতে আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী শুল্ক উভয়কেই বোঝায়। গুরুত্বের দিক থেকে এ উৎসটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। (৪) মূলধনীলাভ কর, (৫) সম্পদ কর, (৬) দান কর ও (৭) সম্পত্তি কর। এই করগুলি থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

৩. কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসগুলি হল ঃ

(১) রেল পরিবহণ, (২) ডাক ও তার বিভাগ, (৩) সরকারী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা, (৪) বিভিন্ন ঋণের উপর সুদ বাবদ প্রাপ্তি, (৫) সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্তি। অতীতের তুলনায় কর-বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণও ক্রমেই বাড়ছে।

১৬.১১. কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট
The Union Budget

১. **বাজেট রচনা, পেশ ও অনুমোদনের পদ্ধতিঃ** (ক) ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্যসরকারের বাজেট দু'টি অংশে বিভক্ত, যথা আয় (receipt) ও ব্যয় (disbursements)। প্রতিটি অংশ আবার দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা চলতি (revenue) খাত ও মূলধনী (capital) খাত। চলতি খাতে থাকে চলতি আয় ও ব্যয়; মূলধনী খাতে থাকে মূলধনী প্রকৃতির আয় ও ব্যয়। চলতি খাতে আয় হল কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব; চলতি খাতে ব্যয়ের মধ্যে থাকে সাধারণ প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, সামাজিক ও অর্থনীতিক সেবামূলক বিবিধ ব্যয়। মূলধনী খাতে আয়ের মধ্যে থাকে ঋণ পরিশোধ বাবদ আদায়, নতুন ঋণ প্রভৃতি, মূলধনী খাতে ব্যয়ের মধ্যে থাকে সাধারণ প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, সামাজিক ও অর্থনীতিক সেবা প্রভৃতি খাতে মূলধনী ব্যয়।

(খ) বাজেটের আয় ও ব্যয়ের দিকে তিনটি করে কলম বা স্তম্ভ থাকে। প্রথম কলমে দেখান হয় বিগত বৎসরের প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় বা বর্তমান বৎসরের বাজেট বরাদ্দ; দ্বিতীয় কলমে থাকে চলতি বা বর্তমান বৎসরের সংশোধিত আয় ও ব্যয়; এবং তৃতীয় কলমে থাকে আগামী বৎসরের আনুমানিক আয় ও ব্যয়।

(গ) কেন্দ্রে ও রাজ্যে অর্থমন্ত্রীদপ্তর বাজেট রচনা করে এবং অর্থমন্ত্রী লোকসভায় ও বিধানসভায় ওই বাজেটটি সাধারণত ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে পেশ করেন। তখন একবার সামগ্রিক ভাবে এবং আরেকবার দফাওয়ারী বিভিন্ন দপ্তরের জন্য বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। ওই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তর সম্পর্কে অভিযোগ ও আলোচনা করা হয়। বাজেটটির উপর ভোট নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তরের ব্যয়মঞ্জুরির জন্য একটি অর্থবিল (finance bill) পাস করা হয়। এর দ্বারা নতুন করের প্রস্তাবগুলি পাস হয়। তারপর ওই

অনুমোদিত বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দেবার উদ্দেশ্যে একটি ব্যয়মঞ্জুরীর বিল (appropriation bill) পাস করা হয়। এই ভাবে সংসদে ও বিধানসভায় বাজেটটি পাস না হলে বাজেটের প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা যায় না। জিনিস, ইস্পাত, লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর। অন্যদিকে কম রোজগারী মানুষদের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত আয়কর রেহাইয়ের স্তর এখনকার বাৎসরিক ১৮,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২,০০০ টাকা করা হয়েছে। এর

১৬.১২. কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট : ১৯৯০-৯১ The Union Budget 1999-91

এক নজরে ১৯৯০-৯১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট
(কোটি টাকার হিসাব)

	১৯৮৭-৮৮ সালের প্রকৃত হিসাব	১৯৮৮-৮৯ সালের সংশোধিত বাজেট	১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট	১৯৯০-৯১ সালের বাজেট
রাজস্ব আয়	৩৭,২৩০	৪৩,১৪০	৫২,৬৩০	৫৭,৯৩৮
রাজস্ব ব্যয়	৪৬,৩৭০	৫৫,১৭০	৫৯,৬৪০	৭০,৯৭০
রাজস্ব ঘাটতি	৯,১৪০	১১,০৩০	৭,০১০	১৩,০৩২
মূলধনী আয়	২২,০৩০	২৪,৭১০	২২.১৯০	২৯,৩৯১
মূলধনী ব্যয়	১৮,৭১০	২১,৬২০	২২,৫২০	২৩,৫৬৫
মোট আয়	৫৯.২৬০	৬৭,৫৭০	৭৪,৮২০	৮৭,৩২৯
মোট ব্যয়	৬৫,০৮০	৭৬,৭৯০	৮২,১৬০	৯৪,৫৩৫
সামগ্রিক ঘাটতি	৫,৮২০	৯,২২০	৭,৩৪০	৭,২০৬
কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নীট ঋণ	৫,৮২০	৯,২২০	৭,৩৪০	৭,২০৬

১৯শে মার্চ, ১৯৯০ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে ভারতের লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ করেন। জাতীয় মোর্চা সরকারের এটাই হল প্রথম বাজেট। মোর্চা সরকারের এই প্রথম বাজেটে বেশ কিছু কর প্রস্তাবের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধক নানা ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে কালো টাকার প্রসার রুখতে বেশ কিছু ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। এই বাজেটে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কার্যসূচির উপর। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকেও এই বাজেটে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। গরিব কৃষক, হস্তশিল্পী, তন্তুজীবীদের ঋণ মকুবের ব্যবস্থাও করা হয়েছে এই বাজেটে।

১৯৯০-৯১ সালের এই বাজেটে ১,৯৫৯ কোটি টাকার নতুন কর বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৭,২০৬ কোটি টাকা হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। বাজেটে অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছে পেট্রল, ডিজেল, সিগারেট, রেফ্রিজারেটর, কিছু ইলেকট্রনিক্স্

ফলে কমপক্ষে দশলক্ষ মানুষ আয়করের হাত থেকে রেহাই পাবে। এ ব্যবস্থার ফলে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ক্ষতি হবে ২৫০ কোটি টাকা। তবে কোম্পানি করের ক্ষেত্রে যে পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়েছে তাতে বাড়তি আয় হবে ৮০০ কোটি টাকা।

সাধারণ পোস্টকার্ড ও রেজিস্টার্ড সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দামের কোন রকম রদবদল করা হয়নি বটে তবে ছাপানো পোস্টকার্ড, ইনল্যাণ্ড ও সাধারণ চিঠি, বুকপোস্ট ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। দান করের ক্ষেত্রে এখন থেকে কর দেবার দায় চাপবে গ্রহীতার উপর।

এই বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো স্বর্ণ আইন প্রত্যাহার। সীমান্ত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫,৭৫০ কোটি টাকা।

এবারের বাজেটে বিলাসদ্রব্যের উপর বেশি হারে কর বসানো হয়েছে। যেমন মোটর গাড়ির উপরে অন্তঃশুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। নতুন কর বসানো হয়েছে ওয়াশিং মেশিন, মোটর সাইকেল,

আধুনিক রান্নার মেশিন, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার, ইলেকট্রনিক গেম্‌স্‌, বার্নিশ, রং ইত্যাদির উপর। নতুন কর বসানোর ফলে পেট্রলের দাম লিটার পিছু কমপক্ষে ৮'৫০ পয়সায় দাঁড়াবে। অন্যদিকে, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়নি। লোহা ও ইস্পাতের উপর অন্তঃশুল্ক বাড়ানো হয়েছে। স্টেইনলেস্‌ স্টীলের দাম বাড়বে টন পিছু ৫০০ টাকা। এ্যালুমিনিয়ম পিণ্ডের দাম টন পিছু বাড়বে ৩,৫০০ টাকা।

অর্থমন্ত্রী দণ্ডবতে কফি, রেপসীড ও সরষের তেল, আচার, কীটনাশক, সমুদ্রজাত দ্রব্য, জীবনদায়ী ঔষধ ও হোমিওপ্যাথী ঔষধের ক্ষেত্রে অন্তঃশুল্কে কিছু ছাড় ঘোষণা করেছেন। স্ট্যাণ্ডার্ড নিউজপ্রিণ্টের আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে টন প্রতি ১০০ টাকা। অপরিশোধিত তেলের উপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে আদায় করা হবে অতিরিক্ত ৮৩৬ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অভিযোগ করেছেন, তাদের মুনাফার অনুপাতে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি কর দেয় না। তাই করের জাল থেকে কোম্পানিগুলি যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে সেদিকে দণ্ডবতে নজর দিয়েছেন। তার ফলে ইনভেস্টমেণ্ট এ্যালাউন্স ও ইনভেস্টমেণ্ট ডিপোজিট এ্যাকাউণ্টের মত উৎসাহ প্রকল্পগুলিকে দণ্ডবতে রদ করে দিয়েছেন।

কালো টাকার প্রসার রোধ করার জন্য অর্থমন্ত্রী কড়া ব্যবস্থা নেবার কথা বলেছেন। তাই কর-ফাঁকিদাতা ও কালোটাকার লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য অর্থনীতির গোয়েন্দা ব্যুরোকে ঢেলে সাজানোর কথা তিনি বলেছেন। এর ফলে অর্থনীতিক অপরাধীদের পক্ষে বেনামী ধনসম্পত্তি রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ট্যারিফ-কাঠামো সরল ও যুক্তিসঙ্গত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কর-ফাঁকির সুযোগ সীমিত করা এবং সস্তা দামের কাপড়ের জন্য কম হারে শুল্কের ব্যবস্থা করা।

অনাবাসী ভারতীয়রা যাতে তাঁদের অর্থ এদেশে সহজে বিনিয়োগ করতে পারেন তার জন্য নিয়মকানুন সরল করার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। কর্মসংস্থানের জন্য বড় ধরনের উদ্যোগের ব্যবস্থা করার কথা বাজেটে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণের জন্য নতুন সূত্রের। মূল্য পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট কমিটি স্থাপনের কথাও বাজেটে বলা হয়েছে। তা ছাড়া তেলের আমদানির জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যয় কমাবার প্রয়োজনীয়তার কথাও অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বিশেষ গুরুত্ব-সহকারে উল্লেখ করেছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট পেশ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী কংগ্রেস (আই) সরকারের সমালোচনা করে বলেন, সপ্তম যোজনায় (১৯৮৫-৯০) 'লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের' অন্যতম ক্ষেত্রটি হলো ঘাটতি ব্যয়। দণ্ডবতে বলেন, সপ্তম যোজনায় ঘাটতি দেখানো হয়েছিল ১৪,০০০ কোটি টাকা। বাস্তবে তা দাঁড়ায় দ্বিগুণেরও বেশী। অর্থমন্ত্রী বলেন, অপর এক বড় সমস্যা হল বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি। বহুল ব্যবহৃত দ্রব্যাদির আমদানি বৃদ্ধিই এর কারণ।

দণ্ডবতে বলেন, ১৯৮৯-৯০'র বাজেটে প্রস্তাবিত হিসাবের তুলনায় অতিরিক্ত খরচ হয়েছে ৫,৬২০ কোটি টাকা। ১৯৯০-৯১'র বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে অতিরিক্ত ১,৫০০ কোটি টাকা। সারে ভরতুকি বাবদ অতিরিক্ত ৯৫০ কোটি টাকা এবং খাদ্যের ভরতুকি বাবদ অতিরিক্ত ২৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারী ঋণের উপর সুদবাবদ ব্যয় হবে ৭১০ কোটি টাকা। এ ছাড়া, সরকার ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের অন্তর্বর্তী সাহায্য বাবদ ৩২০ কোটি টাকা ব্যয় করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাজেটে আয় খাতে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ ৫৯৯ কোটি টাকা এবং আয়কর বাবদ ৭৫৫ কোটি টাকা আদায় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এ ছাড়া, ১৯৬৩ সালে প্রবর্তিত স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন তুলে দেবার প্রস্তাবও বাজেটে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯০-৯১'র বাজেটে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩৯,৩২৯ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় এই পরিমাণ ৪,৮৮৩ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৪'২ শতাংশ বেশি। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট বরাদ্দ থেকে আসবে ১৭,৩৪৪ কোটি টাকা, বাকী ২১,৯৮৫ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও ঋণ সংগ্রহ থেকে।

বাজেটে বিভিন্ন খাতে প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ হল ঃ প্রতিরক্ষা-১৫,৭৫০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ উৎপাদন— ৫,৯১৭ কোটি টাকা, কৃষি ও সমবায়-৯০৩ কোটি টাকা, গ্রামোন্নয়ন —৩,১১৫ কোটি টাকা, তপসিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ—৩২০ কোটি টাকা, শিক্ষা— ৮৬৫ কোটি টাকা, নগর উন্নয়ন—২৭২ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ—৯৫০ কোটি টাকা।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ২২'৯ শতাংশ বাড়িয়ে ১২,৮৪৮ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচ ধরা হয়েছে ৬৪,৫১৫ কোটি

টাকা। এর মধ্যে সুদ বাবদ অনুমিত ব্যয় ৯০-৯১ সালে ২০,৮৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে হিসাবে ধরা হয়েছে। বহির্ভূত রাজস্ব ১৪,২৪০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। নিচে পরিকল্পনার ৩৯ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি খাতে

১৯৯০-৯১ বাজেটে প্রতি টাকায় আয়-ব্যয়ের হিসাব

টাকা প্রতি আয়	পয়সা	টাকা প্রতি ব্যয়	পয়সা
উৎপাদন শুল্ক	২২	কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা	১৫
আমদানী-রপ্তানী শুল্ক	১৯	সুদ	১৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৩	প্রতিরক্ষা	১৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১০	করের অংশ	১৩
ঘাটতি	০৬	অন্যান্য পরিকল্পনা	১৩
অন্যান্য মূলধনী আয়	০৪	বহির্ভূত ব্যয়	১৩
করপোরেশন ট্যাক্স	০৫	রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দেয় সহায়তা	১১
আয়কর	০৫	ভরতুকি	০৯
বৈদেশিক সাহায্য	০৪	পরিকল্পনা বহির্ভূত সহায়তা	০৩
অন্যান্য কর	০২	ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে	০৪
মোট	১০০ পয়সা		১০০ পয়সা

১৬.১৩ কেন্দ্রীয় রাজস্বের উৎস
Sources of the Union Revenues

১. কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের মুখ্য খাত দু'টিঃ (ক) মূলধনী খাত, এবং (খ) চলতি খাত।

২. মূলধনী খাতে আয়ের উৎস হল : (ক) ঋণের আদায়, নীট বাজার ঋণের আদায়, নীট বিদেশী ঋণের আদায় এবং স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফান্ডের আদায় ও রিজার্ভ ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ ইত্যাদি। ১৯৯০-৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনী খাতে মোট আদায় হবে ২২,৩৯১ কোটি টাকা।

৩. চলতি খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় দুটি ভাগে বিভক্ত : (ক) কর-রাজস্ব এবং (খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কর-রাজস্ব প্রধানত তিন রকমের : (ক) আয় কর এবং (খ) সম্পত্তি ও মূলধনী লেনদেনের কর এবং (গ) পণ্য ও সেবা কর। কর-বহির্ভূত রাজস্ব চার রকমের : (ক) মুদ্রা, নোট ও টাকশাল থেকে আয় ; (খ) সুদ ও লভ্যাংশ ; (গ) অন্যান্য কর-বহির্ভূত আয় এবং (ঘ) অনুদান প্রভৃতি। ১৯৮৯-৯০ সালের বাজেটে মোট কর-রাজস্ব ৩৮,৩৯০ কোটি টাকা (নতুন কর বাদে) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ১৪,২৪০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। নিচে পরিকল্পনার ৩৯ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি খাতে মোট রাজস্বের বৃদ্ধিটি দেখান হল।

সারণি ১৬-৪ : চলতি খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব (কোটি টাকায়)

	১৯৫০-৫১ (প্রকৃত আদায়)	১৯৮৯-৯০ (বাজেট)
রাজ্যগুলির অংশ বাদে কেন্দ্রের নীট কর-রাজস্ব	৩৫৭	৩৮,৩৯০
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	৪৯	১৭,২৪০

৪. **আয়কর :** আয়কর দুই প্রকার : আয়কর ও কোম্পানি কর। কেন্দ্রীয় সরকার অ-রেজিস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান, অবিভক্ত হিন্দু-পরিবার ও ব্যক্তির উপর আয়কর আরোপ করে। ব্যক্তিগত আয়কর থেকে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হয়। সমাজের সকল ব্যক্তিকেই আয়কর দিতে হয় না। যারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করে (বর্তমান বার্ষিক ব্যক্তিগত ২২ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় আয়কর মুক্ত করা হয়েছে) কেবল তাদেরকেই আয়কর দিতে হয়। আয়কর একটি প্রগতিশীল কর। অর্থাৎ, যাদের আয় যত বেশি হবে, তারা তত বেশি হারে আয়কর দেবে। আয় বাড়লে কর দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়ে। সুতরাং আয়কর

"কর দেওয়ার ক্ষমতা" তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৯ সালের আয়কর আইনের দ্বারা 'ধাপ প্রথার' (Step system) পরিবর্তে স্ল্যাব প্রথার (Slab system) প্রবর্তন করা হয়। ধাপ প্রথা অনুযায়ী সমগ্র আয়ের উপর একই হারে কর ধার্য করা হত। কিন্তু স্ল্যাব প্রথায় উচ্চতর স্ল্যাবগুলিতে উচ্চতর হারে কর ধার্য করা হয়ে থাকে। এই প্রথায় আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বিত্তবানদের নিকট থেকে অধিক অর্থ আদায় করা যায় এবং দরিদ্রদের কিছুটা ত্রাণের ব্যবস্থা করা যায়।

ভারতের আয়কর আইনে উপার্জিত এবং অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। উপার্জিত আয়ের উপর উদারতার সাথে কর ধার্য করা হয়।

রাজস্বের একটি স্থিতিস্থাপক উৎস আয়কর। কারণ, দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য যত প্রসারিত হবে ততই সমাজের ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি পাবে। তাতে আয়কর রাজস্বের সংগ্রহ বেশি হবে। ভারত সরকারের বাজেটে দেখা যায় ব্যক্তিগত আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে, গত ৩৫ বৎসরে আয়কর-রাজস্ব চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও দেখা যায়, ১৯৫০-৫১ সালে মোট কর-রাজস্বের ৩৫% সংগৃহীত হত আয়কর থেকে, এই অনুপাত ১৯৮৯-৯০ সালে ১৯%-এ নেমে এসেছে। আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়।

সারণি ১৬-৫ : কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর রাজস্ব (কোটি টাকায়)

	১৯৫০-৫১ (প্রকৃত আদায়)	১৯৮৯-৯০ (বাজেট)
ব্যক্তিগত আয়কর	১৪০	৪,২৬০
বাদ রাজ্যগুলির অংশ	৫০	৩,১৩০
ব্যক্তিগত আয়কর থেকে কেন্দ্রের নীট আয়	৯০	১,১৩০
কোম্পানি কর	৪০	৪,৭৬০

কোম্পানীর আয়কর (অর্থাৎ কর্পোরেশন কর বা কোম্পানি কর) হল বড় বড় শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর আরোপিত কর। এর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের সবটুকুই কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্যগুলি এর অংশ পায় না। কোম্পানি কর থেকে সংগৃহীত আয়কর রাজস্বের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, ১৯৫০-৫১ সালে এ সূত্রে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে সেটা ৬,০৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। অর্থাৎ, এ সূত্র থেকে রাজস্ব ৪০ বৎসরে প্রায় ১৫২ গুণ বেড়েছে।

৫. **পণ্য ও সেবা কর : (ক) বাণিজ্য শুল্ক :** বাণিজ্য শুল্ক বলতে আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী শুল্ক এই দু'টিকেই বোঝায়। এদের মধ্যে আমদানী শুল্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০-৯১ সালে বাজেটে আমদানী-রপ্তানী শুল্ক থেকে ২১,৪৬০ কোটি টাকা আদায় হবে বলে ধরা হয়েছে। রপ্তানী শুল্ক যুদ্ধ পরবর্তীকালেই (বিশেষ করে ১৯৪৯ সালে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরবর্তীকালে) গুরুত্ব লাভ করে রাজস্বের সূত্র হিসাবে আমদানী শুল্ক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেও এই শুল্ক ব্যবহার করা হয়।

বাণিজ্য শুল্কের ফলে সাধারণত ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের অসুবিধা বেশি হয়,—এ কারণে এটা ন্যায়-নীতির বিরোধী। ভারত সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টার মতে আমদানী শুল্ক সাধারণত ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্যের উপরে অত্যধিক, বিলাসদ্রব্যের উপরে তুলনামূলকভাবে কম এবং পুঁজিদ্রব্য ও কাঁচামালের উপরে সর্বাপেক্ষা কম চাপ সৃষ্টি করে।

ভারত সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের অন্যতম সূত্র হল বাণিজ্য শুল্ক। বিভিন্ন সময়ে সরকার যখনই আর্থিক অসুবিধায় পড়েছে, বাণিজ্য শুল্ক সরকারকে ঐ অসুবিধা দূর করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ভারত যতই শিল্পোন্নত হতে থাকবে, রাজস্বের প্রধান সূত্র হিসাবে বাণিজ্য শুল্কের উপর নির্ভরশীলতা ততই কমে আসবে। তখন বেশি করে নির্ভর করতে হবে অন্তঃশুল্কের উপরে।

সারণি ১৬-৬ : কেন্দ্রীয় সরকারের পণ্য কর-রাজস্ব ([illegible] টাকায়)

	১৯৫০-৫১ (প্রকৃত আদায়)	[illegible]০ [illegible]
বাণিজ্যশুল্ক	১৫৫	[illegible]
কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক	৬৮	[illegible]
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অন্তঃশুল্ক		[illegible],৮০০
বাদ রাজ্যগুলির অংশ		৮,৩১০
কেন্দ্রের নীট অন্তঃশুল্ক বাবদ রাজস্ব	৬৮	[illegible]২,২৫০

সূত্র : Budget at a Glance, 1989-90,

(খ) **কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক :** কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রধান সূত্র হল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক। এই সূত্র থেকে সংগ্রহের পরিমাণ ১৯২০-২১ সালের ৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৯-৯০ সালে মোট ২২,৭০০ কোটি টাকা হয়েছে ও রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে নীট ১৩,৩৯০ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে।

প্রতি বৎসর সরকারী বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা আনার প্রয়োজন হয়। তাই সরকার নতুন নতুন দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসাচ্ছে। আবার কোনো কোনো

পুরাতন অন্তঃশুল্কের হার বাড়াচ্ছে। ১৯৩৪ সালে চিনি, দিয়াশলাই ও ইস্পাত পিণ্ডের উপর এই শুল্ক বসান হয়। বর্তমানে মিলের সুতীবস্ত্র, তামাক, মোটর গাড়ির তেল, সিমেন্ট, কেরোসিন, বৈদ্যুতিক পাখা, বালব, কাগজ, পশমবস্ত্র, মোটর গাড়ি ইত্যাদি অনেক দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসান হয়েছে। এর কারণ হিসাবে অবশ্য বলা হয়েছে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য নতুন নতুন দ্রব্যের উপর এই শুল্ক বসাতে হচ্ছে।

অন্তঃশুল্ক রাজস্ব সংগ্রহের একটি স্থিতিস্থাপক (elastic) উৎস। ফলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই উৎসের মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এ কারণে এই শুল্ক সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের একটি স্থায়ী নির্ভরযোগ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে আপন স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক ভারতের অর্থনীতিতে সরকারকে বাধ্য হয়েই রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই শুল্কের উপর ক্রমশই অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হচ্ছে। ভারত সরকারের রাজস্বের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা একটি তথ্য থেকে বোঝা যাবে : ১৯৫০-৫১ সালে মোট কর-রাজস্বের ১৯% পাওয়া যেত কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক থেকে ; আর ১৯৮৯-৯০ সালে প্রায় ৯০% এসেছে ঐ উৎস থেকে। অবশ্য অন্তঃশুল্কের উপর সরকারের এত বেশি নির্ভর না করে উপায়ও নেই। কারণ, দেশে যতই শিল্পায়নের অগ্রগতি হবে ততই আমদানি কমতে থাকবে। এতে বাণিজ্য শুল্ক থেকে রাজস্ব আদায় কম হবে। অপরদিকে দেশের শিল্পজাত দ্রব্য যত বেশি উৎপন্ন হতে থাকবে ততই অন্তঃশুল্কের মাধ্যমে আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বস্তুতঃপক্ষে, দেশের কর-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করতে হলে অন্তঃশুল্কের ভিত্তিরও সম্প্রসারণ করা দরকার। তবে মনে রাখা দরকার, দিয়াশলাই, কেরোসিন ও মিলের মোটা কাপড় ইত্যাদির উপর অন্তঃশুল্ক কর-ব্যবস্থার অধোগতিশীলতারই পরিচায়ক। কেন না সাধারণভাবে দরিদ্র ব্যক্তিরাই এই ধরনের অন্তঃশুল্কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিলাসদ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক : ফলাফল : দেশের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর যে কর (শুল্ক) বসান হয় তাকে অন্তঃশুল্ক বলে। রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজনে আধুনিককালে অন্য দেশের সরকারের মত ভারত সরকারকেও অন্তঃশুল্কের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হচ্ছে।

অন্তঃশুল্ক একটি পরোক্ষ কর। দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদক বা বিক্রেতার উপর অন্তঃশুল্ক বসান হলেও আসলে এরা কিন্তু অন্তঃশুল্কের ভার বহন করে না। এর কারণ হল, তারা ক্রেতাদের উপর করভার চালনা করে দেয়। ফলে, শেষ পর্যন্ত ক্রেতাদের করভার বহন করতে হয়। পরোক্ষ কর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের উপরই সমান হারে বসে। দ্রব্যসামগ্রীর উপর অন্তঃশুল্ক বসান হলে ধনী বা দরিদ্র যে-ই হোক না কেন সকলকেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের উপর সমান হারে কর দিতে হয়। জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর অন্তঃশুল্ক বসান হলে বিত্তবান অপেক্ষা বিত্তহীনদেরই আর্থিক অসুবিধা হয় বেশি, তারাই হয় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক অধোগতিশীল। বণ্টনগত দিক থেকে বিচারে বলা যায় এ ধরনের অন্তঃশুল্ক সামাজিক সাম্য ও ন্যায় নীতির বিরোধী। তার কারণ, হিসাবে বলা যায়, "কর প্রদান ক্ষমতা নীতি"-র সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর আরোপিত অন্তঃশুল্কের কোনো সঙ্গতি থাকে না। যাদের আয় কম বলে করপ্রদানের ক্ষমতাও কম তারাই অন্তঃশুল্কের মাধ্যমে তুলনায় বেশি কর দিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, বিত্তবানেরা তুলনায় কম কর দিয়েই রেহাই পেয়ে যায়।

কিন্তু বিলাসদ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসান হলে তার চাপ যে বিত্তবানের উপরেই পড়ে এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করাই বিত্তহীনের সীমিত আয়েরদ্বারা সম্ভব হয় না। তাই তাদের কাছে বিলাসদ্রব্য ক্রয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিলাসের ভোগ্যদ্রব্য কেনে একমাত্র ধনীরাই। তাই এসব দ্রব্যের উপর চড়াহারে অন্তঃশুল্ক বসান হলে ধনী ব্যক্তিরাই চড়া দামে ঐসব দ্রব্য কিনতে বাধ্য হয়। ধনীদের সামাজিক পদমর্যাদা, আভিজাত্যবোধ, আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির জন্য অন্তঃশুল্কের হার খুব চড়া হলেও বিত্তবানদের ঐ সব দ্রব্য কিনতেই হয়। তাই এ ধরনের অন্তঃশুল্কে আর্থিক চাপ ধনীদের উপরেই পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, টেলিভিশন সেট, রেডিও সেট, ফ্রীজ, মোটরগাড়ি, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, সুগন্ধিদ্রব্য—এগুলির ক্রেতা প্রধানতঃ ধনীরাই। এসব দ্রব্যের উপর চড়া হারে অন্তঃশুল্ক বসান হলে দরিদ্রদের তাতে কিছু যায় আসে না। অথচ, চড়া হারে কর বসান হলেও আমাদের দেশের বর্তমান নব্যধনীশ্রেণীর লোকদের পক্ষে টেলিভিশন সেট না কিনে উপায় নেই। কারণ এখন টেলিভিশন সেট হচ্ছে আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক (status symbol)। আজ ধনীর ঘরে টেলিভিশন সেট না থাকাটা তাদের পক্ষে লজ্জার কথা। হীনমন্যতাবোধে তারা পীড়িত হবে। তাই টেলিভিশন সেটের উপর যদি অত্যাধিক চড়া হারে অন্তঃশুল্ক বসে তাতেও ধনীরা দমিত হবে না। তাদের ঐ সেট কিনতেই হবে।

পরিশেষে এ কথা বলা যায়, বিলাসের ভোগ্যপণ্যের উপর অত্যধিক চড়া হারে অন্তঃশুল্ক বসানই উচিত। অন্যদিকে দরিদ্রদের নিষ্কৃতি দেবার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর থেকে যতটুকু সম্ভব অন্তঃশুল্ক তুলে নেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া দরকার।

মূলধনীলাভ কর : ১৯৪৭ সালে মূলধনীলাভ কর প্রথম প্রবর্তিত হয়। ব্যবসায়ী মহল তীব্রভাবে এই করের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার ফলে ১৯৪৯ সালে এ কর রদ করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ক্যালডরের সুপারিশে এর পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

মূলধনী লাভ কাকে বলে? দ্রব্যসামগ্রীর দৈনন্দিন নিয়মিত ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা যে মুনাফা হয় সেটা সাধারণ লাভ। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে এর উপরে আয়করদিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকতে পারে যা তাদের দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়বস্তু নয় অথচ, ঐ সকল সম্পত্তির বাজার দর বৃদ্ধির দরুন কখনও সেটা বিক্রয় করলে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার ক্রয়মূল্য থেকে বেশি হতে পারে। **সম্পত্তি বিক্রয়ের দরুন মালিক এরূপ যে আকস্মিক মুনাফা উপার্জন করে সেটাই মূলধনীলাভ।** সাধারণ লাভ থেকে এটা পৃথক, কারণ, এটা অনিয়মিত। এরূপ আকস্মিক বা অনিয়মিত লাভের উপরে করকে মূলধনী-লাভ কর বলা হয়।

সারণি ১৬ ৭ : সম্পত্তি ও মূলধনী লেনদেনের কর-রাজস্ব
(কোটি টাকায়)

	১৯৫০-৫১ (প্রকৃত আদায়)	১৯৮৯-৯০ (বাজেট)
সম্পত্তি কর		১২০
সম্পদ কর	...	১০
অন্যান্য কর		৫০
মোট		১৮০
নীট কেন্দ্রীয় রাজস্ব	...	১৮০

মূলধনীলাভ করের পক্ষে যুক্তি : ভারতে মূলধনীলাভ করের সপক্ষে যুক্তি হল : ১. অন্যান্য আয়ের মত মূলধনী-লাভ আয় বাড়ায়। সুতরাং এতে করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অতএব মূলধনীলাভকে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত নয়। ক্যালডরের মতে ভারতে যে হারে অর্থনীতিক উন্নয়ন সংঘটিত হচ্ছে তাতে বিপুল পরিমাণে মূলধনীলাভ হতে থাকবে। শেয়ার মূলধনের লাভ এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক হবে বলে তিনি মনে করেন। এমতাবস্থায় মূলধনীলাভকে কর-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ২. মূলধনীলাভকে কর-বহির্ভূত রাখলে করদাতারা তাদের অন্যান্য আয়কে ঐ প্রকারের কর-বহির্ভূত আয় হিসাবে দেখাতে পারে। এতে কর আদায়কারী কর্তৃপক্ষের অসুবিধা হতে পারে এবং কর-ফাঁকিদাতাদের উৎসাহ দেওয়া হবে। ৩. উন্নয়ন-মূলক কাজে সরকারের বিপুল পরিমাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সূত্র থেকে অর্থসংগ্রহ করতে হয়। মূলধনী লাভের উপরে কর ধার্য করা এদিক থেকে অপরিহার্য।

মূলধনীলাভ করের বিপক্ষে যুক্তি : ১. এই কর প্রবর্তনের ফলে কর-ব্যবস্থায় নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়, অথচ এই কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ স্বল্প।

২. এই কর ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উৎসাহ কমিয়ে দেয়।

৩ শিল্পোন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হল মূলধনের বাজারে ঋণপত্রের অবাধ গতিশীলতা মূলধনীলাভ কর এই গতিশীলতাকে ব্যাহত করে শিল্পোন্নয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

৪ কর অনুসন্ধান কমিশন মনে করেন যে, মূলধনী লাভ কর কর-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহিত করে। কারণ কর দাতারা কর-ধার্যোপযোগী আয়কে (taxable income) মূলধনীলাভের অন্তর্ভুক্ত করে দেখাবার চেষ্টা করবে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই দেখা যায়, মূলধনী লাভ করের বিপক্ষে যুক্তি অপেক্ষা সপক্ষে যুক্তিগুলি বেশি জোরালো। এ কারণে মূলধনীলাভ কর প্রবর্তন করা সব দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

ভারতের মূলধনীলাভ করের বৈশিষ্ট্য : ১৯৫৬ সালের মূলধনী লাভ করের অব্যাহতির সীমা ছিল ৫,০০০ টাকা। মূলধনীলাভ সহ মোট আয়, ১০,০০০ টাকার অধিক না হলে কর ধার্য হবে না। কর নির্ধারণের হিসাব হবে এরূপ : কোনো বিশেষ বৎসরে যত মূলধনীলাভ হবে তার ⅓ অংশ কর-ধার্যোপযোগী আয়ের সাথে যুক্ত হলে প্রচলিত আয়করের যে হার ঐ আয়ের উপর ধার্য করা হয়, মূলধনী লাভের উপর করের হার তাই হবে। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো ব্যক্তির এক বৎসরের মোট আয় ২০,০০০ টাকা এবং সেই বৎসরের মূলধনীলাভ ১৫,০০০ টাকা, এই ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকার মূলধনীলাভের উপরে ধার্য করের হার হবে ২৫,০০০ টাকার [২০,০০০+(১৫,০০০÷৩)] উপরে প্রচলিত আয়করের হারের অনুরূপ।

১৯৬৪-৬৫ সালে বাজেটে এই করের কিছু পরিবর্তন করা হয়। তদনুসারে স্বল্পকালীন মূলধনীলাভ (অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে যে মূলধনীলাভ হয়েছে) আয় হিসেবে পরিগণিত হত এবং অনুপার্জিত আয়ের মত এর উপরেও সারচার্জ (surcharge) ধার্য হত। দীর্ঘকালীন মূলধনী-

লাভের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল হারে কর ধার্য হত। বর্তমানে এই পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির মোট আয়ের উপরে যে হারে কর ধার্য হয় তার গড়ের ৭৫% হিসাবে জমি ও বাড়ি থেকে প্রাপ্ত মূলধনীলাভের উপরে কর দিতে হয়। আর অন্যান্য মূলধনীলাভের ক্ষেত্রে উক্ত গড়ের ৫0% হিসাবে কর দিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত হারেই কোম্পানি-সমূহের মূলধনীলাভের উপর কর ধার্য হয়। কিন্তু কোম্পানির জমি ও বাড়ি থেকে লব্ধ মূলধনীলাভের উপর অতিরিক্ত কর (super tax) ৫% থেকে বেড়ে ১৫% করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর ৫%। কোম্পানির অংশীদারদের শেয়ারের উপর প্রদত্ত বোনাসকে মূলধনী-লাভ করের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৬৫ সালের ফিন্যান্স অ্যাক্টে বলা হয় যে, কোনো অধীন কোম্পানি তার সম্পূর্ণ মালিক (১00 শতাংশ শেয়ারের)—ভারতে অবস্থিত তার মালিক কোম্পানির কাছে তার মূলধনী বিত্ত (ক্যাপিট্যাল অ্যাসেটস্) হস্তান্তর করলে তার উপর মূলধনীলাভ কর প্রযোজ্য হবে না।

১৯৭২-এর ফিন্যান্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যক্তিগত ব্যবহারের জড়োয়া গহনা প্রভৃতি থেকে মূলধনীলাভ হলে ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে তার উপর প্রচলিত হারে মূলধনী-কর দিতে হবে।

(খ) **সম্পদ কর :** ক্যালডরের সুপারিশে ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় সম্পদ কর অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথিবীর বহুদেশেই সম্পদ কর প্রচলিত আছে। ভারতে ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবারে এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদের উপর এই কর ধার্য করা হয়। ক্যালডরের মূল সুপারিশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উপর এই কর ধার্য করার কোনো কথা ছিল না। পরে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে এই কর তুলে দেওয়া হয়। কর অব্যাহতির সীমা হল এরূপ : ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে কৃষিসম্পত্তিকেও সম্পদ করের অধীনে আনা হয়েছে।

সম্পদ করের বিরুদ্ধে যুক্তি : সম্পদ করের বিরুদ্ধে যুক্তি হল : ১. সম্পদ কর সঞ্চয় এবং পুঁজিগঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এতে শিল্পায়নের গতি ব্যাহত হয়। ২. সম্পদ কর নির্ধারণের ব্যাপারে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না, তাই এটা অন্যায্য। কারণ উৎপাদনশীল সম্পদ থেকে আয় হয় কিন্তু অনুৎপাদনশীল সম্পদ থেকে কোনো আয় হয় না। এক্ষেত্রে দু'ধরনের সম্পদকে একই হারে করের অন্তর্ভুক্ত করলে তা হবে ন্যায়নীতির বিরোধী। ৩. সম্পদ করের ক্ষেত্রে পরিচালনাগত নানা অসুবিধা দেখা দেয়, যেমন—বিশেষ কোনো সম্পদের প্রকৃত মালিককে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, কিংবা, সম্পদের অর্থমূল্য নিরূপণ করা অসুবিধাজনক।

সম্পদ করের পক্ষে যুক্তি : ক্যালডর সম্পদ করের পক্ষে তিন দিক থেকে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন—ক. ন্যায়, খ. অর্থনীতিক ফলাফল, গ. প্রশাসনিক দক্ষতা।

১ করপ্রদান ক্ষমতার পরিমাপ করতে কেবলমাত্র আয়কে মাপকাঠি ধরলে সেটা ন্যায়বিচারের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য হয় না ; বরং যথার্থ মাপকাঠি হবে বিভিন্ন সূত্রে উপার্জিত আয় এবং বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মালিকানা।

২ আয়করের তুলনায় সম্পদ করের সুবিধা হল এই যে, আয়কর বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি গ্রহণের মনোবৃত্তি ও উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করে, কিন্তু সম্পদ কর তা করে না।

৩. আয়কর এবং সম্পদ কর—এই দু'টি কর একই সঙ্গে প্রবর্তিত হলে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়বে। আবার কোনো করপ্রদানকারীর সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে যেমন তার গোপন আয়ের সূত্র প্রকাশিত হয়েপড়বে, তেমনি তার বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে অপ্রকাশিত সম্পদের কথাও জানা যাবে। এরূপ যুক্ত-ভাবে প্রবর্তিত কর দু'টি করপ্রদানকারীর করপ্রদান ক্ষমতার সঠিক নির্দেশ দেবে এবং কর-প্রবঞ্চনাও কঠিন হয়ে পড়বে।

৪. যে সম্পদ থেকে কোনো আয় হয় না সে সম্পদের উপর কর ধার্য করলে, করপ্রদানকারীর উপর অন্যায় করা হয় বলে যে যুক্তি দেখান হয়েছে, তার উত্তরে ক্যালডর বলেন যে, কোনো বিশেষ সম্পদ থেকে 'আর্থিক আয়' না হলেও অন্য প্রকারের আয় নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র আর্থিক আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের উপরেই কর বসিয়ে, আর্থিক আয় সৃষ্টি করে না এমন সম্পদকে করের বাইরে রাখলে ন্যায় ও নীতির দিক থেকে তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

(গ) **দানকর :** ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ক্যালডরের সুপারিশে দানকর ভারতীয় কর-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্পত্তি দান ক'রে সম্পত্তি কর (মৃত্যু কর) এড়াবার সুপরিচিত পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই কর প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছিল।

দানকরের বৈশিষ্ট্য : ১. দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের আইনের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ছয় অথবা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পাবলিক লিমিটেড

কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির দানের উপরে দানকর বসবে।

২. যে কোনো এক বৎসরে বর্তমানে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দানের উপরে কর দিতে হয় না। সর্বদাই পূর্ববর্তী বৎসরের দানের উপর দেয় করের হিসাব করা হয়। দাতব্য ও অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠানকে আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে তাদের দানকর দিতে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনা ক্ষেত্রগুলিতে দানের জন্য এখন দানকর দিতে হয় না। ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে দানকরের ক্ষেত্রে করের হার সংশোধন করে ৫ শতাংশ থেকে ক্রমশ বাড়িয়ে সর্বাধিক ৭৫ শতাংশ করা হয়েছে।

৩. ভূদান, সম্পত্তিদান, সন্তানদের শিক্ষার জন্য দান, শ্রমিক-কর্মচারীদিগকে বোনাস, অবসর ভাতা ইত্যাদি দান, পেশা, বৃত্তি ও ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে দান, নির্ভরশীল মহিলাদের বিবাহের জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দান ইত্যাদির উপরে দানকর প্রযোজ্য হবে না।

৪. স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দানের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা অবধি কোনো কর দিতে হবে না।

দানকরের পক্ষে যুক্তি : ১. ক্যালডরের মতে সম্পত্তি কর (মৃত্যু কর) ও সম্পদ কর দেশের কর-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলে দানকরের অন্তর্ভুক্তিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেউ সম্পত্তি দান করে যাতে এ কর দু'টি ফাঁকি দিতে না পারে সেই জন্য ক্যালডর একই সঙ্গে দানকর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।

২. সম্পত্তি কর বা উত্তরাধিকার কর (মৃত্যু কর) যে যুক্তিতে প্রবর্তিত হয় ঠিক একই যুক্তিতে দানকরও প্রবর্তন করা উচিত। অর্থাৎ মালিকের মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যদি কর দিতে হয় তবে দানের মাধ্যমে সম্পত্তির যে হস্তান্তর ঘটে তাকে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

৩. কেউ তার উপার্জিত আয়কে দান হিসাবে পাওয়া বলে হিসাবে দেখিয়ে আয়কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলে দানকরের সাহায্যে তা বন্ধ করা যায়।

(ঘ) সম্পত্তি কর (বা মৃত্যু কর) : ১৯৫৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের পার্লামেন্টে সম্পত্তি কর আইন (Estate Duty Act) পাস হয় এবং ঐ বৎসরেরই অক্টোবর মাস থেকে সেটা প্রবর্তিত হয়। ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে এটি বিলোপ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য : ১. সম্পদ বণ্টনের অসাম্য দূর করা; ২. মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদের কেন্দ্রীভবন বন্ধ করা; ৩. রাজ্য গুলির আর্থিক ভিত্তিতে দৃঢ়তা আনা; ৪. রাজ্যগুলির উন্নয়ন ও সমাজ-সেবামূলক কার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থসংস্থান করাই এর উদ্দেশ্য।

পক্ষে যুক্তি : ১ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত বিপুল সম্পত্তি এবং তা থেকে উপার্জিত আয় যা দেশের মধ্যে ধনবৈষম্য বাড়াচ্ছে, তা এ করের সাহায্যে কমিয়ে দেশে ধনবৈষম্য হ্রাস করা যায়। ২. এর থেকে আদায়ীকৃত অর্থ ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়। ৩. এ কর ফাঁকি দেওয়া কঠিন। এবং ৪ এটা উৎপাদনকে ক্ষুণ্ণ করে না।

বিরুদ্ধে যুক্তি : এর বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হল এই যে, এটা সঞ্চয়ের উদ্যম ও উৎসাহ নষ্ট করে। সুতরাং এটা দেশের পুঁজিগঠনের পথে বাধা দেয়।

কিন্তু এই করের পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তি বিচার করে ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এ সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সঞ্চয়ের জন্য অন্যান্য নানারূপ সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেমন সঞ্চয়কারিগণকে সঞ্চয় বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া সম্ভব সেরূপ সরকারের পক্ষেও সঞ্চয় করা এবং তা বাড়ান সম্ভব। তা ছাড়া সঞ্চয় ও পুঁজিগঠনের উপর এর প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু ক্ষতিকর হয় না।

১৬.১৪ ধন ও আয় বৈষম্য হ্রাসে ভারতের কর-ব্যবস্থা
The Indian Tax Structure & Reduction in Inequality in Wealth and Income Distribution

১. রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কর বসান হয়। এ ছাড়া আরো একটা সামাজিক ন্যায়ের উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা হয়। সে উদ্দেশ্য হল, সমাজে ধন ও আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্য যতদূর সম্ভব হ্রাস করা। এজন্যই অনেক রকমের প্রত্যক্ষ কর বসাতে হয়। যেমন, আয়কর, মূলধনীলাভ কর, বিলাস দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর ইত্যাদি। আবার এভাবে সংগৃহীত কর-রাজস্বের বেশীর ভাগ প্রধানত দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বার্থে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এখন দেখতে হবে, ভারতের বর্তমান কর-ব্যবস্থা এই সামাজিক লক্ষ্য সাধনে কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে।

২ প্রত্যক্ষ করের মধ্যে দু'টি প্রধান কর—ব্যক্তিগত আয়কর ও কোম্পানির উপর করের কথা ধরা যাক। এ দু'টি কর থেকে মোট কর রাজস্বের ২২% সংগৃহীত হয়। সম্প্রতি আরো কয়েকটি প্রত্যক্ষ কর বসান হয়েছে বটে, তবে এগুলি থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ নগণ্য। সেজন্য ধন বণ্টনে ও আয়ের ক্ষেত্রে অসাম্য হ্রাস করার ব্যাপারে এই নতুন করের অবদান খুব বেশি হওয়া সম্ভব

নয়। এ কথা ঠিক, ভারতে বর্তমান ব্যক্তিগত আয়করের হার বেশি। এ কথাও স্বীকৃত, ধনীর নিকট থেকে প্রচুর অর্থ আয়করের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সরকার দরিদ্রজনের কল্যাণে ব্যয় করতে পারে। কিন্তু, খুব উচ্চহারে ব্যক্তিগত আয়কর ধার্য করা হলে কি হবে? আয়কর সংগ্রহের ব্যাপারে গাফিলতি ও অদক্ষতার জন্য ব্যাপকভাবে এদেশে কর-ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে উচ্চহারে আয়করের দ্বারা যে সামাজিক লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা হচ্ছে, অন্য দিকে কোটি কোটি টাকার আয়কর কর-ফাঁকির ফলে সরকারের রাজকোষে জমা হচ্ছে না। ফলে আসল উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না।

৩ পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গত কয়েক বৎসর ধরে নানা ধরনের পরোক্ষ কর দরিদ্র জনসাধারণকে ক্রমশই বেশি করে ভারাক্রান্ত করছে। বিদ্যুতের উপর অত্যধিক কর, বর্ধিত হারে বিক্রয় কর, পথযাত্রীদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর, জনসাধারণের ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের উপর বর্ধিত হারে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, ডাকমাশুলের বৃদ্ধি, রেলযাত্রীদের উপর অত্যধিক কর—ইত্যাদির ফলে পরোক্ষ কর আরো বেশি অধোগতিশীল হয়ে পড়েছে। এ প্রবণতা ধন ও আয় বৈষম্য হ্রাসের বদলে নিঃসন্দেহে ঠিক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করছে।

৪. সরকারী ব্যয়ও যেভাবে করা হচ্ছে তাতে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি তেমন কিছু হচ্ছে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে অসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তাতে সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য রাজস্বের খুব কমই অবশিষ্ট থাকছে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ভারতের কর-ব্যবস্থা ধন-বণ্টন আয়-বণ্টনে বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে কার্যকর নয়। বরং তা আয় বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।

১৬.১৫. কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়
Expenditure of the Central Government

১. গত ৪০ বৎসর ধরে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে চলতি ও মূলধনী, উভয় খাতেই। সারণি ১৬-৮-এ তা দেখান হল।

সারণি ১৬-৮ : কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় (কোটি টাকায়)

		১৯৫০-৫১ (প্রকৃত ব্যয়)	১৯৯০-৯১ (বাজেট বরাদ্দ)
চলতি খাতে	...	৩৪৬	৭০,৯৭০
মূলধনী খাতে	...	১৮৩	২৩,৫৬৫

সূত্র : Budget at a Glance, 1990-91.

২. বৃদ্ধির কারণ : ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের গতি থেকে দেখা যায় যে, এটা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালে চলতি খাতে মোট ব্যয় ৩৪৬ কোটি টাকা থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালে ৭০,৯৭০ কোটি টাকায় পরিণত হবে বলে বাজেটে ধরা হয়।

৩ বেসামরিক শাসন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি : নতুন নতুন মন্ত্রিদপ্তর ও অফিস স্থাপন, বেসরকারী কর্মচারিগণের মাহিনা ও দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি, বিদেশে দূতাবাস স্থাপন ও প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদি।

৪. প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি : ভারতীয় দেশরক্ষা বাহিনীর সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ, সীমান্তসংক্রান্ত অশান্তি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক পরিস্থিতির অবনতি। বিগত কয়েক বছর ধরে, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. ঋণজনিত ব্যয় বৃদ্ধি : উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল পরিমাণে সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই ঋণ বাবদ প্রচুর সুদ দিতে হয়। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রদেয় সুদের পরিমাণও তাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬ সামাজিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি : শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, খনিজ সমীক্ষা, পশ্চাদপদ বর্ণ, শ্রেণী ও আদিবাসীদের উন্নয়ন, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রভৃতি খাতে সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলির প্রদত্ত অনুদান বৃদ্ধি ইত্যাদি : পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির উন্নয়নের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এই ব্যবস্থা ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে।

৮. অমিতব্যয়িতা : সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা খুব কমই দেখা যায়। সরকারের সব বিভাগে যে মনোভাব কাজ করে তা কতকটা এ রকম : "আপাতত এখনকার মত কাজ সেরে নিই, পরে কি হবে তা পরে দেখা যাবে।" এ মনোভাবের ফলে বিচার-বিবেচনা করে ব্যয় হ্রাসের বিশেষ কোনো চেষ্টা থাকে না। আবার এমন ঘটনাও বিরল নয় যখন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে খরচ বাড়াতেই থাকে যাতে পরবর্তী বাজেটে আরও বেশি অর্থ দাবি করা যায়।

১৬.১৬. সরকারের ব্যয়বৃদ্ধির অর্থনীতিক ফলাফল
Economic Effects of the Rise in Government Expenditure

১. ১৯৫১ সালের পর থেকে সরকারী ব্যয় বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। এর অর্থনীতিক ফলাফল বহুমুখী। যেমন ঃ পুঁজিগঠন ঃ সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের নীট পুঁজিগঠনের হার জাতীয় আয়ের ২.৮% (প্রথম পরিকল্পনা) থেকে বেড়ে ১৯৭৮-৭৯ সালে ২১ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

২. অর্থনীতিক উন্নয়ন ঃ পরিকল্পনা কালে বিপুল সরকারী ব্যয়ের ফলে ভারতের অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নয়ন বিশেষভাবে কৃষি-সম্প্রসারণে, শিল্পবিকাশে ও পথ, জল ও আকাশ পরিবহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এভাবে সরকারী ব্যয় অর্থনীতির অন্তর-কাঠামো (Infra-structure) সুদৃঢ় করেছে এবং উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করেছে।

৩. সমাজ-সেবার বিস্তার ঃ বর্ধিত সরকারী ব্যয়ে কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসার সুব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নানাবিধ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

৪. বর্ধিত সরকারী ব্যয় জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করেছে। ফলে আরো বেশি কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

৫. সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঃ বিপুল সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারী ক্ষেত্রে বহু শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এরই ফলে বর্তমানে ভারতে ক্রমবর্ধমান সরকারী ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে এই সরকারী ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

৬. আয়-বৈষম্য দূরীকরণ ঃ সামাজিক সেবামূলক কাজে সরকারী অর্থের ব্যয়ের ফলে সমাজে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্য কিছু পরিমাণে দূরীভূত হচ্ছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান সাধারণভাবে উন্নীত হয়েছে।

৭. মুদ্রাস্ফীতি ঃ প্রভূত পরিমাণে সরকারী ব্যয়ের একটি অনিবার্য পরিণাম ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী-রূপে মূল্যস্ফীতি ঘটায়। এই মূল্যস্ফীতি ভারতের সমগ্র অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। এর হাত থেকে মুক্তির আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

১৬.১৭. ভারতের সরকারী ঋণ
Public Debt in India

১. প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রথম-ভাগ থেকেই ভারতে সরকারী ঋণের সৃষ্টি হয়। প্রথম-দিকের সরকারী ঋণের সমগ্র অংশই ছিল উৎপাদনশীল। ১৮৬৭-৬৮ সালে উৎপাদনশীল কার্যে প্রথম ঋণ গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে রেলপথ নির্মাণ ও সেচকার্যের মত উৎপাদন-শীল কর্মে সরকার অর্থ ব্যয় করতে আরম্ভ করে। ১৯৮২ সালে ভারতের উৎপাদনশীল ঋণের পরিমাণ অনুৎপাদন-শীল ঋণের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়।

২. প্রথমদিকে সরকারী ঋণ প্রধানত ভারতে সংগৃহীত হলেও ভারতে বিদেশীরাই এই ঋণ দিত। পরে লণ্ডনের বাজার থেকে (স্টার্লিং) ঋণ সংগৃহীত হতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে ঋণের জন্য ভারত সরকার মূলত ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের উপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হয়।

৩. প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে (১৯১৯ সালের মার্চ) ভারতের টাকা-ঋণ (rupee dept) এবং স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫৪.৭৮ কোটি টাকা এবং ৩০৪.০৮ কোটি টাকা।

৪. ১৯৩৯ সালের মার্চের শেষে ভারতের টাকা-ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০৯.৯৬ কোটি টাকা এবং স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬৯ কোটি টাকা।

৫. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতের সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। ভারতের স্টার্লিং-দেনা যুদ্ধের কয়েব বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু অন্যদিকে টাকা-ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

৬. পরিকল্পনা কালে সরকারী ঋণের পরিমাণও উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। সারণি ১৬-৯-এ তা দেখান হল।

সারণি ১৬.৯ ঃ ভারত সরকরের ঋণ (কোটি টাকায়)

	১৯৫০-৫১ (প্রকৃত পরিমাণ)	শতাংশ	১৯৮৯-৯০ (বাজেট)	শতাংশ
অভ্যন্তরীণ	২,০২২	(৯৮.৫)	১৩০,৭৬০	৮৮
বিদেশী	৩২	(১.৫)	২৮,০৪০	১২
মোট	২,০৫৪		১৫৮,৮০০	

সূত্র ঃ Budget of the Central Govt. for 1989-90

৭. সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ ঃ ভারতের সরকারী ঋণকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ

(১) উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঃ রেলপথ নির্মাণ, সেচকার্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য যে ঋণ সংগৃহীত হয় তাকে উৎপাদনশীল ঋণ বলে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের সময় খয়রাতি ইত্যাদি কার্যের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে। ভারত সরকারের সমগ্র ঋণের প্রায় ৮৩% উৎপাদনশীল ঋণ।

(২) অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ঋণ ঃ দেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত ঋণকে অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং বিদেশ থেকে

সংগৃহীত ঋণকে বিদেশী ঋণ বলা হয়। ভারতের সমগ্র সরকারী ঋণের ৭৫% অভ্যন্তরীণ। ভারতের বিদেশী ঋণ ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৫০-৫১ সালের মোট সরকারী ঋণের ১·৫% ছিল বিদেশী ঋণ। বর্তমানে মোট ঋণের প্রায় ১২% বিদেশী ঋণ। এই ক্রমবর্ধমান বিদেশী ঋণ ভারতীয় অর্থনীতিকে পরনির্ভর করে এর ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলেছে।

(৩) দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ: যে ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো বিশেষ সময় নির্দিষ্ট থাকে না তাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বলে। আর যে ঋণ স্বল্পকালের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয় তা স্বল্পমেয়াদী ঋণ। ভারত সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সমগ্র ঋণের ৬০%।

৮. ভারত সরকারের ঋণ বৃদ্ধির কারণ: গত ৩৯ বৎসরে দেশের মোট সরকারী ঋণ প্রায় ৫০ গুণ বেড়েছে। এর কারণ তিনটি। প্রথমত, দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করার প্রয়োজনে ঋণ নিতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনা কাল থেকে প্রতিরক্ষা শক্তির বৃদ্ধির জন্য ঋণের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। তৃতীয়ত, মুদ্রা-স্ফীতি-বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে জনসাধারণের নিকট থেকে উদ্বৃত্ত নগদ টাকা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারের ঋণ নীতি পরিচালিত হচ্ছে।

১৬.১৮. রাজ্য সরকারসমূহের আয়-ব্যয়
Revenue and Expenditure of the State Governments

সারণি ১৬-১০ : চলতি খাতে রাজ্য সরকারগুলির আয়-ব্যয়
(কোটি টাকায়)

		১৯৫১-৫২ (হিসাব)	১৯৮৮-৮৯ (বাজেট)
১. আয়			
(ক) কর-রাজস্ব :			
আয়করের অংশ		৫৩	২,৬৭০
কৃষি আয়কর		৪	১০০
বৃত্তি কর		—	২২০
	মোট	৫৭	২,৯৯০
সম্পত্তির উপর কর :			
ভূমি রাজস্ব		৪৮	৫৪০
স্ট্যাম্প কর ও রেজিস্ট্রেশন		২৬	১,২৪০
এস্টেট ডিউটি		—	—
শহরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির কর		২	১০
	মোট	৭৬	১,৭৯০
পণ্য কর :			
কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অংশ		১	৭,৭১০
রাজ্য অন্তঃশুল্ক		৪৯	২,৮৫০
বিক্রয় কর		৫৯	১২,৬২০
মোটর গাড়ির কর		১০	১,৩৪০
প্রমোদ কর		৬	৪০০
অন্যান্য কর ও প্রদেয়		২৩	২,২১০
	মোট	১৪৮	২৭,১৩০
মোট কর রাজস্ব		**২৮১**	**৩১,৯১০**

(খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব	৯০	৭,৩৭০
(গ) কেন্দ্রীয় অনুদান	৩০	৮,৪৭০
সর্বমোট	৩৯৬	৪৭,৭৫০
২. ব্যয়		
(ক) উন্নয়নমূলক ব্যয়	১৯৬	৩২,০০০
(খ) উন্নয়ন-বহির্ভূত ব্যয়	১৯৬	১৬,২৮০
(গ) অন্যান্য	—	৫৩০
মোট ব্যয়	৩৯২	৪৮,৮১০
৩. উদ্বৃত্ত	+৪	—১,০৬০

১. আয়ের উৎস : ভারতের রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উৎসগুলির মধ্যে আছে ভূমিরাজস্ব, প্রমোদকর, বিক্রয়কর, কৃষি আয়কর, স্ট্যাম্প ডিউটি, অন্তঃশুল্ক, সেচকর, পথকর, যানবাহন কর ইত্যাদি। এদের মধ্যে আয়ের উৎস হিসাবে বিক্রয়কর, প্রমোদকর, রাজ্য অন্তঃশুল্ক ও কৃষি আয়করের গুরুত্ব বর্তমানে বেড়েছে এবং ভূমি-রাজস্বের গুরুত্ব কমে গেছে। তা ছাড়া, ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে আয়কর (কোম্পানি কর বাদে) ও কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের একটি অংশ, সম্পত্তি করের (মৃত্যু করের) ৯৭ শতাংশ, রেলযাত্রী টিকিটের উপর ধার্য করের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশের পরিবর্তে বাৎসরিক অনুদান এবং তা ছাড়া অনুদান সাহায্য (grant-in-aid) পেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উৎস সীমাবদ্ধ এবং অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় দেখা যাছে যে, এরা ক্রমেই কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য, অনুদান ও ঋণের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ কারণে এরা খুবই অসন্তুষ্ট। তাদের বাজেটগুলি অধিকাংশই ঘাটতি বাজেট। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তাই এরা নতুন নতুন আয়ের উৎসের সন্ধান করছে।

২. ব্যয়ের খাত : রাজ্য সরকারগুলির ব্যয়ের সর্ব-প্রধান খাত হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলা অর্থাৎ সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচারবিভাগ, জেল প্রভৃতি। অন্যান্য খাতগুলির মধ্যে আছে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায় ইত্যাদি। এদের কতকগুলি উন্নয়নমূলক এবং কতকগুলি সামাজিক সেবা জাতীয় বা সামাজিক কল্যাণ জাতীয়। আইন ও শৃঙ্খলার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও, সব খাতেই রাজ্য সরকার-গুলির ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে এবং তুলনায় আয়ের উৎসগুলি সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাদের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি হচ্ছে। এ কারণে দেখা যায় যে ইদানীংকালে রাজ্যসরকারগুলির ঋণের পরিমাণও প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে এদের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৪৫ কোটি টাকা। ১৯৮৮-৮৯ সালে তা বেড়ে ৭৯,৫৫০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে।

সারণি ১৬.১১ : রাজ্য সরকারগুলির ঋণ (কোটি টাকায়)

	মার্চ, ১৯৬১	মার্চ, ১৯৭৯	মার্চ, ১৯৮৯
১ অভ্যন্তরীণ ঋণ	৫৯০	১,৮৫০	১২,৮৩০
(ক) বাজার থেকে ঋণ-সংগ্রহ ও বণ্ড বিক্রি	৫০৯	১,২৩০	১০,৩৫০
(খ) রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ	৪০	৩৮০	২০০
(গ) ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ	৫০	২৪০	২,২৮০
২. কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঋণ	২,০২০	৬,৩৬০	৫৬,১৭০
৩ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি	১৩০	৫৪০	১০,৫৫০
মোট ঋণ	২,৭৪০	৮,৭৫০	৭৯,৫৫০

সূত্র : Report on Currency and Finance, Reserve Bank of India, 1988-89

৩. **রাজ্য সরকারগুলির আয় বৃদ্ধির সমস্যা ঃ** রাজ্য-সরকারগুলির আয়ের উৎসের মধ্যে বিক্রয়কর অন্যতম। কর হিসাবে এটা যেমন উৎপাদনশীল, তেমনি স্থিতিস্থাপক। সহজেই এর হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে এর ব্যাপ্তি সংকুচিত বা প্রসারিত করে প্রয়োজন মত অর্থসংগ্রহ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে এটা খুবই অধোগতিশীল। কারণ এর বেশির ভাগ বোঝা গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষকে বহন করতে হয়। এটা উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর হার এক নয় বলে জটিলতা আরও বেড়েছে। তার উপর আবার কতকগুলি রাজ্যে একই পণ্যের যতবার বেচা-কেনা হয় ততবারই বিক্রয়কর দিতে হয় (মালটিপ্‌ল পয়েণ্ট ট্যাক্‌স্) এবং কতকগুলি রাজ্যে আবার কেবল একবার বেচা-কেনার (সাধারণত শেষবার অর্থাৎ সাধারণ ক্রেতার কাছে বিক্রির সময়) সময় (সিঙ্গ্‌ল্ পয়েণ্ট ট্যাক্‌স) দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে দু'রকম অর্থাৎ বহুদফা এবং একদফা বিক্রয়কর আদায় ব্যবস্থাই রয়েছে। এ ধরনের জটিলতা কিছুটা কমাবার জন্য চিনি, তামাক ও মিলের কাপড়ের উপর রাজ্য বিক্রয়করের পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়েছে এবং এর থেকে আদায়ীকৃত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া, ১৫টি রাজ্যে ১৭টি বিলাসদ্রব্যের উপর একই হারে বিক্রয়কর ধার্য করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলির বিক্রয়করের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ও অন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বিক্রয়কর ধার্য করার জন্য কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন ১৯৫৭ সাল থেকে বলবৎ করা হয়েছে।

৪. বিক্রয়কর থেকে রাজ্য সরকারের সর্বাধিক আয় সম্ভব করার জন্য এবং কর-ফাঁকি বন্ধ করার জন্য কর অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশগুলি মূল্যবান। কমিশনের মতে এজন্য—১. বিক্রয়করটি বহু দফায় ধার্য ও আদায় করতে হবে (মাল্‌টিপল্ পয়েণ্ট সেল্‌স্ ট্যাক্‌স্)। ২. এর হার কম হবে। তাতে বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট থেকে মোট আদায়ের পরিমাণ অনেক বেশি হবে। ৩. বিলাসদ্রব্যের উপর চড়া হারে কর ধার্য করতে হবে।

৫. রাজ্য সরকারগুলির আয়ের একটি উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। বর্তমানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও অতি সামান্য আয়তনের জমির মালিক-চাষীদের ভূমিরাজস্ব মকুব করার ফলে আয়ের উৎস হিসাবে এর গুরুত্ব কমে গেছে। এর পরিবর্তে আরেকটি নতুন উৎসের গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা খুবই বেড়ে গেছে। এটি হল কৃষি আয়কর।

৬. ভূমিরাজস্ব ও কৃষি আয়কর—এ দু'টিই প্রত্যক্ষ কর। তাই রাজ্য সরকারগুলির, কর-ব্যবস্থায় এ দু'টি করের উপর আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উপরন্তু, উৎপাদনশীলতা, ন্যায়বিচার ও প্রগতিশীলতার দিক থেকেও এ কর দু'টি সমর্থনযোগ্য।

৭. একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, গত ৪০ বৎসরে শহরাঞ্চলে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে করভার যেমন বেড়েছে, গ্রামাঞ্চলে কৃষি থেকে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে করভার তেমন কিছুই বাড়েনি। অথচ পরিকল্পনার গত ৪০ বৎসরে কৃষির উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয় হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত ১০ শতাংশ পরিবার এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে। শহরাঞ্চল তার আয়ের ১৭.০ শতাংশ সরকারের রাজস্ব হিসাবে জমা দেয় আর গ্রামাঞ্চল দের তার আয়ের মাত্র ২.৬ শতাংশ। কৃষিতে বর্তমানে যে আয় সৃষ্টি হচ্ছে তার মাত্র ৬/৭ শতাংশের উপর কর আদায় করা হয় আর শহরাঞ্চলের সৃষ্ট আয়ের ২৫ শতাংশের উপর কর ধার্য হয়েছে। বর্তমানে দেশের ১৫টি বাছাই করা জেলাতে (দেশের মোট আবাদী জমির ১২ শতাংশ) যে নতুন কৃষি স্ট্রাটেজী প্রয়োগ করে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব ঘটান হচ্ছে, তাতে উপকৃত হচ্ছে ধনী চাষী। এদের ক্রমবর্ধমান আয়ের উপর কর ধার্য না করার অর্থ হবে দেশের গরিব মানুষের পকেট কেটে ঐ ধনী চাষীদের পকেট ভর্তি করা। সুতরাং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে করের বোঝার বণ্টনে বর্তমান গভীর বৈষম্য দূর করার জন্য ন্যায়বিচারের দিক থেকে কৃষি আয়কর ধার্য করা উচিত এবং এর উপর রাজ্য সরকারগুলির সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কর থেকে গ্রামাঞ্চলকে রেহাই দেওয়ার কিছুমাত্র যুক্তি নেই। তা ছাড়া, এই উৎসটি যথেষ্ট উৎপাদনশীলও বটে। কারণ, দেশে কৃষির আয় বৃদ্ধির সাথে এই করের আদায়ও বাড়বে এবং তা থেকে রাজ্যসরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

৮. রাজ্য সরকারগুলির আয়ের আরেকটি উৎস রাজ্য অন্তঃশুল্ক বা উৎপাদন শুল্ক। সাধারণত মাদকপানীয়, গাঁজা, ঔষধ, আফিম ইত্যাদির উপর ধার্য কর থেকে এই রাজস্ব আদায় হয়। এ পর্যন্ত প্রায় সব রাজ্যই 'মাদক নিষিদ্ধকরণ' নীতি অনুসৃত হওয়ায় এর থেকে খুব বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্প্রতি তামিলনাড়ু প্রভৃতি কোনো কোনরাজ্য এ নীতি কিছুটা শিথিল করেছে; ফলে ঐ সব রাজ্যে এ উৎস থেকে রাজস্বের পরিমাণ বেড়েছে। এ ব্যাপারে অন্য রাজ্য সরকারগুলিরও বিচার-বিবেচনা করে নতুন নীতি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তাতে রাজ্যের রাজস্ব বাড়ানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হতে পারে।

৯. পরিশেষে, এ সব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও, রাজ্য সরকারগুলির সকলেই একবাক্যে এই অভিযোগ করেছে যে, তাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ-সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় সব ক'টি মূল্যবান উৎসই নিজে ব্যবহার করছে। এজন্য সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎসগুলির পুনর্বণ্টনের নীতিটির নতুন করে বিচার-বিবেচনা করার প্রস্তাব উঠেছে।

১৬.১১. উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে কৃষিকরের ভূমিকা Role of Agricultural Taxation in a Developing Economy

১ স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষিক্ষেত্র থেকেই আসে। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রেরই উচিত দেশের করভারের উল্লেখযোগ্য অংশ বহন করা।তা ছাড়া, শিল্পে অনগ্রসর বলে এ সব দেশের শিল্পক্ষেত্র থেকে এত বেশি মুনাফা পাওয়া যায় না যার থেকে একটা অংশ পুঁজিগঠনের কাজে লাগান যেতে পারে। এ জন্য কৃষিক্ষেত্রের উপরই কর বসিয়ে পুঁজিগঠনের চেষ্টা করতে হয়। অর্থাৎ অর্থনীতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার জন্যই স্বল্পোন্নত দেশগুলির কৃষিক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

২. কৃষিক্ষেত্রে উচ্চহারে কর বসালে অর্থনীতিক উন্নয়নে বিশেষ বাধা হবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। জমির মালিক যদি ধনী হয় সে ক্ষেত্রে কৃষিকর খুবই উপযোগী। কৃষিকর প্রয়োজনমত প্রগতিশীল হারে বসান যায়। এ করের সাহায্যে জমির কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। আবার, উচ্চহারে কর বসিয়ে জমির মালিকদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা পদ্ধতিও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. দেশের উন্নয়নের কাজে সাফল্যের জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। উন্নয়নের কাজে তাদের অংশগ্রহণ সম্ভব করা এবং একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা যায় কৃষিকরের মাধ্যমে।

৪ অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে 'দেশের যাবতীয় জমির উপযুক্ত ব্যবহার যাতে হয় তা দেখা দরকার। জমি নিয়ে ফট্‌কা কারবার বন্ধ করার জন্য, জমির মালিকানা কেবলমাত্র সামাজিক পদমর্যাদা ও আভিজাত্যবোধের জন্যই যাতে ব্যবহৃত না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য উচ্চহারে কৃষিকর বসান যায়। জমি থেকে বিক্রয়লব্ধ আয়ের উপর মূলধনী কর (Capital Gains Tax) বসিয়ে জমি নিয়ে ফট্‌কা বন্ধ করা যায়।

৫. অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জমির মূল্য বাড়ে। এই মূল্যবৃদ্ধি জমির মালিকের হাতে একেবারে অপ্রত্যাশিত (আকস্মিক) আয় এনে দেয়। এই আয়ের সবটুকুই যদি কৃষিকরের মাধ্যমে সরকার নিয়ে নেয় তাতে আপত্তির কিছু নেই, বরং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে সরকারের এ কাজ করা উচিত।

৬. কৃষিকর বসানো হলে কৃষককে সেই কর যদি টাকা পয়সায় শোধ করতে হয় তা হলে তাকে বাজারে আরো অনেক বেশি ফসল বিক্রির জন্য আনতে হবে। এর ফলে দেশের শস্যের বাজারে আরো অনেক বেশি ফসল বিক্রির বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত অনেক বেশি পরিমাণে আসবে ; এতে কৃষিক্ষেত্র থেকে অকৃষিক্ষেত্রে শস্য হস্তান্তরিত হবে। অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে এটা খুবই সহায়ক।

এ সব কারণে আজকাল স্বল্পোন্নত দেশে কৃষিকরের গুরুত্ব বেড়েছে। এ সব দেশের সরকার কৃষিকরের বিষয়টি উন্নয়নমূলক অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে উপলব্ধি করছে।

ভারতের কৃষি আয়করের সমর্থনে যুক্তি : ভারতের মত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কৃষি আয়করের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নয়নের কাজে ভারতের কৃষিক্ষেত্রের যতটুকু দেবার আছে ততটুকু কৃষিক্ষেত্র দিচ্ছে কিনা তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১. বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায়, ভারতের কৃষিক্ষেত্র থেকে করের মাধ্যমে খুব নগণ্য পরিমাণে অর্থ আসে। এ ক্ষেত্রের উপর যতটা কর বসানো উচিত, বাস্তবে তার থেকে অনেক কমই আদায় করা হয়। অর্থাৎ, ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উপর করের ভার খুবই লঘু। ডাঃ ম্যাথু[1] দেখিয়েছেন, ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের কৃষিক্ষেত্র থেকে কর হিসেবে পাওয়া গেছে ঐ ক্ষেত্রের মোট আয়ের ৩'২ শতাংশ ; তারই পাশাপাশি কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্র কর হিসেবে দিয়েছে তার আয়ের ১৭৪ শতাংশ। তা ছাড়া তিনি আরও দেখিয়েছেন, কৃষিক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির মাথাপিছু করের গড় পরিমাণ যেখানে মাত্র ১৬ টাকা, কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে মাথাপিছু করের গড় পরিমাণ সেখানে ৯৮ টাকা। এ ধরনের বৈষম্য কমা দূরে থাকুক বরং ক্রমশ বাড়ছেই। ডঃ কে. এন. রাজের মতে ভারতের কর-ব্যবস্থা খুবই অন্যায্য ; কেননা এই কর-ব্যবস্থায় ভারতের বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের উপর বস্তুতপক্ষে কোনো করই বসেনি বলা যায়। সাম্য ও ন্যায়নীতির দিক থেকে এটা খুবই আপত্তিকর।

1. Dr. E. T. Mathew : Agricultural Taxation and Economic Development in India,

২. কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রের ব্যক্তিগত করের মধ্যেও উৎকট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রের একটি পরিবারের বাৎসরিক আয় ৭৬,৫০০ হলে তাকে এর ৬৫ শতাংশ কর দিতে হয় (১৯৭০-৭১ সালের হারে), অথচ কৃষিক্ষেত্রে কোনো পরিবারের ঐ পরিমাণ আয়ের উপর কর দিতে হয় মাত্র ৫.৩ শতাংশ। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের আয়ের উপর প্রায় কোনো করই বসছে না, বসলেও সামান্য কর দিয়েই কৃষিক্ষেত্র রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।

৩. সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতের কৃষক ভূমিরাজস্ব দিয়ে আসছে। ভূমিরাজস্ব এদেশে ৩০-৪০ বছরের ব্যবধানে নতুন করে ধার্য করা হয়। এটা ধার্য করতে ঐ সময়ের প্রচলিত মূল্যস্তর হিসাবে ধরা হয়। বর্তমানে দেশের মূল্যস্তর এত বেশি বেড়ে গেছে যে, বহুকাল আগে নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের হার বর্তমানে খুবই নগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। [বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ এ রকম: প্রথম-৬০০ কোটি টাকা, দ্বিতীয়—৯৮০ কোটি টাকা, তৃতীয়—১,৭১৮ কোটি টাকা, ১৯৬৬-১৯৬৯ এই তিন বৎসরে—১,৬৮৭ কোটি টাকা এবং চতুর্থ—৪,০০০ কোটি টাকা। পঞ্চম—৮,০৮৪ কোটি টাকা। ষষ্ঠ—২৪,৭০০ কোটি টাকা এবং সপ্তম পরিকল্পনায়—৩৯,৭৭০ কোটি টাকা।] এতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা যেমন বেড়েছে তেমনি মোট উৎপাদনও বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে। এক কথায়, উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে কৃষিক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উপকৃত হয়েছে। এ অবস্থায় কৃষিক্ষেত্র থেকে আরও বেশি পরিমাণে কৃষি আয়কর আদায় করা খুবই যুক্তিযুক্ত।

৫. তা ছাড়া, এই সব পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের নানা রকমের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। যেমন, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, পরিবহণ সংসরণের প্রসার, কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি। সমগ্র কৃষিক্ষেত্র এর ফলে উপকৃত হয়েছে। এ কারণেও কৃষিক্ষেত্র থেকে আরো বেশি হারে কর আদায় করা উচিত।

৬. উপরন্তু, ভারতের সর্বত্র কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য কৃষকের ব্যবহৃত জলকরের হার খুবই কম। ফলে সেচ প্রকল্পগুলি আর্থিক দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কৃষি কর বসান সবদিক থেকেই সমর্থনযোগ্য।

৭. বড় বড় কৃষকেরা পরিকল্পনাকালে উৎকৃষ্ট বীজ, কমদামে সার ও কীটনাশক ঔষধ, প্রচুর ঋণ ও আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বেশি পরিমাণে পেয়েছে। ঐ ধরনের সুযোগ-সুবিধা ১০ একর বা তার বেশি জমির মালিকরাই বিশেষভাবে ভোগ করেছে। তাই ন্যায়নীতি ও যুক্তির দিক থেকে এটা খুবই সঙ্গত যে, ঐ সব বিত্তবান কৃষক তাদের আয়ের একটি যুক্তিসঙ্গত অংশ সরকারের রাজকোষে কৃষিকরের মাধ্যমে তুলে দেবে। এতে সরকারী আয়ও যেমন বাড়বে, তেমনি কৃষির উন্নতির জন্যও এর থেকে অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮. আরও একটি বিশেষ কারণে ভারতে কৃষিকর বসান উচিত। কৃষিক্ষেত্রে করের হার বর্তমানে যা আছে তা এত নগণ্য যে কৃষিকর বলতে কিছুই প্রায় নেই বললেই চলে। কৃষিকর প্রকৃত অর্থে না থাকার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। কেন না, অন্যান্য কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্র থেকে অর্জিত বিপুল আয় কৃষিক্ষেত্রের আয় বলে হিসাবে দেখাবার প্রবণতা দারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে প্রচুর 'কালো টাকা' অন্যক্ষেত্র থেকে সরে এসে নিজের পরিচয় গোপন করে 'সাদা টাকা' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে। আয় কর-ফাঁকিরও বিস্তৃত ক্ষেত্র গড়ে উঠছে। কৃষিকর প্রবর্তন করে এই পাপচক্র দূর করার চেষ্টা করা যায়।

৯. সবশেষে, কৃষিকর প্রবর্তন করে সরকারের রাজস্ব যেমন বৃদ্ধি করা যাবে, তেমনি গ্রামাঞ্চলে আর্থিক ও আয় বৈষম্য দূর করার পথেও অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাবে। উপরে বর্ণিত যুক্তিগুলি এক কথায় অকাট্য। তাই ভারতে কৃষি আয়কর অবিলম্বে প্রবর্তন করা উচিত।

১৬.২০. গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর আরোপ
Taxation in the Rural Sector

১. **রাজ কমিটির সুপারিশ:** প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ কে. এন. রাজের সভাপতিত্বে গঠিত কৃষি সম্পদ ও কৃষি আয় সম্পর্কিত কর কমিটি ('কমিটি অন ট্যাক্সেশন অব এগ্রিকালচারাল ওয়েলথ অ্যান্ড ইনকাম') ১৯৭২-এর শেষ দিকে ভারত সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। কৃষিক্ষেত্রে করের উপযোগী সম্বল কি ভাবে সমাবেশ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই কমিটির কাজ।

২. একথা সত্য যে, এদেশে কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে উপার্জিত আয়ের শতকরা ২৫ ভাগই করের অধীন হলেও কৃষিক্ষেত্রে উপার্জিত আয়ের ৬ থেকে ৭ শতাংশের বেশি করের অধীন নয়। গ্রামীণ ক্ষেত্র তার আয়ের ২'৬ শতাংশের বেশি কর দেয় না অথচ শহর ক্ষেত্র তার নীট আয়ের ১৭'৪ শতাংশই কর হিসাবে রাষ্ট্রের তহবিলে জমা দেয়। কৃষিক্ষেত্রে এখন ভূমিরাজস্ব এবং তার উপর যে সব সেস ও সারচার্জ রয়েছে, তাছাড়া ফসলের উপর যে সেস ও কৃষি আয়কর রয়েছে, এসব মিলিয়ে যে মোট আদায় হয় তা গোটা দেশের কৃষির মোট উৎপন্ন-আয়ের ১ শতাংশও হবে

কিনা সন্দেহ। অথচ এই কৃষিক্ষেত্রেই দেশের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং ন্যায়বিচারের খাতিরে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মধ্যে করের বোঝার যে গভীর বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার প্রয়োজনীয়তা কারও অস্বীকার করার উপায় নেই।

৩. কিন্তু শুধু গ্রামীণ ও শহর এলাকার মধ্যেই যে করের বোঝার গভীর বৈষম্য রয়েছে তা নয়, গ্রামীণ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে করের গভীর বৈষম্য রয়েছে। ভারতে এখন ১৫টি বাছাই করা জেলায় যে নতুন কৃষিগত রণনীতি ('নিউ এগ্রিকালচারাল স্ট্র্যাটেজী') চালু করা হয়েছে তার ফলে এই জেলাগুলিতে কৃষকদের আয় দেশের অন্যান্য অংশের কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশি বাড়ছে। অথচ করের বোঝা সকলের উপরই সমান রয়েছে। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও অবিচারের দৃষ্টান্ত। এরও প্রতিবিধান দরকার। এর সমাধানের জন্যই রাজ কমিটি সুপারিশ করেছেন।

৪. রাজ কমিটির মূল সুপারিশ হল: (১) এগ্রিকালচার হোলডিং ট্যাক্স (এ. এইচ. টি.)—রাজ কমিটি কৃষকের মালিকানাধীন জমি ('ওনারশিপ হোলডিং') এবং চাষের অধীন জমি ('অপারেশনাল হোলডিং')-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যে জমির উপর কৃষকের মালিকানা রয়েছে তা' হল মালিকানাধীন জমি। তার সবটাতে সে চাষ করতে পারে, নাও পারে। সে তার নিজের জমির একাংশ অন্য কাউকে বন্দোবস্ত দিয়ে (লীজ দিয়ে) বাকি অংশে নিজে চাষ করতে পারে, আবার তা ছাড়াও অন্য কারও জমি বন্দোবস্ত নিয়ে (লীজ নিয়ে) তাতে চাষ করতে পারে। এইভাবে নিজের জমি থেকে যে অংশ সে অন্য কাউকে লীজ দেয় তা বাদ দিলে এবং অন্যের যে জমি সে নিজে চাষের জন্য লীজ নেয় তা যোগ দিলে তার চাষের অধীন মোট জমি পাওয়া যাবে। যে জমি রেজিস্ট্রী করে লীজ দেওয়া ও নেওয়া হয়েছে কেবল সে জমিই চাষের অধীন জমির (অপারেশনাল হোলডিং) পরিমাণ হিসাব করার সময় ধরতে হবে। এবং এইভাবে হিসাব করে একজন কৃষকের চাষের অধীন যে জমি পাওয়া যাবে তার আনুপাতিক মূল্যের উপর ('রেটেবল্ ভ্যালু') কর ধার্য করতে হবে।

চাষের অধীন জমির আনুপাতিক মূল্য ধার্য করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমির ও ফসলের উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে। জমির উন্নয়ন খরচ বাবদ, অনধিক ১ হাজার টাকা পর্যন্ত, কৃষি জমির আনুপাতিক মূল্যের ২০ শতাংশ ছাড় দিতে হবে। প্রতি জেলায় ও অঞ্চলে, বিভিন্ন ফসলের বা বিভিন্ন ধরনের ফসলের অধীন প্রতি হেকটেয়ার জমির আনুপাতিক মূল্যের এক-একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। বিগত দশ বৎসরের ফলন, বিগত তিন বৎসরের ফসলের দাম এবং বিভিন্ন ফসলের চাষের খরচের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হিসাব করে প্রতি বৎসর ঐ আনুপাতিক মূল্যের তালিকা সংশোধন করতে হবে। ফসল কম বা নষ্ট হলে সেজন্য কর থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা থাকবে। জমির আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী করটি প্রগতিশীল হারে ধার্য হবে এবং বর্তমান ভূমিরাজস্বের পরিবর্তে এটি বসবে। প্রথমে ৫ হাজার টাকা বা তার বেশি আনুপাতিক মূল্যের চাষের অধীন জমিতে ভূমিরাজস্বের বদলে এটি বসান হবে। তারপর বসান হবে ৫ হাজার টাকার কম কিন্তু আড়াই হাজা টাকার বেশি আনুপাতিক মূল্যের জমিতে। তারপর বসান হবে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মত আড়াই হাজার টাকার কম আনুপাতিক মূল্যের জমিতে। দাতব্য ও ধর্মীয় ট্রাস্টগুলি এই কর থেকে রেহাই পাবে না। কৃষিকার্যে নিযুক্ত কোম্পানিগুলিকে জমির আনুপাতিক মূল্যের কমপক্ষে ২০ শতাংশ হিসাবে এই কর দিতে হবে। বাগিচা কোম্পানিগুলি বর্তমান কৃষিগত কর-ব্যবস্থা অনুযায়ী কর দেবে বটে, কিন্তু যে জমি তারা বাগিচার কাজে ব্যবহার করছে না তার উপর অন্য যে কোনো কৃষিতে নিযুক্ত কোম্পানির মতই কর দেবে।

(২) **কৃষিগত ও অকৃষিগত আয় একত্রিত করতে হবে:** এদেশে কোনো কোনো কর যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত তেমনি এমন কিছু কর আছে যেগুলি রাজ্য সরকারগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন। এর ফলে আয়কর দাতাদের কর-ফাঁকির যেমন সুবিধা হয় অন্যদিকে তেমনি রাজস্বসংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের এই ধরণের ক্ষতি যাতে না হয় সে জন্য ওয়ানচু কমিশন সংবিধান সংশোধন করে কৃষি-আয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়ে আসার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই সুপারিশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তাই রাজ কমিটি সুপারিশ করেছেন, কৃষিগত ও অকৃষিগত আয়কে যোগ দিয়ে মোট আয় নির্ধারণ করে, কর ধার্য করার সময়, কৃষি আয়কে বাদ দিয়ে বাকি আয়ের উপর কর ধার্য করতে হবে। তাতে মোট আয়ের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায় বলে উচ্চতর হারে অকৃষিগত আয়ের উপর কর ধার্য করা যাবে এবং আদায়ের পরিমাণ বেশি হবে।

(৩) **কৃষিসম্পত্তির উপর কর:** কৃষিজোতের উপর কর ধার্যের পাশাপাশি কৃষি সম্পত্তির উপরও কর ধার্য করতে

হবে এবং এই করটি সম্পদ করের অন্তর্ভুক্ত হবে। করযোগ্য সম্পত্তির ন্যূনতম সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১'৫ লক্ষ টাকা করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে। বর্তমানে এই করের ক্ষেত্রে যে সব ছাড় দেবার ব্যবস্থা আছে তা তুলে দিয়ে কমিটি করের হার হ্রাসের সুপারিশ করেছে। এ সবের ফলে, কমিটির মতে সম্পদ করের আদায়ের পরিমাণ ৫/৬ গুণ বাড়বে।

(৪) **মূলধনীলাভ কর** : রাজ কমিটি সমস্ত কৃষি জমির হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধনীলাভ কর প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন।

(৫) **কর ধার্যের 'ইউনিট'** : রাজ কমিটি বলেছেন, কৃষিজোত-কর ব্যক্তির উপর ধার্য করে পরিবার হিসাবে ধার্য করতে হবে। এবং এজন্য স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যা নিয়ে এক একটি পরিবার গঠিত বলে বিবেচনা করতে হবে। এর ফলে ব্যক্তি হিসাবে কর ধার্য হওয়ার দরুন যে সব কর-ফাঁকির সুযোগ রয়েছে তা বন্ধ হবে।

(৬) **অন্যান্য সুপারিশ** : পশু, হাঁস মুরগী ও গো-মহিষাদি পালন থেকে যে আয় হয় রাজ কমিটি তার উপরও আয়কর ধার্যের সুপারিশ করেছেন। তা ছাড়া কমিটি আরও সুপারিশ করেছেন, সেচের খরচ ওঠে এমনভাবে সেচের জলের দাম ধার্য করতে হবে।

৫. **মন্তব্য** : রাজ কমিটি যে কৃষিজোতের উপর কর ধার্যের সুপারিশ করেছেন তার সমর্থনে যুক্তি হল : (১) নতুন কৃষিগত রণনীতি প্রভৃতি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের দরুন কৃষিতে যে আয় বাড়ছে ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে তার বদলে কৃষিজোত কর বসালে সে আয় বৃদ্ধির সাথে করের আদায় বাড়বে। ফলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। (২) বর্তমানে শহরাঞ্চলের ও শিল্পগুলির আয়ের উপর আয়কর রয়েছে। কৃষি আয়ের উপর কর থাকায় গ্রামীণ আয় যে অন্যায় সুবিধা ভোগ করেছে, কৃষিজোত কর ধার্যের ফলে সে অবিচার দূর হবে। কিন্তু কৃষিজোত কর ধার্য করা ও আদায় করার বিষয়ে প্রশাসনিক ও অন্যান্য অসুবিধা রয়েছে। এই কর বসাতে হলে গোটা দেশের সমস্ত কৃষিজোতের মাটির প্রকৃতি, আবহাওয়া, ফসলের ধাঁচ এবং কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ও ফসলের দামের ওঠানামা প্রভৃতি হিসাব করে সমস্ত জোতের আনুপাতিক মূল্য স্থির করতে হবে। এ কাজটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তা ছাড়া ২,৫০০ টাকার বেশি আনুপাতিক মূল্যের জোতের অ্যাসেসমেন্ট প্রতি বৎসর সংশোধন করতে হবে। ফলে রাজ্য সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের উপর প্রবল চাপ পড়বে। তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো জোতের প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা যাবে না। তাতে আনুমানিক আয়ের ভিত্তিতে কর ধার্য হয়ে যাবে। তার ফলে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু তা হলেও, এই দিকটি সম্পর্কে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এই কাজটিতে হাত দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা যে রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৬২১. ভারত সরকারের কর সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি

The New Long-term Fiscal Policy

১. ১৯৮৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোকসভায় ভারত সরকারের কর-সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি ঘোষণা করেন। ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভারত সরকারের করনীতি সংক্রান্ত অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থিতিশীলতার যে উদ্দেশ্যটি উল্লেখ করেছিলেন তার অনুসরণে এবং করকাঠামোর ব্যাপকতর সংস্কার-সাধনের উদ্দেশ্যে এই নয়া ফিসক্যাল পলিসি রচিত হয়েছে।

২. এই নবঘোষিত ফিসক্যাল পলিসির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অন্ততঃ আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যক্তিগত আয়কর ও সম্পদকরের হারে কোনো পরিবর্তন করা হবে না। তবে ২/৩ বৎসর অন্তর করহারের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বিবেচনা করে, বাজেট সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে আয়ের স্তর (tax brackets) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রদবদল করবেন।

৩. কৃষি আয়ের উপর কোনো কর ধার্য করা হবে না বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

৪. ন্যাশনাল ডিপজিট স্কীম নামে একটি নতুন সঞ্চয় পরিকল্প প্রবর্তন করা হবে এবং তাতে আয়করদাতা এক বৎসরে যে পরিমাণ টাকা জমা দেবে তার অর্ধেক পরিমাণে তার আয়করযোগ্য আয় (taxable income) বাদ যাবে।

৫. মূল্যস্তরের বৃদ্ধির কারণে দানকরের বর্তমান সীমা ৫,০০০ টাকা পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা হবে।

৬. সম্পদকর (wealth tax) সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোনো অস্থাবর সম্পত্তির বেচাকেনার ক্ষেত্রে, বিক্রয় দলিলে মূল্য হিসাবে যত টাকা দেখান হয়েছে তার ১৫ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে সরকার ওই সম্পত্তি কিনে নিতে পারবে। এই ব্যবস্থাটি প্রথমে শহরাঞ্চলে এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশি দামের সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে।

৭. কোম্পানি করের (corporate tax) হার আর কমানো হবে না। ১৯৮৭ সালের 'অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার' থেকে সারচার্জ ও সারট্যাক্স তুলে দেওয়া হবে। কোম্পানিগুলি মুনাফার ২০ শতাংশ পর্যন্ত তাদের করযোগ্য আয় থেকে বাদ দিতে পারবে, যদি তারা ওই টাকাটা শিল্পোৎপা-

উন্নয়ন ব্যাংক, ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত অন্যান্য সংস্থায় জমা দেয়। এই ব্যবস্থাটি ১৯৮৭-৮৮ সালের 'অ্যাসেসমেণ্ট ইয়ার' থেকে বলবৎ হবে।

৮. আয়কর আইনে কোম্পানিগুলিকে সুবিধাদানের যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তা পুনর্বিচার করা হবে। কোম্পানি-গুলির বিত্তের অবচয় / অবপূর্তির বর্তমান বিভিন্ন হার-গুলিকে কমিয়ে দু'টি কি তিনটি হার রাখা হবে।

৯. মূলধনী লাভ কর সম্পর্কে বলা হয়েছে, বহুদিন আগে খরিদ করা সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের তারিখ এগিয়ে এনে ১৯৭৪ সালের ১লা এপ্রিল করা হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী লাভের করের হার হবে মাত্র দু'টি, স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে হার হবে ৫০ শতাংশ, অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে হবে ৬০ শতাংশ।

১০ বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের (non-resident Indians) দ্বারা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কর ব্যবস্থা রয়েছে তা পরিবর্তিত হবে না।

১১ করফাঁকি বন্ধের জন্য নানান বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২. বহিঃশুল্ক ও অন্তঃশুল্ক কাঠামোর সংশোধন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর মূল লক্ষ্য হল দেশের অর্থ-নীতিক উন্নয়ন, ন্যায় বিচার ও সমতা, সরলতা এবং অধিক রাজস্ব সংগ্রহযোগ্যতা। তা ছাড়া, এর আরেকটি উদ্দেশ্য হল, বর্তমান পার্থক্যমূলক পরিমাণগত বিধিনিষেধ ও পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রমশ পক্ষপাতিত্বহীন আর্থিক হাতিয়ারগুলির ব্যবহারের প্রবর্তন করা।

অন্তঃশুল্ক বা উৎপাদনশুল্ক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হিসাবে সংশোধিত 'value added tax' (Mod VAT) ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হবে। মামলা মকদ্দমার দরুন অন্তঃশুল্ক আদায়ে বিলম্ব দূর করার জন্য একটি Appellate Tribunal স্থাপন করা হবে।

১৩. বহিঃশুল্ক ব্যবস্থা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানত শুল্কের উপর নির্ভর করা।

১৪. এই নবঘোষিত ফিসক্যাল পলিসি সপ্তম পরি-কল্পনাকালে বলবৎ থাকবে। এর উদ্দেশ্য হবে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করকাঠামোর সংস্কার, পরিকল্পনার সীমার মধ্যে ভরতুকির পরিমাণ আবদ্ধ রাখা, পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কমানো, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কাজকর্মের উন্নতিসাধন, দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও অন্যান্য সামাজিক অর্থনীতিক কর্মসূচির জন্য অতিরিক্ত সম্বল সমাবেশের জন্য সঞ্চয়ে উৎসাহ দান।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কর-রাজস্ব বিভাজনের বর্তমান ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা কর।
[C.U. B.Com. (Hons.) 1983]

[Make an evaluation of the existing system according to which allocation of tax-revenue between the Centre and the States in India is made.]

২ কর-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ক্যালডরের প্রস্তাব-গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য কর। এ প্রস্তাবগুলির কতটা রূপায়িত হয়েছে?

[Discuss the main features of Kaldor's proposals for Indian Tax Reform. To what extent have these proposals been implemented ?]

৩ ভারতে মূলধনী লাভ কর ধার্যের বিষয়টি বিচার কর। ভারতে এটি যে রূপে ধার্য হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর।

[Discuss the question of levying a tax on Capital Gains in India. Discuss the features of the Capital Gains Tax as introduced in India.

৪. ভারতে সম্পদকর ধার্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি-গুলি বিচার কর। এ করের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

[Consider the case for and against the introduction of Wealth Tax in India. Discuss the chief features of this tax.]

৫ ভারতের সরকারী ঋণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ এবং স্বাধীনতার পর থেকে বৃদ্ধির কারণগুলি বর্ণনা কর।

[Write a short note on India's public debt and describe the causes of its increase during the post-independence period.]

৬. ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটগুলিতে অন্তঃ-শুল্কের ভূমিকাটি পরীক্ষা কর।

[Examine the role that exise duty plays in the budgets of the Central Government and the State Governments in India.]

৭. ভারতের বর্তমান কর কাঠামোর বিচার কর। কি কারণে তুমি এর সংস্কার করতে চাও?

[Examine the present tax-structure of India. Do you think that the Indian tax-structure should be reformed ? If so, explain why this should be done.]

৮. ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের জন্য কোন্ কোন্ সূত্র থেকে অতিরিক্ত সম্বলের ব্যবস্থা করা যায় ? এ সম্পর্কে ভারতের কর কাঠামোর কি ধরনের সংস্কারের জন্য তুমি পরামর্শ দেবে ?

[Mention the sources from which additional resources for financing India's economic development can be raised. Suggest the nature of reform of the Indian taxstructure that you would prescribe in this regard.]

৯ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে আর্থিক সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে মন্তব্য লেখ।

[Give your views on the present arrangement for the division of financial resources between the Centre and the States in India.]

১০ ১৯৫৬ সাল থেকে ভারতে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির কারণসমূহের উল্লেখ কর। সরকারী ব্যয়ের এই বিপুল বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল কি ?

[State the causes of increase in India's public expenditure since 1956. What are the economic effects of such an enormous increase in the volume of public expenditure ?]

১১. ভারতে রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের উৎসগুলি বর্ণনা কর এবং তাদের আয়বৃদ্ধির জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ।

[Give an account of the sources of revenue of the State Governments of India. State the measures that are to be adopted for increasing their revenues]

১২. সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর : কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক।

[Write a short note on : Central Exeise Duty.]

১৩. ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কর রাজস্বের উৎসগুলি বর্ণনা কর ও তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশ কর।

[Describe the sources of the Government of India's tax revenue and indicate the relative importance of these sources.]

১৪. ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কর।

[Briefly comment on the features of the federal tax-structure of India.]

১৫. পরিকল্পনাকালে এদেশের কর-ব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য কর।

[Comment on the changes that have been brought about in the system of taxation in this country during the plan period.]

১৬. বিলাসের ভোগ্যদ্রব্যের উপর চড়া হারে অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হলে তার চাপ নিশ্চিতরূপে বিত্তবান শ্রেণীর উপরেই পড়ে এই বিশ্বাসের কারণ আছে কিনা, তা বিচার কর। উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

[Is there any valid reason to belive that the burden of a high rate of excise duty on luxury goods would inevitably fall on the rich ? Furnish suitable examples in support of your view.]

১৭ আয় বণ্টনে আরও বেশি সমতা আনার জন্য তুমি ভারতের কর-ব্যবস্থার যে ধরনের পরিবর্তনের সুপারিশ করবে তার ধরনটি বর্ণনা কর।

[Indicate the nature of the change in the Indian tax-system that you may suggest in order to make the distribution of income more equitable]

১৮. ভারতে কৃষি আয়ের উপর আরও বেশি হারে কর ধার্য করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

[Write a note on the necessity of imposing a higher rate of tax on agricultural income in India.]

১৯. অষ্টম ফিন্যান্স কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the main recommendations made by the English Finance Commission.]

২০. ভারতীয় আয়কর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

[Write a short note on the Income Tax in India.]

২১. ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থসংস্থানের উপায় হিসাবে কৃষি আয়কর ধার্য করার প্রস্তাবটি আলোচনা কর।

[Discuss the proposal for introducing Agricultural Income Tax as a source of finance for economic development of India.]

২২. স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে সরকারী ঋণের পরিমাণ কিভাবে বেড়েছে তা দেখাও। এ প্রসঙ্গে সরকারের ঋণ সংক্রান্ত নীতিও বিশ্লেষণ কর।

[Give an account of the increase in Government of India's public debt in the post-independence period. Analyse in this connection the Government's policy about public debt.]

২৩. সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকারের ব্যয়ের ধরনটি বর্ণনা করে এ সম্পর্কে মন্তব্য কর।

[Describe and comment on the pattern of expenditure incurred by the Government of India in recent times.]

২৪. একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কিভাবে আর্থিক উৎসগুলির ভাগবাঁটোয়ারা হওয়া উচিত তা বর্ণনা কর। এক্ষেত্রে ভারত কি একটি সন্তোষজনক ভিত্তি উদ্ভাবন করতে পেরেছে ?

[Describe the principles of allocation of the financial resources between the Centre and the States in a Federal Government. Do you think India has found a satisfactory basis of these principles of allocation ?]

[C.U. B.A. (III) 1985]

২৫. পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি পূরণের পক্ষে ভারতের কর কাঠামো কি উপযোগী ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Is the Indian tax-structure suitable for achieving the objectives of India's economic development through planning ? Give reasons in support of your answer.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় কর-রাজস্বের পাঁচটি প্রধান উৎসের নাম কর।

[Mention five important sources of tax revenue of the Government of India.]

[C.U. B.A. (III) 1985]

২ রাজ্য সরকারের কর-রাজস্বের পাঁচটি প্রধান উৎসের নাম কর।

[Name five important sources of tax revenue of the State Governments in India.]

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের কর-বহির্ভূত রাজস্বের কয়েকটি উৎসের বর্ণনা দাও।

[Describe some of the sources of non-tax revenue of the Government of India.]

৪. ভারতের রাজ্য সরকারগুলির কর-বহির্ভূত রাজস্বের কয়েকটি উৎস বিবৃত কর।

[Mention some of the sources of non-tax revenue of the State Governments in India.]

৫. নিম্নলিখিত করগুলির মধ্যে কোন্‌টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির মধ্যে বাঁটোয়ারা হয় ঃ

আমদানী শুল্ক, বিক্রয় কর, মদের উপর অন্তঃশুল্ক, কোম্পানীর মুনাফার উপর কর, বস্ত্রের উপর অন্তঃশুল্ক।

[Which of the following taxes is shared between the Central and the State Government in India : import duties, sales tax, excise on liquor, tax on company profits, exise duty on cloth ?]

৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্বের উৎসগুলির একটি বিবরণ দাও।

[Describe the sources of revenue of the Governtment of West Bengal.]

[C.U. B.A. (III) 1984]

৭. কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎসগুলির বিবরণ দাও।

[Give an account of the Principal sources of revenue of the Government of India.]

[C.U. B.A. (III) 1983]

পঞ্চম খণ্ড

কৃষিক্ষেত্রের সমস্যাবলী

PROBLEMS OF THE AGRARIAN SECTOR

১৭ কৃষি অর্থনীতির গঠন, সমস্যা ও বিকাশ

Structure, Problems And Growth of The Agrarian Economy

কৃষির গুরুত্ব /
কৃষি-অর্থনীতির গঠনবৈশিষ্ট্য /
কৃষির মূল সমস্যা /
কৃষির উন্নয়নের গুরুত্ব /
পরিকল্পনাকালে সরকারী কৃষিনীতি ও কৃষির অগ্রগতি,
কৃষিনীতির ত্রুটি ও দুর্বলতা /
অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

১৭.১. কৃষির গুরুত্ব
Importance of Agriculture

অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের মত কৃষি ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান ভিত্তি। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির এই গুরুত্ব নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

১. **জাতীয় আয় ও কৃষি :** ভারতে জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলির মধ্যে কৃষির অবদান সর্বাধিক। ১৯৮৪-৮৫ সালে ছিল ৩৯.০ শতাংশ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদানের অনুপাত অনেক কম। ১৯৭৮ সালে ব্রিটেনে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল ২ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩ শতাংশ, কানাডায় ৪ শতাংশ ও অস্ট্রেলিয়ায় ৫ শতাংশ।

২. **কর্মসংস্থান ও কৃষি :** কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ভারতে কৃষির অবদান সর্বাধিক। জনসংখ্যার সর্বাধিক অংশ কৃষিতে নিযুক্ত রয়েছে। ১৯৮১ সালে দেশে কর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যার ৫৯.৪ শতাংশ কৃষিতে নিযুক্ত ছিল। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশগুলিতে কৃষিতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা হল কর্মরত জনসংখ্যার ২ শতাংশ মাত্র, ফ্রান্সে ৯ শতাংশ ও অস্ট্রেলিয়ায় ৬ শতাংশ।

৩. **মানুষ ও পশুর খাদ্য ও কৃষি :** বর্তমানে দেশবাসীর খাদ্যের মোট প্রয়োজনের প্রায় সবটাই কৃষিতে উৎপন্ন হচ্ছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে দেশে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ হয়েছে ১৪.৮৫ কোটি টন। খাদ্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। দেশের গৃহপালিত পশুপক্ষীর (গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট ইত্যাদি এবং হাঁস, মুরগী প্রভৃতি) যাবতীয় প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রধানত কৃষি থেকে পাওয়া যায়। এই সব প্রাণীদের কাছ থেকে মাংস, চামড়া, হাড়, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন পাওয়া যায় তেমনি কৃষি এবং পরিবহণেও এই সব পশু ব্যবহার করা হয়।

৪. **শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহণ ও কৃষি :** দেশের শিল্প ও সেবাক্ষেত্র কৃষির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। নানান খাদ্য-পানীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, চা, বনস্পতি, চিনি, তেল, চট, কাপড়, কাগজ ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য শিল্পের কাঁচামাল কৃষি যোগায়। এই শিল্পগুলির উৎপন্ন দ্রব্য

বেচাকেনার প্রয়োজন থেকে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় ও পরিবহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, প্রয়োজন সৃষ্টি হয় গুদাম-জাতকরণ, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি অন্যান্য কাজকারবারের।

৫. **রপ্তানি ও কৃষি:** রপ্তানি তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও কৃষির ভূমিকা সর্বপ্রধান। চা, চিনি, পাটজাত-দ্রব্য, তৈলবীজ, তামাক, মশলা প্রভৃতি ভারতের প্রধান কৃষিজাত রপ্তানী দ্রব্য। ভারতের মোট রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ৫০ শতাংশই হল কৃষিজাত দ্রব্য। তাছাড়া অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যের ২০ শতাংশ অন্তর্বস্তু (contents) হল কৃষিজাত। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের মোট রপ্তানির ৭০ শতাংশই হল কৃষিজাত দ্রব্য। অতএব রপ্তানির মারফত বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের দ্বারা প্রয়োজনীয় বিদেশী পুঁজিদ্রব্য সংগ্রহ করে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান সর্বাধিক।

সুতরাং কৃষিই হল ভারতের শিল্প, ব্যবসায় এবং পরিবহণ ও রপ্তানী বাণিজ্যের ভিত্তি। সর্বাধিকসংখ্যক দেশবাসীর জীবিকার উপায় ও জাতীয় আয়ের বৃহত্তম উৎস। কৃষির সাফল্য ও সমৃদ্ধিতে সরকারের বাজেট অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যগুলি পূর্ণ হয়। কৃষির ব্যর্থতায় যেমন বাজেটের লক্ষ্য পূর্ণ হয় না তেমনি পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অতএব ভারতের অর্থনীতিতে ও অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্বকে কখনই ছোট করে দেখা যায় না। **ভারতে গত সাড়ে তিন দশকের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, কৃষির অগ্রগতিই হল পরিকল্পনার সাফল্যের প্রধান ভিত্তি।**

১৭.২. কৃষি-অর্থনীতির গঠনবৈশিষ্ট্য
Structural Features of the Agrarian Economy

১. **গঠনবৈশিষ্ট্য:** ভারতের কৃষি-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত পরিচয় পেতে হলে, কৃষির মূল সমস্যা ও দুর্বলতা জানতে হলে, দেশের কৃষি-কাঠামোর গঠন ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

(১) **জমির ব্যবহার:** দেশের মোট আয়তন ৩২ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমির মধ্যে মাত্র ১৩ কোটি ৯১ লক্ষ হেক্টেয়ার বা ৪২ শতাংশ জমি চাষের অধীন। এর মধ্যে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ হেক্টেয়ার (বা ৭ শতাংশ) জমিতে বৎসরে একাধিকবার চাষ হয়। আবাদী জমির মাত্র ২১ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা আছে। গড়ে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার মাথা-পিছু আবাদী জমির পরিমাণ ১ একরের কিছু বেশি। আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৬ শতাংশ (২ কোটি ১৮ লক্ষ হেক্টেয়ার)।

(২) **উৎপন্ন ফসলের ধাঁচ:** আবাদী জমির প্রায় ৮২ শতাংশে খাদ্যশস্য ও ১৮ শতাংশে অন্যান্য ফসলের চাষ হয়। উৎপাদনের পরিমাণ ও আবাদী জমির আয়তনের দিক থেকে ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। মোট আবাদী জমির এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি জমিতে ধান এবং এক-দশমাংশের কিছু কম জমিতে গমের চাষ হয়। তুলা, আখ ও পাট মুখ্য বাণিজ্যিক ফসল। এরা ভারতের তিনটি প্রধান শিল্প—বস্ত্রকল, চিনিকল ও চটকলের ভিত্তি। চীনাবাদাম ও অন্যান্য তৈলবীজ বনস্পতি-তৈল শিল্পের ভিত্তি।

(৩) **জোতের গড় আয়তন:** অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজোতের গড় আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। খামার জমির গড় আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫ একর, ডেনমার্কে ৪০ একর, ইংলণ্ডে ২০ একর, আর ভারতে মাত্র ৫·৭ একর। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে এ বিষয়ে তারতম্য দেখা যায়। ভারতে জোতের গড় আয়তন ৭·৫ একর হলেও, এক বিঘারও কম আয়তনের জোতের পরিমাণ নগণ্য নয়। এজন্য ভারতকে ক্ষুদ্রচাষীর দেশ বলা হয়।

(৪) **জোতজমির মালিকানার ধাঁচ:** ভারতের প্রতি ১০০টি কৃষক পরিবারের মধ্যে ২০টির কোনো জমি নেই, ৫০টি পরিবারের জমি ১ একরেরও কম এবং ১২টি পরিবার মোট কৃষিজমির ৬৫ শতাংশের মালিক। মুষ্টিমেয় গ্রামীণ পরিবারের হাতে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়ে অধিকাংশ কৃষককে ভূমিহীন চাষী, কৃষি, মজুর ও ভাগচাষীতে পরিণত করেছে। এটি কৃষির ফলন বৃদ্ধির পথে একটি বড় বাধা।

(৫) **জোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ:** ভারতীয় কৃষক পরিবারের জোতের গড় আয়তন ৭·৫ একর, অথচ ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগেও জোতের গড় আয়তন ছিল ৯-১০ একরেরও বেশি। সুতরাং যত দিন যাচ্ছে দেশের কৃষি-জোতের গড় আয়তন ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে এবং উত্তরাধিকার আইনের জন্য জোতজমিগুলি ক্রমশ বিভক্ত এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। ফলে জোতের আয়তন এত ছোট হয়ে পড়েছে যে তাতে চাষের খরচ ওঠে না।

(৬) **ভূমি বন্দোবস্ত:** জমির স্বত্বস্বামিত্ব ও প্রজাস্বত্বের শর্তাদি নিয়ে ভূমি ব্যবস্থা গঠিত। এই শর্তগুলি কৃষকের যত অনুকূল হবে, ততই কৃষিকাজে তাদের আগ্রহ বাড়বে। কৃষির উৎপাদন বাড়বে। ভূমিব্যবস্থা কৃষকের প্রতিকূল হলে কৃষিকাজে তারা নিরুৎসাহিত হবে। সুতরাং, দেশের কৃষি

অর্থনীতিতে ভূমি-ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসনে জমির মালিকানা থেকে কৃষককে বঞ্চিত করে যে কৃষকস্বার্থ-বিরোধী ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাতে জমিদার ও জোতদারের তীব্র শোষণে কৃষির ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে ও কৃষকের দারিদ্র্য বাড়তে থাকে। স্বাধীনতা-লাভের পর কৃষির উন্নতির জন্য ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কাজটি জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটানোর পর কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা ছাড়া আর কোনো রাজ্যে বিশেষ এগোয়নি।

(৭) **প্রত্যক্ষ ভোগানির্ভর কৃষি:** ভারতের কৃষি প্রধানত প্রত্যক্ষ ভোগানির্ভর। দেশে মোট উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক শতকরা ৩৬ ভাগ মাত্র ব্যবসায়ী ও দালালদের কাছে বিক্রয় হয়; শতকরা ১৫ ভাগ ফসল খাজনা ও মজুরি হিসাবে খরচ হয় ও শতকরা ৮ ভাগ বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকি শতকরা ৪১ ভাগ ফসল কৃষকরা নিজেরা ব্যবহার করে। ফলে কৃষকদের বিক্রয়যোগ্য ফসল কম বলে তাদের আর্থিক আয়ও কম হয়। কৃষকের হাতে ব্যয় করার মত নগদ অর্থও কম। সুতরাং আয় কম বলে কৃষকদের তথা গ্রামীণ জনসাধারণের আর্থিক সঞ্চয়ও কম। এ কারণে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের যেমন উন্নতি ঘটছে না, তেমনি গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারও সংকীর্ণ থেকে যাচ্ছে।

(৮) **কৃষি শ্রমিক:** বিপুল সংখ্যক কৃষি শ্রমিকের অস্তিত্ব ভারতের কৃষি কাঠামোর আর একটি সঙ্কটপূর্ণ দিক। ১৯৮১ সালের লোকগণনা অনুসারে দেশের কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেত-মজুরের অনুপাত দেশে কর্মে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫.২ ভাগ। এদের অধিকাংশেরই নিজস্ব কোনো জোতজমি নেই। এরা জমি থেকে দেনার দায়ে উৎখাত হওয়া কৃষক। অন্যের জমিতে দৈনিক মজুরিতে কাজ করে এরা জীবনধারণ করে। কাজের অভাবে বৎসরের মধ্যে বহুদিন এরা বেকার থাকে। এদের আয়ও খুব কম। কর্মহীনতা ও স্বল্প আয়ে পিষ্ট এই কৃষি শ্রমিকবাহিনীর অস্তিত্ব ভারতে মানবশক্তির অপচয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত। গ্রামীণ জনসমষ্টির এই অংশের চরম দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলে যন্ত্র-শিল্পজাত পণ্যের বাজারের সীমাবদ্ধতার একটি প্রধান কারণ।

(৯) **ব্যাপক কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি:** ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যান্য জীবিকার অভাব, গ্রামীণ কুটির শিল্পের অবনতি, পুঁজি ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব,—এই সব কারণে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে কৃষিতে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতাও বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত এটা প্রকাশ্য কর্মহীনতার রূপ গ্রহণ করেনি, কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার না হলে অচিরেই কর্মহীনতার রূপ প্রকট হয়ে উঠবে।

(১০) **পুঁজির স্বল্পতা:** ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ খুবই কম। কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ, ফলে কৃষকের স্বল্প উৎপাদন, ফলে কৃষকের স্বল্প আয়—এই পাপচক্রই ভারতের অর্থনীতির মৌল সমস্যা। পুঁজির স্বল্পতার জন্যই কৃষকেরা উন্নত সার, বীজ, যন্ত্রপাতি ও সেচের সুবিধা গ্রহণে অক্ষম।

(১১) **ত্রুটিপূর্ণ কৃষি সংগঠন:** কৃষি সংগঠনকে উৎপাদন সংগঠন ও পণ্য বিক্রয়ব্যবস্থার সংগঠন - এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। উৎপাদন সংগঠনের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতে পারিবারিক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কৃষিকাজ পরিচালিত হয়। অধিকাংশ কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য ও স্বল্প আয়ের দরুন কৃষির বর্তমান ভিত্তি (অর্থাৎ পারিবারিক কৃষি সংগঠন) কৃষির উন্নয়নের পক্ষে অনুপযুক্ত। কৃষিজোতের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, পুঁজির পরিমাণও সামান্য। এমতাবস্থায় শুধু পরিবারের লোকের সাহায্যে কৃষির ফলন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা অসম্ভব। এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র জোতগুলিতে চাষের খরচ পর্যন্ত ওঠে না। কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ব্যবস্থার সংগঠনও ত্রুটিপূর্ণ। কৃষকেরা ফসল কাটার আগেই সমস্ত ফসল মহাজনদের নিকট দেনার দায়ে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। গুদামের অভাব ও ঋণ পরিশোধের তাগিদ তাদের অবিলম্বে ফসল বিক্রয়ে বাধ্য করে। ফলে কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দর পায় না।

(১২) **জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির চাপ:** দীর্ঘকাল ধরে দেখা যাচ্ছে, জমির উপর নির্ভরশীল জন-সংখ্যার অনুপাত বাড়ছে। ফলে দীর্ঘকাল ধরে জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি সক্রিয় রয়েছে।

(১৩) **কৃষিতে মুদ্রা-ব্যবহারহীন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব:** ভারতের গ্রামীণ মানুষদের বিশেষত কৃষকদের ভোগব্যয়ের ৩৯ শতাংশ লেনদেনে টাকার ব্যবহার হয় না। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে পুরোপুরি আর্থিক প্রণোদনা সৃষ্টি হয় না এবং কৃষির এই অংশের সাথে বাজারের যোগসূত্র স্থাপিত হয় না। বর্তমানে অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

(১৪) **একর পিছু ফলনের স্বল্পতা:** পরিকল্পনা সত্ত্বেও ভারতের একর প্রতি গড় ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্ধেক বা তার থেকেও কম। এমনকি ভারতের তুলনায় মিশর, ইতালী এবং জাপানে ধান ও গমের ফলন চার-পাঁচ গুণ বেশি। অবশ্য সম্প্রতি ধান, গম ও অন্যান্য ফসলের একর প্রতি ফলন বাড়ছে।

১৭.৩. কৃষির মূল সমস্যা : স্বল্প উৎপাদনশীলতা The Basic Problem of Agriculture : Low Productivity

১. বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বিশেষত স্বাধীনতা লাভের আগে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ৩৮ শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছিল তুলনায় ৩৮ শতাংশ মাত্র এবং দানাশস্যের মোট উৎপাদন একরূপ অপরিবর্তিতই ছিল। অর্থাৎ সে সময় কৃষির উৎপাদিকা শক্তির অবনতি ঘটেছিল। সে অবনতি দূর হয় ১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে। সারণি ১৭.১এ গত দুই দশকে উৎপাদিকা শক্তির উন্নতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে সব শস্যের উৎপাদনশীলতার সূচকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য বেড়েছে। এবং এই বৃদ্ধিটা ঘটেছে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে বেশি, অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রে কম। কারণ দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপরই এই সময়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদিকা শক্তির এই বৃদ্ধিটা যে খুবই কম তা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শস্যের ক্ষেত্রে জমির উৎপাদিকা শক্তির বিচার করলেই বোঝা যাবে।

সারণি ১৭.১ ; কৃষির উৎপাদনশীলতার সূচকসংখ্যা

	সব শস্য	খাদ্যশস্য	অন্যান্য শস্য
১৯৬০-৬১	৮৭	৮৬	৮৯
১৯৭০-৭১	১১২	১১৩	১০৯
১৯৮৭-৮৮	১৩২.৮	১৪৯.৩	১২৯.৯

সূত্র : Reserve Bank of India Bulletin, April-May, 1970 and Economic Survey 1982-83; 1987-88, Statistical Outline of India, 1986-87.

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২-৩ নং সারণিতে দেখা যাবে চাল এবং গম ও তুলা এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য ও বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে ভারতে উৎপাদনশীলতা বিশ্বের গড়পড়তা উৎপাদনশীলতার থেকে যথেষ্ট কম, অন্যান্য কয়েকটি দেশের তুলনায় কম তো বটেই। সুতরাং কৃষিতে একর পিছু জমির উৎপাদনশীলতার স্বল্পতা ভারতে অত্যন্ত প্রকট এবং তা আমাদের কৃষির মূল সমস্যা বলেই গণ্য করতে হবে।

২. ভারতের কৃষি-অর্থনীতির গঠন বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটি কৃষির উন্নত ও ফসলের দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিকূল। কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণ হিসেবে এগুলির উল্লেখ করা যায়—জমিতে সেচ-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, গড়পড়তা জোতের ক্ষুদ্রায়তন, জোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থান, কৃষির উপর নির্ভরশীল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পুঁজির স্বল্পতা ইত্যাদি মিলে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটির তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃত ও সম্পূর্ণ কৃষি সংস্কারের অভাব, ক্রমবর্ধমান কৃষি মজুরবাহিনী, ব্যাপক কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি এবং ত্রুটিপূর্ণ কৃষি-সংগঠন প্রভৃতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষককে উপযুক্ত প্রণোদনা যোগাতে পারছে না। এই সব গঠনগত ও প্রতিষ্ঠানগত বাধা এখনও রয়েছে বলেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সব রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও কৃষির ফলনে, উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটছে না এবং কৃষির উন্নয়ন হার এখনও অনিশ্চিত এবং কৃষিজাত কাঁচামালের অভাব এখনও প্রবল হয়েই রয়েছে।

৩. **ভারতের কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থা, খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের অভাব, কৃষকের দারিদ্র্য, মোট উৎপাদনের স্বল্পতা ইত্যাদি সব কিছুরই মূল কারণ হল কৃষিজমির একর পিছু স্বল্প উৎপাদনশীলতা।**

৪. **কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার আসল কারণ হল কৃষি-কাঠামোর পশ্চাৎপদ চরিত্র। এর মূল কারণটি হল কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগের স্বল্পতা এবং উৎপাদনের কাজে সহায়ক উপাদানগুলির অভাব।**

৫. **কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণ :** কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) সাধারণ কারণ, (খ) প্রতিষ্ঠানগত কারণ ও (গ) প্রযুক্তিবিদ্যাগত কারণ।

(ক) **সাধারণ কারণ :** (১) কৃষির উপর নির্ভরশীল ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির চাপ : কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ১৯০১ সালে যেখানে ছিল ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৮১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৫৭ কোটি ২০ লক্ষ। কৃষকের মাথাপিছু কর্ষিত জমির আয়তন ১৯০১ সালে যেখানে ছিল ০.৪৩ হেক্টেয়ার, ১৯৮১ সালে তা কমে ০.৩১ হেক্টেয়ার দাঁড়ায়। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে স্বাভাবিক নিয়মে দেশে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটে, শিল্প-ক্ষেত্রে সেই বর্ধিত জনসংখ্যার নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। শুধু তাই নয় ; এও দেখা গেছে, বিভিন্ন হস্তশিল্পে নিযুক্ত বহু শ্রমিক তাদের দীর্ঘকালের পেশা ছেড়ে দিয়ে কৃষিকাজে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি ও কৃষিক্ষেত্রে তার অনিবার্য চাপের ফলে কৃষিজোতের ক্রমাগত উপবিভাজন ও খণ্ডিকরণ, জমির মাথাপিছু আয়তন হ্রাস, কৃষিতে স্বল্পনিযুক্তি (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা) ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস [বহুক্ষেত্রে এ উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়ে শূন্যে (0) পরিণত হচ্ছে অথবা ঋণাত্মক (-) হচ্ছে]—প্রভৃতির মত কুফল দেখা দিচ্ছে।

(২) হতাশাব্যঞ্জক গ্রামীণ পরিবেশ : ভারতের কৃষকদের বেশির ভাগই নিরক্ষর, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। বর্ণভেদ প্রথা ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার মত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ মানুষের তথা, কৃষকসমাজের ধ্যানধারণা ও জীবনযাত্রা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভাগ্যই সব কিছু নির্ধারণ করে—এ বিশ্বাস কৃষকসমাজে গভীর ও ব্যাপক। ভাগ্যের উপর সর্বাত্মক নির্ভরশীলতা কৃষকদের কাজের প্রণোদনা নষ্ট করে, এক ধরনের মানসিক উদাসীনতা সৃষ্টি করে। এটা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির অন্তরায়। গ্রামীণ সমাজের হতাশাপূর্ণ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে না পারলে এ দেশের কৃষির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

(৩) কৃষির পক্ষে প্রয়োজনীয় সেবার অপ্রতুল যোগান : কৃষিঋণের সুব্যবস্থা, কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা, ফসলের সঞ্চয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা, প্রভৃতি সেবা কৃষিকাজের পক্ষে অপরিহার্য। ভারতের কৃষিতে সবগুলি উপাদানই অপ্রচুর। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

(খ) প্রতিষ্ঠানগত কারণ : (১) জোতের আয়তন—ভারতে কৃষিজোতের গড় আয়তন ৫ একরেরও কম। এত ছোট আয়তনের কৃষিজোতে লাভজনকভাবে চাষ করা প্রায় অসম্ভব। তার কারণ খুব ছোট জোতে চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, ছোট জোতে চাষ নানাদিক থেকে অপচয়মূলক। কেননা, এ ধরনের চাষে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ও গবাদি পশুর কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয় না। উপরন্তু সেচ ব্যবস্থারও পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করা যায় না।

(২) ভূমিস্বত্বের ধাঁচ—ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ভূমিস্বত্বের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, জমির যারা মালিক তারা নিজেরা জমি চাষ করে না, যারা জমির মালিক নয় জমি তারাই চাষ করে। জমির মালিক নয় বলে চাষীদের জমি-চাষের ব্যাপারে কোনো অধিকার থাকে না, তাই জমির স্বত্বস্বামিত্ব সম্পর্কেও তাদের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। জমির মালিকেরা খুশিমতো তাদের জমি থেকে চাষীদের উৎখাত করে দিতে পারে। এর ফলে কৃষিকাজে কৃষকের কোনো উৎসাহ বা উদ্দীপনা থাকে না। কৃষির উৎপাদন-শীলতা বৃদ্ধির পথে এটা একটি বিরাট বাধা।

(গ) প্রযুক্তিবিদ্যাগত কারণ : (১) পুরাতন ও দক্ষতাহীন উৎপাদন কৌশল : ভারতের কৃষিক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে যে উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে তা দক্ষতাহীন। পাশ্চমী দেশগুলি এবং জাপান সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদন কৌশলের সহায্যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছে। তুলনায় ভারতের কৃষিতে চিরাচরিত ও দক্ষতাহীন উৎপাদন কৌশলের প্রাধান্য রয়ে গেছে বলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতাও নিচুস্তরেই রয়ে গেছে।

(২) উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার অভাব : ভারতের কৃষি প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। কোথাও কোথাও কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে বটে তবে প্রয়োজনের তুলনায় সেটা অপ্রতুল। তা ছাড়া, যতটুকু ব্যবস্থা রয়েছে তার পূর্ণ-সুযোগও কৃষকরা গ্রহণ করতে পারছে না।

৬. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থা : (ক) কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত কমাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর জন্য গ্রামীণ মানুষের বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে) নিয়োগের বিকল্প ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। জীবিকার ধাঁচের (occupational structure) এমন পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে যাতে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত ৬০ শতাংশে কমিয়ে আনা যায়। (খ) ব্যাপকভাবে ভূমি সংস্কার কার্যক্রম রূপায়িত করার প্রয়াস চালান হচ্ছে। (গ) উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তনের লক্ষ্য সামনে রেখে উচ্চমানের যন্ত্রপাতি, বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতির বহুল ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। জমিতে দু'টি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শস্যপর্যায় (rotation of crop) নির্বাচন, কীটনাশক ঔষধের ব্যাপকতর প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যবস্থাও গৃহীত হচ্ছে।

৭. কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলাফল : (১) কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার প্রত্যক্ষ ফল প্রয়োজনের তুলনায় মোট উৎপন্ন ফসলের স্বল্পতা। (২) খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন কম বলে একদিকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অনাহার বা স্বল্পাহার রয়েছে। অপরদিকে খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। এতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। (৩) কৃষকদের মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় কমই থেকে যাচ্ছে। (৪) স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য তুলা, পাট, আখ, তৈলবীজ প্রভৃতি বাণিজ্যিক বা অর্থকরী ফসলের উৎপাদনও অল্প। এর দরুন কৃষকদের আর্থিক আয় বা ক্রয়শক্তিও কম।

(৫) কৃষকদের ক্রয়শক্তি কম হওয়ায় তাদের কাছে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কম। ফলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রসারিত হতে পারছে না। (৬) শিল্পপ্রসার ব্যাহত হওয়ায় দেশে যথেষ্ট কর্মসংস্থানও হচ্ছে না। (৭) একদিকে স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য কৃষকের আয় কম এবং অপরদিকে দিনের পর দিন খাজনা, কর ও সুদের হার বাড়ছে বলে কৃষকের দেনা বাড়ছে। (৮) ঋণের দায়ে আবদ্ধ কৃষক ফসল ওঠা মাত্র নামমাত্র দরে তা গ্রাম্য মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। (৯) অবশেষে ঋণ শোধে অপারগ হয়ে কৃষকরা ধনী চাষী ও মহাজনদের কাছে জমি বিক্রয় করে দিচ্ছে। এ ভাবে ভারতের কৃষি ও কৃষক, মহাজন ব্যবসায়ী-ধনী চাষী, এই তিন অশুভ শক্তির অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। জমি থেকে কৃষক উৎখাত হয়ে যাচ্ছে ও মুষ্টিমেয় গ্রামীণ ধনী মহাজন ও বড় চাষীদের হাতে অধিক পরিমাণে জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

১৭.৪. কৃষির উন্নয়নের গুরুত্ব

Importance of the Development of Agriculture

১. কৃষি হল ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। এজন্য কৃষির উন্নয়ন ছাড়া এ সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। ভারতে অন্য সব কিছুর আগে কৃষির উন্নয়ন কেন প্রয়োজন, তার কারণগুলি হল : (১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকেই ভারতে খাদ্য-ঘাটতি চলছে। জনসংখ্যা বৎসরে ২·২ শতাংশ হারে বাড়ছে। অর্থনৈতিক উন্নতির বর্তমান চেষ্টার ফলে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়বে। ফলে যাঁরা একবেলা খেত তারা দুবেলা খাবে। অর্থাৎ, আয় বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বাড়বে। এ ছাড়া কৃষিকাজ ছেড়ে যতই আরও বেশি লোক শিল্পে যোগ দেবে ততই তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষকদের আরও বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। সুতরাং, দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য দ্রুতগতিতে খাদ্যের উৎপাদন না বাড়ালে চলবে না। (২) বিকাশমান শিল্পগুলির কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা কৃষিক্ষেত্রকেই মেটাতে হবে। এজন্য কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদনের পরিমাণ যেমন আরও বাড়াতে হবে, তেমনি বহু প্রকারের কাঁচামালও উৎপাদন করতে হবে। (৩) বর্তমানে ভারতে বিদেশ থেকে প্রচুর যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করতে হচ্ছে। এই আমদানির মূল্যে পরিশোধের জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা আমরা যত বেশি উপার্জন করতে পারব ততই আমদানির মূল্য পরিশোধ করতে আমাদের সুবিধা হবে। আরও বেশি পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের জন্য বিদেশে চাহিদা আছে এমন ভারতীয় কাঁচামালের রপ্তানি বাড়াতে হবে। কাঁচামালের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কাঁচামালের উৎপাদন বাড়ানো খুবই দরকার।

সুতরাং, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান ও কৃষিজাত কাঁচামালের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কৃষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপন্ন ফসলের গুণগত উন্নতি ও উৎপাদনের বৈচিত্র্যসাধন করতে হবে। এজন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। তবেই কৃষির উৎপাদন এত বাড়বে যে, কৃষক পরিবারগুলির ভোগের পরেও উদ্বৃত্ত থাকবে। কৃষির এই উদ্বৃত্তই কৃষিবহির্ভূত কাজে নিযুক্ত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা, শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা ও রপ্তানির চাহিদা মেটাতে পারবে। এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সক্ষম হলেই বর্তমান প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির রূপান্তর ঘটবে, বাজার নির্ভর কৃষি প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থায়ী ও দৃঢ় কৃষিভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তবেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্র যথার্থ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কৃষির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ছাড়া শিল্পবিপ্লব সাফল্য লাভ করেনি। এজন্যই ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা থেকে শিল্পের সাথে কৃষিকে সমান অগ্রাধিকার দেবার কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনায় কৃষির উপর এই অগ্রাধিকার আরোপ করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

১৭.৫ পরিকল্পনাকালে সরকারী কৃষিনীতি ও কৃষির অগ্রগতি

Agricultural Policy and Progress during the Plan Period

১. পরিকল্পনাকালে, সরকারী কৃষিনীতির দুটি প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। একটি হল কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন কাঠামোগত সংস্কার সাধন, অন্যটি হল কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপযোগী অন্তর্কাঠামো সৃষ্টি।

২ যে দুটি ব্যবস্থার দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে তা হল : (ক) কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীগুলির, অর্থাৎ জমিদারী, জায়গীরদারী ইত্যাদি ব্যবস্থার বিলোপ ; এবং (খ) পঞ্চায়েতীরাজের মারফত স্থানীয়ভাবে কৃষির উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণে ও রূপায়ণে কৃষিগত শ্রেণীগুলির সহযোগিতা লাভের ব্যবস্থা।

৩. কৃষিতে উন্নয়ন কার্যক্রমের উপযোগী নতুন অন্ত-

কাঠামো সৃষ্টির জন্য প্রধানত দুটি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ঃ (ক) বড়, মাঝারি ও ছোট সেচপ্রকল্পের ব্যবস্থা এবং (খ) ছোট সেচ প্রকল্পগুলির প্রয়োজনে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ কর্মসূচির দ্বারা বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা।

৪. ভারতে কৃষি সংস্কার নীতিতে যে তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হল ঃ (১) দেশের ৪০ শতাংশ এলাকায় অবস্থিত জমিদারী, জায়গীরদারী প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার বিলোপ; (২) রায়তওয়ারী এলাকায় চাষীদের স্বত্বের নিরাপত্তার ও খাজনা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা; এবং (৩) জমির মালিকানার উপর সিলিং ধার্যকরণ এবং সিলিংয়ের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা। মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপের দ্বারা ২ কোটিরও বেশি চাষীর সঙ্গে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল কৃষি নীতি অনুসরণের ফলে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্বৃত্ত জমিবণ্টনের দ্বারা আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছে।

৫. পঞ্চায়েতীরাজ মারফত ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা শুরু হয় তৃতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে। এর দ্বারা সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির উপর গ্রামাঞ্চলে নবোদ্ভূত কৃষকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে অবশ্য ধনী কৃষকদেরই কৃষি উন্নয়নের সুফলগুলি ভোগ করতে দেখা গেছে। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিস্তার এবং সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির মারফত গ্রামের গরিবদের আপেক্ষিক শক্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এভাবে উপরোক্ত ত্রুটিটি অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হতে পারে।

৬. সেচ ও ঋণব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণ মারফত কৃষির উন্নয়নের উপযোগী অন্তকাঠামো সৃষ্টির কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। সে অগ্রগতি অবশ্য প্রয়োজন অনুযায়ী হয়নি ও নির্ধারিত লক্ষ্যেও পৌঁছাতে পারেনি। ছোট সেচ প্রকল্পের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মধ্য দিয়ে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগে স্থানীয় সম্বল সংগ্রহের ঘটনাটি ধরা পড়েছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণে সরকারী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্বল সংগ্রহের মনোভাব উৎসাহিত হয়েছে। কৃষিতে মাথাপিছু বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে। তবে, সেচের অধীন জমির পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনা কালে ১৭% থেকে বর্তমানে ২৩%-এ পৌঁছলেও (যে বৃদ্ধিটি মোটেই বেশি নয়), এর প্রায় অর্ধেক হল ছোট সেচপ্রকল্পের অধীন এবং তা এখনও প্রধানত মৌসুমি-নির্ভর বলে, ভারতের কৃষিব্যবস্থা এখনও বিপজ্জনকভাবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের খামখেয়ালের উপরেই নির্ভরশীল রয়ে গেছে।

৭. সমবায় সমিতিগুলির মারফত স্বল্প ও মাঝারী মেয়াদের কৃষিঋণের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে ৩% থেকে বর্তমানে ৩৩%-এ উঠেছে। তাহলেও সুদখোর মহাজন সমেত বেসরকারী উৎসটিই এখনও পর্যন্ত কৃষিঋণের প্রধান উৎস হয়ে রয়েছে। তাছাড়া সমবায় ঋণের একটি অংশ ওই মহাজনরাই আত্মসাৎ করছে দেখা যাচ্ছে। কৃষিঋণের অপব্যবহার যেমন ঘটছে তেমনি তা পরিশোধের অবস্থাটিও মোটেই সন্তোষজনক নয়। সর্বোপরি, গরিব চাষীরা এখনও পর্যন্ত কৃষিঋণের সামান্যই পাচ্ছে।

৮. তা সত্ত্বেও, গত ৪০ বৎসরের পরিকল্পনাকালে কৃষির অগ্রগতি খুব একটা কম হয়নি। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৫ কোটি টনের রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে। সেচের অধীনে জমির পরিমাণ অনেক বেড়েছে। সারের ব্যবহার বেড়েছে কয়েক গুণ। সমবায় সমিতি প্রভৃতি মারফত প্রতিষ্ঠানগত ঋণদানের পরিমাণ বেড়ে মোট কৃষিঋণের এক তৃতীয়াংশ হয়েছে। ১৯৬৭ ৭০ ভিত্তি বছর ধরে কৃষির মোট উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৫০ ৫১ সালে ৫৮ ৫ থেকে বেড়ে ১৯৮৫ ৮৬ সালে ১৫৮ ১ হয়েছে। সেচের জমির মোট আয়তন ওই সময়ে ২·২৬ কোটি হেক্টেয়ার থেকে বেড়ে ৫·৭৮ কোটি হেক্টেয়ার হয়েছে। নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার ৫৬ হাজার টন থেকে বেড়ে ৬০ লাখ টনে পৌঁছেছে। ফসফেট সারের ব্যবহার ৭ হাজার টন থেকে বেড়ে ২০ লাখ টন হয়েছে।

১৭.৬ কৃষিনীতির ত্রুটি ও দুর্বলতা
Defects and Weaknesses of the Agricultural Policy

১. পরিকল্পনাকালে কৃষির উন্নয়নে বিশেষ অগ্রগতি সত্ত্বেও, কৃষি-উন্নয়নের ধাঁচটিতে কতকগুলি অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটান হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিকল্পনার প্রথম দশ বছরের তুলনায় পরবর্তী দুই দশকে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছে। সাম্প্রতিককালে কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক ওঠানামার হার কিছুটা বেড়েছে। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়ে গেছে। ভূমিহীন চাষীর তুলনায় জমির মালিক-চাষীরা, ছোট জোতের তুলনায় বড় জোতের মালিকরা কৃষি-উন্নয়নের দরুন বেশি লাভবান হয়েছে।

২. এর কারণ প্রধানত তিনটি ঃ (ক) সেচের ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের স্বল্পতা; (খ) ঋণ-দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ধনী চাষীদের প্রভাব, এবং (গ) ধান উৎপাদনে এবং সেচহীন শুষ্ক অঞ্চলে চাষের ক্ষেত্রে কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্যার পশ্চাদপদ অবস্থা। সরকারী সেচব্যবস্থা

কৃষি-উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে পারে, আর চাষীকে তার জমির অনুপাতে অতিরিক্ত সুফল ভোগ করতে দিতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দশ বছরের তুলনায় পরবর্তীকালে সেই সরকারী সেচব্যবস্থার অগ্রগতির হার কমে গেছে। অপরপক্ষে বেসরকারী সেচব্যবস্থার দ্বারা আঞ্চলিক বৈষম্য যেমন বাড়ে তেমনি চাষীদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বৈষম্যও বাড়ে। অথচ ইদানীং ওই বেসরকারী সেচব্যবস্থারই দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, ফসলের চড়া দর এবং কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার আকর্ষণে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগেই ক্রমশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

৩. বর্তমান সরকারী কৃষিনীতির একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজে ও জমি পুনরুদ্ধারের কার্যসূচীতে সরকারী বিনিয়োগের স্বল্পতা। কৃষি উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় প্রকৃত অগ্রগতি কেন আশানুরূপ হচ্ছে না এবং কৃষিপণ্যে বর্তমান চড়া দর কেন স্থায়ী হয়ে থাকছে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে উপরে বর্ণিত কৃষি রণনীতির মধ্যে।

৪. ইদানীং দেখা যাচ্ছে, বড় চাষীরা তাদের ক্ষেত জমির আত্যন্তিক ব্যবহারে খুবই আগ্রহী। একাজে তারা ঋণদানকারী সংস্থাগুলি থেকে আর্থিক সম্বল নিয়ে ব্যক্তিগত সেচ নলকূপ বসাতে কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার কিনে সেগুলিকে তাদের নিজ নিজ কৃষি জমিতে ব্যবহার করতে একটু বিশেষ রকমের উৎসাহী। তুলনায় সরকারী বিনিয়োগের সাহায্যে নতুন জমিতে আবাদ বাড়াতে ততটা আগ্রহী নয়। শুকনো অঞ্চলের বড় চাষীরাও আগের মতো বড় ও মাঝারী সেচ প্রকল্পে অংশ নিতে আগ্রহী হচ্ছে না। এর কারণ, প্রথমত, বেশ কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতাভোগী গোষ্ঠীগুলি হল সেচ সমৃদ্ধ অঞ্চলের বড় ও ধনী চাষী। এরা এখনই নতুন এলাকায় সরকারী সেচ প্রবর্তনে আগ্রহী নয়। দ্বিতীয়ত, যেসব রাজ্যে শুকনো অঞ্চলেরই প্রাধান্য, সেখানেও ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলির সদস্যারা হল প্রধানত ধনী চাষী। এরা বিনিয়োগযোগ্য সম্বলের স্বল্পতা মেনে নিয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, সম্বল সংগ্রহ করতে গেলে অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামের ধনীদের উপর কর বসাতে হবে। তৃতীয়ত, এমনকি সংগৃহীত সম্বলও এমন প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয় যার দ্বারা প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলিই উপকৃত হবে। কারণ নতুন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ক্রমবর্ধমান দামের দরুন, বিবিধ সরকারী ঋণদানসংস্থাগুলির থেকে ঋণ নিয়ে ব্যক্তিগত নলকূপ, সার ইত্যাদির জন্য খরচ করাটা বড় চাষীদের পক্ষে লাভজনক হয়ে উঠেছে।

৫. কৃষির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্বলের স্বল্পতার রণনীতিটি (strategy) শহুরে উচ্চবিত্ত-প্রভাবশালী অংশের পক্ষেও সুবিধাজনক হয়েছে। কারণ এরা এদের আয়ের অপেক্ষাকৃত কম অংশ খাদ্যশস্যের জন্য খরচ করে এবং তা করতে গিয়ে কৃষিজাত দ্রব্যের দরবৃদ্ধির জন্য এদের প্রকৃত আয় যতটা হ্রাস পাচ্ছে তা পুষিয়ে যাচ্ছে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় অধিকতর অগ্রাধিকার সম্পন্ন কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয় এমন অকৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর অধিকতর উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির দ্বারা। আর এই রণনীতির দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেবল গ্রাম ও শহরের গরিবরা, তাদের অধিকাংশ খরচ করে বেশি দাম দিয়ে যাদের খাদ্যশস্য কিনতে হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগযোগ্য সম্বলের স্বল্পতার সমস্যাটাই মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যাটা হল, বিনিয়োগ করার জন্য যে সম্বল পাওয়া যাচ্ছে সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যথাযোগ্যভাবে বরাদ্দ করতে না পারা, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিয়োগের বিষয়ে বাস্তবসম্মত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে না পারা। প্রসঙ্গত বলা যায়, কৃষির জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্বলের স্বল্পতার এবং কৃষির বিভিন্ন খাতে যথেষ্ট বরাদ্দ না করার মূলে কারণ হল, গ্রাম ও শহরের উচ্চবিত্ত প্রভাবশালী অংশের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সব দ্রব্যসামগ্রীর ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি।

৬. তবে শহরের উচ্চবিত্ত প্রভাবশালী অংশটি 'ন্যায়সঙ্গত' দামে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের সুনিশ্চিত যোগান অবশ্যই চায়। কিন্তু এদিকে কৃষিতে বিনিয়োগের স্বল্পতার দরুন খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তারা এ সমস্যাটা সমাধান করতে চায় একদিকে ধান-চাল-গমের উপর লেভি বসিয়ে সরকারি ব্যবস্থার মারফত খাদ্যশস্য বণ্টন এবং নিয়ন্ত্রিত দামে তা বিক্রির ব্যবস্থার দ্বারা (যে ব্যবস্থাটা আবার গ্রামের উচ্চবিত্ত-প্রভাবশালী অংশটি অনেকটা পরিমাণে ব্যর্থ করে দিয়েছে), এবং অন্যদিকে উন্নত সেচ ব্যবস্থাসম্পন্ন সীমাবদ্ধ এলাকাগুলিতে ও বড় বড় খামারগুলিতে সার, উচ্চফলন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ প্রভৃতি কৃষি উপকরণগুলি প্রয়োগের দ্বারা দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।

৭. বর্তমান কৃষি রণনীতির ফলে দ্রুতহারে কৃষির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। এটা সম্ভব হচ্ছে না বিশেষ করে এ কারণে যে সরকারী বিনিয়োগের স্বল্পতার দরুন কৃষিভিত্তি সম্প্রসারিত করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে কৃষির উন্নয়ন দেশের সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হারে অগ্রগতি হয়েছে, ফলে অঞ্চলে অঞ্চলে প্রবল বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, সারা দেশের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয়

কয়েকটি কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা দ্বীপের মতো জেগে রয়েছে। এ দু'টি বৈশিষ্ট্যই পরস্পর অঙ্গাঙ্গী হয়ে পরস্পরকে স্থায়ী হতে সুযোগ দিচ্ছে।

৮. ভূমিসংস্কার, কর, ঋণ এবং মূল্যস্তর সম্পর্কে সরকারী নীতিগুলিও খুব বেশি পরিমাণে ধনী ও বড় চাষী ঘেঁষা। সরকারী নীতি ধনী ও বড় চাষীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করলে সে নীতিকে ব্যর্থ করে দেবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা ধনী ও বড় চাষীরা রাখে। তা ছাড়া, এ সব চাষীরা এতই শক্তিশালী যে সরকারী ক্ষমতা ও সম্বল তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার কাজে প্রয়োজন মত ব্যবহারও করতে পারে।

৯. গত চল্লিশ বৎসরে কৃষিক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক আইন পাস করা হয়েছে। কিন্তু এ সব আইনের অনেকগুলিই কার্যকর হয়নি। ভূমিসংস্কার আইন পাস হয়েছে, কিন্তু কার্যকরভাবে এর প্রয়োগ হয়নি। এ ছাড়া, কৃষক প্রজারা ভূমিস্বত্বের নিরাপত্তা (Security of tenure) বিধান ও কৃষকদের দেয় খাজনার হার নিয়ন্ত্রণ করার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। একদিকে আইন করে খাজনার হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে কিন্তু ক্ষেতমজুরের মজুরির হার আইনের সাহায্যে বাড়ানো হলেও কার্যক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনো প্রয়োগ দেখা যায়নি। এর ফলে ধনী চাষীরাই উপকৃত হয়েছে। কারণ আইন করে খাজনার হার কমিয়ে দেওয়ার ফলে ধনী চাষীরা ক্ষেতমজুর বা দরিদ্র চাষীদের জমি চাষের বন্দোবস্ত দেয় নি। নিজেরাই চাষ করার উদ্দেশ্যে জমি নিজেদের দখলে রেখেছে। আবার ঐ জমি চাষের জন্য তারা যে সব ক্ষেতমজুর নিয়োগ করেছে তাদের আইন অনুযায়ী যে মজুরি দেওয়া উচিত তা ধনী চাষীরা তাদের দিচ্ছে না। কৃষিক্ষেত্রে ধনী চাষীদের এ ধরনের নীতির ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বড় বড় জোতের ফলনের হার নিজ জমির মালিক ছোট চাষীদের অথবা কৃষক প্রজার জোতের ফলনের হারের চাইতে কম হচ্ছে। দেশের কৃষি অর্থনীতির পক্ষে এটা ক্ষতিকর।

১০. বড় চাষীরা প্রভাবশালী বলে সরকারী ঋণদান সংস্থাগুলি থেকে অনেক বেশি ঋণ আদায় করে নিতে পারছে। এবং সে ঋণের একটা বড় অংশ চড়া সুদে ছোট চাষীদের দিচ্ছে। ছোট চাষীরা প্রভাবশালী নয় বলে, ওই ঋণদানকারী সংস্থাগুলি প্রদত্ত ঋণের সামান্য অংশই তারা পায় এবং সেজন্য বড় চাষীদের কাছ থেকে ও মহাজনদের কাছ থেকে তারা চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ওই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ছোট চাষীদের চেয়ে বড় চাষীরাই বেশি বকেয়া ফেলে রাখছে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিও অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের বড় চাষীদের কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। ফলে সমবায় ঋণের বেশির ভাগ ছোট চাষীদের হাতে না গিয়ে যাচ্ছে বড় চাষীদের কাছে।

১১. ছোট চাষীদের প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ সম্পর্কে দু'টি বিষয়ে মনে রাখা দরকার। একটি হল, সুদের হার কম হওয়া চাই। অন্যটি হল, ঋণের পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া চাই। বর্তমানে সরকারী ও সমবায় ঋণদানকারী সংস্থাগুলি কম সুদে কৃষিঋণের বন্দোবস্ত করেছে বটে। কিন্তু ছোট চাষীদের প্রয়োজনীয় পরিমাণে ঋণ পাওয়াটা সুনিশ্চিত হয়নি। তা সুনিশ্চিত করতে হলে কৃষিঋণের রেশনিং করা অবশ্য প্রয়োজন। তাহলে বড় চাষীরা কম সুদে কৃষিঋণের বেশিরভাগ নিজেরা নিতে পারবে না, এবং তা থেকে একটা অংশ চড়া সুদে ছোট চাষীদের দিয়ে নিজেরা মহাজনে পরিণত হতে পারবে না। সম্প্রতি ছোট চাষীদের জন্য যে নিম্নতর সুদের হারে ও বড় চাষীদের জন্য উচ্চতর সুদের হারে সরকারী ঋণদানকারী সংস্থাগুলি কৃষিঋণ দানের নীতি গ্রহণ করেছে (differential interest rates policy), কৃষিঋণের রেশনিং প্রবর্তিত না হলে ওই নীতিটির উদ্দেশ্য বিফল হবে এবং অতি সহজেই বড় চাষীরা পার্থক্যমূলক সুদের হারে প্রদত্ত কৃষিঋণের উচ্চতর সুদের বোঝা ছোট চাষীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে, এখন যেমন ঘটছে।

১২. বহু সমস্যার মধ্যে দেশের দু'টি অন্যতম সমস্যা হল, (ক) কৃষিজাত পণ্যের স্বল্পতা ও (খ) সাধারণ মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি। এমন পরিস্থিতিতে যা করা উচিত ছিল তা হল কৃষিজাত পণ্যমূল্যস্তর এমনভাবে স্থির করা যাতে (১) ন্যায়সঙ্গত দরে ভোগীদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের যোগান সুনিশ্চিত করা যায়, (২) সাধারণ চাষীর তুলনায় বড় চাষীরা ও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সমৃদ্ধিশালী কৃষি অঞ্চলগুলি বিশেষ কোনো সুবিধা না পায়। কার্যত কিন্তু এ পর্যন্ত বড় চাষীরা কৃষিপণ্য মূল্য নির্ধারণ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সরকারী খরিদ দরের চেয়ে বেশি দর আদায়ের সমর্থ হয়েছে এবং উৎপাদকের উপর ধার্য সরকারী লেভিও এড়াতে পেরেছে।

১৭.৭. অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা Lessons and Requirements

১. বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, ভারতের মতো বিকাশমান দেশের কৃষি উন্নয়ন রণনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ, প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন এবং প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার, এই তিনটি উপাদানেরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতে পরিকল্পনার প্রথম দশকে সেজন্য সঠিকভাবেই প্রতিষ্ঠানগত

সংস্কার ও সেচকার্যে বিনিয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

২. ভারতের মতো যে দেশের কৃষিতে মানুষ-জমির অনুপাত বেশি, জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে, এবং কৃষির পুঁজি-ভিত্তি দুর্বল, সেখানে কেবল প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নের হার সন্তোষজনক হতে পারে না। অন্যদিকে, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাকে অবহেলা করে কেবল সরকারী বিনিয়োগের উপর জোর দিলেও বর্তমান উপকরণগুলির ব্যবহারে অদক্ষতা দূর করা যায় না, উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো যায় না। তা ছাড়া সরকারী সম্বল পর্যাপ্ত না হলে বেসরকারী পুঁজির প্রয়োজন থাকে এবং তাকে আকর্ষণ করার জন্য উপযুক্ত প্রণোদনার ব্যবস্থা করা দরকার হয়।

৩. জোতজমির সংবন্ধকরণ সমেত ভূমিসংস্কার এবং সমবায় ব্যবস্থার দ্বারা ছোট চাষীদের জন্য কৃষিঋণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগত সংস্কারগুলি দ্বারা কেবল যে কৃষির উন্নয়ন সম্ভবপর হয় তা নয়, উন্নয়নের সুফলগুলির অধিকতর সমবণ্টনও ঘটান যায়। ভারতের মতো বিকাশমান দেশে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে উন্নয়নের সুফলগুলির অধিকতর সমবণ্টনের ব্যবস্থাগুলির কোনো গুরুতর বিরোধও নেই। বরং এরা পরস্পরের সহায়ক হতে পারে।

৪. তবে ভারতে কৃষি উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তার কৃষি অর্থনীতির উন্নততর অন্তকাঠামোর মধ্যে। বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ অন্তকাঠামো দিয়ে কৃষির উন্নয়ন যতটুকু হচ্ছে তার বেশি হওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজন হল, এই অন্তকাঠামোর সুষ্ঠু পুনর্গঠন। এই পুনর্গঠন একমাত্র বিপুল সরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব। কারণ, এমন বিশাল আকারে বিনিয়োগ করা ভারতের কৃষকদের ব্যক্তিগত তো বটেই, এমনকি যৌথ ক্ষমতারও বাইরে। একটি দৃষ্টান্ত: ভারতে মাটির উপরিভাগে অবস্থিত জল দেশের মোট সম্ভাব্য সেচশক্তির দুই-তৃতীয়াংশের উৎস। এই জলসম্পদের ব্যবহার বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগের দ্বারাই সম্ভব। এমন কি মাটির নিচে অবস্থিত সম্ভাব্য সেচশক্তির একটা বড় অংশও কাজে লাগানো যায় কেবল গভীর নলকূপে সরকারী বিনিয়োগের দ্বারা। জলনিকাশী ব্যবস্থায় এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণেও প্রয়োজন হয় সরকারী বিনিয়োগ এবং সংগঠনের। আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে এবং গ্রামীণ মানুষের ব্যাপক অংশের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষির অন্তকাঠামোর এরকম বিকাশের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের সরকারী বিনিয়োগের ফলে ফসলের উৎপাদন বাড়বে, খাদ্যশস্যের দাম কমবে, ভোগীদের প্রকৃত আয় বাড়বে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গঠন বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the structural features and the importance of agriculture in the economy of India.]

২. ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাবের উপর মন্তব্য কর।

[Comment on the proposal for according priority to agricultural development in India's five-year plans.]

৩. দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের কার্যক্রমে কৃষির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কৃষির এই গুরুত্ব যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছে বলে কি তুমি মনে কর?

[Analyse the importance of agriculture in any programme for rapid economic development of a country. Do our five-year plans, in your opinion, give any indication that such importance of agriculture has been duly acknowledged?]

৪. ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কৃষির উন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা কতটা সমর্থনযোগ্য?

[How far is the priority accorded to agricultural development in our five-year plans justified?]

৫. (ক) ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকা পর্যালোচনা কর। (খ) ভারত সরকারের কৃষিনীতির বিচারমূলক আলোচনা কর।

[(a) Indicate the role of agriculture in India's economic development. (b) Make a critical appraisal of the agricultural policy of the government of India.]

৬. পরিকল্পনাকালে ভারতের কৃষিনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

[Describe the features of the agricultural policy as adopted during of plan period.]

৭. পরিকল্পনাকালে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার কিভাবে চেষ্টা করেছে তা বর্ণনা কর।

[Give an account of the efforts made by the government of India to increase agricultural productivity.]

৮. ভারতের কৃষির স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে পরামর্শ দাও।

[Explain the causes of low productivity in Indian agriculture and suggest measures to increase agricultural productivity.]

৯. ভারতের কৃষির মূল সমস্যাটি নির্ধারণ কর।

[Indicate the fundamental problem of Indian agriculture.]

১০. ভারতের কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the effects of low productivity in Indian agriculture.]

১১. ভারতে অনুসৃত কৃষিনীতির ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা কর।

[Describe the defects and weakness of the agricultural policy that is being adopted in India.]

১২. ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা কম কেন? উহা বৃদ্ধি করিবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নির্দেশ কর।

[What are the causes of low productivity in Indian agriculture? Suggest some measures for improving it.] [C. U. B. A III, 1984]

১৩. ভারতীয় কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। ভারতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দাও।

[Analyse the causes of low productivity in Indian agriculture. Suggest measures to increase agricultural productivity in India.]

[C. U. B. Com. (Hons.), 1984]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. সবুজ বিপ্লবের ফলে দরিদ্র কৃষকরা লাভবান হয়নি কেন?

[Why did the benefit of the Green revolution not accrue to the poor farmers?]

[C. U. B. A. III, 1983]

২. ভারতের জনগণের কত শতাংশ প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করে?

[What percentage of the population of India depends on the primary sector for livelihood?] [C. U. B. A. III, 1983]

কৃষিসংস্কার ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Agrarian Reform And Economic Development

১৮.১. ভূমিব্যবস্থার গুরুত্ব
Importance of the Land Tenure System

১. কৃষি সংস্কার বলতে দুটি বিষয় বোঝায়। একটি হল, ভূমির ভোগদখল বা অধিকারের শর্তাবলীর (Land tenure) সংস্কার। অপরটি হল, প্রজাস্বত্ব (Tenancy) সংক্রান্ত শর্তাবলীর সংস্কার। প্রথমটির দ্বারা জমির মালিকানার ও ক্রয় বিক্রয়ের এবং বন্ধকদানের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয়টির দ্বারা চাষের জমির এবং উৎপন্নের অংশের উপর চাষীর অধিকার সাব্যস্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. ভূমির ভোগদখলের শর্তাবলী ও প্রজাস্বত্বের শর্তাবলী অর্থাৎ এক কথায় ভূমিব্যবস্থা, দেশের কৃষি ও অর্থনীতি ও গ্রামীণ জীবন তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ও সমাজজীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। জাতিসংঘের ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, দেশের কৃষি জমির ভোগদখল সংক্রান্ত রীতিনীতি ও প্রথা এবং আইন কৃষকের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তার জীবনযাত্রার মানকে নামিয়ে দিতে পারে, তার উদ্যম নষ্ট করতে পারে, উন্নতির পথরোধ করতে পারে এবং জমির মালিকানার নিরাপত্তার অভাবে তাকে জমিতে পুঁজি বিনিয়োগে নিবৃত্ত করতে পারে। জমি হল উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক অনুসারে উৎপাদনের পরিমাণ, তার গুণাগুণ ও আয়ের বণ্টন নির্ধারিত হয়। এই সম্পর্ক, উৎপাদন বিকাশের সহায়ক হতে পারে আবার বাধা হয়েও দাঁড়াতে পারে। এ কারণে বলা হয়, **মানুষ ও জমির মধ্যে যে সম্পর্ক, গোটা সমাজবিজ্ঞানে তার চেয়ে মৌলিক সম্পর্ক আর নেই।** এজন্য যে কোনো দেশের কৃষি কাঠামোর আলোচনায় ভূমিব্যবস্থার প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

১৮.২. ভারতের পুরাতন ভূমিব্যবস্থা
Past Land Tenure Systems in India

১. ভারতে ইংরেজ আগমনের আগে পর্যন্ত তৎকালীন রাজশক্তি ভূমিতে কৃষকদের মালিকানা স্বীকার করে নিয়েছিল। সে যুগে উৎপন্নের একাংশ রাজশক্তির প্রাপ্য রাজস্ব বলে স্বীকৃত হত।

২. কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতের ভূমিব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজরা যে নতুন ভূমি-বন্দোবস্তের

প্রবর্তন করল তাতে তারা ধরে নিল যে, রাজশক্তিই হল (অর্থাৎ ইংরেজ সরকার) দেশের সমগ্র ভূমির প্রকৃত সর্বোচ্চ মালিক। তারা কৃষিজোতের গুণাগুণ বিচার না করে, অজন্মা বা চাষের লাভ-ক্ষতি বিচার না করে জমির খাজনার পরিমাণ ধার্য করে নগদ টাকায় সে খাজনা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করল। এর পিছনে তাদের প্রধান অর্থনীতিক উদ্দেশ্য ছিল ভূমি থেকে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা। আর রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের মধ্যে নিজেদের সমর্থক এক নতুন সামন্তশ্রেণী সৃষ্টি করা। এর ফলে ইংরেজ শাসনে চার প্রকারের ভূমি বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়েছিল।

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা, (২) মহালওয়ারী বন্দোবস্ত, (৩) অস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং (৪) রায়তওয়ারী ব্যবস্থা।

৩. **মন্তব্য : ইংরেজ শাসনে ভারতে যে সব ভূমি-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল তাদের প্রকৃতি বিচারে দেখা যায়—** (১) দেশের সর্বত্র একই রকমের ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। একই অঞ্চল, প্রদেশ এমনকি জেলাতেও বিভিন্ন রকমের ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল।

(২) দেশের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি অঞ্চলে প্রকৃত কৃষকদের উপর জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি নানারূপ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এরা পরগাছা হিসাবে কৃষকের আয়ে ভাগ বসিয়ে কৃষি অর্থনীতির প্রাণ-রসকে প্রবলভাবে শোষণ করত। নানারূপ কর, খাজনা, আবওয়াব, নজরানা ইত্যাদি কৃষকদের জীবন অসহ্য করে তুলেছিল।

(৩) কৃষকের স্বত্বস্বামিত্বের নিরাপত্তা ছিল না। বিশেষত জমিদারী প্রথার অন্তর্গত এলাকাতে যখন তখন জমিদারদের খেয়ালখুশিতে কৃষক-প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত।

(৪) কৃষকের উপর ধার্য খাজনাও অত্যধিক ছিল। খাজনা ধার্য করার কোনো সুচিন্তিত, যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। ফলে কৃষিতে লাভ-ক্ষতি বিচার করে খাজনা ধার্য হত না।

(৫) এ ছাড়া ভূতপূর্ব দেশীয় রাজাগুলিতে কৃষকের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ঐ সব অঞ্চলে কৃষকরা প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, জটিল ভূমিব্যবস্থা, অত্যধিক খাজনার হার, নিরাপত্তার অভাব, মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্বভোগীদের শোষণ ও ভূমিদাসত্ব—এসব অবস্থা কৃষিকাজে কৃষকের সমস্ত আগ্রহ, উদ্যম নষ্ট করে ভারতের কৃষকদের জীবনে এনেছে দারিদ্র্য, হতাশা, নিপীড়ন ও বুভুক্ষা। সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ফল সুস্পষ্টই দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রবল অন্তরায় ছিল।

১৮.৩. ভূমি বা কৃষিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা : বর্তমান কৃষি কাঠামোর চরিত্র

Need for Agrarian Reform : Nature of the Present Agrarian Structure

১. উত্তরাধিকার সূত্রে স্বাধীন ভারত যে কৃষি-কাঠামোটি পেয়েছে তার মূল চরিত্রটি হল আধাসামন্ত-তান্ত্রিক। দেশের ব্যাপক অংশে কৃষকদের উপর চেপে রয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীরা; জমির মালিকানা এবং কৃষিকাজ মুষ্টিমেয় পরিবারের হাতে গুরুতররূপে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। জমিদার-জোতদার, বড় কৃষক ও মহাজন, এই তিনের শোষণে চাষী জর্জরিত হচ্ছে। এরূপ কৃষি কাঠামোতে, উৎপাদনের উপায়স্বরূপ জমির সাথে প্রকৃত চাষী অর্থাৎ উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষ বা শ্রমশক্তির সম্পর্কটি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির, চাষীর আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির, কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এরূপ কৃষি কাঠামোর ফল হল, কৃষক সমাজের ব্যাপক অংশের গভীর দারিদ্র্য, কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও মোট উৎপাদনের স্বল্পতা, কৃষকদের মধ্যে দারিদ্র্য ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাধিক্য, কর্মহীনতা ও বিপুল পরিমাণ দেনার বোঝা এবং দেশের অধিকাংশ মানুষের (কারণ কৃষির উপর নির্ভর-শীল মানুষই দেশে সর্বাধিক) ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদার স্বল্পতা।

২. এ কারণে অনেক দিন আগেই এদেশে কৃষি বা ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। কৃষি সংস্কার বা ভূমি সংস্কার বলতে যা বোঝায় সেটা হল জমি ও চাষীর মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন বা সংস্কার সাধন। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনের উপায়ের সাথে উৎপাদক-শক্তির সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সাধন।

৩. ১৯৩৬ সালে তৎকালীন কংগ্রেসের বর্ধিত অধিবেশনে বলা হয়েছিল "দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও জরুরী সমস্যা হল কৃষক সমাজের মধ্যে নিদারুণ দারিদ্র্য, কর্মহীনতা ও দেনার বোঝা।" তখন এ আই সি সি-কে দেওয়া হয়েছিল একটি সর্বভারতীয় কৃষিসংস্কার কর্মসূচি তৈরি করার দায়িত্ব। ১৯৫১ সালে পরিকল্পনা কমিশন বলেছিল "অধিকাংশ কৃষকই কোনোমতে বেঁচে আছেন, তাঁরা জমির উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করতে অসমর্থ।"

৪. এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন হল কৃষিতে পুরানো ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন করা। তার ফলে—(১) মধ্যস্বত্বভোগী অর্থাৎ খাজনাভোগী শ্রেণীর অবসান ঘটবে, (২) প্রজাস্বত্বের এরূপ সংস্কার করা হবে যার ফলে কৃষক জমির মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হয়, তার মালিকানাস্বত্বের নিরাপত্তা থাকে ও খাজনা কমে, এবং, (৩) জোতজমির মালিকানার সিলিং বা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে সিলিং-এর অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন খেতমজুর ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। ভূমিব্যবস্থার এরূপ সংস্কারের দ্বারা জমির (অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানের) সাথে চাষীর (অর্থাৎ উৎপাদক-শক্তির) এমন একটি অনুকূল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও মোট উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধি সম্ভব হবে। কারণ এরূপ ভূমি সংস্কারের দ্বারা—

(১) জমিদার-জোতদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ ঘটবে, কৃষকেরা এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

(২) সিলিং ধার্যের দ্বারা উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ফলে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকেরা জমি পাবে। এবং জমির মালিকানায় বর্তমান বিরাট বৈষম্য দূর হবে।

(৩) কৃষকেরা জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও জমির উন্নয়নে তাদের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি হবে।

(৪) খাজনার হার কমানো হলে, পুরানো দেনা মকুব বা হ্রাস করা হলে এবং কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হলে গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির বনিয়াদটি দৃঢ় হবে।

(৫) কৃষির ফলন, খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের মোট উৎপাদন ও কৃষকের আয় এবং জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

(৬) কৃষকের আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের সঞ্চয় ক্ষমতা বাড়বে ও পুঁজিগঠন সম্ভব হবে। ফলে কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

(৭) কৃষকের আয় বৃদ্ধির ফলে, গ্রামাঞ্চলে সব রকমের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়বে, দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বাড়বে এবং শিল্প প্রসারের সুবিধা হবে। গ্রামীণ কুটির শিল্পগুলির পণ্যের চাহিদাও বাড়বে এবং ঐ সব শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটবে।

(৮) গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পে বেকার ও অর্ধ-বেকার সমস্যা দূর হবে।

এইভাবে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে এক নতুন প্রগতিশীল কৃষি কাঠামো সৃষ্টি হবে, কৃষির পুনর্গঠন ঘটবে এবং প্রগতিশীল গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ রচিত হবে। এই কারণেই ভারতে ভূমি বা কৃষি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এত জরুরী হয়ে উঠেছে।

১৮.৪. ভূমি সংস্কার: সরকারী নীতি, ব্যবস্থা এবং অগ্রগতি

Land Reform: Govt. Policy, Measures and Progress

(১. **সরকারী নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থা:** পরিকল্পনা-কালে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাষীর প্রতি সামাজিক ন্যায়বিচার এই দুটি প্রধান লক্ষ্য অনুসৃত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় জমির মালিকানার ধাঁচ এবং কৃষিকে জাতীয় উন্নয়নের একটা মৌলিক বিষয়রূপে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্য-সরকারগুলির পক্ষে অনুসরণীয় নীতির একটি রূপরেখা স্থির করা হয়। এই নীতিটি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশদ করা হয় এবং—(ক) কৃষি কাঠামোর চরিত্রের দরুন কৃষি উৎপাদনের পথে বাধাগুলি দূর করার এবং দ্রুত একটি সুদক্ষ ও উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষি অর্থনীতির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির এবং (খ) সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক বৈষম্যগুলি দূর করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে ছিল: (১) মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ; (২) খাজনা নিয়ন্ত্রণ, প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা বিধান ও কৃষকদের জমির মালিকানা প্রদানের ব্যবস্থাসহ প্রজাস্বত্বের সংস্কার; (৩) জমির মালিকানার উপর সিলিং ধার্য করা; (৪) জমির সংবন্ধকরণ ও (৫) কৃষির পুনর্গঠন।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্বোক্ত নীতিগুলি ও ঐ মর্মে প্রণীত আইনগুলি কাজে পরিণত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষিতে কারিগরী কৌশলের বিকাশ এবং বর্তমান সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমিসংক্রান্ত সরকারী নীতির পুনরায় দিক নির্দেশের এবং দ্রুত রূপায়ণের জন্য বর্তমান আইনগুলির পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান সংবিধান অনুসারে ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়নের অধিকার হল রাজ্য সরকারগুলির। পরিকল্পনা কমিশনের এই সিদ্ধান্তগুলি হল সুপারিশ ধরনের।

ভূমি সংস্কারের অগ্রগতির পর্যালোচনা, ভূমি সংস্কার আইনগুলির ত্রুটি নির্দেশ করা, আইনগুলির রূপায়ণে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করা এবং কারিগরী কৌশলের বিকাশ ও বর্তমান সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয়

খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার এ বিষয়ে একটি সরকারী গাইড লাইন প্রচার করে। তাতে সিলিং কমিয়ে এইরূপ পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : (১) জমির ব্যক্তিগত সিলিংয়ের পরিবর্তে এখন থেকে সিলিং হবে পারিবারিক ভিত্তিতে; (২) পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তান বোঝাবে ; (৩) সেচের জমি হলেও সে জমিতে বৎসরে দু'টি ফসল হলে, এরূপ জমির পারিবারিক (পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত) সিলিং হবে ৪.০৫ হেক্টেয়ার থেকে ৭.২৮ হেক্টেয়ারের (১০ থেকে ১৮ স্ট্যাণ্ডার্ড একর) মধ্যে ; (৪) যে সেচের জমিতে বৎসরে একটি ফসল হয় তার পারিবারিক সিলিং হবে ১০.৮৩ হেক্টেয়ার (২৭ একরের বেশি নয়) ; (৫) বাগিচা সহ অন্যান্য জমির পারিবারিক সিলিং হবে ২১.৮৫ হেক্টেয়ার (৫৪ একরের বেশি নয়) ; (৬) পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচের বেশি হলে অতিরিক্ত লোকসংখ্যার মাথাপিছু অতিরিক্ত জমি রাখতে দেওয়া যেতে পারে, তবে এরূপ অতিরিক্ত জমিসহ পরিবারটির মোট জমি পাঁচজনের পরিবারের জন্য ধার্য সিলিংয়ের জমির দ্বিগুণের বেশি হতে পারবে না ; (৭) চা, কফি, রবার, কোকো এবং এলাচ বাগিচার জমি সিলিং থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই গাইড লাইনের ভিত্তিতে প্রায় সব রাজ্যেই নতুন করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাদের অনেকেই এই নতুন আইন কাজে পরিণত করতে আরম্ভ করেছে।

২. **ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি : (১) মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলুপ্তি :** স্বাধীনতা লাভের আগে দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকায় জমিদারী, তালুকদারী, জায়গীরদারী, ইমামদারী প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থাগুলির প্রায় বিলোপ ঘটেছে। প্রায় ২ কোটি কৃষক সরকারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছে এবং জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করেছে। এই মধ্যস্বত্বভোগী প্রচুর পরিমাণ আবাদযোগ্য পতিত জমি ও বনভূমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত ৫৭.৭ লক্ষ হেক্টেয়ার জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমস্যা থেকে গেছে অবশিষ্ট কিছু ধর্মীয় ও দাতব্য মধ্যস্বত্বভোগীর স্বত্ব সম্পর্কে একই ধরনের আইনের প্রবর্তন, কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত খাজনা ধার্য করার এবং নতুন জমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা গড়ে তোলার।

(২) প্রজাস্বত্বের সংস্কার : মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপের পরও রায়তওয়ারী এবং প্রাক্তন জমিদারী এলাকাগুলিতে কৃষকদের মালিকানাস্বত্ব অর্পণের কাজ, ন্যায্য খাজনা ধার্য করার কাজ ও কৃষক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। প্রাক্তন ভূস্বামীরা যাতে প্রজাদের কাছ থেকে জমি চাষের আগেকার অধিকার আবার কেড়ে না নেয় সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের এবং কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।

(৩) জমির সিলিং ধার্যকরণ : প্রায় সব রাজ্যেই কৃষি জমির বা জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ বা সিলিং ধার্য করে আইন পাস করা হয়েছে। অধিকাংশ স্থলেই এই সিলিং ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে। সিলিং দু'রকমের— বর্তমানে কতটা সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি রাখা যাবে এবং ভবিষ্যতেই বা কতটা রাখা যাবে। বিভিন্ন রাজ্যে এই সিলিং বিভিন্ন মাত্রায় ধার্য করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে ভারতে সমস্ত রাজ্যে একই ধরনের সিলিং ধার্য করার সরকারী নীতি গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটি ও মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার সিলিং সম্পর্কে যে নতুন নীতি গ্রহণ করেছে তা হল—(১) স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র কন্যাসহ পাঁচ জনকে নিয়ে একটি পরিবার ধরে পারিবারিক ভিত্তিতে সিলিং ধার্য হয় ; (২) পারিবারিক সিলিং হবে দো-ফসলী সেচের জমির ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৮ স্ট্যাণ্ডার্ড একর এবং এক-ফসলী সেচের জমি হলে ২৭ একরের অনধিক ; (৩) অন্যান্য যাবতীয় জমিতে সিলিংয়ের পরিমাণ ৫৪ একরের বেশি হবে না ; (৪) পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচজনের বেশি হলে মাথাপিছু অতিরিক্ত জমি রাখা যাবে, কিন্তু মোট জমির পরিমাণ সিলিংয়ের দ্বিগুণের বেশি হবে না ; (৫) আগের তুলনায় সিলিং বহির্ভূত ক্ষেত্রের সংখ্যা কমান হয়েছে। এখন শুধু চা, কফি, রবার, এলাচ ও কোকো বাগিচা এবং ভূদান যজ্ঞ কমিটি, সমবায় ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের জমি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি গবেষণাগারের জমি এবং সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত রেজিস্টার্ড সমবায় খামার সমিতির জমিতে সিলিং প্রযোজ্য হবে না ; (৬) উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের সময় ভূমিহীন খেতমজুর এবং বিশেষ করে তফসিলী সম্প্রদায় ও তফসিলী উপজাতির ভূমিহীন খেতমজুরদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সরকারের নির্দেশ ছিল যে, ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সিলিং সম্পর্কে নতুন আইন প্রণয়নের কাজ রাজ্য সরকারগুলিকে শেষ করতে হবে এবং সেই সব আইন ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী থেকে বলবৎ হবে।

(৪) **জমির সংবদ্ধকরণ ঃ** কৃষকদের বিক্ষিপ্ত জমি একত্র সংবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যতে জমির খণ্ডীকরণ বন্ধ করার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের অন্ধ্র এলাকা, তামিলনাডু, কেরালা ও উড়িষ্যা বাদে আর সব রাজ্যেই আইন পাস করা হয়েছে। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছামূলক সংবদ্ধকরণের এবং অন্যান্য রাজ্যে বাধ্যতামূলক সংবদ্ধকরণের আইন পাস করা হয়েছে।)

১৪.৫. ভূমি সংস্কারের পর্যালোচনা

Review of Land Reforms Measures

১. ভারতের অর্থনীতিতে জমি একটি মূল্যবান সম্পদ অথচ পরিমাণে অপ্রতুল। জমির সিলিং আইনের উদ্দেশ্য হল প্রভূত পরিমাণ জমির মুষ্টিমেয় মালিক-ভূস্বামীদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে খেতমজুর, ভাগচাষী ও ছোট চাষী প্রভৃতি জমির প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বিলি করা। কিন্তু এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ন্যায্য এবং মহৎ উদ্দেশ্যে সাড়ম্বরে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের পর বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের জমির মালিকানার উপর সিলিং ধার্য করে রাজ্যে রাজ্যে যে আইন পাস হয় চার রকমের ত্রুটির জন্য তা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। প্রথমতঃ, অন্ধ্র, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অনেক রাজ্যে সিলিং-এর অধীন জমির পরিমাণ অনেক বেশি রাখা হয়েছিল। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিলিং ছিল ব্যক্তিগত, পারিবারিক নয়। ফলে উদ্বৃত্ত জমি বেশি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়তঃ, নানারূপ ফলের বাগিচা, বাগান ও বাণিজ্যিক ফসলের জমি ইত্যাদিকে ওই সব আইনে সিলিং থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আইনের এই ফাঁকটির সুযোগ নিয়ে বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা সিলিং আইন ফাঁকি দিয়েছে। তৃতীয়তঃ, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে উদ্বৃত্ত জমির জন্য বাজার দামে ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে কায়েমী স্বার্থের সুবিধা এবং সরকারের পক্ষে উদ্বৃত্ত জমি গ্রহণ করার নতুন সমস্যা দেখা দেয়। পরে, ১৯৭৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে (৩৪তম সংশোধন) জমির সিলিং আইনকে নবম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করে তা আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত করে সমস্যার সমাধান করা হয়। চতুর্থতঃ, সিলিং আইনে আগে সাবালক পুত্রদের পৃথক পরিবার বলে গণ্য করে মূল পরিবারের সিলিংয়ের সম-পরিমাণ জমি তাদের প্রত্যেকের জন্য রাখতে হত বলে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যেত কম। বর্তমানে তা সংশোধন করা হয়েছে। ফলে মোট উদ্বৃত্ত জমি কমই পাওয়া গেছে।

২. ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় অন্য তিনটি দিক হল, চাষীদের চাষের অধিকারের নিরাপত্তা, জমির খাজনা ধার্য করা এবং জমি বন্দোবস্তের শর্তাবলী নির্ধারণ করা। কিন্তু ভারতে ভূস্বামীকে জমির মালিকানা বজায় রাখতে দিয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যে সব আইন পাস করা হয়েছে তা বিশেষ সফল হয়নি। কারণ, খাজনা বাড়ানোর অধিকার ভূস্বামীর থেকে গেছে, উচ্চ হারে ধার্য খাজনার অনাদায়ে চাষীকে জমি থেকে উৎখাত করার অধিকার থেকে গেছে। তাছাড়া অধিকাংশ চাষী যেখানে ভাগচাষী, সেখানে মুষ্টিমেয় চাষীর জমি বন্দোবস্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অর্থহীন।

৩. (ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলির আরেকটি ত্রুটি হল, বিলি করা উদ্বৃত্ত জমির চাষীরা ছাড়া বা যারা জমি পুরো দামে ভূস্বামীর কাছ থেকে কিনে নিচ্ছে তেমন চাষীরা ছাড়া অন্যান্য চাষীদের সাথে রাষ্ট্রের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেই।)

(৪. ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগের মূল কারণ চারটি ঃ (ক) খেতমজুর, গরিব চাষী ও ভাগচাষীরা অসংগঠিত ও নিষ্ক্রিয় বলে নিচ থেকে সরকারের উপর কোনো চাপ নেই। (খ) আমলাতন্ত্রের সহানুভূতিহীন, আগ্রহহীন মনোভাব; (গ) জমি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য ও দলিলপত্রের অভাব; এবং (ঘ) মামলা মোকদ্দমা। এই দেখে পরিকল্পনা কমিশনের টাস্ক ফোর্স মন্তব্য করেছে ঃ "যে সমাজে সমগ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগুলি, বিচারবিভাগীয় ঘোষণাগুলি ও পূর্ব দৃষ্টান্ত-গুলি, প্রশাসনিক ঐতিহ্য ও কার্যধারা প্রভৃতি সবই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতার ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজব্যবস্থার সপক্ষে প্রযুক্ত হয়, সেখানে গ্রামীণ এলাকায় সম্পত্তির কাঠামো পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে রচিত একটি বিচ্ছিন্ন আইনের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই সামান্য। এবং যে যৎসামান্য সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল তা-ও আইন-গুলির ছিদ্রপথে এবং দীর্ঘপ্রলম্বিত মামলা-মকদ্দমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।" এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য বাহুল্যমাত্র।

(একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর ও কেরালা ছাড়া ভারতে আর কোনো রাজ্যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা সন্তোষজনক অগ্রগতি লাভে সক্ষম হয়নি। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২৪ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১২ লক্ষ ১২ হাজার একর হল আবাদী জমি এবং তা থেকে ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমি ভূমিহীন খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।)

(১৯৮২-র ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা ভারতে মোট ২ কোটি

৭৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর উদ্বৃত্ত জমির আনুমানিক হিসাব পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উদ্বৃত্ত বলে ঘোষিত হয়েছে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮০ হাজার একর (৬০%)। এর ৩৮·৯% বা ১ কোটি ৮ লক্ষ একর সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। তার ২৮·২% বা ৭৮ লক্ষ ৪০ হাজার একর বিলি করা হয়েছে।)

১৮.৬ পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের অগ্রগতি

Progress of Land Reforms in West Bengal

গ্রামীণ জনজীবনে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভূমিসংস্কার কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ও সুসংহত কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। এই পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্পণ করা হয়েছে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির উপর। ইতিপূর্বে দুই দশকেরও অধিক কাল ধরে ১৯৫৩ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৫৫ সালের ভূমিসংস্কার আইন চালু ছিল। জমিদারি-স্বত্ব বিলোপ, জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন সম্বন্ধে অনেক বিস্তারিত ব্যবস্থা এই আইন দুটিতে ছিল। কিন্তু আইনের বিধি এবং তার প্রয়োগের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। আইনের বিধানগুলি রূপায়িত করার কাজ যতটা গুরুত্ব দিয়ে করা প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি। বিগত আট বছর ধরে ভূমিসংস্কার আইনের বিধানগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার জন্য প্রশাসনকে তৎপর করতে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির প্রতিটি কাজে বিভিন্ন রূপে কৃষক সংগঠনগুলির সহযোগিতা এবং পঞ্চায়েত সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। উন্নয়নের কর্মসূচিতে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা এই রাজ্যে সর্বপ্রথম।

ভূমিসংস্কার কর্মসূচির প্রথম লক্ষ্য হল জমির মালিকানা এবং প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈষম্য ও অসঙ্গতিগুলি অন্তত কিছু পরিমাণে দূর করা। জমিদারি বিলোপের ফলে স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তির হাতে প্রভূত পরিমাণ জমির মালিকানার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তারপর ভূমিহীনদের মধ্যে অতিরিক্ত জমি বিতরণ এবং ভাগচাষীগণের জমির উপর স্বত্ব নির্বিঘ্ন ও সুরক্ষিত করার কাজে ক্রমে একটি সার্বিক বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে রয়েছে ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি সরকারে ন্যস্ত করা, জমির প্রাপক এবং ভাগচাষিগণকে চাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান এবং গ্রামাঞ্চলে কয়েক শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিকে বাস্তুজমির স্বত্ব প্রদান প্রভৃতি প্রকল্প। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হল, প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যেই যত বেশি পরিমাণ সম্ভব ঊর্ধ্বসীমা-বহির্ভূত জমি দ্রুততার সঙ্গে সরকারে ন্যস্ত করা। আগে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইনগুলিতে অনেক মারাত্মক ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, ছিল বিবিধ ধরনের ছাড়ের ব্যবস্থা এবং অনেক রকমের ফাঁক। বড় বড় জোতদারেরা এই ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে; বে আইনীভাবে এবং দুরভিসন্ধি নিয়ে প্রচুর জমি হস্তান্তর হয়েছে নানা উপায়ে। আইন কার্যকরী করার কাজ যদি দ্রুততার সঙ্গে না করা হয় তাহলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ধুরন্ধর লোকেরা ঊর্ধ্বসীমা বিধিকে এড়িয়ে যেতে পারে। এজন্য তারা প্রচলিত আইন ব্যবস্থার সর্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ করে সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার সুযোগ পায়। এই জন্যই যারা নানা গোপন উপায়ে সীমাতিরিক্ত জমি রেখেছে তাদের সম্বন্ধে যথাশক্তি কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনকে নিয়োজিত করা হয়েছে। এই সঙ্গে ফাঁকি দিয়ে রাখা সীমাবহির্ভূত জমি খুঁজে বের করার ব্যাপারে পঞ্চায়েতের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে যা পূর্বে আর কখনও করা হয়নি। এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ একর কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা বিষয়ক আইনে সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

ন্যস্ত জমি বণ্টন সম্পর্কে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে কাজের উৎকর্ষের উপর, যাতে যথার্থই যাঁরা ভূমিহীন তাঁরাই যেন উদ্বৃত্ত জমি পান। প্রতিটি ভূমিহীনকে, স্বল্প পরিমাণ হলেও, একখণ্ড জমি দেওয়া—যে জমিকে কেন্দ্র করে সেই দরিদ্র কৃষক ক্রমে স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন। যদি ঐ কৃষককে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা যায়, তাঁর জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা যায় তবে ঐ জমি থেকে বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। সেই সঙ্গে পশুপালন, মৎস্যচাষ, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি অনুপূরক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলে তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত হবে। ভূমি-সংস্কার কর্মসূচীর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। এইরূপ যৌথ প্রচেষ্টার ফলে ৩১ মার্চ, ১৯৮৫ পর্যন্ত ৮·০৩ লক্ষ একর ন্যস্ত জমির পুনর্বণ্টন সম্ভব হয়েছে। ঐ জমি পেয়েছেন প্রায় ১৫·৯৬ লক্ষ ব্যক্তি। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই জমি-প্রাপকদের প্রায় ৫৫ শতাংশ তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। যত শীঘ্র সম্ভব বাকী কৃষিজমি উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বামফ্রন্ট সরকারে ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গ হল বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষা এবং বর্গাজমিতে তাঁদের নিরাপত্তা বিধান। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার কাজকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের সময় থেকেই বর্গাদারদের নামে সেটলমেণ্ট রেকর্ডে নথিভুক্ত করা জরিপ ও সেটেলমেণ্ট কাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু আইনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নথিভুক্তির কাজ হয়েছিল সামান্য মাত্র। ১৯৭৭ সালে দেখা গিয়েছিল যে মাত্র তিন লক্ষের মত বর্গাদারকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তারপর থেকে বামফ্রণ্ট সরকার 'অপারেশন বর্গা' নামে বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা চালান তা এত পরিচিত যে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। সামান্য ৭ বছরের স্বল্প সময়ে প্রায় ১০ লক্ষের মত নাম নথিভুক্ত হয়েছে। ৩১ মার্চ, ১৯৮৫ তারিখে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ ১৭ লক্ষ। এ বিষয়ে সরকারি প্রশাসন যেমন অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে তেমনি পঞ্চায়েত। রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কৃষক সংগঠনগুলিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশাসনিক প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণ সহায়তা করেছে। সাধারণ জরিপের কাজ এবং অপারেশন বর্গা উভয়ের মাধ্যমেই নথিভুক্তিকরণের কাজ চলেছে। বর্গাদারগণের অধিকার সুরক্ষা ও চাষের নিরাপত্তা বিধানের ফলে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে অস্থিরতা হ্রাস পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে বর্গাদারগণ তাঁদের জমি থেকে আরো অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত হচ্ছেন।

জমি পুনর্বণ্টন এবং সমস্ত কৃষকের বিশেষত ভাগ চাষিগণের স্বত্ব নিরাপদ করার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিগণ যাতে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান, আর্থিক ঋণ এবং কৃষি সরঞ্জামাদির যথোপযুক্ত সাহায্য পান সেদিকেও সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। সমস্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টাই যাতে এদের দিকেই প্রসারিত হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং চেষ্টা চলছে যাতে এই কাজের উপযোগী প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠে। আই আর ডি পি, এন আর ই পি প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীন বিবিধ সুযোগ ও সহায়তা প্রদানের বিষয়ে পাট্টাপ্রাপক ও বর্গাদারদেরই অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। পাট্টা-প্রাপক ও বর্গাদারদের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা বিগত কয়েক বছরে বিস্তৃততর করা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মাত্র ৫৯,০০০ জন ব্যক্তিকে ঋণদানের ব্যবস্থা করে এই পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালে এই পরিকল্পনায় প্রায় ৩ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। ১৯৮৫-র খারিফ মরশুমে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ। আই আর ডি পি, এন আর ই পি, আর এল ই জি পি এবং তৎসহ ভূমি উন্নয়ন বিষয়ক একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প ইত্যাদির সঙ্গে এই ঋণদান-সূচি মিলিত হয়ে সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচিকে বিস্তৃত, ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করে তুলেছে।

১৯৭৫ সালের বাস্তুজমি গ্রহণ আইনের প্রয়োগেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা গেছে। পঞ্চায়েতসমূহের সহায়তায় এই প্রকল্পে প্রায় ১'৯৪ লক্ষ ব্যক্তিকে বাস্তুজমির স্বত্ব প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালের শেষ পর্যন্ত শহরাঞ্চলে ১০'৯২ লক্ষ বর্গমিটার উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

১৮.৭ জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

Fixation of Ceiling on Land Holdings : Arguments For and Against

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জোতজমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত বলে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন মত প্রকাশ করেছিল। সাধারণভাবে ভারত সরকার কৃষি সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে এই নীতি কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় সকল রাজ্যেই ভূমি-ব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়। এই ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

উদ্দেশ্য ও সপক্ষে যুক্তি : (১) জোতজমির মালিকানায় দেশে প্রচণ্ড বৈষম্য বর্তমান। কৃষিজমির অধিকাংশ মুষ্টিমেয় পরিবারের কুক্ষিগত হয়েছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ধনবণ্টন ও আয়বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রবল বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে সম্পদ, আয় ও সুযোগের বৈষম্য হ্রাস করাই ভারতের অর্থনীতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এই পথে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

(২) অতীতে দেখা গেছে যে, রায়তওয়ারী অঞ্চলেও কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ বেশি বেড়ে গেলে তারা জমিতে কোর্ফা প্রজা দ্বারা চাষ করায়। ফলে নতুন নতুন ভাড়াটিয়া চাষীর উদ্ভব হয়। এই সকল চাষীর সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। জোতজমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিলে এরূপ নতুন মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হবে না।

(৩) জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দিলে যে

উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে, তা খুব ছোট মালিক-কৃষক ও ভূমিহীন খেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হবে। এতে গ্রামের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র কৃষকদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হবে। জমি লাভ করে তারা গ্রামসমাজে পদমর্যাদায় উন্নত হয়েছে বলে অনুভব করবে। সামগ্রিক গ্রামসমাজের মানসিকতার এক বিরাট প্রগতিশীল পরিবর্তনের সূত্রপাত হবে।

(৪) জমি পেলে এই সকল কৃষক উদ্দীপনার সাথে চাষ করবে, তাতে জমির পূর্ণতর ব্যবহার সম্ভব হবে এবং ফলন বাড়বে।

(৫) গ্রামবাসীদের মধ্যে জমির মালিকানার মোটামুটি সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভেদ কিছুটা দূর হবে। তাতে **সমস্বার্থবোধ** জাগবে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সমবায় গ্রাম পরিচালন ব্যবস্থা, সমবায় কৃষি পদ্ধতির অগ্রগতি দ্রুততর হবে।

(৬) দরিদ্র কৃষকদের আয় ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে।

সামগ্রিক বিচারে এতে কৃষিকাঠামো ও গ্রামীণ সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির বাধা অপসারিত হবে।

বিরুদ্ধে যুক্তি : কিন্তু এই ব্যবস্থার বিরোধীরা জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখান যে,—(১) শহরাঞ্চলের ব্যক্তিগত ধনসম্পদের মালিকানার যদি সীমা নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তবে গ্রামীণ ক্ষেত্রে জোতজমির মালিকানার সীমা নির্দিষ্ট করা অন্যায়। এ যুক্তিটি জোরালো নয়, কারণ জমি প্রকৃতির দান এবং এর যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। জমি অন্যান্য সম্পদের মত নয়। তা ছাড়া এতে জমি থেকে লব্ধ আয়ের সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। শুধু জমির মালিকানার উপর সীমা আরোপ করা হয়েছে। (২) কেউ কেউ বলেছেন যে, এতে কৃষকদের উদ্যম নষ্ট হবে, কারণ তারা চাষের জমি বাড়াতে পারবে না। এ যুক্তিও দুর্বল। কারণ, যে দেশে কৃষকদের প্রায় অর্ধেকেরই কোনো জমি নেই কিংবা থাকলেও সামান্য, সেখানে কাউকেও খুব বেশি জমির মালিক হতে দেওয়া অন্যায়।

সুতরাং, সবদিক বিবেচনা করলে জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণকে একটি শুভ ও কাম্য পদক্ষেপ বলে সমর্থন করা উচিত।

১৮৮. কৃষি শ্রমিক : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, পরিমাণ

Agricultural Labour : Definition Features and Magnitude

১. **সংজ্ঞা :** গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের জীবিকায় নিযুক্ত মানুষ রয়েছে। আছে গ্রামীণ শ্রমিক যাদের জমিজমা, সম্পত্তি কিছু নেই, আছে অতি ছোট জমির মালিক চাষী, ভাগচাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রী ইত্যাদি যারা দরকারী বাড়তি আয়ের জন্য সাময়িক ভাবে অন্যের জমিতে মজুরি খাটে। সুতরাং কৃষি শ্রমিক কাদের বলা যায়, এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এই কারণে প্রথম কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫০-৫১) স্থির করেছিলেন, যারা বছরে তাদের মোট কাজের দিনের অর্ধেক বা তার বেশি দিন মজুরিতে কৃষির কাজ করছে তাদের কৃষি শ্রমিক বলে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, বছরে কৃষিকাজে নিয়োগের পরিমাণকে কৃষি শ্রমিক কিনা সে বিচারের মাপকাঠি রূপে কমিটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫৬-৫৭) স্থির করেছিলেন, কৃষিকাজে উপার্জিত মজুরি যাদের আয়ের প্রধান উপায় তারাই হল কৃষি শ্রমিক। অর্থাৎ এবার কৃষিকাজে মজুরিরূপে উপার্জিত আয়কে কৃষিশ্রমিক কিনা সে বিচারের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অনেকেই এই অভিমতের পক্ষপাতী।

২ **বৈশিষ্ট্য :** কৃষি শ্রমিকদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা শিল্প শ্রমিকদের সাথে তাদের স্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়।

(১) কৃষি শ্রমিকরা শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে অসংগঠিত অংশ। শিল্প শ্রমিকদের মতো তারা শত শত বা হাজারে হাজারে একই মালিকের দ্বারা নিযুক্ত হয় না। ছোট বড়ো মাঝারি নিয়োগকারীদের দ্বারা অল্প সংখ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে তারা নিযুক্ত হয়। এই ধরনের নিয়োগ সংগঠন গড়ে তোলার পথে একটি বড়ো বাধা।

(২) কৃষি শ্রমিকদের একটি অংশ, অনেক স্থানে একটি বড়ো অংশ স্থানীয় নয়, বহিরাগত, যারা কাজের শেষে নিজেদের দেশ গাঁয়ে ফিরে যায়। এটিও তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার আরেকটি বাধা।

(৩) কৃষি শ্রমিকদের নিয়োগকর্তারা অধিকাংশই মাঝারি চাষী, অনেকে আবার ছোট চাষীও বটে। এ কারণে নিয়োগকর্তা ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে একটা সরাসরি ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

(৪) কৃষি শ্রমিকরা বেশিরভাগই অদক্ষ শ্রমিক। ফলে চাহিদার তুলনায় এদের যোগান বেশি।

(৫) কৃষি শ্রমিকদের কাজের শর্তাবলীর উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রণীত একমাত্র ন্যূনতম মজুরি আইন ছাড়া আর

বিশেষ কোনো আইনকানুনও নেই। এবং যা আছে তাও এদের অসংগঠিত অবস্থা, দারিদ্র্য এবং অদ প্রকৃতি প্রভৃতির দরুন নিয়োগকর্তারা সহজেই অমান্য করতে সক্ষম হয়।

৩. **কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা বা পরিমাণ :** ভারতের লোকগণনায় রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যায় স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ৫৪ লক্ষে (জম্মু কাশ্মীর ও আসাম বাদে) পরিণত হয়েছে। সুতরাং ভারতে কৃষি শ্রমিক সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কর্মে নিযুক্ত জনশক্তির শতাংশ হিসাবে কৃষি শ্রমিকরা ১৯৫১ সালে ১৯'৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮১ সালে ২৫'১৬ শতাংশে পরিণত হয়েছে। প্রথম গ্রামীণ শ্রমিক অনুসন্ধানী কমিশনের মতে কৃষি শ্রমিক পরিবারগুলি ছিল মোট গ্রামীণ পরিবারের ২১৮ শতাংশ। ১৯৭৪-৭৫ সালে দ্বিতীয় গ্রামীণ শ্রমিক অনুসন্ধানী কমিশনের হিসাব বেড়ে ২৫'৩ শতাংশ হয়।

১৮.৯ কৃষি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা
Economic Condition of Agricultural Labour

১. **কর্মসংস্থান :** জমির মালিক চাষীদের চাষের কাজে পরিবারের কর্মক্ষম লোকের চাইতে বেশি লোকের দরকার হলে তবেই তারা কৃষি শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করে। সুতরাং কৃষি শ্রমিকেরা চাষের মরশুম ছাড়া বৎসরের অন্য সময় জমিতে চাষের কাজ পায় না। এই কারণে ভারতের সর্বত্র কৃষি শ্রমিকেরা বৎসরের কিছুটা সময় মাত্র কাজ পায়। সুতরাং ভূমিহীন ও অন্যান্য জীবিকার সুযোগহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক বেকারী ও স্বল্প নিযুক্তি দেখা যায়। ১৯৫০-৫১ সালের প্রথম কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি দেখেছিলেন বৎসরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে কৃষি শ্রমিকেরা ১৮৯ দিন খেত-খামারে ও ২৯ দিন অন্যান্য কাজে, মোট ২১৮ দিন নিযুক্ত থাকে ও বাকি ১৪৭ দিন বেকার থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সালের দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধানী কমিটি ওই অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখতে পাননি। তারা দেখেছিলেন পুরুষ কৃষি শ্রমিকরা বৎসরে ২২১ দিন ও নারী কৃষি শ্রমিকরা ১৪১ দিন কাজ পায়; সাময়িক শ্রমিকরা কাজ পায় ২০১ দিন। ১৯৬৩-৬৪ সালের গ্রামীণ শ্রম অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় পুরুষ শ্রমিকরা বৎসরে ২৪০ দিন ও নারী শ্রমিকরা ১৫৯ দিন কাজ পায়। ১৯৭৪-৭৫ সালের গ্রামীণ শ্রম অনুসন্ধানের দ্বারা দেখা যায় পুরুষ শ্রমিকরা নগদ মজুরিতে বৎসরে কাজ পাচ্ছে ১৯৩ দিন, নারীরা কাজ পাচ্ছে ১৩৮ দিন। সুতরাং বৎসরে ৪/৫ মাসের বেশি সময় যে কৃষি শ্রমিকরা বেকার থাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর উপর তাদের দৈনিক কত ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে তাও কিছু নির্দিষ্ট নয়। মালিক, শ্রমিক ও স্থানীয় রীতির উপর তা নির্ভর করে এবং সেটা ১০-১২ ঘণ্টাও হতে পারে। তা ছাড়া, খোলা আকাশের নিচে রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যেই তাদের কাজ করতে হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি যে সব রাজ্যে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে সেখানে কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা বেড়েছে। যেখানে কৃষি শ্রমিকদের অভাব ঘটেছে সেখানে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ ঘটছে।

২. **মজুরি ও আয় :** কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ভারতের প্রায় সর্বত্রই সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে। ১৯৪৮ সালে ন্যূনতম মজুরি আইন পাস হবার পর কৃষি শ্রমিকদের মজুরির হার নির্ধারিত হয় দৈনিক ৬২ পয়সা থেকে ১'৫০ টাকার মধ্যে। ১৯৫০-৫১ সালে পুরুষ কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরির হার ছিল ১'০৯ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে তা কমে হয় ০'৯০ পয়সা (দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি); ১৯৭৪-৭৫ সালে তা বেড়ে হয় ১'২৪ টাকা (গ্রামীণ শ্রম অনুসন্ধান)। নারী শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৯৫০-৫১ সালে ০'৭০ পয়সা থেকে বেড়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে ২'২৭ টাকা হয়। শিশু কৃষি শ্রমিকদের মজুরির হার ১৯৫০-৫১ সালে ০'৬৮ পয়সা থেকে বেড়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে হয় ১'৮২ টাকা। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে কৃষি শ্রমিকদের মজুরির হার সামান্য বাড়লেও মূল্যস্তরের বৃদ্ধির দরুন তাদের প্রকৃত মজুরির হার ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে কমে যায়। পরবর্তীকালে উচ্চফলন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ এবং সবুজ বিপ্লবের ও কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের দরুন কৃষি শ্রমিকের চাহিদা সংকুচিত হয়েছে। ফলে কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি ও আয়ের এবং জীবন ধারণের মানের বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি। ন্যূনতম মজুরি আইনের দ্বারা কৃষি শ্রমিকদের নির্ধারিত মজুরির হার অত্যন্ত কম থেকে যাচ্ছে এবং তা বলবৎ করারও কোনো সরকারী ব্যবস্থা নেই। যেখানে কৃষি শ্রমিকরা সংগঠিত সেখানে আন্দোলনের শক্তিতে নির্ধারিত হারের চাইতে খানিকটা বেশি হারে তারা মজুরি আদায়ে সক্ষম হয়। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই সে অবস্থা নেই। জাতীয় কৃষি কমিশনও এজন্য, কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন।

গ্রামীণ পরিবারগুলির ৬১ শতাংশেরই কোনো জমি নেই, বা থাকলেও তা ১ হেক্টেয়ারেরও কম। এদের হাতে রয়েছে মোট আবাদী জমির ৮ শতাংশ মাত্র। তার মধ্যে ২২ শতাংশ পরিবারের কোনো জমি নেই, আর ২৫ শতাংশ

পরিবারের জমি হল মাত্র আধ হেক্টেয়ার করে। এরাই হল দেশের কৃষি শ্রমিক পরিবারগুলির উৎস। ১৯৫০-৫১ সালে কৃষি শ্রমিক পরিবারের গড়পড়তা পরিবার পিছু বার্ষিক আয় ছিল ৪৪৭ টাকা। ১৯৫৫-৫৭ সালে তা কমে ৪৩৭ টাকা হয়। ১৯৬৩ ৬৪ সালে তা বেড়ে ৬০০ টাকা ও ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৬৭১ টাকা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে যদি মুদ্রাস্ফীতিটা বিবেচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক গড়-পড়তা আয় প্রায় একই স্তরে থেকে গেছে।

৩. **দেনা**ঃ কোনো রকমে বেঁচে থাকার প্রান্তসীমায় অবস্থিত দেশের কৃষি শ্রমিক পরিবারগুলির শুধু আয় এবং কাজই কম তা নয়, বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে তাদের দিনের পর দিন দেনার অতলে তলিয়ে যেতেও হচ্ছে। প্রথম কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি দেখেছিলেন কৃষি শ্রমিক পরিবার-গুলির ৪৪'৫ শতাংশই হল দেনাগ্রস্ত। দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি দেখলেন দেনাগ্রস্ত পরিবারগুলির অনুপাত বেড়ে ৬৪ শতাংশ হয়েছে (১৯৬৪ ৬৫) এবং পরিবার পিছু দেনার পরিমাণ ১০৫ টাকা থেকে বেড়ে ২৪৪ টাকা হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ এর গ্রামীণ শ্রম অনুসন্ধানে দেখা গেল দেনাগ্রস্ত পরিবারের অনুপাত বেড়ে ৬৬ শতাংশ হয়েছে এবং পরিবারপিছু দেনার পরিমাণ হয়েছে ৫৮৪ টাকা। ওই অনুসন্ধানে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত আরেকটি সমীক্ষায় (১৯৭১-৭২) দেখা গেছে ষাট ও সত্তরের দশকে দেশে গ্রামীণ ঋণদানের জন্য ব্যাঙ্ক প্রভৃতির বিস্তার সত্ত্বেও কৃষি শ্রমিক ঋণের বেশির ভাগটাই নিতে বাধ্য হয়েছে মহাজনদের কাছ থেকে, যা পরিশোধ করার কোনো উপায়ই তাদের নেই।

৪. **জীবনযাত্রার মান** (Standard of living)ঃ যে কোনো মানুষের অথবা সমাজের যে কোনো অংশের জীবনধারণের মান তার ভোগব্যয় (consump tion expenditure) এবং ভোগের ধাঁচের (consump tion pattern) দ্বারা প্রকাশ পায়। প্রথম কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫০ ৫১) দেখেছিলেন, সমস্ত কৃষি শ্রমিক পরিবারেই বার্ষিক মাথাপিছু গড় ভোগব্যয় ছিল ১৩৮'৯০ টাকা মাত্র। বাস্তব তা ৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা অবধি ছিল। দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫৫ ৫৭) দেখতে পেয়েছিলেন, ওই গড়পড়তা বার্ষিক মাথাপিছু ভোগব্যয় অতি নগণ্য মাত্রায় বেড়ে ১৪১ টাকা হয়েছে। তাদের ব্যয়ের ধাঁচটি ছিল এই রকম, খাদ্য-দ্রব্যের জন্য ব্যয় হত আয়ের ৮৫ শতাংশ, পরিধেয় ও পাদুকার জন্য ব্যয় হত আয়ের ৬ শতাংশ, বাকিটা ব্যয় হত সেবা ও বিবিধ প্রয়োজনে। সেই স্বাধীনতালাভের পর থেকে এতাবৎকাল কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বাস্তবিক পক্ষে অতি নিম্নস্তরেই থেকে গেছে ও মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন তা আরও কমে গেছে। ফলে তাদের ব্যয়ের মাত্রায় কিংবা ব্যয়ের ধাঁচে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই ঘটনাগুলি থেকে তাদের তীব্র দারিদ্র্য ও শোচনীয় জীবনযাত্রার মান ফুটে উঠছে। স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পরেও সমাজের এই অংশের এই দুঃস্থ অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

৫ **খতবন্দী শ্রমিক** (Bonded labour)ঃ ভারতে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে একটি অংশ হল 'খতবন্দী শ্রমিক' বা 'বন্ডেড লেবার'। কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে এরা একটি বিশিষ্ট অংশ এবং এদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। এই খতবন্দী শ্রমিক প্রথা এক ধরনের কৃষিদাসত্বমূলক (agrarian serfdom) প্রথা এবং ভারতে প্রাচীন প্রাক-ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার একটি ভগ্নাবশেষ ও ভারতের পক্ষে অন্যতম কলঙ্কস্বরূপ। এই প্রথার বৈশিষ্ট্য হল, ঋণ নিতে গিয়ে মহাজনের কাছে নিজের কিংবা পরিবারের সকলের, অথবা কোনো একজনের দাসখত লিখে দিতে হয়। যতদিন না মহাজন ওই ঋণ শোধ হল বলে ঘোষণা করে ততদিন খাতক বা তার পরিবারের সকলকে বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মহাজনের জন্য মহাজনের জমিতে কাজ করতে হয়। ১৯৭৬ সালে খতবন্দী শ্রমিক প্রথা (অবলোপ) আইন পাস করেও তা বলবৎ করার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে এই অভিশপ্ত প্রথা ভারতের বিভিন্ন পশ্চাৎপদ অঞ্চলে এখনও বজায় রয়েছে।

১৪.১০. ভারতে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ও তাদের অর্থ-নীতিক অবস্থা

Agricultural Labour : Number and Economic Condition

১ দ্বিতীয় গ্রামীণ শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ পরিবারগুলির ২৫ শতাংশই হল কৃষি শ্রমিক পরিবার। তাদের ৮৫ শতাংশই সাময়িকভাবে কাজ পায়, মাত্র ১৫ শতাংশ কোনো না কোনো ভূস্বামীর কাছে স্থায়িভাবে কাজে নিযুক্ত থাকে। এদের অর্ধেকের বেশি পরিবারের কোনো জমিজমা নেই, বাদবাকিদের জমিজমা নামমাত্র। এই কৃষি শ্রমিক পরিবারগুলি দেশের সবচেয়ে গরিব পরিবারগুলির অন্যতম। কোনোমতে এরা বেঁচে রয়েছে। এদের জীবনধারণের মান নিম্নতম। এদের ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশই হল তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকিরা তফসিলী উপজাতি ও সমাজের অন্যান্য পশ্চাৎপদ অংশের মানুষ। বিভিন্ন সরকারী অনুসন্ধান কমিটি ও লোক-

গণনার রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে দেশে কৃষি শ্রমিক সংখ্যা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ থেকে বৎসরে ১৭ লক্ষ করে বেড়ে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ শ্রমশক্তির মধ্যে এদের অনুপাত ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮১ সালে ২৫ শতাংশে পরিণত হয়েছে। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণ বহু।

২. প্রথম কারণ, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য উপায়ে জীবিকাসংস্থানের অভাবে ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ জনসংখ্যা জমি তথা কৃষিতে শ্রমিক রূপে যোগ দিচ্ছে। ভূস্বামীরা তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অতি স্বল্প মজুরিতে সাময়িকভাবে তাদের নিয়োগ করছে। ফলে তাদের কর্মসংস্থান ও আয় স্বল্প থেকে গেছে।

৩. দ্বিতীয় কারণ, দেশে ছোট জমির মালিক প্রান্তিক চাষীরা ক্রমশ দুস্থতার দরুন জমিজমা হারিয়ে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। কৃষির উন্নতি, তথা সেচ, নলকূপ, রাসায়নিক সার, উন্নতমানের বীজ প্রভৃতির জন্য পরিকল্পনায় যে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ ১৯৫১ সাল থেকে ঘটছে তার সমস্তটাই বড়ো ও ধনীচাষীদের উপকারে লেগেছে, ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণের প্রায় সবটাই তারাই কুক্ষিগত করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

৪. তৃতীয় কারণ, দুস্থতা, বিকল্প কাজের অভাব, দেনার বোঝা এবং অসংগঠিত চরিত্র, এই সব কারণে ভূস্বামীদের সঙ্গে কৃষি শ্রমিকদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা নেই। মালিকরা যে সামান্য মজুরি দিতে চায় তাতেই তাদের বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়। এমনকি ন্যূনতম মজুরি আইনে সরকার যে ন্যূনতম মজুরির হার বেঁধে দেন তা পর্যন্ত বলবৎ করার কোনো সরকারী ব্যবস্থা না থাকায় ওই আইনটি অনেক স্থানেই প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

১৮.১১. কৃষি শ্রমিকদের জন্য গৃহীত সরকারী ব্যবস্থা ও সুপারিশ

Government Measures for Agricultural Labour & Suggestions

১. স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী স্তরে কৃষি শ্রমিক ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ন্যূনতম মজুরি আইন (১৯৪৮), জমির উপর সিলিং ধার্য করা ও উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন ব্যবস্থা, গ্রামীণ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য শ্রম সমবায় গঠন, বিশেষ আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ভূমি উদ্ধার ও উদ্ধারকরা জমিতে ভূমিহীন কৃষকের বসতি স্থাপন, খতবন্দী শ্রমিক প্রথার বিলোপ আইন (১৯৭৬) এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি।

২. **আইনগত ব্যবস্থাসমূহ :** ভারতের সংবিধানে ভূমিদাসত্ব অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। খতবন্দী দাসত্বও ১৯৭৬ সালে আইনের দ্বারা বিলোপ করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ন্যূনতম মজুরি আইন পাস করে কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ভারতে অনেক রাজ্যেই কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিও নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এই সব আইনগত সরকারী ব্যবস্থা সত্ত্বেও, খতবন্দী দাসত্ব ও কৃষি শ্রমিকের সামান্য মজুরির হার বহু রাজ্যেই রয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ হল—(১) কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন ও সংগঠিত আন্দোলনের অভাব, (২) সরকারী আইনগুলি বলবৎ করার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব এবং (৩) গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব। ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ও ধনী চাষীদের সচ্ছলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবস্থার অনুন্নতি অব্যাহত রয়েছে। এই তিনটি কারণ দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হওয়া কঠিন।

৩. **কৃষি সংস্কার ও অন্যান্য কর্মসূচি :** পরিকল্পনাকালে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার দ্বারা জমির উপর সিলিং ধার্য করে উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ছোট প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে তা বণ্টনের যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল বাস্তবিক পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের আর কোনো রাজ্যে তা সবিশেষ অগ্রসর হয়নি। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কর্মসূচিও ব্যর্থ হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ধনী ও বড়ো চাষীদের প্রাধান্যের দরুন। পরবর্তীকালে ছোট চাষী উন্নয়ন সংস্থা (SFDA), প্রান্তিক চাষী ও কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন সংস্থা (MF & ALDA) প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পতিত জমি পুনরুদ্ধার করে তা কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সর্বশেষে প্রবর্তিত হয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি (REP)। পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকল্পে শ্রমনিবিড় কর্মকৌশল প্রয়োগ করে তাতে সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণে কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু তাতে সামগ্রিক সমস্যাটির সামান্য অংশমাত্র স্পর্শ করা গেছে। মূলে সমস্যাটিতে হাত এখনও পড়েনি। এজন্য স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে একদিকে দেশব্যাপী প্রকৃত ভূমিসংস্কারের সঙ্গে

সঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষি নির্ভর গ্রামীণ ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ যা স্থানীয়, পুঁজি, উপকরণ এবং দেশীয় ও দেশোপযোগী প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর হবে। তাহলেই একমাত্র কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা দূর হবে, উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকরা ওই সব শিল্পে কাজ পাবে, কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমবে ও কৃষি শ্রমিকদের মজুরির হার বাড়বে।

৪. **অন্যান্য ব্যবস্থা :** অন্যান্য সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামীণ কর্মসূচিতে নিয়োগের উপযোগী গ্রামীণ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম সমবায় (labour co-operatives) গঠনের প্রচেষ্টা। এই সমবায়গুলি সরকারী প্রকল্পে শ্রম সরবরাহের চুক্তি করে কাজ করবে। ফলে যে সময় মাঠে কাজ থাকে না সেই সময় কৃষি শ্রমিকরা সরকারী প্রকল্পে নিযুক্ত থাকতে পারবে। সারা বছর তাদের কাজ চলবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা খুব অল্প এলাকাতেই এখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়েছে। কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য যে কোনো প্রচেষ্টাতেই সবার আগে দরকার তাদের মধ্যে সংগঠন স্থাপন, সংগঠনের মারফত চেতনা সৃষ্টি এবং চেতনার ও সংগঠনের ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করা। তা না হলে ভালো ভালো সরকারী আইনও বিফল হচ্ছে, সরকারী কর্মসূচিগুলিও ব্যর্থ হচ্ছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের কৃষি-জোতের উচ্চতম সীমা নির্ধারণের প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

[Discuss the different aspects of the question of fixation of ceiling on agricultural holdings in India.]

২. ভারতের সাম্প্রতিককালের কৃষি সংস্কারের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ কৃষি সংস্কারের তাৎপর্যের উপর মন্তব্য কর।

[Describe the main features of the agricultural reforms that have been introduced in India in recent times and comment on their significance.]

৩. ভূমি সংস্কারের অগ্রগতির উপর টীকা লেখ।

[Write a note on the progress made in the sphere of land reforms.]

৪. স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে যে ভূমিসংস্কার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা কর। (ক) উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও (খ) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, এ দুটি ক্ষেত্রে এ নীতির প্রভাব কিরূপ হয়েছে ?

[Discuss the features of the land reform policy as adopted in India in the post-independence days. What has been the effect of this policy on (a) increasing productive efficiency and (b) ensuring social justice ?]

৫. "মানুষ ও ভূমির মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার চাইতে বেশি মৌলিক সম্পর্ক কোনো সমাজ বিজ্ঞানেই নেই।" ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরের উক্তিটি আলোচনা কর এবং ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে একটি উপযুক্ত নীতির সুপারিশ কর।

["There is no relationship in social sciences more fundamental than that existing between man and land." Discuss the statement in the context of the Indian economy and suggest a suitable land policy for India.]

৬. টীকা লেখ : ভারতে ভূমি সংস্কারের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা।

[Write a note on : the economic justification of land reforms in India.]

৭. স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে যে সকল ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য কি ? এ উদ্দেশ্যগুলি কতদূর সাধিত হয়েছে ?

[What were the objectives of the various land reform measures adopted in independent India ? How far have these objectives been achieved ?]

৮. ভারতের ভূমি সংস্কারের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give a brief account of the progress of land reforms measures in India.]

[C. U. B. A. (III), 1985]

৯. ভারতে কৃষিজোতের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিবার সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Argue the case for the imposition of a ceiling on agricultural holdings in India.]

[C.U.B.A. (III), 1984]

১০. ভারতে ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যগুলি নির্দেশ কর। ১৯৫১ থেকে ভারতে ভূমি সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Indicate the objectives of land reforms in

India. Briefly discuss the land reform measures undertaken in India since 1951.]

[C. U. B. Com. (Hons.) 1983]

১১. কৃষি শ্রমিকদের অর্থনীতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

[Briefly describe the economic condition and standard of living of the agricultural labourers.]

১২. কৃষি শ্রমিকদের দুরবস্থার কারণগুলি এবং এজন্য প্রতিকারমূলক সরকারী ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Briefly discuss the causes of distress of agricultural labourers and the measures adopted by the government for ameliorating their conditions.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ: (ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; (খ) জমির সিলিং; (গ) পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি।

[Write short notes on: (a) Permanent Settlement; (b) Celing on land holdings; (c) Progress of Land reform in West Bengal.]

২. 'কৃষি শ্রমিক' বলতে কাদের বোঝায়? তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

[Who are the agricultural labourers ? What are their features ?]

৩. কৃষি শ্রমিকের আয়, কর্মসংস্থান, দেনা ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

[Write short notes on income, employment, debt and standard of living of agricultural labourers.]

৪. খতবন্দী শ্রমিক কাদের বলে?

[Who are the bonded labourers ?]

কৃষির উপকরণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদনশীলতা

Agricultural Inputs, Technology And Productivity

১৯.১. ভূমিকা
Introduction

১. কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষিকার্যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যেমন কৃষকের স্বত্বস্বামিত্বের নিরাপত্তা, আর্থিক, সামাজিক ও আইনগত পদমর্যাদার উন্নতি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও প্রসার এবং নানান উৎপাদন উপকরণের যোগান।

২. কৃষিকার্যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও প্রসার বলতে প্রত্যক্ষভাবে, কৃষি জমির ব্যবহার পদ্ধতি অর্থাৎ কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন বোঝায়। উন্নত ধরনের সেচকার্য, ভূমি সংরক্ষণ, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, আধুনিক পদ্ধতিতে ভূমি-কর্ষণ, আবর্তন কৃষির প্রবর্তন ও প্রসার, শুষ্ক কৃষি ও মিশ্র কৃষির প্রবর্তন, চাষে পশুশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার (অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন) ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবস্থাই এর অন্তর্গত। এসব ব্যবস্থার সাহায্যে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে পারলে, অল্প ব্যয়ে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। কৃষিতে প্রয়োজনীয় মানবিক শ্রমের পরিমাণ কমবে। কৃষির উৎপাদনে আরো বেশি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব হবে। কৃষকের মাথাপিছু আয় বাড়বে। কৃষি থেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা শিল্পে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে। কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার আয়তন ক্রমশ কমতে থাকবে। কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার জন্য যে সম্ভাব্য সঞ্চয় এত কাল ধরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল সে প্রক্রিয়াটি আর কাজ করবে না। ফলে কৃষিজাত পণ্যের কিছু কিছু উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে। এ উদ্বৃত্তের দ্বারা শিল্পক্ষেত্রে ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত জনসমষ্টির প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শিল্পের ব্যবহার্য কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করা যাবে।

৩. কৃষিকার্যে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে দুটি বিষয় প্রয়োজন। প্রথমত, কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাধারণ ও আধুনিক কারিগরী শিক্ষার প্রসার চাই। দ্বিতীয়ত, কৃষিতে অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ চাই। যতই আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালিত হবে ততই তাতে পুঁজির প্রয়োজন বাড়বে। পুরাতন লাঙল ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতির তুলনায় আধুনিক কলের লাঙলের দাম অনেক বেশি আধুনিক সেচ, উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের জন্যও ব্যয় বাড়বে।

১৯.২. সেচ
Irrigation

১. প্রয়োজনীয়তা : কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এ জলের জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা কৃষির পশ্চাদপদ অবস্থারই পরিচায়ক। আধুনিককালে বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ কৃষির জন্য জল সরবরাহের যে ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে সেচব্যবস্থা তারই ফল। ভারতে তিনটি বিশেষ কারণে সেচের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(১) ভারতে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৫ ইঞ্চি হলেও, সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান নয়। স্থান বিশেষে ৪৬০ ইঞ্চি থেকে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত এর তারতম্য ঘটে। তা ছাড়া বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত। এইরূপ অবস্থার উপর নির্ভরশীল কৃষিকার্যের দ্বারা ফসলের উৎপাদন সুনিশ্চিত করা যায় না।

(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এক-ফসলী জমি দো-ফসলী জমিতে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিপাত অল্প হওয়ায় এরূপ প্রগাঢ় কৃষির অসুবিধা ঘটেছে। তা ছাড়া কোনো কোনো ফসলের জন্য বেশি জলের প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের দ্বারা তা পাওয়া যায় না।

(৩) অনেক সময় বর্ষা ঋতু তার স্বাভাবিক সময়সীমার আগেই শেষ হয়ে যায়। তাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

কৃষি-বিজ্ঞানিকগণের মতে, শুধুমাত্র উপযুক্ত সেচের দ্বারা বর্তমান কৃষিজমির ফলন দ্বিগুণ করা এবং ফসলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভারতে বর্তমানে মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ২২ ভাগ সেচের অধীন।

২. বিভিন্ন প্রকার সেচকার্য : ভারতে প্রধানত তিন প্রকারের সেচকার্য প্রচলিত যথা—(১) কূপ, (২) জলাশয়, (৩) খাল। সেচের অধীনে মোট জমির বেশিরভাগই খালসেচের অধীন।

৩. ভারতে সেচ সম্ভাবনা : পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ভারতে মাটির উপরে অবস্থিত জলসম্পদ হল প্রায় ১৭ কোটি হেক্টেয়ার-মিটার। তার মধ্যে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টেয়ার-মিটার জলসেচের কাজে লাগানো যেতে পারে এবং তার দ্বারা ৬ কোটি হেক্টেয়ার জমিতে সেচের জল দেওয়া যায়। ১৯৮৫-৮৬ পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটির নিচ থেকে ২ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টেয়ার-মিটার জলসম্পদ পাওয়া যেতে পারে ও তার দ্বারা ২ কোটি ২৩ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ করা যায়। বর্তমানে মোট আবাদী জমির ২৫ শতাংশ সেচের অধীন।

৪. সরকারী নীতি, পরিকল্পনা ও সেচকার্যের অগ্রগতি : সুদূর অতীতে ভারতের সেচকার্যের জন্য বহু জলাশয়, খাল ও কূপ খনন করা হয়েছিল। ইংরেজ আমলের শাসক শক্তির অবহেলায় ঐগুলির অধিকাংশই মজে নষ্ট হয়ে যায়। ইংরেজ শাসনের শেষ দিকে অবশ্য পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সেচকার্য ঘটে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সরকারী সেচকার্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হচ্ছে। যে সকল সেচকার্যে ৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হয় ঐগুলিকে বৃহৎ সেচকার্য (major irrigation works), যে সকল সেচকার্যে ৫ কোটি টাকার কম অথচ ২৫ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় হয় সেগুলিকে মাঝারি সেচকার্য (medium irrigation works) ও যে সকল সেচকার্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম ব্যয় হয় সেগুলিকে ক্ষুদ্র সেচকার্য (minor irrigation works) বলে গণ্য করা হয়। সকল প্রকার সেচের উদ্দেশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি।

১৯.৩. বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট নদী প্রকল্প
Multipurpose River Valley Projects

১. নদীবাহিত বিপুল জলরাশি যেমন সেচকার্যের জন্য ব্যবহার করার প্রচুর সুযোগ ভারতে রয়েছে, তেমনি নদীনালাগুলি অন্যান্যবিধ বহু উপায়েও দেশের সেবা করতে সক্ষম। নদী শাসন ও খাল খনন দ্বারা নিম্নলিখিত উপকার একযোগে সাধিত হতে পারে—১. সেচকার্য, ২. বন্যানিয়ন্ত্রণ, ৩. বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, ৪. নৌ-পরিবহণ ও ৫. কৃত্রিম জলাধারগুলিতে মৎস্য চাষ। এই-গুলির মধ্যে প্রথম দুটি প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সহায়ক। তৃতীয়টি যান্ত্রিক কৃষির ও শিল্পায়নের, চতুর্থটি অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে ও পঞ্চমটি দেশের মৎস্যের চাহিদা পূরণের সহায়ক। একযোগে এতগুলি লক্ষ্য সাধিত হয় বলে বৃহৎ নদীপ্রকল্পগুলিকে বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট প্রকল্প বলা হয়। বলা বাহুল্য, এগুলিতে যেমন অধিক পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন ও কার্য সমাপনে অধিক সময় লাগে, তেমনি নানাবিধ সুবিধা দ্বারা নানাদিকে এরা দেশের কৃষি ও শিল্পকে অগ্রসর করে দেয়। কৃষি ও শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তনে এরা উপযোগী পরিবেশ রচনা করে। সেচের অধীন জমির পরিমাণ বাড়লে শুধু যে বর্তমান খাদ্য ঘাটতি মিটবে, তাই নয়, অধিকন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদাও মেটানো যাবে।

২. প্রথম পরিকল্পনা কালে বৃহৎ সেচকার্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ৬২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেচকার্য সম্প্রসারণের এক বিরাট কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেচের জন্য মোট ব্যয় হয় ৪২০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় সেচের জন্য ৬৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয় ১,৪৩১ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ৩,৪৪৩ কোটি টাকা এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছিল ১২,১৬০ কোটি টাকা। সপ্তম পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ১৬,৯৭৯ কোটি টাকা।

১৯৫০-৫১ সাল থেকে খালের দ্বারা জলসেচের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, এবং মোট জলসেচের ৪০ শতাংশ খালের দ্বারা সম্পাদিত হলেও কূপ, বিশেষত নলকূপের দ্বারা জলসেচ অত্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৫০-৫১ সালে মোট সেচিত জমির পরিমাণ ছিল ২০৯ লক্ষ হেক্টেয়ার, ১৯৮১-৮২ সালে তা বেড়ে ৩৯৭ লক্ষ হেক্টেয়ার হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে সেচের অধীন মোট জমি দাঁড়ায় ৬ কোটি ৪১ লক্ষ হেক্টেয়ার বা মোট আবাদী জমির ৩০'৫ শতাংশের বেশি।

সারণী ১৯.১: ভারতে বিবিধ উপায়ে জলসেচিত জমির পরিমাণ

উপায়	মোট ১৯৫০-৫১ সেচ-এলাকা (লক্ষ হেক্টেয়ার)	শতাংশ	১৯৮১-৮২ সেচ এলাকা (লক্ষ হেক্টেয়ার)	শতাংশ
খাল	৮৩	৩৯'৮	১৫৫	৩৯'১
কূপ ও নলকূপ	৬০	২৮'৭	১৮১	৪৫'৬
পুকুর	৩৬	১৭'৩	৩৫	৮'৮
অন্যান্য	২৯	১৪'২	২৬	৬'৫
মোট	২০৯	১০০'০	৩৯৭	১০০'০

সূত্র: Indian Agriculture in Brief, 19th Ed. 1982 and Economic Survey 1987-88

সেচের দরুন সৃষ্ট সমস্যা: সেচ, বিশেষত খালের দ্বারা সেচের ব্যবস্থায় কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন—(ক) ফসলের চাষের ধাঁচের পরিবর্তন ঘটে (changes in the cropping system)। তার ফলে এক-ফসলী জমি যে কেবল দো-ফসলী বা তিন ফসলী জমিতে পরিণত হতে পারে শুধু তা নয়। আখ, পাট ইত্যাদি নগদ ফসলের (cash crops) উপর চাষীরা জোর দেয় এবং ফসলের ধাঁচের এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে যার ফলে জমির ক্ষতি হয় ও ফসলের রোগ বাড়ে। (খ) নানা কারণে সেচের জমিতে জল দাঁড়িয়ে যায়, ফসল ডুবে যায়। ফলে জল নিকাশের ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। (গ) সেচের খালের জল পাশের জমিতে চুঁইয়ে গভীরে চলে গিয়ে মাটির নিচের জলের স্তরকে উপরে তুলে দেয়। তখন সেই জলের সাথে মাটির তলার লবণ উপরে উঠে এসে আবাদী জমিতে নুনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে ফসলের ক্ষতি করে। (ঘ) সেচ ব্যবস্থার দ্বারা যতটা জমিতে সেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তার পরিপূর্ণ ব্যবহার করার সমস্যা দেখা দেয়।

১৯.৪. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন
Generation of Power

১. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের পক্ষে বিদ্যুৎশক্তি দিন দিনই অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। জীবনযাত্রার মানের উন্নতির পক্ষেও বিদ্যুৎ অপরিহার্য। এজন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রথম থেকে দেশে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রথম পরিকল্পনার গোড়ায় দেশের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বা ২,৩০০ মেগাওয়াট। এর অধিকাংশই ছিল তাপ ও ডিজেল দ্বারা উৎপন্ন। জলবিদ্যুতের পরিমাণ ছিল কম। ষষ্ঠ যোজনার শেষে তা বেড়ে ৫১,৪০০ মেগাওয়াটে পরিণত হয়। ওই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালে ৫৩০ কোটি কিলোওয়াট থেকে বেড়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে ১৭ হাজার কোটি কিলোওয়াটে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৮৭-৮৮ সালে দেশে ৯ শতাংশ বিদ্যুৎ ঘাটতি থেকে গেছে।

২. দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে যেমন শিল্পে বিদ্যুতের যোগান বেড়েছে তেমনি গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে গ্রামের বাড়িঘর এবং জল সেচের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ চালিত পাম্প-এর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনার গোড়াতে দেশে ৩,৬২৩টি গ্রামে বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালের শেষে ৩,৮২,০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি প্রসারিত হয়।

১৯.৫. প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক সার:
Manures and Fertilisers

১. **প্রয়োজনীয়তা:** ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে কৃষিকার্য প্রচলিত। অথচ তদনুপাতে জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত সার ব্যবহারের অভাবে মৃত্তিকার উর্বরতা প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। এটা একর প্রতি ফলন হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতের জমিতে ফসফরাস, নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের বিশেষ অভাব রয়েছে। প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে এ অভাব দূর করতে হবে। তা ছাড়া, ভারতে খাদ্য ও কাঁচা-

মালের ঘাটতি দূর করতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যে নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজী প্রয়োজন, অধিক পরিমাণে সারের ব্যবহার হল তার মূল ভিত্তি।

২. বিভিন্ন প্রকারের সার : কৃষিকার্যে যে সকল সার ব্যবহারের প্রয়োজন তা হল—(১) খামার-গোহালের সার বা পশুর মল। (২) মিশ্র সার বা আবর্জনা ও সব্জির পচানো সার। (৩) মনুষ্য বিষ্ঠা। (৪) সবুজ সার বা লতাপাতার সার। (৫) খইল। (৬) রাসায়নিক সার এবং (৭) প্রাণিজ সার।

৩. রাসায়নিক সারের উৎপাদন : উপরোক্ত নানা ধরনের সার ব্যবহারে অসুবিধা থাকায়, ভারতে রাসায়নিক সারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক সার ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু রাসায়নিক সার ব্যবহারের কয়েকটি অসুবিধাও আছে। প্রথমত, জৈব সারের ন্যায় রাসায়নিক সার ফসলের সুষম পুষ্টিসাধন করে না। দ্বিতীয়ত, যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচ না করে শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহারে চারা গাছগুলি শুকিয়ে যায়। তৃতীয়ত, রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হলে, কোন্ জমিতে কোন্ ধরনের সারের প্রয়োজন, তা কি পরিমাণে প্রয়োগের প্রয়োজন এবং কোন্ সময়ে ও কিভাবে তা ব্যবহার করতে হবে, সে সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ সকল বিষয়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন আছে। পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য দেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সারের প্রথম কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বিহারের সিন্দ্রিতে। ১৯৫১ সালে এখানে উৎপাদন আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সারের কারখানাগুলির পরিচালনার জন্য ৭৫ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে The Fertilizer Corporation of India Ltd. নামে একটি সরকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থার অধীন ৮টি কারখানায় বর্তমান সার উৎপন্ন হচ্ছে। এছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রেও বিদেশী সহযোগিতা ও বিদেশী পুঁজিতে কয়েকটি সারের কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও সরকারী ও আধা সরকারী ৫টি সারের কারখানায় উৎপাদন চলেছে, ৮টি কারখানার নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে এবং ১২টি নতুন কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলি হল বেসরকারী কারখানা।

রাসায়নিক সারের ব্যবহার : ১৯৬৫-৬৬ থেকে নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজী প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। সারণি ১৯-২-এ তা দেখা যাচ্ছে।

সারণী ১৯-২ : **ভারতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার**

বৎসর	নাইট্রোজেন সার	ফসফেট সার	পটাস সার	মোট	আবাদী জমির হেক্টেয়ার পিছু ব্যবহার (কেজি)
	(———হাজার টন		——)		
১৯৫১-৫২	৫৯	৭	—	৬৬	০.৫
১৯৬০-৬১	২১২	৫৩	২৯	২৯৪	১.৯
১৯৭০ ৭১	১,৪৭৯	৫৪১	২৩৬	২,২৫৬	১৩.৬
১৯৮৭-৮৮	৫,৭৭০	২,১১০	৮৬০	৮,৭৪০	—

সূত্র : Basic Statistics Relating to the Indian Economy, Vol. I.
All India, October 1980, Govt. of India, Ministry of Agriculture,
Annual Report, 1984-85

১৯৮২-৮৩ সালে ভারতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ হেক্টেয়ার পিছু বেড়ে ৩৯.৪ কেজি হলেও উন্নত দেশগুলির তুলনায় তা অনেক কম। যেমন জাপানে তা হেক্টেয়ার পিছু ৪৩৭ কেজি, পশ্চিম জার্মানিতে ৪২১.১ কেজি, ব্রিটেনে, ৩৭৪.৬ কেজি।

১৯.৬. বীজ

Seeds

জমির ফলন বৃদ্ধি ও উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য যেমন সেচ ও উপযুক্ত সার ব্যবহার করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজের। ভারতের উৎপন্ন ফসল গুণে নিকৃষ্ট ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কোনো নির্দিষ্ট মান নেই। ফলে ফসলের পরিমাণ যেমন কম হয়, তেমনি উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না। সুনির্দিষ্ট মানের কৃষিজাত কাঁচামাল উৎপন্ন হয় না বলে শিল্পের অসুবিধা হয়। বিশেষত রপ্তানি শিল্পের তৈয়ারী দ্রব্যগুলি বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারে না। এজন্য উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি কৃষির উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য। অনেকের মতে, কেবলমাত্র উৎকৃষ্টতর বীজের ব্যবহারে ভারতের কৃষির উৎপাদন ১০ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এক্ষেত্রে সবিশেষ চেষ্টা করছে। সকল রাজ্যেই উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ ফলনশক্তি বিশিষ্ট বীজের উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এমন কি ঐ ধরনের

বীজ ভারত এখন রপ্তানি করতেও পারে। কৃষিতে এখন সর্বত্র এই ধরনের বীজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এই বীজের ব্যবহার দ্রুত বেড়ে চলেছে।

১৯.৭. ফসলের রোগ ও কীটপতঙ্গজনিত ক্ষতি
Crop Diseases and Losses

ভারতে বৎসরে মোট উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক ১০ শতাংশ রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণে বিনষ্ট হয়। ইক্ষু, গম ও তুলার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান সমস্যা। এজন্য ব্যাপক গবেষণা কার্য পরিচালনা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৯.৮ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা : সবুজ বিপ্লব ও নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজী
Modern Agricultural Technology : Green Revolution & New Agricultural Technology

১ ১৯৬৬ ৬৭ সাল থেকে কৃষিতে উচ্চ ফলন ক্ষমতা-সম্পন্ন বীজ, জলসেচ নিয়ন্ত্রণ, কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়েছে। তার সাথে যথেষ্ট ঋণ ব্যবহারের ভিত্তিতে 'প্যাকেজ ডীল' পদ্ধতিতে বাছাই করা এলাকায় প্রগাঢ় কৃষির এক নতুন কায়দা 'নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজী' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসৃত হচ্ছে। একেই 'সবুজ বিপ্লব' নাম দেওয়া হয়েছে। তাতে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। এর ফলে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে কৃষির উৎপাদন বৎসরে শতকরা ৯ অথবা ১০ ভাগ হারে বেড়েছে।

২. তথাকথিত 'নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজী বা পদ্ধতি' প্রবর্তিত হয় ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সূত্রপাত হয় আরও আগে, ১৯৫৮ সালে। ঐ বৎসর দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশ কমে গেলে মার্কিন ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে একদল বিশেষজ্ঞ ১৯৫৯ সালে এদেশে উপস্থিত হয় এবং বিষয়টি অনুসন্ধান করে দশ সপ্তাহের মধ্যে 'ভারতের খাদ্য সংকট সম্পর্কে রিপোর্ট ও উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা' নামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬০-৬১ সালে প্রগাঢ় কৃষি জেলা প্রকল্প (Intensive Agricultural District Programme) চালু হয়। এর চার বৎসর পর প্রগাঢ় কৃষি অঞ্চল প্রকল্প (Intensive Agricultural Area Programme) প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৫ সালে উচ্চ ফলনশক্তি-সম্পন্ন বীজ দেখা দেয়। এই সকল বিষয়কে এক কথায় নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজী বলা হয় এবং ১৯৬৭ সাল থেকে এর প্রয়োগ শুরু হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা বিশেষভাবেই এই নতুন কৃষি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এর সার কথা হল, বিকাশমান দেশের কৃষক সমাজ সামগ্রিকভাবে দক্ষ কিন্তু দরিদ্র। তারা প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে বলে তাদের বেশি করে উৎপাদনের উপকরণ যোগান দিলেই উৎপাদন বাড়বে না বা কৃষির রূপান্তর ও বিকাশ ঘটবে না। এজন্য চাই বিপুল পরিমাণে নতুন নতুন উপকরণ ও কৃষি-কৌশলের ব্যবহার। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলির পরিমাণ কম ; তাই বাছাই করা কয়েকটি অঞ্চলে সমস্ত উপকরণ ও কারিগরী কৌশল কেন্দ্রীভূত করে কাজ করতে হবে। এজন্য স্বাভাবিক সুবিধার দরুন সেচ এলাকাগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে।

৩. **ভারতে প্রয়োগ :** এই তত্ত্ব অনুসরণ করে ভারতে ১৫টি বাছাই করা সর্বোৎকৃষ্ট সেচ অঞ্চলে ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে উচ্চ ফলনক্ষমতাসম্পন্ন বীজ, জলসেচ নিয়ন্ত্রণ, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার, এবং উপযুক্ত পরিমাণে ও উপযুক্ত ধরনের রাসায়নিক সার কাম্য মাত্রায় একসাথে ব্যবহার করে তার সাথে উপযুক্ত পরিমাণে ঋণের বন্দোবস্ত, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করে চাষের কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে ১৮টি জেলায় এটি বিস্তৃত হয়েছে। সংক্ষেপে এই হল **নতুন কৃষি পদ্ধতি**। আধুনিক উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৌশলের এই 'প্যাকেজ ডীল' বা সামগ্রিক প্রয়োগই এই পদ্ধতির মূল কথা। এর দ্বারা দেশে কৃষির ফলন বৃদ্ধির পথে সমস্ত বাধা দূর করে একর পিছু ফলনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য। এই পদ্ধতির দ্বারা কিছু চমৎকার ফল অবশ্যই পাওয়া গেছে। ভারতে তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' পিছনে রয়েছে এই নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজী।

৪. **নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতির তাৎপর্য :** (১) তথাকথিত সবুজ বিপ্লব ভারতে ধনতান্ত্রিক কৃষির বিকাশে সাহায্য করছে। নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতিতে উচ্চফলন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ, কীটনাশক রাসায়নিক, রাসায়নিক সার এবং সেচের জন্য যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন। তা বড় ও ধনী চাষী ছাড়া মাঝারি ও গরিব চাষীর সাধ্যের বাইরে। ভারতে বড় চাষীরা মোট চাষীদের ৬ শতাংশ এবং তারা ৪০ শতাংশ জমির মালিক। সুতরাং এরাই টিউবওয়েল, পাম্পসেট, রাসায়নিক সার ও কৃষি যন্ত্রপাতিতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করছে। ফলে, নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতির দরুন ধনতান্ত্রিক কৃষি বিস্তার লাভ করছে।

(২) এতদিন কৃষির সাথে শিল্পের সম্পর্ক ছিল একতরফা বা একমুখী ; কৃষিজাত দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতিতে

শিল্পজাত নানান দ্রব্য যথা টিউবওয়েল পাইপ, পাম্প, রাসায়নিক সার, কীটনাশক রাসায়নিক প্রভৃতি দ্রব্য কৃষি কার্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ কৃষির সাথে, শিল্পের সাথে দ্বিমুখী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা ঘনিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়েছে।

(৩) নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতি চাষীদের বাজারমুখী করে তুলছে। তারা কৃষির প্রয়োজনীয় আধুনিক উপকরণগুলির যোগান ও উৎপন্ন ফসল বিক্রির জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

৫. নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতির সুবিধা: (১) অধিক মাত্রায় কৃষি উপকরণগুলির প্রয়োগে ক্রমবর্ধমান হারে ফলন পাওয়া যায়; সুতরাং তাতে খরচের সাশ্রয় হয়।

(২) নতুন কৃষি পদ্ধতিতে চাষের দৃষ্টান্তে চাষীরা উৎসাহিত হয়ে তা অনুসরণ করে। ফলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতার স্তরটি উন্নত এবং প্রসারিত হয়।

(৩) নতুন কৃষি পদ্ধতির দরুন খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধির মারফত মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেশে খাদ্য আমদানির প্রয়োজন প্রায় দূর হয়েছে; অন্যদিকে নানান কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলির প্রসার ঘটছে।

৬. নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতির ত্রুটি: (১) নতুন কৃষি পদ্ধতিতে যে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন তা ছোট ও মাঝারি চাষীর সাধ্যের বাইরে বলে অধিকাংশ চাষী এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না। ভূমিহীন খেতমজুর ও ভাগচাষীদের তো কথাই নেই। সুতরাং গ্রামীণ ক্ষেত্রে নতুন কৃষি পদ্ধতির দ্বারা ধনী ও বড় চাষীদের নিয়ে গঠিত সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ কিছু সমৃদ্ধ দ্বীপ সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র; সে সমৃদ্ধি গ্রামের সকলকে স্পর্শ করছে না। দেশের ১০ শতাংশ ধনী চাষীর মধ্যেই তা আবদ্ধ রয়েছে।

(২) দেশের মধ্যে জল ও অন্যান্য উপকরণে সমৃদ্ধ এলাকাগুলিতেই শুধু নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতি সফল হয়েছে। সে কারণে আবার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে গেছে।

(৩) নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতির ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং একই অঞ্চলের ধনী ও অপেক্ষাকৃত গরিব চাষীর মধ্যে আয় বণ্টনে বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে।

(৪) নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতি দেশের মধ্যে কৃষি কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজন আছে সেটা স্বীকার করে না। জমির বৈষম্যমূলক মালিকানা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখে। ফলে সাধারণ ও গরিব চাষীদের উন্নতির পথে তা সাহায্য করে না।

(৫) নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতি কর্মহানি ঘটায়। পাম্প ও জলসেচের দরুন একদিকে কৃষিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির যেমন সুযোগ ঘটে, তেমনি অন্যদিকে ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দরুন কৃষিতে কর্মহানিও ঘটে। নতুন কৃষি কারিগরী পদ্ধতির প্রসারের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে যদি শিল্প প্রসার না ঘটে, তা হলে, খেত মজুরদের কর্মহীনতা বা স্বল্পনিযুক্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধির সমূহ আশংকা থেকে যায়।

৭. সবুজ বিপ্লবের শিক্ষা: (১) সবুজ বিপ্লব বা কৃষির নতুন কারিগরী পদ্ধতি এখন পর্যন্ত বিশেষভাবে গম, ভুট্টা ও বাজরার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ধান চাষের ক্ষেত্রে তা সবেমাত্র কিছুটা শুরু হয়েছে। তৈলবীজ, তুলা ও পাট চাষের ক্ষেত্রে এর অগ্রগতি অল্প। ডাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও এর কোনো প্রভাব পড়েনি। সুতরাং অল্প কয়েকটি ফসলের ক্ষেত্রে ফলনের যে অগ্রগতি ঘটেছে তা সমস্ত প্রধান ফসলের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একে কৃষির ক্ষেত্রে বিপ্লব বলে গণ্য করা যায় না।

(২) সামগ্রিকভাবে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমভাগে নতুন কৃষিকারিগরী পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়লেও, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি জেলাতে এখনও তা সীমাবদ্ধ রয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তা প্রসারিত হয়নি।

(৩) অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যে সব অঞ্চলে চাষীদের মধ্যে সাক্ষরতার স্তর উন্নত হয়েছে সে সব অঞ্চলেই নতুন কৃষিকারিগরী পদ্ধতিও অনেকটা সফল হয়েছে। সুতরাং নিরক্ষরতা দূরীকরণ এই নতুন কৃষিপদ্ধতির সাফল্যের একটি পূর্বশর্ত।

(৪) নতুন কৃষিকারিগরী পদ্ধতি গ্রামাঞ্চলে তিন ধরনের নতুন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে—(ক) বড় ও ছোট চাষীর মধ্যে বিরোধ, (খ) মালিক চাষী ও প্রজা চাষীর মধ্যে বিরোধ এবং (গ) নিয়োগকর্তা ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ। এদের মধ্যে ধনী বড় চাষীরা রাসায়নিক সার, পাম্পসেট, কৃষি যন্ত্রাদিতে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করতে পারে, বাজারে ভাল বীজ অধিকাংশই কিনে নিতে পারে, সমবায় ও ব্যাঙ্ক ঋণের সিংহ ভাগ পেয়ে থাকে এবং এইভাবে ছোট ও মাঝারি চাষীদের কৃষির উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে। বেশি জমির মালিক চাষীরা তাদের জমির একটা অংশ যথেষ্ট বিনিয়োগের দ্বারা নতুন কৃষি পদ্ধতিতে চাষ করে; আরেকটি অংশ চাষ করে গরীব প্রজাচাষীরা।

তারা পুঁজির অভাবে পুরানো পদ্ধতিতেই অসুবিধাজনক শর্তে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করছে। ফলে ভারতে পাশাপাশি আধুনিক ও প্রাচীন, দু'রকম পদ্ধতিতে চাষ চলছে। প্রথমটির আয় বেশী; দ্বিতীয়টির আয় কম। সুতরাং ওই দু'য়ের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দিয়েছে। তা থেকে জন্ম নিচ্ছে সামাজিক বিরোধ। আর সকলের নিচে রয়েছে ভূমিহীন খেতমজুরেরা। তারা এই নতুন কৃষিপদ্ধতির দরুন কর্মচ্যুত হচ্ছে ও এ সমস্ত সুফল থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

সুতরাং ধনী বড় চাষীদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে খেতমজুর ও গরিব চাষীদের বাঁচাতে হলে, দরকার হল তাদের মধ্যে সংঘ গঠনে উৎসাহ দেওয়া, মজুরি বৃদ্ধি করা, জমি বন্দোবস্তের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, খাজনার হার কমানো, ভূমি সংস্কার রূপায়িত করা। তা না হলে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব শেষ পর্যন্ত 'সবুজ' থাকবে না বলে অনেকেরই অভিমত।

৮. **অগ্রগতি:** নতুন কৃষি রণনীতির অগ্রগতির সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে উচ্চ ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজের অধীন জমির পরিমাণ ১ কোটি ১৪ লক্ষ হেক্টেয়ার থেকে বেড়ে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টেয়ার, এবং ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে একাধিক ফসলী জমির পরিমাণ ১৫ লক্ষ হেক্টেয়ার থেকে বেড়ে ৩১ লক্ষ হেক্টেয়ার, ফসলের চারা রক্ষার ব্যবস্থা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টেয়ার থেকে বেড়ে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টেয়ার এবং ভূমিসংরক্ষণ ব্যবস্থা ১২ লক্ষ হেক্টেয়ার থেকে বেড়ে ২৭ লক্ষ হেক্টেয়ারে পরিণত হয়েছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৪০ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ৯৪ লক্ষ টনে এবং এলাকার পরিমাণ ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ হেক্টেয়ার থেকে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ হেক্টেয়ারে পরিণত হয়েছে।

১১.৯. কৃষির যন্ত্রীকরণ
Mechanisation of Agriculture

১. কৃষির পুঁজির মধ্যে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় সার, সেচ ও বীজ প্রভৃতিকে যদি আবর্তন পুঁজি ধরা যায়, তবে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি হল স্থির পুঁজির দৃষ্টান্ত। ভারতে কৃষকের পুঁজির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। যতই সেচ, বীজ ও সারের উন্নতি করা হোক না কেন, তার সাথে কৃষি-যন্ত্রপাতির উন্নতি না ঘটালে এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ না হলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা ফলবতী হবে না। সুতরাং ভারতের কৃষিযন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে আজ দু'টি বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন:

(১) পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে স্থানোপযোগী উন্নত, আধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রবর্তন।

(২) কৃষির যন্ত্রীকরণ। অর্থাৎ মনুষ্য ও পশুশ্রম-নির্ভর বর্তমান কৃষির পরিবর্তে যন্ত্র বা পুঁজিনির্ভর কৃষি প্রবর্তন।

২. **আধুনিক যন্ত্রপাতি:** কৃষিতে আধুনিক ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা বর্তমান। এর দ্বারা ভারতের পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত ক্ষুদ্র জোতগুলির ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিদপ্তর এজন্য নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্য চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে নতুন ধরনের ইস্পাতের লাঙল, ইক্ষু পেষণের কল, জল তোলার জন্য ক্ষুদ্রাকার পাম্প, ছোট ঠেলাগাড়ি, নিড়ানি, শস্য ঝাড়াই ও মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদি উদ্ভাবিত হয়েছে।

৩. **কৃষির যন্ত্রীকরণ:** মনুষ্য ও পশুশক্তির পরিবর্তে বা তার সহায়ক হিসাবে যন্ত্রশক্তির ব্যবহারকেই যন্ত্রীকরণ বলা যায়। সুতরাং কৃষির যন্ত্রীকরণ বললে, কৃষিকার্যে মনুষ্য ও পশুশক্তির পরিবর্তে বা তার সহায়ক হিসাবে যন্ত্রশক্তির প্রবর্তন বোঝায়। কৃষির যন্ত্রীকরণ দ্বারা পুঁজিনির্ভর কৃষিকার্য প্রচলিত হয়। যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া যেমন শিল্প-ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদন অসম্ভব, তেমনি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও কৃষির যন্ত্রীকরণ দরকার।

৪. **যন্ত্রীকরণের প্রকারভেদ:** কৃষির যন্ত্রীকরণ দুই প্রকার: পূর্ণ যন্ত্রীকরণ ও আংশিক যন্ত্রীকরণ। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমের স্বল্পতার দরুন কৃষিতে পূর্ণ যন্ত্রীকরণ ঘটেছে। সোভিয়েত দেশেও পূর্ণ যন্ত্রীকরণ প্রবর্তিত হয়েছে। ভারত সহ অন্যান্য সব দেশেই কম বেশি পরিমাণে কৃষির আংশিক যন্ত্রীকরণ হচ্ছে। তবে যে দেশ যত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত সেখানে কৃষিকার্যে তত বেশি মনুষ্য ও পশুশক্তির উপর নির্ভরশীলতা এবং তত কম যন্ত্রীকরণ দেখা যায়। কৃষির পূর্ণ যন্ত্রীকরণের দ্বারা শুধু ভূমিকর্ষণ, ফসল কাটা ও সংগ্রহ, ফসলের ঝাড়াই-মাড়াই প্রভৃতি কার্য সম্পাদন বোঝায় না, অন্যান্য কাজেও যন্ত্রের ব্যবহার বোঝায়।

৫. **যন্ত্রীকরণের সুফল:** (১) কৃষির যন্ত্রীকরণ কৃষিশ্রমের দক্ষতা বাড়ায়। ফলে কৃষকগণের মাথাপিছু উৎপাদন বাড়ে। কৃষির মোট উৎপাদন বাড়ে। (২) কৃষি-কার্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃষির বিভিন্ন কাজ দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব হয়। (৩) কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিতে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক কৃষকের প্রয়োজন হয়। (৪) কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারা খুব ভালো করে মাটি চষা হয় বলে জমির একর প্রতি ফলন বাড়ে। (৫) শ্রমিকের দক্ষতা ও জমির ফলন বৃদ্ধির দরুন

উৎপাদনের ব্যয় কমে। (৬) সামগ্রিকভাবে কৃষির অপচয় হ্রাস পায় ও উন্নতি ঘটে। এতে কৃষিজাত দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বাড়ে। (৭) কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলে কৃষকের নিজের ভোগের পরও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল তার হাতে থাকে। এইরূপে প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির পরিবর্তে বাজারনির্ভর কৃষির উদ্ভব ঘটে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে। ফলে বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান বাড়ে। (৮) কৃষকের আয় বাড়ে এবং শহর ও শিল্পাঞ্চলের আয়ের সাথে গ্রামাঞ্চলের আয়ের সামঞ্জস্য ঘটে। শিল্প ও কৃষির মধ্যে মাথাপিছু আয় ও মোট আয় বণ্টনে অধিকতর সমতা দেখা দেয়। (৯) শিল্পের মত কৃষিকার্যেও বিশেষায়ণ বাড়ে। তাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষিযন্ত্রপাতি চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির দরুন নতুন জীবিকার সৃষ্টি হয়। (১০) যন্ত্রপাতি চালনা ও মেরামতি কাজে অনেক শ্রমিক প্রয়োজন হয় বলে কৃষিকাজ ছেড়ে বেশি আয়ের জন্য অনেক কৃষক তাতে যোগ দেয়। এভাবে কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারা জমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমে। (১১) সর্বোপরি, এতে গ্রামীণ সমাজে গভীর পরিবর্তন ঘটে। কৃষি যন্ত্রীকরণ কৃষকের উপর থেকে কায়িক শ্রমের কঠোর বোঝা কমিয়ে বিশ্রামের সময় বাড়িয়ে দেয়। আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে তাকে নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা দেয়। গ্রামীণ সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হয়।

৬ **কৃষির যন্ত্রীকরণের সাফল্যের শর্ত :** (১) কৃষি-যন্ত্রপাতি চালনার জন্য প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেলের (ডিজেল তেল) ও বিদ্যুতের সরবরাহ প্রয়োজন। (২) সেচ কার্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ আবশ্যক। (৩) কৃষিজোতের আয়তন বৃহত্তর হওয়া প্রয়োজন। (৪) কৃষকদের মধ্যে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি চালনার উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি দরকার। (৫) কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির চাহিদা-পূরণে সমর্থ কৃষিযন্ত্র উৎপাদনশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

৭. **কৃষির যন্ত্রীকরণের অসুবিধা :** উপরোক্ত বিষয়গুলির অভাবে কৃষির যন্ত্রীকরণের অসুবিধা বাড়ে। অবস্থা অনুকূল হলেও এর প্রবর্তনে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা হল কর্মহীনতা। কৃষিকার্যে যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার ঘটে। এরূপ সংস্কারের ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কমে। সুতরাং কৃষির যন্ত্রীকরণ হলে বহুসংখ্যক কৃষকের বেকার হবার আশঙ্কা থাকে। কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে যে হারে কৃষকেরা কর্মচ্যুত হবে। সে হারে অন্যত্র তাদের কর্মসংস্থান করতে না পারলে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে।

৮. **ভারতে কি কৃষির যন্ত্রীকরণ বাঞ্ছনীয় :** কৃষির যন্ত্রীকরণ হলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যায় তা ভারতের পক্ষে শুধু কাম্য নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষেও অপরিহার্য। বিশেষত, এর ফলে—১. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের দ্বারা কৃষিপণ্যের রপ্তানী বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে। ২. উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা বর্তমান খাদ্যঘাটতি পূরণ করা যাবে। ৩. পুঁজির স্বল্পতা ভারতের কৃষিতে যে পাপচক্র সৃষ্টি করেছে এবং যে পাপচক্র সম্পূর্ণরূপে ভাঙার জন্য কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার একমাত্র কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারাই কৃষিকার্যে সে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব। সুতরাং কৃষির যন্ত্রীকরণ ভারতের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য।

৯. **বাধা :** কিন্তু এর পথে কতকগুলি বিঘ্ন রয়েছে : ১. এর সাফল্যের জন্য যে সব অনুকূল অবস্থা প্রয়োজন, (যেমন দেশের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ও খনিজ তৈলের সরবরাহ, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও ব্যাপক সেচকার্য ইত্যাদি) সেগুলি বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে নেই। ২. দেশের মধ্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প এখনও উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় অত্যধিক ব্যয়ে কৃষিযন্ত্রপাতি আমদানি করতে হচ্ছে। সেজন্য যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন, তা সংগ্রহ করা ভারতের সাধ্যের বাইরে। ৩. ভারতের কৃষিজোতের আয়তন বর্তমানে এত ক্ষুদ্র যে তাতে কৃষির যন্ত্রীকরণ সফল হবে না। কৃষি যন্ত্রপাতির দাম এত বেশি যে সেগুলি কেনা কৃষকের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। ৪. প্রত্যক্ষ ভোগ-নির্ভর কৃষি এখনও ব্যাপক যন্ত্রীকরণের অন্তরায়। ৫. গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে কর্মহীনতা তীব্র হয়ে উঠেছে। এর উপর কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারা এর ব্যাপকতা আরও বাড়বে। অনেকের মতে, ভারতে ব্যাপক কৃষি যন্ত্রীকরণের দ্বারা ৬০ শতাংশ কৃষিনির্ভর মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। বর্তমানে শিল্পসম্প্রসারণের গতিবেগ যথেষ্ট নয় বলে অবিলম্বে তাদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে না। সুতরাং দ্রুত কৃষির যন্ত্রীকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যাতে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে এই পদ্ধতি কার্যকর করা যায় সেজন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে।

১০. **ভারতে সরকারী বৃহদায়তন যান্ত্রিক খামার :** রাজস্থানে সুরতগড়ে সোভিয়েত যন্ত্রপাতির সাহায্যে সরকারী খামারে কৃষির সম্পূর্ণ যন্ত্রীকরণের প্রথম পরীক্ষা করা হয়। তার সাফল্য দেখে সোভিয়েত কৃষি বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ভারতে সুরতগড়ের ন্যায় ১০০টি খামার প্রতিষ্ঠা দ্বারা খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। সুরতগড়ের কেন্দ্রীয় যান্ত্রিক খামারটি ১২,১৪১ হেক্টেয়ার জমি নিয়ে ১৯৬৬

সালে স্থাপিত হয়। পরে জেতসার, হিসার, ঝাড়সুগুড়া ও রাইচুড়ে আরও চারটি কেন্দ্রীয় সরকারী যান্ত্রিক খামার স্থাপিত হয়েছে। তারও পরে কান্নানোর (কেরালা), লাধোয়াল (পাঞ্জাব), চেঙ্গাম (তামিলনাড়ু), কোকিলা-বাড়ি (আসাম) এবং মিজোরাম-এ আরও দুটি,—মোট ৬টি নতুন রাষ্ট্রীয় কৃষিখামার স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে সাত কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে গঠিত দি স্টেট ফার্মস্ করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া নামে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সরকারী কৃষি সংস্থা স্থাপন করে ঐ ছয়টি কেন্দ্রীয় সরকারী খামারকে এ সংস্থার অধীনে আনা হয়েছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে কৃষির যন্ত্রীকরণের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the prospects and limitations of mechanisation of agriculture in India.]

২. ভারতের কৃষিতে যে নতুন কর্মপদ্ধতি (নিউ এগ্রিকালচারাল স্ট্র্যাটেজী) নিয়ে পরীক্ষা চলছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? এ কর্মপদ্ধতি কি সফল হয়েছে?

[What are the features of the new agricultural strategy on which experiment is being made in India? Has this strategy been successful?]

৩. কৃষি উৎপাদনের নতুন কৌশলটি ব্যাখ্যা কর। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ নীতি ভারতীয় পরিকল্পনার দু'টি লক্ষ্যবস্তু—(ক) উন্নয়ন এবং (খ) সাম্য অর্জনে কতদূর সফল হতে পারে তার বিচার কর।

[Explain the new agricultural strategy. Consider, on the basis of the experience gathered, how far would this strategy succeed in achieving the twin goals of Indian planning, namely (a) economic development of India and (b) establishment of equality.]

৪. ভারতের কৃষিতে 'সবুজ বিপ্লব'-এর প্রকৃতি ও ফলাফল বর্ণনা কর এবং দেশের সব রাজ্যে তার সমান বিকাশ না ঘটার কারণ ব্যাখ্যা কর।

[Analyse the nature and effects of the 'Green Revolution' as introduced in Indian agriculture. Explain the reasons why the 'revolution' could not develop evenly in all the states.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রবর্তনের ফলে যে দু'টি রাজ্য সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হয়েছে তাদের নাম লেখ।

[Name the two states that have benefited most from the introduction of H.Y.V. seeds.]

[C. U. B. A. III, 1984]

২. ভারতের কৃষির যন্ত্রীকরণের সপক্ষে একটি যুক্তি দেখাও।

[Advance one argument in support of mechanisation of farming in India.]

[C. U. B. A. III, 1984]

৩. সবুজ বিপ্লবের ফলে দরিদ্র কৃষক কেন লাভবান হয়নি?

[Why has the benefit of the Green Revolution not accured to the poor farmers?]

[C. U. B. A. III, 1983]

কৃষির সংগঠন

Organisation Of Agriculture

২০.১. ভূমিকা
Introduction

১. ভারতের কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি সংস্কার দ্বারা কৃষিকার্যে কৃষকের উৎসাহ বৃদ্ধি, কৃষিতে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কৃষিকার্যের সাংগঠনিক পরিবর্তনের। এই ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হলে কৃষিকার্যে বিপুল মানবিক শ্রমের উৎস উন্মুক্ত হবে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকের দ্বিধাহীন সহযোগিতা সুনিশ্চিত হবে এবং জমি, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও মানবিক শ্রমের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। কিন্তু কৃষিকার্যের পরিচালনার বর্তমান সাংগঠনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে না পারলে সুফল লাভের সম্ভাবনা কম।

২. ভারতের কৃষি পারিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। কৃষক পরিবারগুলির পারিবারিক শ্রম ও আর্থিক সামর্থ্য কম বলে কৃষিতে শ্রম ও পুঁজির যোগান সাধারণত সীমাবদ্ধ। পারিবারিক জোতের মধ্যেই এই কৃষিকার্য গণ্ডিবদ্ধ। এই জাতীয় সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল ও কৃষির উন্নয়নের একান্ত অনুপযোগী।

৩. এ কথা ঠিক যে, কৃষিসংস্কার করে জমিতে কৃষক-প্রজার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, কৃষিযন্ত্রপাতির উন্নতি, আরও বেশি সেচের ব্যবস্থা, ভাল সার ও বীজ সরবরাহের বন্দোবস্ত করে কৃষিতে যন্ত্রীকরণের ক্ষেত্র হয়ত তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জোতের আয়তন যদি আরও বড় না করা যায়, কৃষিকার্য পরিচালনার সংগঠনে যদি কোনো পরিবর্তন না আনা যায় তবে এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে চাষের কাজে ভাল সেচ, সার, বীজ ও ভাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও সবটুকু সুবিধা আদায় করা যাবে না। কৃষি সংগঠনের পুনর্গঠন বলতে জোতের এবং কৃষিকার্য পরিচালনা-সংগঠনের পুনর্গঠন বোঝায়। এটি ভারতের কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

২০.২. কৃষিজোতের আয়তন ও অবস্থান
Size and Location of Agricultural Holdings

ভারত ক্ষুদ্র চাষীর দেশ। কৃষিশ্রমিক তদন্ত কমিটির রিপোর্ট (১৯৫০ সাল) অনুযায়ী ভারতের কৃষিজোতের

গড় আয়তন ৭'৫ একর। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫ একর, জার্মানীতে ২১ একর, ইংলণ্ডে ২০ একর। এখানে কৃষিজোতের গড় আয়তন ৭'৫ একর হলেও অনেক অঞ্চল ও রাজ্যে জোতের গড় আয়তন এর চেয়ে অনেক কম (কেরালায় তা মাত্র ২'৪ একর, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩'৮ একর, বিহারে ৪'১ একর, পশ্চিমবঙ্গে ৪'৭ একর, মাদ্রাজে ৪'৫ একর ও আসামে ৫'৩ একর)। শুধু বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাবের পেপসু অঞ্চল, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রে জোতের গড় আয়তন সারা ভারতের গড় অপেক্ষা বেশি; সৌরাষ্ট্রে জোতের গড় আয়তনই সর্বাধিক (২৯'৬ একর)। সারা ভারতের সামগ্রিক চিত্র হল, দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষক পরিবারের জোতের আয়তন ২'৫ একর অপেক্ষা কম। শুধু তাই নয়, প্রতিটি কৃষক পরিবারের সমগ্র জোত গ্রামের এক স্থানে একত্রে অবস্থিতও নয়। তা খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে। উত্তরাধিকার আইন ও অন্যান্য কারণে দীর্ঘকাল ধরে ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে কৃষক পরিবারের জোতজমি বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। জোতের এই উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণের ফলে কৃষি-জোতের আয়তন ক্রমশই ছোট হয়ে পড়েছে। এটি ভারতের কৃষির একটি গঠনবৈশিষ্ট্য। অতি ক্ষুদ্রাকার জোত ভারতের কৃষি-উন্নয়নের এক বিরাট বাধা।

২০.৩. জোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ
Subdivision and Fragmentation of Land Holdings

১. জোতের উপবিভাজন বলতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জোতজমির ক্রমান্বয় বণ্টন বা ভাগ-বাঁটোয়ারা বোঝায়। আর বিক্ষিপ্তকরণ বলতে একই কৃষকের জমি বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে বোঝায়।

২. **কারণ:** গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, উত্তরাধিকারের প্রচলিত আইন, গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য জীবিকার অভাব, গ্রাম্য মহাজনের প্রবল গ্রাস ও একান্নবর্তী পরিবার-গুলির ভাঙনের ফলে এজমালি সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার দরুন জমির উপবিভাজন বেড়েছে।

৩. **কুফল:** ফলে জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে যে তা আর লাভজনকভাবে চাষ করা যায় না। সুতরাং কৃষকদের আয় কমেছে ও দেনা ক্রমেই বাড়ছে। দেনার ফলে তারা মহাজনদের কাছে জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়ে ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়ছে। খণ্ড খণ্ড জমির মধ্যে বেড়া দেওয়ার জন্য আলের পরিমাণও বাড়ছে। অনেক জোত এত ছোট হয়ে পড়েছে যে আর চাষ করা চলে না বলে তা পতিত থেকে যাচ্ছে। এতে জমির অপচয় বাড়ছে। ক্ষুদ্র জোতের দরুন আয় অল্প হওয়ায় কৃষকরা যেমন আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারছে না, তেমনি জোতগুলি ছোট ছোট বলে ঐ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। বিভিন্ন কৃষকের জমি পাশাপাশি এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলে কারো পক্ষেই নিজ জমি থেকে জল নিকাশের কিংবা সেচের নহর কাটার সুবিধা নেই। ফলে জমির অবনতি ঘটে। এ অসুবিধার দরুন সামগ্রিকভাবে কৃষিকাজে ভারতীয় কৃষকদের দক্ষতা কমে যাচ্ছে। তার উপরে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির বিক্ষিপ্ত অবস্থান গ্রামাঞ্চলে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে ঘন ঘন মামলা-মোকদ্দমার একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. এভাবে জোতজমির উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ জমির অপচয় বাড়াচ্ছে, জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অসুবিধা ঘটাচ্ছে, সেচের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কৃষির দক্ষতা কমাচ্ছে। তার উপর গ্রামের লোকেদের মধ্যে দারিদ্র্য, দলাদলি ও বিবাদ-বিসংবাদ বাড়িয়ে তুলছে।

২০.৪. অর্থনীতিক জোত
Economic Holding

১. ভারতের কৃষিজোতের আয়তন ছোট হওয়ায় চাষের খরচ ফসল বিক্রি করে উসুল করা যায় না। তাই এদেশের কৃষিতে লাভের বদলে লোকসানই হয়। অন্যান্য জীবিকার অভাব ও প্রত্যক্ষ ভোগের উদ্দেশ্যে কৃষিকার্য চলেছে বলেই এরূপ লাভহীন কৃষিজোত ও কৃষিকাজ বজায় রয়েছে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে এর পরিবর্তে অর্থনীতিক জোত প্রবর্তিত হওয়া দরকার।

২. **সংজ্ঞা:** যে আয়তনের জোত হলে তাতে কৃষক পরিবারের উপযুক্ত নিরবচ্ছিন্ন কর্মসংস্থান ঘটতে পারে, এবং যা থেকে কৃষক পরিবারের আরও বেশি আয় করা সম্ভব এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করা সম্ভব সেটাই হল 'অর্থনীতিক জোত'। 'অর্থনীতিক জোত' কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের জোত নয়। স্থান-কাল অনুসারে এর আয়তন ছোট বা বড় হতে পারে। কৃষক-পরিবারে অর্থনীতিক জোতের আয়তন অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

৩. মৃত্তিকা, জলবায়ু, ফসলের প্রকৃতি, কৃষির পদ্ধতি, কৃষক পরিবারের লোকসংখ্যা ও সামর্থ্য, কৃষিকার্য পরিচালনার সংগঠন—এই রকম অনেক বিষয়ের উপর অর্থনীতিক জোতের আয়তন নির্ভর করে। এ কারণে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনীতিক জোতের আয়তন বিভিন্ন প্রকার হবে। ফলে জোতের আয়তন বাড়াতে হবে, বৃহত্তর জোতের

প্রবর্তন করতে হবে। অর্থনৈতিক জোতের আয়তন বড় হলে প্রতিটি কৃষক পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক জোতের ব্যবস্থা করা যাবে না। কারণ, জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা বেশি। অতএব, এ অবস্থায় সর্বাপেক্ষা কাম্য পথ হচ্ছে সমবায় সংগঠনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জোতের প্রবর্তন ও কৃষিকার্য পরিচালনা। এ পথে জোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্ততা দূর করা সম্ভব হবে।

২০.৫. উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্ততার প্রতিকার
Remedies of Subdivision and Fragmentation

১. কৃষিজোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্ততার সমস্যা সমাধানের জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রথমত, বহু খণ্ডে বিভক্ত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জোতগুলির একত্রীকরণ বা সংবদ্ধকরণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, একত্রীভূত জোতগুলি যাতে আবার বিভক্ত না হতে পারে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

(১) **জোতের সংবদ্ধকরণ :** জোতের সংবদ্ধকরণ বলতে প্রত্যেক কৃষকের জোতজমি এক স্থানে একত্রিত করা বোঝায়। এজন্য কৃষকদের পরস্পরের সম্মতি নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত জোতের বিনিময় করার প্রয়োজন হয়। ১৯২১ সাল থেকে পাঞ্জাবে এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে তা অনুসরণ করা হয়। সেই সময় বিভিন্ন প্রদেশে এই উদ্দেশ্যে আইন পাস করা হয়। প্রথমে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে জমির সংবদ্ধকরণের ব্যবস্থা করা হয়। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সংবদ্ধকরণের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাতে তেমন কাজ না হওয়ায় পরবর্তীকালে আইনের সাহায্যে আংশিকভাবে বাধ্যতামূলক সংবদ্ধকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও স্বেচ্ছায় জোতের সংবদ্ধকরণের উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি।

(২) **সংবদ্ধ বা একত্রীভূত জোতের সংরক্ষণ :** সংবদ্ধ জোত ভবিষ্যতে যাতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা দ্বারা পুনরায় বিভক্ত হতে না পারে সেজন্য উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার পথে বিস্তর অসুবিধা রয়েছে। শিল্পসম্প্রসারণ দ্বারা অন্য ক্ষেত্রে জীবিকার সংস্থান করতে না পারলে জমির উপর ভাগীদারদের দাবির প্রবণতা কমবে না।

তবে এ ক্ষেত্রে সমবায় কৃষির কিংবা গ্রামের সমস্ত জোতজমির যৌথ ব্যবস্থাপনাই স্থায়ী প্রতিবিধান বলে মনে হয়। কারণ, তাতে জমির মালিকানায় অংশীদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জোতজমির বিভাজন চলে না। ফলে ভবিষ্যতে আবার এই সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

(৩) **সরকারী নীতি ও অগ্রগতি :** হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে জোত সংবদ্ধ করার কর্মসূচি সম্পূর্ণ হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং রাজস্থানে এর অগ্রগতি ঘটেছে।

২০.৬. বৃহদায়তন কৃষিকার্য
Large-scale Farming

১. শিল্পের মত কৃষিক্ষেত্রেও বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করলে, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বাড়ে, তাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদন-ব্যয় কমে, শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়ে। সেজন্য ভারতের মত অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং কৃষিকার্যের দক্ষতা বাড়াতে ক্ষুদ্র কৃষিজোতের পরিবর্তে বৃহদায়তন কৃষিজোতের প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে এ সব দেশে জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান যতই উন্নত হবে ততই খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকবে। কৃষির ফলন বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং কৃষিতে বৈচিত্র্য এনে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ সব দেশের ক্ষুদ্রায়তন কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অক্ষম। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত পরিবর্তন সাধনে যে সব চেষ্টা এ সব দেশে চলেছে—যথা, সেচকার্যের প্রসার, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার সরবরাহ, উন্নত ধরনের কৃষিযন্ত্রপাতি ব্যবহার ও কৃষির যন্ত্রীকরণ ইত্যাদি—তা ক্ষুদ্র পারিবারিক জোতের ভিত্তিতে পরিচালিত কৃষিতে বিশেষ ফলপ্রদ হতে পারে না। পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হলে তার সাথে সংগতি রেখে জোতের আয়তনও বৃদ্ধি করতে হয় এবং কৃষিকার্যের সংগঠনেরও পরিবর্তন ও উপযুক্ত সম্প্রসারণ করতে হয়। এক কথায়, কৃষিতে স্বল্পায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে বৃহদায়তন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চাই, এবং পুরাতন পারিবারিক সংগঠনের পরিবর্তে নতুন বৃহত্তর সংগঠন চাই। এ ব্যবস্থার দ্বারা জমির উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্ততার সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটবে, অন্যদিকে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ও কৃষিসংস্কার দ্বারা কৃষক প্রজাদের জমির মালিকানা দেবার ফলে নতুন করে ক্ষুদ্রায়তন কৃষির উদ্ভবের যে সম্ভাবনা আছে তা দূর হবে।

২. **বৃহদায়তন কৃষির প্রকারভেদ :** বৃহদায়তন কৃষিসংগঠন চার প্রকারের হতে পারে : (১) কারখানা ও

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন পুঁজিবাদী কৃষিকার্য। (২) সোভিয়েত দেশের মত যৌথ খামার। (৩) সমবায় খামার। (৪) সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা।

(১) **ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিবাদী কৃষি:** শিল্পে যেমন কৃষিতেও তেমনি ব্যক্তিগত মালিকানা, পরিচালনা ও উদ্যোগ ব্যক্তিগত পুঁজি ও ঋণের সাহায্যে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা চালাতে পারে। স্বভাবতই এ কাজ করা একমাত্র ধনী কৃষকদের পক্ষেই সম্ভব। তবে যে সব দেশে লোকসংখ্যা কম ও জমির পরিমাণ বেশি এবং ক্ষুদ্র চাষীর সমস্যা নেই সে সব দেশে এর সুবিধা রয়েছে। কিন্তু শিল্পে যেমন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মারাত্মক কুফল দেখা যায় কৃষিক্ষেত্রেও তেমনি এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ফল তার বিষময় হতে পারে। তাতে গ্রামাঞ্চলে ধন ও আয় বৈষম্য খুব বেশি রকম বাড়বে। ভারতের মত দেশে অসংখ্য কৃষক জমি থেকে বিতাড়িত হবে। গ্রামীণ কর্মহীনতা তীব্রতর হয়ে উঠবে। সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল হবে। পুঁজিবাদী কৃষি ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যের বিরোধী এবং দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। সুতরাং ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ইদানীংকালে ভারতে এর প্রসার ঘটেছে। তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী কৃষি শক্তিশালী হচ্ছে।

(২) **যৌথ খামার:** বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশে জোতের ক্ষুদ্রায়তন, কৃষকের দারিদ্র্য, যন্ত্রপাতির স্বল্পতা, জমির উপবিভাজন ইত্যাদি সমস্যা দূর করে কৃষির সমৃদ্ধির জন্য যৌথ খামার প্রবর্তিত হয়। এর দ্বারা সেখানে ক্ষুদ্রায়তন কৃষির স্থলে বৃহদায়তন কৃষি প্রতিষ্ঠিত হয়। যৌথ খামার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল, কৃষকদের জমি ও যন্ত্রপাতি একত্রিত করে বিশাল জোতে চাষ করা হয়। এই ব্যবস্থায় যোগ দিলে কৃষকেরা আর সেটা ছেড়ে আসতে পারে না এবং জমির মালিকানা ফিরে পায় না; চিরতরে তাদের জমি একত্রিত হয়ে যায়। ভারতের কৃষকদের মধ্যে জমির ক্ষুধা প্রবল এবং জমির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি তাদের আকর্ষণ এত গভীর যে, বর্তমান মুহূর্তে এই ব্যবস্থা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না।

(৩) **সমবায় খামার:** সমবায় খামার বলতে এমন একটি কৃষি পদ্ধতি ও সংগঠন বোঝায় যাতে একত্রিত জমিতে সকলে মিলে চাষ করলেও জমির উপর সদস্যদের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে। সমবায় খামারের কৃষিকার্য থেকে খরচ বাদ দিয়ে যে নীট মুনাফা বা আয় হত তা সদস্যদের মধ্যে তাদের জমির অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

সমবায় কৃষি নানা প্রকারের হতে পারে। সাধারণভাবে এই প্রকার কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (১) কৃষকদের জমি একত্রিত করে একটি বৃহৎ জোতে পরিণত করা হয়। (২) তাদের জমির মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে। (৩) একত্রিত জমিতে কৃষিকার্যের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা যৌথ বা যুক্তভাবে করা হয়। (৪) সদস্যরা তাদের পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক পায়। (৫) মোট আয় থেকে কৃষির খরচ ও সঞ্চয় তহবিলের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ কেটে নিয়ে নীট আয় সদস্যদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ জমির অনুপাতে বণ্টন করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমবায় কৃষি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে।

২০.৭. বিভিন্ন প্রকারের সমবায় কৃষি
Types of Co-operative Farming

১. চার প্রকার সমবায় কৃষি সমিতি দেখা যায়: (১) সমবায় উন্নততর খামার সমিতি, (২) সমবায় যুক্ত খামার সমিতি, (৩) সমবায় কৃষক-প্রজা খামার সমিতি ও (৪) সমবায় যৌথ খামার সমিতি।

(১) **সমবায় উন্নততর খামার সমিতি:** এতে যোগদানকারী কৃষকদের জমি একত্রিত করে যুক্তভাবে চাষ করা হয় না। সদস্যদের জোত পৃথক থাকে ও প্রত্যেক নিজের জোত নিজে চাষ করে। কৃষিতে উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবহারে উৎসাহবর্ধন, বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ, সেচকার্য, ফসল কাটার সময় পরস্পরকে সাহায্য দান, সকলে একসঙ্গে কৃষিপণ্য বিক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। একে সঠিক অর্থে সমবায় কৃষি সমিতি বলা যায় না। তবে অনুন্নত দেশে এ ধরনের সমিতি স্থাপন করে প্রকৃত সমবায় কৃষি প্রবর্তনের পথ প্রস্তুত করা যায়।

(২) **সমবায় যুক্ত খামার সমিতি:** কৃষির জন্য জমি ক্রয় বা ইজারা গ্রহণ; তাতে বাসগৃহ, গোশালা ও গুদাম নির্মাণ; কৃষির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয় ও কৃষিপণ্যকে অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যে পরিণত করা; জমি, ফসল ও অন্যান্য সম্পত্তি বন্ধক রেখে কৃষির যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং সভ্যগণকে কৃষিকার্যে ঋণ প্রদান; গো-পালন, ননী, মাখন প্রস্তুতকরণ এবং ফল ও শাকসব্জির চাষ; কৃষিকাজ সম্বন্ধে সদস্যদের অভিজ্ঞতা পরামর্শ দেওয়া ও কৃষিশিক্ষার বিস্তার; কৃষির উন্নয়নের জন্য এবং সদস্যদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, মিতব্যয়িতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রচেষ্টা—এই সকল নানাবিধ উদ্দেশ্যে সমবায় যুক্ত খামার সমিতি গঠিত হয়।

এতে জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুন্ন থাকে অথচ একত্রীভূত বৃহত্তর জোতে কৃষিকাজ করা যায়। কৃষকেরা সকলেই কৃষিকার্যে যোগদান করে এবং কাজের জন্য সমিতি থেকে মজুরি পায়। খরচ বাদে নীট আয় ফসলের অংশ সদস্যদের মধ্যে তাদের জমির অনুপাতে বণ্টন করা হয়। ভারতে এই প্রকার সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(৩) **সমবায় কৃষক-প্রজা খামার সমিতি :** এটি একটি নিম্নতর পর্যায়ের কৃষি সমবায় সমিতি। এ ধরনের সমিতি নিষ্কর অথবা খাজনার শর্তে জমির বন্দোবস্ত নিয়ে সদস্যদের মধ্যে ছোট ছোট জোতে ভাগ করে দেয়। প্রত্যেক সদস্যই সমিতির অধীন প্রজা হিসাবে চাষ করে থাকে। অবশ্য তারা সমিতির নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চাষ করে, জমির জন্য নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়া এবং সমিতির নিয়মানুযায়ী জমির উন্নতি সাধনের জন্য অথবা পতিত জমি উদ্ধারের কাজে শ্রমদান করে বা অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করে। সমিতি থেকে সদস্যদের প্রয়োজনীয় ঋণ, বীজ, সার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণত পতিত জমি উদ্ধার করে তাতে কৃষিকার্য প্রবর্তন করার জন্য এই জাতীয় সমিতি বিশেষ উপযোগী। উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে এই প্রকার সমিতির দ্বারা সুফল পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ সমবায় কৃষি না হলেও এতে সমবায় কৃষির মত কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা থাকায় এবং অন্যদিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে কৃষি-কাজ পরিচালিত হওয়ায় ধীরে ধীরে সমবায় কৃষির বিরুদ্ধে কৃষকদের সন্দেহ ও ভয় কমতে থাকে। ফলে পরবর্তীকালে এর দ্বারা প্রকৃত সমবায় কৃষির (যথা, সমবায় যৌথ খামার সমিতি) প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

(৪) **সমবায় যৌথ খামার সমিতি :** এ ধরনের সমিতিতে কৃষকদের জমির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। জমির মালিকানা সমবায় সমিতির উপর অর্পিত হয়। কৃষকরা যে পরিমাণে তাদের শ্রম ও অন্যান্য বিষয় দিয়ে সমিতির কৃষিকাজে সাহায্য করে সে অনুপাতে তারা ফসল অথবা সমিতির আয়ের অংশ পায়। সোভিয়েত দেশে প্রচলিত এ ধরনের কৃষিকে যৌথ খামার ব্যবস্থা বলা হয়। এই প্রকার কৃষি যাবতীয় সমবায় কৃষির মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের। এর সাফল্যের জন্য কৃষকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উচ্চস্তরের হওয়া দরকার।

২০.৮. সমবায় খামারের সুবিধা বা সপক্ষে যুক্তি Arguments in Favour of Co-operative Farming

(১) জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে কৃষিজোতের একত্রীকরণ করে বৃহদায়তন চাষের প্রবর্তন করা সম্ভব। ভারতীয় কৃষকদের জমির ক্ষুধার কথা মনে রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সমবায় খামার ভারতের কৃষকদের মানসিক পরিবেশের উপযোগী। (২) এর দ্বারা বৃহদায়তন কৃষির প্রবর্তন করে কৃষির যন্ত্রীকরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। (৩) সমবায় কৃষির ভিত্তিতে কৃষিজোতের আয়তন বড় হলে, বর্তমানের ছোট ছোট লাভহীন জোতগুলি অর্থনীতিক জোতে পরিণত হতে পারবে। ফলে কৃষির ব্যয় নির্বাহ করেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হবে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কৃষিজাত উদ্বৃত্ত যত বেশি সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, ততই উন্নয়নের গতি দ্রুত হবে। (৪) জোতের আয়তন বৃহৎ হওয়ায় অধিকতর পরিমাণে ঋণ ও পুঁজির সুবিধা, উন্নত যন্ত্রপাতির সুবিধা, গভীরভাবে ভূমি কর্ষণের সুবিধা, উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের সুবিধা, সেচকার্যের উপযুক্ত ব্যবহারের সুবিধা—প্রভৃতি বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পরিপূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব হবে। (৫) এর দ্বারা, যন্ত্রের ভিত্তিতে বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে মানবশক্তিতেও ব্যয়সঙ্কোচ ঘটবে অর্থাৎ বর্তমান অপেক্ষা অনেক কম কৃষকের সাহায্যে অধিকতর উৎপাদন সম্ভব হবে। কৃষকদের শ্রমের পূর্ণতর নিয়োগ ঘটবে এবং কৃষিতে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা লোপ পাবে। (৬) কৃষিসংস্কার, কৃষিতে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও কৃষির যন্ত্রীকরণের যাবতীয় সুফল একমাত্র সমবায় কৃষির দ্বারাই সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। এতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। (৭) আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় সমবায় কৃষি সমিতিগুলি সভ্যগণের জন্য নানাবিধ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করে মরসুমী কর্মহীনতার সময় তাদের কর্ম-সংস্থান করতে পারবে। (৮) কৃষকদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি পেলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। (৯) কৃষির সামগ্রিক উন্নতির দ্বারা কৃষি ও শিল্প সমানভাবে শক্তিশালী হয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে আত্মনির্ভর করে তুলতে পারবে। সমবায় কৃষি দেশের খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি পূরণ করে শিল্প সম্প্রসারণে সাহায্য করবে। অন্যদিকে কৃষকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করে গ্রামাঞ্চলে শিল্পপণ্যের বাজার প্রসারিত করবে। (১০) সর্বোপরি, বর্তমান ভারতের গ্রামাঞ্চলে মানুষে মানুষে যে অর্থনীতিক অসাম্য এবং সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য গ্রাম-সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে, সমবায় খামারের সৃষ্টি হলে ঐ অসাম্য ও বৈষম্য কিছুটা দূর করা সম্ভব হবে, ফলে গ্রাম-সমাজের ঐক্য দৃঢ় হবে।

এভাবে সমবায় কৃষি এক সমৃদ্ধিশালী, ঐক্যবদ্ধ, নতুন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন, শক্তিশালী গ্রামভারতের ভিত্তি স্থাপন করবে।

২০.৯. সমবায় খামারের অসুবিধা বা বিরুদ্ধে যুক্তি Arguments Against Co-operative Farming

১. **বিরুদ্ধে যুক্তি :** (১) অনেকের মতে, এর ফলে ব্যক্তিগত মুনাফার অফুরন্ত সম্ভাবনা না থাকায় কৃষকদের উদ্যোগ ও উৎসাহ থাকবে না; 'বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হবে। কেউ আগ্রহ নিয়ে চাষ না করলে ফলন কমবে। এর উত্তরে বলা যায় যে, বর্তমানের খেতমজুরদের অবস্থা ভূমিদাসের চেয়ে ভাল নয়। রায়তরা জমিদার-মহাজনদের কবলিত। ছোট চাষীরা মহাজনের শোষণে রিক্ত। তাদের হাতে জমি দিয়ে যদি তাতে সমবায় খামার প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই বরং তারা জমিদার-মহাজনদের কবলমুক্ত হয়ে কৃষিকার্যে উদ্যোগী ও উৎসাহী হবে। কৃষির ফলন বাড়বে।

(২) বিরোধীদের মতে, জমির প্রতি ভারতের কৃষকের গভীর আকর্ষণ রয়েছে। সমবায় খামার প্রবর্তিত হলে, ব্যক্তিগত মালিকানা নষ্ট হবে ও তারা এর বিরোধিতা করবে। এর উত্তরে বলা যায় যে, স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সমবায় খামার স্থাপিত হলে এবং সমবায় খামারের উপকারিতা বুঝতে পারলে, চাষীরা বিনাদ্বিধায় নতুন যুগের প্রয়োজনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবে। তা ছাড়া স্বেচ্ছামূলক সমবায় খামার-প্রবর্তিত হলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকবে। যে কোনো সময় সমবায় খামার থেকে কৃষক বেরিয়ে আসতে পারবে এবং আবার আগের মত ব্যক্তিগতভাবে জমি চাষ করতে পারবে।

(৩) সমবায় খামারের আর একটি অসুবিধা এই যে, এতে কৃষির যন্ত্রীকরণ ঘটবে এবং তার ফলে প্রথমে কৃষিতে কর্মহীনতা বাড়বে। প্রথম দিকে অবশ্য কিছু প্রতিকূল ফল দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত কৃষির ফলন, কৃষকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও বাজার বিস্তৃত হবে। তখন কর্মচ্যুত কৃষকদেরও কর্মের সংস্থান হবে।

(৪) অনেকে বলেন যে, সমবায় খামার পরিচালনার যোগ্য লোক এদেশে নেই বলে সমবায় খামার গঠন অনুচিত হবে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, সমবায় খামার গঠিত না হলে তার পরিচালনার কাজ শেখার কোনো সুযোগই এদেশে কেউ কোনো দিন পাবে না। খামারগুলি গঠিত হলে, তবেই তাতে হাতে-কলমে শিক্ষা পেয়ে সুশিক্ষিত সমবায় খামারকর্মীদল গড়ে উঠবে।

(৫) আবার কেউ কেউ বলেন যে ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলির ফলন বৃহদায়তন খামার অপেক্ষা বেশি হয়। সুতরাং ঐগুলিকে রক্ষা করতে হবে। বাস্তবে এই বক্তব্যের কোনো সমর্থ পাওয়া যায় না। কারণ, ভারতে জমির ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারে চাষ হয় বলে ভারতের কৃষি থেকে চাষের খরচও উঠতে চায় না।

(৬) কেউ কেউ বলেন যে, সমবায় খামার স্থাপনে গণতন্ত্রের ভিত্তি নষ্ট হবে। এটাও ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, বর্তমানে যে পারিবারিক জোত আছে তাতেই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কৃষিকর্মে রত কৃষকেরা দারিদ্র্যের জন্য গ্রাম্য মহাজন, ধনী চাষী-জোতদার ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিজমত প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলেও সমবায় খামারই তার পথ। কারণ, তাতে কৃষকের অর্থনীতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রের শক্তিশালী হবে।

২. **মন্তব্য :** ভারতে সমবায় কৃষির বিকাশের পথে কতকগুলি বাধা রয়েছে : (১) অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য এবং সারা জীবন সব কিছু হতে বঞ্চিত হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে নতুন কোনো কিছুর প্রতিই প্রবল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও আগ্রহের অভাব রয়েছে। তাই সমবায়-কৃষির মত নতুন কোনো ব্যবস্থা প্রচলন করলে কৃষকেরা তাকে আদর করে বরণ করে নেবে এমন মনে হয় না। (২) পুরাতন একান্নবর্তী পরিবার ও প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ঐতিহ্য আর নেই। গ্রামসমাজের এইরূপ মানসিক ও বাস্তব পরিবেশ সমবায়মূলক কৃষি প্রচেষ্টার প্রতিকূল। (৩) সমবায় কৃষিতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার উপর যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় তা প্রথমাবস্থায় কৃষকদের নিকট অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হতে পারে। এতে তাদের সম্পত্তির অধিকার ক্ষুন্ন হল বলে তারা মনে করতে পারে। যে সব দেশে সমবায় খামার প্রবর্তিত হয়েছে সেখানে প্রথম দিকে এরূপ বিরোধিতা দেখা গিয়েছে। (৪) সমবায় খামারের সাফল্যের জন্য প্রচুর কৃষিঋণ, কৃষির যন্ত্রীকরণ, বৃহৎ কৃষি সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা, উৎকৃষ্ট সার ও বীজ সরবরাহ ও বিস্তৃত সেচের প্রবর্তন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় প্রয়োজন। এই বিষয়গুলির মধ্যে উপযুক্ত সংযোগ সাধন দরকার। (৫) সমবায় কৃষির সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা এই যে, এতে কৃষিক্ষেত্রের অনেক কৃষক অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা বাড়বে।

৩. **কিন্তু এ সকল বাধার কোনটিই দূর করা অসম্ভব নয় :** ধৈর্যের সাথে কৃষকদের মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার, কৃষকদের শিক্ষার ও চেতনার মান বৃদ্ধি, সমবায় আন্দোলনের প্রসার—প্রভৃতির দ্বারা এর প্রতি, কৃষকদের বিরূপ মনোভাব দূর করা সম্ভব। আইনগত ব্যবস্থা ও

ভারতের জনমানসের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমবায় কৃষির উপযুক্ত সামঞ্জস্যবিধান (যেমন, বর্তমানে সমবায় যুক্ত খামার সমিতিগুলির মাধ্যমে করা হচ্ছে), উপযুক্ত ঋণ, সেচ, সার, বীজ ও কৃষির যন্ত্রীকরণের জন্য পরিকল্পিত সরকারী ব্যবস্থা, সমবায় খামার পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষাদান ইত্যাদির দ্বারা অন্যান্য বাধাগুলি দূর করা যেতে পারে। পরিশেষে, দেশের সামগ্রিক শিল্পায়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে সমবায় কৃষির বিস্তারের কার্যক্রম গৃহীত হলে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা বাড়তে পারবে না।

৪. **উপসংহার :** ভারতের একদিকে ভূমিহীন কৃষক এবং ক্ষুদ্র নামমাত্র জমির মালিক-চাষীর সংখ্যাধিক্য এবং অপর দিকে মুষ্টিমেয় ৩৫% গ্রাম্য পরিবারের হাতে ৩৭% জমির মালিকানা সুস্পষ্টভাবেই সমবায় খামারের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দিচ্ছে। একমাত্র এর দ্বারা কৃষিতে মানবিক শক্তি ও জমির অপচয় ও অপব্যবহার দূর করে, যথার্থ ও পরিপূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এর দ্বারাই কৃষিতে আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান পদ্ধতির প্রয়োগে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং কৃষির বিকাশের কণ্ঠরোধকারী মহাজন-ধনীচাষী জোতদার গ্রাম্য ব্যবসায়ীর অশুভ জোট দূর করে প্রগতিশীল কৃষি কাঠামো গঠন করা সম্ভব।

২০.১০. ভারতে সমবায় খামার
Co-operative Farming in India

১. স্বাধীনতা লাভের পর উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসী জেলায় ভারতে সমবায় খামার ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। পরে বোম্বাই, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের অন্যত্র সমবায় খামার আন্দোলন প্রসারিত হয়। এর মাধ্যমে ব্যাপক অঞ্চলে পতিত জমি উদ্ধার ও যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তিত হয়।

২. **সরকারী নীতি ও সমবায় খামারের অগ্রগতি :** পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পরিকল্পনাকালে পরীক্ষামূলক-ভাবে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সমবায় যুক্ত খামার গঠনের সুপারিশ করে ও এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৫২ সালে বিভিন্ন স্থানে সমবায় খামার গঠনে সমবায় আন্দোলনকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা কালে সমবায় খামার আন্দোলন কার্যত বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি।

৩. **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** সমবায় খামার সম্পর্কে সরকারী লক্ষ্য এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে 'দশ বৎসরকালের মধ্যে দেশে সমবায় ভিত্তিতে আবাদী জমির একটা অংশের চাষ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ৬ লক্ষ একর জমি ও ১ লক্ষের বেশি সদস্য নিয়ে ৫,৬০১টি সমবায় খামার সমিতি গঠিত হয়।

৪. জমি, লোকবল ও অন্যান্য সম্বল একত্রিত করে চাষ করলে তার দ্বারা যে কৃষির উৎপাদন বাড়ান, কৃষি-নির্ভর-শিল্পের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে কাজের সংস্থান বাড়ান এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করা যায় তা কৃষকদের দেখাবার জন্য **তৃতীয় পরিকল্পনায়** ১০টি করে সমবায় খামার নিয়ে এক একটি 'পাইলট প্রকল্প' রূপে মোট ৩১৮টি পাইলট প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ফলে সমবায় খামারের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

৫. **চতুর্থ পরিকল্পনাতে** স্থির হয় যে, দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় খামার সমিতিগুলিকে সক্রিয় করা হবে এবং কেবল উন্নতির সম্ভাবনা বিশিষ্ট ঘনসংবদ্ধ অঞ্চলেই নতুন সমবায় খামার সমিতি স্থাপন করা হবে।

৬. **সমবায় খামার সমিতির উন্নতির জন্য সুপারিশ :** সমবায় খামারের অগ্রগতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি রিপোর্ট ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হলে সমবায় খামার আন্দোলনের ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। কমিটি দেখতে পান যে—(১) ভারতে সমবায় খামারের যে অগ্রগতি ঘটেছে তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ ; (২) কৃষকরা ও সরকারী কর্মচারীরা কেউই এর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি ; (৩) কৃষকদের মনে দ্বিধা ও সাহায্যদানের ব্যাপারে সরকারী কুণ্ঠা এর অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে ; (৪) অধিকাংশ সমবায় খামারই গ্রামীণ জমির শহরপ্রবাসী মালিকদের ভূমিসংস্কার আইন ফাঁকি দেওয়ার জন্য গঠিত হয়েছে ; (৫) অনেক ক্ষেত্রে আবার গ্রামীণ ধনী, প্রভাবশালী ও চতুর ব্যক্তিরা সরকারের কাছ থেকে জমি আদায় করার জন্য সমবায় খামার গঠন করেছে। (৬) প্রবাসী মালিকেরা যে সব সমবায় খামার গঠন করেছে তা নিজেরা চাষ না করে কৃষিশ্রমিক দিয়ে চাষ করায়। (৭) তবে প্রধানত কৃষিশ্রমিকরা যে সমবায় খামার গঠন করেছে সে খামারগুলি উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে।

৭. সমবায় খামারের অগ্রগতির পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার একটি নির্দেশনা কমিটি নিয়োগ করে। ঐ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, সমবায় খামার আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রসার না করে তাকে সুসংবদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং তার যেটুকু প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা প্রগাঢ় কৃষি-কার্যের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত অঞ্চলেই যেন করা হয়। কমিটি আরও বলে যে, বেশির ভাগ অঞ্চলেই সমবায় খামার আন্দোলন সরকারী উৎসাহ ও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে, অনেক সময় বড় চাষীরাই সমবায় খামার সমিতিগুলির উপর আধিপত্য করেছে। অনেক অঞ্চলেই এমন সমিতি গঠিত হয়েছে যা সাফল্য অর্জনে অক্ষম। সরকার বা সমবায় সমিতিগুলি থেকে সমবায় খামারগুলির প্রয়োজনীয়

আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যও উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া হয়নি। এগুলি সবই সত্য; তবে এ সকল বাধা সত্ত্বেও সমবায় খামারগুলি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষমতা দেখিয়েছে। অতএব, দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে সমবায় খামারের একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

৮. ১৯৬৮ সালে জাতীয় সমবায় খামার পর্ষৎ-এর সুপারিশ হল—(১) পুরাতন সমবায় সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার উপরই রাজ্য সরকারগুলির জোর দেওয়া উচিত এবং যেখানে উন্নতির সম্ভাবনা আছে কেবল সেখানেই নতুন সমিতি স্থাপন করা উচিত। (২) সদস্যদের সমস্ত জমি একত্রিত করার জন্য প্রত্যেক সমিতির নির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকা উচিত। (৩) সমিতির সমস্ত জমিতে অবশ্যই একত্রে চাষ করতে হবে। এবং (৪) উপরোক্ত নির্দেশগুলি পালন না করলে কোনো সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত নয়।

৯. **মন্তব্য:** সমবায় খামার আন্দোলনের এই বাস্তব চিত্র থেকে এই ধারণাই জন্মায় যে, সমবায় খামার আন্দোলন যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তাতে গ্রামাঞ্চলের মুষ্টিমেয় ধনী কৃষক, ভূস্বামী ও প্রবাসী ভূস্বামীরাই প্রকৃত লাভবান হয়েছে, অথচ যাদের মঙ্গলের জন্য এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল সেই দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকসমাজ এতে খুব কমই উপকৃত হয়েছে।

১০. সুতরাং সমবায় খামার আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে এই দিকটি সম্পর্কে নজর দিতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন হল: (১) **প্রকৃত ভূমিসংস্কার দ্রুত** সম্পাদন করে উদ্বৃত্ত ভূমিহীন খেতমজুর ও ছোট এবং গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি করা; (২) প্রথমদিকে সমবায় ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি গঠন করে এবং অনুরূপ ও সহযোগিতামূলক কর্মের সাহায্যে কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা; তারপর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সমবায় খামার সমিতি গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া; (৩) তাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ও সুবিধাজনক শর্তে কৃষি-ঋণ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ, উচ্চফলনক্ষমতাসম্পন্ন বীজ ও সেচের ব্যবস্থা করা। এবং (৪) সরকারের তরফ থেকে তাদের পরামর্শ ও কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

২০.১১. জোতের আয়তন, উৎপাদনশীলতা ও মুনাফাযোগ্যতা বা দক্ষতা
Size, Productivity and Profitability or Efficiency of Holdings

১. জোতের উৎপাদনশীলতা বলতে বোঝায় একর পিছু জমির (অর্থাৎ বিঘা, একর বা হেক্টেয়ার পিছু) ফলন, আর জোতের মুনাফাযোগ্যতা বা দক্ষতা (farm profitability or efficiency) বলতে বোঝায় কৃষক ও তার পরিবারের দ্বারা সরবরাহ করা উপাদানগুলির (যেমন নিজেদের শ্রম, লাঙল-বলদ ইত্যাদির) অনুমিত মূল্য (imputed value) সহ চাষের খরচ বাদে উৎপন্ন ফসলের উদ্বৃত্ত পরিমাণের মূল্য (surplus of value of output)।

২. ভারতে বেশ কিছুকাল ধরে, জোতের আয়তন এবং উৎপাদনশীলতা ও মুনাফাযোগ্যতা বা দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক চলেছে। অধ্যাপক অমর্ত্যকুমার সেন এই বিতর্কের তিনটি অনুসিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন: (ক) বাজার চলতি মজুরির হারে যদি চাষে নিযুক্ত পারিবারিক শ্রমের মূল্য ধরা হয়, তাহলে দেখা যায় ভারতীয় কৃষির অধিকাংশই হল অলাভজনক (unremunerative)। (খ) শ্রমের অনুমিত মূল্যসহ চাষের খরচ হিসাব করা হলে এবং সেই মাপকাঠিতে উৎপন্ন ফসলের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি যদি হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যায়, মোটামুটিভাবে জোতের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির মুনাফাযোগ্যতা বাড়ে। (গ) আবার, মোটামুটিভাবে এও দেখা যায়, জোতের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে একর পিছু জমির উৎপাদনশীলতা কমে।

উপরোক্ত তিনটি অনুসিদ্ধান্তের প্রথমটিতে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন, ভারতের অধিকাংশ কৃষিকার্যই অলাভজনক; দ্বিতীয়টিতে বলেছেন, জোতের আয়তন বাড়লে মুনাফাযোগ্যতাও বাড়ে; কিন্তু তৃতীয়টিতে তাঁর বক্তব্য হল, বড় জোতের তুলনায় ছোট জোতের উৎপাদনশীলতা বেশি। সুতরাং দ্বিতীয় বক্তব্যটির সাথে তৃতীয় বক্তব্যটির একটি বিরোধ দেখা যায়।

৩. স্বভাবতঃই অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের এই অনুসিদ্ধান্তগুলি নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জোতের ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ভারতে জোতের আয়তনের সঙ্গে তার উৎপাদনশীলতার একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। তার মূল কারণ হল, (ক) ছোট আয়তনের জোতে একর পিছু শ্রম ব্যবহৃত হয় বেশি পরিমাণে; অন্যান্য উপকরণগুলি শ্রমের তুলনায় কম অনুপাতে ব্যবহার করা হয়। (খ) বড় জোতের তুলনায় ছোট জোতগুলি বেশি প্রগাঢ়ভাবে চাষ করা হয়। (গ) ছোট জোতগুলিতে সাধারণত একাধিক ফসলের চাষ হয়। এবং (ঘ) ছোট জোতগুলি সাধারণত বেশি সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায় এবং সেটা তাদের প্রগাঢ় চাষে আরও সাহায্য করে।

৪. সবুজ বিপ্লব এবং জোতের আয়তন ও উৎপাদনশীলতার বিপরীত সম্পর্ক : সবুজ বিপ্লব হল মূলত কৃষিতে পুঁজি-নিবিড় কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ (উচ্চফলন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ, রাসায়নিক সার, সেচ ইত্যাদির ব্যবহার)। এর ফলে বড় বড় জোতগুলির সঙ্গে ছোট ছোট জোতগুলির উৎপাদনশীলতার পার্থক্য কমে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। ফলে বড় বড় জোতগুলির আয়তনের সঙ্গে উৎপাদনশীলতার বিপরীত সম্পর্ক অনেকটা দূর হয়ে আনুপাতিক সম্পর্ক দেখা দিয়েছে। এর দরুন বড় জোতের মালিকদের আয় অনেক বেড়ে গ্রামীণ আয়ের বণ্টনে বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে সমবায় খামার প্রবর্তনের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the arguments in favour of and against the introduction of co-operative farming in India.]

২. "ভারতের সব অসুবিধার মূল উৎস হল কৃষিজমিতে জনসংখ্যার চাপ এবং মাথাপিছু স্বল্প উৎপাদনশীলতা।" —এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় খামার কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কতদূর সক্ষম তা আলোচনা কর।

["Pressure of population on agricultural land and low per capita productivity are at the root of all difficulties that India has to face." In the light of this statement, examine how far co-operative farming would be able to help increase agricultural productivity.]

৩. ভারতে সমবায় খামারের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Give an account of the progress made by co-operative farming in India.]

৪. ভারতে সমবায় খামারের অগ্রগতি আলোচনা কর এবং এর ভাল ও মন্দ দিকগুলি দেখাও।

[Make an assessment of the progress made by co-operative farming in India and point out its positive and negative aspects.]

৫. ভারতে সমবায় ভিত্তিতে চাষের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the case for and against a system of co-operative farming.]

[C. U. B. A. III, 1983]

৬. ভারতে সমবায় কৃষির অগ্রগতির বিবরণ দাও। এদেশে সমবায় কৃষির কাজকর্ম কি সন্তোষজনক মনে হয় ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

[Give an account of the progress made by co-operative farming in India. Has the performance of co-operative farming in this country been satisfactory ? Give reasons for your answer.] [C. U. B. Com. (Hons.), 1984]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. জোতের উপবিভাজন কথাটির অর্থ কি ?

[What does subdivision of holding mean ?]

২. কৃষিজোতের বিক্ষিপ্তকরণ বলতে কি বোঝায় ?

[What is meant by fragmentation of agricultual holding ?]

৩. "অর্থনীতিক জোত" বলতে কি বোঝায় ?

[What is meant by an 'economic holding ?]

কৃষির অর্থসংস্থান
Agricultural Finance

২১.১. ভূমিকা
Introduction

১. উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য শিল্পের মত কৃষিক্ষেত্রেও অর্থ অপরিহার্য। বীজ, সার ও সেচকার্য, কৃষিশ্রমিকের মজুরি কৃষিকাজের আরম্ভ থেকে ফসল বিক্রয় পর্যন্ত কৃষকের সংসারব্যয় নির্বাহ, উপযুক্ত দর না পাওয়া পর্যন্ত ফসল ধরে রাখা, কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়, চাষের পশু ক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ কারণে কৃষিতে অর্থ প্রয়োজন। জমির উন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন, উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়।

২. ব্যক্তিগত, সমবায় অথবা যৌথ কৃষি, যে পদ্ধতিতেই উৎপাদন হোক না কেন, কৃষির প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের দু'টি উৎস সচরাচর দেখা যায় : (১) কৃষির আয় থেকে সৃষ্ট সঞ্চয় এবং (২) ঋণ। কৃষির উন্নয়নের দ্বারা সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়। উন্নত দেশে কৃষির অতীত ও চলতি সঞ্চয় থেকে কৃষির প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান সম্ভব। কিন্তু অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থসংস্থানের জন্য ঋণের উপরেই প্রধানত নির্ভর করতে হয়।

২১.২. কৃষিঋণের প্রকারভেদ
Types of Agricultural Credit

সময় ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিন শ্রেণীর কৃষিঋণ প্রয়োজন হয়। যথা—স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

১. **স্বল্পমেয়াদী ঋণ :** প্রতি বৎসর ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত তা ধরে রাখতে যে অর্থের প্রয়োজন তাকে কৃষির 'চলতি পুঁজি' বলা যায়। এজন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রয়োজন। ফসল বিক্রয় হয়ে গেলে এই প্রকার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব।

২. **মাঝারিমেয়াদী ঋণ :** কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় পশু যন্ত্রপাতি, কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন ও জমির ছোটখাটো উন্নতির জন্য যে ঋণের প্রয়োজন তা হল কৃষির মাঝারি-মেয়াদী ঋণ। এই প্রকার ঋণ ১৫ মাসের অধিককালের জন্য প্রয়োজন এবং অনধিক ৫ বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ করা সম্ভব।

৩. **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ :** জমির স্থায়ী উন্নতি, নতুন জমি ক্রয়, পতিত জমি উদ্ধার, সেচকার্য প্রবর্তন, মূল্যবান

কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ, খামারবাড়ি নির্মাণ, পুরাতন ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন। এই ধরনের ঋণ ১৫/২০ বৎসরের আগে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

২১.৩. ভারতে কৃষিঋণের সমস্যা

The Problem of Agricultural Credit

১. ভারতে কৃষিঋণের সমস্যা দীর্ঘকালের। ৭০ বৎসরেরও আগে মিঃ নিকলসন ভারতে কৃষকদের ঋণের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ভারতের কৃষিজোতের ক্ষুদ্র আকার, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জোতে কৃষিকার্যের অত্যধিক ব্যয়, ফলনের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা, ফসল বিক্রয়ে অসুবিধা, ঋণের জামিন হিসাবে জমির অনুপযুক্ততা, ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনকাল থেকে ফসল বিক্রয় পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষার প্রয়োজনীয়তা, কৃষকের দারিদ্র্য ও অস্থাবর সম্পত্তির অভাব —প্রভৃতি কারণে কৃষিঋণের সংকট প্রবল আকার ধারণ করেছে।

২. আয় অল্প বলে ভারতীয় কৃষকগণকে যেমন কৃষির জন্য ঋণ করতে হয়, তেমনি সংসার খরচ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, অসুস্থতা, প্রভৃতি বিভিন্ন কারণেও সর্বদাই ঋণ করতে হয়। কৃষির জন্য যে ঋণ করা হয় তা উৎপাদনশীল। কিন্তু অন্যান্য কারণে (যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) ঋণ অনুৎপাদনশীল। ভারতের কৃষিঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদনশীল। এজন্য ঋণের দ্বারা কৃষির উন্নতি ও কৃষকের আয়বৃদ্ধি ঘটেনি। অতএব চরিত্র বিচারে ভারতের কৃষিঋণের সমস্যা দুই প্রকার :

(১) পুরাতন ঋণভার লাঘব এবং অনুৎপাদনশীল নতুন ঋণ হ্রাস করার সমস্যা। এবং (২) নতুন উৎপাদনশীল কৃষিঋণ সরবরাহের সমস্যা।

ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে যেমন কৃষি সংস্কার, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন এবং সমবায় কৃষির প্রচলন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণের সরবরাহ।

২১.৪. কৃষকের পুরাতন ঋণভারের সমস্যা

The Problem of Rural Indebtedness

১. **ঋণভারের হিসাব :** ১৮৭৫ সাল থেকে আরম্ভ করে নানা সময়ে কৃষিঋণের বিভিন্ন হিসাব করা হয়েছে। ১৯১১ সালে স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান-এর হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি টাকা। ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী তা ৯০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের হিসাবে তা বেড়ে ১৮০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কৃষিজাত আয় ছিল ৯৫৩ কোটি টাকা। জাতীয় আয় কমিটির প্রথম রিপোর্টে পুরাতন ঋণের পরিমাণ ৯১৩ কোটি টাকা বলা হয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ ও বিনিয়োগ সমীক্ষার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দেশের গ্রামীণ পরিবারগুলির ৬৩%ই ঋণগ্রস্ত এবং তাদের মোট ঋণের পরিমাণ ২,৭৮৯ কোটি টাকা। এর ৮৫% বা ২,৩৮০ কোটি টাকা হল কৃষক পরিবারের ঋণ এবং এই সকল কৃষক পরিবারের মোট গ্রামীণ পরিবারের ৭৫%। গ্রামীণ পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ ৪০৬ টাকা ও কৃষক পরিবার-পিছু ঋণের পরিমাণ ৪৭৩ টাকা। মোট ঋণ, ২,৭৮৯ কোটি টাকার মধ্যে ৮৯% হল আসল বাবদ ও ১১% হল সুদ বাবদ দেনা। এই বিবরণ থেকেই ভারতের গ্রামীণ ও কৃষি দেনার ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। দু'টি পরিকল্পনার পরেও কৃষি দেনার এই পর্বতপ্রমাণ বোঝা অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে যেন উপহাস করছে।

২. **ঋণভারের কারণ :** পুরুষানুক্রমিক পৈতৃক ঋণের বোঝা, গ্রামের মহাজন কর্তৃক কৃষকের অজ্ঞতা ও নিরক্ষতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা, কৃষকদের বেহিসাবী ব্যয়ের স্বভাব, মামলা মোকদ্দমার দিকে ঝোঁক ও তজ্জন্য ঋণগ্রহণ, যখন তখন মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ পাওয়ার সুবিধা, সুদের চড়া হার প্রভৃতি কৃষিঋণ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। এছাড়া অন্যান্য কারণও আছে। কৃষকদের আয় অত্যন্ত অল্প হওয়ায় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ না নিলে কৃষকদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। যখনই লাঙল বা গরু কিনতে হয়, তখনই মহাজনদের কাছে হাত পাততে হয়। এর উপর কৃষি-ফলনের অনিশ্চয়তা এবং উপযুক্ত ফসল বিক্রয়ব্যবস্থার অভাবও তাদের ঋণের উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজ রাজত্বে প্রবর্তিত উচ্চহারে খাজনা ও সেচ-কর প্রভৃতি তাদের আয় কমিয়ে দিয়ে তাদের মহাজনদের কবলে নিক্ষেপ করেছে। পরিশেষে, জমির ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির দরুন তাদের পক্ষে জমি বন্ধক রেখে সহজে গ্রামীণ ধনী কৃষক, জমিদার ও মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা হয়েছে।

৩. **ঋণভারের কুফল :** উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ঋণ নিলে উৎপাদন ও আয় বাড়ে। তা থেকে সহজেই ঋণ পরিশোধ করে ঋণ গ্রহণকারী তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষিঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদনশীল বলে সে ঋণে কুফল ছাড়া সুফল ঘটেনি।

(১) **অর্থনৈতিক কুফল :** কৃষকদের স্বল্প আয়ের অধিকাংশই ঋণ শোধ করতে নিঃশেষিত হয়। এর ফলে

জমির উন্নতি ও ফসল বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় ও পুঁজি বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং তাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই নেমে যেতে থাকে। মহাজনদের তাগিদে ফসল ঘরে তোলার আগেই যে কোনো দরে বিক্রয় করে দিতে হয় বলে কৃষক কোনোদিনই সুবিধাজনক দরে ফসল বিক্রয়ের সুযোগ পায় না। দেনার দায়ে মহাজনরা জমি দখল করে নেয়। ভারতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধির এটি হল প্রধান কারণ। এই অবস্থায় কৃষিকাজে কৃষকের আর কোনো উৎসাহ থাকে না। সেজন্য কৃষির ফলন কমে।

(২) **সামাজিক কুফল:** দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত কৃষক মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এমনকি দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র কাজের সন্ধানে তার যাওয়ার উপায় থাকে না। মহাজনের দাসে পরিণত কৃষকের কোনো সামাজিক মর্যাদা থাকে না। সমাজের কাছে সে তখন অসহায়, তাচ্ছিল্য ও কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে।

(৩) **নৈতিক কুফল:** চিরন্তন ও ক্রমবর্ধমান ঋণভার ভারতের কৃষক সমাজকে স্বাধীন জীবিকা ও জীবনধারণের সুস্থ ও স্বাভাবিক উপায় থেকে বঞ্চিত করেছে; মহাজনের ভূমিহীন ক্রীতদাসে পরিণত করে ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্তি সম্পর্কে তাদের মনের সব আশা-ভরসা চিরতরে মুছে দিয়েছে। বৈষয়িকভাবে দেউলিয়া কৃষককে নৈতিক দেউলিয়ায় পরিণত করছে। বঞ্চিত কৃষক স্বভাবতই আত্মরক্ষার তাগিদে ঋণ পরিশোধে ফাঁকি দিতে যেমন দ্বিধা করে না, তেমনি কায়িক শ্রমে ফাঁকি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যে সমাজ তাকে বঞ্চিত করল, সে সমাজকে সেও বঞ্চনা ও ঘৃণা দ্বারাই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে।

ভারতের বর্তমান অর্থনীতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হল প্রচণ্ড ঋণভারে জর্জরিত হতাশ, কর্মোদ্যমহীন, মহাজনের কর-কবলিত কৃষকসমাজ ও কৃষির উদ্ধার। ঋণের এই নাগপাশ থেকে কৃষকের উদ্ধার ছাড়া কৃষির উন্নয়ন ও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি অসম্ভব।

৪. **প্রতিকারের উপায় ও গৃহীত ব্যবস্থা:** তিনটি উপায়ে কৃষিঋণভার সমস্যার প্রতিকার সম্ভব। প্রথমত, পুরাতন ঋণ হ্রাস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন ঋণ-গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তৃতীয়ত, কৃষকগণকে কৃষির জন্য সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ করতে হবে।

(১) **পুরাতন ঋণভার হ্রাস:** সবার আগে ঋণভার হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে নানারূপ আইন পাশ হয়েছে: তাতে কোথাও বিশেষ অবস্থায় ঋণশোধের সঙ্গতিহীন কৃষকগণকে দেউলিয়া ঘোষণা করে ঋণভার থেকে তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়ার, কোথাও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার, ঋণসালিসী বোর্ড গঠন করে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে মহাজন ও দেনাদারের মধ্যে আপসে ঋণ মকুবের ও সুবিধাজনক কিস্তিতে পরিশোধের, সুদের হার হ্রাসের, কোথাও বা বকেয়া সুদের পরিমাণ হ্রাসের ও আসল টাকার দ্বিগুণের বেশি সমস্ত পুরাতন ঋণ মকুব করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেনার দায়ে মহাজনের দাসত্ব প্রথা (Bonded Labour) বেআইনী করা হয়েছে।

(২) **নতুন ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** এর উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে ঋণভার যেন অযথা না বাড়ে এবং কৃষকগণ অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে যেন ঋণ না করে। এজন্য একদিকে যেমন কৃষকদের মধ্যে প্রচার দরকার, তেমনি প্রয়োজন আইনগত কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের। ঋণদাতার উপর আইনগত বিধি-নিষেধ আরোপ করা এবং ঋণদাতারা যাতে চড়া হারে সুদ না নেয় ও হিসাবের কারচুপি না করতে পারে, দেনাদার কৃষককে সর্বস্বান্ত না করতে পারে, সেজন্য অতীতে কেন্দ্রীয়-ভাবে ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আইন পাস করা হয়েছে।

(৩) **সহজ শর্তে ঋণ সরবরাহ:** এর ব্যবস্থা করা কৃষিঋণ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ। আইনগত ব্যবস্থা দ্বারা পুরাতন ঋণভার হ্রাস শুধু পুরাতন অন্যায়ের অবসান করতে পারে। নতুন ঋণ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কৃষকদের উপর মহাজনের শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ হতে পারে। কিন্তু সহজ শর্তে যথেষ্ট ঋণ সরবরাহের বন্দোবস্ত না হলে, কৃষকদের উপর মহাজনদের গ্রাস দূর হবে না।

৫. **কৃষিঋণভার সংক্রান্ত আইনের সমালোচনা:** কৃষিঋণভার সংক্রান্ত আইনগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এরূপ আইনের উদ্দেশ্য দুই প্রকারের। প্রথমত, পুরাতন ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা। দ্বিতীয়ত, নতুন ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাজনী ব্যবসায়ের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা।

এ সকল আইনগত ব্যবস্থায় কৃষকের ভার আংশিক লাঘব হয়েছে। কিন্তু তা সমস্যার মূল স্পর্শ করেনি। পুরাতন দেনা সম্পূর্ণ মকুব করে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীর দ্বারা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির পথেই কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের মাথাপিছু আয়ের স্থায়ী বৃদ্ধির মধ্যেই এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান রয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্যগুলিতে একদিকে পুরাতন ঋণ মকুবের, ঋণের দায়ে হাতছাড়া হওয়া জমি কৃষকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার, পুরাতন ঋণ আদায়ের মামলা রদ এবং গরীব ও ও ছোট চাষীদের কৃষিঋণদানের জন্য প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

২১.৫. প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের আনুমানিক হিসাব ও উৎস

Estimate and Sources of Rural Credit Requirements

১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ১৯৫১ সালে নিযুক্ত সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির (গোরওয়ালা কমিটি) মতে দেশে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণের বাবদ মোট বাৎসরিক ৭৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন। তখন এই ঋণের প্রায় ৯৩ শতাংশ বেসরকারী উৎস থেকে সংগৃহীত হত। কৃষক মহাজন ও সাধারণ মহাজনেরা যথাক্রমে প্রায় ২৫ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৭০ শতাংশ ঋণ দিত। আধুনিক প্রতিষ্ঠানগত সূত্র, অর্থাৎ সরকার ও সমবায় সমিতি যথাক্রমে ৩'৩ শতাংশ ও ৩'১ শতাংশ, মোট ৬'৪ শতাংশ যোগান দিত। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ১ শতাংশের কম কৃষিঋণ সরবরাহ করত।

২. কারও কারও মতে বর্তমানে প্রতি বৎসর ১,৩০০/১,৪০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত গ্রামীণ, ঋণ পর্যালোচনা কমিটির (ভেঙ্কটাপ্পিয়া কমিটি) মতে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষিতে ২,০০০ কোটি টাকার মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ প্রয়োজন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ১৯৭৩-৭৪ সালে ২,০০০ কোটি টাকার স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন ছিল। ১৯৬১-৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ ঋণ ও বিনিয়োগ সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, সে সময়ে কৃষকদের ঋণের ৯ শতাংশ সমবায় সমিতিগুলি, ৫ শতাংশ সরকার ও ০'৪ শতাংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সরবরাহ করছিল। বাকি প্রায় ৮৫ শতাংশ যোগাড় হত মহাজন প্রভৃতি অন্যান্য সূত্র থেকে। ১৯৬৯ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত একটি অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষিঋণ-দানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃষিঋণের ৩০ শতাংশ সরবরাহ করছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে এই প্রধান সংস্থাগুলি কৃষি-ঋণের ৩৩ শতাংশ ও ৫'৩ শতাংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যোগাচ্ছিল। একটি সরকারী হিসাবে বর্তমানে সমবায় সমিতি, বাণিজ্যিক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি মোট প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের ৪০ শতাংশ যোগান দিচ্ছে।

৩. পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দেশের কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও তার ভিত্তি দৃঢ় করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় দেশে কৃষিঋণ সরবরাহ করার মত উপযুক্ত উৎসের অভাবই হল গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। ভারতে কৃষিঋণের জন্য পুরাতন মহাজনী ব্যবস্থার উপর এখনও বেশি নির্ভর করতে হয়। সরকারী কৃষিঋণদান ব্যবস্থা, সমবায় ঋণদান সমিতির কাজ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বৃদ্ধির চেষ্টা—এ সব কিছুই প্রয়োজনের তুলনায় এখনও কম। বহু উৎসাহ নিয়ে মহাজনী আইন পাস করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়েও মহাজনদের অশুভ কবল থেকে কৃষকদের মুক্ত করা যায়নি। সুতরাং পরিকল্পনার সাফল্য ও দেশের ঘোষিত নীতির স্বার্থে কৃষিঋণ ব্যবস্থার গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন।

৪. **কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কাম্য পদক্ষেপ :** (১) কৃষিঋণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সরকারকেই পথপ্রদর্শকের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির সরকারকে আরও অধিক পরিমাণে স্বল্পমেয়াদী ঋণের যোগান দিতে হবে। (২) কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ ও বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, কৃষকদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ও বৈষয়িক সাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমবায়ের ভিত্তিতেই গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা গঠন করতে হবে। গ্রামীণ ঋণদান সমিতিগুলিকে গ্রামীণ মহাজনদের স্থান গ্রহণ করতে হবে। (৩) কৃষকদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে ও ঐ সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলে আরও পোস্ট অফিস, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা খুলতে হবে। (৪) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে আরও অধিক পরিমাণ কৃষিঋণদানে অগ্রসর হতে হবে। (৫) গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারগুলিতে অবিক্রীত ফসল মজুদ রাখার জন্য গুদাম নির্মাণ করতে হবে। ঐ গুদামে রক্ষিত ফসলের রসিদ জামিন হিসাবে রেখে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকদের ঋণদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। (৬) সমবায় ঋণদান সমিতির সঙ্গে সমবায় কৃষি ও সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তা হলে কৃষকেরা ঋণ নিয়ে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কি না সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি তার তদারক করতে পারবে। (৭) রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঋণদানের শর্তাদির কঠোরতা আরও শিথিল এবং ঋণের পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। (৮) গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির মতে কৃষি ঋণদানের জন্য একটি পৃথক কৃষিঋণ করপোরেশন গঠন করা প্রয়োজন।

৫. এ সম্পর্কে উল্লেখনীয় যে, স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন করে এবং সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির পরামর্শ অনুসারে গ্রামীণ ঋণ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার এ ক্ষেত্রে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে এবং উপরে উল্লিখিত অনেক ব্যবস্থাই কার্যকর করেছে।

২১.৬. গ্রামীণ ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠন : গোরওয়ালা কমিটি সুপারিশ
Restructuring of Rural Credit : Gorwala Committee Recommendations

১. পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমিকায় কৃষির দ্রুত পুনর্গঠনে সাহায্য করার জন্য গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করা অত্যাবশ্যক। এই কারণে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় এবং ১৯৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্রামীণ ঋণ সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান, ত্রুটি নির্দেশ ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি সমীক্ষা কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি সারাভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি (গোরওয়ালা কমিটি) নামে পরিচিত। ১৯৫৪ সালে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে।

২. কমিটি দেখতে পায় যে, তখন কৃষকদের মোট ঋণের মাত্র ৩.৩ শতাংশ সরকার ও ৩.১ শতাংশ সমবায় সমিতিগুলি সরবরাহ করছিল। ৭০ শতাংশ ঋণ সরবরাহ করছিল মহাজনরা। এ থেকে কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এ পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন কৃষকদের উপযুক্ত পরিমাণে ঋণের যোগান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু ব্যর্থতা সত্ত্বেও সমবায় সমিতিকে ভিত্তি করেই নতুনভাবে গ্রামীণ ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠন আবশ্যক।

৩. **সুপারিশের তিনটি মূল নীতি :** কমিটির মতে, গ্রামীণ ঋণ পুনর্গঠনের জন্য সমবায় সমিতিকেই মূল প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এজন্য কমিটি যে তিনটি মূলনীতি গ্রহণের সুপারিশ করে তা হল :

(ক) সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারকে অংশ নিতে হবে। (খ) ঋণদানকারী ও অন্যান্য সমবায় সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (গ) সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের জন্য কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. **ছয়টি প্রধান ব্যবস্থা :** উপরোক্ত তিনটি মূল নীতির অনুসরণে কমিটি নিম্নলিখিত ছয়টি প্রধান ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে।

(১) **প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে সীমাবদ্ধ** দায়ের ভিত্তিতে বৃহত্তর আকারে সংগঠিত করতে হবে। অন্যান্য প্রকার কৃষিসমবায় সমিতিগুলির সাথে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে হবে। রাজ্যস্তরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ও প্রাথমিক সমিতিগুলিতে সীমাবদ্ধকালের জন্য সরকারকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(২) **গ্রামবাসীদের অন্যান্য যাবতীয় জীবিকা ও কাজ** (যথা—ভূমিকর্ষণ, সেচ, বীজ ও সার সংগ্রহ, পশুপালন, মৎস্য চাষ, পরিবহণ, কুটির শিল্প, কৃষিপণ্য সংরক্ষণের মজুদ ঘর ও গুদাম নির্মাণ, কৃষিপণ্য বিক্রয়, কৃষিপণ্যকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অর্ধপ্রস্তুত-পণ্যে পরিণতকরণ প্রভৃতি) **সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে।** এদের ক্ষেত্রেও সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৩) **সমবায়ের উন্নয়ন ও সমবায় ভিত্তিতে দেশে ব্যাপকভাবে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প পরিচালনার জন্য, সমবায় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠিত করার জন্য, কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারী উদ্যোগে গঠিত একটি সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পর্ষদ থাকবে।** একটি কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশন ও প্রতি রাজ্যে একটি করে রাজ্য গুদাম করপোরেশন থাকবে।

(৪) **পাঁচটি তহবিল** সৃষ্টি করতে হবে। এদের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে থাকবে দু'টি। একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অপরটি মাঝারিমেয়াদী ঋণের জন্য। একটি তহবিল থাকবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের অধীনে। তা থেকে সমবায় সমিতিগুলিকে অনাদায়ী ঋণ মকুবের জন্য অর্থ দেওয়া হবে। অপর দু'টি তহবিল থাকবে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পর্ষদের অধীনে। এদের একটি থেকে গুদাম নির্মাণে ও কৃষিপণ্য বিক্রয় কার্যে সহায়তার জন্য ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হবে। অপরটি গুদাম সংক্রান্ত সুবিধা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হবে।

(৫) **গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কাজকর্মের সুবিধা সৃষ্টির জন্য সরকারের অংশীদারীতে** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রসার ঘটাতে হবে। এজন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দ্বারা একটি নতুন ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে।

(৬) **সমবায়ের সাফল্যের জন্য বিস্তর কর্মীকে শিক্ষাদান** করতে হবে। এজন্য সমবায় শিক্ষাদান পরিচালনার কেন্দ্রীয় কমিটিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সরকার কর্তৃক নানাবিধ সাহায্য দিতে হবে।

৫. **সুপারিশগুলির রূপায়ণ :** গ্রামীণ ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির সব ক'টি প্রধান সুপারিশই সরকার গ্রহণ করে ও অবিলম্বে কাজে পরিণত করে। তার ফলে—(১) বৃহদাকারে কৃষি ও অ-কৃষি ঋণদান সমিতি গঠন ও তাতে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নীতি কার্যকর হয়েছে। (২) কৃষির যাবতীয় কাজ সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণে সমবায় ভিত্তিতে সংগঠিত হচ্ছে। (৩) ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্ক এখন গ্রামাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে নতুন শাখা খুলে দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং কৃষক ও গ্রামবাসীদের ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা দিচ্ছে। (৪) সমবায় সমিতিগুলির কাজে সরকার যাতে বেশি করে অংশগ্রহণ

করতে পারে, সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে দু'টি তহবিল খোলা হয়েছে। প্রথমটির নাম জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী) তহবিল। রাজ্যসরকারগুলি কর্তৃক সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়, কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এই তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় তহবিলটির নাম জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল। মাঝারিমেয়াদের ঋণদানের জন্য ও স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মাঝারিমেয়াদী ঋণে পরিণত করার জন্য এই তহবিল থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়া হয়। (৫) ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পর্ষদ এবং ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় গুদামনির্মাণ করপোরেশন স্থাপিত হয়। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল ও জাতীয় গুদাম উন্নয়ন তহবিলও পরবর্তীকালে স্থাপন করা হয়। (৬) ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যুক্তভাবে সমবায় শিক্ষাদান পরিচালনার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে। পুণাতে সমবায়ের পদস্থ কর্মচারীদের জন্য একটি সমবায় কলেজ ও পুণা, রাঁচী, মীরাট, মাদ্রাজ ও ইন্দোরে সমবায়ের নিম্নপদস্থ কর্মীদের শিক্ষার জন্য পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। (৭) জম্মু এবং কাশ্মীর ও কেরল ছাড়া আর সব রাজ্যেই রাজ্য গুদাম করপোরেশন স্থাপিত হয়েছে।

৬. **মন্তব্য:** এই সকল ব্যবস্থা নিয়ে সরকার গ্রামীণ ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের বিশেষ চেষ্টা করেছে। অবশ্য অনেকের মতে, সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার সুপারিশে দু'টি ত্রুটি আছে। (১) সমবায় সমিতিগুলি খুব বড় আকারে গঠন করা উচিত নয়। (২) সমিতির কাজে সক্রিয় সরকারী অংশগ্রহণ খুব বেশি পরিমাণে হলে সমবায় আন্দোলনে সরকারের আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বাড়বে। তা সমবায় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। যাই হোক, এই দু'টি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করলে গ্রামীণ ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের চেষ্টা যে অনেকখানি সফল হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

২১.৭. সমবায় আন্দোলনে কৃষিঋণ ও বিপণনের সহাবস্থান Place of Agricultural Credit & Marketing in the Co-operative Movement

১. ভারতে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯০৪ সালে। সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর ধরে এ আন্দোলন কৃষিক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। ফলাফল বিচারে দেখা যায়, এ আন্দোলন কিছু কিছু সাফল্য লাভ করলেও তা মোটেই যথেষ্ট নয়। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, এ আন্দোলন কৃষিঋণদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কৃষি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রসার ঘটেনি।

২. ভারতের কৃষির সমস্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কৃষকের ঋণের সমস্যাটাই সবচেয়ে বড়। কৃষিকাজে অর্থের প্রয়োজন হয়। কৃষক গরিব। তার নিজের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। অন্য কোথাও থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে সে বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছে হাত পাতে। মহাজন ঋণ দেয় কিন্তু সুদের হার অত্যধিক। একবার মহাজনের কবলে পড়লে কৃষকের আর রক্ষে নেই। চিরকালের জন্যে সে ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ে যায়, সে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

৩ কৃষিঋণের সমস্যার কিছুটা সমাধানের জন্যই এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমবায় আন্দোলনের পত্তন করা হয়। তখন মনে করা হয়েছিল কৃষিঋণের সমস্যাটাই যেহেতু প্রধান সমস্যা সেজন্য এই সমস্যার সুরাহা করতে পারলেই ভারতের কৃষক বাঁচবে এবং কৃষিও বাঁচবে। আসলে এ সমস্যাটাকে কৃষকের অন্যান্য সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করেই সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। সেজন্যই এ দেশে সমবায় আন্দোলন প্রধানত কৃষিঋণদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষকের অন্যান্য সমস্যার দিকে এ আন্দোলন নজরই দেয়নি।

৪. এভাবেই প্রায় ৫০ বছর ধরে আন্দোলন চলার পরেও দেখা গেল এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি। কেন হয়নি তার কারণ খুঁজে বের করতে গিয়ে গোরওয়ালা কমিটি ১৯৫৪ সালে এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমিটি স্পষ্টভাবেই এ মত প্রকাশ করে যে, কৃষিঋণের সমস্যাটাকে কৃষকের অন্যান্য সমস্যা থেকে আলাদা করে দেখাটা একেবারেই অবাস্তব ও ভুল। গোরওয়ালা কমিটি আসলে সমবায় আন্দোলনের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গীটাকেই অবাস্তব বলে তাকে বদলাবার কথা বলে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে সে সম্পর্কে কমিটি সঠিকভাবেই বলে যে, কৃষিঋণের সমস্যাকে আলাদা করে না দেখে **সামগ্রিকভাবে** দেখতে হবে। কারণ, শুধু ঋণ দিলেই কৃষকের সমস্যার সমাধান হবে না। ঋণ নিয়ে কৃষক যে ফসল উৎপাদন করল, লাভজনক দামে সে ফসলের বিক্রয়ের কি ব্যবস্থা হবে? লাভজনক দামে তার ফসল বিক্রয় করতে না পেরে গরিব কৃষক যে বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা তো একটা বাস্তব ঘটনা।

৫. তাই, ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ঋণের সমস্যার সাথে সাথে আরো যে একটা বিরাট সমস্যা রয়েছে সেটা হল কৃষিপণ্যের বিপণন-সমস্যা। কৃষকের পণ্য বিপণনের সমস্যাটা কি? ফসল উৎপাদন হল, ন্যায্য দামের আশায় ফসল নিয়ে কৃষক বাজারে গেল। কিন্তু এ দেশের বিক্রয়ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে যে অব্যবস্থা চলছে তাতে কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায়

না, বঞ্চিত হয়, প্রতি বছরই ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর ফলে কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ পেয়েও লাভজনক দামে উৎপন্ন ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারছে না। উৎপাদন খরচও উসুল হচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আবার নতুন ঋণের জন্য সমবায় সমিতির দ্বারস্থ হচ্ছে। পূর্ব-ঋণ পরিশোধ করার কোনো উপায়ই থাকছে না। এ রকমের একটা বিষচক্র কৃষককে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৬. তাই গোরওয়ালা কমিটি সঠিকভাবে সমস্যাটার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কমিটি বলল, সমবায় আন্দোলনকে একটা পূর্ণাঙ্গ কৃষিঋণের কাঠামোর (Integrated Scheme of Rural Credit) কথা মনে রেখে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। সমবায় আন্দোলন একদিকে যেমন কৃষিঋণের ব্যবস্থা করবে তেমন পাশাপাশি কৃষকের উৎপন্ন ফসলের বিপণনের জন্যও সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা করবে। কৃষক যাতে তার ফসলের ন্যায্য দাম পায়, সে যাতে ফরিয়া, চোরাকারবারী, ব্যবসায়ীদের দালালের হাতে প্রবঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থাও সমবায় বিপণন সমিতিই করবে। সুতরাং এ দুটি কাজই একসঙ্গে করতে না পারলে সমবায় আন্দোলন কিছুতেই কৃষকের সাহায্যে আসবে না। এ দুটির সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটির সমাধান করতে হলে আরেকটিরও সঙ্গে সঙ্গে সমাধান দরকার।

২১.৮. সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ ও বিনিয়োগ সমীক্ষা, ১৯৬১-৬২
All India Rural Credit and Investment Survey, 1961-62

গোরওয়ালা কমিটির সুপারিশগুলি কাজে পরিণত করার পর গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬১-৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ ও বিনিয়োগ সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষা থেকে গ্রামীণ ঋণ সম্পর্কে যে চিত্রটি পাওয়া গিয়েছিল তা এই :

১. দেশের গ্রামীণ পরিবারগুলির ৬৩% ঋণগ্রস্ত এবং তাদের মোট নগদ দেনার পরিমাণ ২,৭৮৯ কোটি টাকা। এর ৮৫% বা ২,৩৮০ কোটি টাকা হল কৃষক পরিবারগুলির মোট ঋণ। এই কৃষক পরিবারগুলি হল আবার মোট গ্রামীণ পরিবারগুলির ৭৫%।

২. প্রতি গ্রামীণ পরিবার পিছু গড়পড়তা দেনার পরিমাণ ৪০৬ টাকা এবং প্রতি কৃষক পরিবার পিছু গড়পড়তা দেনা ৪৭৩ টাকা। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও মহীশূরে কৃষক পরিবারগুলির দেনার পরিমাণ সর্বাধিক।

৩. প্রতি গ্রামীণ পরিবার পিছু গড়পড়তা ৪০৬ টাকা দেনার মধ্যে ৩৬৩ টাকা আসল বাবদ এবং ৪৩ টাকা সুদ বাবদ দেনা। অতএব মোট দেনা ২,৭৮৯ কোটি টাকার মধ্যে ৮৯% হল আসল বাবদ ও ১১% হল সুদ বাবদ দেনা।

৪. এই মোট দেনার ৪৬% কৃষি মহাজন, ১% অন্যান্য, ১৫% পেশাদারী মহাজন, ৯% সমবায় সমিতি, ৭% আত্মীয় স্বজন, ৮% ব্যবসায়ী ও কমিশন এজেন্ট, ৫% সরকার, ০.৯% জমিদার, ০.৪% বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট ঋণ। মোট গড়পড়তা পারিবারিক ঋণ ৪০৬ টাকার মধ্যে প্রতি পরিবার পিছু কৃষি-মহাজনদের নিকট ঋণ হল ১৮৭ টাকা।

৫. সমবায় সমিতিগুলির নিকট গ্রামীণ পরিবারগুলির মোট দেনা ২৫৫ কোটি টাকার মধ্যে ২৩৭ কোটি টাকা হল কৃষক পরিবারগুলির ঋণ। গরিব পরিবার অপেক্ষা ধনী পরিবারগুলিই সমবায় সমিতি থেকে বেশি ঋণ পেয়েছে। ৫০০ টাকার অনধিক সম্পত্তিবিশিষ্ট গ্রামীণ পরিবারগুলি পেয়েছে সমবায় ঋণের মাত্র ১১% আর সর্বাপেক্ষা ধনী গ্রামীণ পরিবারগুলি পেয়েছে ৩৪.৪।

৬. ঋণের অধিকাংশই, যেমন, ৫১.৩% সংসার খরচের জন্য এবং মাত্র ৩২.৫% কৃষিকার্যে মূলধনী ও অন্যান্য খাতে খরচের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. গ্রামীণ ঋণের ৭১.২% ব্যক্তিগত জামিনে, ২২.৭% স্থাবর সম্পত্তির জামিনে এবং ১.৪% গহনাদির জামিনে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২১.৯. সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ পর্যালোচনা (ভেঙ্কটাপ্পিয়া) কমিটি
All India Rural Credit Review (Venkatappia) Committee

১. ১৯৬৫ সাল থেকে (পুরোপুরিভাবে ১৯৬৬-৬৭ সালে) নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজীর প্রবর্তনের দরুন, তার অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিঋণ সরবরাহের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া, আগেকার সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির (গোরওয়ালা কমিটি) সুপারিশগুলি কাজে পরিণত করার পর গ্রামীণ ঋণের যোগান কতটা বেড়েছে তা অনুসন্ধান এবং নতুন অবস্থার উপযুক্ত নতুন ব্যবস্থার সুপারিশ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬৬ সালে শ্রীভেঙ্কটাপ্পিয়ার সভাপতিত্বে একটি সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ পর্যালোচনা কমিটি নিয়োগ করে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলির ও চতুর্থ পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রেখে এই কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশ করে। ১৯৬৯ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

২. সুপারিশ : কমিটি বলে,—(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের পুনর্গঠন করে একটি কৃষিঋণ পর্ষৎ স্থাপন করা উচিত। (২) সমগ্র দেশে বাছাই করা জেলাগুলিতে একটি করে ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন

করা উচিত। (৩) উন্নয়নের সম্ভাবনাবিশিষ্ট অনুন্নত অঞ্চলগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে একটি গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন করপোরেশন স্থাপন করা উচিত। (৪) কৃষিঋণ পুনঃসংস্থান করপোরেশনকে আরও সক্রিয় এবং বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং (৫) সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মারফত সময়মত যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ সরবরাহের জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার এই সুপারিশগুলি কিছু কিছু কাজে পরিণত করেছে।

২১.১০. কৃষিঋণ ব্যবস্থায় উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা Role of the Reserve Bank in the Improvement of the System of Agricultural Credit

১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নয়, ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কৃষিঋণের ব্যবস্থা করার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষিঋণ দেবার ব্যবস্থাটা ছিল এই: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথমে ঋণ দিত রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক তা থেকে ঋণ দিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক তা থেকে ঋণ দিত প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি তা থেকে ঋণ দিত সমিতির সদস্য কৃষকদের। এইভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় সমিতিগুলির মারফত দেশের কৃষকদের কৃষিকার্যের জন্য ঋণ দেয়।

২. স্বাধীনতার পর এবং বিশেষত, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে কৃষিঋণ দানের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা উত্তরোত্তর বেড়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে ৩১ বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। সারা দেশে প্রয়োজনীয় স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণের পরিমাণ যদি ৪,০০০ কোটি টাকা হয় তাহলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একাই তার ২৫ শতাংশ বা তার বেশি যুগিয়েছে। তাছাড়া, গোরওয়ালা কমিটির সুপারিশগুলি রূপায়িত করতে গিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশে সমবায় ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের প্রধান হাতিয়ার রূপে কাজ করেছে।

৩. ১৯৮২ সালে ন্যাবার্ড স্থাপিত হবার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ও দায়িত্ব ন্যাবার্ডের উপর ন্যস্ত হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ন্যাবার্ড রাজ্য সমবায় সমিতিগুলিকে মোট ১,২৪৫ কোটি টাকার কৃষিঋণ মঞ্জুর করেছে।

২১.১১. কৃষিঋণের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা Role of the State Bank in Agricultural Credit

১. ১৯৫৫ সালে ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করে বর্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে, স্টেট ব্যাঙ্ক কেবল দেশের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রূপেই নয়, কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রেও, বিশেষত সমবায় ঋণদানের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় পরিণত হয়েছিল, ১৯৮২ সালে ন্যাবার্ড প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত। গ্রামীণ ও কৃষিঋণের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্কের কাজগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) গ্রামীণ ঋণদানকারী সংস্থাগুলির বিকাশে সহায়তা; (খ) সমবায় বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতিগুলির ঋণ বা অর্থসংস্থান; এবং (গ) গুদামজাতকরণ ব্যবস্থায় সাহায্য দান।

২. **গ্রামীণ ঋণদানকারী সংস্থাগুলির বিকাশে সহায়তা** (General assistance for the development of rural credit institutions): এই উদ্দেশ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের কাজগুলির মধ্যে পড়ে—(ক) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সপ্তাহে তিনবার বিনা খরচে অর্থ স্থানান্তরের সুবিধাদান। এ ছাড়া ১৯৮৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ও আধা শহর এলাকায় প্রায় ৯,৭৭০-টি শাখা ও উপশাখা খুলে স্টেট ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতিগুলিকে আরো বেশি করে সুলভে অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ করে দিয়েছে।

(খ) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাজারের চলতি হারের আধ শতাংশ কম হারে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান।

(গ) জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণদান। এটা স্টেট ব্যাঙ্ক নানাভাবে করে থাকে। যেমন, জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির ডিবেঞ্চার কিনে, ডিবেঞ্চারের জামিনে ঋণ দিয়ে, এবং সরকারের গ্যারাণ্টির জামিনে ঋণ দিয়ে।

(ঘ) নির্দিষ্ট গ্রামের সমস্ত কৃষক ও কারুশিল্পীদের ঋণ সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ (Village adoptive scheme)। স্টেট ব্যাঙ্ক কিছুদিন হল বেছে বেছে গ্রামবিশেষের সমস্ত কৃষক ও কারুশিল্পীদের ঋণ সংস্থানের দায়িত্ব নিচ্ছে। এ পর্যন্ত এভাবে স্টেট ব্যাঙ্ক মোট ৪৯,৫০০টি গ্রামের দায়িত্ব নিয়ে ২২ লক্ষ চাষীকে এই সুবিধার সুযোগ দিয়েছে। এজন্য দেওয়া ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৭৫৭ কোটি টাকা।

(ঙ) গ্রামোদয় পরিকল্পনা মারফত সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়নে সহায়তা। ১৯৭৭ সালে প্রবর্তিত এই পরিকল্পনা

মারফত স্টেট ব্যাঙ্ক কেবল গ্রামের অর্থনৈতিক প্রয়োজনই নয় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যও কাজ করছে। বাছাই করা গ্রামের জন্য প্রথমে অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার কর্মসূচি গ্রহণ ও কাজে পরিণত করা হয়। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রায়োজন মেটাবার কাজে হাত দেওয়া হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। এই দু'টি পর্যায় নিয়ে হল সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্প বা গ্রামোদয় পরিকল্প।

(চ) কৃষি বিকাশ শাখা স্থাপন। সারা দেশে স্টেট ব্যাঙ্ক কৃষির উন্নয়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্য বিশেষ কৃষি বিকাশ শাখা প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। এর বিশেষ উদ্দেশ্য হল এক একটি অঞ্চলে কৃষির সামগ্রিক বিকাশ, কেবল কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা মাত্র নয়। এজন্য এখন স্টেট ব্যাঙ্ক ন্যাবার্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছে। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে স্টেট ব্যাঙ্কের কৃষি বিকাশ শাখার (Agricultural Development Branch) সংখ্যা ছিল ৪৩১টি। এই ৪৩১টি কৃষি বিকাশ শাখা ১৬ লক্ষ চাষীকে মোট ৫৭৬ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল।

৩. **বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতিগুলিকে ঋণদান (Financial assistance to marketing and processing societies) :** যেখানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সমবায় বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতিগুলির ঋণের দ্রুত এবং যথোপযুক্ত সংস্থানে সক্ষম হচ্ছে না, যে সব স্থানে স্টেট ব্যাঙ্ক সরাসরিভাবে ওই সব সমিতিকে উৎপন্ন দ্রব্যের জামিনে ঋণ দেয়। এই ভাবে সমবায় চিনিকল, কটন জিনিং মিল, পাইট বাঁধাই মিল, প্রভৃতিরাও ঋণ পাচ্ছে।

৪. **গুদামের জমা-রসিদের জামিনে ঋণদান (Advancing against warehouse receipts) :** বৈজ্ঞানিক গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু গুদামে কৃষিপণ্য রাখার ব্যবস্থা জনপ্রিয় না হলে কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। তাই সেজন্য অনুমোদিত গুদামগুলিতে কৃষি-জাতপণ্য বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত) জমা রাখার পর জমা-রসিদের জামিনে স্টেট ব্যাঙ্ক ঋণ দিচ্ছে।

৫. **ঋণদানের অগ্রগতি :** স্টেট ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণদানের পরিমাণ ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ১৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৫-র জানুয়ারিতে ৩,৬০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কে চাষীদের সরাসরি আমানতি হিসাবের সংখ্যা ৪১০ থেকে বেড়ে ৫৭ লক্ষে উঠেছে। এদের তিন-চতুর্থাংশই হল ১ হেক্টেয়ারের কম জমির মালিক।

২১.১২. কৃষিঋণের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা Role of Government in Agricultural Credit

১. সরকারের প্রত্যক্ষভাবে কৃষিঋণদানের প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীতে ১৮৮৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। (১) ১৮৮৩ সালে জমি উন্নয়ন ঋণ আইন ও ১৮৮৪ সালে কৃষিঋণ আইন পাস হয়। এ দু'টি আইনে প্রদত্ত ঋণ তাকাভি ঋণ নামে পরিচিত। প্রথম আইনটির দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ও দ্বিতীয় আইনটির দ্বারা স্বল্পমেয়াদী ঋণ-দানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ এই দু'টি ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য ও ঋণের শর্তগুলি কঠোর থাকায় তাতে কৃষকের সামান্যই উপকার হয়েছে। তাছাড়া, এই সকল ঋণের অধিকাংশই ধনী কৃষকেরা পায়। দরিদ্র কৃষকের বিশেষ উপকার হয় না। সুদের চড়া হারও এদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছে। (২) ইদানীংকালে অনুদান ও অন্যান্য ঋণ হিসাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি কৃষকদের নানাপ্রকার আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রত্যক্ষ সরকারী ঋণের মোট পরিমাণ বেশি হয়নি। সেজন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকার সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশমত গ্রামীণ ঋণ পুনর্গঠন পরিকল্পনা কাজে পরিণত করেছে। (৩) ১৯৫৫ সালে সরকার গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার ও সমবায় ঋণদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছে। (৪) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে দু'টি কৃষিঋণ তহবিল, কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অধীনে একটি এবং সমবায় ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও দু'টি, মোট পাঁচটি তহবিল স্থাপন করেছে। (৫) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প ও তা কাজে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুদাম-নির্মাণ করপোরেশনসমূহ গঠিত হয়েছে। (৬) জমিবন্ধকী (বর্তমানে জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত) ব্যাঙ্কগুলিকে অধিক দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা হয়েছে। (৭) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাতে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় সেজন্যে তাদের ঋণের গ্যারান্টি দিচ্ছে। (৮) কৃষিঋণের সমবায় ভিত্তিতে দৃঢ়তর করার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষাদান সমিতির মাধ্যমে সমবায় শিক্ষাদান কার্যের সম্প্রসারণ করেছে। (৯) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সমিতিগুলির কার্যের সংযোগ সাধন করেছে। (১০ পরি-কল্পনা দ্বারা উপরোক্ত ঋণদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছে। (১১) ১৯৬৩ সনে কৃষির দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য ভারত সরকার কৃষিঋণ পুনঃসংস্থান করপোরেশন (এগ্রিকালচারাল রি-ফিন্যান্স করপোরেশন) স্থাপন করেছে।

২. বর্তমানে সরকার মোট গ্রামীণ ঋণের ৫৩% যোগাচ্ছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যক্ষ ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৯ কোটি টাকা।

২১.১৩. গ্রামীণ ঋণদানে সমবায় ঋণদান সমিতির ভূমিকা Role of Co-operative Credit Societies in Rural Credit

১. ১৯০৪ সালে প্রথম সমবায় আইন পাসের পর ভারতের সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তনকাল থেকে এদেশে সমবায় আন্দোলন প্রধানত ঋণই দিয়ে এসেছে। সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যাই ছিল প্রথমাবধি সর্বাধিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কৃষকদের দ্বারা গৃহীত ঋণের ৩ শতাংশ মাত্র ছিল। এজন্য সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিল। বর্তমানে সমবায় সমিতিগুলি কৃষিঋণের শতকরা ৩৫ ভাগ যোগাচ্ছে বলে সরকারী বিবরণে প্রকাশ।

২. **ঋণদানক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ :** সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির ব্যর্থতার কারণগুলি হল :

(১) সমিতিগুলি আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল নয়। পুঁজি খুব কম, আমানত জমার পরিমাণও নগণ্য। (২) সমিতিগুলি ব্যাঙ্ক পরিচালনার মূল নীতিগুলি অনুসরণ করে চলে না। ঋণের সাথে তাদের পুঁজি ও দেনার সামঞ্জস্য থাকে না। (৩) ঋণদানের ব্যাপারে তারা বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় না। অত্যধিক ঋণদান, অনুৎপাদনশীল ঋণদান প্রভৃতির দৃষ্টান্তও কম নয়। (৪) সমিতিগুলি নিজেরা অল্প মেয়াদে ঋণ ও আমানত জমা পায় কিন্তু অধিকাংশ সময়েই প্রদত্ত ঋণ ঠিকমত আদায় করতে পারে না, ফলে কার্যত প্রদত্ত ঋণের অধিকাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পরিণত হয়। তাতে সমিতির আর্থিক সামর্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। (৫) সমিতিগুলি চড়া হারে সুদ আদায় করে। সাধারণত সুদের হার শতকরা ১২ থেকে ২৪ টাকার মধ্যে। ফলে যারা ঋণ নেয় তাদের যেমন বিশেষ উপকার হয় না, তেমনি ঋণের পরিমাণও অল্প হয়। (৬) সমিতিগুলি গ্রামীণ সঞ্চয় আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়কারীদের আকৃষ্ট করতে পারলে আমানত জমার পরিমাণ বাড়ত। সমিতিগুলির শক্তি বাড়ত। (৭) অধিকাংশ সমিতিরই পাওনা টাকা অনাদায়ী থেকে যায়। ফলে এই ক্ষতির পরিমাণ বহন করতে না পেরে অল্পকালের মধ্যে সমিতিগুলির বিলোপ ঘটে। (৮) এতদিন যাবৎ সমবায় ঋণদানকার্য কৃষির অন্যান্য সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে সরকার মনে করত। ফলে সমবায় ঋণদানকার্যে যেটুকু চেষ্টা করা হয়েছে তা আংশিক ও বিচ্ছিন্নভাবেই করা হয়েছে। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমবায় ঋণের কাজ কখনই করা হয়নি। তাই এই ব্যাপারে এতদিন সাফল্য লাভ করা যায়নি।

৩. কিন্তু বর্তমানে সমবায় ঋণের ছবিটির পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন কৃষি স্ট্র্যাটেজীর দৌলতে সমবায় ঋণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সাহায্যের পরিমাণ বহু গুণ বেড়েছে। সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের পর থেকে সমবায় ঋণকাঠামোর যথেষ্ট পরিবর্তন ও উন্নতি এবং ১৯৬৫ সালের পর আরও সম্প্রসারণ ঘটেছে। ১৯৭৯-৮০ সালে কৃষিঋণের শতকরা ৩৫ ভাগ সমবায় সমিতি মারফত দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি নিঃসন্দেহে কৃষিঋণের ক্ষেত্রে সমবায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় দেয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি স্বল্প ও মাঝারি-মেয়াদে কৃষিঋণ দিচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি মোট ২,৯৫১ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে।

২১.১৪. কৃষিঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ভূমিকা Commercial Banks and Rural Credit

১. ১৯৬৯ সালে দেশের ১৪টি বেসরকারী বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অন্যতম যুক্তি বা প্রয়োজন হিসাবে বলা হয়েছিল, ওই ব্যাঙ্কগুলি কৃষিকার্যে কিংবা কৃষিজমির উন্নয়নের প্রয়োজনে ঋণদান সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর ওই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কৃষিঋণ দেবে এটাই ছিল আকাঙ্ক্ষিত। ঘটেছেও তাই। এর আগে, ১৯৬৭ সালে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির শাখা খোলা শুরু হয়েছিল। ওই সব নতুন শাখাগুলিকে স্বভাবতঃই গ্রামীণ নানা উৎপাদন ক্ষেত্রে ও কৃষিতে ঋণ দেওয়া আরম্ভ করতে হয়েছিল। ফলে দেখা গেল, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ১৪টি বৃহৎ বেসরকারী ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সময় সারা দেশের গ্রামীণ ও আধা-শহর অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫,২০০; কৃষিতে প্রত্যক্ষ ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০.২ কোটি টাকা (মোট ঋণদানের ১.৪ শতাংশ) ও পরোক্ষ কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ১২২.১ কোটি টাকা (মোট ঋণদানের ৪.১ শতাংশ)। ১৯৮৮-৮৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ ও আধা-গ্রামীণ শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,৮০০ এবং তাদের দেওয়া কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,৬৭০ কোটি টাকা।

২. **প্রত্যক্ষ ঋণ:** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি প্রতি বৎসর চাষের মরশুমে যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয় তার পরিমাণ হল তাদের মঞ্জুর-করা মোট ঋণের ৪৪ থেকে ৪৭ শতাংশ, বা প্রায় অর্ধেক। এছাড়া, নিম্নলিখিত বিবিধ উদ্দেশ্যেও ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের অধিক দিনের নানান মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে: পাম্প, ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা, কুয়ো খোঁড়া ও নলকূপ বসানো, ফল ও ফুলের বাগান তৈরি, জমি সমতল করা ও জমি উন্নয়ন, এবং হালের বলদ কেনা, ইত্যাদি। এই সব উদ্দেশ্যে নানান মেয়াদে ব্যাঙ্কগুলির মঞ্জুর করা ঋণের পরিমাণ হল বর্তমানে তাদের মোট ঋণের প্রায় ৩৫ শতাংশ। এইসব উদ্দেশ্য ছাড়াও ডেয়ারি, হাঁস-মুরগীর খামার, শুকর খামার, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ ও মৎস্য শিকার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দেয় তার পরিমাণটা এখন তাদের মোট মঞ্জুর করা ঋণের ১৫-১৬ শতাংশের কম নয়।

৩. **পরোক্ষ ঋণ:** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নিজেরা সরাসরি চাষীদের কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট নানা উৎপাদনমূলক কার্যে ঋণ দেওয়া ছাড়াও কৃষিপণ্য বিপণনে ও প্রক্রিয়া-জাতকরণে এবং সংশ্লিষ্ট উৎপাদন কর্মে, সার ও কৃষির উন্নত বীজ প্রভৃতি বিক্রয়ে পাম্পসেট ও কৃষির বিবিধ যন্ত্রপাতি বিক্রয়ে নিযুক্ত সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সংস্থাকে ঋণ দিয়ে, খাদ্যশস্য কেনা, মজুদ করা এবং বিক্রয়ে নিযুক্ত ভারতের খাদ্য করপোরেশনকে ও রাজ্য সরকারকে এজন্য ঋণ দিয়ে এবং কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়ে কৃষিতে যথেষ্ট পরিমাণে পরোক্ষ ঋণ সরবরাহ করছে।

৪. **ছোট চাষী:** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কৃষিঋণ দেয় তার প্রায় সবটাই পেত বড় জমির মালিক চাষীরা। ছোট চাষীরা ব্যাঙ্কঋণ থেকে এতদিন বঞ্চিতই ছিল বলা যায়। এখনও ২ হেকটেয়ারের কম জমির মালিক ছোট চাষীদের প্রায় ৭০ শতাংশই ব্যাঙ্কঋণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থা (SFDA) স্থাপন করে তার উপর দুটি কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে। SFDA ক্ষুদ্রচাষী কারা তা স্থির করবে এবং তাদের জন্য বাস্তব-সাধ্য (viable) কৃষি উন্নয়ন পরিকল্প তৈরি করে দেবে। ব্যাঙ্কগুলি গোষ্ঠিবদ্ধভাবে ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্রচাষীকে লাভজনক কৃষিকার্যরত চাষীতে পরিণত করতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে সারা ভারতে সমস্ত উন্নয়ন ব্লকে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP) বিস্তারের পর থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে IRDP কর্মসূচিগুলিতে ঋণ দিয়ে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে নানা কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি।

স্টেট ব্যাঙ্ক এবং ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এখন আরও নানাভাবে ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এলাকাগুলিতে (SFDA and MFAL areas) উপরোক্ত ব্যাঙ্কগুলি ১৬টি কৃষক সেবা সমিতি (Farmers' Service Societies) স্থাপন করে ওই সমিতিগুলির সদস্যদের স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ এবং কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ-গুলি সরবরাহ ও কৃষিপণ্য বিপণনে সাহায্য করে।

যে সব অঞ্চলে জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সাংগঠনিক বা আর্থিকভাবে দুর্বল সে সব অঞ্চলে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি পরিকল্প গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পটি হল, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে ঋণ দেবে এবং ওই ঋণ থেকে সমিতিগুলি তাদের সদস্য-চাষীদের ঋণ দেবে। ১৩টি রাজ্যের ১৪২টি জেলায় প্রায় ২,৭২৫টি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিকে এই ভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়ে সাহায্য করছে। ১৯৮০-৮১ সালে এরকম উপায়ে দেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি টাকা।

সম্প্রতি অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে একদিকে সম্বলের সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে ঋণের সদ্ব্যবহারের দিক থেকে অঞ্চলগতভাবে এক বা একাধিক ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে কাজ করলে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায়। তাই স্টেট ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এক একটি অঞ্চলে একটি বা কয়েকটি গ্রাম বেছে নিয়ে ওই সব গ্রামের কৃষকদের সমস্ত ঋণ সরবরাহের দায়িত্ব নিচ্ছে। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে এরকমভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ৮৯,০০০ গ্রামের দায়িত্ব নিয়েছিল ('গ্রাম গ্রহণ পরিকল্প' বা Village Adoption Scheme) এবং তাদের জন্য মোট ৬৪০ কোটি টাকার ঋণের সংস্থান করেছিল।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বর্তমানে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মারফত গ্রামীণ কৃষক, কারিগর ও বণিক এবং ছোট উদ্যোক্তাদের সস্তায় ঋণের যোগান দিচ্ছে। ১৯৮৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১৫৯টি আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। তাদের মোট শাখার সংখ্যা সে সময় ছিল ৮,২২০টি।

২১.১৫. স্বল্পমেয়াদী গ্রামীণ ও কৃষিঋণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি Progress in the sphere of short term Agricultural Credit

সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ পর্যালোচনা কমিটি হিসাব করেছিল কৃষকদের বৎসরে আনুমানিক মোট ২,০০০ কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ (চলতি উৎপাদনের জন্য) দরকার।

কার্যত দেখা যায় চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে সমবায় ও সরকারী কৃষিঋণের মোট পরিমাণ ৭০১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ এই দু'টি উৎস এখন স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণের মোট ৩৫ শতাংশ সরবরাহ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সরবরাহ করেছে (১৯৭৪-৭৫) মোট ২০১ কোটি টাকা। এই সরাসরি ঋণ ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি পরোক্ষভাবে ১৯৮১-এর শেষ নাগাদ ১,৫৭৩ কোটি টাকা কৃষিঋণ দিয়েছে।

২১.১৬ দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ
Long-term Agricultural Credit

১. **প্রয়োজনীয়তা :** কৃষিতে স্বল্প ও মাঝারিমেয়াদী ঋণের ন্যায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণও অপরিহার্য। তা ছাড়া কৃষিজমির স্থায়ী উন্নতিবিধান, বৃহৎ সেচকার্য পরিচালনা, পতিত জমি উদ্ধার, পুরাতন ঋণ পরিশোধ, জমি ক্রয় প্রভৃতি কাজে অনেক টাকার দরকার। ভারতে স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণের সমস্যাই অতি তীব্র। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের তো কথাই নেই। ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক প্রচেষ্টার দরুন এর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে।

২. পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য প্রধানত যে ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল, তা হল জমিবন্ধকী বা জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও জার্মানীতে এই ব্যাঙ্ক বিস্তার লাভ করে।

৩. **ভারতে জমি উন্নয়ন ব্যাংক :** ভারতের রাজকীয় কৃষি কমিশন (১৯২৬ সাল) ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি (১৯২৯ সাল) ভারতে সমবায় ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, যা বর্তমানে জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত (Land Development Banks) স্থাপন ও প্রসারের জন্য সুপারিশ করে।

৪. তারপর থেকে এই ব্যাঙ্কগুলির প্রসার ও উন্নতি ঘটেছে। ১৯৮৩ সালে জমি উন্নয়ন ব্যাংকগুলি মোট ৪৬০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। সামগ্রিক অবস্থা বিচারে এই অগ্রগতি সন্তোষজনক মনে হতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

৫. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাভাবে এদের সম্প্রসারণের ও পুঁজি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির পরামর্শ অনুসারে ১৯৫৭-৫৮ সালে গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক দ্বারা 'গ্রামীণ ঋণপত্র' বাজারে বিক্রয়ের পরিকল্পনা করে। এইগুলির মেয়াদ ছয় বা সাত বৎসর। ফসল বিক্রয়ের সময় এইগুলি গ্রামাঞ্চলে বিক্রয় করা হয়। জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী) তহবিল থেকে টাকা নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই জাতীয় ঋণপত্রের ⅓ অংশও কিনে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকার 'গ্রামীণ ঋণপত্র' কেন্দ্রীয় জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি সাফল্যের সাথে বিক্রয় করে অর্থসংগ্রহ করছে।

৬. **ত্রুটি :** সাম্প্রতিককালে জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কিছু উন্নতি হয়েছে বটে তবে এদের কয়েকটি ত্রুটি দেখা যায় :—(১) ভারতের সর্বত্র এরা সমানভাবে সম্প্রসারিত হতে ও উন্নতিলাভ করতে পারছে না। (২) পরিচালকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। (৩) এদের আয় কম, ব্যয় বেশি। (৪) ঋণ মঞ্জুর করতে বড় বেশি দেরী হয়। ঋণের শর্তগুলিও কঠোর। (৫) নতুন ঋণের অধিকাংশই পুরাতন ঋণ শোধে ব্যয় করা হয়। (৬) কৃষকের উপার্জন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ আদায়ের কিস্তি স্থির করা হয় না। তাতে ঋণ পরিশোধ করতে কৃষকের অসুবিধা হয়। (৭) কিস্তিগুলি নির্ধারিত সময়ে সকল ক্ষেত্রে আদায় করা হয় না। (৮) অন্যান্য কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সাথে এদের সংযোগ অতি অল্প। এই ত্রুটিগুলি দূর হলে ভারতে দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটবে।

২১.১৭. ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ন্যাবার্ড)
The National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)

১. **গঠন :** ১৯৮২ সালের ১২ জুলাই এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৬৩ সালে স্থাপিত কৃষিঋণের পুনঃসংস্থান ও উন্নয়ন কর্পোরেশনের (ARDC) কার্যাবলী এই ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এর পরিচালক পর্ষৎ ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে পরামর্শ করে পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের মনোনীত করবে। পরিচালক পর্ষৎ একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করতে পারবে। উপদেষ্টা পরিষদের কাজ হবে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কার্যসূচির রূপায়ণে পরামর্শ দেওয়া।

২. **সম্বল :** ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মোট পুঁজি ১০০ কোটি টাকা। এর অর্ধেক দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আর বাকী অর্ধেক দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। স্বল্পমেয়াদী কার্যসূচি রূপায়ণের জন্য ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারবে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও বহুজাতিক অর্থসাহায্যকারী সংস্থা থেকেও ঋণ নিতে পারবে। আবার, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনাধীন ন্যাশনাল রুরাল ক্রেডিট (লঙ্-টার্ম অপারেশনস্) ফান্ড থেকে অর্থ তুলতে পারবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনাধীন

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট (লঙ্-টার্ম অপারেশনস্) ফান্ড থেকে সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবে। উপরন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহ থেকে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে নিয়মিত অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়, সরাসরি ঋণ, আমানত ও দানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ভারতীয় অথবা বৈদেশিক কোনো ব্যাঙ্ক কিংবা অর্থসরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ হিসাবে নিতে পারে।

৪. **উদ্দেশ্য :** পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এই ব্যাঙ্ক। কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, কারিগরী শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঋণের ব্যবস্থা করাই এই ব্যাঙ্কের লক্ষ্য। এ ঋণ প্রয়োজন ও অবস্থা অনুসারে স্বল্প-মেয়াদী, মাঝারিমেয়াদী অথবা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

৫. **কাজ :** (১) এই সংস্থা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ঋণদাতা সংস্থাগুলিকে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়।

(২) রাজ্য সরকার যাতে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির শেয়ার কিনে তাদের অর্থের সংস্থান করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ন্যাবার্ড রাজ্যসরকারগুলিকে ২০ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়।

(৩) কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মে নিযুক্ত যে কোনো সংস্থার শেয়ার পুঁজিতে কিংবা তাদের অন্যান্য লগ্নিপত্রে (securities) বিনিয়োগ করার জন্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো সংস্থাকে ন্যাবার্ড দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে।

(৪) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি, ক্ষুদ্র-শিল্প, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, হস্তশিল্প, গ্রামীণ কারুশিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিক কর্মে উৎপাদন ও বিনিয়োগের জন্য ন্যাবার্ড পুনঃ অর্থসংস্থানকারী হিসাবে (refinancing) কাজ করে।

(৫) ন্যাবার্ড ক্ষুদ্র শিল্প, গ্রামীণ ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ কারুশিল্প, আতক্ষুদ্র (tiny) ও বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) ক্ষেত্র প্রভৃতি উন্নয়নে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার, পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য সর্ব-ভারতীয় এবং রাজ্যস্তরের সংস্থাগুলির কাজকর্মের সংযোজন করে।

(৬) ন্যাবার্ড প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের তদারক করে।

(৭) কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্য ন্যাবার্ডের একটি গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল রয়েছে।

সুতরাং ন্যাবার্ড হল একাধারে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, হস্তশিল্প, কারুশিল্প ও অন্যান্য গ্রামীণ কারুশিল্প এবং গ্রামীণ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিক কাজ-কর্মের উন্নয়নের জন্য পলিসি ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত এবং ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থায় নিযুক্ত সর্বোচ্চ সংস্থা। দেশে সমবায় কাঠামোর পুনর্গঠনের কাজেও ন্যাবার্ড গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছে।

বিবিধ খাতে ন্যাবার্ড কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত মোট ঋণদানের পরিমাণ (৩০শে জুন ১৯৮৭)

		(কোটি টাকা)
ক্ষুদ্র সেচ	.	৪,৬৩৩
জমি উন্নয়ন		৪১১
কৃষি যন্ত্রীকরণ	...	১,৫২০
বাগিচা ও ফুল বাগিচা	...	৭৭০
পশু ও পক্ষীপালন	...	২৩৯
মৎস্য চাষ	...	২১৪
ডেয়ারী উন্নয়ন	...	৩৩৩
গুদাম ও বাজার	...	২৬৭
অন্যান্য	.	২,৩৬২
মোট		১০,৭৪৯

সূত্র : RBI, Report on Trend & Progress of Banking in India, 1985-86

৬. **কাজের অগ্রগতি :** ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে যেদিন ন্যাবার্ড স্থাপিত হয় সেদিন রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট ঋণ ছিল ৭৬০ কোটি টাকা। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ন্যাবার্ডকে ঋণ দেবার জন্য আরও ১,২০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ১৯৮৩-১৯৮৭ এই চার বৎসরে ন্যাবার্ড ঋণদানের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ২,৯৭০ কোটি টাকার মত সম্বল সংগ্রহ করেছে।

স্থাপিত হবার তিন বৎসরের মধ্যে, ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বিবিধখাতে মোট ১০,৭৪৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে।

ন্যাবার্ড গ্রামীণ ঋণের সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করেছে। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত হয়েছে :

২১·১৮. আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক
Regional Rural Banks

১. প্রথমে ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর একটি অর্ডিন্যান্স দ্বারা ও পরে ১৯৭৬ সালে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বারা ভারত সরকার সারা দেশে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করে। ১৯৭৫ সালের ২রা অক্টোবর প্রথমে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ ও গোরক্ষপুরে, হরিয়ানার ভিওয়ানিতে, রাজস্থানের জয়পুরে এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহে, এই প্রথম পাঁচটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই পাঁচটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, এই পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রবর্তিত (sponsored) হয়। প্রতিটি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পুঁজি ১ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজি ২৫ লক্ষ টাকা। এর শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের, শতকরা ১৫ ভাগ রাজ্য-সরকারের এবং শতকরা ৩৫ ভাগ প্রবর্তনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের।

২. ১৯৭৭ সালের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির কাজের মূল্যায়ন ও সার্থকতা বিচারের জন্য অধ্যাপক এম. এল. দান্তোয়ালার সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে এবং সারা দেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিস্তারের সুপারিশ করে। কমিটির অভিমত ছিল, যে সব জেলায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল সে সব জেলাতেই আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ওই রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি স্টীয়ারিং কমিটি নিয়োগ করে। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থির করে শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে (apex cooperative banks) গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যুগ্ম প্রবর্তক বা ক্ষেত্র বিশেষে একক প্রবর্তক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তার ফলে রাজ্য শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হবে এবং গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে।

৩ **উদ্দেশ্য :** গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজকর্মের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ছোট ও প্রান্তিক চাষী, ক্ষেত মজুর, কারুশিল্পী ও ছোট উদ্যোক্তাদের ঋণ এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হল আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির উদ্দেশ্য।

৪. **অগ্রগতি :** ১৯৮৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সারা দেশে ২৩টি রাজ্যে মোট ১৯৩টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপিত ছিল। এদের মোট শাখা ছিল ১২,৬০০। ১৯৮৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি গ্রামীণ এলাকায় সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষকে মোট ১,২৭০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে, মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৩৮০ কোটি টাকা। রাজ্যগতভাবে উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

১৯৮২-৮৩ সালে ন্যাবার্ড স্থাপিত হবার ফলে, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি ন্যাবার্ডের তদারকী ও তত্ত্বাবধানে এসেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিবর্তে ন্যাবার্ড এখন এদের ঋণ সরবরাহ করছে।

২১·১৯. ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম (আই আর ডি পি)
Integrated Rural Development Programme (IRDP)

১. গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য বিগত কয়েক বৎসরে বেশ কয়েকটি কার্যসূচি রূপায়ণের ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ কার্যসূচি প্রবর্তনের ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers' Development Agency), খরা প্রবণ অঞ্চল কার্যসূচি (Drought Prone Areas Programme) এবং কর্তৃত্বমূলক অঞ্চল উন্নয়ন সংস্থা (Command Area Development Authority), এ সব সংস্থার বা কার্যসূচির কোনোটিই সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়নি বা হতে পারেনি। যে সব দরিদ্র মানুষের সুবিধা বিধানের জন্য কার্যসূচিগুলি রূপায়ণ করা হয়েছে সেই সব মানুষের কিছু উপকার যে হয়নি তা নয়। তবে তার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ এবং কার্যসূচিগুলি দেশের বিরাট জনসমষ্টির এক অতি ক্ষুদ্র অংশকেই স্পর্শ করতে পেরেছে। তাই যে সত্যটি উপলব্ধি করা গেছে তা হল গ্রামীণ মানুষের সীমাহীন ও শোচনীয় দারিদ্র্যের কিছুটা অপনোদন করতে হলেও চাই এক বিরাট ও ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যসূচি।

২. তাই গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম পরিবারগুলিকে দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠিয়ে আনতে, তাদের হাতে আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ পৌঁছে দিতে এবং তারা যাতে ঋণ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যসূচি নামে একটি প্রকল্প ১৯৭৮-৭৯ সালে চালু করা হয়।

৩. এই কার্যসূচির অন্যতম লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনতার পরিমাণ হ্রাস করা ও গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সম্পদ ও উপকরণ সরবরাহ করা। যাতে এগুলি ব্যবহার করে তারা দারিদ্র্য

সীমার উপরে উঠে আসতে পারে এবং সেখানে মোটামুটি স্থায়িভাবে অবস্থান করতে পারে।

৪ এই কার্যসূচির সার্থক প্রয়োগের জন্য জনসমষ্টির এমন অংশকেই বেছে নেওয়া হয়েছে যে অংশ সীমাহীন দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে পড়ে আছে। জনসমষ্টির এ অংশের মধ্যে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারা হল—ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, কৃষি শ্রমিক ও কৃষিক্ষেত্রের বাইরে কাজ করে এমন শ্রমিক, গ্রামীণ কারিগরী শিল্পী, তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিসমূহ—বস্তুতপক্ষে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত প্রতিটি লোককেই এ কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. প্রসঙ্গত বলা যায়, পাঁচ-সদস্য বিশিষ্ট কোনো পরিবারের বার্ষিক আয় ৩৫০০ টাকার কম হলে সে পরিবারটিকে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত বলে গণ্য করা হয়। ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত ৩২ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটি মানুষ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। এই ২৬ কোটি মানুষই হল পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যসূচির লক্ষ্যস্থল।

৬. এই কার্যসূচির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা। এর জন্য গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং এ সব মানুষকে উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ দিতে হবে। আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি—এ দু'টি লক্ষ্যে পৌঁছুতে কৃষিতে ও আনুষঙ্গিক শিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে এবং এমন সব অর্থনীতিক কাজে বিনিয়োগ করতে হবে যে সব কাজ দরিদ্র পরিবারগুলি তাদের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করবে। এ কার্যসূচি পূর্বনির্ধারিত কোনো হিসাব অনুসারে অর্থের ক্ষেত্রগত বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাখেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হবে দু'টি বিষয়ের দ্বারা: (ক) যাদের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা হবে তারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের কাজে কতটা আগ্রহী; (খ) ব্যাঙ্কসমূহ কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগের কাজকে কতটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। তবুও সাধারণভাবে বলা যায়, কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, বনসৃজন, গ্রামীণ ও কুটির শিল্প এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্য ও সেবামূলক কাজ—প্রভৃতি এই কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

৭. ব্যাপ্তি: প্রথমে ২,৩০০টি ব্লকে কার্যসূচির প্রয়োগ হয়েছে। ১৯৮০ সালের ২রা অক্টোবর থেকে দেশের ৫,০১১টি উন্নয়ন ব্লকের প্রত্যেকটিকেই কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮. ১৯৮০ সালের ২রা অক্টোবর ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থার (Small Farmer's Development Agency) কার্যসূচির সাথে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

২১.২০. কৃষিঋণের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা

Present Position in Agricultural Credit

১. নানা ধরনের কার্যসূচি গ্রহণের ফলে ভারতে কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক অবস্থা হল: মাঝারি ও স্বল্পমেয়াদী মোট ঋণ ৪,৭০০ কোটি টাকার ৮০ শতাংশ সমবায় সমিতিগুলি (১,৯২০ কোটি টাকা), ২১ শতাংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি (১,৩৩৫ কোটি টাকা) ও বাকিটা সরকার এবং আঞ্চলিক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি সরবরাহ করছে (১৯৮০-৮১)।

২. পঞ্চাশের দশকে গ্রামীণ অঞ্চলে যখন মহাজনদের একাধিপত্য ছিল, সে তুলনায় বর্তমান অবস্থা অনেক উন্নত। মহাজনদের সেই একাধিপত্য আর নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, ৭০ শতাংশ গ্রামীণ জনসাধারণ এর দ্বারা এখনও উপকৃত হচ্ছে না। গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে বিগত ৩০।৩৫ বৎসরে যে উন্নতি ঘটেছে তা সবচেয়ে গরিব গ্রামীণ জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে ও জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. এর কারণ হল: (ক) গ্রামীণ ঋণের অধিকাংশই গ্রামের ৩০ শতাংশ বড়, স্বচ্ছল ও মাঝারি চাষীরা আত্মসাৎ করছে।

(খ) এমনকি প্রান্তিক, ছোট চাষী এবং গরিব চাষীদের জন্য ঋণের যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে তাও সরকারী আমলা এবং রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশে স্বচ্ছল, বড় ও মাঝারি চাষীরা আত্মসাৎ করে।

(গ) গ্রামীণ জনসংখ্যার সবচেয়ে গরিব ৩০ শতাংশ ভূমিহীন খেতমজুর, দাস শ্রমিক, তফসিলী সম্প্রদায় ও উপজাতিদের জন্য অতি সামান্য ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত করা হয়েছে। এরা আজও উচ্চবর্ণের মহাজন ও ভূস্বামীদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে।

(ঘ) সমাজের গরিব মানুষদের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ, সমবায় ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচারের তুলনায় কাজ হচ্ছে খুবই কম।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের গ্রামীণ ঋণ সরবরাহের উৎসগুলি বর্ণনা কর। গ্রামীণ ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্গঠন কিভাবে সম্ভব?

[Describe the various sources of rural credit in India. Suggest how it would be

possible to reorganize the present system of supplying rural credit ?]

২. ভারতে বর্তমানে কৃষিঋণের প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য কর। এই প্রসঙ্গে, কৃষিঋণের উৎস হিসাবে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকাটি আলোচনা কর।

[C.U. B.Com. (Hons.) 1985]

[Comment on the adequacy of the present institutional arrangement for agricultural credit in India. Discuss, in this connection, the role of regional rural banks as sources of agricultural finances.]

৩. স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপনের ফলে এদেশে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অভাবজনিত সমস্যার কতটুকু সমাধান হয়েছে বলে তুমি মনে কর ?

[How far in your opinion, have the problems arising out of the non-existence of banking facilities in the rural areas of India been solved as a result of the setting up of the State Bank of India ?]

৪. কৃষিঋণ সরবরাহের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকার বিশ্লেষণ কর।

[Examine the role of the Reserve Bank of India in the matter of providing agricultural credit.]

৫. ভারতে সমবায় ঋণদান আন্দোলনের বিকাশ কেন যথেষ্ট হল না তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

[Explain why in India the co-operative credit movement could not grow to the desired extent.]

৬. ভারতে কৃষিঋণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কি ? এ সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

[What are the problems relating to agricultural credit in India ? What measures have been adopted to solve these problems ?]

৭. ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

[Write a note on the National Bank for Agricultural and Rural Development.]

৮. ইণ্টিগ্রেটেড্ রুরাল ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম-এর উদ্দেশ্য ও কার্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the objectives and functions of the Integrated Rural Development Programme.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. কৃষকেরা কি উদ্দেশ্যে (ক) স্বল্পমেয়াদী, (খ) মাঝারিমেয়াদী ও (গ) দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ নেয় ?

[What specific purposes do the farmers contract (a) short term, (b) medium term and (c) long-term agricultural loans for ?]

২. কোন্ সালে ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয় ?

[In which year was the co-operative movement in India launched ?]

৩. টীকা লেখ : গ্রামীণ ঋণের সুসংহত পরিকল্প।

[C.U. B.Com. (Hons.) 1984]

[Write short note on : Integrated Scheme of Rural Credit.]

কৃষিপণ্য বিপণন
Agricultural Marketing

কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা / অর্থনীতিক উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের গুরুত্ব / কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠনের ত্রুটি / প্রতিকার ও গৃহীত ব্যবস্থা / কৃষিপণ্য বিপণনে সমবায়ের ভূমিকা / ভারতে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা / আলোচ্য প্রশ্নাবলী /

২২.১. কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা
The Problem of Agricultural Marketing

১ ভারতের কৃষিপণ্য বিক্রয়ের প্রথম সমস্যা হল উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনের অভাব। দ্বিতীয় সমস্যা হল, কৃষকেরা প্রধানত নিজ ভোগের জন্য কৃষিকার্য করে বলে বাজারে বিক্রয়যোগ্য ফসল অল্প পরিমাণেই আসে। তৃতীয় সমস্যা হল কৃষিপণ্যের মূল্যের। ভারতে সব রকমের পণ্য-মূল্যের মধ্যে কৃষিপণ্যের মূল্যের ওঠানামা সর্বাপেক্ষা বেশি। ফলে কৃষকগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. কৃষিপণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনের অভাবে কৃষকের ফসল বিক্রয়লব্ধ আর্থিক আয়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এদেশের কৃষকেরা উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট, উপযুক্ত দরে ফসল বিক্রয়ে অসমর্থ। ফলে ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ন্যায্য আয় লাভে তারা বঞ্চিত। কৃষকের আয় কম হওয়ার এটা অন্যতম কারণ।

৩. **উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা:** কৃষির উন্নয়নের যে কোনো সুষ্ঠু ও সামগ্রিক পরিকল্পনায় শুধু কৃষিগত প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, কৃষিকার্যের সংগঠনের উন্নয়ন ও কৃষিঋণের সংস্থানই যথেষ্ট নয়। সে সবের সাথে কৃষি-পণ্য বিক্রয় সংগঠনের উন্নতি না হলে, ঐ সকল ব্যবস্থার দ্বারা বর্ধিত উৎপাদনের ফল লাভ থেকে কৃষক বঞ্চিত থাকবে। সুতরাং কৃষিপণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠন যে কোনো সুষ্ঠু কৃষির উন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠন স্থাপন করে কৃষকের উদ্যোগ যেমন বাড়ানো যায়, তেমনি তার আয় বাড়াতেও সাহায্য করা হয়। এতে বাজারে কৃষিপণ্যের যোগান আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

২২.২. অর্থনীতিক উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের গুরুত্ব
Importance of the Marketable Surplus in Economic Development

১. পৃথিবীর সব বিকাশমান দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য কৃষিজাত উদ্বৃত্তের (Marketable agricultural surplus) গুরুত্ব রয়েছে। কৃষিপ্রধান স্বল্পোন্নত দেশ-গুলির বিক্রয়যোগ্য কৃষিজাত উদ্বৃত্ত রপ্তানি করে তা দিয়ে বিদেশ থেকে পুঁজিদ্রব্য আমদানি করা যায়। এই পুঁজি-দ্রব্য যত বেশি আমদানি করা যাবে ততই স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজিগঠনের প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি যেহেতু কৃষিপ্রধান, অর্থাৎ যেহেতু এই দেশগুলির জাতীয়

আয়ের প্রধান অংশ কৃষি থেকেই আসে, সেজন্য এ দেশগুলির পক্ষে কৃষি-উদ্বৃত্ত রপ্তানি করে (বিনিময়ে পুঁজিদ্রব্য আমদানি করে) পুঁজিগঠন করা যতটা সম্ভব, অন্য কোনো উপায়ে তা করা সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য কৃষিজাত উদ্বৃত্ত চার ভাবে সহায়তা করে :

(১) উন্নয়নকালে দেশে দ্রুত লোকসংখ্যা যেমন বাড়ে তেমনি অর্থনীতির প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে অর্থনৈতিক দ্বিতীয় পর্যায়ের ও তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হয়। এক কথায় বলা যায়, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হতে থাকে। সুতরাং গ্রাম থেকে শহরে বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। স্বল্পোন্নত দেশের জনসমষ্টির অধিকাংশই স্বল্পাহারে থাকে বলে সকল ক্ষেত্রেই আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। সেজন্য বিক্রয়ের জন্য উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

(২) শিল্প প্রসারের ফলে কৃষিজাত কাঁচামালের চাহিদা বাড়ে, সেজন্য কাঁচামালের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়।

(৩) এসব দেশে গ্রামীণ বাজার সম্প্রসারণে সম্ভাবনা খুবই বেশি। বিক্রয়যোগ্য কৃষিজাত উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেলে তাতে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়বে। ফলে গ্রামীণ বাজারের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকবে। আর শিল্পগুলিও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য দেশের মধ্যে বিরাট বাজারে বিক্রয় করতে পেরে আরও উৎসাহিত হবে এবং এ কারণেই শিল্পগুলি আরও সম্প্রসারিত হবে।

(৪) বিক্রয়যোগ্য কৃষিজাত উদ্বৃত্ত রপ্তানি করে এ সকল দেশ বিদেশী পুঁজিদ্রব্য ও কারিগরী জ্ঞান আমদানির মূল্য শোধ করতে পারে। সুতরাং, ভারতের মত বিকাশমান দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে শক্তি সঞ্চার করার জন্য বিক্রয়যোগ্য কৃষিজাত উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে।

২২.৩. কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠনের ত্রুটি
Defects of the Marketing Organisation

১. কৃষকেরা পৃথকভাবে নিজ নিজ ফসল বিক্রয় করে। ফলে তারা শক্তিশালী ব্যবসায়ীদের সাথে দর কষাকষিতে সুবিধা করতে পারে না।

২. অভাবের তাড়নায়, মহাজনের চাপে, খাজনা ও কর প্রদানের তাগিদে তারা গ্রামের মধ্যেই, এমনকি ফসল কাটার আগেই অল্প দরে ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের অভাবে তারা দূরবর্তী বাজারে ফসল বিক্রয় করতে পারে না।

৩. ফসল উৎপাদনকারী কৃষক তার উৎপন্ন ফসল ভোগীদের কাছে সরাসরি বিক্রয় করে না। এ কাজটি করে এক বিরাট সংখ্যক মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী—যেমন পাইকার, দালাল, ফড়িয়া, আড়তদার ইত্যাদি। এরা কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকায় কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়ে। ভোগীরা হয়ত পণ্যের মূল্য বেশিই দেয়, কিন্তু কৃষকেরা এই বেশি মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা মোটেই পায় না—আসল সুবিধা ভোগ করে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা।

৪. কৃষিপণ্যের বিক্রয়ের সময় কৃষকের এমন সব ব্যয় বহন করতে হয় যা একদিকে যেমন অযৌক্তিক অন্যদিকে তেমন অত্যধিক। দালালের দালালী, ওজনকারীর পাওনা, ওজনের চলতা, পণ্যে বাজে জিনিস মিশাল থাকার মিথ্যা অজুহাতে গর্দা, আড়তদারের পাওনা, বাজারের বারোয়ারী পূজার চাঁদা, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ চাঁদা—এ রকম কারণে ও অকারণে অসংখ্য দেয় কেটে রেখে তবে কৃষককে তার প্রাপ্য দাম দেওয়া হয়। ফলে কৃষক প্রবঞ্চিত হয়।

৫. বাজারগুলিতে সঠিক ওজনের মাপ বা বাটখারার যেমন অভাব, তেমনি অভাব সর্বত্র একই রকমের ওজনের মানের। বাটখারার কারচুপিতে কৃষক যেমন প্রবঞ্চিত হয়, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে ও বাজারে ওজনের মানের বিভিন্নতা থাকায় ক্রয় বিক্রয়ের জটিলতা ও হিসাবের অসুবিধা বাড়ে।

৬. ভারতে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের নির্দিষ্ট মান বলে কিছু নেই। কিংবা উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকেও গুণানুযায়ী সযত্নে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় না। ফলে কৃষক ফসলের ভাল দরও পায় না।

৭. গ্রামাঞ্চলে কোথাও ফসল মজুদ ও সংরক্ষণের সন্তোষজনক ব্যবস্থা নেই। নিজেদের সামর্থ্যের অভাবে তারা ফসল মজুদের ব্যবস্থা করতে পারে না। বাজারে আনীত ফসল অবিক্রীত থাকলে তা সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থায় ফসল উঠলেই তা বাজারে এনে ফেলা এবং বাজারে যে দর পাওয়া যায় সেই দরেই বিক্রয় করে দেওয়া ছাড়া কৃষকদের অন্য উপায় থাকে না। এ কারণেই ফসল কাটার পরেই বাজারে প্রচুর ফসলের চালান আসে ও বাজার দর ভীষণভাবে পড়ে যায়।

৮. গ্রামাঞ্চলে পথঘাট ও পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নতির জন্য একস্থান থেকে অন্যত্র উদ্বৃত্ত ফসল সহজে চালান দেওয়া যায় না। ফলে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দর দেখা দেয়। একারণে কৃষক ও ক্রেতা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯. গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ও যাতায়াতের অসুবিধা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার ফলে কৃষক কোন্ বাজারে কিরূপ দরে ফসলের ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে না। মূল্য ও বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তারা ঠিক সময়ে, ঠিক দরে ফসল বেচতে পারে না।

১০. উপযুক্ত দরের অপেক্ষায় ফসল ধরে রাখা কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য ঋণের প্রয়োজন। সহজ শর্তে ঋণ পেলে কৃষকরা বেশি ফসল বিক্রি করে ঐ ঋণ শোধ করতে পারত।

১১. সবশেষে আর একটি বিষয় হল, ভেজাল। ভারতে বর্তমানে বোধ করি এমন কোনো কৃষিপণ্য নেই যাতে ভেজাল মেশানো হয় না। চালের সাথে কাঁকর, আটা-ময়দার সাথে ধূলোবালি, চীনাবাদামের সাথে মাটির ডেলা, সরিষার সাথে শেয়াল কাঁটার বীজ ইত্যাদি এমন বহুতর ভেজাল-মিশ্রিত দ্রব্যের দর স্বভাবতই অল্প হতে বাধ্য।

২২.৪. প্রতিকার ও গৃহীত ব্যবস্থা
Remedies and Measures Adopted

ভারতের কৃষিপণ্য বিক্রয়ের বর্তমান ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য নিম্নোক্ত তিন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১. **নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা :** কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দেয় নানাবিধ খরচ ও তাদের পরিমাণ নির্ধারণ, মাপ ও ওজন ইত্যাদি বিষয়ে সর্বত্র একই প্রকার নিয়মকানুন স্থির করা এবং সামগ্রিকভাবে বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য 'বাজার কমিটি' স্থাপন করে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের বর্তমান অনেক ত্রুটি দূর করা যায়। সব নিয়ন্ত্রিত বাজারে একই রকমের নিয়ম প্রচলিত থাকলে কৃষকের প্রতি বহু অন্যায়ের অবসান ঘটবে।

১৮৯৭ সালে বেরারে তুলার জন্য এ ধরনের বাজার ভারতে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। তার অনেক পরে ১৯২৭ সালে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে আইন পাস করে এরূপ বাজার স্থাপিত হয়। পরে মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহীশূর, বরোদা ও হায়দরাবাদে এরূপ নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ বাজারের সংখ্যা বেড়ে ১৯৮০-৮১ সালে ৪,৪৫০টি হয়েছে।

২ **আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাসমূহ :** পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশে ভারত সরকার সর্বত্র পুরোন ওজন ও মাপ তুলে দিয়ে ১৯৫৬ সালে আইন পাস করে মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে।

১৯৩৭ সালে কৃষিজাত দ্রব্যের শ্রেণীবিন্ধকরণ ও চিহ্নিতকরণের আইন পাস হয়। সমুদ্র শুল্ক আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী তামাক, পশম, চন্দন কাঠের তৈল প্রভৃতি কতকগুলি রপ্তানি পণ্যের বাধ্যতামূলক শ্রেণীবিন্ধকরণ ঘটে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রীত পণ্যগুলি যথা—ঘৃত, তৈল, ডিম, মাখন, গম, আটা, চাউল, আলু, ইক্ষু, গুড় ও ফল সম্পর্কে স্বেচ্ছামূলক শ্রেণীবিন্ধকরণের নীতি সরকার অনুসরণ করছে।

বর্তমানে বেতারে ও দূরদর্শনে নিয়মিতভাবে বাজার দর প্রচারিত হচ্ছে। সরকারের বিক্রয় বিভাগ বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করে থাকে। রাজ্য সরকারগুলিরও অনুরূপ কৃষিপণ্য বিক্রয় ও তদারকি দপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন সাময়িকীও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ভারতে বর্তমানে পণ্যসংরক্ষণের জন্য হিমঘর স্থাপিত হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা এখনও কম। ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষিপণ্য মজুদের ও সংরক্ষণের জন্য বহু গুদাম আছে। সমবায় ভিত্তিতেও এরূপ গুদাম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায়। উভয় প্রকার ব্যবস্থার সুযোগই ভারতে আছে।

সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ব্যাপকভাবে গুদাম নির্মাণের নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে ১৯৫৬ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক 'কৃষি উৎপন্ন উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ করপোরেশন আইন' পাস হয়েছে। এই আইনের দ্বারা কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, বিক্রয়, সংরক্ষণ, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ পর্ষদ স্থাপিত হয়েছে।

ভেজাল দূর করা এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী কৃষিজাত কাঁচামাল থেকে অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারে যাতে বেচাকেনা দ্রুত নিষ্পন্ন হয় এবং বিবাদ-বিসংবাদ যাতে হ্রাস পায় এবং ফাট্‌কা কারবার যাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য বেচাকেনার চুক্তির নিয়মাবলী নির্ধারণ ও আগাম বেচাকেনার চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগ কর্তৃক গম, চীনাবাদাম, বনস্পতি তৈল ও তিসি বীজ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে আগাম বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয়েছে। এই আইন কার্যকর করার জন্য আগাম বাজার কমিশন নিযুক্ত হয়েছে। এই সংস্থা খাদ্যশস্য সমেত ৩৯টি কৃষিপণ্যে আগাম চুক্তি নিষিদ্ধ করেছে ও তুলা, পাট, চীনাবাদাম প্রভৃতি ১৩টি পণ্যে আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

৩. **সমবায় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিক্রয় :** কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার দ্বারা কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে কৃষিপণ্যের চলাচল ও বিক্রয় সংক্রান্ত সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, কৃষিপণ্য বিক্রয়ের প্রায় সমগ্র ব্যবস্থাই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হচ্ছে। কৃষকদের তুলনায় এরা সংখ্যায় অল্প, আর্থিক সামর্থ্য এদের অনেক বেশি। এদের সামাজিক পদমর্যাদাও বেশি। সুতরাং কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সর্বনিম্ন স্তরে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকরা এদের সাথে দর কষাকষিতে কখনই সমকক্ষ হতে পারে না। অতএব কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, তাতে কৃষকের শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা গেলে, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরাই বেশি সুবিধা ভোগ করবে। কৃষকদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা বৃদ্ধির একমাত্র পথ হল তাদের মধ্যে সমবায় বিক্রয় সংগঠন স্থাপন করা। তার ফলে দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে সমবেত শক্তির দ্বারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতি গঠনের দ্বারা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে:

ক বিক্রেতা হিসাবে কৃষকের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়বে। খ. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের বিলোপ ঘটলে কৃষকের আয় বাড়বে। গ. ভোগী ক্রেতার নিকট সরাসরি দ্রব্য বিক্রয়ে সাধারণ খরিদ্দাররা অপেক্ষাকৃত অল্প দরে কৃষিপণ্য কিনতে পারবে। ঘ. সমবায় বিক্রয় সমিতি কৃষকদের ঋণ দিয়ে গ্রামাঞ্চলে মহাজনদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

ভারতে প্রাথমিক, কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জাতীয়—চার রকমের বিক্রয় সমিতিই আছে এবং এদের সংখ্যা বাড়ছে ও কাজকর্ম প্রসারিত হচ্ছে।

২২.৫. কৃষিপণ্য বিপণনে সমবায়ের ভূমিকা
Role of Co-operatives in Agricultural Marketing

১. ভারতে কৃষিপণ্যের বিপণনে কৃষকেরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা সংঘবদ্ধভাবে না করে বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ পণ্য বিক্রয় করে। তাদের বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ অল্প, বিক্রয় খরচ বেশি। ব্যবসায়ীদের সাথে দরকষাকষি করে কৃষকেরা সুবিধা করতে পারে না। মাপের ব্যাপারে অসাধুতা তো আছেই, তার উপর অনেক মহাজন নিজেরাই ব্যবসায়ী বলে কৃষকদের নিকট প্রাপ্য ঋণের আসল ও সুদ বাবদ কৃষকদের অত্যন্ত অল্প দরে ফসল বেচতে বাধ্য করে। বাজারের দরদাম সম্বন্ধে নিরক্ষর ও অজ্ঞ কৃষকরা কোনো সংবাদই রাখে না। বাজারগুলিতে গুদামের অভাব, ঋণের অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষকগণ উপযুক্ত দর পায় না।

২. **সমবায় বিক্রয়-পদ্ধতির সুবিধা:** সমবায় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিপণন সংগঠিত করা হলে এই সব অসুবিধা অনেকাংশে দূর হতে পারে। ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে:

(১) সংঘবদ্ধতার দ্বারা কৃষকদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা বাড়বে। (২) একত্রে পণ্য বিক্রয় করলে একসঙ্গে বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের জন্য গাড়িভাড়া প্রভৃতির জন্য বিক্রয়-ব্যয়সংকোচ ঘটবে। (৩) ব্যবসায়িগণের মাপ এবং ওজনের কারচুপি, বাজে আদায় প্রভৃতি অসাধুতা বন্ধ হবে। (৪) সমবায় বিক্রয় সমিতি সরাসরি ভোগীদের কাছে পণ্য বিক্রয় করে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের দূর করতে পারবে। ফলে কৃষকরা ফসলের দাম পাবে। আর ক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা অল্প দরে পণ্য কিনতে পারবে। (৫) বিক্রয় সমবায় সমিতি কৃষকদের ঋণ দিয়ে ফসল ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে। (৬) বিক্রয় সমিতিগুলি নিজেরাই গুদাম নির্মাণ করে ফসলের মজুতকরণের অসুবিধা দূর করতে পারে। (৭) বিক্রয় সমিতিগুলি কৃষক ও উৎপাদন সমিতিগুলিকে পরামর্শ দিয়ে ও সাহায্য করে ফসলের মানোন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে পারে। (৮) কৃষকদের বাজারের অবস্থা ও দর সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। (৯) সমবায় সমিতিগুলির মারফত দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হলে ক্রেতারা ন্যায্য দরে জিনিস পাবে এবং ব্যবসায়ীদের দাম বাড়াবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এভাবে সমবায় সমিতিগুলি দেশে মূল্যস্তরের স্থিরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এভাবে সমবায় নীতির প্রয়োগে কৃষকের আর্থিক অবস্থার ও কৃষিপণ্য বিক্রয় কার্যের উন্নয়ন ঘটতে পারে।

৩. **সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতির অগ্রগতি:** ভারতে তিন পর্যায়ের বিক্রয় সমিতি দেখা যায়। সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে প্রাথমিক বিক্রয় সমিতিগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় বিক্রয় ইউনিয়ন বা ফেডারেশন। এরা হল মধ্যবর্তী পর্যায়ের সমিতি। প্রাথমিক সমিতিগুলির কার্যক্ষেত্র মহকুমা বা তালুক এলাকায় সীমাবদ্ধ। মধ্যবর্তী সমিতিগুলির কার্য জেলাভিত্তিতে। প্রাথমিক সমিতিগুলি এদের সভ্য। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে রাজ্য বা প্রাদেশিক বিক্রয় সমিতি। এরা প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিগুলিকে ঋণ দেয় ও তাদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে বাজারে বিক্রয় করে।

৪. **ত্রুটি:** ভারতে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির দরুন সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। যথা, (১) ঋণের স্বল্পতা। (২) সমবায় সমিতির কাজে উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাব। (৩ সমিতির কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব। (৪) গ্রামাঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নতি। (৫) সভ্যদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আনুগত্যের ও নিষ্ঠার অভাব। (৬) গুদামের অভাব। (৭) সমবায় বিক্রয় সমিতিতে ধনী কৃষকের প্রাধান্য ও প্রভাব ইত্যাদি। সারা ভারতে সাধারণভাবে সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতিগুলি প্রসারলাভ করতে না

পারলেও বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশে এরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

৫. সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা : গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়া হলে, পরিচালনার ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা-বৃদ্ধির দিকে যত্ন নিলে, কৃষিপণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও শ্রেণীবদ্ধকরণে আরও দৃষ্টি দিলে, সমবায় বিক্রয় সমিতির সাথে সমবায় কৃষি সমিতির ও সমবায় ঋণ সমিতিগুলির অধিকতর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হলে, সমিতিগুলিকে বিশেষজ্ঞ কর্মী দিয়ে শক্তিশালী করা হলে, উদারভাবে সমিতিগুলিকে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে পারলে, ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্যের বাজারগুলিতে গুদাম তৈরির কাজে সরকারী উদ্যোগ প্রবর্তিত হলে, গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা বৃদ্ধি করে সমবায় বিক্রয় সমিতি ও গুদাম পরিচালনার কাজের সাথে ব্যাঙ্কের কাজের সমন্বয় করতে পারলে, এবং সর্বোপরি গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ও পরিবহণের উন্নতিসাধন করতে পারলে, তবেই সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতিগুলি সার্থকভাবে কৃষকদের সেবা করতে পারবে এবং বাজারে কৃষিপণ্যের যোগান বাড়াতে পারবে।

সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী ভারত সরকার উপরে বর্ণিত অনেকগুলি ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে। সে সব ব্যবস্থার মধ্যে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে ভারতের সর্বত্র সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতিগুলির কাজ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে দেশের খাদ্যসংকট ও খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের নানারূপ দোষত্রুটির ফলে খাদ্য-বণ্টনের ভার ক্রমেই বেশি পরিমাণে সমিতিগুলির উপর আরোপ করবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিক্রয় সমিতিগুলি যাতে সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে খাদ্য করপোরেশন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের সাথে লেনদেন করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২২.৬. ভারতে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা Warehousing in India

১. গুদাম হল উৎপাদনের স্থান থেকে ব্যবহারকারী বা ভোগীর কার্যস্থল বা বাসস্থান পর্যন্ত স্থানান্তরের পথে পণ্যটি নিরাপদ রাখার স্থান। বাজার, কৃষক এবং সাধারণ ভোগকারী বা ক্রেতা, সকলের সুবিধা এবং স্বার্থের দিক থেকেই পণ্যের উন্নত গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. গুদাম মোটামুটি চার রকমের : (ক) কারবারীদের ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক সংস্থাগত কিংবা লিমিটেড কোম্পানি-গুলির মালিকানা ও পরিচালনাধীন **বেসরকারী গুদাম**। (খ) ডক বা বন্দর কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত শুল্কাধীন **সরকারী গুদাম**। (গ) ডক কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত গুদাম (bonded warehouse)। (ঘ) সমবায় সমিতি বা বেসরকারী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত **সরকার অনুমোদিত গুদাম** (licensed warehouse)।

৩. **সুবিধা :** (ক) গুদামে পণ্য জমা রেখে উৎপাদকরা বাজারে ভাল দরের জন্য অপেক্ষা করতে পারে।

(খ) গুদামে জমা করা পণ্যের জামিনে উৎপাদকরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারে।

(গ) জমা রসিদের হস্তান্তর দ্বারা সহজে পণ্যের বেচা কেনা করা যায়। এটা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক।

(ঘ) বাজারে পণ্যের টানের দরুন দাম চড়ে গেলে গুদাম থেকে পণ্য বিক্রির দ্বারা পণ্যের দাম কমানো যায়। বাজারে পণ্যের দাম পড়ে গেলে, পণ্য গুদামজাত করে, বাজারে পণ্যের যোগান কমিয়ে দিয়ে দর ওঠানো যায়। এইভাবে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা বাজারে পণ্যের দরের ওঠানামা কমিয়ে দরের স্থিরতা ও চাহিদা এবং যোগানের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(ঙ) গুদামজাত পণ্যের আগাম বেচাকেনা (future trading) করা যায়।

(চ) যেমন তেমনভাবে পণ্য মজুদ করার দরুন পণ্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, উন্নত গুদামজাতকরণের দ্বারা সে ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করা যায়।

৪. ১৯৪৫ সালের কৃষি অর্থসংস্থান সাবকমিটি ও ১৯৫০ সালের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি ভারতে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও অর্থসংস্থান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার গুরুত্ব নির্দেশ করেছিল। ১৯৫৪ সালের সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা (গোরওয়ালা কমিটি) একটি দেশব্যাপী গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার কর্মসূচির সূত্রপাত করে। কমিটি জাতীয় স্তরে, রাজ্য ও জেলাস্তরে এবং গ্রাম ও গ্রামীণ স্তরে,—এই তিন স্তরে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করে। ভারত সরকার এই সুপারিশ মেনে নিয়ে ১৯৫৬ সালে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ পর্ষৎ (National Co-operative Development and Warehousing Board) এবং ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় গুদামজাতকরণ করপোরেশন (Central Warehousing Corporation) স্থাপন করে। এই সময় থেকে রাজ্যে রাজ্যেও রাজ্য গুদামজাতকরণ করপোরেশন (State Warehousing

Corporation) স্থাপিত হতে থাকে। সমবায় সমিতি-গুলি গ্রামীণ এলাকায় নিজেরা গুদাম প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে সদস্যদের ফসল ও অন্যান্য পণ্যের মজুদ ধারণের জন্য। এরই পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও বেসরকারী গুদাম স্থাপন করতে থাকে। নিচে সারা ভারতে সরকারী, সমবায় ও বেসরকারী গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া হল।

সারণি ২২-১ : ভারতে গুদামজাতকরণ ক্ষমতা (লক্ষ টন) : ১৯৮৫, মার্চ

	নিজস্ব	ভাড়া করা	মোট
১. কেন্দ্রীয় গুদামজাতকরণ করপোরেশন	৩২	১৬	৪৮
২. ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া	৮৯	৬৪	১৫৩
৩. রাজ্য গুদামজাতকরণ করপোরেশন	৩৯	২৮	৬৭
মোট	১৬০	১০৮	২৬৮

সূত্র : সপ্তম পরিকল্পনা, দ্বিতীয় খণ্ড।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে অসুবিধাগুলি আলোচনা কর। এ সব অসুবিধা দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে?

[Discuss the difficulties of agricultural marketing in India? What measures have been suggested to remove these difficulties?]

২. সমবায় কিভাবে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের ও কুটির শিল্পের সমস্যার সমাধান করতে পারে তা বর্ণনা কর।

[Discuss how cooperation can solve the problems of agricultural marketing and those of the cottage industries.]

৩. ভারতে বর্তমান কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলি কি? এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? এগুলি ছাড়া অন্যান্য কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে তুমি মনে কর?

[What are the main problems of the existing system of agricultural marketing in India? What measures has the government taken to solve these problems? What measures in addition to those taken by the government would you recommend?]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সমস্যাটি কি?

[What is the problem of agricultural marketing?]

২. "কৃষিজাত উদ্বৃত্ত" বলতে কি বোঝায়? অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব কি?

[What is meant by "agricultural surplus"? What is its importance in economic development of a country?]

খাদ্যমূল্য ও খাদ্যশস্য বণ্টন সমস্যা
Problem Of Food Prices And Distribution

ভারতের বিকাশমান অর্থনীতিতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব /
খাদ্যের যোগান ও চাহিদা /
ভারত সরকারের খাদ্যনীতি /
খাদ্যশস্যের দাম ও দাম নির্ধারক বিষয়সমূহ /
খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিতিকরণ /
আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার /
খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় : ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া /
খাদ্যশস্যের সংগ্রহমূল্য /
আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

২৩.১. ভারতের বিকাশমান অর্থনীতিতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব
Importance of increasing Food Production in a developing country like India

১. 'ক্ষুধার্ত অঞ্চল' ('hunger belt') নামে পরিচিত জনাভারে প্রপীড়িত ভারতসহ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশ ও জীবনধারণের মানের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্যের প্রয়োজনে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বকে কোনোক্রমেই লঘু করে দেখা যায় না। এইসব বিকাশমান দেশগুলির প্রায় সকলেই কৃষিপ্রধান হলেও, সম্বলের স্বল্পতা, প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি ও পুরাতন কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্যা, খরা ও বন্যার প্রকোপ এদের কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। কৃষির উৎপাদিকা শক্তির স্বল্পতা এবং অন্যান্য জীবিকার অভাবে গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকাংশের কৃষির উপর নির্ভরতা এইসব দেশে শুধু মানুষের কর্মসংস্থান ও আয়ের স্বল্পতাই সৃষ্টি করেনি, তাদের জীবনে অল্পাহার, অনাহার এবং রোগ ও মহামারীকে স্থায়ী এবং কর্মশক্তি ও কর্মোদ্যম বিশেষভাবেই ক্ষুন্ন করছে।

২. স্বল্পোন্নত দেশগুলির সর্বত্র পরিমাণগত ও গুণগত ভাবে জনসাধারণের মাথাপিছু লভ্য এবং গৃহীত খাদ্য বিশেষভাবেই স্বল্প। তার উপর প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের দরুন তা আরও কমছে। সুতরাং উন্নয়ন বিহীন অবস্থাতেই খাদ্য গ্রহণের বর্তমান পরিস্থিতিটি বজায় রাখতে হলেও প্রতি বৎসর খাদ্যোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এমন অবস্থায় অর্থনীতিক বিকাশ প্রচেষ্টা শুরু হলে, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা বাড়বে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যশস্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়বে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের চাহিদা দেখা দেবে। দেশজ খাদ্যের উৎপাদন ওই বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হলে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী অপরিহার্য হয়ে উঠবে এবং তা বৈদেশিক মুদ্রার সীমাবদ্ধ তহবিলের উপর প্রবল চাপ ও সংকট সৃষ্টি করবে।

৩. সে সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারতের মত সমস্ত স্বল্পোন্নত ও বিকাশমান দেশে কৃষির উন্নয়ন এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেই

হবে। কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির মূলে চাবি-কাঠিটি হল কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। একদিকে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার মারফত কৃষির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন, সেচ, সার, উন্নতবীজ, ঋণ, কৃষিগবেষণা প্রভৃতি কৃষির নানান উপকরণ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সম্প্রসারণের মারফত কৃষির উৎপাদনশীলতার ক্রমাগত বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতার সবিশেষ বৃদ্ধি দেশে খাদ্যের মোট উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবে। কৃষিতে স্বল্পতর জনশক্তি অধিকতর পরিমাণে ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে। শহর ও শিল্পাঞ্চলে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে অর্থনীতিক বিকাশের দরুন কর্মসংস্থান বাড়বে ও গ্রামাঞ্চল থেকে জনশক্তির স্থানান্তর ঘটবে। বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির দরুন বর্ধিত উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান অংশ শহরে ও বাজারে খাদ্যশস্যের যোগান বাড়বে ও সেখানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। দেশে খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন দূর করবে। সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও কল্যাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনে খাদ্যোৎপাদনের সবিশেষ বৃদ্ধির দ্বারা স্বনির্ভরতা লাভের পথ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পন্থা নেই।

২৩.২. ভারতে খাদ্যের যোগান ও চাহিদা
Food Supply and Demand in India

১. **উৎপাদন ও যোগান :** ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালের মধ্যে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বার্ষিক গড়পড়তা মাত্র ৩.১ শতাংশ হারে এবং ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে ২.৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। ফলে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে প্রায় তিন দশক ব্যাপী কালে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল মাত্র ২.৯ শতাংশ। এই সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা (productivity) বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১ ৮ শতাংশ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কৃষির উৎপাদন-শীলতার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। তা শুরু হয় সত্তরের দশকের গোড়া থেকে। কিন্তু তারপর তিন বৎসর তা প্রায় একই স্তরে আবদ্ধ থাকার পর ফের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে ১৯৮৩-৮৪ সালে, যখন ১৫.২৩ কোটি টনের রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়। পরবর্তী বৎসরে অবশ্য তা অতিক্রম করা কিংবা ধরে রাখাও যায়নি। ১৯৮৪-৮৫ সালে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন আবার খানিকটা নেমে গেছে। সুতরাং খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি যে অব্যাহত গতিতে ঘটেছে তা নয়। তার যথেষ্ট উঠানামাও ঘটেছে এবং ঘটছে। মাঝে মাঝে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক (—)-ও হয়েছে। ফলে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা (বিশেষত খরা ও বন্যার দরুন) দূর হয়নি।

সারণি ২৩-১ : ভারতে খাদ্যশস্যের যোগান (কোটি টন)
(১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮৭)

	নীট উৎপাদন	আমদানি	মাথাপিছু লভ্য (দিন পিছু গ্রা)	কৃষির উৎপাদন-শীলতা সূচক সংখ্যা
১৯৫০-৫১	৫.০৮	০.২	৩৯৪.১	৭২.৪
১৯৬০-৬১	৮.২৩	০.৩৫	৪৬৭.৮	৯৩.০
১৯৭০-৭১	১০.৮৪	০.৩৬	৪৬৯.০	১০৯.৪
১৯৮০-৮১	১২.৯৬	—	৪৫৩.০	১২৫.৭
১৯৮১-৮২	১৩.৩৩	০.২১	৪৫৪.০	১২৬.৩
১৯৮২-৮৩	১৩.০০	০.১৯	৪৩১.০	১২৬.৪
১৯৮৩-৮৪	১৫.২৩	০.৩৩	৪৭৮.০	১৪৯.৬
১৯৮৪-৮৫	১৪.৬২	০.৬৩	৪৬৩.০	১৪৮.২
১৯৮৭	১২.৪৩	(—)০.২৯	৪৬৫.৫	১৪৯.৩

সূত্র : Pocket Book Economic Information, Govt. of India ; 1971 ; Statistical outline of India, Tata Services Ltd., 1971, 1984 ; Statistical Pocket Books of India 1983, Govt. of India, Ministry of Planning, Economic Survey, 1974-75, 1983 and 1987-88 ; Annual Report, Ministry of Agriculture, 1984-85 ; Indian Economic Diary.

সারণি ২৩-২ : খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার (শতাংশ)

১৯৫১-৫৬	৫.২
১৯৫৬-৬১	৩.৯
১৯৬১-৬৬	—২.০
১৯৬৬-৬৯	৯.৪
১৯৬৯-৭৪	২.৮
১৯৭৪-৭৯	৫.৪
১৯৭৯-৮০	—১৭.৬
১৯৮০-৮১	১৯.৮
১৯৮১-৮২	২ ২
১৯৮২-৮৩	—৪.২
১৯৮৩-৮৪	১৬.৭

সূত্র : Statistical outline of India, Tata Services Ltd., 1984.

খাদ্য আমদানি : ১৯৫০-৫১ সাল থেকে তিন দশক ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদন যখন ধীর গতিতে বাড়ছিল তখন দেশে জনসংখ্যা বাড়ছিল দ্রুত গতিতে। ফলে খাদ্য ঘাটতি মেটাতে, ১৯৭৮, ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সাল ছাড়া অন্য সব বৎসরগুলিতে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সত্তরের দশকের মধ্যভাগ ছিল সবিশেষ পরিমাণে খাদ্য আমদানির কাল। রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হয়েছিল ১৯৭৫ সালে (৯০৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৪.০৭ লক্ষ টন)। বর্তমানে

খাদ্য আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট কমেছে, যদিও তা একেবারে বন্ধ হয়নি। খাদ্যে স্বনির্ভরতা লাভ করা গেছে বলেই সকলের ধারণা।

বাজারে মোট যোগান : কিন্তু খাদ্যের মোট উৎপাদনই যে বাজারে খাদ্যশস্যের মোট যোগান, তা মনে করলে ভুল হবে। উৎপাদকরা তাদের ফসলের যে অংশটা বাজারে বিক্রির জন্য আনে তা-ই হল বাজারে ফসলের মোট যোগান। চাষীরা উৎপন্ন ফসলের কতটা অংশ বাজারে বিক্রির জন্য আনবে সেটা, উৎপাদনের হার, পরিবারের খোরাকির পরিমাণ, বীজ ধান, ফসলের বাজার দর, বিক্রির সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। চাষীরা যদি ফসল বেশি করে ধরে রাখে তাহলে বাজারে ফসলের যোগান কমে ও টান দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীরাও বাজারে ফসলের যোগান অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। চড়া দামের আশায় তারা মজুদ ধরে রেখেও বাজারে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম টান সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া খাদ্যশস্য ঠিক মতো মজুদ রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থাও ভারতে এখনও গড়ে ওঠেনি। এই কারণে উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক ৬ শতাংশ প্রতি বৎসর নষ্ট হয় এবং তাতেও বাজারে খাদ্যশস্যের যোগান কমে।

মাথাপিছু যোগান বা লভ্য পরিমাণ : জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা এখন যথেষ্ট বাড়েনি বলে, এবং সেহেতু মোট উৎপাদনও জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় যথেষ্ট বাড়েনি বলে, দেশে মাথাপিছু লভ্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ (সারণি ২৩-১) প্রায় এক স্থানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বলা যায়; এমনকি ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় তা খানিকটা বরং কমেই গেছে। জনসাধারণের জীবন মানের দিক থেকে এটা ঠিক উন্নতির অবস্থা নয়। তা ছাড়া দেশের অন্ততঃ ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে রয়েছে বলে, মনে রাখতে হবে, মাথাপিছু লভ্য পরিমাণের সবটা কেনার ক্ষমতাও এদের নেই।

২. **চাহিদা :** (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে তিন দশকে জনসংখ্যা ৩৬ কোটি থেকে বেড়ে ৬৮ কোটি এবং ১৯৮৪ সালে আনুমানিক ৭৩ কোটি হয়েছে। ১৯৫১-৬১-র দশকে বার্ষিক ২.১৬ শতাংশ হারে, ১৯৬১-৭১-র দশকে বার্ষিক ২.৪৮ শতাংশ হারে এবং ১৯৭১-৮১-র দশকে বার্ষিক ২.৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে বার্ষিক আনুমানিক ২.২৪ থেকে ২.২৫ শতাংশ হারে বাড়ছে।

(খ) **আয়বৃদ্ধি :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই চড়া হারের সঙ্গে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ও বাড়ছে। মাথাপিছু আয় চলতি মূল্যস্তরে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সালে ২৪৫.৫ টাকা থেকে ২,৯৭৪.৫ টাকা এবং ১৯৮০-৮১ সালের মূল্যস্তরে (স্থির মূল্যস্তর) ১৯৮৬-৮৭ সালে ১,৮৬১.৩ টাকা হয়েছে।

জনসংখ্যা এবং মাথাপিছু আয়, এই দু'টির বৃদ্ধির দরুন দেশে খাদ্যের মোট চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। গরিব দেশে অনাহার ও স্বল্পাহারের পটভূমিতে আয় বাড়লে, আয় বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যের চাহিদা বেশি হারে বাড়ে। অর্থাৎ, এসব দেশে খাদ্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা বেশি।

জাতীয় কৃষি কমিশনের মতে, জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির দরুন দেশে খাদ্যের মোট চাহিদা ২০০০ সালে ২০ কোটি থেকে ২২ কোটি টনের মধ্যে দাঁড়াবে।

সুতরাং দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও যোগানের তুলনায় খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা এখনও পর্যন্ত বেশিই রয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজারে মোট যোগান বাড়িয়ে এই সমস্যার সমাধান আজ দেশের সামনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।

২৩.৩. সরকারের খাদ্যনীতি
Food Policy of the Government

১. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ষাটের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পটভূমিতে খাদ্য-অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা (management of food economy) ভারতে সরকারী পলিসির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা এবং খাদ্যমূল্যস্তরের স্থিতিকরণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে। ফলে ভারত সরকারের খাদ্যনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি হয়ে দাঁড়ায় :

(ক) খরা ও বন্যার মোকাবিলা করা ;

(খ) গরিব মানুষের জন্য সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা ;

(গ) খাদ্য উৎপাদনকারী চাষীদের জন্য লাভজনক দর বজায় রাখা ;

(ঘ) খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা ;

(ঙ) খাদ্যশস্য আমদানি ও ক্রয়ের মাধ্যমে একটি আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার (buffer stock) গড়ে তোলা এবং তা থেকে সস্তা দরে গরিব মানুষদের খাদ্যশস্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সরকারী খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা (public distribution system) চালু রাখা ;

(চ) দামস্ফীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কৃষিজাত দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত সরকারী নীতিকে ব্যবহার করা ; এবং

(ছ) খাদ্যশস্যের মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ বাড়াতে

এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে উপরোক্ত উদ্দেশ্য-গুলিকে ব্যবহার করা।

২. ভারত সরকারের কৃষিনীতি ও কৃষি পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারী ব্যবস্থাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) কৃষিক্ষেত্রে উন্নত কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ; (খ) কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত বা কাঠামোগত সংস্কার; এবং (গ) কৃষিজাত দ্রব্যের দর যাতে পড়ে না যায় সেজন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থা (minimum support prices) অনুসরণ করা।

৩. ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থাটি প্রয়োগের বিশেষ দরকার হয়নি। কারণ সে সময় যোগানের তুলনায় খাদ্যশস্যের চাহিদা যথেষ্ট বেশি থাকায় খাদ্যশস্যের বাজার দর যথেষ্ট চড়া থাকতো এবং চাষীরা বাজার দরে ফসল বিক্রি করাটাই পছন্দ করতো। কিন্তু ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধির দরুন বাজার দরের তেজীভাব কমে গেলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং গমের সহায়ক মূল্য ওই বৎসরে টন প্রতি ১০৫ টাকা থেকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৫১ টাকায় তোলা হয়। এর কারণ, এই সময়ে উন্নত বীজ, সার, সেচ ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দরুন চাষের খরচ বাড়তে থাকে এবং বাজার দরের খামখেয়ালী ওঠানামা থেকে চাষীকে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দেয়; কেন না এটা করতে না পারলে উৎপাদন ব্যাহত হবার আশঙ্কা থাকে।

৪. ১৯৭৫-৭৬ সালের উত্তম ফসলের পর খাদ্যোৎপাদন পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে এবং সেই সময় থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজন অনেক কমে যায়। বর্তমানে কেবল আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডারটি বজায় রাখার প্রয়োজনে অল্প পরিমাণে খাদ্য আমদানি করা হচ্ছে।

৫. ভারত সরকারের খাদ্যনীতির অন্যতম অঙ্গ খাদ্য পুষ্টি সংক্রান্ত নীতি (nutritional policy)। ভারতবাসীর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর অংশের স্বল্পতা হল দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্য সমস্যার আরেকটি দিক। এ কারণে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মানুষের মতো বেশির ভাগ ভারতবাসীই অপুষ্টিতে (malnutrition) ভোগে। ভারতে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় 'ক্যালরি' (calorie)-র ৯০ শতাংশ সংগৃহীত হয় কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ দানাশস্য, মূলজাতীয় খাদ্য, ডাল ও চিনি থেকে, বাকি ১০ শতাংশ সংগৃহীত হয় আমিষ খাদ্য থেকে। অন্যান্য দেশে, বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে ৫৭ শতাংশ ক্যালরি সংগৃহীত হয় কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ দানাশস্য, ডাল, চিনি প্রভৃতি থেকে ও ৪৩ শতাংশ ক্যালরি সংগৃহীত হয় আমিষ জাতীয় খাদ্য থেকে। বেশির ভাগ ভারতবাসীর খাদ্য থেকে দৈনিক ২,০০০ ক্যালরিরও কম সংগৃহীত হয়। উন্নত দেশে সংগৃহীত হয় ৩,০৫০ ক্যালরি। উন্নত দেশে মানুষ দৈনিক গড়পড়তা ১০০ গ্রাম প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। ভারতে মাত্র ৫৯ গ্রাম। খাদ্যে পুষ্টির অভাবই ভারতবাসীর স্বল্প দক্ষতার প্রধান কারণ।

এ কারণে ভারত সরকারের খাদ্যনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানুষকে বেশি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা। এজন্য খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষৎ (Food & Nutrition Board) নামে একটি সরকারী সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। উচ্চ পুষ্টি গুণসম্পন্ন খাদ্য উদ্ভাবন ও প্রবর্তনে পর্ষৎ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৬. আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার (Buffer stock) এবং খাদ্যশস্য খরিদ ও বণ্টন হল সরকারী খাদ্যনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিকাশমান অর্থনীতিতে জনসংখ্যা আরও কিছুকাল ধরে বেশ উঁচু হারে (২ শতাংশ বা তার কিছু বেশি) বাড়বে এবং আয়ও বাড়তে থাকবে বলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়লেও, চাহিদারও প্রচণ্ড চাপ থাকবে। তাছাড়া খরা ও বন্যা তো লেগেই আছে। তাই খাদ্যশস্যের বাজারে নানাভাবে সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়া খাদ্যমূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা সম্ভব নয়। এইজন্য গৃহীত সরকারী ব্যবস্থাগুলি হলঃ খাদ্যশস্য খরিদ করার ব্যবস্থা। এজন্য বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসলের সবই সরকারী একচেটিয়া খরিদ, লেভির মারফত চাষীদের ও চালকল মালিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ এবং ফসলের দর পড়ে গেলে বা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকলে তা বন্ধ করার জন্য খোলা বাজার থেকে সরকারী খরিদ (Support purchasses) প্রভৃতি নানাভাবে সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছে এবং করছে। প্রথম পরিকল্পনা কাল থেকে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য শস্য খরিদ করা হত। খরিদ শস্যের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৯৭৬ সালে তা মোট উৎপাদনের ১২ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭৮ সাল থেকে সরকারী খরিদের উদ্দেশ্য হল দুটিঃ আপৎকালীন খাদ্য-ভাণ্ডার বজায় রাখা এবং বাজারে ফসলের দাম পড়ে যাওয়া থেকে চাষীকে বাঁচানো।

স্বল্পমেয়াদী বা মাঝারি মেয়াদীকালে কারবারী ও চাষীরা যদি চড়া দামে পরে ফসল বিক্রির আশায় শস্য ধরে রাখে বা মজুদ করতে থাকে তাহলে শস্যের যোগানে ঘাটতি ও বাড়তি চাহিদার মোকাবিলা করার জন্য ফসলের যে মজুদ করা হয়, তাকে আপৎকালীন খাদ্যশস্য ভাণ্ডার বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল একদিকে বাজার দরকে ও অন্য-দিকে চাষীর আয়কে স্থিতিশীল করা।

সরকারী বণ্টন ব্যবস্থায় ভারতে নানারূপে পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশের দশকে বড় বড় শহরগুলিতে রেশনিং

ব্যবস্থা মারফত খাদ্যশস্য বণ্টন করা হত। পরে ১৯৭৩ সালে গমের পাইকারী ব্যবস্থা জাতীয়করণ ও সরকারী একচেটিয়া গম খরিদের নীতি ঘোষিত হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালে তা পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। ১৯৫৭ সাল থেকে খাদ্যশস্যের আঞ্চলিক ব্যবস্থা (zonal system) প্রবর্তিত হয়। গোটা দেশকে কয়েকটি খাদ্য-অঞ্চলে বিভক্ত করে সরকারী অনুমতিপত্র ছাড়া এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে খাদ্যশস্য পাঠানো-আনানো নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে এই ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সারা দেশে খাদ্যশস্যের চলাচল অবাধ করা হয়েছে।

৭. **মন্তব্য :** ভারত সরকার এমন একটি খাদ্যনীতি রচনা করেছে যা খাদ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ, সবটা মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিতে পরিণত হয়েছে। এই নীতির মাধ্যমে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যবণ্টনের উন্নতি এবং খাদ্যের পুষ্টি বৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে নীতিটি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে এবং তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সব সময় সঙ্গতিও থাকছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সফল হলেও সর্বক্ষেত্রে তা হয়নি বা যথোপযুক্ত হয়নি।

২৩.৪. খাদ্যশস্যের দাম এবং দাম-নির্ধারক বিষয়সমূহ Food Prices and their Determinants

১. প্রথম পরিকল্পনাকালে খাদ্যমূল্যস্তর হ্রাস পেলেও তারপর থেকে এ পর্যন্ত খাদ্য-মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিই ঘটেছে। নিচের তথ্য থেকে তা দেখা যাবে।

খাদ্যশস্যের পাইকারী দরের সূচক সংখ্যা
(১৯৭০-৭১ = ১০০)

১৯৭২-৭৩	১৯৮২-৮৩	১৯৮৬-৮৭
১২৭	২৬৪	২৯৮

২. খাদ্যশস্যের দামস্তরের নির্ধারকগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) চাহিদার দিকের উপাদান; (খ) যোগানের দিকের উপাদান; এবং (গ) সরকারী নীতির প্রভাব।

৩. **চাহিদার উপাদানসমূহ :** এক্ষেত্রে চারিটি উপাদান সক্রিয়। এরা হল : (ক) **জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।** ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৩৬'১ কোটি থেকে বেড়ে ৬৮ কোটি হয়েছে। বর্তমান জনসংখ্যার জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্য যোগানো ছাড়াও প্রতি বৎসর ১ কোটি থেকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ নতুন জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের সংস্থানের প্রয়োজনে দেশে খাদ্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে।

ভারতে খাদ্যশস্যের চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায় : (১) জনসাধারণের দারিদ্র্যের জন্য তাদের অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটাতে হয়। এই অবস্থায় তাদের আয় সামান্য বাড়লে তার প্রায় সবটাই তারা খাদ্যের জন্য খরচ করে। অর্থাৎ ভারতে খাদ্যশস্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা অত্যন্ত বেশি।

(২) শিল্পোন্নয়নের ফলে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমছে ও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা তুলনা-মূলকভাবে বাড়ছে। সে কারণে জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় খাদ্যশস্যের চাহিদার তুলনায় চাল ও গমের চাহিদা বাড়ছে।

(৩) খাদ্যশস্যের বৃহৎ উৎপাদক ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে চড়া দামের আশায় গোপন মজুদ ধরে রাখার ও ফাটকাবাজীর প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। গোপন পথে অর্জিত কালো টাকা এই অপকর্মে সহায়তা করছে।

(খ) **পরিকল্পিত বিনিয়োগ :** পরিকল্পনাকালে দেশে প্রতি বৎসর উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ঘটছে। বার্ষিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৫৩-৫৪ সালে ৩৪০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৪,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। এই বিপুল বার্ষিক বিনিয়োগের ফলে দেশে কর্মসংস্থান, আয় এবং জনসাধারণের হাতে ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে চলেছে। ফলে তা খাদ্যশস্যের চাহিদা ও দামকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

(গ) **ব্যাংক ঋণ ও টাকার যোগান :** ১৯৫১ সাল থেকেই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারবারে ব্যাঙ্ক থেকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। ১৯৫১-৫২ সালে তা ৫৮০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮১-৮২ সালের জানুয়ারী মাসে ৪১,৬৩৬ কোটি টাকা হয়েছে। এই ব্যাঙ্ক ঋণ দেশের টাকার যোগানকে বাড়িয়ে দিয়ে খাদ্যশস্যের ও সাধারণ দামস্তরকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলেছে।

(ঘ) **ঘাটতি ব্যয় :** পরিকল্পনার ব্যয়ের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা অর্থাৎ বাড়তি নোট ছাপিয়ে সংস্থান করা হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তা ৫,০০০ কোটি টাকায় উঠেছে। ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্ক ঋণ ও ঘাটতি ব্যয় দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সে বৃদ্ধির হারটা দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় টাকার যোগান বৃদ্ধি দেশে সাধারণ মূল্যস্তর ও খাদ্যমূল্যস্তরকে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী করে দিচ্ছে।

৪. **যোগানের উপাদানসমূহ :** খাদ্যশস্যের যোগানের দিকের উপাদান হল তিনটি : (ক) **খাদ্যশস্যের উৎপাদন :**

খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন পরিকল্পনাকালে বেড়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে মোট উৎপাদন ৮·২ কোটি টন থেকে ১৯৮০-৮১ সালে ১২·৯৮ কোটি টন হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে উৎপাদন হয়েছে ১৫·২০ কোটি টন। কিন্তু উৎপাদনের এই বৃদ্ধি ধারাবাহিক নয়, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হারও স্থায়ী নয়। মাঝে মাঝেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খরা কিংবা বন্যা অথবা উভয় কারণেই ফসলের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। তার ফলে মোট উৎপাদনের খুব বেশি ওঠানামা ঘটছে। এর দরুন দেশে খাদ্যশস্যের যোগানে স্থিতিশীলতা এখনও আসেনি। তাছাড়া, চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় যোগানের বৃদ্ধি যথেষ্টও নয়। এই কারণে দেশে খাদ্যশস্যের দামের উধ্বর্গতি ঘটছে।

(খ) **বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত :** খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন যেটুকু বেড়েছে তাতে বাজারে বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের যোগানও বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদন যতটা বাড়ছে, বাজারে বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের যোগানের পরিমাণ ততটা বাড়তে দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ, বড়ো বড়ো কৃষকদের অবস্থার উন্নতির ফলে তাদের পক্ষে বেশি দামের আশায় বেশি দিন ধরে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে ধরে রাখার ক্ষমতা বেড়েছে। ১৯৭৩ সালে গমের পাইকারী ব্যবসায়ে সরকারী অধিগ্রহণের ব্যর্থতা এবং কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সরকারের তরফ থেকে কিনে নেবার ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রতি সরকারের নরম মনোভাব খাদ্যশস্যের দামস্তরের উপর খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ী ও বড়ো কৃষকদের আধিপত্য পাকাপাকিভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

(গ) **আমদানি :** দেশে চাহিদার তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হলে ঘাটতি মেটানোর উপায় হল বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করা। ভারতে অতীতে প্রায় প্রতি বৎসরই খাদ্যশস্য আমদানি করতে হত। তবে গত কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এবং ফুড করপোরেশন মারফত খাদ্যশস্য কিনে সরকারী আপৎকালীন খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার দরুন খাদ্য আমদানির প্রয়োজন প্রায় হচ্ছে না বললেই চলে।

২৩.৫. খাদ্যশস্যের মূল্যস্থিতিকরণ : গুরুত্ব, সমস্যা ও সমাধান
Stabilization of Prices of Foodgrain : Importance, Problem and Solution

১. বিগত চল্লিশ বছর ধরে শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারত কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশের স্তরেই রয়ে গেছে। সমগ্র অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্যের জন্য খাদ্য-শস্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্য ভারতের সাধারণ মূল্যস্তরের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বাড়লে বা কমলে সাধারণ মূল্যস্তরও অনুসারে বাড়ে বা কমে। এদিকে আবার ভারতের কৃষি একান্তভাবেই ঋতুনির্ভর। ঋতুর আচরণ অনিশ্চিত বলে কৃষির উৎপাদনও দারুণভাবে ওঠানামা করে। কৃষিপণ্যের যোগান ও চাহিদার মধ্যে সাময়িক অসঙ্গতির কারণে কখনও কখনও খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নেমে যেতে পারে, আবার কখনও কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েও যেতে পারে।

২. এ প্রসঙ্গে, খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাসের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

৩. **কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি :** উন্নয়নশীল দেশে জনসাধারণের খাদ্যশস্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা (income-elasticity of demand for foodgrain) বেশি হয়। এসব দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। তাতে দেশের মানুষের আর্থিক আয় (money income) বাড়ে। এই আর্থিক আয় বৃদ্ধির সাথে সমতা রেখে যদি খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা না করা হয় তবে মূল্য কাঠামোটিতে বিকৃতি ঘটে। এ ছাড়া, দেশে জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে ও উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় দেশের মানুষ শহরে ও নগরে বসতি স্থাপন করতে থাকলে অনিবার্যভাবেই খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়বে এবং তার ফলে খাদ্যশস্যের দামও বাড়বে। খাদ্যশস্য তথা সব ধরনের কৃষিপণ্যের দাম কম বা বেশি যাই হোক না কেন খাদ্যশস্যের ভোগী এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদনকারী—এই উভয়শ্রেণীর মানুষের উপর তার শুভ বা অশুভ প্রভাব অবশ্যই পড়বে। এসব পণ্যের দামের ওঠানামার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার সুযোগে কৃষিপণ্য বিপণনে লিপ্ত মধ্যস্থ ব্যক্তিরা (অর্থাৎ দালাল বা ফড়িয়ারা) নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির আর একটা দিকও আছে। চাল, গম, ডাল, ভোজ্য তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কৃষিজাত ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়লে জনসাধারণের জীবনযাত্রার খরচ বাড়ে। দরিদ্রতর অংশের মানুষের আর্থিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। এদের মধ্যে যারা সংগঠিত তারা তাদের নিজ নিজ সংঘের মাধ্যমে অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা আদায় করে নিজের মজুরি হারের কিছু বৃদ্ধি ঘটাতে হয়ত সক্ষম হয়—যদিও সে মজুরি বৃদ্ধি মূল্যস্তর বৃদ্ধির সাথে কখনই সমান হয় না। ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক সময়েই তাদের মজুরিহারের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। শিল্পমালিক যখন শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে উচ্চতর হারে মজুরি দিতে রাজী হয় তখন সে নিজের শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বাড়িয়েই অতিরিক্ত অর্থ

সংগ্রহ করে শ্রমিকদের দাবি পূরণ করে। এর ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়ে। কৃষিজাত কাঁচামালের দাম বাড়লে যে সব শিল্প এসব কাঁচামাল ব্যবহার করে সে সব শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের দামও বাড়ে। খাদ্যশস্যের মূল্য-বৃদ্ধি এবং কৃষিজাত কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি—এ দু'টি ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি 'উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মূল্যস্ফীতি'র (cost push inflation) সূচনা করে। এ ধরনের মূল্য-স্ফীতিকে 'ক্ষেত্রগত মূল্যস্ফীতি' (sectoral inflation) বলা হয়।

৪. এ প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে। ধারণাটি হল: কৃষিপণ্যের মূল্যস্তর বাড়লে কৃষকদের সুবিধা হয়। এখন প্রশ্ন হল, এ ধারণাটা সঠিক কিনা। এর উত্তরে বলা যায় এ ধারণা সব সময় সত্য হয় না। এর কারণটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: কৃষিপণ্যের মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে যে সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি হয় তার প্রায় সবটাই ধনী কৃষকেরা ভোগ করে। কারণ, তাদের জোতজমির আয়তন খুব বড়। অন্যদিকে বেশির ভাগ ক্ষুদ্র চাষীই তাদের দারিদ্র্যের জন্য ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আবার ঠিক এ সময়েই চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুসারে বাজারে ফসলের দাম কমের দিকেই থাকে। তাই অপেক্ষাকৃত কম দামেই কৃষককে ফসল বিক্রি করতে হয়। অন্যদিকে, শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য কৃষককে বেশি দাম দিতে হয়। এমন কি বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, ডিজেল তেল প্রভৃতির মত অপরিহার্য কৃষি-উপকরণের জন্যও কৃষককে অধিক দাম দিতে হয়। এর থেকে স্পষ্টতই দেখা যায়, কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে সুবিধা ক্ষুদ্র কৃষকের হয় না, হয় বড় ও ধনী কৃষকদের আর ফড়িয়া বা দালালদের। সমাজের দিক থেকে এর একটা তাৎপর্য রয়েছে যা মনে রাখা দরকার। কৃষিপণ্যের মূল্যস্তর বাড়লে ধনী ও বড় বড় কৃষক আর ফড়িয়াদের যে অতিরিক্ত আয় হয় সেটা দিয়ে তারা সাধারণত জমি বা সোনা কেনে কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ ভোগে অপচয় করে। সুতরাং, এমন একটি কথা বললে ভুল হবে না যে কৃষিপণ্যের মূল্যস্তর বাড়লে তাতে পুঁজিগঠনের দিক থেকে অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সমাজের বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না।

৫. **কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস:** কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমে গেলে কৃষকের সর্বনাশ। ভারতের মোট জন-সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম পড়ে গেলে এই বিপুল সংখ্যক কৃষি-নির্ভর মানুষের আয় নিদারুণভাবে কমে যায়। কৃষককে নানা রকম দেনা দিতে হয়। যেমন জমির খাজনা, ঋণের সুদ প্রভৃতি। কৃষিপণ্যের দাম কমে গেলে এ সব দেনা শোধ করার পর কৃষকের হাতে খুব কম অর্থই অবশিষ্ট থাকে। এতে তার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব হয় না। অর্থাভাবে অনেকসময় তার সামান্য জোতজমিও তাকে বিক্রি করে দিতে হয়। এর সব থেকে মারাত্মক প্রভাব পড়ে কৃষকের মানসিকতার উপর। কৃষি তার কাছে অলাভজনক এক গুরুভার বলে মনে হয়। কৃষিকাজে তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে যায়। ফলে কৃষির উৎপাদনও দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

৬. এর অন্য একটা দিকও আছে। কৃষিপণ্যের দাম পড়ে গেলে কৃষকের আয় কমে যায়। কৃষকের আয় কমে গেলে তার ক্রয়শক্তিও কমে যায়। ফলে কৃষকের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও হ্রাস পায়। শিল্পে মন্দা নেমে আসে। তাই এমন কথা বলা যায়, কৃষিপণ্যের দামের হ্রাস শুধু কৃষিকেই বিপর্যস্ত করে না, শিল্পক্ষেত্রেও এক সর্বনাশা প্রভাব বিস্তার করে।

৭. **গুরুত্ব:** যে দেশ পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে চায় সে দেশে খাদ্যমূল্যের স্থিতিসাধন একটা অবশ্য করণীয় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, খাদ্যশস্যের দামস্তর বেড়ে গেলে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যয়ও বেড়ে যায়। এবং পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণে আরও বেশি আর্থিক সম্বলের প্রয়োজন হয়। এ কারণে ভারতের প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকেই সাধারণ মূল্যস্তর ও বিশেষ করে খাদ্যমূল্যস্তর সম্পর্কে উপযুক্ত নীতি গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনাকালে খাদ্যমূল্যস্তর হ্রাস পেলেও তারপর থেকে এ পর্যন্ত খাদ্যমূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিই ঘটে চলেছে। তাই এ মূল্যস্তরের স্থিতিকরণের বিষয়টি এত গুরুত্ব পাচ্ছে।

৮. **সমস্যা:** খাদ্যশস্যের মূল্যস্তরের স্থিতিসাধনের প্রধান সমস্যাটি হল খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন। ভারতের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, দেশের মানুষের মোট ক্রয়শক্তি বাড়ছে, তার ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদাও বাড়ছে। অন্যদিকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন নানা কারণে লক্ষ্য মতো বাড়ানো যাচ্ছে না। এতে যোগানের পরিমাণ যথেষ্ট হচ্ছে না। তা ছাড়া, মোট উৎপাদন যাই হোক না কেন সেটা ক্রেতা-ভোগীদের কাছে ন্যায্য দামে পৌঁছে দেবার মত বণ্টন ব্যবস্থাও সুষ্ঠু ও কার্যকর নয়। এ প্রসঙ্গে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার কথা উল্লেখ করতে হয়।

খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর বেসরকারী কর্তৃত্বই প্রধান। যদিও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে ও ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলে সরকার খাদ্যশস্য বণ্টনের কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে তবু একথা স্বীকার

করতেই হবে যে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্যই বিদ্যমান।

৯. উপায়ঃ দেশের খাদ্যমূল্যস্তর বৃদ্ধির স্থায়ী প্রতিকার হল, চাহিদা অনুসারে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই হল এ সমস্যার মূল সমাধান।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা দরকার।

(১) প্রকৃত ভূমিসংস্কার দ্বারা অকৃষক মালিকদের হাত থেকে সমস্ত জমি এবং সিলিং আইন প্রয়োগ করে বড় কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত জমি নিয়ে ছোট কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

(২) কৃষকদের সুবিধাজনকভাবে সেচের জল, ঋণ, বিদ্যুৎ, পাম্পসেট, উচ্চ ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সময়মত যোগাতে হবে।

(৩) কৃষকেরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পায় তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৪) কৃষকদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে।

(৫) খাদ্যশস্যের (চাল, ডাল, গম, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি) পাইকারী ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করতে হবে।

(৬) কৃষকদের বিক্রয়যোগ্য সমস্ত কৃষি উদ্বৃত্ত ন্যায়সঙ্গত দামে সরকারকে কিনে নিতে হবে [ন্যায়সঙ্গত দাম নির্ধারণে কৃষকদের উৎপাদন খরচের সাথে তাদের ন্যায্য মুনাফাও যোগ করে নিতে হবে]।

(৭) পরিবারের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি খাদ্যশস্য মজুত নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করতে হবে।

(৮) সারা দেশে রেশনিং প্রবর্তন ও প্রতিটি নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্যশস্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। এটা করা সম্ভব না হলে অন্তত সব শহরে ও নগরে রেশনিং চালু করতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) প্রয়োজন খুব জরুরী হলে সীমাবদ্ধ পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে।

(১০) পরিশেষে, যতদিন না দেশের জনসাধারণের খাদ্যের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাবার মত সুপ্রচুর খাদ্যোৎপাদন করা হচ্ছে ততদিন আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার (buffer stock of food) গড়ে তুলে খাদ্যমূল্যস্তরের স্থিতিসাধনের চেষ্টা করতে হবে।

২৩.৬. আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার
Buffer Food Stock

১. কৃষিজাত পণ্যের বিশেষ করে খাদ্যশস্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকর পন্থা হল খাদ্যশস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা এবং রেশনিং প্রথার মাধ্যমে সারা দেশে খাদ্যশস্যের বণ্টন সুনিশ্চিত করা। এ দু'টি ব্যবস্থার কোনোটিই সারা দেশে ব্যাপকতম ভিত্তিতে এবং কার্যকরভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় খাদ্যশস্যের দাম স্থিতিশীল করতে আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা দরকার।

২. আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করে। (ক) কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন যখন খুব ভাল হয় এবং তার ফলে এ সব পণ্যের দাম কমতে থাকে তখন সরকার এ সব পণ্যের পরিপোষক দাম নির্ধারণ করে দেয় এবং কৃষকদের কাছ থেকে ঐ দামে তাদের উৎপন্ন ফসল কিনে নেয়। সরকারের কেনা ফসল আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডারে মজুত রাখা হয়। (খ) আবার, ফসলের দাম যখন বাড়তে থাকে সরকার তখন আপৎকালীন মজুত-ভাণ্ডার থেকে ন্যায্য দরে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। ভারতে এ ধরনের ফসল কেনা ও ফসল বেচার কাজ সরকারের তরফ থেকে যে দু'টি প্রতিষ্ঠান করে তারা হল স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন ও ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া।

৩. এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে আপৎকালীন খাদ্য-ভাণ্ডার বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। তবে এই খাদ্য-ভাণ্ডারের কার্যকারিতা যাতে বাড়ানো যায় সে জন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। যেমন, (ক) খাদ্যভাণ্ডার গঠন ও তার ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে হওয়া দরকার। এ ভাণ্ডারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে একদিকে ভোগী ও অন্যদিকে উৎপাদনকারী কৃষক। এ দুই শ্রেণীর মানুষেরই স্বার্থরক্ষার কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। ফসল কেনার সময় এই ভাণ্ডার এমন একটি মূল্যস্তর স্থির করে দেবে যাতে উৎপাদনকারী কৃষকেরা কৃষিকাজে প্রণোদনা পায়। মূল্যস্তরটি অবশ্যই এমন হবে যাতে কৃষকের উৎপাদন খরচ ও স্বাভাবিক মুনাফা প্রতিফলিত হবে। এ কারণে ফসলের একটা ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া দরকার এবং কৃষকেরা যাতে সে দামে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারে তার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করা দরকার। এতে ফসলের দামের ওঠানামা হলেও কৃষকের মনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না।

(খ) খাদ্যভাণ্ডারকে সময়মত সক্রিয় হতে হবে। শুধু তাই নয়, এর কাজকর্ম এমন ব্যাপক আকারে হওয়া চাই যাতে খাদ্যমূল্যের উপর কাম্য প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে খাদ্যের ঘাটতি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যমূল্যস্তর ঐ সব অঞ্চলে দারুণভাবে বেড়ে গেছে।

(গ) খাদ্যভাণ্ডারের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ব্যক্তিদের (অর্থাৎ দালাল বা ফড়িয়াদের) ভূমিকার কথা মনে রাখা দরকার। কৃষিজাত পণ্যের কখনো ঘাটতি দেখা দিলে এই ব্যক্তিরা সে অবস্থার সুযোগ নিয়ে দামস্তরে দারুণ অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সরকারী খাদ্যভাণ্ডারে প্রভূত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত আছে জানা থাকলে সকলশ্রেণীর মানুষের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি হয়। সমগ্র অর্থনীতির উপরে এর ফল শুভ হয় এ কারণে যে খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী—এরা সকলেই ফাট্‌কা কারবারে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয়। সাম্প্রতিক কালে ভারতে আপৎকালীন খাদ্যভাণ্ডার গঠন করা হয়েছে। খাদ্যভাণ্ডার পরিচালনার ব্যাপারে যে সব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়: (ক) সঠিক মূল্য নির্ধারণের সমস্যা, (খ) অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা, (গ) খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণের সমস্যা ও (ঘ) প্রশাসনিক সমস্যা।

(ক) সঠিক মূল্য নির্ধারণের সমস্যাটা মূলত খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ ও ন্যূনতম দাম কত হবে তা স্থির করা। এটা সহজ কাজ নয় এ কারণে যে এ দু'টো দামস্তর নির্ধারণ করার নির্ভুল ও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো মানদণ্ড নেই। তা ছাড়া, সর্বোচ্চ মূল্য ও ন্যূনতম মূল্যের মধ্যে কতটা ফাঁক থাকবে যে ফাঁকের মধ্যে খাদ্যশস্যের দাম ওঠানামা করতে দেওয়া হবে—এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। শুধু তাই নয়; নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে করা হবে সেটাও একটা সমস্যা।

(খ) খাদ্যভাণ্ডার গঠন করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। ২ কোটি টন খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনের ২,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হয়েছে। খাদ্যভাণ্ডার সৃষ্টিতে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ বস্তুতপক্ষে আটক হয়ে থাকে।

(গ) খাদ্যভাণ্ডার যত বড় হবে গুদামের সংখ্যাও সে অনুপাতে বাড়তে হবে। দীর্ঘকালীন সময়ে হয়ত অনেক গুদাম নির্মাণ করা সম্ভব কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে এটা যে একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(ঘ) খাদ্যভাণ্ডার সুষ্ঠু পরিচালনার কাজে বহুসংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দরকার। এ কাজের উপযুক্ত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করাও একটি সমস্যা।

২৩.৭. খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়: ফুড কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া
State Trading in Foodgrain: The Food Corporation of India

১. ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারত সরকার দেশে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা। কিন্তু, সে সময় যেরূপভাবে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হয়েছিল তাতে সমস্যা কিছুমাত্র দূর হয়নি।

২. অবশেষে, তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর থেকে পুনরায় তীব্র খাদ্যসমস্যা দেখা দিলে, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার সংকল্প নিয়ে ভারত সরকার ভারতের খাদ্য করপোরেশন নামে একটি বিধিবদ্ধ কেন্দ্রীয় করপোরেশন গঠন করে। পার্লামেন্টে গৃহীত আইনের দ্বারা ১৯৬৫ সালে এটি স্থাপিত হয়। করপোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থারূপে কাজ করে। এর উদ্দেশ্য হল খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তন করা এবং দেশের খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা গ্রহণ করা। ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে করপোরেশন খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র (sole) এজেন্টরূপে কাজ করছে।

৩. ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ী সংস্থারূপে দেশের খাদ্য ব্যবসায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে সব রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। কর্পোরেশন প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য কেনে এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত এই পরিমাণ শস্য বণ্টনের উদ্দেশ্যে সব রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রেরণ করে। বিদেশ থেকে আমদানি করা সার ও দেশের মধ্যে লেভি চিনির কারবার কর্পোরেশনই চালায়। কর্পোরেশন সারা দেশে ২ কোটি টন পণ্যসামগ্রী মজুদ করার মত গুদাম স্থাপন করেছে। আরও ৩৫ লক্ষ টন পণ্যসামগ্রী রাখা যেতে পারে এমন ব্যবস্থার উপযোগী আরও গুদাম ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে নির্মাণের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন ২৫টি চাউলকল আছে। ১৯৮০-৮১ সালে কর্পোরেশনের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৩,২৪৮ কোটি টাকা।

৪. ১৯৫৯ সালে সরকার খাদ্যশস্যে সরকারী ব্যবসায়ের যে স্কীমটি গ্রহণ করেছে, তার মূল কথা ছিল:

(১) প্রথম দিকে তা গম এবং চাল, এই দু'টি প্রধান দানা জাতীয় শস্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। (২) পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রিত দামে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রি করবে। কিন্তু খুচরা দর অবস্থা অনুযায়ী স্থির করবে রাজ্য সরকার। (৩) অন্তর্বর্তীকালে লাইসেন্স নিয়ে পাইকারী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় করবে। কৃষকদের কাছ থেকে তারা নির্ধারিত ন্যূনতম দামে শস্য কিনবে। তাদের স্টকের একটা অংশ নিয়ন্ত্রিত দামে সরকার কিনতে পারবে। বাকি অংশটা তারা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে নিয়ন্ত্রিত দামের মধ্যে বেচতে পারবে। এ সময়ে সরকার ক্রমশ বেশি পরিমাণে শস্য কিনতে থাকবে এবং এইভাবে যতদিন না পুরো সরকারী ব্যবসায় প্রবর্তিত হচ্ছে ততদিন বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে। (৪) শেষ পর্যন্ত গ্রামস্তরে কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফত কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্য-শস্য কিনে তা বিক্রয়-সমবায় ও সমবায় সংঘগুলির হাতে পৌঁছানো হবে। সেখান থেকে ঐ শস্য খুচরা ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সমবায় মারফত সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রির স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে। (৫) তা ছাড়া, যে সব কৃষক সরকারের কাছে শস্য বেচতে চায় তাদের কাছ থেকে তা কেনার জন্য সরকার একটি সংস্থা গঠন করবে। সেটি 'না-লাভ না-লোকসান' ভিত্তিতে কাজ করবে।

৫. **খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি :** ভারতের খাদ্য করপোরেশন মারফত বর্তমানে দেশে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হচ্ছে। সংক্ষেপে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

পক্ষে যুক্তি : ১. উৎকট মুনাফার লালসায় খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী, চালকল মালিক ও বৃহৎ উৎপাদকরা খাদ্যশস্য গোপনে মজুত করে যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে, তাতে দেশে খাদ্যবণ্টনের পুরানো ব্যবস্থা যে আর মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং কৃত্রিম খাদ্যসমস্যা দূর করার অন্যতম উপায় হল খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রবর্তন করা।

২. এর ফলে দেশের মধ্যে খাদ্যশস্যের ন্যায্য বণ্টন সম্ভব হবে এবং দেশে খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিরতা দেখা দেবে।

৩. দেশে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যে মুনাফালোলুপতার জন্যে যে কালো টাকার খেলা চলছে এবং সেজন্য মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ছে তাও এই ব্যবস্থাতে কিছু পরিমাণে কমবে। ক্রেতারা সরকার-নির্ধারিত ন্যায্য দরে খাদ্যশস্য পেলে মধ্যবর্তী কারবারীদের শোষণ থেকে তারা রক্ষা পাবে।

৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করার জন্যও এই ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তার কারণ হল, দেশে পরিকল্পিত খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা না থাকায় খাদ্যবণ্টনে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের দ্বারা সুষ্ঠু পরিকল্পনার পক্ষে একটি বহু-প্রতীক্ষিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

৫. এই ব্যবস্থায় কৃষকদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য দরে শস্য ক্রয় করা হবে ও তাতে কৃষকরা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অন্যায় শোষণ থেকে রক্ষা পাবে। ফলে উপযুক্ত দাম পাওয়ায় কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হবে।

বিপক্ষে যুক্তি : ১. অনেকের মতে, সরকার ইতো-পূর্বে খাদ্যশস্যে যে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তন করেছিল তা সফল হয়নি ; সুতরাং এত বড় আকারে ও ব্যাপকভাবে এটা প্রবর্তন করার কোনো যুক্তি নেই।

২. এই ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করতে ও মজুত রাখতে হবে, তার উপযোগী গুদাম সরকারের নেই।

৩. খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে যে বিরাট পুঁজির প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করতে সরকারকে অসুবিধায় পড়তে হবে।

৪. খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারবারীরা ও তাদের বিপুল সংখ্যক কর্মচারী তাদের পুরান কাজ ও জীবিকা হারাবে। ফলে নতুন একটি সমস্যা দেখা দেবে।

৫. **উপসংহার :** খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধের অন্যতম অস্ত্র হিসাবে এবং কৃষকদের ও ভোগীদের পক্ষে ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করার উপায় হিসেবে এই ব্যবস্থা বর্তমানে একান্তই দরকারী হয়ে পড়েছে। এর সাফল্যের পথে যে সকল অসুবিধা রয়েছে—যথা, পুঁজি ও গুদামের স্বল্পতা, অতীত সরকারী ব্যর্থতা প্রভৃতি—সেগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে ; তবে তাতে কিছু সময় লাগতে পারে।

২৩.৮. খাদ্যশস্যের সংগ্রহমূল্য
Procurement Prices of Foodgrain

১. রাষ্ট্রীয় বণ্টন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, চাষীরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পায় এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের কবলে যাতে খাদ্যশস্য চলে না যায়, এই তিনটি উদ্দেশ্যে সরকার খাদ্য করপোরেশন মারফত বাজার থেকে উদ্বৃত্ত

খাদ্যশস্য ক্রয় করে। এজন্য খাদ্যশস্যের নির্দিষ্ট ক্রয়মূল্যও (সংগ্রহমূল্য) সরকারকে ঠিক করে দিতে হয়। মরসুমের অবস্থা অনুসারে এ দরের রদবদল হবে বলে সরকার ঘোষণা করেছে। যে দরে সরকার খাদ্য করপোরেশন মারফত খাদ্য-শস্য ক্রয় করে সে দরেই তা বিক্রয় করা হয়।

২. খাদ্যশস্যের মূল্যের স্তর নির্ণয়ের বিষয়টি সমগ্র অর্থনীতির (বিশেষভাবে কৃষি অর্থনীতির) দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজার থেকে সরকার যে দরে খাদ্য-শস্য কিনবে সে দরই হল শস্যের সংগ্রহমূল্য। এ সংগ্রহ-মূল্যের সাথে কৃষকের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংগ্রহমূল্য যদি যথাযথ হয়, কৃষক তাতে উপকৃত হবে। তার মোট খরচের মধ্যে তার স্বাভাবিক মুনাফাও ধরা থাকবে; খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে কৃষক উৎসাহিত হবে। অন্যদিকে সংগ্রহমূল্য যদি যথাযথ না হয়, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কৃষিকাজ তার কাছে অ-লাভজনক পণ্ডশ্রম বলে মনে হবে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হবে, সমগ্র অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। এখন প্রশ্ন হল, খাদ্যশস্যের সংগ্রহমূল্যের যথাযথ স্তর নির্ণয় কি ভাবে হবে। এখানে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, সংগ্রহমূল্যের যথাযথ স্তর নির্ণয়ের কাজটি ভারতের মত অর্থনীতিতে খুবই কঠিন। কেন না 'যথাযথ স্তর' তত্ত্বগতভাবে নির্ণয় করা গেলেও তাতেই খাদ্যশস্য সংগ্রহের সমস্যাটি মিটে যায় না। তত্ত্বগতভাবে, সে মূল্যস্তরই 'যথাযথ' যে স্তরের মূল্যে কৃষকের মোট উৎপাদন খরচ উসুল হবে। এ উৎপাদন খরচের মধ্যে কৃষকের স্বাভাবিক মুনাফা অবশ্যই ধরা হবে। এ রকম স্তরের মূল্য পেলে কৃষকের অভিযোগের তেমন কিছু থাকবে না, খাদ্যশস্যের উৎপাদন তার কাছে অ-লাভজনক বলে মনে হবে না। কৃষকও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে অন্যান্য লাভজনক শস্য উৎপাদনের কাজে জমি ব্যবহার করবে না। বরং এভাবে নির্দিষ্ট 'যথাযথ' মূল্য সরকারের কাছ থেকে পেলে সরকারের কাছেই উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করতে সে আগ্রহী হবে। সরকারও তার খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে। তত্ত্বগতভাবে এ যুক্তির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। এমনটি হলে ভারতের খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়।

৩. কিন্তু ভারতের বাস্তব অবস্থায় 'যথাযথ সংগ্রহ-মূল্যস্তর' নির্ণয় করা এক দুরূহ কাজ। কারণ, এ ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। প্রথম, ভারতের অর্থনীতি এক সর্বনাশা মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়েছে। ফলে মূল্যস্তরও হয়ে গেছে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। প্রতি-সপ্তাহে বা প্রতিমাসে অন্যান্য জিনিসপত্রের মত খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে থাকে। ফসলের মরসুমের সময় মূল্যবৃদ্ধির হারটা হয়তো একটু কম থাকে, কিন্তু মরসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মূল্যস্তর একটানা উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করে। মরসুমের সময় সরকার যে 'যথাযথ' সংগ্রহমূল্য নির্ণয় করে দেয়, কৃষক পরিষ্কার বুঝতে পারে, ঐ সময় ঐ সংগ্রহমূল্যস্তরে সরকারকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিক্রি না করে যদি আরো কিছুদিন উদ্বৃত্ত শস্য মজুত করে রাখা যায় তা হলে সরকার-নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য কালোবাজারে পাওয়া যাবে। এটা খুবই বাস্তব, বিশেষ করে ভারতে। কেননা, এ দেশে ব্যবসায়ীরাই এতকাল ধরে খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত রয়েছে। এদের বেশির ভাগই আজ আর বিশুদ্ধ ব্যবসায়ী নয়। কেননা কালোবাজারী ও মজুত-দারী আজ এদের ব্যবসায়ের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার যে 'যথাযথ' সংগ্রহমূল্য স্থির করে বাজারে খাদ্যশস্য ক্রয়ের চেষ্টা করছে, ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ কালো টাকার সাহায্যে সেই 'যথাযথ' মূল্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গোপনে কৃষকের কাছ থেকে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে খাদ্যশস্য কিনে নিচ্ছে। বেশি আয়ের লোভে কৃষকও এ সব কালোবাজারী ও মজুতদারের খপ্পরে গিয়ে পড়ছে। সরকারও শস্য সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করতে পারছে না। এ সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে কেউ কেউ 'সংগ্রহমূল্য' বাড়াবার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, সংগ্রহমূল্যস্তর কি পরিমাণ বাড়লে কৃষকরা কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি না করে সরকারের কাছেই বিক্রি করবে বলে নিশ্চিতভাবে আশা করা যাবে? সরকার যদি 'যথাযথ' সংগ্রহমূল্য আরো বাড়িয়ে দেয়, সে ক্ষেত্রেও তো কালোবাজারী ব্যবসায়ীরা সরকারের বর্ধিত সংগ্রহ-মূল্যের চেয়ে আরো বেশি মূল্য দিতে চাইবে। এর তো কোনো শেষ থাকবে না।

৪. দ্বিতীয়ত, খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন খরচ (এতে কৃষকের স্বাভাবিক মুনাফাও ধরতে হবে) হিসাব করে সংগ্রহমূল্য নির্ণয় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের মধ্যেও জটিলতা থাকছে। যেমন আজকাল কৃষক জমিতে রাসায়নিক সার, উন্নত ধরনের বীজ ও কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহার করছে। এগুলির জন্য যে দাম কৃষক দেয় তা শস্যের উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত হয়। নিয়ন্ত্রিত দামে এগুলি কৃষকের কাছে বিক্রয়ের কিছু কিছু ব্যবস্থা সরকার করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ কৃষকই নিয়ন্ত্রিত দামে এ জিনিসগুলি পায় না। তাকে খোলাবাজার থেকে অনেক বেশি দাম দিয়ে এগুলি কিনতে হয়। সরকার যখন শস্যের উৎপাদন খরচ হিসাব করে, তখন কৃষকের ব্যবহৃত এ জিনিসগুলির নিয়ন্ত্রিত দামই ধরে নেয়। কিন্তু কৃষককে যে খোলাবাজারে এই জিনিসগুলি কিনতে হয়েছে সেটা সরকারের হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না বা ধরা সম্ভবও নয়। ফলে সরকারের হিসাবে যেটা 'যথাযথ' উৎপাদন

খরচ কৃষকের হিসাবে তা হয় না। তাই সরকারের কাছে যেটা 'যথাযথ সংগ্রহমূল্যস্তর' কৃষকের কাছে সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ ধরনের 'যথাযথ' সংগ্রহ-মূল্যস্তরে কৃষক তার ফসল বিক্রি করলে তার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। কৃষিকাজ তার কাছে অ-লাভজনক পণ্ডশ্রম বলেই মনে হয়।

৫. তৃতীয়ত, ঋণ বাবদ যে সুদ কৃষককে দিতে হয় তাও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ধরতে হয়। সমবায় ঋণদান সমিতি, স্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কৃষকেরা তুলনামূলক কম সুদের হারে ঋণ পায়। কিন্তু এ সুযোগ ভারতের সর্বত্র কৃষকরা পায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকেই কৃষকেরা অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ করতে বাধ্য হয়। ফসলের মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করতে কৃষক মহাজনকে যে উচ্চ হারে সুদ দেয় সরকার নিশ্চয়ই তা হিসাবে ধরবে না। তার ফলে কৃষকের যা আসল উৎপাদন ব্যয় তা কখনই সঠিকভাবে ধার্য হবে না। যথাযথ সংগ্রহমূল্যস্তরও সে কারণে অবাস্তব হয়ে থাকবে।

তাই আজ ভারতের অর্থনীতিতে খাদ্যশস্যের কোন্ সংগ্রহমূল্যস্তর যে যথাযথ, তা স্থির করা কঠিন।

৬. **সর্বশেষ পরিস্থিতি :** সম্প্রতি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের বড় চাষীদের নেতৃত্বে গম, আখ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের সরকারী সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধির দাবিতে প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সার, কৃষির যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দরবৃদ্ধি এবং কৃষি শ্রমিকের মজুরির হার বৃদ্ধির দরুন ছোট ও বড়, সব চাষীরই উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। ফলে ছোট চাষীদের ফসল উৎপাদনের মোট খরচ উসুল হচ্ছে না। অন্যদিকে, বড় বড় চাষীদের মুনাফার হারও কমে গেছে। তাই কৃষিজাত ফসলের বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির দাবিতে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সরকারের উপর এই আন্দোলনের দরুন যথেষ্ট চাপ পড়েছে।

৭. এই সমস্যার একটি সমাধান হল চাষীদের দাবি মেনে নিয়ে কৃষিজাত দ্রব্যের সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি করা। তাতে সাধারণভাবে চাষীরা সন্তুষ্ট হবে বটে তবে সেটা হবে ক্ষণস্থায়ী। কারণ, এ ধরনের ব্যবস্থার ফলে প্রধানত উপকৃত হবে বড় চাষীরা। তাছাড়া, কৃষিজাত কাঁচামালের সংগ্রহ-মূল্য বৃদ্ধি করা হলে এসব কাঁচামালের দাম বেড়ে যাবে। যে সব শিল্পে এসব কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সে সব শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে সাধারণ মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হবে।

৮. তাই, কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলেছেন, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি না ঘটিয়ে সরকারের উচিত হবে কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিকে ভরতুকি দিয়ে চাষের খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিবিদ্যার আরও উন্নতি করা। অবশ্য এজন্য সর্বাগ্রে চাই আধুনিক কৃষি-উপকরণ। আর চাই কৃষির আধুনিক কারিগরী পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলি চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন, প্রচার অভিযান ও জন-সহযোগিতা।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি নির্দেশ কর। এ সমস্যা সমাধানের জন্য খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কতদূর বাঞ্ছনীয় বা সম্ভবপর বলে তুমি মনে কর ?

[Analyse the nature of India's food problem. How far, in your opinion, is state trading in foodgrain as a method of solving the food problem, desirable or feasible ?]

২. ভারতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের লক্ষ্যগুলি কি হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর ?

[What, in your opinion, should be the objectives of state trading in foodgrains in India ?]

৩. তুমি কি মনে কর খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসারের জাতীয়করণ ভারতের খাদ্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

[Do you think, nationalisation of the wholesale trade in foodgrain would help solve the food problem in India ? Give reasons in support of your answer.]

৪. ভারতে খাদ্যশস্যের মূল্যস্থিতিকরণের সমস্যাটির প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the nature and importance of the problem of stabilising the foodgrain prices in India.]

৫. খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেলে যে সমস্যা উদ্ভূত হয় তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

[Explain the nature of the problems created by a rise in the prices of agricultural products including foodgrain.]

৬. খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের সাধারণ মূল্যস্তর হ্রাস পেলে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the nature of the problem created by a general fall in the prices of agricultural products including foodgrain.]

৭. খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর স্থিতিকরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ?

[What measures should be adopted to stabilise the prices of foodgrain ?]

৮. খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর স্থিতিকরণের বিষয়ে আপৎকালীন খাদ্যভান্ডার কি ভূমিকা নিতে পারে ?

[What role can buffer food stock operations play in the matter of stabilising foodgrain prices ?]

৯. ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

[Write a note on the Food Corporation of India.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতের খাদ্যসমস্যার গুণগত দিকটি ব্যাখ্যা কর।

[Explain the qualitative aspect of India's food problem.]

২. ভারতের খাদ্যসমস্যার অর্থনীতিক দিক বলতে কি বোঝায় ?

[What is meant by the economic aspects of India's food problem ?]

সমবায়, সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতী রাজ
Co-operation, Community Development And Panchayati Raj

২৪.১. সমবায়
Co-operation

১. জমিদার, মহাজন এবং ধনী মালিকের শোষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপে সমাজসংস্কারকদের চেষ্টায় কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তার পর থেকে পৃথিবীর দেশে দেশে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন প্রসারিত হয়। ধনতান্ত্রিক (অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগের) অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলন মূলত দরিদ্র জনসাধারণের আত্মরক্ষার আন্দোলন।

২. সমবায় আন্দোলনের মূল কথা হল, অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদে হীনবল কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণী-গুলি নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একতা, সততা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সমানাধিকার ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজ নিজ জীবিকার ও পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থকরী কার্যাবলী সংগঠিত ও পরিচালনা করলে, ধনিক, বণিক, মালিক, মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও কিছু পরিমাণে মুক্তি পেতে পারে। উপার্জনে আত্মনির্ভর হতে পারে।

৩. সমবায় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ (১) এর দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব ; (২) অশিক্ষিত, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষক ও শ্রমিকসহ বিবিধ শ্রেণীর দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এর দ্বারা একতা, সততা, স্বনির্ভর আত্মোন্নতির শিক্ষায় নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব। (৩) সম-অধিকার বোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষা দিয়ে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি করা সম্ভব। সুতরাং অর্থনৈতিক, নৈতিক ও গণতান্ত্রিক—এই তিনটি ক্ষেত্রেই সমবায় আন্দোলন দরিদ্র মানুষের উপকারে আসে।

৪. সমবায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র ঃ ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় কৃষি, কুটির শিল্প ও ভোগীদের বিপণি, এই তিন ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষভাবে কার্যকর।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসারের পূর্বে জমিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানাই আদর্শ বলে গণ্য করা হত। সেজন্য ক্ষুদ্র জোতের মালিকচাষীদের মধ্যে কৃষিকার্য পারিবারিক ভিত্তিতে চললেও সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় ঋণসংগ্রহ, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার

প্রভৃতি ক্রয় ও বণ্টন, সেচের ব্যবস্থা করা এবং কৃষিপণ্য বিপণন-ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা জনপ্রিয় হয়। এ কারণে কৃষিঋণ ও কৃষিপণ্য বিক্রয়কার্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(ক) **সমবায় ও কৃষিঋণ :** সমবায় সমিতির মাধ্যমে অল্প সুদের হারে ঋণের ব্যবস্থা, সহজ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা মহাজনের নাগপাশ থেকে কৃষকদের মুক্তি সম্ভব।

(খ) **সমবায় ও বিক্রয়কার্য :** কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হলে, বহুসংখ্যক কৃষক একযোগে তাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারে। তাতে বাজারে পণ্য পাঠাবার পরিবহণ খরচ কমে। দলবদ্ধভাবে বিক্রয় ব্যবস্থার সাথে জড়িত থাকার জন্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের সাথে কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং তারা ফসলের ন্যায্য দর আদায় করতে পারে। সমবায় বিক্রয় সমিতির গুদামে তারা ফসল রেখে ন্যায্য দরের আশায় অপেক্ষা করতে পারে। সমবায় বিক্রয় সমিতি কৃষক-সভ্যদের নিকট থেকে ফসল ক্রয় করে ফসল বিক্রয়ের ঝামেলা থেকে ক্ষুদ্র কৃষকদের অব্যাহতি দিতে পারে। গুদামে রক্ষিত ফসল গুণাগুণ অনুযায়ী পৃথক পৃথক শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে। ফলে ফসলের বিক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বেশি দামও পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে কৃষকদের আয় ও অর্থনীতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(গ) **সমবায় ও কুটির শিল্প :** সমবায় পদ্ধতি দেশের চিরাচরিত কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে। সমবায় সমিতি কিছুটা সস্তায় শিল্পের প্রয়োজনে কাচামাল সংগ্রহ করতে পারে। আর পারে উৎপাদনকার্যের তদারকী, উৎপাদনের মান নির্ধারণ, ক্রেতাদের চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তদনুযায়ী উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ, পণ্যগুলির বিপণন ব্যবস্থার সংগঠন ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে। এ ছাড়া, সমবায় ক্রেতাদের নিকট সরাসরি পণ্য বিক্রয় করে মধ্যবর্তী দালাল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে শিল্পীদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। ক্রেতারাও প্রত্যক্ষভাবে শিল্পী সমবায়ের নিকট থেকে কম দরে পণ্য কিনতে পারে।

(ঘ) **সমবায় ও ভোগী :** ভোগীরাও নিজেদের সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করে একসঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম দরে কিনতে পারে। একসঙ্গে বেশি জিনিস আনা হলে পরিবহণ ব্যয় কম পড়ে। সমবায় ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেক সভ্য পাইকারী দরে দ্রব্য কেনার সুবিধা পায়। এটা মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধের এবং পণ্যের ন্যায্যবণ্টন সুনিশ্চিত করার অন্যতম উপায়।

এক কথায়, দরিদ্র ব্যক্তিরা সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে, উৎপাদন এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে। এর সাহায্যে সকল ক্ষেত্রেই ব্যয় কমে ও আয় বাড়ে। ফলে নিজেদের শক্তিতে তাদের বিশ্বাস বাড়ে। গণতান্ত্রিক-পদ্ধতিতে সমিতির কার্যকলাপ পরিচালিত হয় বলে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সমাজের প্রতি অধিকতর দায়িত্বশীল হয়।

২৪.২. ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা
Role of Co-operatives in the Planned Economic Development of India

(ভারত সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এজন্য সরকারী নীতির লক্ষ্য হল অর্থনীতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই দুটি কাজেই সমবায় পদ্ধতি কার্যকর। এজন্য ভারতের বর্তমান পটভূমিকায় সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনের পরিবর্তে সমবায় আজ অর্থনীতিক কার্যক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

২. গ্রামীণ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সমতা ও স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করে সমবায় সমিতিগুলি কৃষি এবং গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপন্নের উৎকর্ষ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন ও প্রসার, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সক্ষম।

৩. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। সমবায়ের দ্বারা কৃষি ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি হলে তাতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ ও আয় কেন্দ্রীভূত হবে না। সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আয় ছড়িয়ে পড়বে। দেশে আয়ের বৈষম্য কমবে। বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পের অধিকতর সুষম উন্নয়ন ঘটবে। অর্থাৎ আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটবে।

৪. এইরূপে কৃষিতে, শিল্পে ও বিবিধ সেবামূলক কার্যে সমবায়ের প্রসারে দরিদ্র জনসাধারণ কর্মের স্বাধীনতা, উন্নতির সুযোগ, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা লাভ করবে। সকলেরই উন্নতি সম্ভব বলে সমবায় আন্দোলন অধিকতর জনসমর্থন লাভ করবে।

৫. ব্যক্তির উন্নতির সাথে সমষ্টির কল্যাণের এইরূপ সমন্বয়ের সুবিধা রয়েছে বলেই ভারত সরকার অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায়

ক্ষেত্র সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করছে। সরকারের বিবেচনায় ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের কার্যক্রম সফল করার পক্ষে সমবায় আন্দোলন একটি অপরিহার্য উপায়।)

২৪.৩. ভারতের সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ A Brief Account of the Co-operative Movement in India

১. **প্রথম পর্যায় (১৯০১-৬৯) :** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের কৃষকদের ঋণভার বাড়তে থাকে। ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন সমবায় ঋণদান সমিতি গঠনের সুপারিশ করে। তার ফলে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাস হয়। এ হল ভারতের প্রথম সমবায় আইন। এর দ্বারা দরিদ্র কৃষক ও অ-কৃষক ব্যক্তিদের জন্য শুধু সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর দ্বারা ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত ৮,১১৭টি সমিতি গঠিত হয়। তাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষের বেশি এবং পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকার বেশি।

১৯১২ সালে দ্বিতীয় সমবায় আইন পাস করা হয়। এ আইনে—ক. সমিতিগুলিকে দায় অনুযায়ী সীমাবদ্ধ ও সীমাহীন দায়যুক্ত, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; খ. ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য প্রকার সমিতি যথা ক্রয়, বিক্রয়, গৃহনির্মাণ, বীমা প্রভৃতি সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়; গ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, এই তিন প্রকারের কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে সমবায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, পুঁজির পরিমাণ, সব কিছুই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা হয় ২৮,০০০, সভ্যসংখ্যা ১১ লক্ষ ও চলতি পুঁজি ১৫ কোটি টাকার অধিক।

২. **দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২০-৩৯) :** ১৯১৯ সালে শাসন সংস্কার আইন পাসের দ্বারা সমবায় দপ্তর প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট হস্তান্তরিত হয়। তার পর থেকে, বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সমবায় আইন পাসের দ্বারা সমবায় প্রসারের চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বিহার-উড়িষ্যার সমবায় আইন উল্লেখযোগ্য। ১৯২০-৩০ সালের মধ্যে আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর অর্থনীতিক মন্দার আঘাতে আন্দোলনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ১৯৩৩-৩৬ সালের মধ্যে বহু সমিতি বিলুপ্ত হয়। এর পর ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন ও তার কৃষিঋণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে, আবার সমবায় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সমিতি, সদস্য ও পুঁজির বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১ লক্ষ ১৬ হাজার, ৫০ লক্ষ ও ১০৪ কোটি টাকারও অধিক হয়। ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশের মধ্যে সমবায় আন্দোলন প্রসারিত হয়।

৩. **তৃতীয় পর্যায় (১৯৪০-৫০) :** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং ভোগী সমবায়, উৎপাদক সমবায়, পরিবহণ সমবায় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সমিতির প্রতিষ্ঠায় সমবায় আন্দোলনের উল্লেখ-যোগ্য বৈচিত্র্য সাধিত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে সাময়িকভাবে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স্বাধীন সরকারের সমবায় নীতি ও আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটাতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে ১৯৫০-৫১ সালে পরিকল্পনার প্রারম্ভকালে সমিতির মোট সংখ্যা হয় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার, সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ও চলতি পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০৬ কোটি ৩৪ লক্ষ।

৪. **চতুর্থ ও বর্তমান পর্যায় (১৯৫১) :** পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগে সমবায় আন্দোলন নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। ভারতের পুরানো সমাজকাঠামোর পরিবর্তে সমবায় জীবনযাপন পদ্ধতিকে নতুন সমাজকাঠামো রূপে গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পিত পথে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি আরম্ভ হয়। সমবায় কৃষি খামারের প্রবর্তন দ্বারা ভূমিসংস্কারের সাথে সমবায় আন্দোলনকে একত্রে গ্রথিত করা হয়। গ্রামীণ ঋণদানের সুসংবদ্ধ কাঠামো গঠনের জন্য সমবায়কেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সমবায়ের নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে।

বর্তমানে সমবায় আন্দোলন বিশেষ করে কৃষিঋণ, কৃষি-উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ (এগ্রিকালচারাল ইনপুটস) ও কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি ও ভোগী সমবায়ের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জাতীয় লক্ষ্য সাধনে সহায়তা করার জন্য সমবায় সমিতি-গুলিকে সংহত, শক্তিশালী ও লাভজনকভাবে কার্যক্ষম করে তোলার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সমবায় সম্পর্কে একটি ৪ দফা কার্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কার্যসূচির লক্ষ্য হবে : (ক) গ্রামীণ প্রাথমিক সমিতি-গুলিকে আরও শক্তিশালী করা এবং এ সব সমিতিকে বহু উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে তোলা; (খ) গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের অর্থনীতিক উন্নয়নে সহায়তা করা; (গ) সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ঋণ, সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি উপকরণ সরবরাহ করে ও

উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা ; (ঘ) সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মিগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত এই ১৯ বৎসরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা ৩ কোটি ৪২ লক্ষ থেকে বেড়ে ১০ কোটি ১০ লক্ষ হয়েছে। এ সময়ে এদের শেয়ার পুঁজি ২২২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১,৯৮৭ কোটি টাকা হয়েছে এবং কার্যকর পুঁজি (working capital) ১,৩১২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯,০৫৮ কোটি টাকা হয়েছে।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক সমবায় কৃষিপণ্য বিপণন সমিতির সংখ্যা হল ৩,৮২২ (১৯৮০-৮১ সালের হিসাব)। ঐ বৎসর বিপণন সমিতিগুলি ১,৯৫০ কোটি টাকার কৃষিজ পণ্য বেচাকেনা করেছে। এর মধ্যে খাদ্যশস্যের বিপণন হয়েছে ৫০০ কোটি টাকার।

১৯৮৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে স্থাপিত প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা হল ৯২,০০০। ভারতের মোট গ্রামীণ এলাকার শতকরা ৯৬ ভাগ অঞ্চলে কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

১৯৭৯-৮০ সালে চিনি উৎপাদনের মরসুমে ১৫৪টি সমবায় চিনিকল সর্বমোট ২৯ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করেছিল।

১৯৭৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ৩০ লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট ৪০,০০০ শিল্প সমবায় (industrial co-operatives) স্থাপিত হয়েছে। ঐ বৎসর এরা ২৬২ কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও ১৯০ কোটি টাকার দ্রব্য বিক্রয় করেছে। বর্তমানে (১৯৮২-৮৩ সালে) দেশে যত সার বণ্টন করা হচ্ছে তার ৪২ শতাংশ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে।

৫. **ভারতের সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য :** ভারতের সমবায় আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম, কৃষিঋণদান সমিতির প্রাধান্য। দ্বিতীয়, প্রথম থেকেই সরকারী প্রচেষ্টায় এর সূত্রপাত। জনসাধারণের আগ্রহে এই আন্দোলন প্রবর্তিত হয়নি।

২৪.৪. ভারতে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য Achievements of the Co-operative Movement in India

১. ভারতের সমবায় আন্দোলন নিম্নলিখিত সাফল্য লাভ করেছে বলে দাবি করা হয়।

(১) সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ অল্প হলেও তার ফলে গ্রাম্য মহাজনগণ সুদের হার কমাতে বাধ্য হয়েছে। (২) সমবায় ঋণদান সমিতি, জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গ্রামীণ জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়ে গ্রামীণ সঞ্চয় বাড়িয়েছে। (৩) সমিতি-গুলির অস্তিত্ব, তাদের প্রচার ও ঋণদান নীতির ফলে ভোগের জন্য ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমেছে। (৪) কৃষকদের উৎপাদনশীল ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বাড়িয়েছে। (৫) সমবায় সমিতির মারফত সরকারী কৃষিদপ্তর কর্তৃক উৎকৃষ্ট বীজ, পশু, সার ও যন্ত্রপাতির প্রচার, ব্যবহার, শিক্ষাদান ও বণ্টন ঘটায় কৃষিকার্যে উন্নতি ঘটেছে। (৬) সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণদান, উৎপাদন সংগঠিত করা, বিক্রয় পরিচালনা করার ফলে গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। (৭) সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সার প্রস্তুত, শিক্ষাদান, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যসম্মতরূপে গোশালা নির্মাণ ও পশুর যত্ন সংক্রান্ত শিক্ষাদান, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে। (৮) কৃষি ও কুটির শিল্প ছাড়াও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ভোগী সমবায় সমিতি, শ্রমিক ও কর্মচারিগণের ঋণদান সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে এসব সংস্থা সদস্যগণের নানাভাবে সেবা ও সাহায্য করেছে। (৯) ছোটবড় সমবায় সমিতিগুলি প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মচারী ও পরিচালকবর্গের শিক্ষাক্ষেত্র। এই সব সমিতির সদস্য হল সাধারণ কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণ। সমিতির কাজ করতে গিয়ে কিরূপে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে হয় সেটা শেখার সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন। (১০) সদস্যদের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য দূর করে, সম-অধিকার ও সুযোগের ভিত্তিতে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে, সমবায় আন্দোলন দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধের সঞ্চার, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি ও সমাজচেতনার বিকাশ এবং নৈতিক উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সমালোচনা : কিন্তু ভারতে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যত সাফল্যেরই দাবি করা হোক না কেন, বাস্তবে এই আন্দোলনের সাফল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে কয়েকটি সমবায় সংগঠনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটলেও সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন অতীতে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। কারণ—(১) সমবায় আন্দোলন প্রধানত কৃষিঋণদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কৃষিজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রসার হয়নি। (২) কৃষিঋণদান ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৫০ সালে গঠিত সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি দেখিয়েছে যে, পঞ্চাশ বৎসর ধরে কৃষিঋণদান সত্ত্বেও সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের মাত্র ৩ শতাংশ সরবরাহ করত। সুতরাং তারা গ্রামের মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদের

মুক্তি দিতে পারেনি। বর্তমানে অবশ্য এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। (৩) সমবায় সমিতিগুলি নিজেরাও চড়াহারে (শতকরা ১২½ টাকা পর্যন্ত) সুদ আদায় করায় সুদের হার বিশেষ কমেনি। (৪) জমি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তির জামিন ছাড়া সমবায় সমিতিগুলি ঋণ দেয় না। ফলে দরিদ্র কৃষকরা সমবায় ঋণের বিশেষ সুবিধা পায়নি। কারণ তাদের অনেকেই জমির মালিক নয়। বরং এতে লাভ হয়েছে প্রধানত ধনী কৃষকদের। (৫) অ-ঋণদান সমিতিগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। এই সমিতিগুলির (যথা—ক্রয় বিক্রয় সমিতি, উৎপাদন সমিতি, প্রভৃতি) সাথে ঋণদান সমিতিগুলি কোনো সংযোগ রাখেনি। ফলে যারা ঋণ পেল তারা তা উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করল কিনা তার তদারকী হয়নি। (৬) কৃষকগণকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়। (৭) অধিকাংশ সমিতিই ছিল স্বল্পায়ু। অনেক সমিতি কিছুদিন কাজের পর অচল হয়ে পড়ে। (৮) ঋণদান সমিতিগুলি ঋণ আদায়েও অক্ষমতা দেখিয়েছে।

অবশ্য পরিকল্পনাকালে সমগ্র সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন দ্বারা এর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে [২৪৩ নং অংশের শেষ দিকে "চতুর্থ ও বর্তমান পর্যায় (১৯৫১)" দ্রষ্টব্য]।)

২৪.৫. সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ (ত্রুটি ও সমস্যা)

Causes of Failure (weaknesses and problems) of the Co-operative Movement

অনেক আশা, ও সম্ভাবনা নিয়ে ভারতের সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এবং সরকারের তরফে এর প্রতি আগ্রহ ও সাহায্যের কোনো ত্রুটি না হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতের সমবায় আন্দোলন আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। যে সব কারণে ভারতে সমবায় আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে তা হল:

(১) সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে। যেমন, সদস্যদের মধ্যে ঐক্য, আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, পরার্থপরতা, সদস্যদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণাবলীর অবস্থিতি। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব ভারতে সমবায়ের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। (২) সমিতির কাজে অত্যধিক সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ গ্রামীণ জনসাধারণের উদ্যম ও উৎসাহ নষ্ট করেছে। (৩) সমিতিগুলির পরিচালনায় বিভিন্ন ত্রুটিও এদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। ঋণদানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, ঋণ আদায়ের অক্ষমতা, পরিচালকগণ কর্তৃক অপব্যবহার, স্বজনপোষণ, হিসাবের ক্র মাতব্বরদের কর্তৃত্ব, ঋণদানে অসাবধানতা, অ উদ্দেশ্যে ঋণদান সমিতির পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি অমান্য করা, দলাদলি, সমিতির কর্তৃত্বের মধ্যে কায়েমি স্বার্থের সৃষ্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব কারণে সমিতিগুলি কাজে দক্ষতা দেখাতে পারেনি। (৪) সমিতিগুলির আর্থিক সচ্ছলতার অভাব ও ঋণ মঞ্জুর করতে অযথা বিলম্ব সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। (৫) ঋণদান সমিতির আধিক্য এবং অন্যান্য অ-ঋণদান সমিতির সংখ্যাল্পতা সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার আর একটি কারণ। সমবায় যে একটি সম্পূর্ণ পৃথক কার্যপদ্ধতি, এটা যে একটি নতুন আদর্শবাদ, জীবনযাপনের নতুন পথ, একথা জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারেনি। (৬) সমবায় সমিতিগুলির ক্ষুদ্রায়তন এবং ঋণদান সমিতিগুলির সীমাহীন দায় তাদের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। (৭) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার সুনির্দিষ্ট কার্যসূচিতে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির মতই কাজ কারবার চালায়। (৮) সর্বোপরি, অতীতের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির সামগ্রিক দুরবস্থাই সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, সারা দেশে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বাত্মক পুনর্গঠনের কোনো ব্যবস্থা অতীতে গৃহীত না হওয়ায় শুধুমাত্র সামান্য ঋণ দিয়ে কৃষক ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা হয়েছিল বলেই সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে।)

২৪.৬. ভারতে সমবায় সংগঠনের কাঠামো

The Structure of the Co-operative Organisation in India

ভারতের সমবায় সংগঠন তিন পর্যায়ে বিভক্ত।

(ক) সর্বনিম্ন পর্যায়ে স্থানীয় বা গ্রামস্তরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি।

(খ) মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলাস্তরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন বা ইউনিয়ন।

(গ) রাজ্যস্তরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমিতি (এপেক্স সোসাইটি) প্রভৃতি।

২৪.৭. সমবায় সমিতিগুলির প্রকারভেদ

Different types of Co-operative Organisation

উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যথা—(১) ঋণদান সমিতি, (২) অ-ঋণদান সমিতি।

(ক) **ঋণদান সমিতি :** এদের মধ্য কৃষিঋণ এবং অ-কৃষিঋণ উভয় শ্রেণীর সমিতিই আছে ('কৃষিকার্যের অর্থসংস্থান' অধ্যায়ে সমবায় ঋণদান সমিতি ও জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে)।

(খ) **অ-ঋণদান সমিতি :** ঋণদান সমিতির অতিরিক্ত প্রাধান্য ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রধান ত্রুটি। ঋণদান ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। অতীতে এদের বাঞ্ছনীয় বলে গণ্য করা হলেও, এগুলির ব্যাপক সম্প্রসারণের চেষ্টা হয়নি।

ভারতে অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর থেকে সমগ্র সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যেমন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে, তেমনি অ-ঋণদান সমবায় সমিতিগুলির উপরও যথার্থ গুরুত্ব আরোপিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন সমবায় কর্মধারাকে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে।

এই উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমিকায় স্বভাবতই সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে,—যেমন কৃষিজাত ও অন্যান্য কাঁচামাল বিক্রয়-যোগ্য পণ্যে পরিণত করা, কৃষিজাত ও কুটির শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ে, গ্রামীণ পরিবহণে, ভোগী সমবায় বিপণি স্থাপনে, কুটির শিল্পের উৎপাদন সংগঠনে, পূর্তকার্যে শ্রমিকদের শ্রমশক্তির সুষ্ঠু নিয়োগে, শস্যবীমা, শস্যরক্ষা ইত্যাদি কার্যসূচিতে—সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ সব সমিতিগুলির উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচনা করা গেল।

(ক) **সমবায় বিক্রয় সমিতি :** ক্রেতাদের কাছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠিত হলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের আর কোনো ভূমিকা থাকে না। অপ্রয়োজনীয় বলে এ সব ব্যবসায়ীদের বিলোপ ঘটে। তাতে পণ্যের উৎপাদক ও ভোগী উভয়েরই উপকার হয়। উৎপাদকের আয় বাড়ে, ভোগীদের ব্যয় কমে।

(খ) **সমবায় প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতি :** আখ থেকে চিনি ও গুড় প্রস্তুত করা, দুগ্ধ থেকে ছানা, মাখন, ঘি তৈরি করা ও তৈলবীজ থেকে তৈলনিষ্কাশন প্রভৃতি কার্যের দ্বারা বিবিধ দ্রব্যকে নানাবিধ বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়; এজন্য এই সকল কাজকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। এই প্রকার সমিতি স্থাপনে শুধু যে গ্রামবাসীদের আয় বাড়বে তাই নয়, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ-সুবিধাও দেখা দেবে। ফলে পরিপূর্ণ সমবায়িক গ্রামীণ অর্থনীতিক গঠন সহজ ও সম্ভব হবে। বর্তমানে এই সকল সমিতির মধ্যে সমবায় চিনি কারখানা, গুড় ও চিনি প্রস্তুতকারী প্রাথমিক সমিতি, দুগ্ধ ইউনিয়ন, তুলাবীজ ছাড়াই, পাট ও তুলার গাঁইট বাঁধাই সমিতি প্রভৃতি প্রধান।

(গ) **সমবায় কৃষি :** গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনায় সমবায় কৃষির প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (এ সম্পর্কে 'কৃষি কার্যের সংগঠন' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ১৯৮১-এর জুন মাসে দেশে মোট ১২,৫৬০টি সমবায় কৃষি সমিতি ছিল। এদের অধীন জমির পরিমাণ ছিল ৬,৭৫,০০০ হেক্টেয়ার।

(ঘ) **ভোগী সমবায় :** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের জন্য ভোগী সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে এইরূপ সমিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি ভোগী সমবায় সমিতিগুলির একটি সারাদেশব্যাপী কাঠামো গড়ে উঠেছে বলে সরকার দাবি করেছে।

(ঙ) **শিল্পসমবায় সমিতি :** হস্তচালিত তাঁত, নারিকেল কাতা ও অন্যান্য কয়েকটি দেশীয় কুটির শিল্পে শিল্পসমবায় সমিতি এদেশে সফল হয়েছে ('কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।

(চ) **শ্রম ও পূর্তসমবায় সমিতি :** গ্রামাঞ্চলে সেচ ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রম পূর্তসমবায় সমিতি গঠনের উপর প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকেই বারংবার গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এরূপ সমিতি স্থাপন করে অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিকরা সংঘবদ্ধভাবে নিজেরাই বিভিন্ন প্রকল্পে শ্রম সরবরাহের ভার নিতে পারে। ফলে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি ও ঠিকাদারদের শোষণ দূর হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও অন্ধ্রপ্রদেশে এইরূপ সমিতি গঠিত হয়েছে।

(ছ) **গৃহনির্মাণ সমবায় :** শহর ও গ্রামাঞ্চলে এবং শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্মাণ কার্যে গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই প্রকার সমিতি অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণে সক্ষম। কারণ যাদের গৃহ নির্মিত হবে তারাই এর সভ্য। এরূপ সমিতিতে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ ও গৃহনির্মাণের মালমশলা দিয়ে সাহায্য করার নীতি গৃহীত হয়েছে। এদের কাজে নেতৃত্ব ও সহায়তা দানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ পরিষদ ও প্রতি রাজ্যে রাজ্যে গৃহনির্মাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২৪.৮. সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন : বিভিন্ন সুপারিশ Reorganisation of the Co-operative Movement : Recommendations

অতীতে বিভিন্ন সময়ে সমবায় আন্দোলনের দোষ-ত্রুটি দূর করে তাকে শক্তিশালী করার জন্য বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানাপ্রকার সুপারিশ করেছেন। তাতে আধুনিক

ফল পাওয়া গেলেও আন্দোলনের বিশেষ উন্নতি কিন্তু দেখা যায়নি। তার প্রধান কারণ ঐ সব সুপারিশের পশ্চাতে কোনো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। কৃষি ও সমবায় যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সমবায়ের ভিত্তিতে সমগ্র কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিক কার্যাবলীর সংগঠন দ্বারা যে উভয়ের উন্নতি সম্ভব ও তাতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ক'রে উভয়েই শক্তিশালী হতে পারে এইরূপ মৌলিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে সে সময় কেউ সমবায় সম্পর্কে চিন্তা করেননি।

(ক) সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ : ১৯৫১-৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি গ্রামীণ ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য যে সুপারিশ করেছিল, তা বস্তুতপক্ষে ভারতের সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের সুপারিশ। ভারত সরকার ঐ সুপারিশগুলি কাজে পরিণত করেছে। ফলে সমবায় আন্দোলন যে পথে পুনর্গঠিত হচ্ছে তার রূপরেখা এভাবে বর্ণনা করা যায়।

(১) **সমবায় কাঠামোর প্রত্যেক পর্যায়ে**—প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ (অর্থাৎ রাজ্য সমিতির স্তরে)—সরকার আর্থিক ও অন্যান্যভাবে কার্যকর অংশ গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারগুলি সমবায় সমিতিসমূহকে ঋণদান ছাড়াও তাদের শেয়ার কিনে পুঁজির একাংশ সরবরাহ করেছে। পরে সমিতিগুলি যতই আত্মনির্ভরশীল হবে ততই সরকার সরে আসবে। (২) সমবায় সমিতিগুলিকে আয়তনে আরও বড় করতে হবে। তাতে শক্তিসামর্থ্য ও কার্যকারিতা বাড়বে। (৩) গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য কাজে যথা, ভূমিকর্ষণ, সেচ, কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, বীজ ও সার বণ্টন, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের সমগ্র অর্থনীতিক জীবনযাত্রা পুনর্গঠন করা হচ্ছে। (৪) সমবায় ঋণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলির কর্মপন্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। (৫) সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিক্রয়কার্যের প্রসারের জন্য সারা দেশে সমবায় সমিতির দ্বারা ও সরকারী উদ্যোগে ও সাহায্যে আরও বেশি সংখ্যায় গুদাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব সরকারী ও সমবায় গুদামে পণ্য জমা দিয়ে কৃষকেরা যে রসিদ পাবে তার জামিনে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। (৬) সমবায় সমিতিগুলি যাতে মফস্বলের এক স্থান থেকে অন্যত্র সহজে টাকা পাঠাতে পারে এবং সমবায় সমিতিগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রের মালিকানায় স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। (৭) সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য সমবায় কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

(খ) অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মহল থেকে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নের জন্য পরামর্শ : (১) আরো বেশি সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন ঋণদান সমিতি স্থাপন করতে হবে। (২) জমির পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের জামিনে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সমবায় সমিতির ঋণের দাবিকে অগ্রাধিকার দেবে। (৪) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি ও সমবায় সমিতিগুলির সাহায্যের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। (৫) সমবায় সমিতির হিসাবরক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য রাজ্যসমবায় দপ্তরগুলিতে যোগ্য কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(গ) সমবায়ের পুনর্গঠনের জন্য স্যার ম্যালকম ডার্লিংয়ের সুপারিশ : দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বিখ্যাত সমবায় বিশেষজ্ঞ স্যার ম্যালকম ডার্লিংকে কলম্বো পরিকল্পনার পরামর্শদাতা রূপে ভারতে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁর সুপারিশ অনেকাংশে সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের বিপরীত। তাঁর প্রধান সুপারিশগুলি হল : (১) বৃহত্তর আকারে সমবায় সমিতি গঠন বাঞ্ছনীয় নয়। এতে সদস্যগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, মতৈক্য প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার সমিতি গঠনই সুবিধাজনক। (২) সমবায় আন্দোলনে ঘনিষ্ঠতর সরকারী অংশগ্রহণ সমবায়ের বিকাশে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। তার ফলে সমবায়ের আত্মনির্ভরশীলতার নীতি ক্ষুণ্ন হবে। (৩) নানাপ্রকার অ-ঋণদান সমিতি যথা—ক্রয় সমিতি, বিক্রয় সমিতি প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় দ্রুতগতিতে স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন এখনও তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই অবস্থায় এর দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে দুর্বল ভিত্তির উপর বিরাট সংগঠন স্থায়ী হবে না। (৪) সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণের কার্যক্রম স্থানীয় অবস্থার দিকে এবং কৃষকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। (৫) নতুন সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি পুরাতন সমিতিগুলির দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

(ঘ) সমবায় সম্পর্কে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের প্রস্তাব : ১৯৫৮ সালের জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ সমবায়ের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব করে যে, সমবায় আন্দোলনকে জনসাধারণের একটি নিজস্ব আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশগ্রহণের জন্য গ্রামীণক্ষেত্রে গ্রাম-সমাজকে ভিত্তি করে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন করতে হবে। এক-একটি গ্রাম নিয়ে এক-একটি সমবায় সমিতি

গঠন করতে হবে। ১৯৬০ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ একটি প্রস্তাবে বলে যে, যে সকল গ্রাম খুব ছোট সেখানে সুবিধার জন্য একাধিক গ্রাম নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা উচিত। এই সমিতিগুলি 'সেবা সমবায় সমিতি' (সার্ভিস কো-অপারেটিভ) নামে পরিচিত হবে। এরা নিজ নিজ গ্রামের অধিবাসীদের ঋণ দেবে, কৃষকদের সেচ, সার, বীজ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করবে। কুটির শিল্পের কারিগরদের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপাদন সংগঠিত করা ও তত্ত্বাবধান করা প্রভৃতি কার্যও পরিচালনা করবে। সামাজিক ক্ষেত্রে গ্রামীণ সেবা সমবায়গুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় শক্তিশালী হবে। এইরূপে গ্রামীণ জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক জীবনযাত্রা, গণতন্ত্র ও ব্যাপকতর সমবায় নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হবে।

২৪.৯. পরিকল্পনাকালে সমবায় সম্পর্কে সরকারী নীতি ও অগ্রগতি

Co-operative Movement during the Plan Period : Government Policy and Progress

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা থেকে সরকার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণে অগ্রসর হয়েছে।

১. **প্রথম পরিকল্পনায়** দেশে অর্থনীতিক কার্যাবলীর এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় উদ্যোগ বজায় রেখে পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সমবায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় স্থির হয় যে, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য যে নতুন সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে তার একটি হল গ্রাম পঞ্চায়েত ও অপরটি হল সমবায় সমিতি। এরা পরস্পরের সহায়তায় গ্রামস্তরে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের সহায়ক হবে। ফলে, সমবায় আন্দোলন যাতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য তার পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১ সালে গ্রামীণ ব্যবস্থা ও সমবায়ের ভূমিকা অনুসন্ধান এবং গ্রামীণ ঋণের একটি কাঠামো গঠন সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য মিঃ গোরওয়ালাকে সভাপতি করে সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি নিয়োগ করে। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণভাবে সমবায় আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, কৃষিঋণ দেওয়া এবং নতুন ক্ষেত্রে সমবায় নীতির পরীক্ষা ও সমবায় কর্মিগণের শিক্ষাদানের কিছু ব্যবস্থা ছাড়া ভারত সরকার সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেনি।

২. **দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে** দেশে সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতিক ক্ষেত্র গঠন জাতীয় নীতির প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এই সময়ে সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার সুপারিশগুলির ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলন পুনর্গঠনের কার্যক্রম গৃহীত হয়। গ্রামে ও শহরে সমবায় আন্দোলনের প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে স্যার ম্যালকম ডার্লিংয়ের মতামত প্রকাশিত হওয়ায় সরকার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ স্যার ম্যালকম বৃহত্তর সমিতি গঠন, নব নব ক্ষেত্রে সমবায়ের দ্রুত প্রসার প্রভৃতি নীতির সমালোচনা করেছিলেন। এর পর ১৯৫৮ সালে সমবায় নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গ্রামসমাজকে নিম্নতম সংস্থা ধরে প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রাম বা পল্লী সমবায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তাতে একথাও বলা হয় যে, গ্রামের সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পল্লী সমবায়ের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

৩. **তৃতীয় পরিকল্পনাকালে** এক-একটি গ্রাম নিয়ে নিম্নতম স্তরে এক-একটি প্রাথমিক সমিতি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রকার সমিতির মাধ্যমেই গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতিক বিকাশ সম্ভব বলে সরকার স্থির করে। বর্তমান ভারত সরকার বৃহত্তর সমবায় সমিতি গঠন ও বহুমুখী সমিতির মাধ্যমে ঋণদান ও অন্যান্য কাজের মধ্যে সমন্বয়ের পথই বেছে নিয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই পথেই সমবায় অগ্রসর হয় এবং এর আরও ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ঘটানো হয়।

৪. **চতুর্থ পরিকল্পনায়** কৃষি ও ভোগী সমবায় সমিতিগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ এবং সমবায় ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ১৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

৫. সমবায় ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সরকারী নীতির দরুন দেশে সমবায় প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১'৮ লক্ষ থেকে বেড়ে ২'৯ লক্ষ হয়েছে, সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ১০ কোটি ১০ লক্ষ হয়েছে। শেয়ার পুঁজির পরিমাণ ৪৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১,৯৮৭ কোটি টাকা হয়েছে এবং কার্যকর পুঁজির পরিমাণ ২৭৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯,০৫৮ কোটি টাকা হয়েছে।

৬. সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির মারফত কৃষিঋণ দানের নীতিতে ছোট চাষী ও সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের ঋণের প্রয়োজনীয়তার দিকে বেশি করে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে যে ঋণ দিচ্ছে তার ২০ শতাংশ ছোট চাষী,

প্রান্তিক চাষী ও গরিবদের জন্য নির্দিষ্ট থাকছে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি এখন স্বল্পমেয়াদী এবং মাঝারিমেয়াদী ঋণ দিচ্ছে। ১৯টি রাজ্য সমবায় জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১,৭০৭টি শাখা ও প্রাথমিক সমিতির মারফত ১,৪০০ কোটি টাকার পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিচ্ছে। ১৯৭৯ ৮০ সালে ৩০ ৪৩ লক্ষ ছোট চাষী, প্রান্তিক চাষী ও খেতমজুরকে সমবায় সমিতির মধ্যে এনে ২৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। সমবায় সমিতির মারফত চাষীদের এখন সার, উন্নত বীজ ও কীটনাশক রাসায়নিক বিক্রি করা হচ্ছে। ভারতে মোট সার বিক্রির ৬০ শতাংশ এখন সমবায় সমিতির মারফত ঘটছে।

৭. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পে এখন সমবায় যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। শিল্পে সমবায়গুলির ৯০ শতাংশই হল গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প সমিতি।

৮. কৃষিপণ্য বিক্রির ব্যবস্থায় সমবায় সমিতিগুলি বেশি করে অংশ গ্রহণ করছে।

৯. সমাজের দরিদ্রতর অংশের জন্য গঠিত সমবায় সমিতিগুলি ছোট ও প্রান্তিক চাষী ও জেলেদের জন্য কর্মসংস্থানের ও আয় সৃষ্টিতে বেশি করে উদ্যোগ নিচ্ছে। এজন্য ডেয়ারী, ফিশারী, পোলট্রি প্রভৃতি পরিচালনায় ভার গ্রহণ করছে।

১০. দেশের মধ্যে ভোগ্যপণ্য বণ্টনেও সমবায় সমিতিগুলি এখন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছে।

১১. এ ছাড়া, পঞ্চম পরিকল্পনায় সমবায়ের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচির উপর জোর দেওয়া হয়েছে: পরিকল্পনায় বলা হয়েছে (ক) যে সব কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক ঋণদান সমিতি দুর্বল সেগুলিকে শক্তিশালী করা হবে। (খ যে সব বিপণন সমিতি ও ভোগী সমবায় ভাণ্ডার ন্যূনতম দক্ষতা দেখাতে পারেনি সেগুলির পুনর্গঠন করা হবে। (গ) জাতীয় কৃষি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষক সেবা সমিতি স্থাপন করা হবে। (ঘ) সমবায় সমিতিগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে হবে যাতে ঐগুলি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের এবং সহায়-সম্বলহীন মানুষের সেবা আরো ভালোভাবে করতে উৎসাহী হয়। (ঙ) সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ও সরকারী পণ্যবিপণন সংস্থাগুলির মধ্যে আরো বেশি সমন্বয় সাধন করা হবে। (চ) সমবায় সমিতিগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় আরো বেশি দক্ষতা আনার চেষ্টা করা হবে।

১২. ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য (ক) গ্রামীণ প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সবল করা এবং এ সব সমিতিকে বহু উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে তোলা; (খ) গ্রামাঞ্চলের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের অর্থনীতিক উন্নয়নে সহায়তা করা; (গ) সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ঋণ, সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা; (ঘ) সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মিগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২৪.১০. সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
Community Development Project

১. গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠনের জন্য গ্রামবাসীদের সমর্থন ও সহযোগিতায় বহুমুখী, সর্বাঙ্গীন ও সুসংবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প এই উপলব্ধির ফল।

'সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প' বিষয়টি মার্কিন দেশীয়। সেখানে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই প্রকার প্রচেষ্টা বহুদিন ধরে প্রচলিত। ভারত-মার্কিন সাহায্য কার্যক্রমের দ্বারা ভারতে এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রবর্তিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে ভারত সরকার এটি গ্রহণ করেছে। এর মূল কথা হল, স্থানীয়ভাবে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতম উন্নয়ন সাধন ও ব্যবহার করা।

২. লক্ষ্য: এর লক্ষ্য তিনটি—শিক্ষাগত, অর্থনীতিক ও সামাজিক। ক. শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিবর্তন সাধন। খ. বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক উন্নতি সাধন; গ. জনস্বাস্থ্য, অবসর বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক জীবনের উন্নয়ন দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন সাধন; এই সব কাজের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করা, সমবায় সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যৌথচিন্তা ও যৌথ কার্যকলাপ প্রবর্তন করাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য। সরকার শুধু এতে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দান করে।

৩. আদর্শ: এর মতে দেশের মূল শত্রু তিনটি—দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞতা। জনসাধারণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই তিনটি শত্রু ধ্বংস করে দেশের বৃহত্তম কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আদর্শ।

৪. কার্যক্ষেত্র: প্রথম পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্ষেত্র হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়—

ক. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সেচের প্রসার, উন্নত সার, বীজ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সাহায্য ও উৎসাহদান, পশুপালন, ধান্য রোপণ, ভূমি সংক্রান্ত গবেষণার প্রসার ইত্যাদি। খ. গ্রামবাসিগণের পার্শ্বজীবিকা সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের

পুনরুজ্জীবন, পুনর্গঠন ও প্রসারে উৎসাহ ও সাহায্য দান। গ. সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তারের জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক ও উচ্চতর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন। ঘ. জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠা ও গ্রামাঞ্চলে জল নিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। ঙ. পথঘাটের উন্নতির দ্বারা পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার। চ. গ্রামাঞ্চলে উন্নত ধরনের গৃহাদি নির্মাণের ব্যবস্থা। ছ. স্থানীয় প্রতিভা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচি, ক্রীড়াসূচি, মেলার অনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ও ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি। জ. কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য কর্মিগণের কাজের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষাদান।

৫. **কার্যপদ্ধতি ও উপায়ঃ** গ্রামের সামাজিক ও অর্থনীতিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গ্রামবাসীদের সমর্থন, উৎসাহ, উদ্যোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হবে। এই হল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যপদ্ধতি। তাতে একটি মাত্র সরকারী কর্তৃপক্ষের মারফত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরকারী সাহায্য প্রদান করা হবে। এই সরকারী গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রধানত কৃষিতে কেন্দ্রীভূত হবে এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের সরকারী প্রচেষ্টা হিসাবে থাকবে। এইজাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম নামে পরিচিত। এজন্য বলা হয়েছিল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প হল গ্রামীণ পুনর্গঠনের কার্যপদ্ধতি এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম হল তার উপায় বিশেষ।

৬. **বৈশিষ্ট্যঃ** প্রথমত, এতে গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় অধিবাসিগণের চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়। গ্রামবাসিগণ যাতে নিজেদের চেষ্টায় উন্নতি করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করাই এর কাজ। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট কয়েকটি সীমাবদ্ধ এলাকা নিয়ে এই প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয় এবং সেখানে উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হয়। একসঙ্গে বিরাট এলাকায় উন্নয়ন ভার নেবার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে কাজ আরম্ভ করলে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। তৃতীয়ত, এই প্রকল্প একসঙ্গে গ্রামীণ জীবনের নানা দিকের উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করে। চতুর্থত, এজন্য বহুমুখী উদ্দেশ্যবিশিষ্ট একটিমাত্র সংগঠনের সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং তা যেন প্রত্যেকটি কৃষকের প্রয়োজন সাধন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। পঞ্চমত, এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হয়। সংক্ষেপে এই হল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য।

৭. **প্রকল্পের প্রকারভেদঃ** সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প দুই প্রকারেরঃ ক. বুনিয়াদী গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পঃ ২ লক্ষ অধিবাসী আছে এরূপ ৩০০টি ও প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল নিয়ে একটি করে বুনিয়াদী প্রকল্প সংগঠিত হয়। এতে কৃষির উন্নয়ন কার্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। স্থান বিশেষে ১০০টি গ্রাম নিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বুনিয়াদী প্রকল্পও গঠিত হতে পারে।

খ. **যৌগিক সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পঃ** এই প্রকার প্রকল্পে কৃষি ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে এবং গ্রামাঞ্চলে শহরবাসের বিবিধ সুবিধা প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৮. **সাংগঠনিক রূপঃ** প্রত্যেক প্রকল্প দুটি স্তরে বিভক্তঃ ক. নিম্নস্তরে গড়ে ১০০ গ্রামীণ পরিবার ও তাদের ৫০০ সদস্য নিয়ে এক-একটি ইউনিট গঠন করা হয়। এরূপ প্রত্যেকটি গ্রাম ইউনিটের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয় কাজ পরিচালিত হয়।

খ. উচ্চ স্তরে ১০০টি গ্রাম ইউনিট ও তাদের ৬০-৭০ হাজার অধিবাসী নিয়ে এক-একটি উন্নয়ন ব্লক গঠন করা হয়। আয়তনের দিক দিয়ে এর কাজ ১৫০-২০০ বর্গ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়নে তিনটি করে এরূপ উন্নয়ন ব্লক থাকে। প্রত্যেকটি ব্লকের কেন্দ্র হিসাবে এক একটি আধা-গ্রাম আধা-শহর স্থাপিত হয়। এরূপ এক একটি শহরের অধিবাসী গড়ে ১,০০০ পরিবার বা ৫,০০০ ব্যক্তি। এই শহরগুলি ব্লকের অন্তর্গত চারদিকের গ্রামগুলির প্রাণকেন্দ্রবিশেষ। তাতে ব্লকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকে এবং হাসপাতাল, সাধারণ ও কারিগরী বিদ্যালয়, সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরজীবনের সুবিধা যথা, বিদ্যুৎ, পাকা নর্দমা, পানীয় জলের কল, সুসজ্জিত বাজার প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই থাকে।

৯. **প্রশাসনিক কাঠামোঃ** সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্তঃ ক. সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রতি দশটি গ্রাম ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত একজন করে গ্রামসেবক থাকে।

খ. তার উপর ব্লক পর্যায়ে একজন করে ব্লক উন্নয়ন অফিসার থাকে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য কৃষি, সমবায়, পশুপালন ও কুটির শিল্প প্রভৃতির আটজন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী থাকে। যে সকল রাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা চালু হয়নি সেখানে স্থানীয় পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যগণ ও প্রগতিশীল কৃষক, সমাজসেবী মহিলা, সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর স্থানীয় সদস্যদের নিয়ে একটি ব্লক উন্নয়ন কমিটি ব্লকস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ও

তা কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত। তা না হলে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উপর এই ভার প্রদত্ত হয়।

গ. জেলাস্তরে একজন করে জেলা উন্নয়ন অফিসার থাকে। জেলার সমগ্র উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তদারকী এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে জনসমর্থন আদায় করা তার বিশেষ দায়িত্ব। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের সভাপতি ও সংসদ এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলীর স্থানীয় সদস্য প্রভৃতি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বিধিবদ্ধ জেলা পরিষদ প্রত্যেক জেলায় সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার দায়িত্ব নেয়।

ঘ রাজ্যস্তরে প্রতি রাজ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বোচ্চ কর্তা হল রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার এবং উন্নয়ন কমিটি।

ঙ. সর্বোচ্চ স্তরে আছে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের অধীন সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ। এর কাজ হল নীতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং ব্লকগুলির ব্যয়ের ধরন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধাঁচ স্থির করে দেওয়া। প্রকল্প কাজে পরিণত করার ভার হল রাজ্যগুলির উপর।

১০. **অর্থসংস্থান:** এই প্রকল্পে ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে কারিগরী সাহায্য চুক্তি অনুযায়ী ১৪২৪ লক্ষ ডলার অর্থসাহায্য পেয়েছে। এ ছাড়া মার্কিন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনও কর্মিগণকে কারিগরী শিক্ষাদানকার্যে সাহায্য করেছে।

প্রত্যেক উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন কাজে ব্যয় সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই যে, এই ব্যয়ের একাংশ স্থানীয় জনসাধারণের অর্থের ও শ্রমের দ্বারা নির্বাহ করা হবে। অপর অংশ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তভাবে বহন করবে।

১১. **অগ্রগতি:** ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর ২৭,৩৩৮টি গ্রামের ১.৬৭ কোটি অধিবাসীসহ ৫৫টি প্রকল্প নিয়ে ভারতে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয়।

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে বলবন্তরায় মেহ্‌তা কমিটির (১৯৫৬ সাল) পরামর্শে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

১. বর্তমানে সমষ্টি উন্নয়নের কার্যসূচি ও ব্লকগুলি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক পর্যায়ে পাঁচ বৎসর করে কাজ চলে। দশ বছরের শেষে ব্লকগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে।

২. মেহ্‌তা কমিটির দ্বিতীয় সুপারিশ ছিল যে, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতা ও দায়িত্বের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। এই সুপারিশ গৃহীত হওয়ায় গ্রাম, ব্লক ও জেলা স্তরে—গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিয়ে গঠিত এই তিন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক সংগঠন স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা সমবায় সমিতি ও সরকারের সহায়তায় গ্রাম, ব্লক ও জেলা স্তরে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও তাদের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবে। এই ব্যবস্থাকেই পঞ্চায়েতী রাজ বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক কর্মসূচির জন্য একটি যুক্ত পরামর্শদাতা পরিষদ স্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে কার্যধারা প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে দেশে ৫০৪ আদিবাসী এলাকার ব্লক-সমেত মোট ৪,৮৯৪টি উন্নয়ন ব্লক ছিল। তিনটি পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ৫০১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও পঞ্চায়েতী রাজের জন্য মোট ২৬০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছিল ১২৯.৮ কোটি টাকা।

১২. **সমালোচনা:** সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম দিকে অর্থনীতিক উন্নয়নের পরিবর্তে কল্যাণমূলক কার্যাবলীর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরে ত্রুটি সংশোধন করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হতে থাকে। মেহ্‌তা কমিটির হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্মের এলাকায় খাদ্যের উৎপাদন প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে বলা হয় যে, মোট কৃষি জমির তুলনায় দোফসলী জমির অনুপাত সামান্যই বেড়েছে। উন্নত ধরনের কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার অতি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনাকালেই বলা হয়েছিল যে, উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত প্রতিগ্রামে বা গ্রামসমষ্টিতে একটি করে বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরা উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করবে এবং প্রত্যেক কৃষক পরিবার এদের সভ্য হবে। সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে জানা যায় যে, তদন্তের অন্তর্গত অর্ধেক সংখ্যক ব্লকেই কোনো বহুমুখী সমিতি ছিল না। আর যেখানে ছিল. সেখানেও তাদের মাত্র ২২ শতাংশ ছিল বহুমুখী সমিতি। তা ছাড়া, সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যতটা চেষ্টা করা হয়েছে, তাদের কাজের উন্নতির তেমন চেষ্টা হয়নি। অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষক পরিবারগুলিই সমবায় সমিতি দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

গ্রামীণ শিল্পগুলির উন্নতি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলেও, ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঐগুলির বিশেষ

উন্নতি ঘটেনি। গ্রাম শিল্পমূল্যায়ন কমিটি (১৯৫৯ সাল) বলেছে যে শুধু পরীক্ষামূলক চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কিছু করা হয়নি। একমাত্র খাদি শিল্পের উন্নতির জন্যই বেশি অর্থব্যয় করা হয়েছে। অন্য ক্ষেত্রের জন্য ব্যয়বরাদ্দ অল্প। হস্তচালিত তাঁত শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পের কারিগরগণের শিক্ষাও বিশেষ অগ্রসর হয়নি। শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র ৩৭ শতাংশ বিভিন্ন শিল্পে যোগ দিয়েছে। যে সকল শিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই সরকারী ঋণ পাওয়ার লোভেই স্থাপিত হয়েছে। সমিতিগুলির আয়তন সাধারণত ক্ষুদ্র। কারিগরদের দক্ষতা সামান্যই বেড়েছে।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু ছাত্রদের উপস্থিতি হতাশাজনক।

বয়স্কশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত পরিমাণে সমষ্টি কেন্দ্র, নারী সংগঠন ও যুবসংগঠন স্থাপিত হয়নি। পূর্বস্থাপিত অনেক সমষ্টি কেন্দ্রই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণেও উৎসাহের অভাব দেখা যায়। গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরাও একাজে সমান উৎসাহ নিয়ে যোগ দেয়নি।

১৩. **উপসংহার ঃ** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে মূল্যায়ন করেছে (১৯৬১ সাল) তাতে বলা হয়েছে যে, মোটের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যাবলী সঠিক দিকে পরিচালিত হলেও তা অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তবে পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তনের পর জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

১৪. **অগ্রগতির সর্বশেষ বিবরণ** থেকে জানা যায় কৃষিতে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারে, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি বণ্টনে, জমি উন্নয়নে, পশুপালন, ও গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য (পানীয় জল, জলনিকাশী ব্যবস্থা, প্রভৃতি) সমাজশিক্ষা (বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি), সড়ক নির্মাণ এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছে।

২৪.১১. পঞ্চায়েতী রাজ
Panchayati Raj

১. **উদ্দেশ্য ঃ** পঞ্চায়েতী রাজ হল একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৯ সালে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে, গ্রামীণ জীবনের বিবিধ কাজে গ্রামীণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ হল এর উদ্দেশ্য। পঞ্চায়েতী রাজ সম্পর্কে অশোক মেটা কমিটির (১৯৭৮) এই হল দৃষ্টিভঙ্গী।

২. **তিন-থাকের সংগঠন ঃ** পঞ্চায়েতী রাজ হল গ্রামীণ ক্ষেত্রে স্ব-শাসন ব্যবস্থা। এর কাঠামোটি তিনটি স্তর বা পর্যায়ে বিভক্ত। সবচেয়ে নিচের তলায়, গ্রাম পর্যায়ে হল গ্রাম পঞ্চায়েত। তার উপর তলায়, কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত ব্লক পর্যায়ে হল পঞ্চায়েত সমিতি। তার উপরে জেলা স্তরে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিয়ে হল জেলা পরিষদ। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয় গ্রামবাসীদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। তার সভাপতি ও সহ-সভাপতি হল প্রধান ও উপপ্রধান। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় পঞ্চায়েত সমিতি। আর জেলা পরিষদ গঠিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধানদের নিয়ে এবং স্থানীয় এম. এল. এ. ও এম. পি.-দের নিয়ে। পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গী হল গ্রামের মহিলা, যুবক, চাষী ও কারিগরদের বিভিন্ন সমিতি। অল্প খরচে ও অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের বিবাদ বিসংবাদে ন্যায় বিচারের জন্য গ্রামীণ আদালত বা ন্যায়পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের কৃষি-উৎপাদন, গ্রামীণ শিল্প, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, মাতা ও শিশুর কল্যাণ, এজমালী গোচারণ-ভূমি, পথঘাট, পুকুর, কূপ ইত্যাদির ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ হল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাজের অন্তর্গত।

৩. **ব্যাপ্তি ঃ** পঞ্চায়েতী রাজ একমাত্র মেঘালয় ও ন্যাগাল্যান্ড ছাড়া ভারতের আর সব কয়টি রাজ্যেই সম্প্রসারিত হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম ও পণ্ডিচেরী ছাড়া সর্বত্রই পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তিত হয়েছে। সারা ভারতে বর্তমানে ২,১২,২৪৮ গ্রাম পঞ্চায়েত, ৪,৪৮১টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ২৫২টি জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অল্পদিন হল পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজে তা সফলভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা একদিকে গ্রামীণ সমাজের সামাজিক-অর্থনীতিক পুনর্জাগরণ ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে এনে দিয়েছে।

৪. **দুর্বলতা ঃ** বাস্তবক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার চারটি প্রধান ত্রুটি ধরা পড়েছে। ত্রুটিগুলি হল ঃ

(ক) পঞ্চায়েতগুলি সরকারী অনুদান আদায় করার ব্যাপারে যতটা উৎসাহী, গ্রামের মানুষের কাছ থেকে কর প্রভৃতির মারফত নিজস্ব আর্থিক সম্বল সংগ্রহে ততটা উৎসাহী নয়।

(খ) অধিকাংশ রাজ্যেই ভূস্বামী ও গ্রামীণ ধনীরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির দরুন পঞ্চায়েতগুলি কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থসাধন করছে।

(গ) সরকারী প্রশাসন কর্তাদের সাথে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মনকষাকষি ঘটে। সরকারী কর্মচারীরা

নির্বাচিত গ্রামীণ প্রতিনিধিদের অধীনে কাজ করতে অনিচ্ছুক দেখা যায়।

(ঘ) গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্যের দরুন পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির যেভাবে কাজ করা উচিত সেভাবে তারা কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ, পঞ্চায়েতী রাজের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাস্তব হয়ে উঠছে না।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির সমালোচনামূলক বিচার কর। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সমবায়ের কি ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে?

[Make a critical evaluation of the progress made by the co-operative movement in India. What role has been assigned to co-operation in India's Five-Year Plans ?]

২. ভারতে সমবায় আন্দোলনের ধীর অগ্রগতির কারণ ব্যাখ্যা কর।

[Account for the slow progress of the co-operative movement in India.]

৩. ভারতের সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন কর।

[Make an evaluation of the working of the co-operative movement in India.]

৪. ভারতীয় অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলন যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা নির্দেশ কর।

[Indicate the role that co-operative movement can play in the Indian economy.]

৫. ভারতের সমবায় আন্দোলনের পর্যালোচনা কর। সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি বুঝিয়ে বল।

[Make a critical appraisal of the co-operative movement in India. Analyse the causes of failure of the co-operative movement.]

৬. ভারতের সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

[Write a short note on the community development project as introduced in India.]

৭. ভারতে সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি আলোচনা কর এবং এর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে পরামর্শ দাও।

[C.U. B.Com. (Hons.) 1983]

[Discuss the weaknesses of the co-operative movement in India and suggest measures for its improvement.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. সমবায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর।

[Indicate the notable characteristics of co-operation.]

২. সমবায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র কি কি?

[What are the spheres of economic act vity where co-operation may be of particular use ?]

৩. ভারতের সমবায় সংগঠনের কাঠামো বর্ণনা কর।

[Describe the structure of the co operative organization that exists in India.]

৪. সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্যগুলি কি কি?

[What are the objectives of community development projects ?]

৫. কোন্ সালে ভারতে পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তিত হয়?

[In which year was Panchayati Raj introduced in India ?]

ষষ্ঠ খণ্ড

শিল্পক্ষেত্রের সমস্যাবলী
PROBLEMS OF THE INDUSTRIAL SECTOR

ভারতের শিল্পায়ন
Industrialisation In India

২৫.১. শিল্পায়ন : অর্থ, প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা
Industrialisation : Meaning, Rationale and Role

১. **অর্থ :** শিল্পায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মগুলির ধারাবাহিক পরিবর্তন বোঝায়। এই প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদান হল দুটি : (১) মূল কাঁচামাল ও অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যাদিকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দ্রব্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে উন্নত কারিগরী কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ ; এবং (২) উৎপাদন সংগঠনগুলিতে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার আধুনিক পদ্ধতিগুলি গ্রহণ।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যন্ত্রীকরণ, নতুন শিল্প স্থাপন, নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা, নতুন অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তই এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এর ফলে একই ক্ষেত্রে আগের তুলনায় পুঁজির বিনিয়োগ বাড়ে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। এজন্য শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে পুঁজির প্রগাঢ়তা ও ব্যাপ্তির প্রক্রিয়া বলে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজির প্রগাঢ়তা ও ব্যাপ্তির ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। এর ফলে আয় বাড়ে। এজন্য শিল্পায়নকে উন্নয়ন প্রক্রিয়াও বলা হয়। সামাজিক এবং অর্থনীতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দেশের সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য, রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রকৃতি ও নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি শিল্পায়নের ধরনধারণ, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সময় প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে।

২. **প্রয়োজনীয়তা :** পরিকল্পনা কমিশনের মতে দুটি প্রধান কারণে ভারতে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে : (১ বেশি পুঁজি বিনিয়োগ, অবিরাম উৎপাদন, বেশি শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচের দরুন কৃষির তুলনায় শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি ; এবং (২) কৃষির তুলনায় শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত সঞ্চয় (surplus savings) সংগ্রহ করা সহজতর।

তবে, কৃষি ও শিল্পায়ন পারস্পরিক সম্পর্কহীন বা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। শিল্পায়নের জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো অত্যাবশ্যক। কৃষির

আধুনিকীকরণ না হলে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়নের গতিবেগ বাড়ে না, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না। ফলে, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও প্রয়োজনানুযায়ী বাড়ে না। অন্যদিকে, শিল্পায়নের প্রসার না হলে কৃষিরও খুব বেশি উন্নতি সম্ভব হয় না। কারণ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের জন্য শিল্পায়ন প্রয়োজন। তা ছাড়া আধুনিকীকরণের ফলে কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে সরিয়ে নেবার জন্যও শিল্পায়নের প্রসার দরকার। স্বল্পকালীন দৃষ্টিতে কৃষি ও শিল্পকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়, কারণ একটিকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বেশি দিলে অপরটির জন্য প্রয়োজনীয় সম্বলে হয়ত টান পড়ে। কিন্তু দীর্ঘকালীন বিচারে এরা পরস্পরের পরিপূরক। শিল্পোন্নত বহু দেশের ইতিহাস থেকে দেখা যায় কৃষির উন্নয়ন ঐ সব দেশের শিল্পায়নের প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কৃষি ও শিল্প আসলে পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পের দিক থেকে যত উন্নতই হোক না কেন, কোনো দেশই কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন না করে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না।

কৃষি নানাভাবে শিল্পকে সাহায্য করেঃ (১) নগরাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শিল্পের দরকারী কৃষিজাত কাঁচামাল সরবরাহ করে। (২) কৃষকের হাতে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টির ফলে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী বাজার সৃষ্টি হয়। (৩) বিদেশে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রয়োজনীয় পুঁজিদ্রব্য আমদানি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। (৪) কৃষিজ দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অর্জিত অর্থ মূলধন সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা যায়। আবার শিল্পায়নের সাথে সাথে কৃষির উন্নতি না হলে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে, বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত, মুদ্রাস্ফীতি, নগর ও শহরাঞ্চলের অত্যধিক ও অবাঞ্ছিত সম্প্রসারণ প্রভৃতি কুফল দেখা দিতে পারে। সর্বোপরি, প্রচলিত সামাজিক খাঁচের মধ্যে অস্থিরতা মাথা চাড়া দিতে পারে।

৩. **ভূমিকা**ঃ ভারত সহ সমস্ত অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে উপরোক্ত কারণে শিল্পায়নের গুরুত্ব এত বেড়েছে যে শিল্পায়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমার্থক বলে গণ্য করা হয়। তবে, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক না হলেও, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের গুরুত্ব যে সর্বাধিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ২৫-১ সারণিতে পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের জাতীয় আয়, এবং জাতীয় আয়ে শিল্প, কৃষি ও সেবাক্ষেত্রের অবদানের পার্থক্য সম্পর্কে তথ্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

সারণি ২৫-১ ঃ মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসের অবদান (১৯৭৩-৮৩)

দেশ	মার্কিন ডলারে মাথাপিছু (১৯৮৩) আয়	জাতীয় আয়ে বিভিন্ন উৎসের অবদান (শতাংশ)		
		কৃষি	শিল্প	সেবা
সুইডেন	১২,৪১৭	৩	৩১	৬৬
ফ্রান্স	১০,৫০০	৪	৩৪	৬২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪,১১০	২	৩২	৬৬
জাপান	১০,১২০	৪	৪২	৫৪
ব্রিটেন	৯,২০০	২	৩২	৬৬
মালয়েশিয়া	১,৮৬০	২১	৩৫	৪৪
ভারত	২৬০	৩৬	২৬	৩৮

সূত্র ঃ World Bank, World Development Report, 1985.

সারণির তথ্যে সুস্পষ্ট যে, যে দেশে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান যত বেশি তার মাথাপিছু আয় তত কম। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এসব দেশেই তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং তার উপায়টা হল শিল্পায়ন। 'বাণিজ্যের মারফত অর্থনৈতিক উন্নয়ন' (Growth through trade)—এ কথাটা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বর্তমান যুগে কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মারফত অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, কারিগরী উন্নতি, উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা, কৃষিজাত কাঁচামালের পরিবর্তে কৃত্রিম পদার্থ উদ্ভাবন ও ব্যবহার, চাহিদার বৈচিত্র্য প্রভৃতির দরুন উন্নত দেশগুলি আজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের রপ্তানি বৃদ্ধির হারের (৬·২%) তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি বৃদ্ধির হার (৩·৬%) প্রায় অর্ধেক মাত্র। এই ব্যবধানটি দূর করতে হলে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে নিজেদের অর্থনীতিকে গতিশীল (dynamic) করে তুলতে হবে। তার একমাত্র পথ হল শিল্পায়ন।

একমাত্র শিল্পায়নের দ্বারাই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত সমাবেশ, কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমের বিকল্প কর্মসংস্থান, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বাজারের বৈচিত্র্যসাধন এবং তার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

২৫.২. শিল্পায়নের প্রক্রিয়া
The Process of Industrialisation

১. মানব সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তন ঘটেছে প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে। প্রথম ঃ কোনো রকমে জীবনধারণের পর্যায়; দ্বিতীয় ঃ বাণিজ্যের পর্যায়; তৃতীয় ঃ শিল্পায়নের পর্যায়। এই তিনটি পর্যায় কিন্তু

সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত নয়। একটি পর্যায় থেকে অপরটিকে অনেক সময় সহজে আলাদা করা যায় না। অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথে এরা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে এই স্তরগুলি আবার পাশাপাশিও থাকতে পারে।

২. শিল্পায়নের পর্যায় তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে, নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাথমিক উৎপন্নকে অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যে (অর্থাৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালে) পরিণত করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে, অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা হয়। তৃতীয় স্তরে, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

৩. প্রথম স্তরের কাজ নির্ভর করে দেশের সম্পদের উপর। দ্বিতীয় স্তরের কার্যাবলী বিদেশ থেকে আমদানি করা দ্রব্যের সাহায্যেও সম্পাদন করা যায়। বেশির ভাগ স্বল্পোন্নত দেশেই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শিল্পগুলিকে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে দেশে প্রথম স্তরের শিল্পই শুধু গড়ে উঠেছে সে দেশের উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানী হয়ে যায়। আর, দ্বিতীয় স্তরের শিল্পজাত দ্রব্যাদি সাধারণত নিজ দেশের বাজারের যোগান দিয়ে থাকে। তৃতীয় স্তরের শিল্প গঠন শিল্পায়নের যথেষ্ট উন্নত স্তরেই সম্ভব।

৪. শিল্পায়নের গতি কোন্ দেশে কি রকমের হবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর, সরকারের প্রকৃতি, ক্ষমতা ও নীতির উপর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শিল্পায়ন হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র। কৃষি, খনি, যানবাহন, শক্তি উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিল্পায়নের পরিকল্পনা করতে হয়। অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে শুধু শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা সফল করা যায় না।

২৫.৩. শিল্পায়নের ফলাফল
Effects of Industrialisation

শিল্পায়নের উদ্দেশ্য হল : (১) সাধারণভাবে দেশবাসীর জীবনধারণের মানের উন্নতি করা, এবং (২) মানবিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য কতখানি পূর্ণ হল তা জানার জন্য শিল্পায়নের ফলাফল ভাল করে অনুসন্ধান করতে হয়। শিল্পায়নের ফলাফলকে তাই তিন ভাবে বিচার করা হয় :

(১) অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তন; (২) বৈদেশিক বাণিজ্যের ধাঁচের পরিবর্তন; এবং (৩) সামাজিক ফলাফল।

(১) **অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তন :** শিল্পায়নের ফলে জনসাধারণের পেশার পরিবর্তন ঘটে। কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বাড়ে। এই পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, কর্মহীনতার বিপদ থেকে রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আইনকানুন তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তা ছাড়াও শিল্পায়নের ফলে কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরাঞ্চলে লোক এসে ভিড় করে, শহরের সংখ্যা বাড়ে। ফলে সামাজিক ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানাবিধ বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, দ্রুত শিল্পায়নের ফলে যে হারে শহরাঞ্চলে কলকারখানা গড়ে ওঠে, ঠিক সেই হারে রাস্তাঘাট ও যানবাহন, বাসগৃহ নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী, বিদ্যালয় এবং শ্রমিক ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় অবসর-বিনোদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে না। এর ফলে সামাজিক কল্যাণ গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। আবার শিল্পায়নের ফলে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চল বেশি দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করে। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

২. **বৈদেশিক বাণিজ্যের ধাঁচের পরিবর্তন :** আগে যে সব জিনিস দেশে উৎপন্ন হত না, শিল্পায়নের ফলে তা দেশে উৎপন্ন হলে, বিদেশ থেকে সে সবের আমদানি কমে। অন্যদিকে, অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দেয় (যেমন শিল্পায়নের জন্য পুঁজিদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল, অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম ও অংশ প্রভৃতি)। আমদানির ঝোঁক কমার দিকে না বাড়ার দিকে বেশি হবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে আমদানি-রপ্তানির উপর বিশেষ কোনো বাধা-নিষেধ না থাকলে শিল্পায়নের ফলে প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রীর অর্থাৎ কাঁচামালের আমদানি বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। তা ছাড়া শিল্পায়নের ফলে জাতীয় আয় বাড়বে, ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদাও বাড়বে, সুতরাং বিদেশ থেকে ভোগ্যদ্রব্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি যদি শিল্পায়নের জন্য সংরক্ষণমূলক শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে আমদানি হয়ত কমবে, ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও কমতে পারে। অপরদিকে শিল্পায়নের ফলে যদি আমদানি না কমে তবে জীবনধারণের মান ও উৎপাদনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও বাড়বে।

৩. **সামাজিক ফলাফল :** শিল্পায়নের ফলে এমন কতকগুলি সামাজিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যাতে ঐ সব

বিষয়ে নতুন করে সামাজিক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন : (১) শিল্প প্রসারের ফলে প্রতিযোগিতা-মূলক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাবের সৃষ্টি হয়; এতে গ্রামীণসমাজের স্বাভাবিক ঐক্যবোধ নষ্ট হয়, গ্রামীণ-সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট হয়। শহরাঞ্চল, জাতি এবং বহির্জগতের সাথে গ্রামাঞ্চলগুলি নানান সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। (২) শিল্পায়নের ফলে পুরোনো কুটির ও নানাবিধ কারুশিল্প ধ্বংস হয়। তার ফলে এই সকল জীবিকা থেকে বহু লোক বিচ্যুত হয় এবং চিরাচরিত সামাজিক বিধি, অনুশাসন ও রীতিনীতি বিপর্যস্ত হয়। (৩) শিল্পায়নের ফলে এমন দ্রব্যের উৎপাদন হয় যাতে রোগ ইত্যাদি কমে যায়। ফলে মানুষের আয়ু বাড়ে এবং তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে সাথে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বিবর্তনের বোঝাটা যতদূর সম্ভব লাঘব করা যায়। শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ফলাফল শহরাঞ্চলই বেশি ভোগ করে। ঘনবসতি, বস্তিজীবন, দারিদ্র্য, কর্ম-হীনতা, অপরাধপ্রবণতা, ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদি শহরজীবনের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এসব সমস্যা দূর করার জন্য নতুন ধরনের সংগঠন প্রয়োজন। নানাবিধ আইন প্রণয়ন করে এবং বিভিন্নমুখী সমাজকল্যাণমূলক কাজের ব্যাপক সম্প্রসারণের দ্বারা এ সব সমস্যার অনেকখানি সমাধান সম্ভব। তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ ব্যাপারে খুবই বেশি, একথা বলাই বাহুল্য।

২৫.৪ শিল্পায়নের সমস্যা
Problems of Industrialisation

১. যে কোনো স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পথ হল শিল্পায়ন। দ্রুত শিল্পায়ন হল দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়ন লাভের প্রধান পন্থা। কিন্তু শিল্পায়নের পথটি সমস্যাহীন নয়। শিল্পায়নের সিদ্ধান্ত নেবার পর যে কোনো স্বল্পোন্নত দেশের সামনে শিল্পায়ন সংক্রান্ত যে সব সমস্যা দেখা দেয় এবং যে সমস্যাগুলির সমাধানের উপর শিল্পায়নের অগ্রগতি বিশেষভাবে নির্ভর করে তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

২. প্রথম সমস্যা হল, শিল্পায়ন কতদূরে প্রসারিত করা হবে (extent of industrialisation) এবং তার গতিবেগ (pace of industrialisation) কি হবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক দেশেরই প্রয়োজন অনুযায়ী একটি আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা কতটা সম্ভব তা নির্ভর করে এই উদ্দেশ্যে দেশটি কতটা পরিমাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ দেশ ও বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় তার উপর।

৩. দ্বিতীয় সমস্যা হল, কোন্ কোন্ ধরনের শিল্প (nature of industries) স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে বিকল্পগুলি হল : (ক) বৃহদায়তন শিল্প কিংবা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; (খ) পুঁজিদ্রব্য শিল্প কিংবা ভোগ্যপণ্য শিল্প; এবং (গ) রপ্তানি পণ্য শিল্প কিংবা দেশীয় বাজারে বিক্রয়োপযোগী পণ্য শিল্প। বৃহদায়তন শিল্পে বেশি পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম হয়; ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে পুঁজি লাগে কম কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টির মুনাফা থাকে বেশি। তাই জনবহুল ও স্বল্প পুঁজির দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আকর্ষণ বেশি। কিন্তু শিল্পায়নের জন্য যে ন্যূনতম সংখ্যক বুনিয়াদী শিল্প স্থাপনের দরকার হয় তাতে যেমন পুঁজি বেশি লাগে তেমনি সেগুলি ক্ষুদ্রায়তনের হতে পারে না। সুতরাং ওই দু'রকম শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতেই হয়। তেমনি, শিল্পায়নের জন্য যেমন পুঁজিদ্রব্য শিল্পগুলি অপরিহার্য তেমনি জনসাধারণের চলতি ভোগ যাতে সবিশেষ ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য ভোগ্যপণ্য শিল্প স্থাপনও দরকার হয়। শিল্পায়নের উপকরণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় এক্ষেত্রেও ওই দু'রকম শিল্পের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিচার করে তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। তৃতীয়ত, শিল্পায়নকালে নানান বিদেশী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন দেখা দেয় শিল্পায়নের গতিবেগ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কিংবা সেটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য। এদিকে আমদানি-করা পণ্য ও সেবার দাম শোধ করতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। তাই প্রয়োজনীয় বিদেশীমুদ্রা উপার্জনের উদ্দেশ্যে দেশে রপ্তানি-পণ্য শিল্প স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দেশীয় বাজারে বিক্রয়োপযোগী পণ্য-শিল্প স্থাপনও জরুরী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তাই উভয় প্রকার শিল্পের মধ্যে—অর্থাৎ রপ্তানি-পণ্যশিল্প ও ভোগ্যপণ্যশিল্প—অবস্থানুযায়ী একটা সামঞ্জস্যবিধান না করলে চলে না।

৪. তৃতীয় সমস্যা হল, অর্থনীতিক উন্নয়নের সূত্রপাত এবং অগ্রগতির স্তর বা পর্যায় ও জাতীয় নীতির লক্ষ্য অনুযায়ী শিল্পগুলি সম্পর্কে অগ্রাধিকার (priority) স্থির করা এবং প্রয়োজনমত তার রদবদল করা। তার উপর নির্ভর করবে কোন্ পর্যায়ে কখন কোন্ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ কতটা হবে ইত্যাদি।

৫. চতুর্থ সমস্যা হল, প্রস্তাবিত শিল্পগুলির উপযুক্ত স্থান মনোনয়ন করা (determining location)। এ শিল্পের

কাঁচামালের প্রকৃতি, তৈরী পণ্যের প্রকৃতি, যোগাযোগ ও পরিবহণের সুযোগ, বাজার ও বন্দরের নৈকট্য, বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা এবং দেশের আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনার দ্বারা নতুন শিল্পগুলির স্থান নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২৫.৫. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্পায়নের পথে বাধা Obstacles to Industrialisation in Underdeveloped Countries

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পায়নের পথে বাধাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) অর্থনীতিক পরিবেশ, (২) জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদান, (৩) সামাজিক উপাদান, (৪) প্রশাসনিক ব্যবস্থা, (৫) আন্তর্জাতিক প্রভাব।

১ **অর্থনীতিক পরিবেশ:** স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পায়নের যে বাধাগুলি দেখা যায় সেগুলি হল: এসব দেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য থাকে। শক্তি উৎপাদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে না। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার সংকীর্ণ থাকে। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি মেরামত করার বন্দোবস্ত এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানার অভাবে নতুন যন্ত্র দ্বারা কাজ চালাতে হয়। এতে উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। শিল্পের অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাজে লাগিয়ে উপজাত দ্রব্য তৈরি করার মত প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকে। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পোন্নত দেশে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকে। পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থার অভাবও শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ঋণদানের উপযুক্ত সংগঠনের অভাব থাকে।

২. **জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদানসমূহ:** দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিল্পায়নকে বাধা দেয়। যে উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হয়ে পুঁজিরূপে উৎপাদনের কাজে সাহায্য করতে পারে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে তা সৃষ্টি করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সঞ্চয় কম হয়। জনসংখ্যা বাড়লে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমতে থাকে। এতে মাথাপিছু গড় উৎপাদন কম হয়, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও কম হয় এবং শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

৩. **সামাজিক উপাদান:** স্বল্পোন্নত দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই শিল্পোন্নয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যেমন—ক. বর্ণভেদ ইত্যাদি বিবিধ পুরনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথা শিল্পের নেতা ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাধা দেয়। কারণ এদের দরুন মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম বা উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ ও উৎসাহ থাকে না।

খ. নিরক্ষরতা, শ্রমের গতিশীলতার অভাব, শ্রমিকদের শিক্ষার সুব্যবস্থার অভাব ও স্থায়ী শিল্প-শ্রমিকবাহিনী সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে শ্রম সংক্রান্ত ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দেয়।

গ স্বল্পোন্নত দেশে মুষ্টিমেয় ধনবানের হাতে যে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের জন্য পাওয়া যায় না। বিলাসব্যসনে ও অপচয়মূলক ব্যয়ে সেই অর্থ নষ্ট হয়।

৪. **প্রশাসনিক ব্যবস্থা:** শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচিকে সফল করার জন্য দক্ষ ও সৎ শাসনব্যবস্থা দরকার। কারণ, কার্যসূচি নিখুঁত হলেও শাসনব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে শিল্পোন্নয়ন সফল হতে পারে না। বর্তমান যুগে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সরকারী নীতি ও কার্যক্রমের দ্বারা শিল্পোন্নয়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই প্রভাবিত হয়। তাই যুক্তিবিহীন আকস্মিক বা খামখেয়ালী কোনো সরকারী কাজের ফলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে।

৫. **আন্তর্জাতিক প্রভাব:** শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিকে সাধারণত শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কারিগরী জ্ঞান ইত্যাদি আমদানি করতে হয়। বিদেশের উপর এই নির্ভরতার জন্য শিল্পায়নে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শিল্পোন্নত দেশ শিল্পে অনগ্রসর দেশে এ রকমের যন্ত্র পাঠাতে রাজী না হতেও পারে। আবার, কখনো কখনো অনগ্রসর দেশগুলি যে পরিমাণ পুঁজিদ্রব্য আমদানি করতে চায়, অগ্রসর দেশগুলি সেই পরিমাণ পুঁজিদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা পাঠাতে সক্ষম না হতেও পারে। উপরন্তু, শিল্পোন্নত দেশগুলির যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা এমন হতে পারে যাতে ঐগুলি কেবলমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষেই উপযুক্ত। অনেক সময় 'পেটেন্ট' ইত্যাদির দ্বারা অগ্রসর দেশগুলি অনুন্নত দেশে ঐসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিতে পারে।

২৫.৬. শিল্পায়নের সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ Aids to Industrialisation

শিল্পায়নের সহায়ক ব্যবস্থাগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) দেশীয়, (২) আন্তর্জাতিক।

১. **দেশীয় ব্যবস্থাসমূহ:** ক. দেশের মধ্য থেকে উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান (অর্থাৎ শিল্পের উদ্যোক্তা যন্ত্রপাতি, শ্রম ও দক্ষতা, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান) বৃদ্ধির জন্য কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার, 'শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন' ইত্যাদির ন্যায় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন এবং বেসরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে সরকারী উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

দেশীয় সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ কাঁচামালের গুণগত উন্নতিসাধন, কাঁচামালের মূল্যান্তর কমানোর জন্য কৃষি ও খনির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা—ইত্যাদির দ্বারা কাঁচামাল সংক্রান্ত অসুবিধা দূর করা যেতে পারে।

খ. উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতির জন্য শিল্পায়নের কার্যসূচির মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের যথাযথ স্থান নির্ধারণ করতে হবে। শিল্পের অনগ্রসর দেশে ক্ষুদ্র শিল্প এবং হস্তশিল্প ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে বিভিন্ন আয়তনের শিল্পের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া উচিত। তাতে অর্থনীতিক রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যার তীব্রতা প্রশমিত করা সম্ভব।

গ. সরকারী নীতি: শিল্পায়নের অন্তরায়গুলি দূর করার জন্য পুরাতন এবং নতুন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো, অনুৎপাদনশীল কাজে ফট্‌কাজাতীয় বিনিয়োগ বন্ধ করা, শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদনের উপাদানগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের আয় ব্যয় নীতির পরিবর্তন করা যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা অর্থনীতিতে যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সরকারের ঋণদান সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা উচিত। আমদানি যথাসাধ্য কামানোর জন্য ও রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বৈদেশিক লেন-দেনের উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত উপযুক্ত নীতি গ্রহণের প্রয়োজন। দেশের সম্পদের প্রকৃতি, রপ্তানি দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য, সোনা ও বিদেশী মুদ্রার সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ এবং শিল্পের জন্য দরকারী বিদেশী কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে এ নীতি স্থির করা উচিত। আমদানি কমানোর জন্য বিদেশী আমদানির উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা সাময়িকভাবে সুবিধাজনক হলেও, স্থায়িভাবে তা গ্রহণ করলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। অর্থনীতির সকল দিকের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে, সামঞ্জস্য রেখে, শিল্পোন্নতির উপযুক্ত হার স্থির করে ও তা যাতে সম্ভব হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পায়নের পরিকল্পনা রচনা ও কাজে পরিণত করা প্রয়োজন।

২. আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ: অগ্রসর দেশগুলি স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পায়নে সাহায্য করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমেও স্বল্পোন্নত দেশগুলি শিল্পায়নে অগ্রসর হতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থা কতখানি কার্যকর হবে তা নির্ভর করবে, কি কি দ্রব্য স্বল্পোন্নত দেশগুলি রপ্তানি করে, রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রার কি পরিমাণ আয় হয়, কোন্ দেশের মুদ্রায় ঐ বৈদেশিক আয় উপার্জন হয় এবং বাণিজ্যের শর্ত কি রকম ইত্যাদির উপর।

স্বল্পোন্নত দেশে বিদেশী পুঁজি দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করে এবং বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপাদান আনার ব্যবস্থা করে। অনেক সময় বিদেশী পুঁজি দেশী পুঁজির বিনিয়োগের উৎসাহ সৃষ্টি করে।

বিদেশ থেকে শিল্পক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার আমদানি ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে ক্রমাগতই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই রকম আমদানি দুইভাবে ঘটে—কারিগর, ইঞ্জিনীয়ার এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞদের ঋণ হিসাবে গ্রহণ ও স্বল্পোন্নত দেশের কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিল্পোন্নত দেশে যাবার ব্যবস্থা।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পায়নে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করতে পারে: (১) সরাসরি আর্থিক বা কারিগরী সাহায্য; (২) দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ভাবধারার বিনিময়; (৩) শিল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্পায়নের গতিপথে বিভিন্ন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান; (৪) বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ করপোরেশন (IFC), আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার (IMF) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়।

২৫.৭. প্রাক্-পরিকল্পনাকালে ভারতে শিল্পায়ন Industrialisation in India: Pre-Plan Period

১৮৬০ সাল থেকে ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার যুগ আরম্ভ হয়েছে বলে ধরা হয়। সে সময় থেকে প্রাক্-পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত ভারতের শিল্পায়নের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রথম যুগ: ১৮৬০-১৯১৩। (২) দ্বিতীয় যুগ: ১৯১৪-১৯৩৯। (৩) তৃতীয় যুগ: ১৯৪০-১৯৫০।

১. শিল্পায়নের প্রথম যুগ (১৮৬০-১৯১৩): এই যুগ ভারতের আধুনিক শিল্পায়নের আরম্ভকাল। অধ্যাপক গ্যাডগিল প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজশাসনের কালকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে সাম্রাজ্য বিস্তার, দ্বিতীয় পর্যায়ে সংহতিসাধন ও তৃতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার শুরু হয়। ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা এই তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে, বিশেষত ১৮৬০-১৮৭০ সালে, দেশে ইউরোপীয় পুঁজি ও পরিচালনায় একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্রুত স্থাপিত হতে থাকে। এ সময়ে যে সব শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে তাদের মধ্যে চা, কফি, চটকল শিল্প, তুলাবস্ত্র ও কয়লাখনি শিল্প উল্লেখযোগ্য। ভারতে লোহ-ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত

আরম্ভ হয় আলোচ্যকালের শেষ দিকে। শিল্পায়নের এই প্রথম যুগের শেষে ভারতে যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২·১ লক্ষ (১৯১১ সাল) এবং ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,১১৩। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কম কারখানায় যন্ত্রশক্তি ব্যবহৃত হত।

২. **দ্বিতীয় যুগ (১৯১৪-৩৯)ঃ** শিল্পায়নের এই দ্বিতীয় যুগ নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যে পূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধে-ভারতে শিল্পগুলি অভূতপূর্ব মুনাফালাভে উৎসাহিত হয়। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধকাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শিল্পোদ্যম প্রসারিত হতে থাকে এবং যুদ্ধশেষে অনেকগুলি যৌথ মূলধনী শিল্প কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে নিযুক্ত ভারতের প্রথম শিল্প কমিশন ভারতের শিল্প সম্ভাবনা অনুসন্ধান করে ও শিল্প প্রসারের সুপারিশ করে। ১৯২১ সালে নিযুক্ত প্রথম ফিসক্যাল কমিশন ভারতের শিল্পায়নে সহায়তার জন্য বিচারমূলক সংরক্ষণের সুপারিশ করলে তা গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভারতের টাকার বহির্বিনিময় হারের অস্থিরতা রপ্তানী বাণিজ্যের অসুবিধা সৃষ্টি করে। ১৯২৯ সালে শ্রমিক আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করে। ১৯২৯-৩৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মন্দা ভারতের শিল্পগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করে। ১৯৩৪ সালের পর থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে। এই সময়ে কিছু কিছু নতুন শিল্প স্থাপিত হয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ে ও লৌহ, ইস্পাত, তুলাবস্ত্র, দিয়াশলাই, কাগজ ও কার্ডবোর্ড, খনি-শিল্প, সিমেন্ট, চিনি, কাচ, বনস্পতি, সাবান, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায়। কারখানার সংখ্যা ১৯৩৯ সালে দাঁড়ায় ১১,৬১৩। কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭,৫০,০০০।

৩. **তৃতীয় যুগ (১৯৪০-৫০)ঃ** এই সময়ে স্পষ্টত তিনটি পর্যায় দেখা যায়। প্রথমত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শিল্পগুলিকে উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ দেয়। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতের শিল্পগুলি যুদ্ধের চাহিদা মেটানোর জন্য তাদের সর্বাধিক ক্ষমতা পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ায়। ভারতীয় শিল্পগুলির উৎপাদন এই সময় সর্বোচ্চ হয়। শিল্পগুলি আশাতিরিক্ত ও অভূতপূর্ব মুনাফায় স্ফীত হয়। এই সময়ে লৌহমিশ্রিত এবং অ-লৌহ বিবিধ ধাতুশিল্প, ডিজেল ইঞ্জিন, পাম্প, সেলাই কল, সাইকেল প্রভৃতি শিল্প, বয়ন, চা, তৈল নিষ্কাশন প্রভৃতি শিল্পের যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্প, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন প্রভৃতি রাসায়নিক উৎপাদন শিল্প ইত্যাদি কতকগুলি নতুন শিল্পের গোড়াপত্তন হয়।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। এর প্রধান কারণ পুরান ও ব্যবহারের অনুপযোগী যন্ত্রপাতি এবং যুদ্ধাবসানে আবার বিদেশী প্রতিযোগিতার আবির্ভাব। এর অল্পকাল পরেই দেশবিভাগ, রাজনীতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় শিল্পগুলি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ভারতে বহু বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানার হস্তান্তর হয় এবং অভিজ্ঞ বিদেশী পরিচালক ও শিল্পে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারিবর্গ ভারত ত্যাগ করে।

তৃতীয়ত, ১৯৪৭ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৫১ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত পুনরুন্নতির কাল। এই সময়ে স্বাধীন ভারত সরকার শিল্পগুলির পুনর্বাসন ও উন্নতির জন্য নানাবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য ১৯৪৭ সালে শিল্প-বিরোধ আইন ও কয়লাখনি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন পাস হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রমিক মালিক ও সরকারের মধ্যে তিন পক্ষের বৈঠকে 'শিল্পে শান্তি'র চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শিল্প অর্থ-সংস্থান কর্পোরেশন স্থাপনের আইন পাস হয়; ৭ই এপ্রিল প্রথম সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয়; ৬ই অক্টোবর কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। ফ্যাক্টরী আইন, কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন ও বোনাস আইন পাস হয়। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি বিস্তারিত ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় এবং পরিশেষে ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয়। পরিবহণের উন্নয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং শিল্পে পুরান যন্ত্রপাতি রদবদলের জন্য পুঁজিদ্রব্য আমদানি করা হয়। ফলে শিল্পোৎপাদন পুনরায় বাড়তে থাকে ও পুরান শিল্পের সম্প্রসারণ এবং নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। শিল্পোৎপাদন সূচকসংখ্যা (১৯৪৬ সালে ১০০) ১৯৪৯ সালে ১০৬·৩ ও ১৯৫১ সালে ১১৭·৫-এ পরিণত হয়।

৪. **প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্যঃ** সুদূর অতীত থেকে বিদেশী ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে, অর্থাৎ ভারতে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার উদ্ভবের আগে পর্যন্ত সারা দেশব্যাপী গ্রামীণ ও কুটির শিল্পজাত তুলা ও রেশমবস্ত্র বয়ন এবং হস্ত ও কারুশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্যের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও বাজার ছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার কাল ছিল ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের যুগ। ইংলণ্ডের বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের কাঁচামাল ও বাজারের প্রয়োজনে বিদেশী ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতকে উপনিবেশে

পরিণত করে, ভারতের দেশীয় গ্রামীণ কুটির ও হস্তশিল্প-গুলিকে ধ্বংস করে ফেলে এবং ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহের উৎসে পরিণত করে। ভারত ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিণত হয়। তাদের শাসনের প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসকশক্তি ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের বিরোধিতা করেছে, ভারতীয়দের শিল্পায়নের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে নির্মম ভাবে বাধা দিয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে কিছু কিছু আধুনিক শিল্প স্থাপিত হতে থাকে। ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কয়েকটি মালিকানাধীন আধুনিক শিল্পকে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির সুবিধা দেয়। তার ফলে তুলাবস্ত্র, কাগজ, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি কয়েকটি হাল্কা শিল্পের উন্নতি ঘটে। কিন্তু কোনো বুনিয়াদী, মূলধনী, ভারী শিল্প স্থাপিত হয় না। কারণ বিদেশী সরকার স্পষ্টতঃই তার বিরোধিতা করেছে।

১৯৫১ সাল পর্যন্ত ভারতে যেটুকু সামান্য শিল্প প্রসার ঘটেছে তার মূল বৈশিষ্ট্য তিনটি :

(ক) ভারতবাসীর স্বল্প আয়ের দরুন দেশে যন্ত্রশিল্প-জাত পণ্যের চাহিদা ও বাজার সীমাবদ্ধ ছিল বলে বেশি পুঁজি নির্ভর বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প বিশেষ প্রসারিত হয়নি। তাই অধিকাংশ শিল্প ছিল স্বল্পপুঁজি নির্ভর। সুতরাং শিল্পগুলিতে শ্রমিক পিছু বিনিয়োজিত পুঁজির স্বল্পতা (Low capital intensity per worker) ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(খ) আধুনিক শিল্পগুলি ছিল দুরকমের। একদিকে ছিল অল্প কয়েকটি যন্ত্রনির্ভর বৃহদায়তন শিল্প; অন্যদিকে ছিল সামান্য পুঁজিনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। এই দুয়ের মাঝখানে মাঝারি আয়তনের শিল্পসংস্থা প্রায় ছিলই না। এই কারণে পরাধীন ভারতের শিল্প বিকাশের কাঠামোটি ভারসাম্যহীন (lopsided development) ছিল বলে গণ্য করা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতে যন্ত্রনির্ভর শিল্পগুলিতে নিযুক্ত ১ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ১০ বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯ লক্ষ; বাকি শ্রমিকরা নিযুক্ত ছিল পারিবারিক শিল্প ও ১০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থায়।

(গ) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের প্রাধান্য। ১৯৫৩ সালে ভারতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের ৬২ শতাংশ ছিল ভোগ্যপণ্য, ৩২ শতাংশ ছিল পুঁজিদ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। ভোগ্যপণ্যের যোগান ছিল চাহিদার তুলনায় বেশি; পুঁজিদ্রব্যের যোগান ছিল চাহিদার তুলনায় কম।

২৫.৮. পরিকল্পনাকালে ভারত শিল্পায়ন Industrialisation in India during Plan Period

কার্যত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকেই ভারতে পরিকল্পিত শিল্পায়নের কাল শুরু হয়েছে। প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিকাশের ভিত্তি, অর্থনীতির পরি-কাঠামোর (infra-structure) বিকাশের সহায়ক এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রকৌশলের উদ্দীপক রূপে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে।

১. প্রথম পরিকল্পনাতে (১৯৫১-৫৬) মোট বিনিয়োগের মাত্র ৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল শিল্প ও খনিজের উন্নয়নের জন্য। শিল্পক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের লক্ষ্য কম করে ধরা হয়েছিল, গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল কার্যরত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মদক্ষতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপর। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে এই সময় ৫৫ কোটি টাকা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রায় ২৩০ কোটি টাকা, মোট ২৮৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। সামগ্রিকভাবে এই সময়ে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সালের তুলনায় (১৯৫১ সালের সূচকসংখ্যা ১০০) উৎপাদনের সূচকসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে ১৯৫৬ সালে ১৩২'৬-এ পৌঁছায়। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদন প্রায় ৭০ শতাংশ, শিল্পের কাঁচামালের উৎপাদন ৩৪ শতাংশ ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ৩৪ শতাংশ বাড়ে। মোট শিল্পোৎপাদন বাড়ে ৩৮ শতাংশ। তা ছাড়া, নতুন শিল্প স্থাপন দ্বারা শিল্পের বৈচিত্র্যকরণও ঘটে।

২. দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে (১৯৫৬-৬১) শিল্পায়নের উপর এবং বিশেষত মূল ও ভারী শিল্পের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়। তবে এর সাথে বেসরকারী ক্ষেত্রের যথাযোগ্য ভূমিকাও নির্দিষ্ট হয়। পরিকল্পনা কমিশন শিল্পায়নের পাঁচটি অগ্রাধিকার নির্দেশ করে : লোহ ইস্পাত ও ভারী রসায়ন শিল্পের প্রসার; উন্নয়নমূলক পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন শিল্পের (যথা—অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক মণ্ড, রং ইত্যাদি) প্রসার; চট কল, চিনি ও তুলাবস্ত্র শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্পের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও রদবদল; যে সকল শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হচ্ছিল না তাদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং বিকেন্দ্রিত ভোগ্যপণ্য শিল্পের (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের) উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা যায় মোট বিনিয়োগ (১,৭৮৮

কোটি টাকা) নির্ধারিত লক্ষ্যের (১,০৯৪ কোটি টাকা) অনেক বেশি হয়েছে। তার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটেছে ৯৩৮ কোটি ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ৮৫০ কোটি টাকা। এই বিপুল বিনিয়োগের ফলে শিল্পোৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ১৩২'৬ (১৯৫১ সালে ১০০) থেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ সালে ১৯৪-তে পৌঁছায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্পোৎপাদন প্রতি বৎসর গড়ে ৭ শতাংশ হারে ও মোট ৩৯ শতাংশ বাড়ে। প্রথম দু'টি পরিকল্পনার মোট দশ বৎসরে ভারতে সংগঠিত শিল্পের মোট উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে বলা যায়।

জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণের অভিপ্রায়ে দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে **তৃতীয় পরিকল্পনায়** (১৯৬১-৬৬) শিল্পায়নের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয় গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি সমাপ্ত করা; ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং ও যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যসাধন; মূল কাঁচামাল ও উৎপাদক দ্রব্যের (খনিজ তৈল, অ্যালুমিনিয়াম, জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য) উৎপাদন বৃদ্ধি; এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ, কাগজ, চিনি, বনস্পতি তৈল ও গৃহ-নির্মাণ দ্রব্য প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেশীয় শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ হয়েছিল ১,৭২৬ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্পোৎপাদন গড়ে প্রতি বৎসর ৭% হারে ও মোট ৩৪'২% বাড়ে। লক্ষ্য ছিল প্রতি বৎসর ১১ হারে বৃদ্ধির। তবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, ধাতুদ্রব্য, পরিবহণের সাজসরঞ্জাম, বুনিয়াদী ধাতু, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ও রাসায়নিক শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিতে যথাক্রমে উচ্চহারে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু চিনি ও বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল কম।

৩. **তৃতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী তিন বৎসর** (১৯৬৬-৬৯) তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনার কাজ চলে। এই তিন বৎসরে সরকারী শিল্পক্ষেত্রে মোট ১,৫৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই তিনটি বৎসর ছিল গভীর মন্দার বৎসর (১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল)। এ সময়ের গোড়াতে ১৯৬০ সালের জুন মাসে আবার টাকার মূল্য কমান হয়। এ সকল কারণে এই গোটা সময়টাই ছিল একটা প্রতিকূল সময়। এই তিন বৎসরের মধ্যে প্রথম দুই বৎসর শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় শূন্য ছিল। তবে শেষ বৎসরে কিছুটা উন্নতি শুরু হয়, শিল্পোৎপাদন ৬ শতাংশ বাড়ে।

৪. **চতুর্থ পরিকল্পনায়** (১৯৬৯-৭৪) শিল্প কাঠামোর ভারসাম্যের অভাব দূর করা ও শিল্পে এ পর্যন্ত যে উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব করার উপযোগী করে কর্মসূচি ও নীতি গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারী শিল্পক্ষেত্রে (খনি সহ) প্রায় ৩,৩৩৮ কোটি টাকার মত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে বিনিয়োগ লক্ষ্য ছিল ৩,০৫০ কোটি টাকার পরিমাণ। আর বেসরকারী শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল ২,২৫০ কোটি টাকা। কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল ২৫০ কোটি টাকা। এই বিপুল বিনিয়োগ দ্বারা, যার শতকরা ৬০ ভাগই ঘটবে সরকারী ক্ষেত্রে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে প্রতি বৎসর ৮ থেকে ১২ শতাংশ হারে শিল্পের উৎপাদন বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অগ্রগতি মোটেই আশানুরূপ হয়নি। নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় গোটা চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নয়ন হার হয়েছে বৎসরে গড়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশ করে।

৫. **পঞ্চম পরিকল্পনায়** (১৯৭৪-৭৯) দেশের মূল শিল্পক্ষেত্রের অন্তর্গত শিল্পগুলির (core sector industries) দ্রুত উন্নয়ন এবং রপ্তানী দ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আশা করা হয় পরিকল্পনাকালে বৎসরে গড়পড়তা ৭ শতাংশ হারে শিল্প বিকাশ ঘটবে। কিন্তু খাদ্যশস্য, সার ও তেলের দামের অত্যধিক বৃদ্ধি পঞ্চম পরিকল্পনার ভিত্তিটিকে প্রচণ্ড আঘাত করে। শিল্পের জন্য প্রথমে সরকারী ক্ষেত্রে ৩৭,২৫০ কোটি টাকা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ১৬,১৬১ কোটি টাকা, মোট ৫৩,৪১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতির দরুন (তেলের আকাশছোঁয়া দামের জন্য) ১৯৭৬ সালে পঞ্চম পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ সংশোধন করতে হয়। সংশোধিত পরিকল্পনায় নতুন করে মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ৬৯,৩৫১ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৪২,৩০৩ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য ও ২৭,০৪৮ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়। নির্ধারিত লক্ষ্য ৭ শতাংশ হারে শিল্পায়নের অগ্রগতির বদলে প্রকৃত পক্ষে প্রথম বৎসর ২'৬ শতাংশ হারে, দ্বিতীয় বৎসর ৬ শতাংশ হারে, তৃতীয় বৎসর ৯'৫ শতাংশ হারে এবং চতুর্থ বৎসর ৩'৯ শতাংশ হারে অগ্রগতি ঘটে। এর পর ১৯৮০ সাল থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনা শুরু হয়।

৬. **ষষ্ঠ পরিকল্পনা** (১৯৮০-৮৫)-র খসড়াতে মোট বরাদ্দ ১,৫৮,৭১০ কোটি টাকার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য ৯৭,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। বার্ষিক উন্নয়ন হার হয় ৫'২ শতাংশ।

ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে ক্রুড ও পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য অতিক্রান্ত হয়েছে। কাগজ, বোর্ড, সংবাদপত্রের কাগজ, নানারকমের পলিথিন, ডি এম টি, কৃত্রিম তন্তু, হস্তচালিত তাঁতের কাপড়, মোটর-গাড়ি, ভ্যান, জীপ ও যন্ত্রপাতি শিল্পে উৎপাদন লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। উন্নয়নের উপকরণগুলি মোটামুটি দক্ষভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার বিগত দুটি পরিকল্পনাকালের তুলনায় বেড়েছে।

৭. **সপ্তম পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০)** অর্থনীতি বিকাশের যে রণনীতি বেছে নেওয়া হয়েছে তাতে উপকরণ-সমূহের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ও উন্নত পর্যায়ের কারিগরী কৃৎকৌশল গ্রহণের উপর এবং শিল্পায়নের গতি দ্রুততর করার জন্য শিল্পকাঠামোর বড় রকমের পরিবর্তন ঘটানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে শিল্পদ্রব্যের উৎপন্নের অনুপাত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০০ খ্রীস্টাব্দে ২০ শতাংশে পরিণত হবে।

২৫.৯ পরিকল্পনাকালে শিল্পায়নের গতি ও প্রকৃতি Industrialisation during Plan Period : Progress and Nature

১. ১৯৫০-৫১ সালে অর্থনৈতিক বিকাশ পরিকল্পনার সূত্রপাত থেকে বিগত সাড়ে তিন দশকে ভারতে যে শিল্পায়ন শুরু হয়েছে তার ফলে একদিকে পুরাতন শিল্প-গুলির যেমন উৎপাদন বেড়েছে, তেমনি নতুন নতুন অনেক শিল্পও স্থাপিত হয়েছে। নবস্থাপিত শিল্পগুলির মধ্যে আছে ভারী, বুনিয়াদী ও পুঁজিদ্রব্য শিল্প। ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির দ্বারা রচিত শিল্পবিকাশের রূপরেখা ক্রমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে একদিকে সামগ্রিকভাবে ঘটেছে মোট শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি, যা পাঁচ গুণেরও বেশি হয়েছে। ভারত এখন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বে প্রথম এবং সারা পৃথিবীতে দশম স্থান অধিকার করেছে। পুঁজিদ্রব্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য (intermediate goods) ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদকশিল্পের বিকাশের দরুন শিল্পকাঠামোর অতীত বিকৃতি অনেকাংশে দূর হয়েছে। অনেক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে ভারত এখন স্বনির্ভর হয়েছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের আমদানি হ্রাস ও সম্পূর্ণ অবসান এবং নতুন নতুন শিল্পোৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির মধ্যে দেশের শিল্পবিকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে।

২. **পুরাতন শিল্পগুলির সম্প্রসারণ :** সারণি ২৫-২-এ দেশের পুরাতন শিল্পগুলির অগ্রগতির চিত্রটি দেওয়া হল।

সারণি ২৫-২ : প্রধান কয়েকটি পুরাতন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি

দ্রব্য সেবা		১৯৫০-৫১	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭
কাপড়	কোটি মিটার	৪২১'৫০	১,২৪৯'৮	—
ইস্পাত	লক্ষ টন	১০'০	৯৪'৯০	৯৭ ০
বিদ্যুৎ	কোটি কিলোওয়াট	২৩'০	১৭'০০	১৮'৭৬
কয়লা	লক্ষ টন	৩২৮'০	১৬২৩'০	১৭৫৫'০
সিমেন্ট	„	২৭ ০	৩২০'০	৩৪৮'০

সূত্র : India-Pocket Book of Economic Information, 1971 ; Statistical Outline of India, 1984. Economic Survey, 1986-87, 1987-88.

৩. **নতুন শিল্প স্থাপন :** পুরাতন শিল্পগুলির সম্প্রসারণের পাশাপাশি ঘটেছে নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার। নিচে সারণি ২৫-৩-এ তার নমুনা দেখান হল।

সারণি ২৫-৩ : নতুন শিল্পগুলির উৎপাদন

দ্রব্য/সেবা		১৯৬০-৬১	১৯৮৫-৮৬
মেশিন টুলস্	(কোটি টাকা)	৭	২৯১'৪
কাপড় কলের যন্ত্রপাতি	(„)	১০'৪	৩৬০'১
চিনিকলের যন্ত্রপাতি	(„)	৪'৪	৪২'৬
সিমেন্ট তৈরীর যন্ত্রপাতি	(„)	০'৬	৯৬'২
বাস ট্রাক-টেম্পো	(হাজার)	২৮'৪	১০৩'৩
মোটর গাড়ি জীপ ল্যান্ড রোভার	(হাজার)	২৬'৬	১১৬'৩
কৃষি ট্রাক্টর	(„)	—	৭৬'৩
বিদ্যুৎচালিত পাম্প	(„)	১০৯'০	৫১২'০
সাইকেল	(লক্ষ)	১১'০	৫৫ ৫৩
বৈদ্যুতিক পাখা	(লক্ষ)	১১'০	৫২'০
পাওয়ার ট্রান্সফরমার	(লক্ষ কেভিএ)	১৪'৪	২৭২'৫
রেডিও রিসিভার	(লক্ষ)	০'৩	১১'৬১
নাইট্রোজেন সার	(হাজার টন)	৯৮'০	৪'৩২৮
ফসফেট সার	(„)	৫২'০	১'৪১৭
পেট্রোলিয়াম (ক্রুড)	(কোটি টন)	০'৫	৩'০২
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	(„)	৫'৮	৩'৯৯

সূত্র : Statistical Outline, 1976-84, Tata Services Ltd. Economic Survey, 1986-87.

এই তালিকার শিল্পগুলি প্রধানত পরিকল্পনাকালেই স্থাপিত ও প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া আরও নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪. **শিল্পের মোট উৎপাদনবৃদ্ধি :** শিল্পগুলিকে বুনিয়াদী শিল্প (যথা—খনি, ভারী অজৈব রাসায়নিক, রাসায়নিক সার, লোহ-ইস্পাত এবং বিদ্যুৎ), পুঁজিদ্রব্য

শিল্প (যথা শিল্প-যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, রেলপথের যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ও মোটর যান), মধ্যবর্তী শিল্প (যথা, সুতা তৈরি, পাটদ্রব্য, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য) এবং ভোগ্যদ্রব্য শিল্প (যথা চিনি, চা, কাপড় বোনা, কাগজ প্রভৃতি)—এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভারতে এই চার শ্রেণীর শিল্পর ক্ষেত্রেই অগ্রগতি ঘটেছে। নিচে সারণি ২৫-৪ এ শিল্পোৎপাদনের সূচকসংখ্যার দ্বারা তা দেখান হল।

সারণি ২৫-৪ : শিল্পোৎপাদনের সূচকসংখ্যা

শিল্প	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭০	১৯৮২-৮৩	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭
১. সাধারণ সূচকসংখ্যা						
১৯৫১ = ১০০	১০০	১৮১'২				
১৯৬০ = ১০০		১০৯'২	১৮১'০			
১৯৭০ = ১০০			১০০'০	১৭৩'৮	২০৯'৮	
২. বুনিয়াদী শিল্প						
১৯৭০ = ১০০	—	—	—	—	১৮৪'৭	
১৯৮০-৮১ = ১০০						১৬৩'২
৩. পুঁজিদ্রব্য শিল্প						
১৯৭০ = ১০০	—	—	—	—	২৪৪'৭	
১৯৮০ ৮১ = ১০০						১৬৬ ৩
৪. মধ্যবর্তী শিল্প						
১৯৭০ = ১০০	—	—	—	—	১৮৬ ১	
১৯৮০-৮১ = ১০০						১৪১'৩
৫. ভোগ্যদ্রব্য শিল্প						
১৯৭০ = ১০০	—	—	—	—	১৫৪'৯	
১৯৮০-৮১ = ১০০						১৪৪'৬
(ক) স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য						
১৯৭০ = ১০০	—	—	—	—	১৮১'৬	
১৯৮০-৮১ = ১০০						২৪২'৩
(খ) অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য						
১৯৭০ = ১০০	—	—	—	—	১৫১'৬	
১৯৮০ ৮১ = ১০০						১৩২'৮

সূত্র : India-Pocket Book of Economic Information, 1971, Govt. of India ; Report on Currency & Finance 1985-86. Economic Survey, 1987-88.

সারণি ২৫-৪-এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনাকালে শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে এবং তার মধ্যে বুনিয়াদী শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। তারপরে স্থান নিয়েছে পুঁজিদ্রব্য শিল্প। তুলনায় মধ্যবর্তী শিল্পের অগ্রগতি কম এবং ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের অগ্রগতি সবচেয়ে কম। ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের মধ্যে অস্থায়ী (non-durables) ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের তুলনায়, স্থায়ী (durables) ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছে বেশি।

৫. জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি : পরিকল্পনাকালে শুধু শিল্প বা অর্থনীতির মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মোট উৎপাদনই বাড়েনি, জাতীয় আয়ে (নীট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন) তার অবদানও অনেক বেড়ে গিয়েছে। সারণি ২৫-৫ এ দেখা যাচ্ছে জাতীয় আয়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান ১৯৫০ ৫১ সালে ১৪'৫ শতাংশ থেকে ক্রমশ বেড়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে ২৩ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

৬. শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন : ভারতে শিল্প বিকাশের যে স্ট্র্যাটেজী দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছিল তা হল ভারী শিল্পকে ভিত্তি করে দ্রুত শিল্পায়নের পন্থা। আমদানি-পরিবর্ত সামগ্রীর উদ্ভাবন, উৎপাদন ও প্রবর্তন ছিল এর অন্যতম অঙ্গ। এই নীতির অনুসরণে শিল্পায়নের দরুন, শিল্প কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এখন শিল্পের মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশের

বেশি হল বুনিয়াদী, পুঁজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যসমূহ। ভারী শিল্পে এসেছে স্বনির্ভরতা। ভোগ্যদ্রব্যে দেশ স্বনির্ভর। শিল্প কাঠামোর বিকৃতি দূর হয়েছে। শিল্প কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে।

সারণি ২৫-৫ : জাতীয় আয়ে শিল্প বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান

		শতাংশ
১৯৫০-৫১	···	১৪'৫
১৯৮৪-৮৫	···	২৩

৭. **রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র :** শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরিকল্পনার তিন দশকের শেষে (১৯৭৯-৮০) দেশের মোট রেজিস্ট্রীকৃত কলকারখানার ৬'৫ শতাংশ, নিযুক্ত শ্রমিকদের ২৫'৬ শতাংশ, স্থির পুঁজির ৬৯ শতাংশ, মোট উৎপাদনের ২৪'২ শতাংশ এবং মূল্য সৃষ্টির (value added) ২৮ ২ শতাংশ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের অন্তর্গত। তুলনায় বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ছিল কারখানার ৮১'৪ শতাংশ, নিযুক্ত শ্রমিকদের ৬৮'৬ শতাংশ, স্থির পুঁজির ২৫'৬ শতাংশ, মোট উৎপাদনের ৬৯'৪ শতাংশ এবং মূল্য-সৃষ্টির ৬৬'৫ শতাংশ। পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের (capital-output ratio) বিচারে দেখা যায়, বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতটি প্রায় আড়াই গুণ। এর কারণ হল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রটিতে বুনিয়াদী, পুঁজিদ্রব্য ও ভারী শিল্পগুলিই প্রধান এবং এই-সব শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রীর তুলনায় বেশি পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। অপরপক্ষে বেসরকারী শিল্প-ক্ষেত্রে প্রাধান্য রয়েছে হাল্কা ও ভোগ্যদ্রব্য এবং মধ্যবর্তী দ্রব্য উৎপাদন শিল্পগুলির। এদের ক্ষেত্রে উৎপন্নসামগ্রীর তুলনায় কম পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের দরকার হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের যথেষ্ট সম্প্রসারণ সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্য অব্যাহত রয়েছে।

৮. **কর্মসংস্থান :** ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল গড়পড়তা ৬'৬ শতাংশ। পরবর্তী পাঁচ বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে তা ১'৩ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে দশ বৎসরে তা ২'৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ভারতে জনসংখ্যা ও কর্মপ্রার্থী অর্থাৎ বেকার বৃদ্ধির হারের তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওই হার নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ভারতে পরিকল্পনাকালে যে শিল্পায়ন ঘটেছে তা বেকার সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।

৯. **বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প :** ভারত সরকারের ১৯৭৮-৭৯ সালের তথ্য অনুসারে ভারতের কলকারখানা-গুলির মাত্র ১'৩ শতাংশ (১,১২৩টি) হল বৃহদায়তন। এই সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১ হাজার বা তার বেশি। কিন্তু এই বৃহদায়তন শিল্প সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের ৪৪ শতাংশ নিযুক্ত রয়েছে, শিল্পপুঁজির ৬৮ শতাংশ বিনিয়োজিত রয়েছে, মোট মূল্যসৃষ্টির (value added) ৫৩ শতাংশ এদের দ্বারা ঘটছে। তুলনায় ৫০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প সংস্থা হল মোট কল-কারখানার ৭৯ শতাংশ (৬৯,১৬৭) এবং এদের নিযুক্ত শ্রমিকরা হল ১৫ শতাংশ। মোট বিনিয়োজিত পুঁজির ৬ শতাংশ এই সংস্থাগুলিতে রয়েছে এবং মোট মূল্যসৃষ্টির ৮ শতাংশ এদের দ্বারা ঘটেছে। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে বৃহদায়তন সংস্থা-গুলিতেই বিনিয়োজিত পুঁজি, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তথা অর্থনীতিক ক্ষমতার সর্বাধিক অংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অতএব ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকারী নীতিটি গোটা পরিকল্পনাকালে ব্যর্থ হয়েছে বলা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার দলিলে একথা স্বীকারও করা হয়েছে।

১০. **একচেটিয়া বেসরকারী পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য :** পরিকল্পনাকালে ভারতে শিল্পক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃদ্ধিও সমতালে ঘটেছে। সারণি ২৫-৬-এ তা দেখান হল।

সারণি ২৫-৬ : ভারতে বিধিবদ্ধ বেসরকারী ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ

	১৯৫৭ (মার্চ)	১৯৮৫ (ডিসেম্বর)
মোট কোম্পানির সংখ্যা	২৯,৩৫৭	১১৮,৩০৫
বেসরকারী "	২৯,২৮৩	১১৭,৩০২
আদায়ীকৃত পুঁজি (কোটি টাকা)		
মোট কোম্পানি	১,০৭৮	২৯,০৩৩
বেসরকারী কোম্পানি	১,০০৫	৬,৪৫৬

সূত্র : Statistical Outline of India, 1982, 1986-87 ; Economic Times, April 17, 1985.

বেসরকারী কোম্পানিগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর বেগে ভারতীয় এবং দেশী-বিদেশী যুক্ত মালিকানার বৃহদায়তন একচেটিয়া কোম্পানিগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি, বিত্ত-সম্পত্তি ও ক্ষমতা বেড়ে চলেছে। সারণি ২৫-৭-এ তা দেখা যাচ্ছে।

সারণি ২৫-৭ : সর্ববৃহৎ বেসরকারী একচেটিয়া কারবারী সংস্থাগুলির বিত্ত-সম্পত্তি

	১৯৮০-৮১ (কোটি টাকা)	১৯৮১-৮২ (কোটি টাকা)	বৃদ্ধির হার
২০ কোটি টাকার বেশি বিত্ত-সম্পত্তির মালিক ২৪৭টি বেসরকারী সংস্থার মোট সম্পত্তি	১৩,৩৪০	১৬,৩২৬	২২%

সূত্র : Economic Times, Corporate Sector in India, 1984.

১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে মাত্র ১ বৎসরে এদের বিত্ত-সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে গড়পড়তা ২২ শতাংশ হারে। এদের মধ্যে অনেকেই আইনগতভাবে পৃথক হলেও বাস্তবে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, একই গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন।

২৪৭টি সর্ববৃহৎ একচেটিয়া সংস্থার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বে অবস্থিত কারবারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ হল ২০টি কারবারী গোষ্ঠী। এদের বর্তমান প্রথম পাঁচটি হল, যথাক্রমে টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া, মফতলাল ও রিলায়েন্স টেক্সটাইলস। এই ২০টি সর্বোচ্চ ধনী ও ক্ষমতাশালী একচেটিয়া কারবারী গোষ্ঠীর বিত্ত-সম্পত্তির বৃদ্ধির চিত্রটি সারণি ২৫-৮-এ দেখান হল।

সারণি ২৫-৮ : ভারতের সর্ববৃহৎ ২০টি একচেটিয়া বেসরকারী কারবারী গোষ্ঠীর মোট বিত্ত সম্পত্তির বৃদ্ধি

		কোটি টাকা	বৃদ্ধি হার
১৯৬৩-৬৪	…	১,০২৬	
১৯৬৬-৬৭	…	২,০৮৬	
১৯৭২-৭৩	…	৩,৫১৬	
১৯৭৫-৭৬	…	৪,১১৪	
১৯৮০	…	৭,৪৯১	
১৯৮২	…	১১,২৮৫	৫১%

সূত্র : Economic Times, 14 February, 1977 and Reply to Lok Sobha unstarred question No. 6104 of April 3, 1984.

এই প্রতিপত্তিশালী বেসরকারী ২০টি কারবারী গোষ্ঠীর হাতে বাস্তবিকপক্ষে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। এদের মধ্যে টাটা, বিড়লা ও মফতলাল, এই তিনটি গোষ্ঠীর সম্পত্তি ১৯৬৩-৬৪ সালে ৬৫৮ কোটি টাকা থেকে প্রায় ১০ গুণ বেড়ে ১৯৮৩ সালে ৬,১৯৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। ২০টি সর্ববৃহৎ গোষ্ঠীর মোট বিত্তসম্পত্তি এই তিনটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

১১. উন্নয়নের হার : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পায়নের কর্মসূচী গ্রহণের পর শিল্পায়নের যে গতিবেগ সৃষ্টি হয় তা ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বজায় ছিল। তারপর থেকে গতিবেগ যথেষ্ট পরিমাণে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এখনও পর্যন্ত অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়নি। ডঃ ইশার আলুওয়ালিয়া (Industrial Growth in India) দেখিয়েছেন, ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে শিল্পের মূল্যসৃষ্টির হারটি (growth rate of value added) ছিল বার্ষিক ৭'৬ শতাংশে। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে তা কমে ৫'৫ শতাংশ হয়। শিল্পের উন্নয়ন বা উৎপাদন বৃদ্ধির হারে এই অবনতিটি ভারী শিল্প অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য ও বুনিয়াদী শিল্পেই সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। মধ্যবর্তী দ্রব্য শিল্পে ও ভোগ্যদ্রব্য শিল্পে উন্নয়নের হারটি প্রথম পর্যায়ে যেমন বেশি ছিল না, পরবর্তী পর্যায়ে তেমনি খুব কমেও নি। বস্ত্র এবং খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত শিল্পে আগাগোড়া উন্নয়ন হারটি অতি সামান্য থেকে গেছে (৪.২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ)।

শিল্পায়নের এই স্বল্প হারের সঙ্গে একটানা যে দামস্ফীতি চলেছে, এই সামগ্রিক অবস্থাটাকেই এককথায় 'নিশ্চলতা-স্ফীতি' 'Stagflation' বলা হয়।

শিল্পায়নের এই শ্লথগতি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগকেও বিশেষভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

এজন্য দায়ী বলে যে সব কারণের উল্লেখ করা হয় তা হল : (১) সবুজ বিপ্লব সত্ত্বেও কৃষির যথেষ্ট অগ্রগতির অভাব এবং গ্রামীণ অঞ্চলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতার অভাবে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার স্বল্পতা বা বাজারে সীমাবদ্ধতা; (২) রাষ্ট্রায়ত্তক্ষেত্রে বিনিয়োগের হ্রাস ; (৩) আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধের দরুন শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির অভাব, এবং (৪) দেশে আয় বণ্টনে বৈষম্য।

১২. শিল্পায়নে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা : গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু—এই চারটি হল স্বাধীনতার আগে থেকেই শিল্পোন্নত রাজ্য। অন্ধ্র-প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা—এই পাঁচটি রাজ্যে শিল্পে অগ্রগতি ঘটেছে স্বাধীনতা লাভের পরে। ভারতের বাকি রাজ্যগুলি এখনও শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। গত ১৭ বৎসর ধরে এই বৈষম্য দূর করার জন্য কিছু চেষ্টা হলেও তা এখনও বিশেষ ফলবতী হয়নি।

১৩. শিল্পে রুগ্নতা : সত্তরের দশক থেকে শিল্প সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান রুগ্নতা শিল্পক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে। কেবল চটকল, কাপড় কল, চিনি

শিল্পের মত পুরাতন শিল্প নয়, ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক, সিমেণ্ট, রবার প্রভৃতি নতুন শিল্পগুলিও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আর্থিক দেউলিয়া ও কারখানা বন্ধ করার মধ্য দিয়ে এই রুগ্নতা প্রতিফলিত হচ্ছে। ছোট, বড় মাঝারি সব আয়তনের সংস্থাই এর মধ্যে রয়েছে।

২৫.১০. একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধানী কমিশনের বিবরণ Report of Monoplies Enquiry Commission

১. জাতীয় আয়ের বণ্টন সম্পর্কে অনুসন্ধানে নিযুক্ত মহলানবিশ কমিটির সুপারিশে ১৯৬৪ সালের ১৬ই এপ্রিল ভারতে একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারক শ্রী কে. সি দাসগুপ্তকে সভাপতি করে ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট মনোপলি এনকোয়ারি কমিশন নিয়োগ করে। ১৯৬৫ সালের ২৮শে অক্টোবর এই কমিশন রিপোর্ট পেশ করে।

২. **রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার :** কমিশনের মতে, ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার দু'রকম কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। যথা— (১) পণ্যগত বা শিল্পগত এবং (২) দেশগত।

৩. কমিশনের মতে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ এবং যৌথ মূলধনী কারবারের উৎপত্তি, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা, এক কোম্পানির টাকা অন্যান্য কোম্পানির শেয়ারে লগ্নি করা (অর্থাৎ হোল্ডিং কোম্পানি গঠন), বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানিগুলি কর্তৃক একই গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন লোককে নিজেদের পরিচালক রূপে গ্রহণ, স্বাধীনতার পর দ্রুতবেগে শিল্পোন্নতির জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উপকরণের বণ্টন ও অগ্রাধিকারগুলির ধাঁচ, লাইসেন্স-এর প্রথা ও পদ্ধতি, পুঁজি সংগ্রহের অনুমতি নেবার ব্যবস্থা, বিদেশী মুদ্রার সংকট দূর করার জন্য আমদানি সংকোচনের উদ্দেশ্যে দেশীয় শিল্পপতিদের সংরক্ষণের সুবিধা ও সাহায্য দান, দেশী-বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান-গুলি কর্তৃক বড় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণের অধিক সুবিধা দান, এবং পেটেন্ট আইন—এ সব বিষয় ক্ষমতার কেন্দ্রী-ভবনে অর্থাৎ বেসরকারী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

৪. কমিশন দেখেছে যে, ৭৫টি একচেটিয়া শিল্প-মালিকগোষ্ঠী তাদের মালিকানাধীন কোম্পানীর মাধ্যমে দেশের মোট বেসরকারী ও অ-ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির মোট সম্পত্তির ৪৭ শতাংশের ও মোট আদায়ীকৃত পুঁজির ৪৪'১ শতাংশের মালিক হয়ে বসেছে। এই একচেটিয়া শিল্পমালিকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে টাটা গোষ্ঠী। বিড়লা গোষ্ঠী দ্বিতীয় এবং মার্টিন-বার্ন গোষ্ঠী তৃতীয়।

৫. কমিশন দেখেছে, নিজেদের একচেটিয়া ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের জন্য এরা শিল্প-ক্ষেত্রে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা দেয়। অন্যায্য ও অত্যন্ত চড়া দামে নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে। সুযোগ পেলেই গোপনে পণ্য মজুত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। খুচরা ব্যবসায়ীরা কি দামে পণ্যগুলি বিক্রয় করবে তা এরাই ঠিক করে দেয়। বাজারে যাতে প্রতিযোগিতার দরুন পণ্যের দাম কমে না যায়, সেজন্য এরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা পণ্যের দাম ঠিক করে দেয়। নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক বাজার বাঁটোয়ারা করে নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করেছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে। তাছাড়া তারা আরও অনেক আপত্তিকর কাজের অপরাধেও অপরাধী।

৬. বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন বলেছে, ভারতের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন মন্দ জিনিস। কমিশন আরও বলেছে, বড় বড় কারবারীদের অনুচিত প্রভাবের দ্বারা সরকারী নীতি প্রভাবিত হয়। প্রধান প্রধান শিল্পপতিরা শাসকদলকে মাঝে মাঝে যে অর্থ সাহায্য করে থাকে তা থেকে এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। কমিশন বলে, সকলে না হলেও, কিছু কিছু কারবারী তাদের অর্থ দিয়ে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলে দেশে সম্প্রতি 'অতি ধনী' নামে আর একটি নতুন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। অতল দারিদ্র্যের পাশাপাশি এই বিত্ত ঐশ্বর্যের পর্বতচূড়ায় অবস্থিত ধনী কারবারীদের বিরুদ্ধে এমন এক শ্রেণী-অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে, যাকে লঘু করে দেখা যায় না। অতি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ধনের এই প্রতাপ সমাজের মূল্যবোধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির মর্যাদা হ্রাস করেছে।

৭. অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কুফলগুলির মধ্যে কমিশন চড়া দাম, গুণগত মানের অবনতি এবং ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের প্রতি বিরোধিতা—এই তিনটির উল্লেখ করেছে। তাছাড়া, কমিশন মনে করে, ক্ষুদ্র শিল্পপতি-গণকে শিল্পক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করা হলে দেশে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও বণ্টনে বৈষম্য বাড়বে।

৮. অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের অর্থনৈতিক সুফলের মধ্যে, কমিশনের মতে, প্রথমটি হচ্ছে, এটা সমাজের পুঁজিগঠন বাড়াতে সাহায্য করেছে ও তার মধ্য দিয়ে দেশে

নতুন নতুন শিল্পস্থাপনে সাহায্য করে দেশের অর্থনীতিক উন্নতিতে সহায়তা করেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বড় বড় কারবারীরা দেশের শিল্পগুলির পক্ষে দরকারী উচ্চ পর্যায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্মীর যোগান দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। তৃতীয়টি হচ্ছে, বড় বড় কারবারীরা দেশে বিদেশী শিল্পপতি ও পুঁজি আকর্ষণ করে তার শরিকানায় দেশে অনেক নতুন শিল্প স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

৯. **সুপারিশ :** কমিশন দেশে অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়ামূলক এবং প্রতিযোগিতাবিরোধী আচরণ সংকুচিত করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে : (১) দেশে একচেটিয়া কারবার দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য ও সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য ৩ থেকে ৯ জন সদস্য নিয়ে একটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অথবা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে থেকে এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করা উচিত। অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়ামূলক ও অন্যান্য অপত্তিকর আচরণ সম্পর্কে অভিযোগের অনুসন্ধান করার জন্য কমিশন একজন তদন্ত-পরিচালক নিয়োগ করবে। কমিশনের কাজের সহায়তার জন্য আপত্তিমূলক কার্যাবলী তালিকাবদ্ধ করতে সরকার একজন রেজিস্ট্রার নিয়োগ করতে পারে। (২) নির্বাচনী প্রচারের জন্য কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে রাজনীতিবিদদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করার প্রথা বন্ধ করতে হবে। (৩) সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। (৪) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লাইসেন্স দানের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাতে একচেটিয়া কারবারী নয় এরূপ শিল্পপতি সুবিধা পায়। (৫) আমদানী লাইসেন্সের বিষয়ে সরকারকে এরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন আমদানিকারীরা যথাযথভাবে তাদের আমদানীকৃত দ্রব্যাদি বণ্টন করে। ভোগীদের যাতে একচেটিয়া কারবারীরা শোষণ করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে সরকারকে আমদানি-নীতির রূপদান করতে হবে। (৬) বেসরকারী ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হলে তাকে দমন বা সংকুচিত করার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে তার প্রতিযোগিতামূলক কারবার স্থাপন করা যেতে পারে। (৭) বেসরকারী একচেটিয়া কারবার দমনের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দিতে হবে। (৮) অসৎ ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার জন্য ভোগী সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ দিতে হবে। (৯) সরকারী প্রয়োজনে জিনিসপত্রাদি কেনার সময় এমন নীতি অনুসরণ করা উচিত যাতে ক্ষুদ্র-প্রতিষ্ঠানগুলি উৎসাহিত হয়।

১০. **একচেটিয়া কারবার দমনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা :** ভারত সরকার কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করে লাইসেন্স প্রদান নীতি সংশোধন করেছে এবং ১৯৬৯ সালে একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংকোচনমূলক আচরণ আইন (মনোপলিজ অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাক্‌টিসেস অ্যাক্‌ট) পাস করেছে এবং একটি কমিশন গঠন করেছে। ১৯৬৯ সালে একচেটিয়া পুঁজিকে খর্ব করার অন্যতম উদ্দেশ্যে দেশের ১৪টি সর্ববৃহৎ দেশীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু অতি সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায় এসব সত্ত্বেও একচেটিয়া পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে চলেছে।

২৫.১১. ভারতে অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন Concentration of Economic Power in India

১. ভারতের মতো মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় আয় ও সম্পদের অপবণ্টন এবং একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি ঘটে কিনা তা নিয়ে সারা দেশে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় বণ্টন এবং জীবনযাত্রার মানের স্তর সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য নিযুক্ত মহলানবিশ কমিটি (১৯৬৪) এই সমস্যাটি খানিক পরিমাণে বিচার বিবেচনা করেছিল। কমিটি তার রিপোর্টে ভারতে জাতীয় আয়ের বণ্টনে বৈষম্যের কথা স্বীকার করেছে এবং অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বিরোধী নানা সরকারী বিধিব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারতে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধানী কমিশনের রিপোর্ট (১৯৬৫) এবং শ্রী আর. কে. হাজারীও এই ঘটনা স্বীকার করেছেন।

২. ভারতে বেসরকারী কারবারের বৃদ্ধি ও প্রসারকে কেন্দ্র করেই একচেটিয়া অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। স্বাধীনতার আগে ১৯৩৭ সালে যখন তৎকালীন ভারতের কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়, তখন থেকে এদেশে বেসরকারী কারবারের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে সময় থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত ভারতে সমস্ত গুরুত্ব-পূর্ণ কারবারী সংস্থার মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ৬৩'৫০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১১২'৭৪ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছিল। এবং তার মধ্যে ভারতীয় পুঁজির অনুপাতটি ২৫'৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৭'৩৬ শতাংশে পরিণত হয়েছিল ও বিদেশী পুঁজির অনুপাতটি ৭৪'৩ শতাংশ থেকে কমে ৪২'৬৪ শতাংশে পরিণত হয়েছিল। মোট টাকার অঙ্কে এই সময় ভারতীয় পুঁজি ১৫'৬৯ কোটি টাকা থেকে

বেড়ে ৬৪'৬৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে ১৫টি সর্ববৃহৎ ভারতীয় কারবারী সংস্থার তালিকায় টাটা গোষ্ঠী ছিল প্রথম এবং বিড়লা গোষ্ঠী ছিল দ্বিতীয়। ১৯৪৭ সালে আদায়ীকৃত পুঁজির হিসাবে, টাটা গোষ্ঠীর অংশ মোট পুঁজির দুই-তৃতীয়াংশ (১৯৩৭) থেকে কমে ৩৬'৭৩ শতাংশে এবং বিড়লা গোষ্ঠীর অংশ ১৯'৭ শতাংশ (১৯৩৭) থেকে বেড়ে ৩৩'৮ শতাংশে পরিণত হয়।

৩. মহলানবিশ কমিটির রিপোর্টে বলা হয় ১৯৫১-৫৮ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত বেসরকারী পাবলিক কোম্পানির শেয়ার পুঁজি, নীট পুঁজি ও মোট পুঁজি স্টকের মধ্যে সর্ববৃহৎ ২০টি কারবারী গোষ্ঠীর অংশ যথাক্রমে ৩৭'৯৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৭'৯৬ শতাংশে, ৩৬ ৪৮ থেকে বেড়ে ৪৫'০৫ শতাংশে এবং ৩৭'০৫ থেকে বেড়ে ৪৪'৪৫ শতাংশে পরিণত হয়।

৪. ১৯৬৪ সালে একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধানী কমিশন দেশের ৭৫টি সর্ববৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীর (যাদের মোট সম্পত্তি ৫ কোটি টাকার বেশি) সম্পত্তির একটি হিসাব করে। কমিটির ১৯৬৬ সালে ওই গোষ্ঠীগুলির বৈষয়িক অবস্থার একটি হিসাব করে। তা থেকে দেখা যায় ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে দেশের মোট বেসরকারী কোম্পানিগুলির সর্বমোট সম্পত্তির মধ্যে ৭৫টি সর্ববৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীর সম্পত্তির অনুপাত ৪০'১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৯'২৫ শতাংশ হয়েছে।

৫. সাচার কমিটির রিপোর্টে (১৯৭৮) বলা হয়েছে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে (কোম্পানি) সর্ববৃহৎ ২০টি কারবারী গোষ্ঠীর (যারা এম আর টি পি আইনে রেজিস্ট্রিকৃত) মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,৪৩০ ৬১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪,৪৬৫'১৭ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে এবং শতাংশ হিসাবে তা ২৫'১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৪'৭ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

৬. ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে ভারতে বৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৩ থেকে বেড়ে ৭৫ হয়েছে এবং বৃহৎ স্বতন্ত্র কারবারী সংস্থার সংখ্যা ৯ থেকে বেড়ে ২৬ হয়েছে। এদের উভয়ের মিলিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে ২,৪১২'০৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮,৯৫৫'৭০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। এই সময়ে এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ দু'টি গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা করে। ১৯৬৪ সালে ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক কারবারী গোষ্ঠী ছিল মাত্র ৩টি। ১৯৭৬ সালে এ রকম কারবারী গোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টি। সর্ববৃহৎ ২০টি কারবারী গোষ্ঠীর মধ্যে ১৯৬৪-৭৬ সালে টাটার স্থান ছিল প্রথম এবং বিড়লার স্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু এই সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিড়লা গোষ্ঠীর সম্পত্তি বেড়েছিল ২০২'৯৬ শতাংশ এবং টাটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি বেড়েছে ১৩৪'৭৯ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল মোদী গোষ্ঠীর সম্পত্তি (৯৪৪'২৩ শতাংশ)। তারপর বেড়েছিল কির্লোস্কার গোষ্ঠীর সম্পত্তি (৬৯৭ ৪৪%)। (S. K. Goyal : Monopoly Capital and Public Policy).

৭. ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালের মধ্যে দশটি সর্ববৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,৭৮৩'৮৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬,০১৩'২৮ কোটি টাকা হয়। এদের মধ্যে বিড়লা গোষ্ঠী প্রথম এবং তার সম্পত্তির পরিমাণ ১,৩০৯'৯৯ থেকে বেড়ে ১,৮৫৫'২০ কোটি টাকায় ও টাটা গোষ্ঠী দ্বিতীয়, তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১,৩০৯'৩৮ কোটি থেকে বেড়ে ১,৫৩৮'৯৭ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সালে মধ্যে ওই দশটি সর্ববৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তিতে বিড়লা গোষ্ঠীর সম্পত্তির অনুপাত ২৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশ এবং টাটা গোষ্ঠীর সম্পত্তির অনুপাত ২৭ শতাংশ থেকে কমে ২৫'৫৯ শতাংশ হয়েছে। দশটি সর্ববৃহৎ গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির মধ্যে ওই দু'টি গোষ্ঠীর মিলিত সম্পত্তির অনুপাত ৫৪'৭৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৬'২৭ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

১৯৮২ সালে আবার টাটা গোষ্ঠী প্রথম স্থান (মোট বিত্ত-সম্পত্তি ২,৪০১ কোটি টাকা) অধিকার করে ও বিড়লা গোষ্ঠী দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসে (মোট বিত্ত-সম্পত্তি ২,০০৫ কোটি টাকা)।

৮. ১৯০৩-৪ থেকে ১৯৪৬ ৪৭ সালের মধ্যে ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে বার্ষিক ১'৫ শতাংশ হারে। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে তা বেড়ে বার্ষিক ৭'৩ শতাংশ হয়। পুঁজিবাদী আয়ও ১৯০৩-৪ সাল থেকে ১৯৪৭-৪৮-এর মধ্যে বেড়েছে ৫ ৫ শতাংশ হারে; ১৯৬৬-৬৭ সালে তা বেড়েছে বার্ষিক ৮'৮ শতাংশ হারে। এর সঙ্গে যদি গোপন আয় ধরা হয় তাহলে বোঝা যায়, পুঁজিপতি শ্রেণীর বার্ষিক আয় আরও বেশি হারে বেড়েছে। তবে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সংখ্যাগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও, লাভজনক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের অনুপাত হল মাত্র ০'৮ শতাংশ। উন্নত দেশগুলিতে এই অনুপাত হল ২ থেকে ৩ শতাংশ।

৯. আর. কে. নিগম এবং এন সি. চৌধুরির হিসাবে (Corporation Sector in India) দেখা যায় ১৯৫৭-৫৮ সালে বেসরকারী ক্ষেত্রে অবস্থিত ২৮,২৫৩টি কোম্পানির

শতকরা ৮৮ ভাগের মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল সর্বমোট আদায়ীকৃত পুঁজির মাত্র ১৫ শতাংশ, আর তাদের মধ্যে শতকরা ০'৪ ভাগ কোম্পানির মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল সর্বমোট আদায়ীকৃত পুঁজির ৩৪ শতাংশ। এদের মধ্যে ১ শতাংশ কোম্পানির মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল সর্বমোট আদায়ীকৃত পুঁজির ৫৭ শতাংশ।

১০. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৭৩-৭৪ সালে ১,৬৫০ অনার্থিক বেসরকারী পাবলিক কোম্পানির সমীক্ষা থেকে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা ২২'৪ ভাগ কোম্পানির মোট আদায়ীকৃত পুঁজি হল সর্বমোট আদায়ীকৃত পুঁজির ৭৪'৮ শতাংশ। তাদের মোট উৎপাদন হল সর্বমোট উৎপাদনের ৬৫'৪ শতাংশ। এবং মোট মুনাফা হল সর্বমোট মুনাফার ৭১'৫ শতাংশ। এক দশক আগেও এদের মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল সর্বমোট আদায়ীকৃত পুঁজির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

২৫.১২. ভারতে অর্থনীতিক কেন্দ্রীভবন একচেটিয়া পুঁজি বৃদ্ধির কারণ
Economic Concentration in India: Cause of Growth of Monopoly Capital

১. একচেটিয়া পুঁজি বলতে এখানে পুঁজির বাজারে এমন একটি পরিস্থিতি বোঝানো হচ্ছে যেখানে অল্প কয়েকটি বিরাট কোম্পানি কিংবা বড় কারবারী গোষ্ঠী কোম্পানিরূপে গঠিত বেসরকারী শিল্প পুঁজির একটা বিশিষ্ট অংশ করায়ত্ত করেছে। দেশে এরকম একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ও প্রসার ঘটলে রাষ্ট্রের চরিত্রের উপর এবং সে রাষ্ট্র যে সব সামাজিক অর্থনীতিক আইন প্রণয়ন করে সে সবের উপর তার বিরাট প্রভাব না পড়ে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে দেখা গেছে যে, ভারতে এখন একচেটিয়া পুঁজির উৎপত্তি ঘটেছে এবং তার বিস্তার ঘটেছে।

২. যে সব কারণে এদেশে একচেটিয়া পুঁজির উৎপত্তি ও দ্রুত বিস্তার ঘটেছে তা সরকারের বিপরীত নীতি এবং বারংবার প্রগতিশীল ঘোষণা সত্ত্বেও যে ঘটেছে তা নয়। বরং বলা যেতে পারে, ১৯৪৮ সালে অর্থনীতিক কর্মসূচি কমিটির রিপোর্ট এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে গৃহীত সরকারী নীতিগুলি থেকে ভিন্নতর পদক্ষেপ গ্রহণে উচ্চস্তরের সরকারী সিদ্ধান্তের দ্বারাই তা ঘটেছে। একদিকে যখন সরকারীভাবে বলা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের লক্ষ্য হল অর্থনীতির কর্তৃত্বসূচক অবস্থানটি দখল করা, এবং কংগ্রেস দল ও সংসদ যখন প্রস্তাব নিল দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রের নীতিগুলি পরিচালিত হবে, অন্যদিকে তখনই ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিটি ধীরে ধীরে এমনভাবে পরিবর্তিত হতে থাকল যাতে অর্থনীতিতে বেসরকারী ক্ষেত্রে ভূমিকা আরও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সরকারী নীতি থেকে বিচ্যুতির প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯৪৮ সালে। তৎকালীন বৃহৎ বেসরকারী কারবারী সংস্থাগুলি রাষ্ট্রের অধিগ্রহণের জন্য নেহেরু কমিটির প্রস্তাবটি বিবেচনার কাজ দশ বৎসরের জন্য ধামাচাপা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিচ্যুতির ঘটনা ঘটে ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে 'খ' তপসিলের অন্তর্গত বেসরকারী শিল্প সংস্থাগুলিকে যথারীতি রাষ্ট্রায়ত্ত না করে বজায় থাকতে দেওয়া হয়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি, পুঁজি কিংবা কারিগরী কারণে যে সব বেসরকারী শিল্প সংস্থা একচেটিয়া সংস্থায় পরিণত হতে পাবে তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে কথা ভাবা হয়েছিল সে চিন্তা যদি কর্তৃপক্ষ মহল না বদলাত তাহলে আজ দেশের কোনো শিল্পেই বেসরকারী একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি ঘটত না। আর তাদের যখন থাকতে দেওয়া হলই, তখন তারা দ্রুত বেড়ে উঠবেই, এটাই স্বাভাবিক। অতএব আজ দেশে যে বেসরকারী একচেটিয়া পুঁজির উৎপত্তি ও বিস্তার ঘটেছে তা ঘোষিত সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুতিরই ফলমাত্র। সরকারী উদ্যোগের জন্য নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্রগুলি ধীরে ধীরে বেসরকারী উদ্যোগের জন্য তথা বৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীগুলির জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং তা একচেটিয়া পুঁজির বিস্তারকে ত্বরান্বিত করেছে।

৩. সরকারী ঋণদানকারী সংস্থাগুলি বৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীগুলিকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করেছে। নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহদানের নামে এরা বিভিন্ন শিল্পে উদার হস্তে যে ঋণ দিয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ একচেটিয়া কারবারী গোষ্ঠীকেই সাহায্য করেছে।

৪. কখনও উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে, কখনও উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহারের অজুহাতে, কখনও বা রপ্তানি বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে, সরকারী উদ্যোগের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারী বৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীগুলিকে নতুন শিল্প স্থাপনে শুধু যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাই নয়, সেই সাথে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া বহুজাতিক শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে তাদের কারিগরী ও আর্থিক সাহায্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে, সরকারী অনুমতির বলেই দেশে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া কারবারী জোটের বিস্তার ঘটেছে।

৫. তাছাড়া, একদিকে সরকার কর্তৃক কার্যকর একচেটিয়া কারবার বিরোধী আইন প্রণয়নে অক্ষমতা এবং

অন্যদিকে একচেটিয়া কারবারী গোষ্ঠীগুলির প্রসারে সহায়তার জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল, আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহণও এজন্য সবিশেষ দায়ী।)

২৫.১৩. অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়া পুঁজি দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
Measures for Checking Economic Concentration and Monopoly Capital

(১. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ: কেবল পুঁজিদ্রব্য শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে প্রধানত আবদ্ধ না রেখে, ভোগ্যপণ্য শিল্প প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রেও তার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। তার ফলে একদিকে একচেটিয়া কারবারের শোষণ থেকে ভোগী জনসাধারণ মুক্তি পাবে এবং অন্যদিকে ওই সব শিল্পের মুনাফা অর্থনীতিক উন্নয়নের সম্বল বাড়াবে। এজন্য অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের দক্ষতাও বাড়াতে হবে।

২. বেসরকারী বৃহৎ কোম্পানিগুলিতে সরকারী ঋণদানকারা সংস্থাগুলি যে ঋণ দিয়েছে সেটাকে শেয়ার পুঁজিতে রূপান্তরিত করে বৃহৎ বেসরকারী শিল্পগুলিতে আংশিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করতে হবে। তাতে বেসরকারী একচেটিয়া কারবারী গোষ্ঠীগুলির অনাচার বন্ধ হবে।

৩. মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে এই ক্ষেত্রটিকে সুস্থ ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

৪. সমবায় ক্ষেত্রটিরও সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। তার ফলে শিল্প ও অর্থনীতিক ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হবে।

৫. নতুন শিল্পের জন্য লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে, কোম্পানি আইনের সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিতে এবং একচেটিয়া বিরোধী আইন প্রণয়নে এমন সব কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হয়, বৃহৎ একচেটিয়া কোম্পানিগুলির অনাচার ও দুর্নীতি বন্ধ হয় এবং বেসরকারী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি বিস্তার লাভের সুযোগ না পায়।

৬. শিল্প উদ্যোগকে উৎসাহ দেবার জন্য কর-ছাড় ব্যবস্থাদির সুবিধা কেবল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে দিতে হবে এবং বৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীগুলির কর ফাঁকি বন্ধ করতে হবে।)

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আরম্ভকাল থেকে ভারতে শিল্পায়নের অগ্রগতির একটি মূল্যায়ন কর।

[Make an evaluation of the progress of industrialisation in India since the beginning of the First Five-year Plan.]

২. ১৯৫৬ সাল থেকে ভারতের শিল্পবিকাশের গতি ও ধাঁচের বর্ণনা দাও।

[Give an account of the industrial growth in India since 1956 and indicate the pattern of industrialisation.]

৩. পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

[Describe the main features of industrialisation during the plan period.]

৪. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে দেশে শিল্পায়নের যে ধাঁচ আনা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the pattern of industrialisation that has been introduced in India's Five-year Plans.]

৫. ভারতের শিল্পবিকাশের বর্তমান রূপটি বর্ণনা কর এবং এ ধরনের বিকাশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

[Describe the present pattern of industrial growth in India and explain why the emergence of such a pattern is justified.]

৬ ভারতে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিক বৈষম্য ও অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণ দর্শাও।

[Account for the growing inequality and concentration of economic power in India.]
[C.U.B.Com. (Hons.) 1983]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. 'শিল্পায়ন' কথাটির অর্থ কি?

[What is the meaning of the term 'industrialisation'?]

২ ভারতের অর্থনীতিতে 'স্ট্যাগফ্লেশন' সম্পর্কে টীকা লেখ।

[Write a short note on 'stagflation' in the Indian economy.] [C.U.B.Com. (Hons.) 1984]

৩. 'মনোপলিজ অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট' কি উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছিল?

[What was the principal objective of 'Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (MRTP) legislation?]

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প
Cottage And Small Industry

ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র : সংজ্ঞা ও পরিধি /
ভারতের অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব /
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের টিকে থাকার কারণ /
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের যুক্তি /
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সমস্যা /
পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের
উন্নয়নে সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা /
ক্ষুদ্র শিল্প বসতি /
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা /
পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি /
আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

২৬.১. ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র : সংজ্ঞা ও পরিধি
The Small Industries Sector : Definition and Scope

১. মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, ব্যবহৃত প্রযুক্তিবিদ্যা, উপকরণ ও উৎপন্ন সামগ্রীর প্রবাহ ও পরিমাণ, স্থানীকরণ এবং বিকাশের ঐতিহাসিক পরম্পরা ইত্যাদির দরুন শিল্প বিশেষের যে বিশিষ্ট সাংগঠনিক চরিত্র ও প্রকৃতি দেখা দেয় তার ভিত্তিতেই সাধারণত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে পার্থক্য টানা হয়।

ভারত সরকার নির্ধারিত বর্তমান সংজ্ঞা অনুযায়ী অনধিক ৩৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগকারী শিল্প সংস্থা অথবা বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক রূপে (ancillary) কার্যরত অনধিক ৪৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগকারী শিল্প সংস্থাগুলি হল ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা। এছাড়া অনধিক ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগকারী শিল্প সংস্থা হল অতি ক্ষুদ্র সংস্থা (tiny unity)।

২. ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রটি তিন প্রকারের শিল্প নিয়ে গঠিত, যথা—(ক) ক্ষুদ্র শিল্প, (খ) কৃষি-ভিত্তিক শিল্প এবং (গ) কুটির শিল্প।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলি দুই ধরনের : (১) কতকগুলি হল আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদক সংস্থা। এরা সাধারণত বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্য সুবিধাগুলি ভোগের উদ্দেশ্যে বড় বড় শহরে স্থাপিত হয় এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৃহদায়তন শিল্পের সরবরাহকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে। এদের বাজারটি আঞ্চলিক হতে পারে, দেশব্যাপী হতে পারে, আবার এদের কারো কারো রপ্তানী বাজারও থাকতে পারে। (২) বাকি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি মোটামুটিভাবে আধুনিক পণ্য উৎপাদন করলেও, পুরাতন পদ্ধতিতেই তা উৎপাদন করে। অর্থাৎ এরা প্রধানত শ্রম-নিবিড় (labour-intensive) উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করে। তবে প্রধানত শহর থেকেই এরা কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং শহরেই এদের পণ্যের বাজার রয়েছে বলে এরা শহরাঞ্চলেই স্থাপিত হয়।

কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলি সাধারণত কৃষিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ করে (processing) অথবা কৃষকদের প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। ডেয়ারি, মাছের চাষ, গুটিপোকার চাষ, শুকর পালন,

হাঁসমুরগী পালন, মৌমাছি পালন, ভেড়া ও ছাগল পালন ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক শিল্পের দৃষ্টান্ত। এই শিল্পগুলি মুখ্যত গ্রামীণ শিল্প এবং ধীরে ধীরে একটি নতুন আধা-গ্রাম আধা-শহর (township)-কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলি অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্প কিংবা গ্রামীণ কুটির শিল্প রূপেও বিকশিত হতে পারে।

কুটির শিল্পগুলি গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকায় কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে আলাদা আংশিক কিংবা সারা সময়ী বৃত্তির (occupation) উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এদের বৈশিষ্ট্য হল: কারিগর বা হস্তশিল্পীরা, অন্য কোনো শ্রমিক নিয়োগ না করে, নিজেদের এবং পরিবারের সকলের সাহায্য নিয়ে নিজেদের বাসস্থানে উৎপাদন করে এবং সমস্ত ঝুঁকি নিজেরা বহন করে। এরা নামমাত্র পুঁজি ব্যবহার করে; উৎপন্ন সামগ্রী স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে কিংবা অন্যান্য শিল্পের ফরমাশ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করে। এরা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে। এই শিল্পগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রচলিত রয়েছে। এদের কারিগরী পদ্ধতি পুরাতন ধরনের। এই সব শিল্প উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আয় হল কারিগর ও শিল্পীদের জীবনধারণের উপায়।

২৬.২. ভারতের অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা / গুরুত্ব
Cottage and Small Industries : Role and Importance

১. **উন্নতি ও সম্প্রসারণ:** কর্মসংস্থান, উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি বিবিধ কারণে ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির এবং গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বৃহদায়তন সংস্থাগুলির তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বিদেশী সরকারের যথেষ্ট উৎসাহদানের অভাব সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ক্ষুদ্র কুটির ও গ্রামীণ শিল্পগুলি যথেষ্ট উন্নতি ও সম্প্রসারণ লাভ করেছে:

রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার সংখ্যা ১৯৫০ সালে ১৬ হাজার থেকে ক্রমশ বেড়ে ৮৫-৮৬ সালে ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার হয়েছে। সাধারণ ভোগ্য ও সৌখীন দ্রব্য থেকে এদের উৎপন্ন সামগ্রীর বৈচিত্র্য বেড়ে ইলেকট্রনিক দ্রব্যসামগ্রী ও সাজসরঞ্জাম, ইলেকট্রোমেডিক্যাল দ্রব্যসামগ্রী, টেলিভিশন সেট পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে এরা ৫ সহস্রাধিক বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে।

২. **মালিকানার ধাঁচ:** ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির শতকরা ৬১ হল একমালিকী সংস্থা, শতকরা ৩৫ হল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং ১ শতাংশ হল সমবায় সংস্থা।

৩. **বিনিয়োগ:** ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (SIDO)-র হিসাব অনুযায়ী ওই সংস্থার তত্ত্বাবধানাধীন রেজিস্ট্রীকৃত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিতে বিনিয়োজিত মোট পুঁজি ১৯৭২ সালে ২,২০৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৮ সালে ৪'৪৩১ কোটি টাকার পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালের একটি হিসাবে (Annual Survey of Industries) দেখা যায়, শ্রমিকপিছু ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় ১৬,৫৮২ টাকা, মাঝারি আয়তনের শিল্প সংস্থায় ২৭,৬১০ টাকা ও বৃহদায়তন সংস্থায় ৬৮,৬১৬ টাকার পরিমাণ স্থির পুঁজি লাগে (অর্থাৎ পুঁজি-কর্মসংস্থান অনুপাতটি কম)। সুতরাং মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পে অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করা যায়।

৪. **কর্মসংস্থান:** ১৯৮৬ সালে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিতে মোট ৯৬ লক্ষ (১৯৭২ সালে ছিল ১৬'৫ লক্ষ) এবং গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলিতে ১৯৮১-৮২ সালে মোট ২ লক্ষ ৪২ হাজার ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত ছিল।

৫. **উৎপাদন:** ১৯৮৬ সালে ক্ষুদ্র শিল্পে মোট উৎপন্নসামগ্রীর মূল্য ছিল ৬১,১০০ কোটি টাকা (১৯৭৬ সালে ছিল ১২,৪০০ কোটি টাকা); গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৮১-৮২ সালে ছিল ৬৬৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা (১৯৭০-৭১ সালে ছিল ১১১'৫ কোটি টাকা)।

৬. **রপ্তানি:** ১৯৭৬ সালে ৭৬৬ কোটি টাকা থেকে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির রপ্তানির পরিমাণ ১৯৮৫-৮৬ সালে ২,৫৮০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার মোট রপ্তানী হল ভারতের মোট রপ্তানির ২২'৫ শতাংশের বেশি এবং ভারত বর্তমানে যে সব আধুনিক দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করছে, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার আধুনিক ধরনের রপ্তানী দ্রব্যগুলি হল তার প্রায় ৪০ শতাংশ।

৭. **রাজ্যগত অবস্থা ও স্থানীকরণ:** ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির ৫৯ শতাংশ, কর্মসংস্থানের ৬২ শতাংশ, স্থির-পুঁজির ৬৬ শতাংশ ও মোট উৎপাদনের ৬৯ শতাংশ মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও গুজরাট, এই ছয়টি রাজ্যের অধিকারে রয়েছে। পশম শিল্পের ৯২ শতাংশ পাঞ্জাবে (লুধিয়ানা), তুলার হোসিয়ারি শিল্পের ৮২ শতাংশ তামিলনাড়ু (কোয়েম্বাটুর), পাঞ্জাব লুধিয়ানা), পশ্চিমবঙ্গ (কলিকাতা ও দিল্লীতে). সাইকেলের অংশ ও সাজসরঞ্জামের ৬৩ শতাংশ পাঞ্জাবে (লুধিয়ানা), নাট বল্টুর ৯২ শতাংশ পাঞ্জাবে (জলন্ধর ও লুধিয়ানা), পশ্চিমবঙ্গে (হাওড়া) ও বৃহত্তর বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

২৬.৩ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের টিকে থাকার কারণ Causes of Survival of Small and Cottage Industries

১. **ক্ষুদ্র গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলির টিকে থাকার কারণ:** ভারতসহ সমস্ত স্বল্পোন্নত এবং এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও, বৃহদায়তন শিল্পের বিস্তার সত্ত্বেও, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যে কেবল টিকেই রয়েছে তা নয়, এদের সংখ্যা, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানও দ্রুত বাড়ছে, তার কারণগুলি দুই রকমের।

(ক) **অর্থনৈতিক কারণ:** (১) বৃহদায়তন শিল্প হল বেশি পুঁজি-নির্ভর। সুতরাং বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহে অনেক সময় লাগে। যতদিন তা সংগৃহীত না হচ্ছে এবং উৎপাদন শুরু না হচ্ছে, ততদিন, স্বল্প পুঁজি-নির্ভর হওয়ায়, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি অনায়াসেই টিকে থাকতে পারে।

(২) বৃহৎ শিল্পগুলি যেমন পুঁজি-প্রধান, তেমনি ক্ষুদ্র গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলি শ্রম-প্রধান। এবং কম মজুরিতে এরা সহজেই স্থানীয় শ্রমিককে নিয়োগও করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্প ক্ষুদ্রশিল্পের পক্ষে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

(৩) যে সব ক্ষেত্রে দরকারী কাঁচামালগুলি একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পাওয়া যায় না, উৎপাদন প্রক্রিয়া যে সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিক্ষম নয় এবং দ্রব্যসামগ্রীও যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী উৎপন্ন হয় না, সেসব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বিশেষ উপযোগী।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান উদ্যোক্তারা তাঁদের ঝুঁকি কমানোর জন্য ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাও স্থাপন করে থাকে।

(৫) খরিদ্দারদের বিরলতা কিংবা পরিবহণ খরচের আধিক্য ইত্যাদি কারণে বাজার অনিশ্চিত বা অসম্পূর্ণ হলে বাজারের আয়তন বড় হতে পারে না। বাজারের আয়তন বড় না হলে তা বৃহদায়তন শিল্পের অনুকূল হয় না। ফলে এই ধরনের বাজার (অর্থাৎ যে বাজার বড় নয়) ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়।

(৬) জমি, পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি যেসব উপাদান ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলি ব্যবহার করে তার অধিকাংশই আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। আবার অধিকাংশ ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাই একমালিকী ও অংশীদারী কারবার বলে অবচয়, অবপূর্তি ও হিসাবরক্ষণের নিয়মকানুনগুলি সম্পর্কে এরা অবহিত থাকে না। কিংবা অবহিত থাকলেও সেগুলি মেনে তারা সঠিকভাবে উৎপাদন খরচের হিসাব করে না। খরচের সঠিক হিসাব না করে তারা অপেক্ষাকৃত কম দামে তাদের উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রি করে বৃহদায়তন শিল্পগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে।

(খ) **সামাজিক কারণ:** কেবল অর্থনৈতিক কারণই নয়, ক্ষুদ্র গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলি টিকে থাকার পিছনে কিছু সামাজিক কারণও আছে।

(১) প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ফলাফল নির্বিশেষে ঝুঁকি নেবার একটি সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে।

(২) স্বাধীন বৃত্তি ও জীবিকার আকাঙ্ক্ষা অনেক মানুষকেই বৃহদায়তন শিল্প সংস্থায় চাকুরির দাসত্বের পরিবর্তে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ভূমিকায় আকৃষ্ট করে।

(৩) নিজের জীবিকা ও পরিবারের অন্যান্যদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনেও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা অনেককে আকৃষ্ট করে।

২৬.৪ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের যুক্তি Argument for expansion and development of Small and Cottage Industries

১. গান্ধীজী চিরাচরিত গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের আজীবন প্রচারক ছিলেন। সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের প্রবক্তারও এদেশে অভাব হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর অন্তত একটি সরকারী নীতিসংক্রান্ত দলিলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সপক্ষে স্পষ্ট যুক্তিগুলি উপস্থিত করা হয়েছিল। দলিলটি হল ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব (Industrial Policy Resolution, 1956)। সংক্ষেপে সমস্ত যুক্তিগুলির সারাংশ এই দলিলটিতে এইভাবে উপস্থিত করা হয়েছিল: ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি অনতিবিলম্বে বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে; জাতীয় আয়ের অধিকতর সমবণ্টন ঘটায় এবং পুঁজি ও কারিগরী দক্ষতার এমন এক কার্যকর সমাবেশ ঘটায় যা অন্যথায় অব্যবহৃত থাকত। অপরিকল্পিতভাবে শহরীকরণের দরুন যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়, সারা দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিস্তারের দ্বারা তা অনেকাংশে পরিহার করা যায়। সুতরাং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সপক্ষে চারটি প্রধান যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে: (ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (খ) আয়ের সমবণ্টন; (গ) উপকরণের সদ্ব্যবহার এবং (ঘ) বিকেন্দ্রীকরণ।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টির যুক্তি:** ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ফলে এখন দেখা গেছে ক্ষুদ্রায়তন ও সংশ্লিষ্ট

শিল্পগুলিতে শ্রমিক পিছু উৎপাদনের পরিমাণ সবচেয়ে কম (স্বল্পতম উৎপাদন-শ্রম অনুপাত) হলেও, বৃহদায়তন শিল্প ক্ষেত্রের তুলনায় এই ক্ষেত্রটির কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষমতা ৮ গুণ বেশি। সুতরাং ভারতের মত বিপুল বেকার সমস্যায় প্রপীড়িত স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে স্বল্প পুঁজি-বিনিয়োগের দ্বারা আশু সর্বাধিক সম্ভব কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি সবিশেষ উপযোগী; যদিও সমস্যার দীর্ঘকালীন সমাধানের জন্য এটি উপযুক্ত নয়।

৩. **আয়ের অধিকতর সমবণ্টন:** ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে ক্ষুদ্র কুটির ও গ্রামীণ শিল্পগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল, বৃহদায়তন শিল্প সংস্থাগুলির তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থাগুলিব মালিকানা ও অবস্থিতি অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত এবং বিকেন্দ্রীত বলে এদের আয় সমাজের বৃহত্তর সংখ্যক এবং স্বল্পতর আয়েব জনসমষ্টির হাতে পৌঁছায়, যা বৃহদা·তন শিল্পের আয়েব ক্ষেত্রে ঘটে না।

৪. **অর্থনীতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ:** বৃহদায়তন শিল্প সর্বদাই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয় বলে এদের আয় সমাজের মুষ্টিমেয় অংশেব মধ্যে যেমন কেন্দ্রীভূত হয় এবং একচেটিয়া ক্ষমতার জন্ম দেয়, তেমনি এই ধরনের শিল্প সংস্থাগুলি সাধারণত দেশের অল্প কয়েকটি বড় বড় শহরে ও অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে দেশের শিল্পায়নে আঞ্চলিক ভারসাম্যের অভাব ঘটায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি কিন্তু স্থানীয় উপকরণের উপব নির্ভরশীল বলে দেশেব সর্বত্র স্থাপিত হতে পারে এবং তার ফলে দেশের সমস্ত অঞ্চল শিল্পায়নের সুফল ভোগে সক্ষম হয়। বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়াতে এবং আয়ের ও অর্থনীতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করে।

৫. **স্থানীয় উপকরণের সদ্ব্যবহার:** ক্ষুদ্র, গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলি স্থানীয় অব্যবহৃত সঞ্চয়, উদ্যোগ ও কাঁচামাল এবং শ্রম প্রভৃতি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যবহার করে স্থানীয় চাহিদা পূরণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের কাজ শুরু করতে পারে। এর ফলে স্থানীয় উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার ও স্থানীয় জনসাধারণের আয়, ভোগ ও জীবনযাত্রার মানেব উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৬. **উপসংহার:** ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থাগুলি দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারবে কিনা তা নির্ধারিত হবে এ সব সংস্থা কতটা দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার উপর। তাই দেশে ব্যাপক শিল্পায়নের কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদের রক্ষা করা এবং এদের উন্নয়নের নানারূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান ও অসুবিধাগুলি দূর করাই সরকারী নীতি হওয়া উচিত।

২৬.৫. কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সমস্যা Problems of the Cottage and Small Industries

ভারতের অর্থনীতিক জীবনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও যে সব সমস্যা ও অসুবিধার জন্য এই শিল্পের যথাযোগ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না তা হল:

১. স্বল্পোন্নত দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও **পুঁজির সমস্যা তীব্র।** শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য শিল্পীরা মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে এমন শর্তে ঋণ সংগ্রহ করে যাতে নিজেরাই সর্বস্বান্ত হয়। সমবায় সমিতির নিকট থেকে প্রাপ্ত অতি নগণ্য সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয় না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি এই সকল শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে অনিচ্ছুক। অন্যদিকে সরকারী সূত্র থেকে অর্থসাহায্য ও ঋণপ্রাপ্তির ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল।

২. **উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার অভাবে** কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতীয় কারিগররা পুরাতন যন্ত্রপাতি নিয়েই কাজ চালাতে বাধ্য হয়। তাদের উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশলও যুগোপযোগী নয়। যে কারিগরী জ্ঞান ও শিল্পদক্ষতা নিয়ে ভারতীয় শিল্পীরা কাজ করে তা দিয়ে এই শিল্পে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩. **উপযুক্ত কাঁচামাল সুবিধামত দরে সংগ্রহ করা** একটি সমস্যা। উৎকৃষ্ট কাঁচামাল না পেলে উচ্চমানের দ্রব্য উৎপাদন করা যায় না। ফলে বিক্রয়ের অসুবিধা দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সাধারণত কৃষি ও বৃহৎ শিল্পগুলি যোগায়। ঐ কাঁচামাল ক্রয় বিক্রয়ের সাথে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা সংশ্লিষ্ট থাকে বলে কুটির শিল্পীরা অনেক অসুবিধা ভোগ করে।

৪ **কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের অসুবিধা** কারিগরদের আর একটি সমস্যা। মহাজন কিংবা ব্যবসায়ীর কাছে সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করবে এই রকম শর্তেই কারিগররা অনেক সময় ঋণগ্রহণ করে। আবার মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা বিপণনের বিভিন্ন স্তরে সংযুক্ত থেকে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে উৎপন্নের ন্যায্য মূল্য থেকে উৎপাদকরা বঞ্চিত হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্ধারণ এবং তদনুযায়ী নমুনা ঠিক করার ব্যাপারেও ভারতীয় কারিগরদের অসুবিধা রয়েছে। ফলে দেশী ও বিদেশী বাজারের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়ের পরিমাণ আশানুরূপ বাড়ছে না।

৫. **বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য হেরে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যও পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে।**

৬. **কুটির শিল্পজাত পণ্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর** পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত স্থানীয় কর (চুঙ্গি) এর অন্যতম সমস্যা। এই কর ক্রেতাগণের পরিবর্তে বিক্রেতা অর্থাৎ উৎপাদকগণকেই বহন করতে হয়।

৭. বিদ্যুৎ সমস্যা বর্তমানে ভারতের সর্বত্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অন্যতম মুখ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সর্বত্রই বিদ্যুৎ-এর কমবেশি রেশনিং চলেছে। ফলে, এদের উৎপাদন ক্ষমতার একটা অংশ অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে এবং তার ফলে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। বৃহৎ শিল্পগুলির অর্থবল রয়েছে। তারা নিজেদের জেনারেটিং সেট বসিয়ে বিদ্যুতের অভাব দূর করছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সম্বলের অভাবে তা পারছে না।

৮. সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির সমস্যাও একটা গুরুতর সমস্যা। শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় শুধু কম নয়। সে সাহায্য পাবার ব্যাপারে সরকারী বিধিনিয়ম ও লাল ফিতার কবলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি জড়িয়ে যায়। বৃহৎ শিল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ওই সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধাগুলি নিজেরা নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে বঞ্চিত করে।

৯. তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির সমস্যাও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। বর্তমানে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে যে বৈচিত্র্য ঘটেছে তার পিছনে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এরা প্রধানত শ্রমনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে কম খরচে উৎপাদন করে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য বেচতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু নিজেরা যথেষ্ট পরিমাণে সংগঠিত নয় বলে রপ্তানির সুযোগ-সুবিধাগুলি পুরোপুরি ভোগ করতে পারছে না।

১০. রুগ্নতা ও অকাল মৃত্যুর সমস্যা হল কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অন্যতম গুরুতর সমস্যা। এদের অধিকাংশই রুগ্ন ও প্রান্তিক সংস্থা। কাঁচামাল অথবা পণ্যের বাজারে দরের সামান্য হেরফের হলেই কিংবা শ্রম-বিরোধ খানিকটা প্রলম্বিত হলেই এদের নাভিশ্বাস ওঠে এবং বিপুল সংখ্যায় এদের বিলোপ ঘটে।

এ সব সমস্যার সমাধানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয়নি বলে প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজন মত সম্প্রসারণ ঘটেনি।

২৬.৬ পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়নে সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা

Govt. Policy and Measures for Development of the Cott ge and Sma'l Industries in the Plan Period

১. **সরকারী নীতি :** ক্ষুদ্র, গ্রামীণ ও কুটির শিল্প যে কোনো দেশের অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই অর্থনীতিক সত্যটির প্রথম সরকারী স্বীকৃতি মিলেছিল ১৯৭৮ সালের প্রথম শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে। তারপর থেকে বারংবার বিভিন্ন সরকারী নীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে এটি সমর্থিত হয়। স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারী শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচিতে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির দায়িত্ব আরোপ করা হয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর। এই নীতিও লক্ষ্যের অনুসরণের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপযুক্ত বিকাশের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করে।

২. **গৃহীত ব্যবস্থা :** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য গৃহীত সরকারী বিধি ব্যবস্থাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি এবং (খ) সাহায্যদান ব্যবস্থা।

৩ **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি :** ক্ষুদ্র, গ্রামীণ ও কুটির শিল্প হল রাজ্যসরকারের অন্তর্গত বিষয়। সুতরাং এদের বিকাশের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে সহায়ক ব্যবস্থা প্রদানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ রূপে রয়েছে ডিরেক্টার অব ইণ্ডাস্ট্রিজ। ডিরেক্টারের অধীনে রয়েছে আঞ্চলিক এবং জেলা অফিসার ও ব্লকস্তরে রয়েছে সম্প্রসারণ শাখার কর্মিবৃন্দ।

কিন্তু রাজ্যসরকারের প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো ছাড়াও অতিরিক্ত সহায়ক কাঠামোরূপে রয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রকের অধীনে রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কমিশনারের পরিচালনাধীনে ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশ সংস্থা (SIDO)। এর কাজ হল ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশের জন্য নীতি নির্ধারণ, সংযোজন ও অগ্রগতির তদারকি করা। ২৫টি ক্ষুদ্র শিল্প সেবা সংস্থা (SISI), ১৮টি শাখা সেবা সংস্থা, ৪১টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ৪টি আঞ্চলিক টেস্টিং সেণ্টার মারফত ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশ সংস্থা কারিগরী, অর্থনীতিক ও ব্যবস্থাপনাগত পরামর্শ দেয়। এ বিষয়ে আরেকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হল জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (NSIC)। এর প্রধান কাজ হল ভাড়া-ক্রয় শর্তে ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিকে

যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, কাঁচামাল সংগ্রহে সাহায্য করা এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ে সহায়তা করা।

রাজ্যস্তরে প্রতি রাজ্যে রয়েছে রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন। এর কাজ হল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল বণ্টন করা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ সংগ্রহে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পুঁজি (seed capital) ও ঋণের মার্জিন স্বরূপ টাকা (margin money) দেওয়া, শিল্প বসতি (industrial estate) স্থাপন করা, ক্ষুদ্র শিল্প স্কীম প্রস্তুত করা ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

কুটির শিল্পের জন্যও কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য রয়েছে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড। কেন্দ্রে একজন ও প্রতি রাজ্যে একজন করে ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার রয়েছে। অনেক রাজ্যে একটি করে হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন স্থাপিত হয়েছে। এরা সাধারণ ব্যক্তিগতভাবে কর্মরত তাঁতকর্মীদের সাহায্য করে। সমবায় তাঁত শিল্পগুলির জন্য প্রতি রাজ্যে রয়েছে এপেক্স সমবায় সংস্থা। সমবায় তাঁত ক্ষেত্রের উৎপাদনে ও তৈরী কাপড় বিক্রয়ে সাহায্য করা হল এদের কাজ।

খাদি এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন গ্রামীণ শিল্পের জন্য রয়েছে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশন (KVIC)।

বিবিধ হস্তশিল্পের জন্য স্থাপিত হয়েছে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌স্‌ বোর্ড। এর কতকগুলি আঞ্চলিক অফিস, কারিগরী ও বিক্রয় সাহায্য কেন্দ্র রয়েছে। রাজ্যগুলিতেও অনুরূপভাবে রয়েছে রাজ্য হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্‌স্‌ ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সি। এরা কাঁচামাল সংগ্রহে ও তৈরী দ্রব্য বিক্রয়ে শিল্পী ও শিল্পী সমবায়গুলিকে সাহায্য করে।

রেশম ও নারিকেল কাতা (coir) শিল্পের উন্নয়নের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড ও নারিকেল কাতা বোর্ড।

অর্থসংস্থান : ক্ষুদ্র, গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলির অর্থসংস্থানে সহায়তার জন্য অনেকগুলি সংস্থা কাজ করছে। বিশেষ বিশেষ সংস্থা মারফত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তাদান ব্যবস্থা ছাড়াও রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সহ সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাঠামো, রয়েছে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন এবং রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি।

জেলা শিল্পকেন্দ্র ও কেন্দ্রস্বরূপ কারখানা (District Industries Centres and Nucleus Plants) : আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন সংস্থা এবং কুটির শিল্প স্থাপনকারী ছোট উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আগে ও বিনিয়োগের পরবর্তীকালে ঋণ, কাঁচামাল, প্রশিক্ষণ, পণ্যবিক্রয় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে সামগ্রিক সাহায্য (Package assistance) দানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের মে মাসে জেলায় জেলায় জেলা-শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। এরা একদিকে ডেভেলপমেণ্ট ব্লকগুলির সঙ্গে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের জন্য স্থাপিত বিশিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখে কাজ করে। ১৯৮১র মার্চ মাস পর্যন্ত সারা দেশের ৪০৬টি জেলার মধ্যে ৩৯২টি জেলায় এই কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়।

'পশ্চাৎপদ' বলে চিহ্নিত জেলা শিল্পের কেন্দ্রস্বরূপ কারখানাগুলি স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় ১৯৮০ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে। সহায়ক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পসংস্থাগুলির (ancillary units) উৎপন্ন দ্রব্যগুলি একত্রিত করা (assembling), বিস্তৃত ধরনের বিনিয়োগ (widely spread pattern of investment) সুনিশ্চিত করা এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থাগুলির প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নয়ন হল এর উদ্দেশ্য।

৪. **সহায়তাদানের কর্মসূচি :** ক্ষুদ্র, গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলিকে সরকার দুই ভাবে সাহায্য করে। প্রথমত, কতকগুলি বিষয়ে বৃহদায়তন শিল্পের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সাহায্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, সরাসরিভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে নানারূপ সাহায্য করা হয়।

(ক) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বৃহদায়তন শিল্পগুলির উপর তিন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে : (১) কতকগুলি পণ্য উৎপাদন ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে ৪৭টি পণ্য উৎপাদন ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত করে এই নীতিটি প্রবর্তিত হয় ; ১৯৮২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত পণ্য উৎপাদন তালিকাটিতে ৮৪৩টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (২) ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিতে শ্রমনির্ভর উৎপাদন কৌশল যাতে সম্প্রসারিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে কাপড়কল প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। (৩) শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাবার জন্য ৫ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহরে নতুন শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স না দেবার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) সরাসরিভাবে ক্ষুদ্র-ও কুটির শিল্পগুলিকে যে সব সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তা হল : (১) ভৌত সাহায্য (Physical assistance)—কারখানা বাড়ি, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্তকাঠামোগুলি একস্থানে একত্রিত হলে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি বাহ্য ব্যয়সংকোচের

সুবিধাগুলি যাতে ভোগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সাল থেকে সমস্ত রাজ্যে মনোনীত স্থানে শিল্প বসতি স্থাপিত হচ্ছে। সাধারণত ৫ হাজারের কম জনবসতির গ্রামীণ এলাকায় এবং ৫ হাজারের বেশি ও ৫০ হাজারের কম জনবসতির আধা শহরাঞ্চলে শিল্প বসতি স্থাপিত হয়।

(২) কারিগরী সাহায্য—উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি-বিদ্যাহীন ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের নতুন ধরনের পণ্য উৎপাদন, নতুন প্রকৌশল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালনা, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্যদানের কাজটি রাজ্য শিল্প অধিকার, ক্ষুদ্র শিল্প সেবা সংস্থা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বোর্ডের মারফত সম্পাদিত হয়।

(৩) কাঁচামাল সংগ্রহ - রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন মারফত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য কাঁচামালগুলি জেলায় জেলায় অবস্থিত ডিপোগুলি থেকে রেশনিং ও কোটা অনুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের আপৎকালীন মজুদ (buffer stock) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর ফলে কাঁচামালের অভাবে সহসা উৎপাদন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দূর হবে।

(৪) আর্থিক সাহায্য—ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে এদের ঋণদানের বিষয়টি 'অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্র' (priority sector) বলে গণ্য করার সরকারী নীতি গৃহীত হয়েছে। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাগুলি থেকে এরা ঋণের সুবিধা পাচ্ছে। সম্প্রতি পার্থক্যমূলক সুদের হারে ঋণদানের প্রকল্পটি এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে। ফলে ১৯৬৯ সালের জুন মাসে ১৫১ কোটি টাকা থেকে এদের ঋণ সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে ১৯৮২-র মার্চ মাসে ৩,৯০৭ কোটি টাকা হয়েছে।

(৫) তৈরী পণ্য বিক্রয়—এদের বিক্রয় সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় এদের পণ্য কেনার নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এদের পণ্যের গুণমানের উন্নতির জন্য গুণ-নিয়ন্ত্রণ ও গুণাগুণ যাচাই পদ্ধতি (quality control and testing) প্রবর্তিত হয়েছে। এদের পণ্যগুলির জনপ্রিয়তা ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সমবায় ও অন্যান্য সমবায় সমিতির উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিপণি (sales emporium) খোলা হচ্ছে।

(৬) কর সংক্রান্ত সুবিধাদান—ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি উৎসাহদানের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যে সব কর সংক্রান্ত সুবিধা (fiscal incentives) দিচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে নতুন সংস্থাকে পাঁচ বৎসরের জন্য কর রেহাই দান, বিনিয়োগ ছাড় (investment allowance), পুঁজি ভরতুকি (capital subsidy) এবং দাম সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব মূলক ব্যবস্থা।

২৬.৭. ক্ষুদ্র শিল্পবসতি
Industrial Estates

১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে ক্ষুদ্র শিল্প পর্ষৎ ভারতে শিল্পবসতি স্থাপনের কার্যক্রম মঞ্জুর করে। এই সব শিল্পবসতিতে স্থাপিত ১৩,৪৭৬টি শিল্প সংস্থা এখন বৎসরে ৬৩৬ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে এবং এই সব সংস্থায় ২ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিক-কর্মীর কাজের সংস্থান হয়েছে। শিল্প বসতিগুলি দুরকমের: বৃহৎ শহরের প্রান্তে স্থাপিত বড় শিল্প উপনিবেশ এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের এলাকায় স্থাপিত ক্ষুদ্রাকার শিল্প উপনিবেশ।

গুরুত্ব: ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার পরিকল্পিত অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে পুঁজি, কাঁচামাল ও শ্রমিক ছাড়াও কারখানাগৃহ, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, পর্যাপ্ত জলের যোগান, গ্যাস, বাষ্পশক্তি, রেলওয়ে সাইডিং ইত্যাদি অনেক কিছুর সুবিধা চাই। দেশে সর্বত্র বিদ্যুতের সরবরাহ নেই। অন্যান্য বিষয়গুলির ব্যবস্থা করা ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য সুনির্বাচিত স্থানে বাজার স্থাপন অথবা কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলের নিকট সরকারী ব্যয়ে উপরোক্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সরবরাহের বন্দোবস্ত করা যায়। এই স্থানগুলিই শিল্পবসতি নামে পরিচিত। এই সকল বসতিতে কারখানাগৃহ, জল, বিদ্যুৎ ও বাষ্প-শক্তির সরবরাহ, রেলওয়ে সাইডিং প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে তাতে একাধিক ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়। শিল্পের উপযোগী সুবিধা ছাড়াও এই উপনিবেশগুলিতে শ্রমিকদের জন্য আদর্শ বাসগৃহ, তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। ফলে এই বসতিগুলি নানাদিক দিয়ে শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে আদর্শস্থানীয় হয়। এই কারণে ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এই ধরনের শিল্পবসতি স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২৬.৮. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা
Co-operatives and the Development of Small and Cottage Industries

গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আয়

বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পরিকল্পনাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল এবং তজ্জন্য শিল্প সমবায় গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম্য কারিগরদের নিজস্ব সঞ্চয় নেই কিংবা জামিন রেখে ঋণ নেওয়ার মত কোনো সম্পত্তিও নেই। সুতরাং তার সমবায় গঠন ও পরিচালনা করলে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার সুবিধা হয় এবং তাদের পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির সমবায়মূলক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে সমবায় সমিতিতে উৎসাহদানের সরকারী নীতির ফলে এই শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

ইতোপূর্বে ভারতে শিল্প সমবায়ের অগ্রগতি সামান্য হলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্প সমবায়ের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বর্তমানে দেশে ৫১ হাজারের বেশি শিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। এদের মোট সভ্য সংখ্যা প্রায় ৩৯ লক্ষ ও মোট কার্যকর পুঁজি ৩৪৮ কোটি টাকা। পণ্যসামগ্রীর পাইকারী বিক্রয় ও রপ্তানী ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে শিল্প সমবায় সমিতি-গুলির একটি জাতীয় ফেডারেশন গঠিত হয়েছে।

২৬.৯. পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি

Progress of Rural Cottage and Small Industries in the Plan Period

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বহু পুরাতন সমস্যাগুলি, যথা ঋণের অভাব, উৎপাদনের অতি পুরাতন পদ্ধতি ও কৌশল, সংগঠিত বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব, কাঁচামালের যোগানের অসন্তোষজনক অবস্থা এই সবের প্রতিকারের জন্য সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ আরম্ভ হয়।

এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি সংস্থা মারফত ঋণের সরবরাহ করা, শিল্পবসতি ও গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প স্থাপন করা এবং শিল্প সমবায় সংগঠিত করা।

প্রথম দুটি পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য মোট ২১৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ২৪০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ও তারপরে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় তিন বছরে ১৩২কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ব্যয় হয় ২৫১ কোটি টাকা। এ ছাড়া, এই সময়ে বেসরকারী উদ্যোগে এজন্য ৫৬০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ ঘটেছে বলে অনুমান। পঞ্চম পরিকল্পনায় ব্যয় করা হয়েছে ৩৮৭ কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছিল ১,৭৮০ কোটি টাকা। সপ্তম পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছে ২,৭৫২ কোটি টাকা।

পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রের দ্রুতগতিতে প্রসার ঘটেছে। রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থার সংখ্যা ১৯৬২ সালে ছিল ৩৬ হাজার। ১৯৮৫-৮৬ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার। এবং এ বৎসরে এ সব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬ লক্ষে। ১৯৮৫-৮৬ সালে সমগ্র ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রের মোট উৎপাদনের পরিমাণ টাকার অঙ্কে দাঁড়ায় ৬১,১০০ কোটি টাকায় (চলতি মূল্য-স্তরে) রপ্তানির দিক থেকেও ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলির অবদান দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮৪-৮৫ সালে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি মোট ২,৫৮০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করেছে। এটা ভারতের মোট রপ্তানি মূল্যের ২২.৫ শতাংশ। নিঃসন্দেহে এটা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। পরিমাণগত এই উন্নতি ছাড়াও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উন্নতিও যথেষ্ট হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে এখন ইলেকট্রনিক্স, প্লাস্টিক, সেরামিক্স, নিখুঁত যন্ত্রপাতি, মেশিনটুল প্রভৃতি অধুনা ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই যথেষ্ট দক্ষতার সাথে উৎপাদন করছে। প্রতিরক্ষা, রেলদপ্তর ও বৃহদায়তন শিল্পের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যোগান দিচ্ছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা আলোচনা কর।

[Discuss the role that the cottage and the small-scale industries can play in the economic development of India.]

২. ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর এবং সেগুলি দূর করার জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে সে বিষয়ে মন্তব্য কর।

[Describe the difficulties that the cottage and the small-scale industries in India have to face and make an evaluation of the measures that the government has adopted to remove those difficulties.]

৩ ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Indicate the role of the small-scale and cottage industries in the Indian economy.]

[B.A. (III) 1985]

৪. ভারতের মত অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থাপনা ও বিকাশের যুক্তিগুলি বর্ণনা করা।

[State the arguments justifying the setting up and expansion of the small-scale and the cottage industries in the Indian economy.]

৫. তোমার মতে ভারতের বেকার সমস্যার সমাধানে কুটির শিল্পের ভূমিকা কি হতে পারে ?

[*What, in your opinion, could be the role that the cottage industries in India may play in solving the unemployment problem.*]

৬. ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রধান প্রধান সমস্যার বিবরণ দাও এবং উহাদের প্রতিবিধান নির্দেশ কর।

[Describe the problems faced by small-scale and cottage industries in India and suggest remedies.] [C.U.B.A. (III), 1983]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কাকে বলে ?

[How would you define a small-scale industry ?]

২. কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[Point out the difference between the cottage and the small-scale industries]

[C.U B.A. (III), 1984]

৩. ভারতে কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানোর সপক্ষে যুক্তি দাও।

[State the arguments in favour of expansion of cottage industries in India.]

[C.U.B.A (III) 1983]

বৃহদায়তন শিল্প
Large-Scale Industries

২৭.১. তুলাবস্ত্র শিল্প
The Cotton-textile Industry

১. গুরুত্ব: ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ১৮১৮ সালে স্থাপিত তুলাবস্ত্র শিল্পের গুরুত্বের কারণ হল: (১) ভারতের শিল্পগুলির মধ্যে এ শিল্প সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করেছে (প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক)। (২) ভারতের তুলা-তাঁত শিল্পে নিযুক্ত প্রায় এক কোটি তাঁতীকে সুতা সরবরাহ করে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছে। (৩) এতে বর্তমানে ৩৬৭ কোটি টাকার অধিক পুঁজি খাটছে এবং এই পুঁজির প্রায় সমগ্র অংশই বেসরকারী ভারতীয় মালিকানা ও পরিচালনার অধীন। (৪) ভারতের বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পগুলির মধ্যে এর স্থান তৃতীয়। (৫) বিশ্বের বস্ত্রের বাজারে ভারত দ্বিতীয় রপ্তানিকারী দেশ।

২. বর্তমান অবস্থা: ১৯৫১ সালে পরিকল্পণা-কালের প্রারম্ভে দেশে ১০৩টি সুতাকল এবং ২৭৫টি সুতা ও বয়ন কল মিলে মোট কাপড় কলের সংখ্যা ছিল ৩৭৮। সরকারী নীতি অনুযায়ী সম্প্রসারণের ফলে ১৯৮০ সালে সুতাকলের সংখ্যা বেড়ে ৩৭০টি এবং সুতা ও বয়ন কলের সংখ্যা বেড়ে ২৯১টি এবং মোট কাপড় কলের সংখ্যা বেড়ে ৬৬১ হয়। মাকুর সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয় ও অটোমেটিক তাঁতের সংখ্যা ১·৯৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ২·০৬ লক্ষ হয়।

বর্তমানে বার্ষিক ২৫০০ কোটি টাকার সুতা ও কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে ও ৯ লক্ষের বেশি শ্রমিক-কর্মী কাজ করছে।

সমগ্র শিল্পটি এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকেন্দ্রিত ও তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা মিল ক্ষেত্র, হ্যান্ডলুম ক্ষেত্র ও পাওয়ার লুম ক্ষেত্র। প্রথমটি হল কেন্দ্রীভূত বা সংগঠিত ক্ষেত্র, বাকি দুটি ক্ষেত্র নিয়ে হল বিকেন্দ্রিত ক্ষেত্র। ১৯৫১ সালে সমগ্র কাপড় কল শিল্পে কাপড়ের মোট উৎপাদনের ৮০ শতাংশ উৎপন্ন হত মিল ক্ষেত্রে। বাকি ২০ শতাংশ উৎপন্ন হত বিকেন্দ্রিত ক্ষেত্রে। সরকারী নীতির দরুন এই অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মিল ক্ষেত্রের উৎপাদন ক্রমশ কমে ১৯৮১-৮২ সালে হয়েছে ৩৬·৫ শতাংশ এবং বিকেন্দ্রিত ক্ষেত্রে ক্রমশ বেড়ে হয়েছে ৬৩·৫ শতাংশ। সুতার মোট উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালে ৫৩·৪ কোটি কেজি থেকে ক্রমশ বেড়ে ১৯৮১-৮২ সালে হয়েছে ১২৫ কোটি কেজি।

উৎপাদনের ধাঁচটি বিচার করলে দেখা যায়, গত তিরিশ বৎসরে সুতার উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি হয়েছে, কিন্তু কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার পঞ্চাশের দশকে ৩·৫ শতাংশ থেকে

কমে সত্তরের দশকে ১.৭ শতাংশ হয়েছে। এর প্রধান কারণ মিল ক্ষেত্রে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিধিনিষেধ।

উৎপন্ন কাপড়ের ধাঁচ বিচারে দেখা যায় বর্তমানে পাঁচ রকমের কাপড় তৈরী হয়—(ক) দরিদ্র মানুষের জন্য মোটা এবং 'মিডিয়াম বি' শ্রেণীর কাপড়; এবং (খ) অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও উচ্চবিত্তের জন্য 'মিডিয়াম এ', ফাইন ও সুপার ফাইন কাপড়। সরকারের কাপড় নীতি অনুযায়ী কাপড় কলগুলি একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মোটা কাপড় ও 'মিডিয়াম বি' কাপড় উৎপাদনে বাধ্য। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৬৫ সালে মিলগুলির উৎপাদনের ২২ শতাংশ ছিল ফাইন কাপড়। সেটা ১৯৭৯ সালে বেড়ে হয়েছিল ৫৭ শতাংশ।

কাপড় ব্যবহারের তথ্য বিচারে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (২ শতাংশ) তুলনায় বর্তমানে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির হার (১.৭ শতাংশ) কম। সুতরাং দেশে মাথাপিছু ব্যবহার্য কাপড়ের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ১৯৬৪ সালে তা ১৬.৮ মিটার থেকে (১৫.২ মিটার তুলার কাপড় ও ১.৬ মিটার কৃত্রিম কাপড়) ১৯৮১-৮২ সালে তা হয়েছে মাথাপিছু ১৫ মিটার (১১.৭ মিটার তুলার কাপড় ও ৪.৩ মিটার কৃত্রিম কাপড়)। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে অবশ্য দেশের সবচেয়ে গরিব ৪০ শতাংশ মানুষের বৎসরে ২ মিটারের বেশি কাপড় ব্যবহারের ক্ষমতা নেই (ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে)।

৩. **বর্তমান সমস্যা:** বর্তমানে তুলাবস্ত্র শিল্প অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন।

(১) **কাঁচামালের অভাব:** প্রয়োজনীয় পরিমাণে ও উৎকৃষ্ট মানের কাঁচা তুলা ভারতে উৎপন্ন হয় না। তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনোও 'সবুজ বা সাদা বিপ্লব' ঘটেনি। ঘাটতি মেটাতে প্রতি বৎসর ভারতকে উৎকৃষ্ট লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করতে হচ্ছে। কিন্তু বিদেশী মুদ্রার সংকটের জন্য বিদেশ থেকে তুলা আমদানির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। তুলার উৎপাদনের ঘাটতি ও বিদেশী তুলার আমদানির অসুবিধা বর্তমানে তুলাবস্ত্র শিল্পে প্রধান সংকট হয়ে উঠেছে। শিল্পটির উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির এটি হল একটি প্রধান কারণ।

(২) **ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ:** বর্তমানে তুলাবস্ত্র-কল মালিকদের অভিযোগ এই যে, উচ্চ মজুরি ও অন্তঃশুল্ক হারের দরুন তুলাবস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। তুলা-বস্ত্রের উৎপাদন খরচের ৮০% হচ্ছে কাঁচামালের দাম ও শ্রমিকদের মজুরি। উৎপাদনে ঘাটতির জন্য বাজারে তুলার দরও বিদেশের বাজার থেকে ২৫%—৪০% বেশি। তা ছাড়া শ্রমিকদের মজুরি ও মহার্ঘভাতার হার বাড়ছে এবং সাজসরঞ্জাম, জ্বালানি তেল, প্যাকিং দ্রব্য ইত্যাদি সবকিছুই দাম চড়া হচ্ছে। টাকার বাট্টাহার কমানোর পর এইগুলির দাম আরও বেড়েছে। এতে তুলাবস্ত্রের খরচ ও দাম বেশি পড়ছে বলে তুলাবস্ত্রের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে অসুবিধা হচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমাতে হলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও আধুনিক উৎপাদনকৌশল প্রবর্তন করে শিল্পের দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।

(৩) **বিশ্ববাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা:** অধুনা রপ্তানি বাজারগুলিতে পশ্চিম জার্মানী, চীন ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পের অন্যতম সমস্যা সৃষ্টি করছে। ইউরোপের বারোয়ারী বাজারে ইংলণ্ড যোগ দেওয়ায় এই সমস্যা আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। মার্কিন বাজারে রপ্তানি কমেছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংকট শিল্পটির পক্ষে এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তার উপর বিশ্বব্যাপী মন্দার অবস্থা রপ্তানি বৃদ্ধি কঠিন করে তুলেছে।

(৪) **পুরাতন যন্ত্রপাতি:** অধিকাংশ ভারতীয় তুলা বস্ত্রকলের যন্ত্রপাতি অতি পুরাতন। এ কারণে বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা যাচ্ছে না এবং বস্ত্রের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। তাই যন্ত্রপাতির রদবদল ও বস্ত্রকলের বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার সাধন ভারতীয় বস্ত্রকল-গুলির দক্ষতা ও বিশ্ববাজারে তাদের প্রতিযোগিতা শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক। পুরাতন যন্ত্রপাতির রদবদলের জন্য আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব রয়েছে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এজন্য মাত্র ৩০ কোটি টাকার মত ঋণ দিয়েছে। আবার তুলাবস্ত্র শিল্পের বিজ্ঞান-সম্মত সংস্কার দ্বারা এতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে কর্মচ্যুতির আশংকাও রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ১০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(৫) **তৈরী বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান মজুদ:** উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির দরুন একদিকে কাপড়ের দাম বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ছে না, রপ্তানিও আশানুরূপ হচ্ছে না। ফলে মিলগুলিতে অবিক্রীত কাপড়ের মজুদ জমে উঠেছে।

(৬) **অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা:** বর্তমানে এই শিল্পের আর একটি সমস্যা হল মিলগুলি নিজেদের উৎপাদনক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। এর অন্যতম কারণ হল, কাপড়ের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কাপড়ের চাহিদা সঙ্কুচিত

হয়ে থাকছে। অন্যদিকে বিদেশের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা রপ্তানি বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

(৭) **'রুগ্ন' মিলগুলির সমস্যা :** 'রুগ্ন' কাপড়কলের সমস্যা এই শিল্পের সমস্যাগুলির অন্যতম। যন্ত্রপাতি, চলতি পুঁজির অভাব, রিজার্ভ ফাণ্ডের অভাব, মুদ্রাস্ফীতি, চড়া শুল্ক, তুলার অভাব, '৬৭-৬৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতির কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(৮) **অন্যান্য সমস্যা :** এই শিল্পের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে আছে বিদ্যুতের তীব্র অভাব এবং বিপুল করের বোঝা।

৪. **সরকারী নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থা :** তুলাবস্ত্র শিল্পের সমস্যাগুলির সমাধানে সরকার অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে : (১) ১৯৫৮ সালে নিযুক্ত যোশী কমিটির পরামর্শে অন্তঃশুল্ক কমানো হয়েছে। (২) মিলগুলিকে রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিদেশ থেকে শক্তিচালিত তাঁত আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (৩) দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের জন্য কাপড়ের কলগুলিকে স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; (৪) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য তুলাবস্ত্রের উপর রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে, লাইসেন্স গ্রহণের প্রথা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বস্ত্রশিল্পের রপ্তানিপ্রসার পরিষদ গঠিত হয়েছে। সুপার ফাইন জাতীয় কাপড়ের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়েছে। (৫) বন্ধ ও 'রুগ্ন' কাপড়ের কলগুলি অধিগ্রহণের জন্য ভারত সরকার ন্যাশনাল টেক্সটাইল করপোরেশন গঠন করেছে। বর্তমানে তুলাবস্ত্র শিল্পে এর ফলে যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে তাতে মোট মিলের সংখ্যা হয়েছে ১০৩টি এবং নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা হল ১,৬৩,০০০। (৬) তুলাবস্ত্র শিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের জন্য সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে।

৫. **গ্রহণযোগ্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা :** (ক) কাপড় কল শিল্পটি তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত এবং মিল ক্ষেত্র ও বিকেন্দ্রীত ক্ষেত্রের মধ্যে যথোপযুক্ত সংযোজন ও সমন্বয়নের কোনো ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয়নি। সুতরাং কাপড়কল শিল্প সম্পর্কে এমন একটি সুসংহত সামগ্রিক সরকারী নীতি গ্রহণ করা দরকার যার লক্ষ্য হবে মিল ক্ষেত্র, হ্যাণ্ডলুম ক্ষেত্র এবং পাওয়ারলুম ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্যসহ সমগ্র শিল্পটির সংযোজিত বিকাশ সাধন এবং যে নীতি হবে তুলা ও নানারূপ কৃত্রিম তন্তুভিত্তিক শিল্পে এবং চিরাচরিত দ্রব্য উৎপাদন শিল্পগুলির উৎপাদনসহ নতুন নতুন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী।

(খ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের দ্বারা মাকু ও তাঁতগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব করতে হবে।

(গ) তুলা চাষীরা যাতে যুক্তিসঙ্গত দাম পায় সেজন্য কাঁচাতুলার ন্যূনতম দর সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং তুলার বাজার দরের ওঠানামা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তুলার আপৎকালীন মজুদ (buffer stock) গড়ে তোলা উচিত।

(ঘ গরিব জনসাধারণ যাতে মোটা ও মিডিয়াম-বি কাপড় ন্যায্য দামে পেতে পারে সে উদ্দেশ্যে এই জাতীয় কাপড়ের সরকারী বিক্রয় ব্যবস্থাটি সম্প্রসারিত ও ত্রুটিহীন করা প্রয়োজন।

(ঙ) কাপড় কল শিল্পের দেশীয় বাজার যেমন বিরাট তেমনি রপ্তানী বাজারের সম্ভাবনাও কম নয়। সুতরাং দেশীয় বাজার ও বিদেশী বাজারের কথা মনে রেখে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে জাতীয় বস্ত্র শিল্পনীতি (National Textiles Policy) গ্রহণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

৬. **সম্ভাবনা :** জনসংখ্যা ও আয়বৃদ্ধির পটভূমিকায় দেশে কাপড়ের বিরাট অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে ভারতীয় বস্ত্রের উৎকর্ষ বাড়াতে ও দাম কমাতে পারলে বিশ্ববাজারেও এর রপ্তানির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ভারতীয় বস্ত্রকল শিল্পের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সমস্যার সমাধান ও উৎপন্নে বৈচিত্র্য আনয়ন প্রভৃতির উপর শিল্পটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বলা যায়।

২৭.২. চটকল শিল্প

The Jute Mill Industry

১. **গুরুত্ব :** চরিত্রের দিক থেকে দেশের প্রাচীনতম এই চটকল শিল্প হল মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী দ্রব্য উৎপাদন শিল্প। নিম্নোক্ত কারণে শিল্পটির গুরুত্ব রয়েছে : (১) চটকল শিল্প ভারতের সর্বাধিক সুসংগঠিত শিল্প। (২) শিল্পটি প্রত্যক্ষভাবে ২·৩৯ লক্ষ শ্রমিকসহ মোট ২·৫০ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান করছে। (৩) পরোক্ষভাবে দেশের পাটচাষীগণের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করছে। (৪) এটা দেশের সর্বপ্রধান বিদেশী মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। (৫) এতে ৩০০ কোটি টাকার পুঁজি খাটছে। (৬) ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবার পাট চাষের দ্বারা জীবন ধারণ করে। (৭) এই শিল্পে বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য হল আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে ৩০০ কোটি টাকার দ্রব্য বার্ষিক রপ্তানী হয়।

২. **বৈশিষ্ট্য :** কয়েকটি কারণে চটকল বিশিষ্টতা লাভ করেছে : (১) শিল্পটি কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে গঙ্গার দুই পারে কেন্দ্রীভূত। বর্তমানে মোট ১১৩টি চটকলের মধ্যে ১০১টি চটকলই এই অঞ্চলে অবস্থিত।

কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিকটবর্তী বাজার, শ্রমিক ও বিদ্যুৎ শক্তির যোগান এবং কলকাতা বন্দরের অবস্থিতি প্রভৃতি এর কারণ। (২) প্রথম থেকেই এটা বিদেশী মালিকানা ও পরিচালনার অধীন রয়েছে। (৩) শিল্পটি রপ্তানিনির্ভর। (৪) ভারত পৃথিবীতে সর্বপ্রধান পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশ। পৃথিবীতে পাটশিল্পে নিযুক্ত তাঁতের ৫৬ শতাংশই ভারতে অবস্থিত। তুলনায় ইংলণ্ডে ৯ শতাংশ ও ফ্রান্সে ৬ শতাংশ রয়েছে। (৫) অতীতে ম্যানেজিং এজেন্সী মারফত এই শিল্পে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অত্যধিক কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। (৬) পশ্চিমবঙ্গে চটকলগুলি অধিকাংশই বৃহদায়তন। (৭) শিল্পটি অত্যধিক পরিমাণে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীল এবং তেজীমন্দার প্রভাবাধীন।

৩. **বর্তমান অবস্থা :** ভারত পৃথিবীর মোট পাটজাত দ্রব্যের ৩২ শতাংশ উৎপাদন করে এবং ভারতের পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ পৃথিবীর পাটজাত দ্রব্যের মোট রপ্তানির ৪৬ শতাংশ।

বর্তমানে ভারতে চটকল শিল্পের লাইসেন্স-প্রাপ্ত মোট উৎপাদন ক্ষমতা হল বার্ষিক ২১ লক্ষ টন। কিন্তু তাঁতের তুলনায় চটের সুতো (Spinning) পাকানোর ক্ষমতা যথেষ্ট থাকায় চটকলগুলির পক্ষে বৎসরে ১৩ লক্ষ টনের বেশি পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে আবার চাহিদার অভাবে প্রকৃত উৎপাদন ১০-১১ লক্ষ টনের বেশি হয় না।

পাটজাত দ্রব্যের প্রধান চাহিদা হল কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্যাকিং-এর জন্য এবং শিল্পগত ব্যবহারের জন্য। এছাড়া কার্পেট ব্যাকিং-এর জন্যও চটের চাহিদা রয়েছে। পাটজাত দ্রব্য প্রধানত তিন প্রকারের, হেসিয়ান ক্লথ, স্যাকিং ক্লথ ও কার্পেট ব্যাকিং। পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা মূলত অস্থিতিস্থাপক, তাই চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল ১-এর কম, অন্তত স্বল্পকালীন সময়ে।

বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্ত ব্যবহারের দরুন এবং পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন, ভারতের পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি ক্রমশ নিম্নমুখী। কিন্তু বর্তমানে খনিজ তেলের দরের অত্যধিক বৃদ্ধির দরুন পাটের রাসায়নিক পরিবর্তগুলি (polypropelene and polythelene) উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলে নতুন করে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা খানিকটা দেখা দিয়েছে।

৪. **সমস্যা (১) কাঁচাপাটের অভাব :** দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতের চটকল শিল্পে কাঁচা পাটের তীব্র অভাব দেখা দেয়। দেশ বিভাগের আগে অবিভক্ত ভারতে ৬৫ হাজার ৭০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হত। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে পাটের উৎপাদন কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৬.৫ লক্ষ গাঁইট। ভারতের পাটের মান নিকৃষ্ট হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। পাটের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য মেস্তার চাষও হয়। চটকলগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য ৭৬ লক্ষ গাঁইট পাট প্রয়োজন। ১৯৮৪ ৮৫ সালে কাঁচা পাটের উৎপাদন ছিল ৬৭ লক্ষ গাঁইট।

কিন্তু এতে আশ্বস্ত বা সন্তুষ্ট হবার কোনো কারণ নেই। কেন না কাঁচা পাটের উৎপাদন খুবই উঠানামা করে। এ পর্যন্ত পাটের উৎপাদন যা বেড়েছে তা ঘটেছে পাটের জমি বাড়িয়ে, ফলন বাড়িয়ে নয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের পাটের ফলন কম, একরপিছু মাত্র ২'৮ গাঁইট। অথচ বাংলাদেশে ও থাইল্যাণ্ডে একরপ্রতি ফলন হল ৩'৮ গাঁইট।

(২) পাটের পরিবর্ত সামগ্রীর আবির্ভাব : চটের থলির পরিবর্তে সস্তা কাগজ, প্লাস্টিক ও কাপড়ের থলির ব্যবহার, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে গম প্রভৃতি দ্রব্য সরাসরি গুদামে ও জাহাজে বোঝাইয়ের ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে প্রবর্তিত হচ্ছে। এজন্য বিশ্ববাজারে চট ও চটের থলির চাহিদা কমছে।

(৩) বিদেশী প্রতিযোগিতা : সম্প্রতি মিশর, পারস্য, ব্রহ্মদেশ, চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও বাংলাদেশে আধুনিক ধরনের চটকল প্রতিষ্ঠার ফলে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। সরকার চটকলগুলিকে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানান কনসেশন দিলেও রপ্তানি বৃদ্ধিতে তা বিশেষ ফল দিচ্ছে না।

(৪) চড়া উৎপাদন খরচ : কাঁচা পাটের মূল্যবৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অধিক পড়ছে বলে চটকল মালিক সমিতি অভিযোগ করে। এর ফলে পাটজাত দ্রব্যের দর বেশি হওয়ায় রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(৫) পুরাতন যন্ত্রপাতি : চটকল শিল্পের পুরাতন যন্ত্রপাতিও শিল্পটির দক্ষতা বৃদ্ধির এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের পথে বাধা। এজন্য এর বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার করা হচ্ছে। ১৯৭৮ (মার্চ) সাল পর্যন্ত এন. আই. ডি. সি. এজন্য প্রায় ৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। তার মধ্য থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৬ কোটি টাকার মত। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশনও একে এজন্য ৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১৯৭০ সালে ভারত সরকার শিল্পটির যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য একটি ৪৮ কোটি টাকার

কর্মসূচি অনুমোদন করেছে। ১৯৭৩ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে রাজী হয় ৩০ কোটি টাকার মত। বিশ্বব্যাঙ্ক এজন্য ২৫০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছে।

(৬) **বিদ্যুৎ সংকট :** সম্প্রতি চটকল শিল্পে আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা হল ১৯৭০ সাল থেকে বিদ্যুৎ সংকটের দরুন অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ।

৫. **সরকারী নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থা :** (১) চটকলের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার সাধনের নীতি গৃহীত হয়েছে। এজন্য চটকলগুলিকে উদারভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতি-পত্র দান ও দেশের মধ্যে চটকলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৫ শতাংশ চটকলের বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার করা হয়েছে। (২) পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য চটকল শিল্পের রপ্তানী প্রসার পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং রপ্তানী শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। (৩) ভারতীয় চটকল মালিক সমিতি ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদনের জন্য একটি পাট উন্নয়ন বিভাগ স্থাপন করেছে এবং নতুন নতুন পাটজাত দ্রব্য উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা চালাচ্ছে। (৪) ১৯৬৯ সালে ভারত সরকারকে চটকল শিল্পের উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি জুট টেকস্‌টাইল কনসালটেটিভ কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। (৫) বাংলাদেশ ও নেপাল এই দু'টি প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশের সাথে মিলে একটি আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করছে। (৬) পাট চাষীদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য ভারত সরকার ন্যায্য দামে চাষীদের কাছ থেকে পাট কিনে মজুত করা ও চটকলগুলির কাছে বিক্রি না করার জন্য ১৯৭১ সালে জুট করপোরেশন গঠন করেছে।

৬. **গ্রহণীয় ব্যবস্থা :** নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর চটকল শিল্পের সমস্যাগুলির সমাধান নির্ভর করছে— (ক) ভারতে অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদন; (খ) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতির রদবদল, আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারসাধন; (গ) নতুন নতুন পাটজাত দ্রব্য উদ্ভাবন করে এদের ব্যবহার ও চাহিদার সম্প্রসারণ। তবে এ সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলেও যন্ত্রপাতির সংস্কারের ক্ষেত্রে সাবধানে অগ্রসর হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ অত্যধিক দ্রুতগতিতে সংস্কারের দিকে অগ্রসর হলে চটকল শিল্পে শ্রমিকদের ব্যাপক কর্মচ্যুতি ঘটতে পারে; সে সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। (ঘ) কাঁচা পাটের ফাটকাবাজি বন্ধ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক।

৭. **সম্ভাবনা :** নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও চটকল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কারণ, পাটের কিছু কিছু পরিবর্ত দ্রব্য বাজারে আছে বটে তবে পাটের মত এত সস্তা ও টেকসই দ্রব্য আর নেই। বারংবার একই চটের থলি ব্যবহারের সুবিধা, অত্যন্ত অল্প দাম এবং আধুনিক শিল্পযুগে পাটজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার প্রভৃতির দরুন পাটজাত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বাজার যে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের ও আমেরিকার প্রধান দেশগুলিতে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতা ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বাজারের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করেছে।

২৭.৩. লৌহ-ইস্পাত-শিল্প

The Iron & Steel Industry

১. **গুরুত্ব :** লৌহ-ইস্পাত হল দেশের শিল্পায়নের মৌল কাঁচামাল এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্প হল একটি বুনিয়াদী শিল্প। এর উপর অন্যান্য শিল্পের বিকাশ নির্ভর করে। সেজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের জন্য লৌহ ইস্পাতের চাহিদা বাড়ছে। ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতের উদ্বৃত্ত লৌহ-ইস্পাত বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজারও রয়েছে।

২. **বর্তমান অবস্থা :** (ক) ভারতে বর্তমানে ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও ১টি বেসরকারী, মোট ৬টি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা (integrated steel plant), ১টি মিশ্র ইস্পাত কারখানা (alloy steel plant), এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে কতকগুলি ছোট ইস্পাত কারখানা এবং স্টীল রি-রোলিং কারখানা রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের সময় দেশে মোট ৩টি ইস্পাত কারখানা ছিল; দু'টি ছিল বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং একটি ছিল মহীশুর রাজ্য সরকারের।

(খ) বর্তমান ৬টি বৃহদায়তন ইস্পাত কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হল ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন; এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হল ৯৪ লক্ষ টন, বাকি ২০ লক্ষ টন হল বেসরকারী সংস্থাটির উৎপাদন ক্ষমতা (টাটা কোম্পানি)। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত বোকারো কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজ চলেছে, বিশাখাপত্তনমে আরেকটি নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। ফলে ৮০-র দশকের শেষে ভারতে ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টনে দাঁড়াবে। মিনি স্টীল প্ল্যাণ্টগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হল বার্ষিক ৩২ লক্ষ টন আর রি-রোলিং কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হল ৪৭ লক্ষ টন। মিশ্র ইস্পাত-

কারখানাটির (দুর্গাপুরে) উৎপাদন ক্ষমতা হল বার্ষিক ১ লক্ষ টন।

(গ) দেশে বর্তমানে 'ফিনিশড্' স্টীলের উৎপাদন ৭০ লক্ষ টন থেকে ৬০ লক্ষ টনের মধ্যে ওঠা-নামা করছে। উৎপাদন বৃদ্ধির বাধাগুলির মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের অভাব, উপযুক্ত পরিমাণে কোকিং-কয়লা সরবরাহের অভাব, পরিবহণের অসুবিধা, উপযুক্ত শ্রমিকের অভাব।

(ঘ) পৃথিবীর ইস্পাত উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারত এখন ১৩শ স্থানের অধিকারী হলেও, ভারতের ইস্পাত উৎপাদন হল পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র ১'১ শতাংশ, তুলনায় সোভিয়েতের উৎপাদন হল ২০ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন হল ১৯'৩ শতাংশ ও জাপানের উৎপাদন হল ১৫'৫ শতাংশ, পশ্চিম জার্মানির উৎপাদন হল ৭ শতাংশ ও ব্রিটেনের উৎপাদন ৪ শতাংশ।

(ঙ) ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনেব দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানা সাংগঠনিকভাবে একত্রিকরণের দ্বারা Steel Authority of India Ltd. (SAIL) গঠিত হয়েছে।

৩. **সমস্যা :** বর্তমানে শিল্পটির সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। (১) **পুঁজির সমস্যা।** বেসরকারী ক্ষেত্রে এর জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সংগৃহীত হয়েছে। আর সরকারী ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের সহযোগিতা গৃহীত হয়েছে। বোকারোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে নতুন একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে। (২) **ধাতুশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।** সেজন্য উৎকৃষ্ট কয়লার সংরক্ষণ করে ও নিকৃষ্ট কয়লা ধুয়ে ধাতু শিল্পে ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ কারণে কয়েকটি কয়লা ধৌতকরণ যন্ত্র বসান হয়েছে। (৩) তা ছাড়া **উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব ও উপযুক্ত পরিবহণের সমস্যাও** রয়েছে। (৪) **ইস্পাত কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্প ব্যবহার এবং দেশে ইস্পাত ঘাটতির সমস্যা।** দেশে যে সব ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে নানা অসুবিধা বিপত্তির দরুন তাদের উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র শতকরা ৬৪-৬৭ ভাগ কাজে লাগান হচ্ছে। এর ফলে দেশে যখন ইস্পাতের চাহিদা বাড়ছে তখন ইস্পাতের উৎপাদন-ঘাটতি সংকট সৃষ্টি করেছে। (৫) **সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলিতে লোকসানের সমস্যাও** কম গুরুতর নয়। দেশের সরকারী শিল্পক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ ২১,১২৬ কোটি টাকার মধ্যে ৪,১৩২ কোটি টাকাই ইস্পাত কারখানাগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। অথচ সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলিতে এখনও লোকসান দূর হয়নি। (৬) ইস্পাতের স্থানীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের ছোট ছোট ইস্পাতের কারখানা (mini steel plant) স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকেই এই কারখানাগুলি রুগ্ন হয়ে পড়তে থাকে। এদের সংকটের মূল কারণ হল কাঁচামালের অভাব, বিদ্যুতের অভাব এবং পরিচালনার ত্রুটি।

৪. **সমস্যার প্রতিকারে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা :** ভারতের ইস্পাত শিল্পের অন্যতম দুটি সমস্যা হল (ক) কোকিং কয়লার উৎপাদন ও যোগান সন্তোষজনক নয় বলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করতে হয় এবং (খ) লৌহ আকরিকের গুণমান উৎকৃষ্ট নয়। ফলে উৎপাদনের খরচ বেশি হয়। এই অসুবিধা দূর করার প্রধান উপায় হল ইস্পাত উৎপাদনের প্রকৌশলের (technology) আরও উন্নতি সাধন এবং শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির সবিশেষ বৃদ্ধি। প্রকৌশলের ক্ষেত্রে সবিশেষ অগ্রগতি ঘটছে, ইস্পাত প্রকল্পের পরিকল্পনায়, যন্ত্রপাতি নির্মাণে ও স্থাপনে তৃতীয় বিশ্বে ভারত বিশেষত্ব অর্জন করেছে। ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও সাফল্য বিশেষভাবেই নির্ভর করছে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রকৌশলের আরও উন্নতির উপর। তার ফলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে ভারত ইস্পাত রপ্তানি করতে সক্ষম হবে।

২৭.৪. চিনি শিল্প

The Sugar Industry

১. **গুরুত্ব :** ভারতের শিল্পগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান হল চিনি শিল্পের। চিনি শিল্পে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ১,৩০০ কোটি টাকা। প্রয়োগবিৎ ও দক্ষ কারিগর সহ প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক এ শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে। ভারতে উৎপন্ন আখের একমাত্র পাইকারী ক্রেতা হল চিনি শিল্প। চিনি শিল্প একদিকে ভারতের কৃষি অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ভারতের ২ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষক পরিবারের আর্থিক অবস্থা চিনি শিল্পের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। অন্যদিকে ব্যবহার্য কাঁচামাল রূপে চিনি অ্যালকোহল, প্লাস্টিক, কৃত্রিম রবার, ফাইবার বোর্ড, কাগজ, ওষুধ ইত্যাদি শিল্পের সাথে জড়িত।

২. **বর্তমান অবস্থা :** (ক) স্বাধীনতা লাভের পর, বিশেষত পরিকল্পনাকালে চিনি শিল্পের বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে চিনিকলের সংখ্যা ছিল ১৩৯। সেই সংখ্যা বেড়ে ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে হয়েছে ৩২৩। ১৯৫০-৫১ সালে চিনির উৎপাদন ছিল ১১'৩৪

লক্ষ টন ; ১৯৮৪-৮৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ হল ৬১'৪৩ লক্ষ টন। ১৯৮৪-৮৫ সালে ভারত ১০ হাজার টন চিনি রপ্তানি করেছে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি চিনি শিল্প থেকে প্রতি বৎসর ২০০ কোটি টাকার মতো কর আদায় করে। বর্তমানে এ শিল্প যে পরিমাণ চিনি প্রতি বৎসর উৎপাদন করে তার দাম প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। চিনি কলে আখ সরবরাহ করে কৃষকের মোট বাৎসরিক আয় হয় ৫০০ কোটি টাকা। বিশ্বের চিনি ও আখ উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত চতুর্থ। তা সত্ত্বেও ভারতে বাৎসরিক মাথাপিছু চিনি ভোগের পরিমাণ (১৯৮৪ ৮৫) মাত্র ১০ ৭ কেজি, যেখানে এই ভোগের পরিমাণ কিউবাতে ৭২ কেজি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪২ কেজি, সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫০ কেজি এবং বিশ্বের গড় মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ২০ কেজি।

(গ) সংরক্ষণ নীতির (policy of protection) মাধ্যমে একটি বড় আয়তনের শিল্পকে কিভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল চিনি শিল্প। ১৯৩১-৩২ সালে চিনি শিল্প সংরক্ষণ নীতির সুবিধা পেতে আরম্ভ করে। পরবর্তী ৭ বৎসরের মধ্যে চিনি শিল্পের বিপুল অগ্রগতি হয়। ১৯৩৯ ৪০ সালেই ভারত চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। ১৯৫০ সালে চিনি শিল্পে সংরক্ষণ নীতির প্রত্যাহার করা হয়।

(ঘ) এতকাল ভারতের চিনির কলগুলি প্রধানত উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে কেন্দ্রীভূত ছিল। পরিকল্পনাকালে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য এ শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের কার্যসূচি নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালায় অনেক চিনিকল বসান হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, উত্তর ভারতে অবস্থিত চিনিকলগুলির তুলনায় দক্ষিণ ভারতের চিনিকলগুলির দক্ষতা বেশি ও উৎপাদন খরচও কম। দক্ষিণ ভারতের চিনিকলগুলির নিজস্ব আখের খেত আছে। উত্তর ভারতের চিনিকলগুলি কৃষকদের কাছ থেকে আখ কিনে থাকে।

(ঙ) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চিনি শিল্পে সমবায় ক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতের ৩২৩টি চিনিকলের মধ্যে ১৫২টি চিনিকলই সমবায় ভিত্তিতে উৎপাদন করছে এবং এ কলগুলির উৎপাদন ভারতের মোট চিনি উৎপাদনের ৫৬ শতাংশ।

(চ) ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৯৮৪-৮৫ সালে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৭৬'৪ লক্ষ টন। এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৪-৮৫ সালে ভারতের অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য ৬৬'৪ লক্ষ টন ও রপ্তানির জন্য ১০ লক্ষ টন —এই হিসাবের ভিত্তিতে।

(ছ) চিনি শিল্প অন্যতম প্রধান হলেও, চিনির উৎপাদনের যথেষ্ট ওঠানামা লক্ষ্য করা যায়; ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রায় ৬৫ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হলে চিনির উদ্বৃত্ত হয় এবং চিনি রপ্তানি আরম্ভ হয়। কিন্তু তারপর দুই বৎসর পর পর চিনির উৎপাদন কমে এবং ১৯৭৯-৮০ সালে তা ৩৯ লক্ষ টনে নেমে আসে। সে সময় দেশে চিনির তীব্র সংকট দেখা দেয়। তারপর থেকে আবার উৎপাদন বাড়তে শুরু করে। চিনির উৎপাদনের এই সংকটের মূল কারণটি ছিল আখের উৎপাদন হ্রাস। লাভজনক দর না পাওয়ায় আখ চাষীরা আখের চাষ কমিয়ে দিয়ে তুলা ও অন্যান্য নগদ ফসলের চাষ শুরু করেছিল। চিনি রপ্তানির যে সব দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি রয়েছে এবং দেশে চিনির ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে সে বিষয় দুটির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে চিনির উৎপাদন এখনও যথেষ্ট নয়। তাই এখনও আমরা চিনি সংকটের মধ্যেই রয়েছি, একথা মনে রাখতে হবে।

৩. **সমস্যা :** (ক) **আখের যোগান :** উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন আখের মোটামুটি স্থির দামে নিয়মিত যোগানের অনিশ্চয়তা এ শিল্পের অন্যতম সমস্যা। ভারতে আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবল ওঠানামাই এর কারণ। (খ) **আখের দর :** বিহার ও উত্তরপ্রদেশের চিনিকলগুলির মধ্যে আখের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে আখের দর চড়া হয়। আবার কৃষকেরা আখের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাতে উৎসাহ পায় তার জন্য সরকার আখের দর বাড়াতে অনুমতি দিয়ে থাকে। ফলে কৃষকদের বিক্রয় করা আখের দর বাড়ে। (গ) **উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার :** ভারতের চিনি কলগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় এক পঞ্চমাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। এর কারণ হিসাবে অবশ্য বলা হয় যে, ক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহারের উপযোগী আখের যোগান বাজারে আসে না। (ঘ) **উচ্চ উৎপাদন ব্যয় :** ভারতে একর প্রতি আখের ফলন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফলনের তুলনায় খুবই কম। হাওয়াইতে যেখানে একর প্রতি আখের ফলন ৮১ টন, সম্মিলিত আরব সাধারণতন্ত্রে ৩৯ টন এবং ইন্দোনেশিয়াতে ৩০ টন, ভারতে যেখানে ফলন মাত্র ১৯ টন। গুণগত মানের দিক থেকেও ভারতের আখ নিম্নস্তরের। আখ পেষাই-এর কাজ হয় দক্ষতাহীনভাবে। এসবের ফলে চিনির দাম অনেক বেশি পড়ে যায়। (ঙ) **চিনিকলগুলির পুরানো ও প্রায় অকেজো যন্ত্রপাতি :** আধুনিক সময়ে যে কয়টি চিনিকল স্থাপিত হয়েছে সেগুলি ছাড়া ভারতের চিনিকলগুলির বেশির ভাগই ৪০-৪৫ বৎসরের পুরানো। এসব কলের যন্ত্রপাতির

আধুনিকীকরণ, উৎপাদন ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার, ভগ্ন বা জীর্ণ যন্ত্রাংশের প্রতিস্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। অথচ, স্থাপনাকালে চিনিকলগুলির যন্ত্রপাতির যা দাম ছিল বর্তমানে সেই দাম ১২-১৪ গুণ বেড়েছে। সুতরাং কলগুলির আধুনিকীকরণের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। স্পষ্টতই, চিনিকলগুলির রিজার্ভ ফান্ডে এত অর্থ নেই। (চ) **অলাভজনক আয়তন:** ভারতে অনেকগুলি চিনিকলই ছোট আয়তনের, তাই এদের উৎপাদনক্ষমতা যেমন কম তেমনি অলাভজনক। ভারতে একটি বড় আয়তনের চিনিকলে দৈনিক মাত্র ১,৩৩০ টন আখ পেষাই হতে পারে। তুলনায় ব্রেজিল ২,০৫০ টন, মেক্সিকোতে ২,০৮৬ টন, আর্জেণ্টিনায় ২,৩৭০ টন এবং অস্ট্রেলিয়ায় ২,৮২০ টন। কিছুকাল আগে ইণ্ডিয়ান সুগার প্রডাক্‌টিভিটি টীম ভারতের চিনিকলগুলির দৈনিক আখ পেষণের ক্ষমতা ৩,০০০ টন করার সুপারিশ করেছে; অবশ্যই চিনি শিল্পের স্বার্থে অলাভজনক চিনিকলগুলিকে বর্জন করতে হবে। (ছ) **গুড় এবং খান্দসারির সাথে প্রতিযোগিতা:** সাদা চিনির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল গুড় ও খান্দসারি। আখ চাষীরা গুড় ও খান্দসারির উৎপাদকের কাছ থেকে আখের বেশি দাম পেলে তারা স্বাভাবিকভাবেই চিনিকলগুলিতে আখ বিক্রয়ে আগ্রহী হবে না। এর ফল চিনিকলগুলিতে স্বাভাবিক কারণে যে আখ বিক্রয় হবার কথা সে আখ গুড় বা খান্দসারি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। (জ) **পরিবর্তনশীল সরকারী নীতি:** চিনি উৎপাদনে দারুণ ওঠানামা কখনো ঘাটতির, কখনো বা প্রাচুর্যের অবস্থা সৃষ্টি করছে। এর ফলে চিনির দামও স্থিতিশীল থাকেনি। এরই প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন সময়ে সরকারী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। চিনির মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ, সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে চিনি বণ্টন, চিনির রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। চিনির অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারী নীতি নির্ধারিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ের তাৎক্ষণিক অবস্থার সুরাহা করার উদ্দেশ্যে, কোনো দীর্ঘকালীন সুচিন্তিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে নয়। ফলে সরকারী নীতিরও ঘটেছে ঘন ঘন পরিবর্তন, যার ফল চিনি শিল্পের উপর মোটেই শুভ হয়নি।

৪ **গৃহীত ব্যবস্থা:** চিনি সম্পর্কে অনুসৃত নীতি হল: (১) আখের একটি ন্যূনতম বিধিবদ্ধ দর স্থির করা হয়েছে এবং তার সাথে চাষীদের প্রিমিয়াম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে; (২) চিনির কলগুলির উপর লেভির পরিমাণ ৬৩'৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ করা হয়েছে; (৩) দেশের সর্বত্র লেভি চিনির একটিমাত্র দর ধার্য করা হয়েছে। লেভি চিনি দেশের সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত দোকান মারফত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (৪) চিনির 'বাফার স্টক' বা আপৎকালীন মজুত ভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়েছে; (৫) আখের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য চিনির উপর কুইণ্টাল প্রতি ৫ টাকা হারে একটি কেন্দ্রীয় সেস্‌ ধার্য করা হয়েছে। এ থেকে প্রাপ্ত অর্থে একটি 'ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড' গঠিত হবে। (৬) বর্তমানে সারা দেশে চিনির দর ও বণ্টনের উপর আংশিক বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হয়েছে।

৫. **গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ:** (ক) বর্তমানে চিনির অবাধ বিক্রি (free sale) এবং চিনির লেভির (levy sugar) যে সরকারী নীতি রয়েছে এবং তার ফলে চিনির যে দু'রকম দাম প্রচলিত হয়েছে তার বিলোপ করে এক দামে চিনি বিক্রির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত এবং বিকল্প নীতি রূপে অন্তঃশুল্ক (excise duty)-কে ব্যবহার করা উচিত। (খ) চিনির আপৎকালীন ভাণ্ডারটি এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যেন তার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠানামার এবং দেশে আখের উৎপাদনের ওঠানামার ধাক্কাটা সামলানো যায়। (গ) চিনি কলের মালিকরা (sugar barons) যেভাবে আখচাষী, চিনি শ্রমিক ও সাধারণ ক্রেতাদের শোষণ করে চলেছে তার অবসান ঘটাবার জন্য চিনি শিল্পটির জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। এই দাবি অনেক দিনের।

২৭.৫. ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প

The Engineering Industry

১. **গুরুত্ব:** ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ভারতে একটি নতুন শিল্প। স্বাধীনতা লাভের পরে এর জন্ম। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারী শিল্পকে কেন্দ্র করে দ্রুত শিল্পায়নের যে কর্মসূচি গৃহীত হয় তার দরুন এই শিল্পটির অতি দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। ফলে বর্তমানে ভারত অনেক ধরনের ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি নির্মাণে যে স্বনির্ভর কেবল তা নয়; ভারত এখন এই শিল্পের তৈরী নানান দ্রব্য রপ্তানিও করছে। এই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি দুই রকমের: (ক পুঁজিদ্রব্য বা যন্ত্রপাতি এবং (খ) দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য।

২. **বর্তমান অবস্থা:** ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে শিল্পটির মোট উৎপাদন ৫০ কোটি টাকা থেকে ৮৬০ গুণেরও বেশি বেড়ে ৪,৩০০ কোটি টাকায় ওঠে। ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানি ১৯৫০ ৫১ সালে মাত্র ৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১২৩ গুণেরও বেশি বেড়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৭৩৮ কোটি টাকায় ওঠে। যে বৎসর তা ছিল ভারতের মোট রপ্তানির ২৪ শতাংশ।

৩. সমস্যাবলী : ভারতের অন্যান্য শিল্পের মতই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে চড়া উৎপাদন খরচ, চাহিদার অবনতি, উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার, কাঁচামালের যোগানের অনিশ্চয়তা, বিদ্যুৎ, কয়লা, পরিবহণ, সর্বাধুনিক প্রকৌশলের অভাব, অর্থসংস্থান, বিক্রয় ইত্যাদি সংক্রান্ত নানান অসুবিধা। তা ছাড়া রুগ্নতার প্রবণতা তো রয়েছেই। সর্বোপরি রয়েছে অভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধতা ও রপ্তানী বাজারে তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং উন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে অনুসৃত সংরক্ষণ নীতি। শেষোক্ত কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অংশ অতি সামান্য এবং তার মধ্যে আবার ভারতের অংশটি অতি নগণ্য, শতকরা ১ শতাংশেরও অনেক কম। এই কারণে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির হারটি এখন নিম্নমুখী।

৪. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : ভারতের অর্থনীতির যতই আধুনিকীকরণ ও বৈচিত্র্যকরণ ঘটবে ততই শিল্পের জন্য নানান পুঁজিদ্রব্য তথা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে। সেই সঙ্গে আয় ও কর্মসংস্থান যত বাড়বে তত দীর্ঘস্থায়ী নানারূপ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। অর্থাৎ এই জাতীয় ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা হল আয়-স্থিতিস্থাপক (income-elastic)। সুতরাং ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দেশীয় বাজারের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। অন্যদিকে প্রকৌশলে উন্নতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন খরচ যতটা কমানো সম্ভব হবে ততটা পরিমাণে রপ্তানি বাজারে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের চাহিদা ও বিক্রি বাড়বে। ইতোমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের বাজারে এবং উন্নত দেশগুলিতেও ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য সুনাম অর্জন করেছে। সুতরাং শিল্পটির সামগ্রিক ভবিষ্যৎ অবশ্যই আশাব্যঞ্জক।

২৭.৬. শিল্পসংস্কার

Rational sation

শিল্পসংস্কার শব্দটির অর্থ ব্যাপক। এর দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার, বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও বিভাগের কার্যাবলীর সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান, শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা, পণ্য বিক্রয়ব্যবস্থা এবং পরিবহণ ও অর্থসংস্থানের উন্নয়ন, এমন কি কারবারের কাঠামোর পরিবর্তন ও কারবারী জোট গঠন পর্যন্ত বোঝায়। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে অপচয় এবং অদক্ষতা দূর করে সর্বাধিক ব্যয়সঙ্কোচ করাই শিল্পসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

শিল্পসংস্কারের যৌক্তিকতা : প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব : শিল্পসংস্কারের দ্বারা অনেকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়। এগুলি চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে; যেমন, (১) শিল্প বা শিল্পপতিদের সুবিধা। (২) শ্রমিকদের সুবিধা। (৩) ভোগীদের সুবিধা। (৪) সমগ্র দেশের সমাজের সুবিধা।

শিল্প বা শিল্পপতিদের সুবিধা : শিল্পসংস্কারের ফলে অপচয় হ্রাস ও বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচন হয়। শিল্পের দক্ষতা ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বাড়ে। যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। এই সকল কারণে সামগ্রিক ফল হিসাবে পণ্যের উৎপাদন-খরচ হ্রাস পেয়ে শিল্পের প্রতিযোগিতা-শক্তি বাড়ে।

শ্রমিকদের সুবিধা : বিশেষায়ন, যন্ত্রীকরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির দরুন শ্রমিকদের দক্ষতা ক্রমেই উন্নত হয়। তাতে তাদের উপার্জন ও জীবনযাত্রার মান বাড়ে। বিবিধ শিল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, যন্ত্রীকরণ ও বিশেষায়নের জন্য শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা কার্যের সমন্বয় ও সংযোগ বাড়ে। সেজন্য শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পায়।

ভোগীদের সুবিধা : শিল্পসংস্কারের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় বলে ভোগীরা স্বল্পদামে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় ও ভোগে সমর্থ হয়।

সমগ্র সমাজের সুবিধা : পণ্যের মূল্য হ্রাস, উৎকর্ষ বৃদ্ধি, শ্রমিকদের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বাজারে পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় ও তাতে দেশের কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও জাতীয় আয় বাড়তে থাকে। দেশীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত হয় এবং শিল্পের স্থিতিশীলতা বাড়ে বলে দেশের অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্পসংস্কারের বাধা : শিল্প শ্রমিক, ভোগী এবং জাতীয় স্বার্থ, সব দিক থেকেই শিল্পসংস্কার কাম্য হলেও শিল্পপতি ও শ্রমিক, উভয় পক্ষই কখনও কখনও এর বিরোধিতা করে।

শিল্পপতিদের বিরোধিতা : পুরাতন যন্ত্রপাতি বর্জন করে নতুন পুঁজি বিনিয়োগ করে যথেষ্ট মুনাফা পাওয়া যাবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চয়তার অভাবে শিল্পপতিরা শিল্পসংস্কারে উৎসুক হয় না।

বর্তমানে দেশের শিল্পক্ষেত্রে জাতীয়করণের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। প্রচুর অর্থব্যয়ে শিল্পসংস্কারের পর শিল্পের জাতীয়করণ ঘটতে পারে এমন আশঙ্কাও বেসরকারী শিল্পসংস্কারকে নিরুৎসাহিত করে।

শ্রমিকদের বিরোধিতা : এতে শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ যেরূপ বৃদ্ধি পায় তাদের মজুরি সেরূপ বাড়ানো হয়

না। এতে পুরাতন শ্রমিকদের একাংশের কর্মচ্যুতি অনিবার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রতি বৎসর বহু শ্রমিক কর্মচ্যুত হচ্ছে। এ কারণে ভারতের সব শ্রমিক সংগঠনগুলি কম-বেশি পরিমাণে শিল্পসংস্কারের বিরোধিতা করেছে এবং এর প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘটও হয়েছে।

২৭.৭. ভারতের শিল্পসংস্কার
Rationalisation in India

অতীতে বিদেশী শাসনকালে দেশের প্রধান শিল্পগুলির শিল্পসংস্কারের প্রয়োজন থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর, বিশেষত বর্তমানে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শিল্পগুলির উৎপাদন খরচ হ্রাস, দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের গণাগুণ বৃদ্ধির জন্য এটি অবশ্য প্রয়োজন। এ ছাড়া উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমিয়ে চাহিদা ও বিক্রয় বাড়াবার অন্য কোনো উপায় নেই উপরন্তু শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যও এটা প্রয়োজন। তবে এর পথে প্রধান বাধা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব এবং শিল্পে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা। তৎসত্ত্বেও সরকারী অর্থ সাহায্যে ও উৎসাহে ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলিতে শিল্পসংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে ছাঁটাই শ্রমিকদের বিকল্প কাজের বন্দোবস্ত করা না হলে শিল্পসংস্কারের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সরকারী নীতি ঘোষিত হলেও, শিল্পসংস্কারের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে এবং তাদের বিকল্প কাজের উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে না। তা ছাড়া, শিল্পসংস্কারের ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়ে এবং শ্রমিকদের উপর কাজের চাপও বাড়ে। সুতারং শিল্পসংস্কারের সাথে সাথে যেমন শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি থাকা দরকার তেমনি দরকার তাদের মজুরি ও বেতনের আনুপাতিক বৃদ্ধি।

চটকলে শিল্পসংস্কার: ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চটকল তদন্ত কমিশন শিল্পটির সংস্কারের আবশ্যকতা নির্দেশ করে। এরপর থেকে দ্রুতগতিতে শিল্পটির যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ আরম্ভ হয়। ১৯৫৭ সালে রপ্তানী প্রসার কমিটি (ডি সুজা কমিটি) অদক্ষ চটকলগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করে। প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকে দেশে পাটের উৎপাদন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টা চলতে থাকে ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য অনুমতিপত্র দেওয়া হতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে চটকল শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯৫৭ সালের রপ্তানি প্রসার কমিটি বিশ্ববাজারে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের প্রচার ও বিক্রয় প্রচেষ্টা তীব্রতর করার পরামর্শ দেয়। শিল্পসংস্কারের জন্য জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন মারফত সরকার চটকল শিল্পে ঋণ দেওয়া আরম্ভ করে। শিল্পসংস্কারের ফলে যাতে অহেতুকভাবে শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চটকল শিল্পসংস্কারের অ্যাড হক কমিটির শিল্পসংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটি সুপারিশ করে (ছাঁটাই শ্রমিকদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করতে না পারলে তাদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য প্রাপ্য শোধ করা, সাময়িকভাবে নিযুক্ত নারী-শ্রমিকদের শিল্পবিরোধ আইনের অধীনস্থ শ্রমিক বলে গণ্য করা প্রভৃতি)।

শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উপর যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পর্যায়ক্রমে চটকল শিল্পের সংস্কারসাধন চলেছে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে ভারতের চটকল শিল্পে ধীরগতিতে শিল্পসংস্কার অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান চটকলগুলির স্পিনিং পর্যায়ের আধুনিকীকরণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন চটকলগুলি আধুনিকীকরণের জন্য ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশনও এজন্যে ৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং ১৯৭০ সালে ভারত সংকার এ উদ্দেশ্যে .০ কোটি টাকার একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করেছে। বর্তমান আধুনিকীকরণের যে কাজ চলেছে তা শেষ হলে চটকল শিল্পের প্রায় ৬০ শতাংশ পুরানো মাকু বদলানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এরই পাশাপাশি দেশে চটকলের পক্ষে অত্যাবশ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজও চলেছে।

তুলাবস্ত্র শিল্পে শিল্পসংস্কার: ১৯৫০ সালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন, ১৯৫০ সালে তুলাবস্ত্র শিল্পের অনুসন্ধানকারী দলের কারিগরী সাব কমিটি, ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত দল, ১৯৫৪ সালে গঠিত শিল্প ও শ্রম সংক্রান্ত যুক্ত পরামর্শদাতা পরিষদ প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা ও কমিটি তুলাবস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন ও শিল্পসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে। ১৯৫৪ সালে বস্ত্র শিল্প অনুসন্ধান কমিটি (কানুনগো কমিটি) তুলাবস্ত্র শিল্পে স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসাবার পরামর্শ দেয়। এর পর থেকে বস্ত্রকলগুলিতে স্বয়ংক্রিয় তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে তুলাবস্ত্র শিল্পের সংস্কারকে শিল্পায়ন কার্যক্রমের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় বলে গণ্য করা হয়। ১৯৫৮ সালে তুলাবস্ত্র

শিল্প অনুসন্ধান কমিটি (যোশী কমিটি) তুলাবস্ত্র শিল্পের সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবনের জন্য নিযুক্ত হয়। এর সুপারিশ অনুসারে তুলাবস্ত্র শিল্পের সংস্কার সাধনের সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেছে। কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী ভারত সরকার একটি তুলাবস্ত্র শিল্প পরামর্শদাতা কমিটি, একটি তুলাবস্ত্র শিল্প পরামর্শ-দাতা পর্ষৎ ও একটি শিল্পসংস্কার সাব কমিটি নিয়োগ করেছে। তুলাবস্ত্র শিল্পের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, বিদেশী মুদ্রা ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯৬১ সালে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (NIDC) কর্তৃক একটি অনুসন্ধানকারী দল নিযুক্ত হয়। সেই দলের সুপারিশ অনুযায়ী শিল্পসংস্কারের জন্য জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন ঋণদান করেছে।

১৯৬৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন তুলাবস্ত্র কলের শিল্পসংস্কারের জন্য ২১ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। করপোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত অনুসন্ধানকারী দলের রিপোর্ট (এপ্রিল, ১৯৬১) বলা হয় যে, ভারতের তুলাবস্ত্র কলের সম্পূর্ণ সংস্কারের জন্য সর্বাধিক ৮০০ কোটি ও সর্বনিম্ন ১৮০ কোটি টাকা লাগবে। সর্বনিম্ন হিসাবে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রতি বৎসর এজন্য ৩০·৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং সমগ্র তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৬০ কোটি টাকার বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে। এই ১৮০ কোটি টাকার মধ্যে তুলাবস্ত্র শিল্প তার সঞ্চয় ও ঋণ দ্বারা ৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। বাকী টাকা ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেল-পমেণ্ট করপোরেশন ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে। অনুসন্ধানকারী দল আরও বলেন যে, ভারতের মোট ৩৯টি বস্ত্রকল জরাজীর্ণ। এদের মধ্যে ২০টি বস্ত্র-কলের বিলোপ ঘটানো ছাড়া উপায় নেই। বাকি ১৯টি বস্ত্রকলের পুনর্বাসন সম্ভব। এজন্য, প্রয়োজনীয় আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কয়লা শিল্পে শিল্পসংস্কার : ১৯৫১ সালে কয়লা শিল্পের ওয়ার্কিং কমিটি সুপারিশ করে যে, কয়লার উৎপাদন বাড়াতে হলে বড় বড় কয়লাখনির যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও শিল্পসংস্কার এবং যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। তা না হলে দক্ষতা বাড়বে না এবং উৎপাদন খরচ কমবে না। বর্তমানে কয়লা শিল্পের জাতীয়করণের পর এ কাজটি সহজসাধ্য হয়েছে এবং তা এগিয়ে চলেছে। পঞ্চম পরি-কল্পনায় কয়লা উৎপাদন লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আধুনিকী-করণ, শিল্পসংস্কার ও যান্ত্রিকীকরণ সহ সমগ্র শিল্পটির পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিকভাবে কয়লার উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হবে এবং কয়লা শ্রমিকদের প্রতিও ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে।

২৭.৮. ভারতে শিল্প-রুগ্নতা সমস্যা
Problem of Industrial Sickness in India

১. **শিল্প-রুগ্নতা :** শিল্প-রুগ্নতা বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যে অবস্থায় একটি শিল্পের অন্তর্গত একাধিক শিল্পসংস্থা একাদিক্রমে কয়েক বৎসর ধরে নগদ টাকা লোকসান দিচ্ছে, আর্থিক ভারসাম্য হারিয়েছে, নিজেদের অভ্যন্তরীণ সম্বল থেকে আর্থিক তহবিল সৃষ্টি করে নিজের কাজকর্ম বজায় রাখতে পারছে না এবং তাদের পুঁজির তুলনায় দায় দেনা বেড়েই চলেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে, যে শিল্প সংস্থা পূর্ববর্তী বৎসর নগদ টাকা লোকসান দিয়েছে, এ বছর দিচ্ছে এবং আগামী বৎসরও (ঋণদাতা ব্যাঙ্কের মতে) সম্ভবত ফের নগদ টাকা লোকসান দেবে, তাকে একটি রুগ্ন শিল্প সংস্থা বলে গণ্য করা যায়। যে শিল্পে এরকম একাধিক রুগ্ন সংস্থা দেখা যায় তাকে রুগ্ন শিল্প বলা যায়।

২. ধনতন্ত্রে বেসরকারী উদ্যোগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্প-রুগ্নতা বিরল ঘটনা নয়। উন্নত ধনতন্ত্রী দেশেও হামেশাই শিল্প-রুগ্নতা দেখা যায়। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন শিল্পে বহুসংখ্যক সংস্থা দেউলিয়া হয়ে যায়, উঠে যায়। তখন অন্যান্য শিল্প সংস্থা বা কোম্পানি কর্তৃক দেউলিয়া সংস্থাগুলির বিত্ত-সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে সংযুক্তি (amalgamation) বা একীকরণের (merger) দ্বারা কিংবা সরকার কর্তৃক জাতীয়করণের দ্বারা সংস্থাগুলিকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করা হয়। কখন বা এরকম কিছুই ঘটে না, সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। সুতরাং শিল্প-রুগ্নতা একমাত্র ভারতেরই বিশেষ রোগ নয়।

৩. শিল্প সংস্থার ও শিল্পের রোগ দেশের পক্ষে বিষম সমস্যার সৃষ্টি করে। রুগ্ন সংস্থার শ্রমিক-কর্মীদের জীবন, জীবিকা, আর্থিক নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। উৎপাদন ও জাতীয় আয় হ্রাস পায়। বিনিয়োজিত পুঁজি বিনষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। কাঁচামালের যোগানদার ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাজারের সামগ্রিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। অতএব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে শিল্পরুগ্নতার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

৪. **শিল্প-রুগ্নতার লক্ষণ :** এ পর্যন্ত শিল্প রুগ্নতার ছয়টি লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে : (ক) স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধ ও বিধিবদ্ধ দায় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের অভাব—এটি হল শিল্প-রুগ্নতার প্রথম লক্ষণ।

কোনো শিল্প সংস্থা যখন খরিদ করা কাঁচামালের দাম দিতে পারে না, শ্রমিক-কর্মীদের মজুরি ও বেতন দিতে দেরি করে, স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, এবং শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে নিজের দেয় চাঁদা ও উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর প্রভৃতি সরকারের নিকট জমা দিতে অপারগ হয়, তখন সংস্থাটি শিল্প ব্যাধির কবলে পড়েছে বুঝতে হবে।

(খ) কাঁচামাল, অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্য এবং সম্পূর্ণ তৈরী দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মজুদভাণ্ডার (inventories) শিল্প-রুগ্নতার দ্বিতীয় লক্ষণ। উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ে অক্ষমতার ফলেই অবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(গ) লাভজনকভাবে কারবার চালাতে হলে প্রত্যেক শিল্প সংস্থাকে অন্তত সেই পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রয় করতে হয় যতটা পরিমাণে করা হলে তার স্থির ও পরিবর্তনীয় খরচ ওঠে, গড় খরচ দামের সমান হয়। এই অবস্থাটাকে শিল্প সংস্থার আয়-খরচ সমতার বিন্দু (break-even point) বলে। উৎপাদন ও বিক্রয় তার কম হলে, গড় খরচ দামের বেশি হয়, তাতে লোকসান হয় এবং শিল্প সংস্থাটি তার উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারছে না ও উৎপাদন ক্ষমতা খানিক পরিমাণে অব্যবহৃত থাকছে (unutilised capacity) বোঝায়। এটি শিল্প-রুগ্নতার একটি গুরুতর লক্ষণ।

(ঘ) বিনিয়োগজাত আয় (return on investment) —সমস্ত স্থির ও পরিবর্তনীয় খরচ মিটিয়ে কারবারী সংস্থাকে এমন একটা হারে মুনাফা উপার্জন করতে হয় যা ভবিষ্যতে তার আর্থিক ও বৈষয়িক পরিস্থিতিকে সুদৃঢ় করবে এবং তার সম্প্রসারণে সাহায্য করবে। এজন্য মুনাফার হারটি বাজার চলতি সুদের হারের চাইতে বেশি হওয়া দরকার। ওই দু'টি হারের তুলনা থেকে সংস্থার স্বাস্থ্যের অবস্থা ধরা পড়ে। রুগ্ন সংস্থার মুনাফার হার বাজার চলতি সুদের হারের তুলনায় কম হয়ে থাকে।

(ঙ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে, শিল্পসংস্থার চলতি বিত্ত-সম্পত্তি ও চলতি দেনার (ratio of current assets to current liabilities) অনুপাত যদি সমান সমান না হয়ে তার কম হয় (less than 1 : 1), তাহলে সংস্থাটিকে রুগ্ন বলে গণ্য করতে হবে। ওই অবস্থায় সংস্থাটির নগদ অর্থের লোকসান হবে এবং তারল্য (liquidity) কমতে থাকবে। তেমনি সংস্থাটির মোট দায় ও নীট সম্পত্তির মূল্যের অনুপাত (ratio of total liabilities to net worth or debt-equity ratio) যদি কমতে থাকে তাহলেও সংস্থাটি ব্যাধিগ্রস্ত বলে বুঝতে হবে।

(চ মেয়াদী ঋণের সুদ প্রদানে বা কিস্তিশোধে অক্ষমতাও শিল্প সংস্থার রুগ্নতার অন্যতম লক্ষণ বলে গণ্য করতে হবে।

(৫) **ভারতে শিল্প-রুগ্নতার বিস্তার :** বিগত ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে ভারতে শিল্প রুগ্নতার সূত্রপাত ঘটে এবং সত্তরের দশকে তা প্রকট হয়ে ওঠে। বর্তমানে তা আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে এবং কেবল কয়েকটি প্রধান প্রধান পুরাতন বৃহদায়তন শিল্পই নয়, আধুনিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহদায়তন শিল্পও এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মাঝারি আয়তনের শিল্পক্ষেত্র আক্রান্ত হয়েছে যেমন তেমনি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রটিতে এ ব্যাধি পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সুতরাং শিল্পায়নের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা শুরু হতে না হতেই দেশের ছোট-বড়-মাঝারি, সমস্ত আয়তনের শিল্পই যে শিল্প-রুগ্নতার শিকার হয়েছে তা দেশের পক্ষে গুরুতর সমস্যা ও দুর্ভাবনার বিষয়।

সারণি ২৭-১ : ১ কোটি টাকার বেশি ঋণপ্রাপ্ত রুগ্নশিল্প সংস্থাগুলির শিল্পগত অবস্থা

শিল্প	সংস্থার সংখ্যা		অপরিশোধিত ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)		মোট ব্যাঙ্ক ঋণের শতাংশ
	মার্চ, ১৯৮০	জুন, ১৯৮৪	মার্চ, ১৯৮০	জুন, ১৯৮৪	
১. সুতি কাপড়	১৮৬	১৪০	৩৩২	৬৯৮	৩৩.০
২. চটকল	৩৪	৩৬	৯১	১২০	৫.৭
৩. ইঞ্জিনিয়ারিং (লৌহ ইস্পাত)	১৩০	১৫৬	৩৭৮	৫৯৭	২৮.৩
৪. রাসায়নিক	২২	২৯	১৩৯	১৫৭	৭.৫
৫. চিনি	৪৮	৪৩	১০৪	১৬৪	৭.৮
৬. সিমেণ্ট	৪	২	১৪	৯	০.৪
৭. রবার	৮	১৬	৪০	১২৩	৫.৮
৮. অন্যান্য	৫০	৯১	১২৩	২৪৩	১১.৫
মোট	৪৮২	৫১৩	১,২২১	২,১১১	১০০.০

সূত্র : Report on Currency and Finance Vol 1 1984-85 and earlier issues.

কাপড়ের কল অধিগ্রহণ করেছে সেগুলির কিংবা মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন রুগ্ন সংস্থাগুলির সংখ্যা ও ঋণের পরিমাণ ধরা হয়নি। তা ধরা হলে যাবতীয় রুগ্ন শিল্প সংস্থাকে দেওয়া অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ২,৫০০ কোটি টাকার কম হবে না।

সারণি ২৭-২ : শিল্প-রুগ্নতা

বছর	বড়	মাঝারি	ছোট	মোট সংখ্যা
	রুগ্ন কারখানার সংখ্যা			
ডিসেম্বর, ১৯৮০	৪০৯	৯৯২	২৩,১৪৯	২৪,৫৫০
„ ১৯৮১	৪২২	৯৯৪	২৫,৩৪২	২৬,৭৫৮
„ ১৯৮২	৪৪৪	১,১৭৮	৫৮,৫৫১	৬০,১৭৩
„ ১৯৮৩	৪৯১	১,২৫৬	৭৮,৩৬৩	৮০,১১০
„ ১৯৮৪	৫৪৫	১,২৮৭	৯১,৪৫০	৯৩ ২৮২
„ ১৯৮৫	৬৩৭	১,১৮৬	১,১৭,৭৮৩	১,০০ ৬০৬
„ ১৯৮৬	৭১৪	১,২৫০	১,৪৫,৭৭৬	১,৪৭,৭৪০
বকেয়া দেনা				(কোটি টাকায়)
ডিসেম্বর ১৯৮০	১,৩২৪'৪৭	১৭৮'৪২	৩০৫'৭৭	১,৮০৮'৬৬
„ ১৯৮১	১,৫৭৮'৮৩	১৮৭'৬৩	৩১৯ ০৭	২,০২৫'৫৪
„ ১৯৮২	১,৭৯০'৬০	২২৫'৭৬	৫৬৮'৯৭	২,৫৮৫'৩৩
„ ১৯৮৩	২,০১৪'৩৩	৩৫৭ ৯৭	৭২৮'৯৯	৩,১০১'২৯
„ ১৯৮৪	২,৩৩০'১২	৫২৮'৫৮	৮৭৯'৬৯	৩,৬৩৮ ৩৯
„ ১৯৮৫	৩,২০৮·৬৪	২৪২'০৭	১,১৮৪'২২	৪·৬৬৫ ২৩
„ ১৯৮৬	৩,২৮৭ ০২	২৫১'০৭	১,৩০৬'১০	৪,৮৭৪'৪৯

সূত্র : Economic Survey, 1987-88

সারণি ২৭-৩ : শিল্প-রুগ্নতা : চলনক্ষম সংস্থার সংখ্যা

কারখানা	সংখ্যা	কোটি টাকা
১. চলনক্ষম (viable) :	১৭,৭০৮	২,১৬৭'৮৮
২ চলনক্ষমতাহীন :	১,২৭,৭১৯	২,৪২১'৮৪
৩. যাদের চলনক্ষমতা এখনও যাচাই হয়নি	২,৩১৩	২৪৪'৭৭
মোট	১,৪৭,৭৪০	৪,৮৭৪'৪৯

সূত্র : Economic Survey, 1987-88.

৬ **রাজ্যগত অবস্থা :** ১৯৮৩ সালের জুন মাসে যে ৪৬৩টি বৃহদায়তন রুগ্ন সংস্থা ছিল তাদের প্রায় ৮০ শতাংশ বা ৩৬৩টি সংস্থা কেন্দ্রীভূত ছিল ভারতের ৬টি রাজ্যে, যথা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিল নাড়ু ও গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশে। এদের কাছে অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ছিল মোট অনাদায়ী ঋণের ৮৪ শতাংশ।

৭. **গুরুত্ব :** পরিস্থিতি সম্পর্কে ষষ্ঠ পরিকল্পনার দলিলে মন্তব্য করা হয়েছিল : "শিল্প-রুগ্নতা কেবল যে বেকার সমস্যাকেই তীব্র করে তোলে তা নয়, বিনিয়োজিত পুঁজিকে করে তোলে ফলহীন এবং শিল্পোন্নতির পক্ষে সৃষ্টি করে প্রতিকূল পরিবেশ। উন্নত দেশগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায়, শিল্পক্ষেত্রে এরকম পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু যে দেশে বেকার সমস্যা একটা প্রধান সমস্যা এবং উপকরণও স্বল্প, সে দেশের পক্ষে এরকম শিল্প-রোগ অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে অনেক বেশি গুরুতর। স্পষ্টতঃই শিল্প-রোগ এমন একটি ক্ষেত্র যার উপর সরকারকে বেশি অগ্রাধিকার দিতেই হবে"। অবশ্য, তা সত্ত্বেও শিল্প-রোগের বিস্তার ঘটেই চলেছে এবং এ বাবৎ গৃহীত সরকারী ব্যবস্থাগুলি কার্যকর হয়নি।

৮. **শিল্প-রুগ্নতার কারণ :** শিল্প-রুগ্নতার কারণ-গুলি দুরকমের : (ক) বাহ্য এবং খ) অভ্যন্তরীণ।

(ক) **বাহ্য কারণ (external causes or factors) :** বাহ্য কারণগুলি নানা রকমের। প্রথমত, দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন বা ক্রয়-বিক্রয় ও দাম সম্পর্কে সরকারী নীতি; দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাগুলিতে বিবিধ শিল্প সম্পর্কে অগ্রাধিকারের ও সেহেতু বিনিয়োগের ধাঁচ সম্পর্কে সরকারী নীতির পরিবর্তন এবং তৃতীয়ত, জাতীয় আয় ও মজুরি নীতির প্রণয়নে সরকারী অক্ষমতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা যায়, কন্ট্রোল কাপড়সংক্রান্ত সরকারী নীতি সুতীকাপড় শিল্পের

বিপত্তির অন্যতম কারণ হয়েছে; শিল্পে বিনিয়োগের ধাঁচের পরিবর্তনের দর্ন একাধিক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; আয় ও মজ্বরি সম্পর্কে কোনো জাতীয় নীতি প্রণয়নে সরকারের অক্ষমতার দর্ন ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে বিচ্ছিন্নভাবে মজ্বরি ও বেতন সংক্রান্ত চুক্তির ফলে সমকাজে সমবেতন নীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দর্ন শ্রমবিক্ষোভ ও শিল্পে অশান্তি বেড়েছে এবং বিভিন্ন শিল্পের অসুস্থতার অন্যতম কারণে পরিণত হয়েছে। তবে, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগ্বলির অসুস্থতার জন্য এই কারণটিকে দায়ী করা যায় না। কারণ সরকারী নীতি মোটাম্বটিভাবে ক্ষ্বদ্রশিল্পগ্বলির আগাগোড়া সহায়ক না হলেও বির্প ছিল না।

(খ) অভ্যন্তরীণ কারণ (Internal causes or factors) : কিন্তু সরকারী নীতির ভুলত্রুটি এবং অক্ষমতা তথা বাহ্য কারণের চাইতে শিল্প-অসুস্থতার জন্য বেশি দায়ী হল শিল্প সংস্থার অভ্যন্তরীণ কারণগ্বলি। এদের মধ্যে রয়েছে, সংস্থার পরিচালকদের কুপরিচালনা, নির্ধারিত উদ্দেশ্যে সংস্থার তহবিল ব্যবহার না করে এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করা, লভ্যাংশ সম্পর্কে অবিবেচনাপূর্ণ নীতি, অত্যধিক উপরি খরচ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে অবচিতির অভাব, উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য চাহিদা সম্পর্কে অত্যধিক আশা ও অন্বমান ইত্যাদি; এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ কারণগ্বলি বিচার-বিবেচনার পর, পরিকল্পনা কমিশন ষষ্ঠ পরিকল্পনার দলিলে মন্তব্য করেছেন, "শিল্প-অসুস্থতার সমস্ত কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ হল পরিচালকবর্গের অযোগ্যতা।" বস্তুতঃপক্ষে অধিকাংশ র্গ্ন শিল্প-সংস্থার ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে। শিল্প পরিচালকবর্গের কুপরিচালনা ও অযোগ্যতার বিষয়টি আমাদের প্রাক্তন ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার অপকীর্তির কথাই মনে করিয়ে দেয়। যতদিন সংস্থাটি লাভজনক থাকে ততদিন পরিচালকবর্গ ও প্রধান শেয়ারহোল্ডারগণ নানাভাবে সংস্থাটিকে শোষণ করে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে সংস্থাটিকে অপমৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।

ক্ষ্বদ্র শিল্প সংস্থাগ্বলির অসুস্থতার জন্য দায়ী কারণগ্বলির মধ্যে রয়েছে, পরিচালকদের অভিজ্ঞতার অভাব; উপযুক্ত পরিমাণ পুঁজির ব্যবস্থা না করে প্রথম দিকে ঋণের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করা, সুসময়ে মুনাফা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যন্তরীণ তহবিল সৃষ্টি না করে মুনাফার অধিকাংশ তুলে ফেলা, অত্যধিক পরিমাণে মজুদ ধারণ করা প্রভৃতির দ্বারা কারবার পরিচালনার বুনিয়াদী নীতিগ্বলি লঙ্ঘন করা; কার্যকর পুঁজির অভাব, চাহিদার অভাব, কাঁচামালের অভাব প্রভৃতির দর্ন উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের অক্ষমতা; সমস্ত দিক বিচার না করে সংস্থাগ্বলিকে সহজে সরকারী অন্বমোদন দান; ঋণের অভাব; এবং যেসব বৃহৎ শিল্প এ সব সংস্থাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে তাদের কাছ থেকে সময় মতো পাওনা টাকা আদায়ের অক্ষমতা প্রভৃতি।

৯. র্গ্ন শিল্প সংস্থা সম্পর্কে সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা : র্গ্ন শিল্প সংস্থা সম্পর্কে সর্বপ্রথম সরকারী নীতি ঘোষণা করা হয় ১৯৭৮ সালে। ১৫ই মে সংসদে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ এ সম্পর্কে সংসদে যে নীতিটি ঘোষণা করেন তার সারাংশ হল :

(ক) র্গ্ন অবস্থার প্রথম দিক থেকেই সরকার শিল্প সংস্থাগ্বলির কাজকর্ম সম্পর্কে নজর রাখবে (monitoring)।

(খ) ঋণদাতা সংস্থাগ্বলি মিলিতভাবে পেশাদার পরিচালকদের একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলবে এবং যেসব সংস্থায় পরিচালনার অযোগ্যতা দেখা যাবে সেখানে ওই গোষ্ঠী থেকে পরিচালক নিয়োগ করবে। পরিচালকদের মধ্যে দুর্নীতি দেখা গেলে ওই সংস্থাকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করা হবে।

(গ) র্গ্ন সংস্থাগ্বলি অধিগ্রহণ বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য সরকার একটি স্ক্রীনিং কমিটি নিয়োগ করবে। কমিটির বা রাজ্য সরকারের বা ঋণদাতা সংস্থার সুপারিশ অন্বযায়ী র্গ্ন সংস্থাটিকে স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে অধিগ্রহণ করা হবে। অধিগৃহীত সংস্থাটিকে পরে চাল্ব সংস্থার্পে বিক্রি করা যেতে পারে কিংবা তার শেয়ার পুঁজির পরিবর্তন, ঋণের পরিবর্তন, সরকার কর্তৃক শেয়ার খরিদ, প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাটির কাঠামোর রদবদল করে, নতুন পরিচালক পর্ষদ নিয়োগ করে সরকার তা নিজের হাতে রাখতে পারে। প্রয়োজনবোধে সরকার সংস্থাটিকে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অন্তর্ভুক্তও করতে পারে। ক্ষ্বদ্র শিল্প ক্ষেত্রে র্গ্ন সংস্থাগ্বলির প্রতি সরকার বিশেষ যত্নবান হবে।

ওই সরকারী নীতি ঘোষণার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক র্গ্ন শিল্প সংস্থাগ্বলির উপর নজরদারির জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেল (monitoring cell) গঠন করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও আঞ্চলিক সেল গঠিত হয়।

গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, র্গ্ন শিল্প সংস্থাগ্বলির পুনর্জ্জীবনের জন্য ঋণদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭১ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে ভারতের শিল্প পুনর্গঠন করপোরেশন (IRCI) গঠন করে। ১৯৮৪ সালে এই সংস্থাটিকে পার্লামেন্টে গৃহীত আইনের দ্বারা ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (IRBI) র্পে পুনর্গঠন করা হয়। এই নবগঠিত সংস্থা র্গ্ন সংস্থাগ্বলিকে শুধু পুনর্গঠনের জন্য ঋণই দেয় না,

উন্নয়নের জন্যও ঋণ দেয়। এম. আর. টি. পি. এবং ফেরা আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহুজাতিক করপোরেশনগুলিকে রুগ্ন শিল্প সংস্থার পুনর্গঠনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেবার ক্ষমতাও শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়েছে। রুগ্ন শিল্প সংস্থাকে সুস্থ কোনো শিল্প সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষমতা এবং রুগ্ন শিল্প সংস্থা অধিগ্রহণ ও পরিচালনা করার ক্ষমতাও এই ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়েছে।

১০. **মন্তব্য ঃ** ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে ১১৬৪টি বড়ো ও মাঝারি শিল্প সংস্থা এবং ১,৪৫,৭৭৬টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা রুগ্ন ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ বড়ো ও মাঝারি সংস্থাকে সাহায্য করা হলে তারা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থাগুলির অধিকাংশই সাহায্য পেলেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না।

সুতরাং এ পর্যন্ত রুগ্ন শিল্পের জন্য গৃহীত সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। শিল্প ব্যাধির প্রতিকারে সরকার কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারেনি। ক্ষুদ্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দানের তাবৎ বাগবিস্তার সত্ত্বেও অধিকাংশ সাহায্যই করা হয়েছে বড়ো শিল্প সংস্থাগুলিকে। রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অংশগ্রহণের ব্যবস্থার দ্বারা সরকার বহুজাতিক করপোরেশনগুলির জাল বিস্তারে সাহায্য করবে কিন্তু তা ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষতি ছাড়া মঙ্গল করবে না।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের চটকল শিল্পের অথবা কয়লাখনি শিল্পের বর্তমান সমস্যা আলোচনা কর। শিল্পটির বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য তুমি কি ব্যবস্থার সুপারিশ করবে?

[Discuss the current problems of either the jute mill industry or the coal mining industry of India. What measures would you recommend to improve its position ?]

২. ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সমস্যাগুলি ও তার বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

[Discuss the problems of the iron and steel industry of India. Review the present position of this industry.]

৩. বর্তমান অবস্থায় ভারতের শিল্পগুলিতে শিল্প সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিচার কর। ভারতের শিল্প-সংস্কার প্রবর্তনের ব্যাপারে তোমার মতে কি কি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

[Examine the need for rationalising the industries in India. What safeguards, in your opinion, should be provided before rationalisation is introduced in the Indian industries ?]

৪. ভারতের রুগ্ন শিল্পের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর। এ সমস্যার প্রতিকারে সরকার কর্তৃক যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সেগুলি বর্ণনা কর।

[Explain the causes of industrial sickness in India. Discuss the measures adopted by the government to ameliorate the sickness of the industries.]

৫. ভারতের চটকল শিল্প সর্বদাই বারংবার সংকটে আক্রান্ত হচ্ছে, শিল্পটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই মন্তব্যটি বিচার কর। [C.U. B.Com. (Hons.) 1983]

[Examine critically the observation that the characteristic feature of the Indian Jute Mill Industry is that it is always haunted by recurrent crisis.]

৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতের তুলাবস্ত্র শিল্প যে সব সমস্যার মধ্যে পড়েছে তা আলোচনা কর। শিল্পটির অবস্থার উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা তোমার মতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

[C.U. B.Com. (Hons.) 1984]

[Discuss the problems that the cotton textile industry in India has been facing since the end of the Second World War. What measures, in your opinion, should be taken to improve the condition of the industry ?]

৭. ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে শিল্পটির গুরুত্ব আলোচনা কর। [C.U. B.Com. (Hons.) 1985]

[Give a brief account of the iron and steel industry in India. Discuss the importance of this industry in the Five-year plans.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. 'শিল্প সংস্কার' কথাটির অর্থ কি?

[What does 'rationalisation' of an industry mean ?]

২. 'অটোমেশন' কথাটির অর্থ কি?

[What is meant by 'automation' ?]

৩. চটকল শিল্পের সমস্যাসমূহ।

[C.U. B.Com. (Hons.) 1985]

[Problems of the jute industry.]

৪. ভারতের শিল্পগুলির সংস্কার।

[C.U. B.Com. (Hons.) 1984]

[Rationalisation of industries in India.]

শিল্পের অর্থসংস্থান
Industrial Finance

আধুনিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায়, বিপুল পরিমাণ পুঁজির অবিরাম যোগান দরকার। শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাকে যদি আধুনিক সভ্যতার সঞ্চালিকা শক্তি,—হৃৎপিণ্ড বলা যায় তবে শিল্পপুঁজির অবিরাম সরবরাহ এর প্রাণদায়িকা শক্তি,—রক্তের সাথে তুলনীয়। পুঁজির প্রাচুর্য বা স্বল্পতার দ্বারা দেশের শিল্পায়নের স্তর, গতি, প্রকৃতি ও সীমা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

২৮.১. প্রয়োজনীয় পুঁজির প্রকারভেদ
Types of Capital Requirements

শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, পরিচালনা ও সংপ্রসারণ, এই তিন উদ্দেশ্যেই পুঁজির প্রয়োজন। পুঁজিকে ব্যবহার অনুযায়ী দু ভাগে ভাগ করা হয়। যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি কেনার জন্য যে পুঁজির দরকার তাকে স্থির পুঁজি (fixed capital) ও শ্রমের মজুরি, কাঁচামাল ইত্যাদি চলতি ব্যয়ের জন্য যে পুঁজি দরকার তাকে চলতি পুঁজি (working or circulating capital) বলা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা যত বেশি পুঁজিনির্ভর বা পুঁজিঘন (capital intensive) হয়, তত বেশি পরিমাণে স্থির পুঁজির প্রয়োজন হয়। স্থির পুঁজি একবার বিনিয়োগ করা হলে দীর্ঘকাল ধরে তা প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিযুক্ত থাকে। এজন্য এটাকে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বলে। সাধারণত ৫ বৎসরের বেশি মেয়াদে এই পুঁজি খাটে। চলতি পুঁজি একবারে বেশি দিনের জন্য নিযুক্ত থাকে না। তৈরী পণ্য বিক্রয় করে সেটা ফেরত পাওয়া যায়। এ জন্য এটাকে স্বল্পমেয়াদী পুঁজি বলে। সাধারণত এর মেয়াদ হল অনধিক এক বৎসর। আবার এই দু'রকম পুঁজির মাঝামাঝি আরেক প্রকার পুঁজি আছে যাকে মাঝারি মেয়াদের পুঁজি বলে। এর মেয়াদ সাধারণত এক বৎসরের বেশি ও অনধিক পাঁচ বৎসর।

২৮.২. বৃহদায়তন শিল্পের অর্থসংস্থান
Financing of Large-scale Industries

১. ক্ষুদ্র মাঝারি ও বৃহৎ, সব রকমের শিল্প সংস্থার প্রয়োজনীয় স্থির ও চলতি পুঁজির অর্থসংস্থানের উৎস-গুলিকে অভ্যন্তরীণ (internal) ও বাহ্য (external) এই দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) অভ্যন্তরীণ উৎস হল, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে (যা কোম্পানিরূপে নয়, এক মালিকানা বা অংশীদারী কারবাররূপে গঠিত) মালিক বা উদ্যোক্তা বা শরিকদের সঞ্চয় বা নিজ সম্বল, কোম্পানিরূপে গঠিত মাঝারি ও বৃহৎ সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, শেয়ার বিক্রির দ্বারা আদায়ীকৃত পুঁজি এবং কোম্পানির সঞ্চয় তহবিল ও

উদ্বৃত্ত আয় বা মুনাফা। (খ) বাহ্য উৎস হল, ক্ষুদ্র সংস্থার ক্ষেত্রে বন্ধুস্থানীয় ও পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত ঋণ, কোম্পানিরূপে গঠিত বৃহৎ সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ, জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত আমানত (public deposit), ব্যাঙ্ক ও শিল্পঋণদানকারী সংস্থা থেকে সংগৃহীত ঋণ।

২. ভারতে শিল্প বিকাশের প্রথম যুগে, শিল্পসংস্থাগুলি যখন ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র, অভ্যন্তরীণ উৎসই ছিল তখন শিল্প পুঁজির অর্থসংস্থানের মূল নির্ভর। উদ্যোক্তারা তখন প্রধানত নির্ভর করত নিজের সঞ্চয়, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিচিতদের এবং দেশীয় মহাজনদের কাছ থেকে সংগৃহীত ঋণের উপর। কিন্তু কালক্রমে বাজারের বিস্তার, আধুনিক প্রকৌশলের প্রবর্তন ও আয়তন বৃদ্ধির দরুন প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ উৎসটির প্রাধান্য কমতে থাকে। পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও শিল্প প্রবর্তনের প্রয়োজন মেটাতে ভারতে তখন ম্যানেজিং এজেন্সী নামে এক বিশেষ ধরনের উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক সংস্থার উদ্ভব ঘটে। প্রায় এক শ' বৎসর ধরে ভারতের ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি (দেশী ও বিদেশী) প্রবর্তক, ব্যবস্থাপক অর্থ সংস্থানকারীরূপে কাজ করে লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট, চটকল, কাপড়কল, কয়লাখনি, চিনিকল, চা বাগিচা ইত্যাদি প্রধান প্রধান শিল্প গড়ে তুলেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্নীতি অযোগ্যতা প্রভৃতি কতকগুলি ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের যে কর্মসূচী গৃহীত হয় তা রূপায়ণের পক্ষে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় ধীরে ধীরে তা বিলোপ করার নীতি গ্রহণ করা হয় এবং অবশেষে ১৯৭০ সালে তা সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়।

৩. ইতোমধ্যে শিল্পের অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী ঋণদানকারী সংস্থা স্থাপন করে মেয়াদী পুঁজি সংস্থানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। ফলে এখন শিল্পপুঁজির সংস্থানের অভ্যন্তরীণ উৎসটির তুলনায় বাহ্য উৎসটির গুরুত্বই বেশি হয়ে উঠেছে। নিচে ২৮'১ সারণির তথ্যে তা দেখান হল।

সারণি ২৮'১ : শিল্প পুঁজির উৎস, (১৯৮০)

উৎস	পরিমাণ (কোটি টাকা)	শতাংশ
অভ্যন্তরীণ	৫৭০'৭৭	৪১'৬০
বাহ্য	৮০০'৬৫	৫৮ ৪০
মোট	১৩৭১'৪২	১০০ ০০

সূত্র : Reserve Bank Bulletin, May 1980.

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত ১,৭২০টি মাঝারি ও বড় বেসরকারী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির (৫ লক্ষ টাকা বা তার অধিক আদায়ীকৃত পুঁজি-বিশিষ্ট) সমীক্ষা থেকে দেখা যায় তাদের মোট পুঁজির ৫৮ শতাংশের বেশি বাহ্যিক উৎস থেকে এবং ৪২ শতাংশের কম অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হল অবচিতির ব্যবস্থাটি (provision for depreciation)। পরিকল্পনার বিগত তিন দশক ধরে শিল্পপুঁজির অর্থসংস্থানের এই ধাঁচটি মোটামুটি অব্যাহত রয়েছে।

৪. **অভ্যন্তরীণ উৎস :** (ক) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিরূপে ভারতে মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্প সংস্থাগুলির পুঁজি সংস্থানের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির মধ্যে মুখ্য হল শেয়ার (share)। প্রত্যেক লিমিটেড কোম্পানি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজির অঙ্ক নিয়ে গঠিত হয়। সেটা হল তার অনুমোদিত পুঁজি (authorized capital)। এই অনুমোদিত পুঁজি সাধারণত ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা বা ১,000 টাকা মূল্যের কতকগুলি অংশে বিভক্ত থাকে এবং ওই অংশগুলি 'শেয়ার' নামে অভিহিত হয় (যেমন, ১০ লক্ষ টাকার অনুমোদিত পুঁজি প্রতিটি ১০ টাকা দামের ১ লক্ষ শেয়ারে বা ১০০ টাকা দামের ১০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত হতে পারে)। কোম্পানিটি তার মধ্যে শেয়ার প্রতি ৫ টাকা করে আদায় করলে তার আদায়ীকৃত পুঁজি হল ৫ লক্ষ টাকা। এটা হল কোম্পানির নিজ পুঁজি (owned capital)। শেয়ার বিক্রি করে যে নিজ পুঁজি আদায় বা সংগ্রহ করা হয় তা দিয়ে সাধারণত স্থায়ী পুঁজি (fixed capital) অর্থাৎ কারখানা বাড়ি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদির জন্য খরচ করা হয়। কোম্পানি যতদিন চালু থাকবে ততদিন এ টাকা লগ্নি থাকবে। শেয়ারহোল্ডারদের ফিরিয়ে দিতে হয় না। তাই এই টাকা দিয়ে স্থির পুঁজির অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির সংস্থান করা হয়। আগে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ টাকাটা ছিল অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে সর্বপ্রধান। বর্তমানেও তা প্রধান স্থান অধিকার করলেও, (খ) এখন কোম্পানির সঞ্চয় তহবিল বা অবচিতি তহবিল (reserve fund or depreciation fund) ও চলতি আয়ের উদ্বৃত্ত (current surplus) প্রভৃতি অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উৎস ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এ বাবদ কোম্পানির হাতে যে টাকা থাকে তাও দীর্ঘমেয়াদী বা স্থির পুঁজির অর্থসংস্থানে ব্যবহার করা হয়।

৫. **বাহ্য উৎস :** (ক) বাহ্য উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম হল ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র (debentures)। দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির প্রয়োজনে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সুদে জনসাধারণের কাছ থেকে

ঋণ করতে পারে। এর পদ্ধতিটি হল, যে অঙ্কের টাকাটা ঋণ করা হবে তা শেয়ারের মত সমান সংখ্যক অনেকগুলি অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশকে ডিবেঞ্চার বলে অভিহিত করা হয় এবং তা সাধারণত নির্দিষ্ট ও অল্প মূল্যে জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়। টাকার রসিদগুলি হল ডিবেঞ্চার। যেমন ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৫০ হাজার ডিবেঞ্চার বা ৫০ টাকা মূল্যের ১০ হাজার ডিবেঞ্চার বিক্রি করা যেতে পারে। এটা যেহেতু কোম্পানির ঋণ এবং তা পুঁজিরূপে লগ্নি করা হবে, সেহেতু ডিবেঞ্চারকে কোম্পানির ঋণ পুঁজি (loan capital on borrowed capital) বলা হয়। বর্তমানে ডিবেঞ্চারের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির অনেকেই এটির সাহায্য নিচ্ছে।

(খ) জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতি (public deposit) বর্তমানে কোম্পানীরূপে গঠিত মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্পসংস্থার পুঁজির সংস্থানের অন্যতম জনপ্রিয় উৎস হয়ে উঠেছে। তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদে ও উচ্চতর হারে সুদের শর্তে এই ধরনের ঋণ সংগ্রহ করা হয় এবং তা চলতি পুঁজির অভাব দূর করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়।

(গ) **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি শিল্প-সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয় না, যদিও যৎসামান্য পরিমাণে কিছু কিছু নামী কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে নিজস্ব অর্থ লগ্নি করে আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি সহ) শিল্পসংস্থাগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ হিসাবে বিপুল পরিমাণে সহায়তা করে থাকে। নিম্নে ২৮.২ সারণিতে সে তথ্য দেওয়া হল। এই তথ্য থেকে দেখা যাবে ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে শিল্পে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হল শিল্পসংস্থানের স্বল্প-মেয়াদী ঋণ।

সারণি ২৮.২: শিল্পে তপসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ

বৎসর	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৯৭২	৩,০৫৩
১৯৮২	১৫,০৭৪

সূত্র: Reserve Bank of India.

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি শিল্পসংস্থাগুলিকে সাধারণত দুই ধরনের স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়: (ক) অ্যাডভান্স লোন, ক্যাশ-ক্রেডিট প্রভৃতি; এবং (খ) বাণিজ্যিক হুণ্ডি (বিল) ও অন্যান্য কমার্শিয়াল পেপার-এর বাট্টা করা। এই দুটির মধ্যে ক্যাশ ক্রেডিটের পরিমাণই বেশি। তবে ব্যাঙ্কগুলি স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিলেই মেয়াদ শেষে পুরনো ঋণ নবীকরণ (renewal) করা হলে তখন স্বল্পমেয়াদী ঋণটি মাঝারি মেয়াদী ঋণে পরিণত হতে পারে। অবশ্য সেটা ব্যাঙ্কের ইচ্ছার উপর ও বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(ঘ) **দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থাসমূহ:** শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের দীর্ঘকালের অভাব দূর করার জন্য ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতে একের পর এক অনেক-গুলি দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং এরা বর্তমানে বাহ্য উৎসগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন (১৯৪৮), ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট করপোরেশন (১৯৫৫), ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (১৯৬৪), ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া (১৯৭১) এবং ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া (১৯৬৪)। এছাড়া জীবন বীমা করপোরেশন (১৯৫৬) ও সাধারণ বীমা করপোরেশনও শিল্পসংস্থাগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়।

২৮.৩. বৃহদায়তন শিল্পে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী অর্থ-সংস্থানকারী সংস্থা

Long and Medium Term Financing Institutions for Large-scale Industries

১. **ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন (IFC):** একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (স্ট্যাটুটরি করপোরেশন) হিসাবে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি নিয়ে এই করপোরেশন স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সালে এটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কের অধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও কাজের ক্ষেত্র: আই. এফ. সি. বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য গঠিত হয়েছে। এ কেবল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ও সমবায় সমিতি—এই রকম শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে। দ্রব্য উৎপাদনে, প্রক্রিয়াজাতকরণে, জাহাজী কারবারে, খনিজ শিল্পে, হোটেল পরিচালনায়, বিদ্যুৎ অথবা অন্যান্য শক্তি উৎপাদনে এবং পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান এর কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে।

সম্বল: এর আদায়ীকৃত শেয়ার পুঁজি ১০ কোটি টাকা। চলতি পুঁজি বৃদ্ধির জন্য করপোরেশন ১৯৭৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১০৮ কোটি টাকার ঋণপত্র বিক্রি করেছে। তা ছাড়া রাজ্য সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের কাছ থেকে করপোরেশন কমপক্ষে

৫ বৎসরের জন্য মোট ১০ কোটি টাকা আমানত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত এরূপ কোনো আমানত এ সংস্থা গ্রহণ করেনি। শক্তি বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের সাধারণ সঞ্চয় তহবিল ছাড়াও অতিরিক্ত একটি বিশেষ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরোক্ত সূত্র থেকে সংগৃহীত আর্থিক সম্বল ছাড়াও করপোরেশন ভারত সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবার ক্ষমতা পেয়েছে।

কার্যাবলী : শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়তার জন্য করপোরেশন নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারে :

১ **ঋণপ্রদান :** করপোরেশন অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদে সম্পত্তির জামিনে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার কিনে ঋণ দিতে পারে।

২. **শেয়ার ক্রয় :** (১৯৬০ সালের পর থেকে) বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনে তাদের পুঁজি যোগাতে পারে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ডিবেঞ্চার কিনে বা তাদের সম্পত্তির জামিনে যে ঋণ দিয়েছে ও দিচ্ছে, ইচ্ছা করলে তা শেয়ার পুঁজিতে পরিণত করতে পারে।

৩. **দায়গ্রহণ :** করপোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ কাজে করপোরেশন নিজে কোনো শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ে বাধ্য হলে অনধিক ৭ বৎসরের মধ্যে তা বিক্রয় করে দিতে হবে।

৪. **ঋণের গ্যারাণ্টি প্রদান :** শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদে অন্য সূত্র থেকে যাতে সহজে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য ঐ ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টি দিতে পারে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিস্তিবন্দী শর্তে বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানি করতে চাইলে সে ক্ষেত্রেও ঐ ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টিদাতা রূপে কাজ করতে পারে।

৫. **প্রতিনিধিরূপে কাজ :** কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে করপোরেশন তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

কাজের অগ্রগতি : জাতীয় এবং শিল্পগত গুরুত্ববিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ ও অন্যান্য সাহায্যদানের উপরই করপোরেশন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। (১) ১৯৬৪ সাল থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বৃহৎ ঋণের সংস্থান করছে বলে এর নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ ঋণের আবেদন পত্র আসছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত করপোরেশন মোট ২,৫৯১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। এই ঋণের অধিকাংশই নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও কিছু অংশ পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির রদবদল, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয়েছে। (২) ঋণপ্রাপ্ত শিল্পগুলির মধ্যে চিনি, তুলাবস্ত্র, রাসায়নিক সার, সিমেণ্ট ও কাগজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাচ শিল্প প্রধান। (৩) উৎপাদক সমবায় সমিতিগুলি করপোরেশনের নিকট থেকে ঋণ পাচ্ছে। এদের অধিকাংশই সমবায় চিনি উৎপাদন-সমিতি। (৪) ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে করপোরেশন দায় গ্রহণের কাজ আরম্ভ করেছে। (৫) ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে করপোরেশনে কিস্তিবন্দী মূল্যপ্রদান শর্তে বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য পরিশোধের গ্যারাণ্টি দেওয়া আরম্ভ করেছে।

করপোরেশনের কাজকর্মে এর দক্ষতা ও সাফল্য প্রমাণিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত এর মোট আয় বাড়ছে ও পরিচালনা ব্যয় কমছে। নীট মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে। করপোরেশন সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণও অংশত পরিশোধে সমর্থ হয়েছে। ঋণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থার উন্নতিও করপোরেশনের সাফল্যের অন্যতম পরিচায়ক। সম্প্রতি এদের মধ্যে কয়েকটি ১২ শতাংশ লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হয়েছে। তা ছাড়া, সুদ প্রদানে ও আসল পরিশোধের খেলাপকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কমেছে। এ পর্যন্ত অনধিক ১৫ বৎসরের মেয়াদে এবং সাধারণত ১২ বৎসরের অনধিককালের মেয়াদেই ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

সমালোচনা : করপোরেশনের কার্যাবলীর নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। অভিযোগগুলি হল : (১) স্বজনপোষণ ও পক্ষপাতিত্ব। (২) কিছু বৃহৎ শিল্পপতি কর্তৃক এর কাজে অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার। (৩) পশ্চাদ্‌পদ রাজ্যগুলিতে শিল্পোন্নয়নের ব্যর্থতা। (৪) বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সদয় মনোভাব। (৫) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রমের বহির্ভূত শিল্পে ঋণদান এবং ভারী ও মূল শিল্পে অবহেলা। (৬) অধিক মুনাফা অর্জনকারী ও বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহে সমর্থ প্রতিষ্ঠানে ঋণদান। (৭) ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তদারকীর অভাব। (৮) ঋণ মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিলম্ব। (৯) অধিক পরিচালন ব্যয়। (১০) সাধারণ পুঁজি (equity capital) সরবরাহের অভাব ইত্যাদি।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন আইনের সংশোধন ও অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা করপোরেশনের অনেকগুলি ত্রুটি দূর হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ১৯৬০ সালে সংশোধন দ্বারা করপোরেশনের নিকট থেকে ঋণ পাবার যোগ্য 'শিল্প প্রতিষ্ঠানের' সংজ্ঞার সম্প্রসারণ ও করপোরেশন কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পুঁজি বা ইকুইটি ক্যাপিটাল সরবরাহের ও বিদেশী মুদ্রায় ঋণদানের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিক থেকে

করপোরেশনের ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় শিল্প উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে।

২. ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড (NIDC)ঃ ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ১ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি ও ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত পুঁজি নিয়ে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিরূপে এটি গঠিত হয়। এই পুঁজির সমস্তই ভারত সরকারের।

উদ্দেশ্য ও কাজের ক্ষেত্রঃ এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি নির্মাণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বেসরকারী মালিকানার অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের বর্তমান কারবার পরিচালনায় অথবা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় পুঁজি ও অন্যান্য সম্বল দিয়ে সাহায্য করা। মুনাফার অনিশ্চয়তা ও প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপিত হয়নি জাতীয় শিল্পোন্নয়নের জন্য সে সকল শিল্প স্থাপনে বিশেষ সহায়তা দানই এর মূল উদ্দেশ্য।

সম্বলঃ এটি নিজ পুঁজি ছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ ও সরকারী অনুদান নিয়ে এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে আর্থিক সম্বল বাড়াতে পারে।

কার্যাবলীঃ এর প্রধান কাজ তিনটি। প্রথমত, নতুন ধরনের শিল্প-স্থাপনের অথবা নতুন কোনো দ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে তার কর্মসূচি রচনা ও প্রয়োজন হলে তা কাজে পরিণত করা হয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পগুলিকে কারিগরী কৌশলগত পরামর্শ দেওয়া। তৃতীয়ত, শিল্প বিশেষের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ঋণ দেওয়া। এই সকল কাজের জন্য একে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

কাজের অগ্রগতিঃ ভারী ঢালাই কারখানা, আখের ছোবড়া থেকে কাগজ প্রস্তুত, রঙের মালমশলা উৎপাদন, কৃত্রিম রবার উৎপাদন, ছোট যন্ত্রপাতির জন্য উপযুক্ত ইস্পাত ও মিশ্র ধাতুর উৎপাদন ইত্যাদি কয়েকটি শিল্প স্থাপন, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের যন্ত্রপাতি এবং চশমার কাচ উৎপাদন, কাঁচা ফিল্ম, অ্যালুমিনিয়াম ও কৃত্রিম রবার ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, ঔষধ, রং ও প্লাস্টিক শিল্পের প্রাথমিক মালমশলা উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প স্থাপনের কাজে করপোরেশন সাহায্য করেছে।

ভারতে শিল্প সংক্রান্ত নকশা তৈয়ার ও পরামর্শদান কার্যের প্রবর্তনের জন্য করপোরেশন একটি নিজস্ব 'প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত পরামর্শদান সংস্থা' (Technological Consultancy Bureau) প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সংস্থা বহু শিল্পকে প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তা করেছে।

চটকল, সুতীবস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের জন্য করপোরেশন মোট ২৮ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী করপোরেশন ঋণের জন্য কোনো নতুন আবেদনপত্র গ্রহণ করেনি। কারণ উপরের উল্লিখিত কাজগুলি এখন থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক মারফত করা হবে বলে স্থির হয়েছে। শিল্পগুলিকে কারিগরী কৌশলগত পরামর্শ দেওয়াই এখন এর প্রধান কাজ। বর্তমানে দেশে ও বিদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শ-দাতা হিসাবে এন. আই. ডি. সি. কাজ করছে। ইরান, কেনিয়া, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, তানজানিয়া, গালফ্ স্টেট্‌স প্রভৃতি স্বল্পোন্নত দেশ এবং এমনকি ইতালির মত অগ্রসর দেশও এর শিল্পগত ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত পরামর্শ নিচ্ছে।

৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড (ICIC)ঃ ভারত সরকারের সমর্থনে, বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে, মার্কিন সরকারের সম্মতিতে এবং মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিনিয়োগ-কারীদের অংশীদারীতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে এটি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে ২৫ কোটি টাকার অনুমোদিত পুঁজি নিয়ে এটি ভারতীয় কোম্পানি আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়। এর আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীঃ ভারতে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ঋণদানের উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হয়েছে। (১) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্প্রসারণ ও তাদের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ঋণদান; (২) শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অংশগ্রহণে উৎসাহ দান এবং (৩) শিল্পবিনিয়োগ ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানাকে উৎসাহিত করা ও পুঁজির বাজারের সম্প্রসারণ প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। এজন্য করপোরেশন এ কাজগুলি করছেঃ

(ক) দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী অর্থসংস্থানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনে সাধারণ পুঁজি সরবরাহ। (খ) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়গ্রহণ। (গ) অন্যান্য সূত্র থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত ঋণের জন্য নিশ্চয়তা দান। (ঘ) বিনিয়োগের আবর্তন দ্বারা

পুনর্বিনিয়োগের জন্য অর্থসংস্থান (রিফিন্যান্স) এবং (৬) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবস্থাপনাগত, কারিগরী ও প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দান।

সম্বল : ৫ কোটি টাকার আদায়ীকৃত পুঁজি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত লোহ-ইস্পাতের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ৭.৫ কোটি টাকা বিনা সুদে ঋণ, এবং বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৫ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার ঋণ, এই মোট ১৭.৫ কোটি টাকা কার্যকর পুঁজি নিয়ে সংস্থাটি ১৯৫৫ সালে কাজ শুরু করে।

কাজের অগ্রগতি : স্থাপনাকাল থেকে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আই. সি. আই. সি. মোট ৩,৬৬৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। এর কাছে সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পগুলির মধ্যে আছে কাগজ, রাসায়নিক, ঔষধ, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিনি, রবার, বস্ত্র, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, জাহাজ ইত্যাদি।

বিদেশী মুদ্রায় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এটি হল এদেশে পথিকৃৎ। তা ছাড়া শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায়গ্রহণকারীরূপে ভারতে এটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এদেশে একটি সবল পুঁজির বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। ঝুঁকিপূর্ণ নতুন শিল্প স্থাপনেও উৎসাহ দিচ্ছে। এদিক দিয়ে এটি উন্নয়ন ব্যাঙ্করূপে কাজ করছে বলা যায়।

৪. **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া (IDBI) :** শিল্পে মেয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এদেশে যে সব বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক তাদের মধ্যে সর্বাধুনিক। আই. এফ. সি., এস. এফ. সি., আই. সি. আই. সি. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শিল্পগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দিয়ে, তাদের শেয়ার পুঁজিতে টাকা খাটিয়ে, শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রির দায়গ্রহণ করে ও অন্যান্য স্থান থেকে তাদের সংগ্রহ করা ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টি দিয়ে সাহায্য করে থাকে। এভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পে যে ঋণ দিচ্ছে তা উত্তরোত্তর বাড়ছে বটে, তবে নবস্থাপিত ও উন্নয়নশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয় এবং তাদের কাজের মধ্যে সংযোগ সাধনের অভাব ছিল। এ কারণে দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে এযাবৎ স্থাপিত শিল্প ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে আরও বেশি কাজ করতে সক্ষম ও আরও বেশি আর্থিক সম্বলবিশিষ্ট একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করছিল। ইতোপূর্বে স্থাপিত শিল্প ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগ স্থাপনের ও নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দিয়ে শিল্প কাঠামোর ফাঁক পূরণ করার জন্য একটি নতুন বিধিবদ্ধ করপোরেশন রূপে এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই এর কাজ আরম্ভ হয়।

এটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সংস্থা-রূপে স্থাপিত হয়েছিল। অনুমোদিত পুঁজি ৫০ কোটি টাকা, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তা বাড়িয়ে ১০০ কোটি টাকা করতে পারে। বর্তমানে এর আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা।

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে একটি আইন পাস করে সংস্থাটির সাথে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পর্ক ছিন্ন করে এখন একে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, এইভাবেই এখন সংস্থাটি শিল্পঋণ সরবরাহের কাজ ভালভাবে করতে পারবে।

কার্যক্ষেত্র ও কার্যাবলী : যন্ত্রের দ্বারা পণ্য উৎপাদন-কারী, খনি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং জাহাজ-ব্যবসায়, পরিবহণ ও হোটেল ইত্যাদি সেবামূলক শিল্প (সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে অবস্থিত এবং কোম্পানি আইন বা অন্যবিধ আইনের অধীনে গঠিত) এর কাছ থেকে ঋণ পেতে পারে। শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে অথবা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান মারফত পরোক্ষভাবে নিম্নোক্ত পন্থায় ঋণ দেয়।

১. **প্রত্যক্ষ ঋণ ও সাহায্য :** শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন এবং শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন যে ধরনের ঋণ দেয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কও ঐভাবে শিল্পগুলিকে সরাসরিভাবে ঋণ দিতে পারে। অর্থাৎ, এই সংস্থা শিল্পগুলিকে—

(১) ঋণ ও দাদন মঞ্জুর করতে পারে। পরে ইচ্ছা করলে এই ঋণ বা দাদন ঋণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, পুঁজি ও স্টকে পরিণত করতে পারে।

(২) এদের শেয়ার, স্টক ও বণ্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয় বা বিক্রির দায় গ্রহণ করতে পারে। ডিবেঞ্চার কিনলে তা পরে ঐ কোম্পানির শেয়ার পুঁজিতে পরিণত করতে পারে।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে অনুমোদিত ঋণদাতা সংস্থা থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য এ সংস্থা ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টি দিতে পারে।

(৪) শিল্প প্রতিষ্ঠানের তরফে বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও প্রমিসরি নোট নিজে গ্রহণ (accept) করতে ও তা বাট্টা বা পুনর্বাট্টা করতে পারে।

২. **পরোক্ষ ঋণ ও সাহায্য : (১) অন্যান্য ঋণদান-**

কারী সংস্থাগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ঋণ দেয় তার পুনঃসংস্থানই (রি-ফিন্যান্স) এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে ১৯৫৮ সালে স্থাপিত রি ফিন্যান্স করপোরেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আই. এফ. সি., এস. এফ. সি. ও আই. সি. আই. সি, তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি শিল্পগুলিকে যে ঋণ দেয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক সে ঋণের পুনঃসংস্থান করছে। শিল্পে ঋণদানের সর্বোচ্চ সংস্থারূপে এটা হল এর প্রধান কাজ।

(২) তা ছাড়া আই. এফ. সি., এস. এফ. সি. ও অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থার ঋণদান ক্ষমতা বাড়াবার জন্য এ সংস্থা তাদের শেয়ার, স্টক, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার কিনে টাকা যোগাতে পারে।

সম্বল: ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের যথোপযুক্ত সম্বলের যাতে কোনো অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর সম্বলের মধ্যে আদায়ীকৃত পুঁজি ছাড়াও আছে ১৫টি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ্য ১০ কোটি টাকার বিনাসুদে একটি কেন্দ্রীয় সরকারী ঋণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তার দ্বারা স্থাপিত জাতীয় শিল্পঋণ (দীর্ঘমেয়াদী) তহবিল থেকে প্রথম ১০ কোটি টাকা সমেত পরবর্তীকালের ঋণ, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং এক বৎসরকাল বা তার থেকে বেশিদিনের জন্য গৃহীত আমানত অর্থ। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া অর্থের সাহায্যে গঠিত উন্নয়ন সাহায্য তহবিল থেকে এ ঋণ নেয়। এইসব সূত্র ছাড়াও ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে আই. ডি. বি. আই. যে কোনো সূত্র থেকে ঋণ নিতে, এমন কি যে কোনো ব্যাঙ্ক বা বিদেশে অবস্থিত লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ নিতে পারে এবং সরকারী ও বেসরকারী সূত্র থেকে উপহার, অনুদান, দান প্রভৃতি গ্রহণ করতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ন্যায় একে সর্বপ্রকার করভার থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

কাজের অগ্রগতি: শিল্পে মেয়াদী ঋণদাতা ব্যাঙ্কসমেত বিবিধ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সংযোগসাধনকারী সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানরূপে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি ঋণদাতা হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক বর্তমানে (ক) শিল্পঋণের পুনঃসংস্থান (খ) রপ্তানিঋণের পুনঃসংস্থান এবং (গ) বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ঋণের গ্যারাণ্টি দেওয়ার কাজ করছে।

১৯৬৪ থেকে ১৯৮৭-র জুন মাস পর্যন্ত আই. ডি. বি. আই. মোট ২২,৬৮০ কোটি টাকার ঋণ ও সাহায্য মঞ্জুর করেছে। রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য এটি রপ্তানি ঋণের পুনঃসংস্থানের শর্তগুলি আরও উদার করেছে এবং কিস্তিতে দাম শোধের শর্তে যারা বিদেশ থেকে বড় অঙ্কের রপ্তানি ফরমাশ পেয়েছে সেই সকল রপ্তানিকারীকে সরাসরি সাহায্য করার জন্য আই. ডি বি. আই. একটি নতুন কর্মসূচি চালু করেছে। তা ছাড়া শিল্পঋণের পুনঃসংস্থানের শর্তগুলিও সম্প্রতি আরও উদার করা হয়েছে। আগে এ ব্যাঙ্ক ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া ১ লক্ষ টাকার কম ঋণ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া ৫ লক্ষ টাকার কম ঋণের পুনঃসংস্থান করত না। এখন এদের পরিমাণ কমিয়ে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা ও ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

মন্তব্য: (১) ব্যাঙ্ক যে কাজ সম্পাদন করেছে তা থেকে সর্বোচ্চ শিল্পলগ্নি-সংস্থারূপে এই প্রতিষ্ঠানটির সার্থকতাই প্রমাণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সক্রিয় ও ধারাবাহিকভাবে শিল্পে মেয়াদী লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন এবং শিল্পোন্নয়নের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাতে নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি আরও বিস্তার লাভ করবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করার এবং সর্বসম্মত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করার পদ্ধতি সহজ ও সরল রাখার জন্য একে অবিরাম চেষ্টা চালাতে হবে।

(২) সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পগুলির মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগত লগ্নিকারী ব্যবস্থা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে এই সকল লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারী বিনিয়োগের ১০ শতাংশ যোগান দিয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বেসরকারী ক্ষেত্রে যে অধিকতর লগ্নি হয়েছে তারও অন্তত ২৪ শতাংশ এরা যোগান দিয়েছে বলে অনুমান। অন্যান্য লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত বেসরকারী শিল্পে যে লগ্নি প্রবাহিত হচ্ছে তা যাতে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনকরূপে ব্যবহৃত হয় তা তদারক করার ভার এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। একমাত্র যে সকল ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা সর্বাপেক্ষা উৎপাদনশীল এবং বৈদেশিক ব্যালেন্সের সহায়ক হবে, সে সকল ক্ষেত্রেই শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ককে ঐ সহায়তা দিতে হবে। বিভিন্ন শিল্পের ও অঞ্চলের নানাবিধ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে আই. ডি. বি. আই.-কে একটি বাস্তব ও নমনীয় কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে।

৫. ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া (UTI): ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া কাজ শুরু করেছে। এটি একটি সরকারী সংস্থা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা করপোরেশন, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ও

অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাগুলি মিলে একে প্রাথমিক পুঁজিরূপে ৫ কোটি টাকা সরবরাহ করেছে।

উদ্দেশ্য ও কাজ : (১) দেশের অল্প আয়ের স্বল্প ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সঞ্চয় সংগ্রহ করা; (২) শিল্পক্ষেত্রে তাকে লাভজনকভাবে ঝুঁকিসহ বিনিয়োগের খাতে প্রবাহিত করা; (৩) তার মারফত একদিকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের আয়ের ব্যবস্থা করা; (৪) তাদের সঞ্চয় বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া এবং (৫) অন্যদিকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ভাণ্ডার শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশে শিল্প পুঁজির ভিত ও পুঁজির বাজার শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য। এই ট্রাস্ট 'ইউনিট' বিক্রয় করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করে। এ ভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা বাছাই করা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি ইউনিটের সর্বনিম্ন মূল্য ১০ টাকা ও সর্বোচ্চ মূল্য ১০০ টাকা ধার্য হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই ইউনিট ট্রাস্ট প্রথম ১০ টাকা মূল্যে ইউনিট বিক্রয় আরম্ভ করে। পরে প্রতিদিন ইউনিটের বিক্রয়মূল্য স্থির করে বিক্রয় করছে। ১৯৬৪ সালের (১৬ই) নভেম্বর থেকে নির্ধারিত দরে ইউনিট কিনছে। ইউনিট বিক্রির কোনো সীমা নেই। বর্তমানে ইউনিট থেকে লব্ধ ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর আয়কর দিতে হয় না। এতে মানুষের মধ্যে ইউনিট কেনার আগ্রহ বেড়েছে।

সম্বল : ৫ কোটি টাকার প্রাথমিক পুঁজি নিয়ে ট্রাস্ট কাজ শুরু করেছে। এই প্রারম্ভিক পুঁজি বিভিন্ন লগ্নিপত্রে এরূপভাবে লগ্নি করা হয় যেন তা থেকে গড়ে ৬%-এর বেশি হারে আয় হতে পারে। ইউনিটগুলি বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যায় তা সরকারী লগ্নিপত্র, শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে লগ্নি করা হচ্ছে। ইউনিটগুলিকে প্রয়োজনমত হস্তান্তর করা যায়। ব্যাঙ্কের নিকট ইউনিট জমা রেখে তার জামিনে ঋণ পাওয়া যায়।

কার্যাবলী : ইউনিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ সুনির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনার জন্য বিনিয়োগ করা হয় এবং প্রতি আর্থিক বৎসরের শেষে খরচ বাদ দিয়ে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় তার শতকরা ৯০% ইউনিট-ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশের পরিমাণ বিনিয়োজিত অর্থের আনুমানিক শতকরা ১০ ভাগ। যেহেতু ট্রাস্ট ইউনিট ক্রেতাদের স্বার্থে কাজ করে সেই জন্য ট্রাস্টকে আয়কর, অতিরিক্ত কর এবং অন্যান্য কর ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে রেহাই দেওয়া হয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান এর প্রাথমিক পুঁজি যুগিয়েছে তাদের ঐ পুঁজিলব্ধ আয়কেও অতিরিক্ত মুনাফা কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

অগ্রগতি : ১৯৮৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ইউনিট ক্রেতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ এবং এদের ক্রয় করা ইউনিটের অর্থমূল্য ৬,০০০ কোটি টাকায় এসে পৌঁছেছে। প্রতি বৎসরই এই সংস্থার মুনাফার অঙ্ক বাড়ছে। প্রথম দিকে ইউ. টি. আই. তার সম্বলের অধিকাংশই সরকারী লগ্নিপত্রে লগ্নি করলেও এখন বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির লগ্নিপত্রে যথেষ্ট পরিমাণ লগ্নি করছে।

জনসাধারণের মধ্যে আরো বেশি ইউনিট বিক্রয়ের জন্য পোস্ট অফিস থেকে ইউনিট বিক্রয়ের নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে (পূর্বে কেবলমাত্র বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ইউনিট বিক্রয় করত)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি নিয়ে ভারতের অধিবাসী নয় এমন ব্যক্তিও এখন ইউনিট কিনতে পারে। উপরন্তু ট্রাস্ট এজেন্ট নিয়োগ করে ইউনিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে।

জন্মকাল থেকে ইউনিট ট্রাস্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি সহযোগী সংস্থা ছিল। বর্তমানে এটিকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কের সহযোগী সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে (১৯৭৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে)।

মন্তব্য : ভারতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এ ধরনের বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে এবং তারা সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভূত কাজ করছে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের ইউনিট কিনে অর্থ লগ্নি করলে সঞ্চয়কারীদের যথার্থই উপকার। কারণ ট্রাস্ট নিজ লাভের শতকরা ৯০% লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করে দিলে সেটা বিনিয়োজিত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ হবে বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, অন্য প্রকারে সরাসরি বিনিয়োগ না করে (যেমন, শেয়ার বা ঋণপত্র কিনে) ইউনিট কিনলেই অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা। তাছাড়া এই মুনাফা বণ্টনে বিলম্ব করা হয় না। বিনিয়োগকারীরা পরিচালনা সংক্রান্ত নানাবিধ অসুবিধা থেকেও মুক্ত থাকে। তা ছাড়া, ট্রাস্টের এরূপ কাজের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ফল লাভ করা সম্ভব। সর্বোপরি, এর মারফত লগ্নি করলে লগ্নিকারীদের লগ্নিকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও তারল্য (অর্থের যে কোনো সময় এটা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার বা বিক্রি করে টাকা ফিরে পাওয়ার অথবা হস্তান্তরের সুবিধা) বজায় থাকে। সুতরাং এটি স্থাপন করায় ভারতে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পুঁজির বাজারের সঞ্চয়প্রবণতা বৃদ্ধির পক্ষে ভালই হয়েছে সন্দেহ নেই। উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের প্রবাহ অব্যাহত রাখতে এটা সাহায্য করবে।

৬. এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (সংক্ষেপে

এক্সইম—Exim) স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী। এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হল :

(ক) বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান সংক্রান্ত যে সব কাজ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (IDBI এতকাল করে এসেছে সে সব কাজ এই নবগঠিত এক্স-ইম ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সম্পাদন করা ;

(খ) আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা ;

(গ) আমদানি ও রপ্তানির কাজে নিযুক্ত সব অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয়সাধন করা ও এর মাধ্যমে প্রধান অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহ করে থাকে সেই সব ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবে দেওয়া অর্থের পুনঃসংস্থানের ব্যবস্থা এক্স-ইম ব্যাঙ্ক করে থাকে।

এক্স-ইম ব্যাঙ্কের পুঁজি-সম্বল : এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পুঁজির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। আদায়ীকৃত পুঁজির সবটাই এসেছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহের প্রয়োজন হলে এক্স-ইম ব্যাঙ্ক ভারত সরকার ও ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর নিকট থেকে যেমন ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে তেমনি পুঁজি-বাজারে বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রি করেও ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে।

কার্যাবলী : (ক) এক্স-ইম ব্যাঙ্ক ভারতের এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পণ্য ও সেবার আমদানি ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে।

(খ) লীজের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের রপ্তানি ও আমদানির জন্য অর্থের যোগান দেবে ;

(গ) ভারতের সাহচর্যে বিদেশে যে সব যৌথ উদ্যোগ স্থাপিত হবে সেগুলিতে অর্থের যোগান দেবে ;

(ঘ) বিদেশের কোনো যৌথ উদ্যোগের শেয়ার ক্রয়ে ইচ্ছুক ভারতীয়দের শেয়ার ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করবে ;

(ঙ) আমদানি ও রপ্তানির কাজে নিযুক্ত কোম্পানির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির অবলেখনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ;

(চ) আমদানি ও রপ্তানির কাজে নিযুক্ত সংস্থাগুলিকে কারিগরী ও প্রশাসনিক বিষয় পরামর্শ দেবে।

বর্তমানে এক্স-ইম ব্যাঙ্ক তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের ঋণদানের কাজ সম্পাদন করে। এই ক্ষেত্রগুলি হল :

(১) ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে ঋণদান ; (২) বিদেশী সরকার, কোম্পানি ও অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহকে ঋণদান ও (৩) ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণদান।

(১) ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য দেওয়া হয় :—

(ক) রপ্তানিকারকদের প্রত্যক্ষ আর্থিক সাহায্য দান ;

(খ) রপ্তানিকারকদের কারিগরী পরামর্শদান ;

(গ) বিদেশের কোনো বিনিয়োগ-প্রকল্প কোনো ইচ্ছুক ভারতীয় কোম্পানি যাতে শেয়ার ক্রয় করতে পারে তার জন্য ঋণ মঞ্জুর ;

(২) বিদেশী সরকার, কোম্পানী ও অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত কারণে ঋণ দেওয়া হয় :—

(ক) বিদেশী সরকার ও বিদেশী ক্রেতাদের আমদানি-রপ্তানির কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ঋণ দান ;

(খ) আমদানি-রপ্তানির কাজে নিযুক্ত বিদেশের ব্যাঙ্ক-গুলির অর্থের অনটন দূর করার উদ্দেশ্যে ঐ সব ব্যাঙ্ককে পুনরায় ঋণ দান ;

(৩) ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে অর্থ সরবরাহ করা হয় :—

(ক) রপ্তানী বিল 'রি-ডিসকাউণ্ট' করা,

(খ) রপ্তানী বাণিজ্যে ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দেয় তার উপর ভিত্তি করে সেই ব্যাঙ্কগুলিকে পুনরায় ঋণ দেওয়া,

উপরে বর্ণিত ঋণদানের এই পদ্ধতিগুলিকে যৌথভাবে 'ফাণ্ডেড্ এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম' নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই ভারতীয় রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

১৯৮২ সালে এই ব্যাঙ্কের ঋণ সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৪০ কোটি টাকা আর ১৯৮৭ সালে তার পরিমাণ হয় ৬৯০ কোটি টাকা। 'ফাণ্ডেড্ প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে অদ্যাবধি যত অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিদেশে নানা ধরনের নির্মাণ প্রকল্প বাবদ প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ মোট ঋণসাহায্যের ⅓ অংশ। নির্মাণ-প্রকল্প ছাড়া ঋণসাহায্য-প্রাপ্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শক্তি-উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্প, পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন ধরনের যানবাহন ও তার সাজসরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্প এবং বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রকল্প। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা—এই দুটি অঞ্চলেই এক্স-ইম ব্যাঙ্কের মোট অর্থসাহায্যের ৬৬% প্রদান করা হয়েছে।

এই ব্যাঙ্ক অন্য আর একভাবে ঋণসাহায্য দিয়ে থাকে। সেটা হল—'আনফাণ্ডেড্ এ্যাসিস্ট্যান্স'। এর মূল উদ্দেশ্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানীকৃত পণ্যের দাম আদায়ের ব্যাপারে নানা ধরনের গ্যারাণ্টি দেওয়া। এই সব গ্যারাণ্টির মধ্যে রয়েছে এক্স্-ইম্-এর তরফ থেকে রপ্তানিকারকদের অগ্রিম অর্থ প্রদানের মতো গ্যারাণ্টি এবং রপ্তানিকারকদের জন্য এই ব্যাঙ্ক-এর উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহের গ্যারাণ্টি। এ ছাড়া, ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতায় একস-ইম ব্যাঙ্ক ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের গ্যারাণ্টিও দিয়ে থাকে।

১৯৮৩ সালে এক্স্ ইম ব্যাঙ্ক 'এক্স্-ইম ব্যাঙ্ক সিনডিকেশন ফেসিলিটি' নামে একটা স্কীম প্রবর্তন করে। এই স্কীমের উদ্দেশ্য হল, রপ্তানির কাজে অর্থ বিনিয়োগ করতে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে অনুমোদনপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহিত করা। ১৯৮২ সালে এই ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারকদের ১০২ কোটি টাকার, ১৯৮০ সালে ৭৫ কোটি টাকার ও ১৯৮৭ সালে ৫২ কোটি টাকার রপ্তানি গ্যারাণ্টি প্রদান করেছে।

এসব কাজ ছাড়া একসইম ব্যাঙ্ক মার্চেণ্ট ব্যাঙ্কিং ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কিং-এর কাজেও নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। এই সব কাজের মধ্যে রয়েছে উন্নয়নমূলক ও পরামর্শ দানের কাজ।

বস্তুত, এক্স্ইম ব্যাঙ্ককে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে যার প্রধান কাজ হবে ভারতের রপ্তানির একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন।

২৮.৪. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অর্থসংস্থান : সমস্যা ও উৎস Financing of Small-scale Industries : Problems and Sources

১. বৃহৎ ও মাঝারি আয়তনের শিল্পগুলির মতই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেরও কাঁচামাল, মজুরি ইত্যাদির জন্য স্বল্প-মেয়াদী যন্ত্রপাতির মেরামতি ও রদবদলের জন্য মাঝারি মেয়াদী এবং কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের দরকার দেখা যায়।

২. সমস্যা : বৃহদায়তন শিল্পগুলির তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির যে অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হয় তা পরিমাণে কম হলেও তা সংগ্রহের অসুবিধা অনেক বেশি। কারণ,—(ক) ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার তুলনায় বৃহদায়তন সংস্থাকেই বেশি পছন্দ করে। কারণ তারা বেশি পরিমাণে ঋণ নেয় এবং তাদের ঋণ দিয়ে ব্যাঙ্কগুলি বেশি পরিমাণে তাদের সম্বল লাভজনক ভাবে খাটাতে পারে। তা ছাড়া, ঋণের জামিন রাখার মত সম্পত্তি বৃহদায়তন সংস্থাগুলির যথেষ্ট থাকে, অপরপক্ষে তেমন সম্পত্তি ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার নগণ্য। (খ) ভারতের পুঁজির বাজারটি সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা অপেক্ষা বৃহদায়তন সংস্থার পক্ষে বেশি অনকুল। শেয়ার বাজারে বৃহদায়তন সংস্থাগুলির পুরাতন শেয়ার যেমন বেচাকেনা হয়, তেমনি তাদের নতুন শেয়ারের তালিকাভুক্তিও সহজ হয়, তাদের ব্যাপক পরিচিতির জন্য। এই অসুবিধার দরুন ক্ষুদ্রায়তন সংস্থাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই চড়া সুদের হারে ও স্বল্পতর মেয়াদে ঋণ করতে বাধ্য হয়। ইদানীংকালে অর্থসংস্থানকারী বিভিন্ন সংস্থা স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থাগুলির এই বড়ো অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর হয়নি।

৩. উৎস : ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলি (এদের মধ্যে কুটির শিল্পও রয়েছে) তাদের ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাই ঋণদানকারী সংস্থাগুলি থেকে এদের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দানের সরকারী নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

আধুনিক ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলি স্টেট ফিন্যান্স করপোরেশন ও স্টেট এইড টু ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ পেয়ে থাকে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৭ এই ১৭ বৎসরে স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিতে প্রায় ৫,৫৫০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছে। তবে দ্বিতীয় উৎসটি থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মাঝারি মেয়াদের ঋণ ও কার্যকর পুঁজি বাবদ ঋণ দেয়।

কুটির ও গ্রামীণ শিল্পগুলি অধিকাংশ ঋণ পায় বিশেষ বিশেষ সংস্থার মারফত সরকারের কাছ থেকে। সমবায় সমিতি মারফত হস্তচালিত তাঁত শিল্প এবং অন্যান্য চিরাচরিত শিল্পগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে পার্থক্যমূলক সুদের হারেও গ্রামীণ শিল্পী ও কারিগররা ঋণ পায়।

এছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণের অনাদায়ে লোকসানের আশঙ্কা দূর করার জন্য ভারত সরকার ১৯৬০ সাল থেকে 'ক্রেডিট গ্যারাণ্টি স্কীম' চালু করে ক্ষুদ্রশিল্প ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাগুলিকে ঋণদানে উৎসাহ দিচ্ছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও স্টেট ফিনান্স করপোরেশনগুলি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে যে ঋণ দেয় তার পুনঃসংস্থান করে এই ধরনের ঋণ বাড়াতে উৎসাহ দিচ্ছে।

এইসব বিধিব্যবস্থার দরুন গত পনেরো বছরে ক্ষুদ্র শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের পরিমাণ ২৫১ কোটি টাকা থেকে (জুন ১৯৬৯) বেড়ে ৬,১৬০ কোটি টাকায়

পরিণত হয়েছে (ডিসেম্বর, ১৯৮৪)। শতাংশ রূপে এই বৃদ্ধিটা হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণদানের ৮·৫ শতাংশ থেকে ১৪·৫ শতাংশ।

২৮.৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে অর্থসংস্থানকারী সংস্থাসমূহ
Institutions for Financing Small and Medium Scale Industries

১. **স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনসমূহ (SFCs) :** ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত একক মালিকানা, অংশীদারী কারবার ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ভিত্তিতে সংগঠিত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য আলাদা অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য সরকারগুলিকে একটি করে স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন স্থাপনের ক্ষমতা দিয়ে পার্লামেণ্ট স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাস করে। বর্তমানে এরূপ ১৮টি করপোরেশন আছে। এই সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির ইচ্ছানুযায়ী এদের পুঁজির পরিমাণ কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা থেকে সর্বাধিক ৫ কোটি টাকার মধ্যে নির্দিষ্ট। এদের শেয়ারের ৭৫ শতাংশ কিনেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (বর্তমানে আই· ডি· বি· আই·), তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ, সমবায় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি ও অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। বাকী ২৬ শতাংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। ভারতের ১৮টি রাজ্যের এই করপোরেশনগুলির আদায়ীকৃত পুঁজির মোট পরিমাণ হল ৩৯·৬ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র : ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন থেকে ঋণ ও সাহায্য পায় না এরকম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংস্থান করাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য।

সম্বল : নিজস্ব আদায়ীকৃত, পুঁজি, ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অন্যূন ৫ বৎসরের মেয়াদে জনসাধারণের নিকট থেকে গৃহীত আমানত—এই তিনটিই এর আর্থিক সম্বল। এদের ঋণপত্রগুলির আসল ফেরত ও তাদের প্রদেয় সুদ সম্পর্কে রাজ্য সংকার গ্যারাণ্টি দিয়ে থাকে। জনসাধারণের নিকট থেকে গৃহীত আমানত এদের আদায়ীকৃত পুঁজির পাঁচ গুণের বেশি হতে পারে না।

কার্যাবলী : এরা—(১) সরকারী ও বেসরকারী সিকিউরিটি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতির জামিনে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার কিনে অনধিক ২০ বৎসরের মেয়াদে প্রত্যক্ষ ঋণ দেয়। (২) অন্য সূত্র থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত অনধিক ২০ বৎসরের মেয়াদে ঋণের গ্যারাণ্টি দেয়। (৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রির দায়গ্রহণ করে।

কাজের অগ্রগতি : ১৯৮৫-এর মার্চ পর্যন্ত সকল স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনগুলি মোট ৪,৩২০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছে। এদের সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পগুলির মধ্যে সূতীবস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিদ্যুৎ সরবরাহ, তৈল-নিষ্কাশন, চা ও রবার বাগিচাই প্রধান।

আই. এফ. সি.-র সাথে তুলনা : আই. এফ. সি -র সাথের এস. এফ. সি.-গুলির উদ্দেশ্য এবং কাজের ধারার মিল থাকলেও ওদের মধ্যে পার্থক্য এই যে,—(১) এস. এফ. সি. কেবল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দেয়, কিন্তু এস. এফ. সি. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, অংশীদারী এবং একমালিকী কারবারেও ঋণ দেয়। (২) আই. এফ. সি.-র শেয়ার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হয়নি। কিন্তু এস. এফ. সি. র শেয়ারের ২৫ শতাংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। (৩) আই. এফ. সি. কেবল ১০ লক্ষ টাকার বেশি ঋণের আবেদন বিবেচনা করে, কিন্তু এস. এফ. সি ১০ লক্ষ টাকার বেশি ঋণের আবেদন বিবেচনা করতে পারে না। (৪) আই. এফ. সি. ২৫ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে ঋণ দিতে পারে, কিন্তু এস. এফ. সি. ২০ বৎসরের বেশি মেয়াদে ঋণ দিতে পারে না।

এদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হল : (১) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় এদের দেওয়া সাহায্যের পরিমাণ নগণ্য। (২) ঋণের আবেদনপত্র বিবেচনায় অত্যন্ত দেরি হয়। (৩) অধিকাংশ আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হয়। (৪) ঋণমঞ্জুরীতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। (৫) এদের সুদের হার খুবই চড়া, শতকরা ৮-১১ টাকা এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শতকরা ৮-১৪ টাকা। ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটা খুবই অসুবিধাজনক। ফলে এরা স্টেট ফিন্যান্স করপোরেশনের ঋণের সুবিধা ভোগ করতে পারে না। (৬) স্টেট ফিন্যান্স করপোরেশনগুলি প্রথমত ঋণপুঁজি সরবরাহ করে। এরা চলতি পুঁজি খুব কমই সরবরাহ করেছে। কারণ মর্টগেজ সম্পর্কে এদের নিয়মাবলী খুবই কঠোর।

তবে আগের তুলনায় বর্তমানে এদের ঋণদানের পরিমাণ বেড়েছে এবং ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা বেশি ঋণ পাচ্ছে। বর্তমানে এরা আই· ডি· বি· আই· থেকে ঋণের পুনঃসংস্থানের সুবিধা পাওয়ায় এদের ঋণদানের ক্ষমতা বেড়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও উন্নতি ঘটবে।

তবে, চলতি পুঁজির সরবরাহ বাড়াবার ও সুদের হার কমাবার জন্য এদের চেষ্টা করা উচিত।

স্টেট ব্যাঙ্ক : ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির পক্ষে স্টেট ব্যাঙ্ক বর্তমানে অন্যতম প্রধান ঋণ ও সাহায্যদাতা সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ৯টি মনোনীত এলাকায় ২৫টি ইউনিটকে সাহায্য করার একটি 'পাইলট' কর্মসূচি হাতে নেবার পর থেকে ব্যাঙ্ক এখন ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদানের ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ১৯৮০ সালের শেষে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে ১ লক্ষ ৬৬ হাজারে পরিণত ও মোট ঋণের পরিমাণ ২৭৪ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। এ থেকে ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদানের ও সাহায্যের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্কের বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক ও শিল্পঋণ :** ইদানীংকালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণ দিচ্ছে। ১৯৭২ এর মার্চ মাস থেকে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই ঋণের মোট পরিমাণ ৫৭৫'৫ কোটি টাকা থেকে ২,৯৬১ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্পে যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছে তার মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক ও ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ হল শতকরা ৮৮ ভাগ এবং তার মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার অধীন ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া ঋণের পরিমাণ হল শতকরা ৫০ ভাগ।

৪ **শিল্পে রাজ্য সরকারের সাহায্য :** রাজ্য সরকারগুলি তাদের নিজস্ব সম্বল থেকে সাহায্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ সাহায্য রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ হিসাবে দিয়ে এদের সহায়তা করছে। এ বিষয়ে প্রতি রাজ্যের দুরকমের ব্যবস্থা আছে। একটি হল **রাজ্য সরকারের শিল্প সাহায্য আইন**। রাজ্য সরকারের শিল্পদপ্তরগুলি ঐ আইনের ব্যবস্থামত স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনধিক ১০ হাজার টাকার ঋণের দরখাস্ত বিবেচনা ও মঞ্জুর করে। তা ছাড়া প্রায় সকল রাজ্যেই এখন একটি করে **স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন** স্থাপিত হয়েছে। এরা মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য, উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, জল, বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহণ, কর সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা ও কাঁচামালের সুবিধা ইত্যাদি নানারূপে সুযোগ দিচ্ছে।

৫. **ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন লিঃ (NSIC) :** ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত পুঁজি নিয়ে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিরূপে এটা গৃহীত হয়েছে। এর সমস্ত শেয়ারই সরকারের।

উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র : (১) বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদনের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির দ্বারা বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও এদের উৎপন্ন দ্রব্যের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদন। (৩) ক্ষুদ্র শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা ইত্যাদি করপোরেশনের উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অর্থসংস্থানে এটি সাহায্য করতে পারে বটে, কিন্তু এর কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়নে সাহায্য করাই এর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

সম্বল : নিজ পুঁজি ছাড়া প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একটি ঋণদানের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন ঋণ তহবিল থেকে ঋণ পেয়েছে। (এই বিদেশী মুদ্রা-ঋণ ব্যবহারের শর্ত এই যে, যে কোনো একটি আবেদন পত্রে ৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত মূল্যের যন্ত্রপাতি কামউনিস্ট দেশ বাদে অন্য যে কোনো দেশ থেকে কেনা চলবে কিন্তু তার বেশি মূল্যের যন্ত্রপাতি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই কিনতে হবে)।

কার্যাবলী ও অগ্রগতি : (১) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে এদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে করপোরেশন ঐগুলি সরবরাহের সাব কন্ট্রাক্ট ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতরণ করে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য করে। (২) বৃহদায়তন শিল্পের বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনের বন্দোবস্ত করে। (৩) বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানাগুলির সুবিধার জন্য সচল মেরামতি কারখানা, সচল পণ্য প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। (৪) ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনের মান নির্ধারণ ও তাদের বাজার, নকশা প্রভৃতি সম্পর্কে কারিগরী পরামর্শ দেয়। (৫) ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কিস্তিবন্দী মূল্যপ্রদান শর্তে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেয়। (৬) প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করে। (৭) ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক ও লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যাতে সহজে ঋণসংগ্রহ করতে পারে সেজন্য ঐ ঋণের গ্যারাণ্টি দেয়। করপোরেশন এ পর্যন্ত ৭,৬০০টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সাহায্য করেছে। এদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ১৮০ কোটি টাকা এবং লোক নিয়োগ ক্ষমতা দেড় লক্ষ।

৬. **ক্রেডিট গ্যারান্টি করপোরেশন :** বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাতে কম ঝুঁকিতে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে বেশি পরিমাণে ঋণ দিতে উৎসাহিত হয় সে উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭১ সালে ক্রেডিট গ্যারাণ্টি করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া নামে আরেকটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে যে ঋণ দেয় এই ক্রেডিট গ্যারাণ্টি করপোরেশন সে ঋণের পরিশোধ সম্পর্কে জামিনদার

হিসাবে কাজ করে। এখন মোট ৩২৮টি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান এই স্কীমের অধীনে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণ দিচ্ছে। ১৯৮১ সালের মার্চে এই স্কীমের অধীন গ্যারাণ্টি প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ৩,০৭৫ কোটি টাকা।

২৮.৬ শিল্প-ঋণদানকারী সংস্থাগুলির কাজের মূল্যায়ন Review of the Working of the Industrial Financing Institutions

১. শিল্পে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদে ঋণদানকারী সংস্থাগুলিকে (financial institutions) উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (development bank) বলে গণ্য করা যায়। কারণ, ঋণ দেবার জন্য আর্থিক সম্বল সংগ্রহ এবং উপযুক্ত উদ্যোক্তাদের ঋণদানের মধ্যেই কেবল এদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে না। বিকাশমান দেশে এরা অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক উপাদানরূপে কাজ করে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনের সূত্রপাত হয় এবং শিল্পের বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী নানা প্রকারের অর্থসংস্থানকারী বা ঋণদাতা সংস্থা অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়ে দেশে এখন অর্থসংস্থানকারী অন্তকাঠামোটি financial infrastructure) আয়তনে ও বৈচিত্র্যে বেড়ে উঠেছে। আজ এদের সংখ্যা হল ৬০টি এবং এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (IBDI)।

২. মোট আর্থিক সহায়তা: ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে এরা শিল্পে মোট ৪৫৮ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে এদের বার্ষিক ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ ১১৮.৫০ কোটি টাকা থেকে বৎসরে ১১ শতাংশ হারে বেড়ে ১৭৭.৩০ কোটি টাকায় পেঁৗছায়। তারপর ঋণ মঞ্জুরির বার্ষিক পরিমাণ বৎসরে ২০ শতাংশেরও বেশি হারে বেড়ে ১৯৮০-৮১ সালে ২,০৬৯ কোটি টাকায় পেঁৗছায়।

৩. সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পগুলির প্রকৃতি: মোট ঋণ সাহায্যের ২৫ শতাংশ পেয়েছে যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, ৭-৮ শতাংশ পেয়েছে বুনিয়াদী ধাতু শিল্প, ১৫ শতাংশ পেয়েছে রাসায়নিক সার সহ বুনিয়াদী রাসায়নিক শিল্প। অন্যান্য সাহায্য প্রাপ্ত শিল্পের মধ্যে রয়েছে বস্ত্র ও খাদ্যসহ বিবিধ ভোগ্যপণ্য শিল্প, পরিবহণ, সাজসরঞ্জাম শিল্প প্রভৃতি।

৪. সাহায্যের বিবিধ উদ্দেশ্য: নতুন প্রকল্প স্থাপন, বর্তমান প্রকল্পের সম্প্রসারণ, বৈচিত্র্যকরণ, আধুনিকীকরণ এবং ন্যাশনালাইজেশন প্রভৃতি বিবিধ উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

৫. ক্ষেত্রগত সাহায্য: ১৯৭৭-৭৮-এর হিসাবে দেখা যায় ওই বৎসরে মোট ঋণ সাহায্যের ১৫.৪ শতাংশ পেয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, ১১.১ শতাংশ পেয়েছে রাষ্ট্রীয় বেসরকারী যুক্ত ক্ষেত্র (Joint sector), ৭.৫ শতাংশ পেয়েছে সমবায় ক্ষেত্র এবং বাকি ৬৬ শতাংশ পেয়েছে বেসরকারী ক্ষেত্র। অন্যান্য বৎসরে প্রাপ্ত ঋণ সাহায্যের বণ্টনটি কমবেশী একই রকমের।

৬. ঋণ সাহায্যের অঞ্চলগত বণ্টন: উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, এই চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত গোটা দেশের মধ্যে ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট ঋণ সাহায্যের ৩৩ শতাংশেরও বেশি পেয়েছে শিল্পোন্নত পশ্চিম অঞ্চল এবং তার মধ্যে আবার পশ্চিমাঞ্চলের সর্বাধিক শিল্পোন্নত মহারাষ্ট্র পেয়েছে এই অঞ্চলের মোট ঋণের অর্ধেকেরও বেশি। সারাদেশের মধ্যে পূর্বাঞ্চল পেয়েছে মোট ঋণ সাহায্যের সবচেয়ে অল্প অংশ, মাত্র ১৩.৫ শতাংশ। এ পর্যন্ত মোট ঋণের বণ্টনের চিত্রটি কম বেশি এই রকমই।

৭. সাহায্যের ধরন: শিল্পঋণের ৭৭.৮৬ শতাংশ দেওয়া হয়েছে টাকায়, ১১.৬৩ শতাংশ বিদেশী মুদ্রায় এবং প্রত্যক্ষভাবে শেয়ার কিনে ও শেয়ার বিক্রির দায় গ্রহণের দ্বারা (subscription and underwriting) সাহায্যের পরিমাণ হল ১০.৫১ শতাংশ।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশনের গঠন ও কার্যাবলীর বর্ণনা দাও এবং তার সম্পাদিত কাজকর্মের মূল্যায়ন কর।

[Give an account of the composition and the functions of the Industrial Finance Corporation of India and evaluate its working.]

২. ভারতের ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পগুলির আর্থিক সমস্যাগুলি বিবেচনা কর এবং এ সমস্যা দূর করার জন্য সাম্প্রতিক কালে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আলোচনা কর।

(ইংগিত: প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে স্টেট ফিন্যান্স করপোরেশন, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্যারাণ্টি দান সংগঠন, শিল্পে রাজ্য সহায়তা আইন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য, ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন—এগুলির উল্লেখ করতে হবে।)

[Analyse the financial problems of the small-scale and the medium-sized industries in India and state the measures that have been adopted to solve these problems.]

(Hints : In answering the second part of the question, mention of the following organisation should be made—the SFCs, the SBI, the Guarantee Organisation of the RBI, State Aid to Industries Act, Direct Aid from the Central Government, NSIC.)

৩. ভারতে ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পগুলির অর্থসংস্থানের জন্য স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনগুলি যে ভূমিকা পালন করেছে তার বিবরণ দাও।

[Give an account of the role that the State Financial Corporations have played in providing finance to the small scale and the medium-scale industries in India.]

৪. বৃহদায়তন শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের জন্য ভারতে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তাদের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

[Give an account of the working of the various institutions that have been set up to provide long-term finance to large-scale industries in India.]

৫. ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার কর।

[Analyse the chief features of the Industrial Development Bank of India.]

৬ ভারতের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কের সাথে ভারতের শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশনের পার্থক্য নির্দেশ কর।

[Indicate the points of difference between the IDBI and the IFCI in respect of their aims and functions.]

৭. ভারতে যে সকল উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কাজ করছে তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

[Discuss the objectives and functions of the various development banks that have been operating in India.]

৮. বৃহৎ শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভূমিকা আলোচনা কর।

[Discuss the role of the Industrial Development Bank of India in providing long-term finance to large-scale industries]

[C.U.B A. (III), 1983]

৯. বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে যে সব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তা আলোচনা কর।

[Discuss the measures that have been adopted in post-independence India to provide long-term finance to large-scale industries.]

[C.U.B.A. (III), 1984]

সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তক প্রশ্ন

১. স্বল্পমেয়াদী, মাঝামিমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য কি?

[What is meant by short term, medium term and long term capital? How do they differ from one another?]

২. শিল্পের অর্থসংস্থানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

[Write a short note on the internal and external sources of industrial finance.]

৩. শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভূমিকা।

[Role of the I.D.B.I. in facilitating industrial finance.]

[C.U.B Com. (Hons.) 1985]

৪. বৃহদায়তন শিল্পে অর্থ যোগায় এমন যে কোনো দুটি প্রধান সংস্থার উল্লেখ কর।

[Mention any two of the institutions which provide finance to large scale industries.]

[C.U.B.A.(III), 1985]

শিল্পের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
Industrial Administration And Management

শিল্প ব্যবস্থাপনা / বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প ব্যবস্থাপনা / ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা / রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ / সরকারী বিভাগীয় সংগঠন / বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন / সরকারী কোম্পানী / উপসংহার / আলোচ্য প্রশ্নাবলী /

২৯.১. শিল্প ব্যবস্থাপনা
Industrial Management

একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বলতে শিল্প-সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্ধারণ এবং প্রধান লক্ষ্য স্থির করার কাজ বোঝায়। আর শিল্পের ব্যবস্থাপনা শব্দটির দ্বারা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের জন্য সংগঠনের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন, তাদের দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য মন যেমন দেহকে চালনা করে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তেমনি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুসংবদ্ধ, সঞ্জীবিত, চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্প-সংগঠনের একদিক হল কলকারখানা স্থাপন ও পুঁজির সংস্থান। অপর দিক হচ্ছে লোকবলের উপযুক্ত ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশকে সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাকে নিরুপদ্রব কার্যক্ষমতা দান করা। এর জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, অনুভূতিশীল ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হতে হয়। বলা বাহুল্য যে, শিল্প-সংগঠনের সাফল্য সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার উপরই বিশেষরূপে নির্ভর করে।

ভারতের শিল্পক্ষেত্র বর্তমানে দুটি অংশে বিভক্ত। একটি বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র (Private Sector), অপরটি রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র (State or Public Sector)। উভয় ক্ষেত্রেই সুদক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমে বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-ব্যবস্থাপনার আলোচনা করে পরে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

২৯.২. বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প ব্যবস্থাপনা
Industrial Management : Private Sector

ভারতের সরকারী শিল্পক্ষেত্রে যৌথমূলধনী কারবার-রূপে গঠিত বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তিন প্রকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল : (১) ম্যানেজিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যবস্থাপনা ; (২) পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক ব্যবস্থাপনা ; এবং (৩) সেক্রেটারী ও ট্রেজারার কর্তৃক ব্যবস্থাপনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ভার প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্টদের উপর ন্যস্ত ছিল। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পরিচালক পর্ষৎ থাকলেও সেটা পরিচালন কর্তৃপক্ষ মাত্র। প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কার্য-

পরিচালনাভার ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি বা ম্যানেজিং এজেন্টরাই বহন করত। বর্তমানে এর পরিবর্তন ঘটেছে। ম্যানেজিং এজেন্সী ও সেক্রেটারি অ্যান্ড ট্রেজারার্স দ্বারা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দুটি পদ্ধতিই ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল বিলোপ করা হয়েছে। ফলে, এখন বেসরকারী শিল্পে কেবল শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকদের নিয়ে গঠিত পরিচালক পর্ষৎ কর্তৃক লিমিটেড কোম্পানিগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত হয়েছে।

২৯.৩. ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা
The Managing System

১. **সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :** ভারতে কাঁচামালের প্রাচুর্য, শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান ও পণ্য বিক্রির বিরাট বাজার থাকায় আধুনিক শিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা উপলব্ধি করে ব্রিটেনের শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীরা এদেশে যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয় ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পুঁজির মালিকানা ও পরিচালনায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল ইংলণ্ডে গঠিত। ইংলণ্ডে গঠিত কিন্তু ভারতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনার ভার সে সময়ে ভারতে বসবাসকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী ও এদেশে বাণিজ্যরত কয়েকটি ইংরেজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে। ইংলণ্ডে গঠিত অথচ ভারতে কার্যরত ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত এই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং এজেন্টরূপে পরিচিতি লাভ করে। ঠিক কোন্ সময় থেকে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয় তা জানা না গেলেও অনেকের অনুমান যে, ১৮৩৩ সালে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকার বিলোপের পর থেকে এদের কার্যকলাপ আরম্ভ হয়।[১] পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যেও ম্যানেজিং এজেন্টরা নিযুক্ত হতে থাকে।

কোনো শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ অংশীদারী কারবার অথবা কোম্পানিকেই (প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি) ম্যানেজিং এজেন্ট বলা হত। সাধারণত বৃহদায়তন যৌথমূলধনী শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপনার জন্য ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হত। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতের প্রতি ছয়টি যৌথমূলধনী কারবারের মধ্যে একটির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণভার ম্যানেজিং এজেন্টের উপর ন্যস্ত ছিল।[২]

২. **ভূমিকা :** ভারতের দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের ভাষায় "ভারতের শিল্পায়নের প্রথম যুগে যখন উদ্যোগ ও পুঁজি কোনোটিই পর্যাপ্ত ছিল না সে সময়ে ম্যানেজিং এজেন্টরাই উভয়ের যোগান দিয়েছে এবং তুলাবস্ত্র, চটকল, ইস্পাত প্রভৃতির মত ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির কয়েকটি সুবিখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তনের উৎসাহ এবং সযত্ন লালন-পালনের জন্যই বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।" ভারতের এমন কোনো সুসংগঠিত শিল্প নেই, যা ম্যানেজিং এজেন্টদের দ্বারা উপকৃত হয়নি। চটকল, তুলাবস্ত্র, লৌহ-ইস্পাত, সিমেণ্ট, কাগজ, চা, রবার ও কফি বাগিচা, কয়লাখনি শিল্প ইত্যাদি দেশের সব কয়টি প্রধান শিল্পই ম্যানেজিং এজেন্টদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এই ম্যানেজিং এজেন্টরাই সেগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। এরাই গত শতাব্দীতে ভারতের শিল্পসম্ভাবনা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক ঝুঁকি বহন করে এবং নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে শিল্প প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করে শিল্পায়নে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে ও ভারতের শিল্পায়নের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করেছে।

৩. **কার্যাবলী ও সুফল :** ম্যানেজিং এজেন্টদের কাজ ছিল তিন ধরনের : (১) তারা শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করত, (২) তারা ছিল প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ; (৩) তারা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থসংস্থান করত। এই তিন ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে তারা শিল্পের সেবা করত।

৪. **ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দোষ :** ভারতের শিল্পোন্নতিতে নানাভাবে সহায়তা করা সত্ত্বেও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা অনেকগুলি দোষে দুষিত হয়ে ওঠে।

১. ম্যানেজিং এজেন্টরা শিল্প-কারবার প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানের নিকট বেশী দামে যন্ত্রপাতি বিক্রি এবং চড়াহারে পারিশ্রমিক আদায় করে পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের খরচ বাড়িয়ে দিত। এদের হাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির একচেটিয়া কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল এবং এরা প্রধানত সেই ধরনের ভোগ্যপণ্য ও রপ্তানী শিল্প স্থাপনেই উদ্যোগী হত যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত। ফলে দেশের শিল্পায়নে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে।

---

1. The Economic Problem of India: Vera Anstey, p. 113.

2. Research and Statistics Division of the Company Law Administration.

২. অনেক ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ ও ঝুঁকি বহনের মনোভাব হারিয়ে ফেলেছিল। অনেকেরই আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযোগী প্রযুক্তি-বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ছিল না। ইদানীংকালে দেখা গিয়েছে যে, ম্যানেজিং এজেন্টরা অত্যধিক মূল্যে একে অপরের নিকট ব্যবস্থাপনার অধিকার বিক্রয় করে বিপুল মুনাফা করেছে। ফলে অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।

৩. ম্যানেজিং এজেন্টরা অত্যধিক চড়া সুদে ঋণ দিত। তারা বে-হিসাবী ব্যয় প্রভৃতির দ্বারা অধীন প্রতিষ্ঠানের অর্থের অপচয় করেছে। অধীন কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্টদের স্বার্থে ও হুকুমে চড়া হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করে, নানারূপে ব্যয় বৃদ্ধি করে নিজেদের ক্ষতি করেছে। ম্যানেজিং এজেন্টরা অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনা-কার্যে শিল্পগত স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের আর্থিক স্বার্থের দ্বারাই বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। তাতে শেষ পর্যন্ত শিল্পের ক্ষতি হয়েছে। অধীন কোম্পানিগুলির প্রচুর অর্থ ম্যানেজিং এজেন্টদের ফাটকা কারবারে প্রলুব্ধ করেছে। ফলে অধীন কোম্পানিগুলির সর্বনাশ ঘটেছে।

৪ ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বিলোপ : এইসব দোষের দরুন ভারত সরকার ধীরে ধীরে ম্যানেজিং এজেন্সী বিলোপ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। অবশেষে ১৯৬৯ সালের সংশোধিত কোম্পানি আইনের দ্বারা ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপ করা হয়। এখন ভারতের সমস্ত কোম্পানিগুলি পরিচালক পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পরিচালনা ব্যবস্থা ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের সমস্ত কোম্পানিগুলিতে প্রবর্তিত হল। সরকারী উদ্যোগের কোম্পানিগুলিতেও এখন এই ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে এর ফলে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন শিথিল হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ পায়ের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে বাধ্য হবে ও তাতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বাড়বে বলে আশা করা হয়। সুতরাং ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ ও পরিচালক পর্ষদ দ্বারা কোম্পানিগুলির পরিচালন ব্যবস্থা সময়োপযোগী হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

২৯.৪. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ Organisational Forms of Public Enterprises

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপের বিভিন্নতা অনুসারে তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক রূপ প্রধানত তিন প্রকারের :

১. সরকারী বিভাগীয় সংগঠন।

২. বিশেষ আইনের দ্বারা গঠিত বিধিবদ্ধ করপোরেশন বা 'স্ট্যাটুটরী করপোরেশন' বা 'পাবলিক করপোরেশন'।

৩ সরকারী যৌথমূলধনী কারবার।

২৯.৫. সরকারী বিভাগীয় সংগঠন Government Departmental Organisation

১. বৈশিষ্ট্য : কোনো সরকারী বিভাগ বা দপ্তরের অধীন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীতে কারবার চালনা রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রাচীনতম রূপ। (১) এতে পরিচালিত কারবারটি এবং সরকারের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। সরকারের বা রাষ্ট্রের সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে কারবারটিকে গণ্য করা হয়। (২) সরকারের কোষাগার থেকে এর ব্যয় নির্বাহ হয় এবং এর যাবতীয় আয় সরকারী কোষাগারে জমা হয়। (৩) সাধারণত যে সকল ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগারের আয় লাভ করাই প্রধান উদ্দেশ্য সেখানে এই ধরনের সংগঠন স্থাপিত হয়। (৪) এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকে।

২. দৃষ্টান্ত : ভারতের পোস্ট অফিস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, লবণ উৎপাদন, রেল পরিবহণ, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা এবং পেরাম্বুরের অখন্ড রেল কামরা নির্মাণের কারখানা, অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রভৃতি এই জাতীয় সংগঠন। ভারতের দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনের কারখানাগুলিও এই প্রকার ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। ভারতে প্রায় ৪৫টি প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

৩. গুণ : এইরূপ সংগঠনের সুবিধা তিনটি—(১) এতে সরকারের সর্বাধিক পরিমাণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত হয়। (২) এ ব্যবস্থায় সর্বাধিক পরিমাণ গোপনতা রক্ষিত হতে পারে। (৩) এর দোষত্রুটির জন্য আইনসভায় বা পার্লামেণ্টে সহজেই প্রশ্ন ও সমালোচনা করা যায়।

৪. দোষ : এই জাতীয় সংগঠনের অসুবিধা—(১) প্রত্যক্ষ সরকারী বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী দপ্তরের চিরাচরিত গয়ংগচ্ছ নীতিতে এটি চালিত হয়। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে এর কাজে অহেতুক বিলম্ব ঘটে। (২) ঘন ঘন বিভাগীয় মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের পরিবর্তনে এর কাজ ও নীতিতে ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে, তাতে কারবারের ধারাবাহিক কার্যসূত্র রক্ষিত হয় না। (৩) এতে কার্যরত সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীরা রুটিন-মাফিক কাজের অতিরিক্ত কোনো উদ্যোগ ও তৎপরতার লক্ষণ

দেখায় না এবং কোনো গাফিলতি ও ত্রুটির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা কঠিন হয়। (৪) বাজারে এদের উৎপাদিত পণ্যের বা সরবরাহকৃত সেবার চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে তদনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম, নীতি ও কার্যপদ্ধতির সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের নেই। (৫) সরকারী দপ্তর নৈর্ব্যক্তিক বলে বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা, পছন্দ, রুচি প্রভৃতির প্রতি এর কোনো লক্ষ্য থাকে না। (৬) সরকারী দপ্তর হওয়ায় এটা আয় অনুযায়ী ব্যয়ের নীতিতে পরিচালিত হয় না। বরং অধিকাংশ স্থলেই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় ঘটিয়ে কারবারের লোকসান ঘটায়। (৭) দৈনন্দিন কাজে অবিরত সরকারী হস্তক্ষেপ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আরও একটি ত্রুটি।

৫. **মন্তব্য:** এর গুণ অপেক্ষা দোষ বেশি বলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে এ ধরনের সংগঠন অনুপযুক্ত।

২৯.৬. বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন
Statutory Corporation

১. **বৈশিষ্ট্য:** সরকারী দপ্তর পরিচালিত রাষ্ট্রীয় কারবারের ত্রুটির জন্য সম্প্রসারণশীল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনে অধিকতর উপযুক্ত একপ্রকার নতুন সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে। এটা 'পাবলিক করপোরেশন' বা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন নামে পরিচিত। ইংলন্ডে রাষ্ট্রীয় কারবারগুলি এই প্রকারের। ভারতেও এই প্রকার কারবার গঠিত হয়েছে। এদের বৈশিষ্ট্য হল—(১) এরা পার্লামেন্টের বা বিধানসভার বিশেষ আইনের দ্বারা গঠিত হয়। (২) ঐ আইনের দ্বারা এদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট হয়। (৩) এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত হয়। (৪) আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এদের স্বাতন্ত্র্য থাকে। (৫) এদের স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয়।

২. **দৃষ্টান্ত:** ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। ভারতের মোট ৩৫টি প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থানুযায়ী পরিচালিত হয়, এদের মধ্যে ১১টি কেন্দ্রীয় ও ২৪টি রাজ্য সরকারের অধীন।

৩. **গুণ:** এই প্রকার সংগঠনের সুবিধা—(১) সরকারী দপ্তরের লালফিতার দৌরাত্ম্য এতে অল্প। (২) বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এর পরিচালনা-নীতি বাজারের অবস্থা অনুযায়ী সহজে পরিবর্তন করা যেতে পারে। (৩) দৈনন্দিন কাজে প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটে না। (৪) পার্লামেন্টে এদের কাজের সমালোচনা করে দোষত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা করা যায়।

৪. **ত্রুটি:** এদের অসুবিধা—(১) এরা যে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সে আইনের সংশোধন না করা পর্যন্ত এদের কার্যাবলী ও সংগঠন সংক্রান্ত কোনো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহজে করা যায় না। সুতরাং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো এদের সহজ পরিবর্তনশীলতা নেই। (২) এদের কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের হস্তক্ষেপ যে ঘটে না তা নয়। (৩) শ্রমিক-কর্মচারীদের তরফ থেকে এ অভিযোগ করা হয় যে, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় সরকার বলেছিল যে, এরা শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থের প্রতি অধিক পরিমাণে লক্ষ্য রাখতে সমর্থ হবে; কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত ঘটনাই দেখা যায়। (৪) এদের ব্যবস্থাপনার ভার এ পর্যন্ত প্রধানত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতাই তাদের নেই।

৫. **মন্তব্য:** সরকারী ক্ষমতায় সজ্জিত অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মত সহজে প্রয়োজনমত নীতি পরিবর্তন করা যায় বলে এ প্রকার রাষ্ট্রীয় করপোরেশনকে অনেকেই রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার জন্য আদর্শ সংগঠন বলে মনে করেন। কিন্তু গোরওয়ালার মতে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও লাভ-ক্ষতির বাণিজ্যিক নীতি যে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সেখানে এই প্রকার প্রতিষ্ঠান অনুপযুক্ত। অবশ্য বর্তমানে এই সকল করপোরেশনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা-বিশেষজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারী যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এদের কর্মদক্ষতাও আশানুরূপ হচ্ছে না। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি উৎপাদন, পরিবহণ, সংসরণ, লৌহ-ইস্পাত এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী-দপ্তরগুলির অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস' নামে একটি পৃথক সরকারী কর্মচারীশ্রেণী সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২৯.৭. সরকারী কোম্পানি
Government Company

১. **বৈশিষ্ট্য:** ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে সর্বাধুনিক সাংগঠনিক রূপ প্রবর্তিত হচ্ছে তা হল সীমাবদ্ধ মালিকানার কোম্পানি। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ও ব্যাপক মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবার (অর্থাৎ প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি) ভারতের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত হয়ে থাকে। ঐ আইনের ৬১৭ ধারায় সরকারী মালিকানায় যৌথমূলধনী কারবার গঠনের ব্যবস্থা

আছে। (১) এইগুলি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি রূপে গঠিত হয়। শুধু কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার, কেবল এক বা একাধিক রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও জনসাধারণ বা বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ এদের শেয়ারের মালিক হতে পারে। তবে মোট শেয়ার পুঁজির ৫১% সরকারের হাতে থাকবে। এরূপ অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে বিদেশী পুঁজি অংশগ্রহণ করেছে। (২) এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার সাধারণ যৌথ-মূলধনী কারবারের ন্যায় একটি পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে। তবে এরূপ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই একটি বাদে অন্য সব শেয়ার রাষ্ট্রপতির নামে খরিদ করা হয় বলে এদের শেয়ারহোল্ডারদের বাৎসরিক সভা ডাকা হয় না, এবং কার্যত সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিরাই এদের পরিচালক নিযুক্ত হন।

২. দৃষ্টান্ত : বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই এ ধরনের। সিন্ধ্রি ফারটিলাইজারস্ অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রাইভেট লিঃ, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড প্রাইভেট লিমিটেড, স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। ভারতে এরূপ সরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ছিল ৮৫১টি ও এদের আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১০,৮৫৩ কোটি টাকা। এদের মধ্যে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৪৯৯টি ও আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ছিল ৯,৭৫৭ ২ কোটি টাকা। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৩৫২টি এবং আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল ১,০৯৫ ৯ কোটি টাকা।

৩. গুণ : (১) এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে অন্যান্য ধরনের সরকারী কারবার অপেক্ষা এদের কর্মক্ষমতা অধিক। (২) যৌথ মূলধনী কোম্পানির আকারে গঠিত হয় বলে সরকার থেকে এদের সাংগঠনিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। (৩) কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয় বলে উক্ত আইনের চৌহদ্দির মধ্যে এদের ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। (৪) করপোরেশনের আকারে গঠিত সরকারী কারবারের ন্যায় এদের হিসাবপত্র ইত্যাদি পার্লামেন্ট বা আইনসভায় পেশ করা বাধ্যতামূলক নয়; এতে সরকারের পক্ষে পার্লামেন্ট বা আইনসভার সমালোচনা এড়ানো কিছুটা সম্ভব হয়। (৫) বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট শেয়ার বিক্রয় দ্বারা এরা অতিরিক্ত পুঁজি সংগ্রহে সক্ষম।

৪. ত্রুটি : (১) সরকারী প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির রূপটি বিভ্রান্তিকর। কারণ, আকারে যৌথমূলধনী কারবার হলেও প্রকৃতিতে এটা সরকারের একক মালিকানার কারবার ছাড়া আর কিছুই নয়। (২) অনেকে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশবাসী ও পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহি এড়াবার জন্যই সরকার এরূপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির আকারে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। (৩) এদের পরিচালক পর্ষদে যে সকল সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত হন তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই; অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পের সাথে যুক্ত এমন অনেককে ঐ অভাব পূরণের জন্য পরিচালক পর্ষদে নিয়োগ করা হয় বটে, তবে তাতে সামগ্রিকভাবে পরিচালনার সংহতি দেখা যায় না।

৫. মন্তব্য : গোরওয়ালার মতে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও লাভ ক্ষতির বিবেচনা যে সকল রাষ্ট্রীয় কারবারে প্রধান সেখানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির আকারে গঠিত প্রতিষ্ঠানই বাঞ্ছনীয়। পার্লামেন্টের এস্টিমেট কমিটি এবং ইকাফে (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East) সম্মেলন এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। তবে প্রথম পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা কমিশন ও ভারত সরকার এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুকূলে মত প্রকাশ করে। ফলে এই প্রকার রাষ্ট্রীয় কারবারই এখন বেশি সংখ্যায় স্থাপিত হচ্ছে।

২৯.৮. উপসংহার
Conclusion

ভারত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করায় একদিকে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির উপযুক্ত সাংগঠনিক রূপ, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং কর্মদক্ষতা প্রভৃতির সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় কারবারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্তশাসন, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, উপযুক্তভাবে হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা, পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের নিকট তাদের কার্য বিবরণী পেশ, তাদের জন্য মন্ত্রীদের দায়িত্ব এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন ইত্যাদি নীতি গৃহীত হওয়া আবশ্যক। এই মূলনীতির মাপকাঠিতে বিচার করলে উপরোক্ত তিন প্রকার রাষ্ট্রীয় কারবারের সংগঠনের মধ্যে পাবলিক করপোরেশনের আকারে গঠিত রাষ্ট্রীয় কারবারগুলিই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ, উপরোক্ত মূলনীতিগুলির অধিকাংশই ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয় (এ সম্পর্কে আরো আলোচনার জন্য "৩১ অধ্যায় : রাষ্ট্র ও শিল্প" দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা যে ভূমিকা পালন করেছে তার মূল্যায়ন কর।

[Evaluate the role of the Managing Agency System in the development of the Indian economy.]

২. ভারতের রাষ্ট্রীয় কারবারের বিভিন্ন রূপের তুলনা কর। এদেশের পক্ষে তুমি কোন্ রূপটি সর্বাধিক উপযোগী বলে মনে কর এবং কেন ?

[Make a comparative study of the different forms of public sector enterprises that obtain in India. Of these forms which one, in your opinion, is the most suitable for this country ? Give reasons for your answer.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১. ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা কাকে বলে ? এর কি কি কাজ ছিল ?

[What is the Managing Agency System ? What were its functions ?]

২. সরকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার কারা ? এর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি ?

[Who are the shareholders of a Government company ? Why is its number increasing ?]

শিল্পসম্পর্ক
Industrial Relations

৩০.১. ভূমিকা
Introduction

ভারতে সংগঠিত শিল্পের রেজিস্ট্রিকৃত কলকারখানাগুলিতে মোট ৮২ লক্ষ শ্রমিক কর্মী কাজ করছেন (১৯৮৪ সালে)। এদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের শ্রমিক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি (১১ লক্ষ ৯০ হাজার)। তার পরেই যথাক্রমে, পশ্চিমবঙ্গ (৮ লক্ষ ৮৭ হাজার), গুজরাট (৬ লক্ষ ৩৯ হাজার), তামিলনাড়ু (৬ লক্ষ ২১ হাজার) ও উত্তরপ্রদেশের (৫ লক্ষ ৩৩ হাজার) স্থান।

৩০.২. ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য
The Changing Features of Industrial Labour in India

১. যে কোনো দেশের শিল্পায়নের দরুন অর্থনীতিতে ও সমাজে নানান সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ফলে দ্রুত শহরীকরণ (urbanisation) শুরু হয়, শিল্প-নির্ভর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর (industrial communities) আবির্ভাব ঘটে, শ্রমের পরিমাণগত বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নয়ন ঘটে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিবিধ পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ ঘটে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৪৩ বৎসর ধরে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

২. শ্রমের ক্ষেত্রে ওই পরিবর্তনগুলির ফলে ভারতের শিল্প শ্রমিকের পুরাতন বৈশিষ্ট্যগুলির স্থলে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চাষের মরশুমের পর গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে শহরে আসার এবং চাষের মরশুমের মুখে শহর থেকে গ্রামে যাবার শ্রমিকদের যে স্থানান্তরী চরিত্র ছিল (migratory character) তা ক্রমশ কমছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে একান্তভাবে শিল্পনির্ভর ও শহরগুলিতে স্থায়িভাবে বসবাসকারী স্থিতিশীল (stable) চরিত্র প্রকট হয়ে উঠছে। এর একটি কারণ হল গ্রামাঞ্চলে কাজের তুলনায় খেতমজুরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে শিল্প শ্রমিকদের কাজের শর্তাবলী ন্যূনতম কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বিবিধ আইন প্রণয়ন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক, ভেষজ ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা নির্ভর শিল্পগুলির বিস্তারের দরুন দক্ষ শ্রমিক বাহিনীর উদ্ভব। পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি, কিছুটা অক্ষর-পরিচয়-বিশিষ্ট, দক্ষ ও

আধা-দক্ষ নারী শ্রমিকের সংখ্যাও আধুনিক কলকারখানাগুলিতে ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৭৭ সালে অনুপাত ছিল কলকারখানায় নিযুক্ত মোট শ্রমিকদের ১০ শতাংশ।

৩. ভারতের শিল্প শ্রমিকরা হল দেশের সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনীতিক স্বার্থ রক্ষায় সবচেয়ে সচেতন ও সংগঠিত। ফলে ভারতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা বাড়ছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

৪. নিয়োগকর্তাদের সাথে দরকষাকষির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা, বিভিন্ন কাজে জীবনের ঝুঁকি থেকে শ্রমিকদের রক্ষা শিল্প বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে, নারী ও শিশু শ্রমিকদের রক্ষা, শ্রমিকদের সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থার সুযোগ দান এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি—এই সব বিবিধ প্রয়োজনে ভারতে অনেকগুলি শ্রমসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায় বিচার, সামাজিক সমান অধিকার, আন্তর্জাতিক সমতা ও জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন—এই চারটি হল ভারতের শ্রম সংক্রান্ত আইনগুলির ভিত্তি।

৩০.৩. ভারতে শিল্পবিরোধ

Industrial Disputes in India

শিল্পায়নের অব্যাহত অগ্রগতি, এবং শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক সম্পর্ক সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সম্পর্কের অবনতি ঘটলে অর্থাৎ শিল্পবিরোধের ফলে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস, মালিকের মুনাফা হ্রাস শ্রমিকের আয় হ্রাস এবং জাতীয় আয় হ্রাস পায়। সব দিক থেকেই শিল্পবিরোধ হানিকর বলে আধুনিক কালে সব দেশেই শিল্পে শান্তিরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে দেশে ১,৭.৯টি শিল্পবিরোধ ঘটেছিল। তাতে ১৭ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী জড়িত ছিলেন এবং মোট ৩ কোটি ৫৩ লক্ষাধিক শ্রম-দিবস নষ্ট হয়েছে।

শিল্পবিরোধের কারণ ঃ শিল্পবিরোধের কারণগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ও অন্যান্য।

ক. অর্থনীতিক কারণসমূহ ঃ ১. স্বল্পতম মজুরির হার ঃ যুদ্ধযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। শ্রমিকদের উৎপাদনের দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ তদনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরির হার বাড়েনি। এতে জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক দুর্দশার চাপে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সময়ে সময়ে শ্রমিকদের আর্থিক আয় যে কিছুটা বাড়ে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আর্থিক আয় যতটুকু বাড়ে তার তুলনায় জীবনধারণের খরচ অনেক বেশি হারে বাড়ে। ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ে তো না-ই বরং কমেই যায়। শ্রমিকদের প্রকৃত আয় হ্রাস পাবার প্রবণতা কোন সাময়িক ঘটনা নয়। এ ব্যাপারটা একটা স্থায়ীরূপ ধারণ করে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে চলেছে।

২. কারখানার অভ্যন্তরীণ অসন্তোষজনক অবস্থা ঃ কারখানা আইন থাকা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে উদাসীনতা ও শৈথিল্যের জন্য অধিকাংশ কারখানার ভিতরে উপযুক্ত পরিবেশ রাখা হয় না। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

৩. কাজের দীর্ঘ সময় ঃ বহুদিন ধরে শ্রমিকরা কাজের সময় হ্রাস করার দাবিতে আন্দোলন করছে। ১৯৪৮ সালে ফ্যাক্টরী আইনে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হলেও শ্রমিকরা তা আরও হ্রাস করার পক্ষপাতী। তা ছাড়া কারখানা আইন প্রযুক্ত হয়নি এমন বহু কারখানায় কাজের আরও দীর্ঘ সময় চালু আছে।

৪. কাজের নিরাপত্তার অভাব ঃ অধিকাংশ কারখানাতেই শ্রমিকদের স্থায়ী না করা ও যথেচ্ছ ছাঁটাই করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষ রয়েছে। আইনমত নির্দিষ্ট কাল অস্থায়িভাবে একটানা কাজের পর চাকুরি পাকা হলে আইন অনুসারে তাদের নানারূপ সুযোগ সুবিধা দিতে হয় বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিক বা নিয়োগকর্তারা অস্থায়ী শ্রমিকদের কিছুদিন পর পর কাজ থেকে বসিয়ে রেখে একটানা কাজে ছেদ ঘটায়। এতে বহু শ্রমিক আজীবন অস্থায়িভাবে কাজ করতে বাধ্য হয় এবং শ্রম আইনগুলির সুবিধা থেকে চিরজীবন বঞ্চিত থাকে। এটা শ্রমিকদের গভীর অসন্তোষের অন্যতম কারণ।

৫. শিল্প সংস্কার ঃ বর্তমানে তুলাবস্ত্র, চটকল প্রভৃতি শিল্পে শিল্পসংস্কারের ফলে বহু শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে।

৬. বোনাস ঃ ইদানীংকালের বোনাসের দাবিকে কেন্দ্র করে ভারতে সকল শিল্পেই শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাঁধছে।

খ. রাজনীতিক ও অন্যান্য কারণ ঃ ১. রাজনীতিক আন্দোলন ঃ অতীতে এবং বর্তমানে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন এবং রাজনীতিক দলগুলি শ্রমিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

২. ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের দাবীও ইদানীংকালে শিল্পবিরোধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৩. শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিক চেতনা ঃ স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে আপন অধিকার আদায়ে ভারতের শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন হয়ে উঠেছে।

৪. **শ্রমিক-সংঘগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি :** ইদানীং-কালে শ্রমিক-সংঘগুলি সকল শিল্পেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ বৃদ্ধির ফলে মালিক পক্ষের সাথে সংঘাত বেড়েছে।

৫. **হতাশা ও অসন্তোষ :** সামান্য আয়, তীব্র দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, কর্মে নিরাপত্তার অভাব, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা না থাকা, পুত্র কন্যার শিক্ষাদীক্ষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটানা হতাশা ও অসন্তোষ রয়েছে। শ্রমিক বিরোধগুলিতে এই কারণগুলির বহিঃপ্রকাশ কম-বেশি লক্ষ্য করা যায়।)

৩০.৪. শিল্পবিরোধ মীমাংসার উপায়
Methods of Settlement of Industrial Disputes

শিল্পবিরোধ মীমাংসার তিনটি উপায় : (১) আলাপ-আলোচনা মারফত স্বেচ্ছামূলক আপস (Conciliation)। (২) স্বেচ্ছামূলক সালিসীর দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তি (Voluntary arbitration)। এর রায় মানা উভয় পক্ষের নিকট স্বেচ্ছামূলক কিংবা বাধ্যতামূলক হতে পারে। এবং (৩) আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক সালিসীর দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তি (Compulsory arbitration or adjudication)। এর রায় মানা উভয় পক্ষের কাছে স্বেচ্ছামূলক কিংবা বাধ্যতামূলক হতে পারে।

১. **আলাপ-আলোচনা মারফত স্বেচ্ছামূলক আপস :** এই পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার দ্বারা উভয় পক্ষের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা হয়। এতে অনেক সময় একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থের সাহায্যও গৃহীত হয়। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দূর করে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ভারতের শিল্পবিরোধ আইনে এরূপ পদ্ধতিতে শিল্পবিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা আছে এবং সেজন্য সরকারী আপস কর্মচারী নিযুক্ত আছে। একে শিল্পবিরোধ মীমাংসার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়।

২. **স্বেচ্ছামূলক সালিসীর দ্বারা বিচার ও মীমাংসা :** এতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে কোনো প্রভাবশালী তৃতীয় পক্ষের দ্বারা বিবাদের বিচার ও মীমাংসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উভয় পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী সালিসীর বিচার ও মীমাংসা উভয়ের নিকট বাধ্যতামূলক হতে পারে কিংবা না হতেও পারে।

৩ **বিচারালয় কর্তৃক বাধ্যতামূলক সালিসীর দ্বারা বিচার ও মীমাংসা :** এতে সরকারী আইনদ্বারা শিল্প-বিরোধের বাধ্যতামূলক বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। তবে বিচারকের রায়, আইনের ধারা অনুযায়ী উভয় পক্ষের নিকট স্বেচ্ছামূলক অথবা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ভারতের শিল্পবিরোধ আইনে স্বেচ্ছামূলক আপস আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসার ব্যবস্থা থাকলেও আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিচার ও তার রায় মেনে চলা বাধ্যতা-মূলক করার উপরই সরকারের বেশি ঝোঁক দেখা যায়। শিল্পবিরোধ মীমাংসার বাধ্যতামূলক সালিসী বিচারের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের সমালোচনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি দেখান হয় :

এর পক্ষে যুক্তিস্বরূপ বলা হয়,—(১) ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলি ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের হাতে রয়েছে। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিকবিরোধকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। মীমাংসার জন্য তারা উৎসুক নয়। (২) ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ নয়। একই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে একাধিক সংঘ থাকে। সুতরাং সব শ্রমিকের পক্ষ নিয়ে কথা বলার মত একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান না থাকায় আপস আলোচনার দ্বারা মীমাংসা সম্ভব হয় না। (৩) আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসায় পৌঁছাতে দীর্ঘকাল কেটে যায় বলেও অভিযোগ করা হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্পে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

এর বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখান হয় তা হচ্ছে,—(১) এতে শিল্পবিরোধ মীমাংসায় সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটে। সরকারী হস্তক্ষেপ শান্তিপূর্ণভাবে হয় না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকার বলপ্রয়োগের দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করে। সুতরাং, এটা পদ্ধতি হিসাবে গণতান্ত্রিক নীতির এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের বিরোধী। (২) এর ফলে দেশের সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। শ্রমিকেরা মালিকপক্ষ অপেক্ষা সব দিক দিয়ে দুর্বল। তাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠনে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তাদের স্বার্থ আরও ক্ষুণ্ণ হয়। (৩) এতে শিল্পে স্থায়ী শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে তিক্ততা বাড়ে। কারণ, এতে বিজয়ীপক্ষ উদ্ধত ব্যবহার করে এবং বিজিত পক্ষ অসন্তোষ মনে পুষে রেখে পরবর্তী সুযোগে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করে। কেউ কাউকে অকপটে ক্ষমা করে না।

মন্তব্য : বাধ্যতামূলক সালিসীর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কয়েকটি অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট শিল্প ব্যতীত অন্যত্র সাধারণভাবে এর প্রয়োগে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই বেশি হবার সম্ভাবনা। শ্রমিকদের উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব

রয়েছে এবং আপস মীমাংসায় দীর্ঘকাল কেটে যায়, এই দু'টি যুক্তিও খুব দৃঢ় নয়। কারণ বাধ্যতামূলক সালিসীতেও বিলম্ব ঘটে থাকে। তা ছাড়া, ১৯৪৭ সাল থেকে এর প্রয়োগে যে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি ঘটেছে ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। এ সম্পর্কে স্মরণীয় যে, বাধ্যতামূলক সালিসীর প্রশ্নেই সরকারের সাথে মতানৈক্যের দরুন ১৯৫৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ভি. ভি. গিরি পদত্যাগ করেছিলেন। এটা যে বাঞ্ছনীয় নয় তার আর একটি প্রমাণ হল, ১৯৫৮ সালের ১৬শ শ্রম সম্মেলনে বাধ্যতামূলক আপস বাতিল করার প্রস্তাব করা হলে শ্রমমন্ত্রী তার বিরোধিতা না করে শুধু বলেছিলেন যে, এর জন্য উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি। ১৯৫৯ সালে ১৭শ শ্রম সম্মেলনে এটা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, অতঃপর বাধ্যতামূলক মীমাংসার পরিবর্তে আলাপ আলোচনা ও স্বেচ্ছামূলক সালিসীর উপব বেশি নির্ভর করা হবে। ১৯৬০ সালেব শ্রম সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রস্তাব করেছিল যে, স্বেচ্ছামূলক সালিসীর সিদ্ধান্তকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে আদালতের রায়ের মর্যাদা দানের জন্য শিল্পবিরোধ আইন সংশোধন করা আবশ্যক। সুতরাং, সব দিক বিবেচনা করে শিল্পবিরোধ মীমাংসার জন্য বাধ্যতামূলক সালিসীর পদ্ধতিকে যথেষ্ট বা বাঞ্ছনীয় বলে গণ্য করা যায় না। এটা উপলব্ধি করেই শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির উপায় রূপে স্বেচ্ছামূলক সালিসীতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ১৯৬৭ সালে ন্যাশনাল আর্বিট্রেশন প্রমোশন বোর্ড স্থাপন করেছে।

৩০ ৫. শিল্পবিরোধ মীমাংসা আইন ও ব্যবস্থা The Industrial Disputes Act and Measures for Settlement

১. স্বাধীনতার আগে ঃ ১৯২৯ সালে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারন করায় ঐ বৎসর দেশের প্রথম শিল্পবিরোধ আইন (Trade Dispute Act. 1929) পাস হয়। এর দ্বারা শিল্পবিরোধ মীমাংসার জন্য একটি আপস পর্ষদ (Board of Conciliation) অথবা অনুসন্ধান আদালত (Court of Enquiry) নিয়োগের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়। শিল্পবিরোধ ঘটলে প্রথম অবস্থাতেই তার মীমাংসার চেষ্টা করার জন্য ১৯৩৮ সালে ঐ আইনের সংশোধনের দ্বারা আপস কর্মচারী (Conciliation Officer) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারত-রক্ষা আইনের ৮১(ক) ধারা অনুযায়ী ভারত সরকার যে কোনো শিল্পবিরোধ বাধ্যতামূলক সালিসী নিয়োগ, তার রায় মানা বাধ্যতামূলক করা এবং ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রয়োগ করে।

২. শিল্পবিরোধ মীমাংসার বর্তমান পদ্ধতি ঃ যুদ্ধপরবর্তীকালে ভারতে শিল্পবিরোধ খুব তীব্র হলে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯২৯ সালের শিল্পবিরোধ আইন এবং যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ক) ধারায় সমন্বয় করে উপরোক্ত সামগ্রিক শিল্পবিরোধ আইন পাস হয়। পরবর্তীকালে অনেকবারই আইনটি সংশোধিত হয়েছে। এই আইনে বর্তমানে শিল্পবিরোধ নিবারণের ব্যবস্থা এবং তার মীমাংসার পদ্ধতিটি হল ঃ

১. ১০০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই একটি করে ওয়ার্কস কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সমসংখ্যক সদস্য থাকবে এবং উভয় পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় আলোচনা, উভয়পক্ষের বিরোধ আলাপ-আলোচনা দ্বারা দূর করা এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য এ কমিটি সর্বদা চেষ্টা করবে।

২. বিরোধ মীমাংসায় ওয়ার্কস কমিটি ব্যর্থ হলে আপস কর্মচারী অনুসন্ধান ও মীমাংসার চেষ্টা করবে এবং ১৪ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট বিবরণ দাখিল করবে।

৩. আপস কর্মচারী ব্যর্থ হলে সরকার বিষয়টি আপস পর্ষদে পাঠাবে। সেটা ব্যর্থ হলে মামলাটি অনুসন্ধান আদালতে যাবে এবং তাতেও বিফল হলে সাধারণ আদালতের নিকট পাঠাবে।

আপস কর্মচারী, কিংবা আপস পর্ষদের ও আদালতের দ্বারা মীমাংসা হলে তাদের সুপারিশ উভয় পক্ষের মানা বাধ্যতামূলক। অনুসন্ধান আদালতের সুপারিশ মানা বাধ্যতামূলক নয়। সরকার অবশ্য আদালত, আপস পর্ষদ বা আপস কর্মচারীর রায় ও সুপারিশকে অগ্রাহ্য করতে পারে।

শিল্পবিরোধের মীমাংসার জন্য তিন স্তরের আদালত স্থাপিত হয়েছে। প্রথমত, ধর্মঘট, লকআউট ইত্যাদি সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য শ্রম আদালত বা লেবার কোর্ট। দ্বিতীয়ত, মজুরি, কাজের সময়, বোনাস, ছাটাই, শিল্প-সংস্কার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিরোধের বিচারের জন্য শিল্প আদালত বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল। তৃতীয়ত, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং একাধিক রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এরূপ শ্রমিকবিরোধের বিচারের জন্য জাতীয় শিল্প আদালত বা ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল। যে-কোনো শিল্পবিরোধের প্রকৃতি বিচারে সরকার বিরোধটি উপরোক্ত তিনটি আদালতের মধ্যে যেটি যথোপযুক্ত সেখানে বিচারের জন্য পাঠায়। এই আদালত-

গুলির রায় চূড়ান্ত এবং তাদের কোনোটির রায়ের বিরুদ্ধেই অন্য কোনো আদালতে আর আপীল করা যায় না।

এই আইনে ছয় সপ্তাহের নোটিস ছাড়া কোনো জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্প এবং কোনো বিরোধ মীমাংসার জন্য আপস প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়ে বা কোনো বিরোধ শিল্প আদালতের বিচার্য থাকাকালীন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট বা লক আউট নিষিদ্ধ।

আগে কেবল মালিক (নিয়োগকর্তা) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার পরিবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারত। এখন এর যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এখন নিয়ম হয়েছে যে, ২১ দিনের নোটিস না দিয়ে নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের কাজের অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। অন্যদিকে, শ্রমিকরাও স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার পরিবর্তনের জন্য এখন আবেদন করতে পারে। ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনে শিল্পবিরোধের মীমাংসার চেষ্টা চলাকালীন মালিকপক্ষের কোনো শ্রমিককে বরখাস্ত করার অধিকার ছিল না। কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতা বৃদ্ধির অজুহাতে বর্তমান সংশোধনে সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মালিকপক্ষকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, আদালতের রায় পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রমবিরোধ আইনের ১৯৬৫ সালের সংশোধনী দ্বারা ছাটাই বা বরখাস্ত হলে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে কোনো শ্রমিক বরখাস্ত বা ছাটাই হলে সে নিজেই এ বিষয়টি শ্রম আদালতে তুলতে পারে। এজন্য ইউনিয়নের মাধ্যমে না গেলেও চলবে। ১ বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে থাকলে সাময়িক শ্রমিকেরা লে-অফের জন্য তাদের মূল বেতন ও দুর্মূল্য ভাতার অর্ধেক ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবে। মালিকেরা এই আইন ভঙ্গ করে শাস্তি পাওয়ার পরেও যদি ক্রমাগত আইন ভঙ্গ করতে থাকে তবে তাদের প্রত্যহ ২০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে স্থির হয় যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে শিল্প সম্পর্ক কমিশন (Industrial Relations Commission) প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিন সদস্যবিশিষ্ট এ কমিশনে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে, আর তৃতীয় ব্যক্তি (যিনি চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করবেন) হবেন বিচার বিভাগের লোক। এটা ঠিক হয়েছে কোনো শিল্পবিরোধের যদি আপস মীমাংসা না হয়, তখন শ্রমিক, মালিক বা সরকার—এ তিনের যে কোনো পক্ষই বিরোধের বিষয়টিকে কমিশনের নিকট পাঠাতে পারবে। তবে বিরোধের আপস মীমাংসা করার কোনো ক্ষমতা কমিশনের হাতে দেওয়া হয়নি।

সমালোচনা : ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন ও তার সর্বশেষ সংশোধনী দ্বারা বর্তমানে শিল্পবিরোধ মীমাংসার যে আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে নিম্নোক্ত কারণে তার সমালোচনা করা হয় : (১) স্থায়ী নির্দেশ সম্পর্কে মালিকপক্ষের ক্ষমতা বর্তমানে সংকুচিত করায় মালিকরা বিক্ষুব্ধ হয়েছে। (২) তেমনি বিরোধ মীমাংসা চলাকালীন মালিকপক্ষকে শ্রমিক ছাটাইয়ের অধিকার দানে শ্রমিকপক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি করা হয়েছে। (৩) শিল্প আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৯৫০ সালে শিল্পবিরোধ আইনের সংশোধন করে একটি শ্রম আপীল আদালত স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালে ঐ আইনটি পুনরায় সংশোধন করে আপীল আদালত তুলে দেওয়া হয়। তাতে শ্রমিকদের অসুবিধা বেড়েছে। সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে—বর্তমানে কেবলমাত্র এই অভিযোগে শ্রম ও শিল্প আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে আপীলের সাধারণ অধিকার ও সুযোগ রয়েছে। এর ফলে শ্রমিক মালিক উভয়পক্ষই এই দুটি উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু এটা ব্যয়-বহুল হওয়ায় শ্রমিকদের পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণ করার অসুবিধা খুবই বেশি। বর্তমানে পুনরায় আপীল আদালত প্রবর্তনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। (৪) শ্রম-বিরোধ আদালতের রায় বাতিলের অধিকার সরকারকে দেওয়া সম্পর্কেও প্রবল সমালোচনা করা হয়েছে। এতে সরকারকে স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে আদালতের সাহায্যে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থার উপর শ্রমিকদের ভরসা কমে গেছে। (৫) সর্বোপরি, বর্তমান ব্যবস্থার স্বেচ্ছা-মূলক আপস আলোচনার পথ খোলা রাখা হলেও, তুলনায় বাধ্যতামূলক সালিসীর উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বাধ্যতামূলক সালিসী ব্যবস্থার কুফলগুলি থেকে যাচ্ছে ও শিল্পে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপনে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

৩০.৬. শিল্পবিরোধ প্রশমন শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা : উপায় Prevention of Industrial Disputes / Establishment of Industrial Peace : Means

১. শিল্পবিরোধ ঘটলে তার দ্রুত মীমাংসার ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন শিল্পবিরোধ নিবারণের ও শিল্পে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দুই প্রকার ব্যবস্থা এর জন্য প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ত্রিদলীয় সম্মেলন, নিয়মানুবর্তিতার জন্য শ্রমিক মালিক আচরণ বিধি, যৌথ দরকষাকষি, মজুরি পর্ষদ, শ্রমবিরোধ আদালতের রায় কার্যকর করা, ব্যবস্থাপনাকার্যে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। পরোক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতি ও দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য আইন, মজুরিসংক্রান্ত আইন, শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আইন এবং মুনাফায় শ্রমিকদের অংশপ্রাপ্তি প্রভৃতি উল্লেখনীয়। এই সকল পরোক্ষ ব্যবস্থা দ্বারা শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ দূর হলে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের স্থায়ী উন্নতি হতে পারে ও শিল্পে শান্তি স্থাপিত হতে পারে।

২. **প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা ঃ**

(ক) **ত্রিদলীয় সম্মেলন ঃ** ১৯৪২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ভারত সরকার শ্রমিক মালিক, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে ত্রিদলীয় সম্মেলন বসছে। এই প্রকার ত্রিদলীয় সম্মেলনের অধিবেশন এবং তার স্থায়ী কমিটির কার্যের মাধ্যমে শিল্পের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তিন পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা সর্বসম্মত শ্রমসংক্রান্ত নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ সম্ভব হয়। ফলে শ্রমিক মালিক বিরোধের অনেক কারণ দূর করা সহজ হয়। এই সম্মেলন সরকারকে শ্রমনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেয় এবং সরকারী নীতি এতে ঘোষিত হলে তদনুযায়ী শ্রমিক ও মালিক কর্তৃপক্ষ তার সাথে নিজেদের কার্যাবলীর সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে।

(খ) **নিয়মানুবর্তিতার আচরণবিধি ঃ** ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে একটি নিয়মানুবর্তিতার আচরণবিধি গৃহীত হয়। পরস্পরের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনা, মধ্যস্থ মারফত আপস-আলোচনা ও স্বেচ্ছামূলক সালিসীর দ্বারা বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি গ্রহণে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষকে স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করানই এর উদ্দেশ্য। এই আচরণবিধির প্রধান ধারাগুলি হল ঃ ক. নোটিস ব্যতীত কোনো ধর্মঘট বা লক-আউট হবে না; খ. ধীরগতিতে উৎপাদন চালাবার পথ গৃহীত হবে না; গ কলকব্জা, যন্ত্রপাতির কোনো ক্ষতি করা হবে না। ঘ. হিংসা, ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ অথবা প্ররোচনাদান করা হবে না; ঙ. শিল্পবিরোধের বর্তমান আইনগত পদ্ধতি অনুসৃত হবে; চ. আপস চুক্তি ও রায় অবিলম্বে কার্যকর করা হবে ইত্যাদি। শ্রমিকদের সব কেন্দ্রীয় সংগঠন ও মালিকদের প্রধান সংগঠনসমূহ এই আচরণবিধি গ্রহণ করায় ভারতে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে আচরণের মান নির্দিষ্ট হয়েছে। এটা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের পক্ষে একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

(গ) **যৌথ দরকষাকষি (Collective Bargaining) ঃ** শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষির দ্বারা চুক্তির মাধ্যমে মজুরির হার ও কাজের শর্ত স্থির করার পদ্ধতিকে যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি বলে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলি হল ঃ** ক. অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক সংঘগুলিতে শ্রমিকদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য। এর ফলে এই পদ্ধতির মাধ্যমে সহজে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়। সব শ্রমিকের জন্য একটি ইউনিয়ন না থাকলে এটা সম্ভব হয় না। একটি মাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে, গোটা শিল্পে আঞ্চলিকভাবে বা জাতীয় স্তরে সব শিল্পেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব। খ. সরকার, মালিক, শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার মনোভাব। জনসাধারণের অনুমোদন, শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের পারস্পরিক বোঝাবুঝির মনোভাব, যৌথ দরকষাকষি চলাকালে মালিকপক্ষ কোনো প্রকারের শ্রমিক-বিরোধী কাজ করতে না পারে তার জন্য সরকার কর্তৃক উপযুক্ত আইন রচনা—ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হলে যৌথ দরকষাকষি সফল হতে পারে। গ. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, হিসাব ও সংবাদ সংগ্রহের জন্য শ্রমিকদের নিজস্ব গবেষণার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। যৌথ দরকষাকষির সময় প্রয়োজনীয় তথ্য, হিসাব ও সংবাদাদিসহ প্রস্তুত হয়ে শ্রমিকপক্ষের মুখপাত্রগণ আলাপ-আলোচনায় সুষ্ঠুভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক বিরোধ কমে, শিল্পে উৎপাদন অব্যাহত থাকে, শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমিক ঐক্য বাড়ে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার জন্য এখনও প্রধানত বাজারের অবস্থা ও কিয়ৎ পরিমাণে সরকারী আইনের দ্বারা মজুরি হার ও কাজের অন্যান্য শর্ত স্থির হয়ে থাকে; কিন্তু শ্রমিকদের দিক থেকে এটা অসন্তোষজনক। অবশ্য, বর্তমানকালে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধি, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, শিল্পের মুনাফাবৃদ্ধি ও শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির ফলে ভারতে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ বাড়ছে। ভূতপূর্ব শ্রমমন্ত্রী ভি. ভি. গিরি প্রমুখ অনেকের মতে, ভারতে ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য এর অনুকূলে সরকারী নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। বিশেষত, ভারতের মত দেশে বাধ্যতামূলক সালিসীর পরিবর্তে যৌথ দরকষাকষির দ্বারা শ্রমিক-মালিক বিরোধ মেটাবার ব্যবস্থা শিল্পে শান্তি স্থাপনে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ভারতীয় অর্থনীতির পটভূমিকায় যৌথ দরকষাকষির প্রয়োগ সম্পর্কে

আলোচনায় প্রথমেই বাটা কোম্পানির কথা উল্লেখ করতে হয়। বাটা কোম্পানির শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ১৯৪৮ সালের যৌথ দরকষাকষির চুক্তি এই ব্যাপারে ভারতে সর্বপ্রথম চুক্তি বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে ঐ কোম্পানিতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি (সেটা ব্যর্থ হলে সালিসীর মাধ্যমে) ও বোনাস প্রদান সম্পর্কে দু'টি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালের শ্রম সম্পর্ক বিলের কথা উল্লেখ করতে হয়। এ বিলে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ছিল। নানা কারণে এ বিল আইনে রূপান্তরিত হতে পারেনি। এ প্রকারের চুক্তি ভারতে আরও কয়েকটি শিল্পে সম্পাদিত হয়েছে। যথা—বোম্বাই মিল মালিক সমিতি ও রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সংঘ, টাটা কোম্পানি ও টাটা শ্রমিক ইউনিয়ন, মহীশূর পেপার মিলস্, ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস, মোদী স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস্, আসাম অয়েল কোং এবং ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানি।

(ঘ) **মজুরি পর্ষদ (ওয়েজ বোর্ড)ঃ** আদালতের সাহায্যে সর্বদা সন্তোষজনকভাবে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয় না। অথচ এ বিষয়টি নিয়ে অনেক শ্রমবিরোধের সৃষ্টি হয়। এজন্য দেখা গেছে শ্রমিক, মালিক ও একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি—এই তিন পক্ষ নিয়ে প্রত্যেক শিল্পের জন্য পৃথক মজুরি পর্ষদ গঠন করলে তাতে সহজে সন্তোষজনক মজুরি হার নির্ধারিত হতে পারে। ফলে মজুরি হারজনিত শ্রমবিরোধ দূর হতে পারে। ভারতে সংবাদপত্রের জন্য অনুরূপ মজুরি পর্ষদের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। এজন্য ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ভারতের পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলনের শ্রমিকপক্ষ থেকে বাগিচা, খনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, তুলাবস্ত্র, লৌহ-ইস্পাত, রাসায়নিক, চিনি, রেল পরিবহণ, সিমেন্ট শিল্প, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ, দেশরক্ষা শিল্পে অসামরিক কর্মী এবং ডক ও বন্দর কর্মীদের জন্য মজুরি পর্ষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে সরকার এ পর্যন্ত তুলাবস্ত্র শিল্প, চিনি, চটকল ও সিমেন্ট শিল্পের জন্য মজুরি পর্ষদ নিয়োগ করেছে। ১৯৬০ সালে তুলাবস্ত্র ও সিমেন্ট শিল্পের জন্য মজুরি পর্ষদের সুপারিশ ও তৎসংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে।

(ঙ) **ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণঃ** সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে শিল্পের ব্যবস্থাপনার ভার শ্রমিকদের হাতে অর্পণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই জন্য শ্রমিকদের উপর শিল্পের ব্যবস্থাপনার ভার অর্পিত হয়েছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শিল্পক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনায় এই ব্যবস্থা আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকের যুক্ত কমিটি গঠনের জন্য আইন পাশ হয়। ১৯১৭ সালের হুইটলে কমিটির সুপারিশে এটা ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয় বলে একে সেখানে হুইটলে কাউন্সিল বলা হয়। ভারতে এটা ওয়ার্কস কমিটি নামে পরিচিত।

ভারতের ১৯৪৭ সালের শ্রমবিরোধ আইনে ১০০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী প্রত্যেক কারখানায় স্থায়িভাবে এ ব্যবস্থা চালু হয়। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতি বিধানই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের কাজে উল্লেখযোগ্য ও সন্তোষজনক কোনো ফল পাওয়া যায় না। পরে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের জন্য একে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৬ সালে এজন্য একটি স্টাডি গ্রুপ নিযুক্ত হয়, ও তা কয়েকটি সুপারিশ করে। তারপর ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে বিষয়টি সম্পর্কে আরও আলোচনা চলে এবং একটি কর্মসূচি প্রণয়নের নিমিত্ত একটি সাবকমিটি নিয়োগ করা হয়। ঐ কমিটি কোন্ কোন্ শিল্প ব্যবস্থাপনাকার্যে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হবে তার একটি তালিকা প্রণয়ন করে। ১৯৫৮ সালের ব্যবস্থাপনাকার্যে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা কিরূপে সুনিশ্চিত ও সম্ভব করা যায় এজন্য একটি আলোচনা আহ্বান করা হয়। ঐ আলোচনা চক্র শ্রমিক-মালিক যুক্ত কমিটি কিভাবে গঠিত হবে এবং তাদের কি কি কাজ থাকবে সে সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করে। ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় আলোচনা-বৈঠক আহ্বান করা হয়। সেটা এই প্রকার **জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের** কাজে সহায়তা করবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপনের পরামর্শ দেয়। সম্মেলনের পরামর্শে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৯৮০ সালের মার্চ অবধি এরূপ ২৩৫টি কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১৩৫টি ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ১০০টি। ফলাফল সম্পর্কে বলা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাল হলেও সাধারণভাবে তা খুব সন্তোষজনক নয়। এই অসন্তোষজনক ফলের কারণঃ ক. যৌথ ব্যবস্থাপনা পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের প্রয়োজনীয় শিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব। খ. কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐ পরিষদ আলোচনা করবে এবং সংবাদাদি পাবার অধিকারী হবে সে সম্পর্কে মতৈক্যের অভাব। গ. শ্রমিকসংঘগুলির অভ্যন্তরীণ বিরোধ। এই বিরোধের ফলে পরিষদের কাজ

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে নি। শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকসংঘ ছাড়া যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদের কার্যে সাফল্য লাভ করা যায় না তা স্বীকার করতেই হয়।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার পরিচালক পর্ষদে শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণের একটি স্কীম নিয়েছে। পিম্প্রিতে হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিকস লিমিটেড-এর পরিচালক পর্ষদে একজন শ্রমিক পরিচালক নিয়োগ করে এটি শুরু করা হয়েছে।

(চ) **শ্রমবিরোধ আদালতের রায় ও চুক্তি কার্যে পরিণতকরণ:** শ্রমবিরোধ আদালতের রায় ও আপস চুক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে মান্য করা হয় না বলে তাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। এজন্য ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনে জরিমানার ব্যবস্থা থাকলেও (সামান্য ২০০ টাকা বলে) সেটা কার্যকর করা হয়নি। এ কারণে ১৯৫৮ সালের জুন মাসে একটি কেন্দ্রীয় কার্যকারীকরণ এবং মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজ্যস্তরেও অনুরূপ কমিটি স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রিদপ্তরে মূল্যায়ন ও রূপায়ণ সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন শ্রম আইন, শ্রমবিরোধ আদালতের রায় ও আপস চুক্তি দ্রুত কাজে পরিণত হচ্ছে।

৩. **পরোক্ষ ব্যবস্থা:**

(ক) **ফ্যাক্টরী আইন:** কাজের শর্ত এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নই কারখানা আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কলকারখানায় শিশুদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ১৮৮১ সালে ভারতে সর্বপ্রথম ফ্যাক্টরী আইন পাস হয়। কয়েকবার এর সংশোধনের পর ভারতে শ্রমিকদের সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনের সুপারিশ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের প্রবর্তিত বিধিগুলি গ্রহণ করে ১৯৩৪ সালে একটি নতুন ফ্যাক্টরী আইন পাস করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর পুনরায় নতুন অবস্থার উপযোগী একটি সম্পূর্ণ নতুন ফ্যাক্টরী আইন প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৪৯, '৫০, '৫৩ ও '৫৪ সালে তা সংশোধিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য বিধিগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান: (১) সাধারণত ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী ও শক্তি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান হলে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে 'ফ্যাক্টরী' বলে গণ্য করা হবে। (২) বয়স্ক শ্রমিকদের কাজের সময় প্রতিদিন ৯ ঘণ্টা ও সপ্তাহে মোট ৪৮ ঘণ্টা বলে নির্দিষ্ট হয়। (৩) ফ্যাক্টরীগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা, দুর্ঘটনা থেকে নিরাপত্তা ও শ্রমকল্যাণের নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। (৪) কারখানায় নিয়োগের যোগ্য কিশোরদের বয়স ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৪ বৎসর করা হয়। (৫) সাময়িক ও স্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য দূর করা হয়।

(খ) **খনি সম্পর্কিত আইন:** ফ্যাক্টরী আইনের মত খনি আইনেরও উদ্দেশ্য হল খনিশ্রমিকদের কাজের শর্ত এবং পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।

ভারতের প্রথম খনি আইন পাস হয় ১৯০১ সালে। ১৯২৩ সালে তার স্থলে আর একটি নতুন আইন পাস করা হয়। অবশেষে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫২ সালে, ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইনের ন্যায় খনি-শ্রমিকদের কাজের শর্তাদি ও পরিবেশ প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা বিষয় সম্পর্কে একটি ব্যাপক আইন পাস হয়। এর দ্বারা—(১) সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা ও খনির উপরে দৈনিক ৯ ঘণ্টার এবং খনি গর্ভে ৮ ঘণ্টার অধিক কাজ নিষিদ্ধ করা হয়; (২) অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি দিতে হবে; (৩) সকালে ৬টার পূর্বে ও সন্ধ্যা ৭টার পরে কাজে নারী-শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়; (৪) ১৮ বৎসরের কম বয়সের শ্রমিকের খনি গর্ভে কাজের জন্য নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়; (৫) বেতনসহ ছুটি ও বিকল্প ছুটির ব্যবস্থা করা হয়; (৬) কার্যস্থলে শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ও শ্রমকল্যাণ কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়।

(গ) **অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক কর্মচারী সংক্রান্ত আইন:** বাগিচা শিল্পের শ্রমিকদের কাজের শর্তাদি ও পরিবেশ সম্পর্কে ফ্যাক্টরী আইনের অনুরূপ ১৯৫১ সালে বাগিচা-শিল্প শ্রমিক আইন পাস হয় এবং ১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে প্রবর্তিত হয়। তাছাড়া দোকান কর্মচারীদের সম্পর্কে, পরিবহণ কর্মীদের সম্পর্কে ও ডক শ্রমিকদের সম্পর্কে আইন পাস করা হয়েছে।

(ঘ) **মজুরি প্রদানের আইন:** ১৯৩৬ সালে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান আইন পাস করে নিয়মিত মজুরি প্রদানের এবং মালিক পক্ষের খুশিমত জরিমানা ও বেতন কাটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আইনটি কয়েকবার সংশোধিত হয়। সর্বশেষ সংশোধন ঘটে ১৯৫৭ সালে। কিন্তু এই আইনের দ্বারা শ্রমিকদের জীবনধারণের মত মজুরির ব্যবস্থা না হওয়ায় স্বাধীনতা লাভের পর নতুন আইন পাসের প্রয়োজন হয়।

(ঙ) **ন্যূনতম মজুরি আইন: প্রয়োজনীয়তা:** ভারতের শিল্প শ্রমিকদের মজুরির হার সাধারণভাবেই কম। তন্মধ্যে এমন বহু শিল্প আছে যেখানে শ্রমিকদের কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করতে হয় অথচ মজুরির হার অবিশ্বাস্য রকমের অল্প। এই সমস্ত শিল্পের শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা বেশি শোষিত হয়। সাধারণত দেখা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই সকল শিল্প গড়ে ওঠে। এতে নিযুক্ত শ্রমিকের শক্তিশালী শ্রমিক-সংঘ গড়ে তুলতে বিভিন্ন কারণে অক্ষম। ফলে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের দর-কষাকষির ক্ষমতা থেকে এরা বঞ্চিত। এ সকল কারণে অতিশয় অল্প হারের মজুরিতে কাজ করা ছাড়া এদের কোনো উপায় থাকে না।

পৃথিবীর বহু শিল্পোন্নত দেশে অত্যধিক শোষিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছে। ভারতের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রস্তাব আগেই তোলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব মেনে নিতে ১৯২৬ সালে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকার এটা মেনে নেয় নি। পরবর্তীকালে 'রয়েল কমিশন অব লেবার'ও প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের অভাবের অজুহাতে এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নি। তবে কমিশন আসামের চা বাগিচার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি মজুরি পর্ষদ স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত শ্রম অনুসন্ধান কমিটিগুলিও এর সমর্থন করেছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের আগে এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা হয়নি। ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন এই দিকে প্রথম সরকারী পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যায়।

বৈশিষ্ট্য : এই আইনের দ্বারা কয়েকটি নির্দিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়েছে। যে সকল শিল্পে শ্রমিকেরা কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে অথচ খুবই কম মজুরি পায়, সেই সকল শিল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করা হবে। (১) প্রয়োজনবোধে যে কোনো নতুন শিল্পে এই আইন প্রয়োগের ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। (২) যে শিল্পে এক হাজারের কম শ্রমিক নিযুক্ত সেখানে এই আইন প্রয়োগ করা চলবে না। (৩) মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার নিজেই কোনো শিল্পের পক্ষে প্রযোজ্য মজুরির হার ঘোষণা করতে পারে, অথবা কোনো কমিটি নিয়োগ করে তাকে নির্দিষ্ট শিল্পের সকল দিক অনুসন্ধান করে সেখানে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দায়িত্ব দিতে পারে। (৪) মজুরি সংক্রান্ত সব প্রস্তাব সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হবে এবং প্রকাশনের তিন মাস পর কার্যকর হবে। প্রচলিত মজুরির হার পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকবে। (৫) ঐ মজুরি হারের পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হলে সরকার এই উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করে তার সুপারিশ সম্পর্কে বিবেচনা করবে। বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার উপদেষ্টা পর্ষদ নিয়োগ করবে। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের পরামর্শ দেবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ স্থাপনের কথাও এই আইনে বলা আছে। এই সকল কমিটি ও পর্ষদে শ্রমিক ও মালিকদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে এবং এ ছাড়া কয়েকজন নিরপেক্ষ সদস্য থাকবেন যাঁদের সংখ্যা কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ⅓-এর বেশি হবে না। সদস্যরা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। (৬) এই মজুরির হার ফুরন হিসাবে ও সময় হিসাবে এই দুইপ্রকার কাজের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হবে। (৭) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, নারী, শিশু ও শিক্ষানবীস ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে মজুরি নির্ধারিত হবে। (৮) ন্যূনতম মজুরি দেশের সর্বত্র সমান হবে এমন কোনো কথা নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে মজুরি হার বিভিন্ন হতে পারে এবং কাজের প্রকৃতি অনুযায়ীও মজুরি হারের তারতম্য হতে পারে। (৯) ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণে মূল মজুরির সাথে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাতা যুক্ত হতেও পারে, অথবা নাও হতে পারে। আবার টাকা পয়সা অথবা দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে এই মজুরি নির্ধারিত হতে পারে।

কার্যে রূপায়ণ : অদ্যাবধি সমস্ত রাজ্য সরকারই কয়েকটি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি আইন প্রয়োগ করেছে। তন্মধ্যে চালকল, ময়দাকল, মোটর পরিবহণ, চর্মশোধন, বাগিচাশিল্প, কার্পেট নির্মাণ, লাক্ষা, তামাক ইত্যাদি শিল্প অন্যতম। তা ছাড়াও কয়েকটি রাজ্য সরকার কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কার্যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যেই বহু শিল্পে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সব রাজ্যেই সমস্ত তালিকাভুক্ত শিল্পে এখনও ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ করা যায়নি, তাই ন্যূনতম মজুরি আইনের একটি সংশোধন (১৯৬১) দ্বারা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সময়ের সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় ন্যূনতম মজুরি পরামর্শদাতা পর্ষদ ন্যূনতম মজুরি আইনের দায়িত্বগুলি পালনের জন্য কেন্দ্রে ও প্রতি রাজ্যে একটি করে ন্যূনতম মজুরি কর্তৃপক্ষ স্থাপনের সুপারিশ করেছে। এটা অবিলম্বে স্থাপন করা উচিত।

মন্তব্য : (১) এই আইনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো কোনো অংশের সুবিধা হয় বটে, তবে কোনো শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা এক হাজারের কম হলে সেখানে এর প্রয়োগ হবে না—এ নীতির ফলে, অনেক শিল্পই এই আইনের প্রয়োগ থেকে বাদ পড়েছে। বাগিচা শিল্প ছাড়া কোনো বৃহৎ শিল্প এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে চটকল, কয়লাখনি ইত্যাদি শিল্পের শ্রমিকেরা এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হয় না, অথচ এ সকল ক্ষেত্রে শোষণ খুবই ব্যাপক ও গভীর।

(২) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে সরকারী বিভাগের পূর্ণ কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। এ ব্যাপারে প্রত্যেক শিল্পে একটি করে মজুরি পর্ষদ স্থাপিত হওয়াই উচিত। এবং সেই পর্ষদ স্থায়ী ভিত্তিতে গঠিত হলে তাতে সুফল লাভের সম্ভাবনা বেশি। (৩) ন্যূনতম মজুরির কোনো সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে কোথাও নির্ধারিত হয়নি। কোন্ নীতির ভিত্তিতে এই মজুরি হার স্থির করা হবে সে বিষয়েও পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয়নি। (৪) কোনো শিল্পে যদি এই আইন লঙ্ঘন করা হয় তবে তাকে বলবৎ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিধি এই আইনে নেই। সুতরাং মালিকেরা আইন ভঙ্গ করলেও শ্রমিকদের কিছুই করার থাকবে না। (৫) এ পর্যন্ত অনেকগুলি শিল্পে ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারিত হলেও সেই মজুরি হার সব শিল্পে এক নয়। এ কারণে সারা ভারতে সব রকমের শিল্পেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি সাধারণ মজুরি হারের প্রয়োজন রয়েছে।

(চ) **বোনাস আইন :** ভারতে শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে বোনাসের সমস্যা আধুনিককালে প্রভুত গুরুত্ব লাভ করেছে। বোনাস ও মজুরি সংক্রান্ত বিরোধ ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশি শ্রমদিবস নষ্ট করেছে। তাই শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বোনাস সমস্যার সমাধান অতিশয় জরুরী বিষয়। ১৯৮০ সালে বোনাস প্রদান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইনটি চালু হয়। সরকারী ক্ষেত্রের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-গুলিতে এ আইন সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে না। তবে সরকারী ক্ষেত্রের যে সব প্রতিষ্ঠানকে সমশ্রেণীভুক্ত বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় সেই সব সরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানে বোনাস দেওয়া হবে। এ ছাড়া মুনাফা অর্জন যে সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয় সে সব প্রতিষ্ঠানে (যেমন রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, জীবনবীমা, করপোরেশন, সরকারী বিভাগীয় সংগঠন প্রভৃতি) বোনাস দেওয়া হবে না। দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্ক বোনাস আইনের আওতায় আসবে। প্রতিষ্ঠানের হাতে বণ্টনযোগ্য উদ্বৃত্ত টাকা থাকুক বা না থাকুক, বোনাসের ন্যূনতম পরিমাণ হবে হয় ৮·৩৩ শতাংশ হারে যে পরিমাণ টাকা হয় সেটা অথবা ১০০ টাকা—এ দুটির মধ্যে টাকার যে অংশটি অধিক সেই পরিমাণ টাকা। বোনাসের হার কোনো ক্ষেত্রেই ২০ শতাংশের বেশি হবে না এবং এই হারে বোনাস একমাত্র সেইসব প্রতিষ্ঠানেই দেওয়া যাবে যেখানে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে থাকবে।

বণ্টনযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থের ভিত্তিতে বোনাস দেবার নীতির পরিবর্তে অন্য বিকল্প সূত্র অনুসারেও বোনাস দেওয়া যাবে। তবে কোনো বিকল্প নীতি অনুসরণ করতে গেলে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়েই তা করতে হবে। অন্য কোনো নীতি বা সূত্র অনুসারে বোনাস দিলে সেটা আইনবিরুদ্ধ বলে গণ্য করা হবে।

১৯৬৫ সালের বোনাস আইনে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের বা রাজ্য সরকারের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন কোনো শিল্পে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বোনাস দেওয়া চলবে না। অধুনা উৎপাদনশীলতার সাথে বোনাসকে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ডাক ও তার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বোনাস দেওয়া শুরু হয়েছে।

(ছ) **শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা (Welfare Measures) :** ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৫১ সালের বাগিচা-শ্রমিক আইন এবং ১৯৫২ সালের খনি আইনের অন্তর্গত সকল শিল্প, ক্যান্টিন, ক্রেস বা শিশু লালনাগার, বিশ্রামগৃহ, স্নানাগার, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং শ্রমিককল্যাণ কর্মচারী নিয়োগের বন্দোবস্ত হয়েছে। এ ছাড়া কয়লা ও অভ্রখনিসমূহে কল্যাণমূলক কার্যক্রম রূপায়ণের জন্য তহবিল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। মোটর পরিবহণ শিল্পের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা বিবেচনাধীন রয়েছে।

১. ১৯৪৭ সালের কয়লাখনি শ্রমিককল্যাণ আইন পাস করে একটি 'কয়লাখনি শ্রমিককল্যাণ তহবিল' সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ২টি কেন্দ্রীয় হাসপাতাল, ৮টি শিশুকল্যাণ কেন্দ্র ও প্রসূতিসদন সহ আঞ্চলিক হাসপাতাল, ২টি ডিসপেন্সারী এবং ২টি টি বি. ক্লিনিক পরিচালনা করছে। ম্যালেরিয়া বিনাশ কার্যক্রম এবং বি. সি. জি. টিকাদান কর্মসূচিও পরিচালিত হচ্ছে।

এই তহবিল থেকে বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র, নারী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু উদ্যান ও পরিবার পরামর্শদান কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। খনিশ্রমিক সন্তানদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যও এ পরিচালনা করেছে।

এর সহায়তায় এবং কার্যক্রমের দ্বারা শ্রমিকদের গৃহাদি নির্মাণের কাজ চলছে।

২. ১৯৪৬ সালের অভ্রখনি শ্রমিককল্যাণ আইন অনুসারে অভ্রখনি শ্রমিকদের চিকিৎসা, শিক্ষা এবং অবসর বিনোদন ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্য একটি অভ্রখনি শ্রমিককল্যাণ তহবিল স্থাপন করা হয়েছে। এটা বর্তমানে তিনটি হাসপাতাল পরিচালনা করছে এবং আর একটি হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং প্রসূতিসদন সহ অনেকগুলি ডিসপেন্সারী কার্যরত রয়েছে। অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

৩. ১৯৫১ সালের বাগিচা-শ্রমিক আইনের দ্বারা বাগিচা কোম্পানিগুলিকে শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ এবং হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী স্থাপনে প্রবৃত্ত করান হয়েছে। কয়েকটি কোম্পানি শ্রমিকদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুল পরিচালনা করছে।

৪ ১৯৬১ সালের মোটর পরিবহণ শ্রমিক আইন দ্বারা এই শিল্পের শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

৫. এ ছাড়াও লৌহ আকর খনি শ্রমিক আইন দ্বারা প্রতি টন আকরে ২৫ পয়সা হারে 'সেস' প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'সেস' থেকে লব্ধ অর্থ শ্রমিককল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

(জ) **সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Social Security Measures) : সামাজিক নিরাপত্তা কাকে বলে :** আধুনিক শিল্পায়ন নানাদিকে সমাজের অগ্রগতি ঘটিয়েছে। শিল্পায়িত সমাজ শ্রমিক শ্রেণীকেও যে উপকৃত করেছে, সে কথাও ঠিক। তবে এটা বলতেই হবে যে, শিল্পায়নের ফল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। তার কারণ, শিল্পায়িত সমাজ বহুক্ষেত্রেই শ্রমিকদের জীবনে সৃষ্টি করেছে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও অসহায়তা বোধ। শিল্পে কর্মরত শ্রমিককে মাথায় নিতে হয় নানা ধরনের ঝুঁকি। তার কর্মক্ষেত্রে বিপত্তি ও বিভ্রাট তার নিত্যসঙ্গী। যে সামাজিক-অর্থনীতিক পরিবেশে তাকে বাঁচতে হয় সেটা কঠোর ও তার পক্ষে প্রতিকূল। তার ভাগ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শিল্পায়িত অর্থনীতির তেজী ও মন্দা। ধনতান্ত্রিক মুনাফাভিত্তিক সমাজে যে বিষয়টি শ্রমিককে নিরন্তর পীড়িত করে তা হল নিরাপত্তার অভাববোধ। এই অভাববোধ শ্রমিকের কোনো মনগড়া ব্যাপার নয়। কারণ বিপদ ও বিভ্রাট তার জীবনে নানা দিক থেকে আসতে পারে। বস্তুতপক্ষে সেগুলি আসেও। অকস্মাৎ সে কর্মচ্যুত হতে পারে - তার নিজের কোনো অপরাধ বা ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও। কখনো কখনো কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পড়ে সে গুরুতরভাবে আহত হতে পারে এবং আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অকর্মণ্য হয়ে যেতে পারে। আবার বার্ধক্যজনিত কারণে বা অসুস্থতার জন্য সে অক্ষম হয়েও পড়তে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতির যখন উদ্ভব হয় শ্রমিকের সচরাচর কোনো নিরাপত্তা থাকে না। শ্রমিকও নিজের ক্ষমতায় এককভাবে তার নিজের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না। শিল্পায়িত সমাজে যে অভাব, অনটন, দুঃস্থতা ও দৈন্যদশা শ্রমিককে নিঃশেষ করে দিতে চায় তার বিরুদ্ধে শ্রমিককে আত্মরক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য যোগাতে এগিয়ে আসতে হয় রাষ্ট্রকে—তথা সমগ্র সমাজকে। এ উদ্দেশ্যে সমাজ রাষ্ট্রের মাধ্যমে নানা ধরনের বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এ সব রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক বিধিব্যবস্থা-গুলি সম্মিলিতভাবে গড়ে তোলে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার একটি কাঠামো। এ কাঠামো যত দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত হয়, শিল্পায়িত সমাজে। এ কাঠামোর সম্প্রসারণ যত ব্যাপক হয় শ্রমিকের নিরাপত্তা ততই সুনিশ্চিত হয়। তাই 'সামাজিক নিরাপত্তা' বলতে সাধারণভাবে সেই সব ব্যবস্থা, আইন-কানুন ও আচরণ বিধির কথাই বলা হয় যে ব্যবস্থাগুলি সমাজ শ্রমিকের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধানের ও বহুমুখী কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবর্তন করে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, প্রসূতিকল্যাণ সম্পর্কে বিবিধ আইন, ১৯৪৮ সালের কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন, ১৯৫২ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১ **দুর্ঘটনা, পেশাগত রোগ ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ :** ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের দ্বারা কার্যরত অবস্থায় আহত হওয়া, পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং তজ্জনিত মৃত্যুর দরুন শ্রমিকদের ক্ষতি-পূরণ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১,০০০ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী কর্মচারীরা এই সুবিধা ভোগ করে।

২. **প্রসূতিকল্যাণ :** ১৯২৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে প্রথম প্রসূতিকল্যাণ আইন পাস হয়। মধ্যপ্রদেশে ১৯৩০ সালে এইরূপ আইন পাস হয়। পরে শ্রম সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনের সুপারিশে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে এই প্রকার আইন পাস করা হয়। বর্তমানে প্রাদেশিক বা রাজ্য আইন ছাড়াও এ সম্পর্কে আরও তিনটি কেন্দ্রীয় আইনে এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথা—১৯৬১ সালের খনি প্রসূতি-কল্যাণ আইন, ১৯৪৮ সালের কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন এবং ১৯৫১ সালের বাগিচাশ্রমিক আইন। এই সকল আইন দ্বারা প্রসূতিদের আর্থিক সাহায্য নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রসূতি-কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের তারতম্যের জন্য এক্ষেত্রে সারা ভারতে একই প্রকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে প্রসূতিকল্যাণ আইন রচিত হয়। এটা কর্মচারী রাজ্যবীমা আইনের অন্তর্গত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য সকল কারখানা, খনি ও বাগিচাতে প্রযোজ্য হবে। খনিশিল্পের ক্ষেত্রে এই আইন ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য শিল্পে এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব রাজ্য সরকারসমূহের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

৩ **সামাজিক বীমা : ১৯৪৮ সালের কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন (Employees' State Insurance Act, 1948)** ভারতের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর দ্বারা শ্রমিকদের

স্বাস্থ্য, প্রসূতিকল্যাণ ও দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতা ইত্যাদি ব্যাপারে নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এটা কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রবর্তিত হয়েছে। এর অন্তর্গত ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. ভারতের সারা বৎসরব্যাপী চালু ও শক্তি ব্যবহারকারী এবং ২০ জন বা ততোধিক শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগকারী সব কারখানাতে এই আইন প্রযোজ্য হলেও সরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্য যে কোনো শিল্পে, বাণিজ্যিক বা কৃষি প্রতিষ্ঠানে এ বীমা সম্প্রসারণ করতে পারে।

খ. মাসিক ১,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী সকল শ্রমিক ও কর্মচারী এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ. এর দ্বারা পাঁচ প্রকার কল্যাণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যথা—(১) পীড়া ; (২) প্রসূতিকালীন ; (৩) অকর্মণ্যতা ; (৪) পোষ্য ; এবং (৫) চিকিৎসা। পীড়িতাবস্থায় ৫৬ দিনের জন্য অর্ধেক মজুরির হারে অর্থ সাহায্য, সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে ৬ সপ্তাহ করে মোট ১২ সপ্তাহের জন্য দৈনিক ৭৫ পয়সা হারে অর্থ সাহায্য, অকর্মণ্যতার দরুন অর্থ সাহায্য, পোষ্যবর্গের জন্য অর্থ সাহায্য ও বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এতে রয়েছে।

ঘ. এই আইন দ্বারা নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও পার্লামেন্টের দ্বারা নির্বাচিত ২ জন প্রতিনিধি এবং মালিকপক্ষ ও চিকিৎসকের প্রতিনিধি নিয়ে 'কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশন' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে।

ঙ. 'কর্মচারী রাজ্যবীমা তহবিল' নামে কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশনের একটি তহবিল স্থাপিত হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারী, মালিকপক্ষ এবং সরকারের প্রদত্ত চাঁদা নিয়ে তহবিল গঠিত হয়েছে।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে আইনটি সংশোধিত হয় এবং ১৯৫২ সালে প্রথমে কানপুর ও দিল্লিতে প্রবর্তিত হয়। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এটা ৬৪ লক্ষ শ্রমিকের ও তাদের ২ কোটি ৭০ লক্ষ পোষ্যবর্গের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে।

৪. **প্রভিডেন্ট ফান্ড ঃ** বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, ১৯৪৮ সালের কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বোনাস কর্মসূচী আইনের। মাসিক ১,৬০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এটা প্রবর্তিত হয়েছে। এই আইনের দ্বারা শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের মূল বেতন ও ভাতার ৬১/৪% ও মালিকপক্ষ থেকে অনুরূপ ৬১/৪% চাঁদা নিয়ে শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। তহবিলটি পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি ট্রাস্টী বোর্ড গঠিত হয়েছে।

প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন তিন বৎসর বা তার অধিককাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ২০ জন বা তদূর্ধ্ব শ্রমিক-কর্মচারীযুক্ত সব কারখানাতেই প্রযোজ্য। যে সকল শ্রমিক-কর্মচারী একটানা এক বৎসরের জন্য অথবা এক বৎসরের বা তার থেকে অল্পকালের মধ্যে অন্তত ২৪০ দিন প্রকৃতপক্ষে কাজ করছে এবং যাদের বেতন ও ভাতার মোট পরিমাণ মাসিক ৫০০ টাকার অধিক নয়, তাদের পক্ষে মূল বেতনের ৬১/৪% প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাঁদা হিসাবে দেওয়া বাধ্যতামূলক। তবে শ্রমিকেরা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি হারে চাঁদা দিতে পারে। সর্বোচ্চ হার হবে ৮১/৩%। মালিকপক্ষেরও অনুরূপ পরিমাণ প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদাদাতার সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ এবং চাঁদা ও সুদ বাবদ সারা দেশের কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে ১৮,৭১৬ কোটি টাকা জমা হয়। এ ছাড়া, একটি মৃত্যুত্রাণ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। এ থেকে শ্রমিক কর্মচারীর মৃত্যু, অসামর্থ্য ও অবসর গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ত্রাণমূলক অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৯টি শিল্পে ৮% হারে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষেরই প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৫ অন্যান্য **ক্ষতিপূরণ ঃ** ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনের বিভিন্ন সংশোধন দ্বারা শ্রমিকদের ছাঁটাই বা বাধ্যতামূলকভাবে কর্মহীন রাখার জন্য ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ আইনের ১৯৫৭ সালের সংশোধন দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে অথবা তার মালিকানার হস্তান্তর ঘটলে ক্ষতিপূরণ দানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

৬. **মেনন কমিটির রিপোর্ট ঃ মৃত্যুত্রাণ ও পেনসন ঃ** শ্রী ভি. কে. মেননকে সভাপতি করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি স্টাডি কমিটি ১৯৫৮ সালে সুপারিশ করেছিল যে, কর্মচারী রাজ্যবীমা ও কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্মসূচি—এই দুটিকে একত্রিত করে একটি সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। ১৯৫৮ সালে শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনেও এটা অনুমোদিত হয়। "এই

কমিটি অনেকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করে। ঐ সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৪ সালে শ্রমিকদের জন্য একটি সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয় এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যেমন কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীকে মৃত্যুত্রাণ বাবদ ১,২৫০ টাকা সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রমিকের মৃত্যুকালে তার আয় মাসিক ১,০০০ টাকার বেশি না হলে তবেই মৃত শ্রমিকের উত্তরাধিকারীরা এই ত্রাণসাহায্য পাবে। এ ছাড়া শ্রমিকের মৃত্যুর পর তার পত্নীকে আজীবনকাল মাসিক ২৫ টাকা হিসাবে এবং তার পুত্র কন্যাদেরও একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট হারে পেনসন্ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে কর্মচারী পরিবার পেনসন্ স্কীম চালু হয়েছে। কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর পেনসন্ দেওয়ার বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

৩০.৭. বেকার বীমা
Unemployment Insurance

১. গত ৩২ বৎসরেরও অধিককাল ধরে ভারতে একটি 'কল্যাণ রাষ্ট্র' এবং 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এদেশে বেকার বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। কিন্তু ইউরোপের ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই দীর্ঘকাল ধরে এটা প্রচলিত আছে, এমনকি সেখানে কর্মহীন ব্যক্তিদের বেকার ভাতাও দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এদেশের বেকার বীমার কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা অনুসন্ধানের জন্য একটি স্টাডি গ্রুপ নিয়োগ করেছিল। ঐ কমিটি সুপারিশ করেছিল, মালিক ও শ্রমিক, উভয়ের নিকট থেকে চাঁদা তুলে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য একটি বেকার বীমা-কর্মসূচি প্রবর্তন করা উচিত। কিন্তু ভারত সরকার তাতে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। পরে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বেসরকারী ও সরকারী উভয় ক্ষেত্রের জন্য একটি বেকার ত্রাণ তহবিল সৃষ্টির প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিবেচনা করে এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী একটি বিশদ কর্মসূচিও প্রস্তুত করে। কিন্তু শিল্পমালিকদের বিরোধিতার দরুন তা পরিত্যক্ত হয়। ১৯৬৫ সালে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তর কর্মচ্যুত বেকার শ্রমিকদের বীমার জন্য একটি কর্মসূচি রচনা করে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। শিল্প-শ্রমিকদের জন্য এরূপ বেকার বীমা ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু হওয়া যে প্রয়োজন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

২. মূল্যায়ন: ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলির কয়েকটি অতি সাধারণ প্রাথমিক ব্যবস্থা মাত্র। এগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এ ব্যাপারে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। শ্রমিকদের বেশির ভাগই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ পায়নি। কেবলমাত্র সংগঠিত শ্রমিকেরাই এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ জন এর দ্বারা উপকৃত। কৃষিশ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক প্রভৃতি এখনও এই ব্যবস্থার বাইরে রয়ে গেছে।

এ হল একদিকের অবস্থা। আবার অন্যদিকে দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি খাপছাড়াভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পে প্রবর্তিত হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানের কোনো চেষ্টাই হয়নি। তাই প্রয়োজন, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত সারা দেশের পক্ষে উপযোগী সম্পূর্ণ এক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির অনেক পিছনে পড়ে আছি। তাদের সমকক্ষ হতে হলে এই ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে করতেই হবে। তার জন্য দরকার সরকারের ইচ্ছা ও সচেতন প্রয়াস এবং নিষ্ঠা। আর দরকার বিপুল সম্বল। ভারতে যে সম্বল রয়েছে তা অপ্রতুল। সুতরাং, ভারতে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে অন্যতম বাধা হয়ে থাকছে সম্বলের অভাব। যথেষ্ট পরিমাণে সম্বল সংগ্রহ করে ভারতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপক ভিত্তিতে প্রবর্তন করা যে একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩০.৮. ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ
Workers' Participation in Management

১ শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও শিল্পের সমৃদ্ধিতে শ্রমিকদের আগ্রহ সৃষ্টি—এই সব উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক-কর্মীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়। শিল্পে গণতন্ত্র (industrial democracy) বলতেও একই কথা বোঝায়।

২. শিল্প সংস্থার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যগুলি হল: (১) ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমিকদের কাছ থেকে ফলপ্রদ চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ সংগ্রহ করা; (২) নিচের তলার শ্রমিকদের কাছ থেকে বাস্তব তথ্যগুলি পেলেই তবে সর্বোচ্চ স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে; (৩) শ্রমিকদের যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশ-

গ্রহণ করতে দেওয়া হয় তবেই তারা সে সিদ্ধান্তগুলি ভাল-ভাবে পালন করবে। (৪) সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের অংশগ্রহণের দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির দুই পক্ষের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে এবং তার ফলে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানটিতে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে তেমনি প্রতিষ্ঠানের একটানা উৎপাদন ও দক্ষতাও বাড়বে।

৩. ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ যে সব উপায়ে সম্ভব হতে পারে তা হল : (১) প্রতিষ্ঠানটিতে শ্রমিক-দের সহ মালিকানা (co-partnership) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এরকম ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিরও সহ-মালিকে পরিণত হয় এবং শেয়ারহোল্ডাররূপে তারা তাদের মধ্য থেকে ডিরেক্টর নির্বাচন করার অধিকার লাভ করে শুধু তাই নয়, লভ্যাংশ রূপে তারা মুনাফার ভাগ পায় এবং লোকসান হলে তার বোঝাও বহন করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মায়। তবে কার্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার প্রসার ঘটেনি, কারণ শ্রমিক ও মালিক কোনো পক্ষই এই ব্যবস্থাটি বিশেষ পছন্দ করে না।

(২) যুক্ত পরামর্শদাতা কমিটি বা পর্ষদ (joint consultation committee or joint management council) : শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই ধরনের যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। কাজের অবস্থা ও নানা বিষয় যেমন, কারখানায় আলোবাতাসের ব্যবস্থা, স্যানিটেশন, পানীয় জল, ক্যান্টিন, খাবার ঘর, বিশ্রাম ঘর, চিকিৎসা, দুর্ঘটনা বিষয়ক ব্যবস্থা, ছুটি, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয়ে এই কমিটি আলোচনা করে পরামর্শ দেয়। সাধারণত মালিকপক্ষ তা গ্রহণ করে।

(৩) পরিচালকপর্ষদে শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণ : এই ব্যবস্থার দ্বারা সর্বোচ্চ স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) শ্রমিকদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান ব্যবস্থা : ভারতে টাটা কোম্পানি, ডি. সি এম এবং বিদেশে বহু সংস্থার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাছ থেকে নানান বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করে। যাদের পরামর্শগুলি গৃহীত হয় তারা পুরস্কৃত হয়।

৪. ভারতে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ব্যবস্থা : ভারতে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের জন্য তিনটি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যথা, (১) ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইন দ্বারা গঠিত ওয়ার্কস কমিটি। তবে এই ব্যবস্থাটি এখন পর্যন্ত বিশেষ কার্যকর হয়ে ওঠেনি।

(২) ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব দ্বারা গঠিত যুক্ত ব্যবস্থাপনা পর্ষদ (joint management council)। কিন্তু এই ব্যবস্থাটিও বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি।

(৩) ১৯৭৫ সালে কারখানার মধ্যে প্রতি বিভাগে (shop floor level) একটি করে শপ কাউন্সিল (shop council) গঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে এটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ও সেবা সংস্থাগুলিতেও প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থাটি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে।

মন্তব্য : এ পর্যন্ত কোনো দেশেই এই পরিকল্পনা সফল হয়েছে বলা চলে না। ভারতেও টাটা লৌহ ইস্পাত কোম্পানির এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয়নি। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোথাও এটা এ পর্যন্ত সফল হয়নি বলে সমালোচকদের মত। ভারতের মত দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি নয়। তা ছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বৃত্ত মুনাফার হিসাব বের করা অত্যন্ত কঠিন। এরূপ অবস্থায় শ্রমিকদের মুনাফার যে অংশ দেওয়া হবে তাতে তারা সন্তুষ্ট হবে বলে মনে হয় না। এ সকল অসুবিধার জন্য এদেশে এ ব্যবস্থা প্রয়োগের সম্ভাবনা অল্প। খুব সম্ভব এই সব কারণেই সরকার এখনও পর্যন্ত কোনো শিল্পে এটা প্রবর্তন করেনি।

৩০.৯. জাতীয় শ্রম কমিশন
National Labour Commission

দেশে শিল্প সম্পর্কের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৬ সালে বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকরকে সভাপতি করে একটি জাতীয় শ্রম কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন ১৯৬৯ সালে রিপোর্ট পেশ করেছে। শ্রমিকদের সম্পর্কে এই রিপোর্টে ৩০০টি সুপারিশ করা হয়েছে এবং এই সুপারিশের অনেকগুলিই সরকার কার্যকর করেছে। এর প্রধান সুপারিশগুলি হচ্ছে :

১. কেন্দ্রে ও রাজ্যে স্থায়ী 'শিল্প সম্পর্ক কমিশন' স্থাপন করতে হবে। এই কমিশনের কাজ হবে, ক. শিল্প-বিরোধের বাধ্যতামূলক সালিসী করা ; খ. স্বেচ্ছামূলক আপসে সাহায্য করা ; এবং গ. কোন্ ইউনিয়ন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক তা নির্ধারণ করা। ২. রাজ্যে স্থায়ী (স্ট্যান্ডিং) শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে। এদের কাজ হবে শ্রমিকদের অধিকার, দায়-দায়িত্ব, আদালতের রায় বা কোন্ পক্ষের কোন্ দাবি ইত্যাদি সম্পর্কে বিচার করা। ৩. ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে মালিকের দেবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা বিবেচ্য নয়। কিন্তু প্রয়োজনভিত্তিক মজুরির বেলায় শিল্পের দেবার মতো ক্ষমতা আছে কি নেই তা দেখতে হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরির প্রবর্তন করা

ভারতে বর্তমানে সম্ভব নয়। তার পরিবর্তে বরং আঞ্চলিক ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তন করা যেতে পারে। ৪. শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যৌথ দরকষাকষিই বরং ভাল। যৌথ দরকষাকষি যাতে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শ্রমিক-সংঘগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ৫. অনেক ক্ষেত্রে ধর্মঘট ও লকআউট যুক্তিযুক্ত হলেও, তাদের উপরে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন। ৬. মজুরিহারের পরিবর্তন এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে একটা স্তরের পর মজুরিহারে শ্রমের উৎপাদন-শীলতা প্রতিফলিত হয়। এজন্য শ্রমিকদের সামনে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা (ইনসেন্টিভ স্কীম) রাখা দরকার। মহার্ঘভাতা বেতনের সাথে যুক্ত করা উচিত। ৭. মজুরি নির্ধারণে মজুরি পর্ষদের (ওয়েজ বোর্ড) গুরুত্ব কমিশন স্বীকার করেছে। মজুরি পর্ষদের সর্বসম্মত সুপারিশ বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হবে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। ৮. প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে শ্রমিকদের দেয় ৬% থেকে বাড়িয়ে ৮% করা উচিত। যেখানে ৮% আছে সেটা ১০% করতে হবে। ৯. সারা দেশের পক্ষে ও সকল শ্রমিকের পক্ষে প্রযোজ্য একটি মাত্র লেবার কোড প্রবর্তন করা সম্ভব নয়।

৩০.১০. পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা : শ্রমনীতি ও মজুরি নীতি
Five Year Plans : Labour and Wages Policies

১. **শ্রমনীতি :** পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে শিল্পগত দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের কল্যাণ বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে সরকারের শ্রমনীতি রচিত ও পরিচালিত হচ্ছে। **প্রথম পরিকল্পনায়** শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বাড়ে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রসারিত হয়, শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি এবং শ্রম সম্পর্কের সামগ্রিক উন্নতি ঘটে। এজন্য মোট ৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়। তবে এই ব্যবস্থাগুলি তখন সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের অগ্রগতিতে তাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। শিল্পে শান্তির জন্য আপসরফা ও সালিসীর উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এই সময়েও সরকারের কোনো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়নি, ফলে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি অনেকটা খাপছাড়া হয়। যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। মজুরির সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই সময়ে সরকার বারবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** দ্বিতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতি অনুসরণ করা হলেও শ্রমিকদের শিক্ষা এবং ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই সময়ে বাধ্যতামূলক সালিসীর পরিবর্তে স্বেচ্ছামূলক সালিসীর উপরও ক্রমশ গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। শ্রমিক-মালিক বিরোধে রাষ্ট্রের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ ও শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সর্বাধিক সহযোগিতা—এই ছিল তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনীতির সার কথা। **চতুর্থ পরিকল্পনায়** এই নীতিই আরও প্রবলভাবে অনুসৃত হতে থাকে। তৎসহ 'কোড অব ডিসিপ্লিন' ও 'কোড অব এফিসিয়েন্সি'-র উপর জোর দেওয়া হয়। **পঞ্চম পরিকল্পনায়** শ্রমনীতির মূল কথা হিসাবে ভবিষ্যৎ মজুরি বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সংযোগ স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পূর্বেকার পরিকল্পনাগুলিতে যে শ্রমনীতি অনুসৃত হয়েছে সে নীতিই **ষষ্ঠ** পরিকল্পনায় **ও সপ্তম পরিকল্পনায়** আরও নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে কার্যে পরিণত করার সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে।

২. **মজুরি নীতি :** সব দেশের অর্থনীতিতেই একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত মজুরি নীতি থাকা দরকার। কারণ, সুষ্ঠু মজুরি নীতি জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়ক। তা ছাড়া, জাতীয় আয়ের ন্যায্য অংশ শ্রমিকরাও পাবে—এটা সুনিশ্চিত হতে পারে সুষ্ঠু মজুরি নীতির মাধ্যমে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ভারত সরকারের মজুরি নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ আয়ের প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে মজুরিহার নির্ধারণ করা হবে।

স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কালে ভারত সরকার শ্রমিক-শ্রেণীর (আর্থিক দিক থেকে দুর্বল) কোনো কোনো অংশের ন্যূনতম মজুরিহার নির্ধারণ ও প্রবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, সরকার উপলব্ধি করে যে শ্রমিকশ্রেণীর এ সব অংশ অর্থনীতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ, তাই এদের সংরক্ষণের জন্য সরকারের দায়িত্ব নেওয়া দরকার। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে **ন্যূনতম মজুরি আইন** পাস করা হয়। যে শ্রমিকদের কঠোর শ্রমের কাজ করতে হয়, যাদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নেই অথবা থাকলেও তা তেমন জোরদার নয়, যে শ্রমিকেরা মজুরির ব্যাপারে মালিকের সাথে যৌথ দরকষাকষি করতে পারে না—এ ধরনের দুর্বল শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইন চালু হয়। সরকার অবশ্য বড় বড় শিল্পে মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যৌথ দরকষাকষি, বা আপস মীমাংসা অথবা সালিসী ও মধ্যস্থতার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি (fair wage) প্রদানের ব্যবস্থা করার একটি প্রস্তাব ছিল। ন্যায্য মজুরি বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ন্যূনতম মজুরি (minimum wage) এবং বাঁচার উপযুক্ত মজুরির (living wage) কথা এসে পড়ে। ন্যূনতম মজুরি শ্রমিক ও তার পরিবারের শুধু যে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করবে তাই নয়, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বজায় রাখতেও সাহায্য করবে। বাঁচার উপযুক্ত মজুরি বলতে সেই মজুরি বোঝায় যা শ্রমিক ও তার পরিবারের বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থা (যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) ত' করবেই, তার উপরেও কিছু পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ব্যবস্থাও করতে পারবে। ন্যায্য মজুরির (fair wage) ধারণা ন্যূনতম মজুরি ও বাঁচার উপযুক্ত মজুরির (living wage) ধারণার মাঝামাঝি বিরাজ করে। তবে এ ব্যাপারে সাধারণ সরকারী নীতি হল, সর্বস্তরে মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারটা শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে যুক্ত করে বিচার করা। পরিকল্পনা কমিশনও বলেছে, ন্যূনতম মজুরির অতিরিক্ত উপার্জন তখনই সমর্থনযোগ্য, যখন তা শ্রমিকের অতিরিক্ত উৎপাদনশীলতা দ্বারা সমর্থিত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে শ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদ মীমাংসার জন্য মজুরি পর্ষৎ (Wage Board) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছিল; কারণ, মজুরি পর্ষদই হল এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উপযোগী প্রতিষ্ঠান।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মজুরি পর্ষদের মাধ্যমেই শ্রম সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার নীতি গ্রহণ করা হয়। আরও প্রস্তাব করা হয়, কোনো শিল্পের মজুরি পর্ষদের সর্বসম্মত প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করতে হবে। মজুরিহার নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক (need-based) মজুরি ন্যূনতম মজুরি হিসাবে ধরতে হবে। এছাড়াও তাদের নিজ নিজ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের মনে প্রণোদনা সৃষ্টি করতে হবে। যাতে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণের দিক থেকে উচ্চতর মানের দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহী হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া, তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে 'বোনাস' সমস্যার সমাধানের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। সেই সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী-কালে শ্রমিকদের বোনাসের প্রশ্নটির মীমাংসা করা হয়।

৩০.১১. ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন
Trade Union Movement in India

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : ভারতের শিল্পায়নের মতই শ্রমিক জাগরণ ও শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাসও খুব বেশি দিনের নয়।

১. **প্রথম শ্রমিক জাগরণ :** উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে শিল্পায়ন প্রচেষ্টার প্রকৃত আরম্ভ হয় বলা যেতে পারে। ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে ও ১৮৫৪ সালে বঙ্গদেশে রেলপথ স্থাপিত হয়। এই সময় থেকেই ভারতের শিল্পশ্রমিক শ্রেণীও জন্মলাভ করে। ১৮৬২ সাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে নানা কারণে বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ফলে ধর্মঘট ঘটার সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সালে নাগপুরে এম্প্রেস মিলের শ্রমিক ধর্মঘটকে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট বলে গণ্য করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৮৬২ সালে কলিকাতায় হাওড়া স্টেশনের ১,২০০ রেলশ্রমিকদের দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটকেই ভারতের প্রথম আধুনিক ধর্মঘটের ঘটনা বলা যেতে পারে। শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৯০ সালে শ্রী এন. এম. লোখাণ্ডের সভাপতিত্বে বোম্বাই মিল শ্রমিক সমিতি গঠনের ফলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। এটাই ভারতে শ্রমিকদের প্রথম সংগঠন। এর পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হলেও, শ্রমিক ধর্মঘট হলেও এবং শ্রমিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করলেও, বস্তুতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে সারা ভারতব্যাপী শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন জন্মলাভ করেনি।

২. **ভারতব্যাপী সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের আরম্ভ :** বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ও পরে শ্রমিক আন্দোলনে নেতাদের অংশগ্রহণে, প্রথম মহাযুদ্ধকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত বিক্ষোভের ফলে ও শেষে রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা স্থাপনের ফলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে নব চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে মিসেস অ্যানি বেসান্তের সহকর্মী শ্রীওয়াদিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে মাদ্রাজে ভারতের প্রথম সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর এরূপ ট্রেড ইউনিয়ন অন্যত্র বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন পরিণতি লাভ করে। লালা লাজপৎ রায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ও দেওয়ান চমনলাল এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সহ-সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজ ও মিসেস অ্যানি বেসান্ত। ১,৪০,৮৫৪ জন শ্রমিকের ৬৪টি ট্রেড ইউনিয়ন এর সদস্য হয়। এর পর থেকে ভারতের সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও তাদের সদস্য-সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সাল ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের একই সঙ্গে বিস্তার এবং অনৈক্যের কাল। এই সময় শ্রমিকদের সারা ভারত সংগঠন বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৪০ সালে পুনরায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে সকল দল ও মতের ঐক্য স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ সালে সারা ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬৭ ও তাদের মোট সদস্যসংখ্যা হয় ৫ লক্ষের বেশি।

৪ যুদ্ধযুগে পুনরায় সারা ভারত শ্রমিক সংগঠন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ে অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধিও ঘটে। ১৯৪৫-৪৬ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৮৭ এবং তাদের মোট সদস্য-সংখ্যা হয় ৮,৬৪,০০০। ট্রেড ইউনিয়নগুলির তহবিলও এই সময় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির কারণ ছিল তিনটি: ক. মূল্যস্তর ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের মধ্যে মজুরি ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির আন্দোলন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বোনাস আন্দোলন দেখা যায়। খ. যুদ্ধের প্রয়োজনে কারখানাগুলিতে দীর্ঘতর সময় কাজের প্রয়োজন হলে শ্রমিকদের মধ্যে অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন ও ভাতার জন্য আন্দোলন দেখা দেয়। গ. ১৯৪২ সালে শ্রমিক, মালিক ও সরকারপক্ষ নিয়ে ত্রিপক্ষ শ্রম সম্মেলন স্থাপিত হলে, তাতে শ্রমিক আন্দোলন কার্যত সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে।

৫. যুদ্ধ-পরবর্তী যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমাগত প্রসার ঘটেছে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৮ লক্ষ। সাম্প্রতিকালের শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রথমটি হল, জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা প্রভাবিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এটি ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়টি হল, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। তৃতীয়টি হল, হিন্দ মজদুর সভা। এটি ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। চতুর্থটি হল, ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এটি ১৯৪৯ সালে স্থাপিত হয়। এখন এটি দুই অংশে বিভক্ত। পঞ্চমটি হল সেণ্টার অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯৭০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির কারণগুলি হল—ক. শ্রমিক সংগঠনগুলির পশ্চাতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ সমর্থন। খ. শ্রমিকদের মধ্যে নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি। গ. ১৯৪৭ সাল থেকেই শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ সম্পর্কে নানারূপ আইন প্রণয়ন। ঘ. ভারত সরকার কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের লক্ষ্য গ্রহণ। ঙ. শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ভাবধারার প্রসার। চ. মূল্যস্তর ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি। ছ. কর্মহীনতার সমস্যা বৃদ্ধি।

৩০.১২. ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য: শক্তি ও দুর্বলতা

Features of the Trade Union Movement in India : Strength & Weakness

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে এর শক্তি ও দুর্বলতা এই দুই দিকেরই বিশ্লেষণ করতে হয়।

১. **শক্তি:** ১৯২০ সাল থেকে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এই দীর্ঘকালের আন্দোলন যে কিছু শক্তি সঞ্চয় করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগে কেবল মাত্র ধর্মঘটের সময়েই ইউনিয়নগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যেত, ধর্মঘট শেষ হওয়ার সাথে সাথে এরাও বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু আধুনিক কালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। পূর্বেকার নিষ্প্রাণ ও অসংবদ্ধ অবস্থা কাটিয়ে এই আন্দোলন বহু শিল্পে সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে তুলেছে, শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে, ভারতের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আজকের ভারতের শ্রমিক আন্দোলন নানা শিল্পে শ্রমকল্যাণমূলক কাজেরও দায়িত্ব নিচ্ছে, আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পে প্রচলিত মজুরিহারের পরিবর্তন করে শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কারখানার কাজের শর্তেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এইগুলি শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিরই প্রমাণ। ধর্মঘট ইত্যাদি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য শক্তি অর্জন করেছে বলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকশ্রেণীর স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণকারী সম্মেলন ও আলাপ-আলোচনায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার অর্জন করেছে। পরিশেষে বলা যায়, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন (পরোক্ষভাবে হলেও) নিজ শক্তির বলে সরকার ও মালিকশ্রেণীকে বহু শ্রমিক-কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়নে বাধ্য করেছে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলন শৈশবাবস্থা পার হয়ে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জনের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

দুর্বলতা: উল্লিখিত সবলতা ও শক্তি সত্ত্বেও স্বীকার

করতে হয় যে, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন মূলত দুর্বল। এ দুর্বলতা ও ত্রুটি যে সকল কারণে দেখা দিয়েছে সে কারণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক. অভ্যন্তরীণ এবং খ. বাহ্য :

অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ : (১) শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা অল্প। খনি শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকদের ৫০%, উৎপাদন শিল্পের শ্রমিকদের ৪০%, রেলপথ শ্রমিকের ২৫% এবং বাগিচা শিল্পের শ্রমিকের ২০% ইউনিয়নের সদস্য। অর্থাৎ, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এক বিরাট অংশ এখনও কোনো সংগঠিত ইউনিয়নের সদস্য নয়। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীনতা ও প্রয়োজনীয় অবসরের অভাব এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। (২) ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই আয়তনে ক্ষুদ্র, তাদের আর্থিক সম্বলও সামান্য। একই শিল্পে বহু ইউনিয়ন গড়ে ওঠে বলে এককভাবে প্রত্যেকেই ক্ষুদ্রাকার হয়। ঋণগ্রস্ততা ও নিম্ন মজুরিহারের জন্য ইউনিয়নের চাঁদা শ্রমিকেরা নিয়মিত দিতে পারে না। (৩) ভারতের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রধান কাজ দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা। শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজে এদের অংশগ্রহণ খুবই সীমাবদ্ধ। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করতে ইউনিয়নগুলি সক্ষম হয় না। (৪) এদের নেতৃত্বের অধিকাংশ বহিরাগত। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে এ পর্যন্ত শ্রমিকদের পরিবর্তে শ্রমিক দরদী বুদ্ধিজীবীরাই নেতৃত্ব দিয়েছে। এই সকল নেতার মানবতাবোধ, উদারতা ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রমিক জীবনের মূল সমস্যা, শ্রমিকদের চিন্তাধারা ও শিল্পসংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে এদের যথাযথ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। (৫) রাজনৈতিক প্রভাব। ভারতের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরই নিজ প্রভাবের অধীন শ্রমিক সংঘ আছে বলা যায়। এতে শ্রমিক আন্দোলনে রাজনীতিক বিভেদ প্রবেশ করে শ্রমিকদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে।

এই সকল ত্রুটির পশ্চাতে আরও কতকগুলি মৌলিক কারণ বর্তমান। ভারতের শ্রমিকদের নিরক্ষরতা, তাদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, বর্ণগত পার্থক্য তাদের শ্রেণীগত ঐক্যকে দুর্বল করেছে। শুধু তাই নয়, এর উপরে শ্রমিকদের এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যোগ দেবার ঝোঁক, ধারাবাহিকভাবে কাজ না করার অভ্যাস, গ্রাম-জীবনের সঙ্গে অধিকাংশ শ্রমিকের সম্পর্ক বজায় থাকায় প্রায়শই শহরাঞ্চলের কর্মক্ষেত্র থেকে গ্রামাঞ্চলে গমন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থিতি, কর্মচ্যুত হলে গ্রাম-জীবনকে শেষ আশ্রয় হিসাবে গণ্য করার প্রবণতা ইত্যাদি কারণের ফলে এখন পর্যন্ত ভারতের শ্রমিকেরা একটা স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারছে না। তদুপরি, যুগ যুগ ধরে নির্দয় শোষণে ও অত্যাচারে অধিকাংশ শ্রমিকেরই দাসসুলভ ও ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতার মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং আত্মশক্তির উপর আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ ত্রুটি ও দুর্বলতার কারণগুলি শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। এ দিক থেকে বলা হয় যে, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার কারণসমূহ প্রধানত অভ্যন্তরীণ এবং শ্রমিকশ্রেণীই ঐ দুর্বলতার উৎস। এ প্রকার মন্তব্য সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশেই সত্য। পূর্ণ সত্য খুঁজতে হলে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার বাহ্য কারণগুলির উল্লেখ করতে হয়।

বাহ্য কারণসমূহ : (১) মালিকশ্রেণীর বিরোধিতা : ভারতে মালিকশ্রেণীর অধিকাংশ কখনই শ্রমিক আন্দোলনকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। যখনই কোনো শিল্পে ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে মালিকপক্ষ সেই ইউনিয়নকে বলপ্রয়োগে ধ্বংস করার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন-কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন ও ছাঁটাই ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করেছে ; এতে ব্যর্থ হলে নিজেরা দালাল ও অনুগত লোক নিয়োগ করে পাল্টা ইউনিয়ন গঠন করেছে। (২) সরকারী বিরোধিতা : প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সরকার অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে বলে শ্রমিকপক্ষের অভিযোগ। এ বিষয়ে মালিকশ্রেণী সরকারের নিকট থেকে আনুকূল্য পেয়েছে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী বহুক্ষেত্রেই উপযুক্ত সংরক্ষণ পায়নি। (৩) লেবার কনট্রাক্টর, সর্দার ইত্যাদি শ্রেণীর বিরোধিতা : এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়েছে এবং সুস্থ শ্রমিক আন্দোলন গঠনে বাধা দিয়েছে।

ভারতের সুস্থ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় : ভারতের শিল্পায়নে শ্রমিকশ্রেণীর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা সার্থকভাবে পালনের জন্য ঐক্যবদ্ধ, অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং ব্যাপক ও শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। এরূপ শ্রমিক আন্দোলনেই আগামীদিনের উন্নতিকামী ভারতের দৃঢ় ভিত্তি। এজন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করে উপরে বর্ণিত ত্রুটি-গুলি দূর করা আবশ্যক : (১) দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকদের একটি মাত্র ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করতে হবে। (২) কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিককর্মীকে তার সভ্য হতে হবে। (৩) সভ্যরা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের আর্থিক সম্বল বৃদ্ধি করবে। (৪) প্রত্যেক শিল্পে একটি মাত্র ইউনিয়ন গঠন করতে হবে। শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের

স্থানীয় ইউনিয়নগুলি তার সদস্য হবে। (৫) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কাজ পরিচালনা করতে হবে। তাতে রাজনৈতিক দলাদলি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। (৬) শ্রমিকদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। (৭) ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (৮) আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্যধারা ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে প্রবর্তন করতে হবে। (৯) শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। (১০) মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই মর্মে ১৯৪৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সংশোধন করা হলেও তা অদ্যাবধি কাজে পরিণত হয়নি।

৩০.১৩. শ্রমিকদের অধিকার ও দায়িত্ব : একটি মূল্যায়ন
Rights and Duties of Workers : An Assesment

১. এমন একটি কথা প্রায়ই বলা হয়, ভারতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির একমাত্র কাজ না হলেও অন্তত প্রধান কাজ হল শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকা এবং নেতৃত্ব দেওয়া। অভিযোগের সুরে আরও বলা হয়, ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয় এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে বিশেষ কোনো আগ্রহ ট্রেড ইউনিয়নগুলি দেখায় না। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অতীত কার্যধারা অনুসরণ করলে এমন প্রশ্নও মনে জাগে—ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব নিজেই কি শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন? নেতৃত্বের নিজেরই কি এ বিষয়ে যথাযথ উপলব্ধি আছে? এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুতর। এ কারণে এটি সবিস্তার আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

২. প্রথমেই বলতে হয়, এমন ধারণাটি যে সাধারণভাবে সত্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথা ঠিক যে ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনভাবে, সুপরিকল্পিতভাবে ও ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যসূচি গ্রহণ করেনি। শুধু যে কোনো কার্যসূচি গ্রহণ করেনি তাই নয়। এ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নগুলির করণীয় কিছু আছে কিনা ট্রেড ইউনিয়নগুলির পত্রপত্রিকায়, প্রচারপত্রে, সভা সমাবেশ, দেওয়াল লিখনে—কোথাও কখনো শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

৩. সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এমনটি হবার কারণ কি? এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউনিয়নগুলির নীরবতা ও উদাসীনতা কি কোনো তাৎপর্যহীন গতানুগতিক ব্যাপার! শ্রমিকদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষিত করার কাজ থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে বিরত থেকেছে, এ ব্যাপারে সামান্য আগ্রহও দেখায়নি সেটা কি সুচিন্তিত কোনো পরিকল্পনা অনুসারে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের একটু গভীরে প্রবেশ করা দরকার। আর দরকার এ দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক অবস্থায় সঠিক উপলব্ধির।

৪. আজ থেকে ১০০—১২৫ বৎসর আগে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে। সৃষ্টি হতে থাকে কল ও কারখানার তথা নানা ধরনের শিল্পের। শিল্পায়নের সাথে শ্রমিকশ্রেণীরও উদ্ভব ঘটতে থাকে। ক্রমে ক্রমে এই শ্রমিকশ্রেণী আকারে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার জন্মলগ্ন থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল (এখনো আছে) অবর্ণনীয়, দুর্বিষহ। তার কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

শিল্পায়িত ধনতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বিরাজ করে ভারতের শিল্পক্ষেত্রেও শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সেই সম্পর্কের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি, হবার কথাও নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ শোষণ ও বঞ্চনাভিত্তিক সমাজ। তাই মানুষের প্রতি মানুষের যে আচরণ স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় সে আচরণ, মানুষের কাছ থেকে মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা, এবং সর্বোপরি, শ্রমিক তথা মানুষ হিসাবে ন্যূনতম অধিকার—এগুলি ধনতান্ত্রিক ভারতের শ্রমিকেরা তাদের নিয়োগকর্তা, তথা শিল্পমালিকদের কাছ থেকে পায়নি। যা পেয়েছে তা ক্রীতদাসের প্রতি দাস-মালিকদের চিরাচরিত ব্যবহারের চাইতে উন্নত কিছু নয়।

৫. এ কথা স্বীকার করতেই হবে, ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও শিল্পায়নের ফলে কলে ও কারখানায় বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু মজুরি হারের শোচনীয় অপ্রতুলতার জন্য শ্রমিকের জীবনে চিরসাথী হয়ে থেকেছে আর্থিক দৈন্যদশা, দুঃস্থতা, অর্ধাশন, কখনো বা অনশন। শ্রমিকদের মজুরির সামান্য বৃদ্ধির দাবিও ভারতের মালিকশ্রেণী কখনো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি। একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী, তীব্র আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কোনো কোনো শিল্পে মজুরিহারের কিছুটা উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

৬ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এ আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছে প্রধানত শ্রমিকদের স্থূল ও সাধারণভাবে বাঁচার দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে মনুষ্যেতর জীবন থেকে

মনুষ্য-জীবনে প্রবেশের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে এবং কখনো কখনো মানুষ হিসাবে প্রত্যাশিত সামান্য কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তাই এটা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের অর্থনীতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামেই নিরন্তর ব্যাপৃত থেকেছে এবং তাদের সমস্ত মনোযোগ ঐ একটি বিষয়ের উপরেই কেন্দ্রীভূত করেছে। অথচ এ অর্থনীতিক দাবিগুলি এমনই সাধারণ স্তরের যে এগুলি পূরণ করা হলেও শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনীতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। তা সত্ত্বেও মালিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে শ্রমিকদের এটুকু দাবি আদায় বিনা আন্দোলনে হয়নি। মনে রাখা দরকার, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাহায্যে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিগত কয়েক দশকে মজুরি ও মহার্ঘভাতার বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে বটে তবে তাতে শুধু আর্থিক মজুরিই (মহার্ঘভাতাসহ) বেড়েছে, প্রকৃত মজুরি বাড়েনি, বরং কমেছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের সমস্ত আন্দোলন ও সংগ্রাম সত্ত্বেও বিগত কয়েক দশকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থান কোনো উন্নতি তো ঘটাতে পারেইনি বরং শ্রমিকদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থান ক্রমাবনতির সাক্ষী হয়েই রয়েছে। এটা হল ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনীতিক অবস্থার বাস্তব চিত্র।

৭. শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলতে হলে তার অধিকারের কথাও বলতে হয়। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শুধুমাত্র অধিকার, তার সাথে কোনো কর্তব্য নেই এটা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি শুধুই কর্তব্য করে যেতে হবে অথচ কোনো অধিকার থাকবে না এমন একটা অবস্থা অকল্পনীয়। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর ন্যূনতম অর্থনীতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন। শ্রমিকশ্রেণী যেখানে সাধারণভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত সেখানে ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের শ্রমিক সদস্যদের দায়িত্ব বা কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার বা তাদের কর্তব্য সম্পাদনে আহ্বান জানানোর কোনো কার্যসূচি প্রণয়ন ও সেটিকে বাস্তবায়িত করার বিষয়ে সঙ্গত কারণেই আগ্রহী হতে পারেনি; যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মরত, সে প্রতিষ্ঠানের সাথে শ্রমিকের যদি আত্মিক যোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ভালোমন্দের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও শ্রমিক বস্তুতপক্ষে কোনো অধিকারই ভোগ করতে পায় না, দেশের সামাজিক-অর্থনীতিক অবস্থা এমনই যে, শ্রমিক মানুষের মতো বাঁচার সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকেও বঞ্চিত থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে শ্রমিকের একাত্ম হবার পথে প্রধান বাধা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা—যে ব্যবস্থায় শিল্পোদ্যোগ ও শিল্পোৎপাদনের পিছনে—এককথায় সমস্ত অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের পিছনে—একমাত্র মুনাফা অর্জনের প্রণোদনাই থাকে, সমাজকল্যাণের বিষয়টি সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি। শোষণ ও বঞ্চনাই এ উৎপাদন সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত থাকে নিরন্তর দ্বন্দ্বের বীজ। শ্রমিকের ইচ্ছা থাকলেও এ উৎপাদন সম্পর্কের ফলেই শ্রমিক তার প্রতিষ্ঠানকে আপন বলে মনে করতে পারে না। তাই প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকের মনে আকর্ষণ ও কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের উপর তার মমত্ববোধ জন্মায় না। শ্রমিক ও তার জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রভূমির—অর্থাৎ তার শিল্প প্রতিষ্ঠানের—মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতির দিক থেকে বিচ্ছেদ ঘটে—সে অনুভব করে সে বিচ্ছিন্ন (alienated)। শিল্প প্রতিষ্ঠান তার নিজের, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হলে তার অবস্থারও উন্নতি হবে—এ বোধ তার জন্মায় না। যদিও শিল্প প্রতিষ্ঠানে তার দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত হয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের উপর তার নিজের অস্তিত্ব নির্ভর করে, উৎপাদন ব্যবস্থার সে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবুও শ্রমিক প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের জন্যই নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে।

৮ নিজের শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র সমাজ সম্পর্কে ও তার দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। যে সমাজ তাকে জীবনধারণের উপযোগী মজুরি দিতে পারে না, মানুষের মত বাঁচার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না—সেই সমাজকে সে নিজের বলে ভাবতে পারে না। সেই সমাজে থেকেও সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। তাই সমাজের প্রতি তার যে কোনো কর্তব্য আছে সে উপলব্ধিও তার জন্মায় না।

৯. এ ধরনের মানসিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিবেশের জন্য—শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য—সব অধিকার থেকে বঞ্চিত শ্রমিকের মনে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হতে চায় না। কারণ তার মনে নিরন্তর যে প্রশ্ন জাগে তা হল—কার প্রতি কর্তব্য, কিসের জন্য কর্তব্য! এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ কারণেই শ্রমিকশ্রেণীকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানাতে অসুবিধা বোধ করে। এ ধরনের আহ্বান যে অবাস্তব ও অকার্যকর হবে সে বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বোধহয় নিঃসন্দেহ।

১০. তবে একথা মানতে হবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের ফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতের সুসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন বিগত ৬০।৭০ বৎসরে অনেক সংগ্রামে জয়ী হয়েছে। মজুরিহারের উন্নতি, শ্রমিকের অনুকূলে কাজের শর্তের পরিবর্তন, উচ্চতর হারে মহার্ঘভাতা ও বোনাস আদায়, ছাটাই, লে-অফ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা, কারখানার আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি, চাকুরির নিরাপত্তা বিধান, অবসরকালীন ভাতা, দুর্ঘটনা ও অন্যান্য কারণে অকর্মণ্যতাজনিত ক্ষতিপূরণ—শ্রমিক স্বার্থের সাথে জড়িত এ ধরনের অনেক দাবি পূরণে ও অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিয়েছে। বস্তুতই, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সর্বাপেক্ষা বড় অবদান হল ভারতের শ্রমিকদের সাধারণভাবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। যে মর্যাদা শ্রমিকেরা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জন করেছে তা হয়ত প্রত্যাশা অনুযায়ী যথেষ্ট নয় এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সব অংশই নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অর্থনৈতিক দাবি আদায় করতে সফল হয়নি, তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ৬।৭ দশক আগে—এমন কি ২।৩ দশক আগেও—শ্রমিকদের যে দৃষ্টিতে দেখা হত সে দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে শ্রমিক-শ্রেণী তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়; যে সব অধিকারের কথা শ্রমিকশ্রেণী অতীতে কল্পনা করতেও পারত না সে সব অধিকারের অনেকগুলিই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করেছে।

১১. ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ও সংগ্রামের ফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরিবর্তন বর্তমানেও ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসূচক পরিবর্তনের গতি অব্যাহত থাকবে—এটা আশা করা যায়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের একাংশের দৃষ্টিভঙ্গীতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নেতৃত্বের এ অংশ শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান অবস্থা—শ্রমিকদের দারিদ্র্য, নানা ধরনের অভাব, অনটন—সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত অধিকার, প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, লব্ধ মর্যাদাবোধ সম্পর্কে নেতৃত্বের এ অংশ শ্রমিকশ্রেণীকে অবহিত হতে আহ্বান জানাচ্ছেন। যতটুকু অধিকার শ্রমিকশ্রেণী অর্জন করেছে তারই ভিত্তিতে শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক করতে চাইছেন নেতৃত্বের এ অংশ। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে এমন কথা বোধ হয় বলা চলে যে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার অর্জন ও ভোগের সাথে সাথে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কেও সজাগ ও আগ্রহী হবার সময় এসেছে।

১২. ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলির তথা শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোচনায় আর একটি বিষয়ের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী যেমন এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান, তেমনি অবিচ্ছেদ্য আর এক উপাদান শিল্পপতি তথা মালিকশ্রেণী। শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি, শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতাগোষ্ঠীর প্রতি, সমাজের বিভিন্ন ভোগীগোষ্ঠীর প্রতি, সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি শ্রমিকদের তথা ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে এ কথা যদি স্বীকার করতে হয়, তবে এ কথাও না মেনে উপায় নেই যে শিল্পপতি গোষ্ঠীর তথা মালিকশ্রেণীরও সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকশ্রেণীর ও মালিকশ্রেণীর পারস্পরিক অবস্থান বিচার করলে এমন একটি সিদ্ধান্তে আসা অসঙ্গত নয় যে শ্রমিকশ্রেণী অপেক্ষা মালিকশ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কম তো নয়ই, বরং বেশি। কিন্তু ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিগত এক শতাব্দীকাল ধরে মালিকশ্রেণী স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে তার ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেছে এমন কথা বলা যায় না। রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, ভোগী ও শ্রমিকশ্রেণী—কারো প্রতি মালিকশ্রেণী নিষ্ঠা ও সততা সহকারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আগ্রহী তো হয়ইনি, বরং পরাঙ্মুখই হয়ে রয়েছে। শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে, বাজারে পণ্যের নিয়মিত যোগান সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে, ক্রেতা ও ভোগীস্বার্থ-সুরক্ষার বিষয়ে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে সমাজের স্বার্থের কথা সব সময় মনে রেখে অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সততা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে শিল্প-পরিচালনা করার ব্যাপারে,—এ সবের কোনোটিতেই ভারতের মালিকশ্রেণী যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের পরিচয় দেয়নি। যদিচ, মালিক শ্রেণীর সুবিধাজনক সামাজিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে এ ধরনের প্রত্যাশা করা অতি সঙ্গত যে, মালিকশ্রেণী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবে।

১৩. ট্রেড ইউনিয়নগুলির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করার সময় ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মালিকশ্রেণী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু পালন করেছে এবং করছে সে বিষয়টিও অনুধাবন করা

দরকার। সব অধিকার ও সুযোগ ভোগ করা সত্ত্বেও সমাজের এক অংশ যদি তার কাছ থেকে সঙ্গতভাবে প্রত্যাশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তবে অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত অপর অংশকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আহ্বান করা কতটা সঙ্গত, বাস্তবানুগ ও ফলপ্রসূ সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৩০.১৩. উন্নয়নশীল অর্থনীতি ও ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন The Developing Economy and India's Trade Unions

১. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা বিগত তিন দশকেরও বেশি কাল ধরে চলেছে। স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করতে হলে সে দেশের অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই (যেমন, শিল্প, কৃষি, পরিবহণ ও সংসরণ প্রভৃতি) উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হয়। কারণ, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বল্পোৎপাদনশীলতাই স্বল্পোন্নত দেশগুলির স্বল্পোন্নতির মূল কারণ। তাই উন্নয়নশীল দেশের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ হল উন্নয়নের গতি দ্রুততর করা এবং এটা করার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পথে যে সব বাধা বিঘ্ন রয়েছে সেগুলিকে দূর করা।

২. স্বল্পোন্নত ভারতের অর্থনীতিও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। তাই ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছে ও করছে শিল্প, পরিবহণ, সংসরণ, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর। ব্যাপক শিল্পায়নের ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য ভারতের পরিকল্পনাগুলির কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে শ্রমিকশ্রেণীর যে এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রমিকশ্রেণীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সক্রিয় ও উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণ ছাড়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো কার্যক্রমই সফল হতে পারে না। শিল্পোৎপাদনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি, অবস্থা বিশেষে আর্থিক, দৈহিক ও মানসিক ত্যাগ ও কষ্ট অপরিহার্য বিবেচিত হলে তা স্বীকার করে নেবার উপযোগী মনোভাব শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্টি করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়মানুবর্তিতার নীতিগুলি কঠোরভাবে পালনের জন্য শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করা—এই সব কাজে শিল্প শ্রমিকদের যথাযথ পরামর্শ ও নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

৪. এখন প্রশ্ন হল, উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে অপরিহার্য এ কাজ সম্পাদনের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি কি সে ভূমিকা পালনের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যানধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে?

৫. ভারতের শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে সম্পর্ক বিগত ৬।৭ দশক ধরে বিদ্যমান, শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিককে যে ভাবে ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, যে কোনো অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে যেখানে কঠোর ও নির্মম সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও যেখানে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি হয় না শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে শ্রমিকের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি না হয়ে যেখানে তার অবনতি ঘটে, শ্রমিকের কর্মজীবন যেখানে নিরন্তর সমস্যায় পীড়িত, যেখানে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তাও বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের আয়ত্তাধীন নয়—সর্বোপরি, যেখানে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদাও শ্রমিকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি—সেখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি উন্নয়নশীল অর্থনীতির অবশ্য পূরণীয় শর্ত পালনে (অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছাতে) শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে এমন প্রত্যাশা করা ভারতের ক্ষেত্রে অন্তত অবাস্তব বলেই পরিগণিত হবে।

৩০.১৪ ট্রেড ইউনিয়ন আইন Trade Union Act

১. অন্যান্য দেশের মতই ভারতেও যে সকল মানবদরদী ও জনকল্যাণব্রতী ব্যক্তি প্রথম শ্রমিক সংগঠন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, রাজরোষ ও মালিকপক্ষের নির্যাতনের মধ্য দিয়েই তাঁরা পুরস্কৃত হন। এমন কি আদালতের রায়ে শ্রমিক সংঘগুলিকে বে-আইনী ও ষড়যন্ত্রকারী সংগঠন বলে ঘোষণা করা হয় (১৯২১ সালের মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় দ্রষ্টব্য)। স্বভাবতই ট্রেড ইউনিয়ন ও তার নেতৃবর্গকে এইরূপ দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধের দায় থেকে মুক্তিদানের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগে ইউনিয়ন গঠনের আইনস্বীকৃত অধিকার ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল। ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস করে শ্রমিকদের এই অধিকার দেওয়া হয়। এই আইনে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা হয় এবং কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে ইউনিয়নের সাধারণ তহবিল থেকে ব্যয় করা যাবে তা নির্দিষ্ট করা হয়। রাজনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা ইউনিয়নগুলির হিসাব পরীক্ষা করিয়ে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির রেজিস্ট্রারের নিকট তা পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইউনিয়নের আইনসঙ্গত কার্যকলাপের জন্য ইউনিয়ন

নেতাদের ফৌজদারী অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

২. কিন্তু এই আইনে মালিকপক্ষ কর্তৃক ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতির ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘকাল ধরে এজন্য শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন চলে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধিত হয়। এর দ্বারা শ্রম আদালতের নির্দেশে মালিকপক্ষ কর্তৃক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দান বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু, অদ্যাবধি এই সংশোধিত আইনটি ভারত সরকার কার্যকর করেনি। এ কারণে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ রয়ে গেছে। ১৯৬০ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনের আর একটি সংশোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলির রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত কতকগুলি অসুবিধা দূর করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. সম্প্রতিকালে শিল্প শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? ভারতে প্রবর্তিত কর্মচারী রাজ্যবীমার বিশেষ উল্লেখসহ তোমার উত্তর দাও। এইগুলি কি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট?

[What measures have in recent times been adopted to provide social security to the industrial workers? Give your answer with special reference to Employees' State Insurance Scheme as introduced in India.]

C.U. B.A. (III) 1982]

২. ভারতের বর্তমান শিল্পবিরোধ মীমাংসার যে পদ্ধতি রয়েছে তা বিচার কর।

[Examine the present method that is adopted in India to settle industrial disputes.]

৩. ভারতে শিল্পবিরোধ মীমাংসার জন্য যে আইনগত পদ্ধতি রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। দেশে শিল্পবিরোধ মীমাংসার জন্য বাধ্যতামূলক সালিসী কতদূর কার্যকর বলে তুমি মনে কর?

[Explain the legal method for settling industrial disputes in India. How far is compulsory arbitration, in your opinion, effective in settling industrial disputes in the country?]

[C.U. B.Com. (Hons.) 1983]

৪. ভারতের সাম্প্রতিককালের শিল্পবিরোধগুলির কারণ কি?

[What are the causes of industrial disputes that have occurred in India in recent times?]

৫. ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দাও।

[Give an account of the present state of the trade union movement in India.]

[C.U. B A. (III) 1983]

৬. ভারতে সুস্থ ও সবল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্তরায়গুলির উপর মন্তব্য কর।

[Discuss the strength and weakness of the trade union movement in India.]

[C U. B.A. (III) 1985]

৭. ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। এর প্রধান ত্রুটিগুলি কি?

[Indicate the main features of the trade union movement in India. What are its main drawbacks?] [C.U. B.Com. (Hons.) 1985]

৮ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি যাতে আরও ভালভাবে কাজ করতে পারে তার পন্থা নির্দেশ কর।

[Suggest the lines of action to be adopted by the Indian trade unions so that they can work in a better way.]

৯. বিকাশশীল অর্থনীতির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়নি—এই বক্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

[Comment on the view that the role of trade unions in India has not been fully oriented towards the requirement of a developing economy.]

১০. ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের অধিকার সম্পর্কে যতটা মাথা ঘামায় তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ততটা মাথা ঘামায় না—এ ধরনের মন্তব্যের সঙ্গে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

[Do you agree with the statement that trade unions in India are more concerned with their rights rather than responsibilities? Give reasons for your answer.]

[C.U. B.Com. (Hons.) 1984]

১১. স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে শিল্পশ্রমিকদের মজুরি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলি বর্ণনা কর।

[Describe the various measures that the government of India has adopted to regulate the wages of the industrial workers in the post-independence days.]

১২. শিল্প শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে? ঐ সব সুপারিশ কাজে কতটা পরিণত করা হয়েছে?

[What measures to ensure the welfare of the industrial workers have been recommended in the 'Five year Plans' of India? How far have these recommendations been implemented?]

১৩. ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে শ্রমকল্যাণের কর্মসূচির বিবরণ দাও।

[Give an account of the programme relating to labour welfare as adopted in India's Five-year Plans.]

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কাকে বলে? ভারতের শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির সংক্ষিপ্তসার দাও। এ ব্যবস্থাগুলি শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কতটুকু বাড়াতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

[What is meant by social security? Give a short account of the social security measures introduced for industrial labour in India.]

১৫. ভারতীয় শিল্প শ্রমিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশ নেওয়ার ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মন্তব্য লেখ।

[Comment on the role that workers' participation in management can play in improving industrial relations in India.]

১৬. ভারতের শিল্পে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক যাতে সন্তোষজনক থাকে সেই বিষয়ে ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার রূপরেখা দাও।

[Give an outline of the different measures adopted by the Government of India to maintain satisfactory relations between employers and workers in Indian industries.]

[C U. B.A. (III) 1982]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতের কোন্ রাজ্যে সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি?

[Which of the Indian states has the highest number of workers employed in its organised industry?]

২. 'বাধ্যতামূলক সালিসী' ও 'স্বেচ্ছামূলক সালিসী' বলতে কি বোঝ?

[What do 'compulsory arbitration' and 'voluntary arbitration' mean?]

৩. 'যৌথ দরকষাকষি' বলতে কি বোঝায়?

[What is meant by 'collective bargaining'?]

৩১

রাষ্ট্র ও শিল্প
State And Industry

৩১.১. মিশ্র অর্থনীতি
Mixed Economy

উৎপাদন, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অবস্থানকেই মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। এতে একদিকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগের কার্যকলাপ ও বিকাশ রাষ্ট্র বা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট হয়; অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী উদ্যোগ-এর পাশাপাশি অবস্থান করে ও বিকশিত হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র দুইটি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরকরূপে কাজ করে। ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে এরূপ একটি মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রকৃতি বিচারে একে নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র বলে গণ্য করা যায়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এ হল একটি সংশোধিত রূপ।

ভারতে বেসরকারী শিল্প সম্পর্কে অতীতে সরকারী নীতি কি ছিল এবং বর্তমান মিশ্র অর্থনীতির নীতিটি কিভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও এর বিকাশে সাহায্য করছে আর এর পাশাপাশি পরিপূরকরূপে কিভাবে সরকারী ক্ষেত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের নীতি নির্ধারিত ও পরিচালিত হচ্ছে সেটাই হল বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্র ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র
STATE & THE PRIVATE SECTOR

৩১.২. প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সরকারী শিল্পনীতি
Industrial Policy in the Pre-Independence Era

শুল্কনীতি : এদেশে ব্রিটিশ শাসনের যুগে শিল্প সম্পর্কে সরকারের নীতি কেবল একটি মাত্র নীতির দ্বারা পরিচালিত হত। তা হল শুল্কনীতি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ভারত থেকে নানান ধরনের কার্পাস বস্ত্র ইংলণ্ডে অবাধে ও বিনা শুল্কে রপ্তানি করা ছিল কোম্পানি-সরকারের নীতি। কারণ ইংলণ্ড তখনও আধুনিক শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানি করতে শুরু করেনি। ১৮৫৭ সালে এদেশে সরাসরি ইংলণ্ডের রাজকীয় শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইংলণ্ডে তখন আধুনিক শিল্পগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন

ভারত থেকে রপ্তানি করা কুটির শিল্পে তৈরী কার্পাস বস্ত্রের উপরে ইংলণ্ডে চড়া আমদানি শুল্ক বসানো হয় এবং দেশীয় কুটির শিল্প ধ্বংসের জন্য বিনা শুল্কে অবাধে এদেশে ইংলণ্ডের মিলজাত সস্তা কাপড় আমদানি শুরু হয়। আর এদেশ থেকে ইংলণ্ডে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় কৃষি ও খনিজ কাঁচামাল অবাধে রপ্তানি শুরু হয়। এইভাবে ১৮৫৭ সাল থেকে ইংরেজ শাসকরা ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারত সরকারের শিল্পসংক্রান্ত নীতির মূলকথা ছিল ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ ও ব্রিটিশ পুঁজি পরিচালিত রপ্তানি নির্ভর শিল্প ছাড়া অন্য যে কোনো দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টার বিরোধিতা। এই নীতি ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রকার সরকারী নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল ভারতের শিল্পায়নের পথে বাধা সৃষ্টি। এরই প্রতিবাদে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি : ব্রিটিশ-ভারত সরকারের দেশীয় শিল্পের প্রতি দীর্ঘকালের প্রকাশ্য বিরোধিতার নীতি পরিত্যক্ত হয় ১৯২৩ সালে। এ সময়ে ভারত সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে।

ভারতে ব্রিটিশ দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য বিদেশী পণ্য ও পুঁজির আমদানি হতে থাকে। এতে ভারতে একচেটিয়া ব্রিটিশ বাজার ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। ভারতের উদীয়মান দেশীয় শিল্পপতিদের শিল্প সম্পর্কে অনুকূল সরকারী নীতি গ্রহণের ক্রমবর্ধমান দাবি ও তার পশ্চাতে জাতীয় নেতৃবর্গের সমর্থন এবং প্রথম মহাযুদ্ধকালে নিযুক্ত ভারতের রাজকীয় শিল্প কমিশন (১৯১৬ সাল) কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকারী আনুকূল্য দানের সুপারিশও এ দেশে শিল্পায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে।

এ সকল কারণে ভারত সরকার অবশেষে ১৯২১ সালে একটি ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করে। এটাই ভারতের প্রথম ফিসক্যাল কমিশন। স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ছিলেন এর সভাপতি।

৩১.৩. প্রথম ফিসক্যাল কমিশন : ১৯২১-২৩ First Fiscal Commission : 1921-23

১. সংশ্লিষ্ট সকল দিক থেকে ভারত সরকারের শুল্ক-নীতি পরীক্ষা করার এবং এ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য ১৯২১ সালে এগারোজন সদস্য নিয়ে প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয়। শিল্পসংরক্ষণের জন্য শুল্কনীতি প্রয়োগ সম্পর্কে কমিশন দেশবাসীর উপর থেকে ভার লাঘবের যুক্তিতে, বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই নীতির প্রয়োগে সংরক্ষণের আবেদনকারী শিল্পগুলির মধ্যে যোগ্যতা বিচারের জন্য তিনটি মূলনীতি প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। যথা :

(১) আবেদনকারী শিল্পটির কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা, যথা কাঁচামাল, সুলভ শ্রমিক এবং শক্তির পর্যাপ্ত সরবরাহ ও অভ্যন্তরীণ বাজার থাকা চাই।

(২) শিল্পটি এরূপ হবে যে সংরক্ষণ ছাড়া তা কোনো মতেই উন্নতি করতে পারবে না অথবা দেশের স্বার্থে এর যত দ্রুত উন্নতি বাঞ্ছনীয় ততটা সম্ভব হবে না।

(৩) শিল্পটি এরূপ হবে যেন অবশেষে সংরক্ষণ ছাড়াই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড়াতে পারে।

উপরোক্ত সুপারিশ ছাড়াও কমিশন আরও কয়েকটি পরামর্শ দেয়। যেমন, প্রয়োজন হলে দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা দান করা যেতে পারে এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিনাশুল্কে আমদানি করা যেতে পারে। তা ছাড়া সংরক্ষণনীতি প্রয়োগের জন্য কমিশন একটি স্থায়ী শুল্ক পর্ষৎ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে।

ভারত সরকার ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি ও তার প্রয়োগের জন্য তিনটি মূল শর্ত গ্রহণ করে, কিন্তু ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশকৃত একটি স্থায়ী শুল্ক পর্ষৎ (Tariff Board) স্থাপনের প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করেনি। তার পরিবর্তে সাময়িক শুল্ক পর্ষৎ (ad hoc Tariff Board) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং শিল্পপতিরা যাতে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করতে নিরুৎসাহিত হয় সে উদ্দেশ্যে আবেদন বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক জটিল ও বিলম্বজনক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রথম বিচারমূলক সংরক্ষনীতি ভারতের প্রধান কয়েকটি শিল্প, যথা লৌহ-ইস্পাত (১৯২৪-৪৭), তুলাবস্ত্র (১৯২৭-৪৭), কাগজ (১৯২৭), দিয়াশলাই (১৯২৮), ভারী রসায়ন (১৯৩১) এবং চিনি (১৯৩২) প্রভৃতি শিল্পে প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মোট ১১টি শিল্প এর আশীর্বাদ লাভ করে। এই শিল্পগুলিতে সংরক্ষণের দরুন সংরক্ষিত শিল্পগুলির উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষিত শিল্পগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

১৯২৯-৩২ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাতে একমাত্র লৌহপিণ্ড উৎপাদন শিল্প ছাড়া অন্যান্য সংরক্ষিত শিল্পের বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি; এ সময়ে অ-সংরক্ষিত

শিল্পগুলিতে মন্দা চললেও সংরক্ষিত শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্রমাগত বেড়েছে।

সংরক্ষিত শিল্পগুলির উন্নতির ফলে তাদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য কয়েকটি নতুন শিল্পের বিকাশ ঘটে। সম্প্রসারণশীল সংরক্ষিত শিল্পগুলির চাহিদা পূরণের জন্য তাদের কাঁচামালের (তুলা, ইক্ষু ইত্যাদি) চাহিদা বেড়েছে। ফলে কৃষকেরা উপকৃত হয়েছে।

২. **সমালোচনা :** (১) প্রথম ফিসক্যাল কমিশন বা ভারত সরকার কেউই ফিসক্যাল নীতিকে দেশের শিল্পায়নের ও সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হিসাবে গণ্য করেনি। তাদের এ সম্পর্কে কোনো চিন্তাধারাই ছিল না। বরং একে তারা আবেদনকারী শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার জন্য সাময়িকভাবে সহায়তা দানের উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছে। ফলে কিছু শিল্প উন্নতি লাভ করেছে বটে তবে তাতে দেশের সুশৃঙ্খল শিল্প-বিকাশ ঘটেনি। (২) সংরক্ষণ দেবার বিষয়ে তিনটি মূলনীতির কঠোর প্রয়োগে অনেক শিল্প সংরক্ষণ লাভ করতে পারেনি। (৩) সরকারীভাবে ভারত সরকার সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে তাদের মনোভাব শিল্পায়নের বিরোধী ছিল। অস্থায়ী শুল্ক পর্ষৎ স্থাপন, এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা, শুল্ক পর্ষৎ অস্থায়ী হওয়ায় এদের কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব প্রভৃতির মধ্যে শিল্পায়ন বিরোধী সরকারী মনোভাব প্রকাশ পায়। (৪) শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণ দেবার ফলে প্রথম শিল্পনীতিতে দেশে নতুন শিল্প স্থাপনের বিরোধিতা করা হয়। (৫) বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে ও ব্যবস্থা গ্রহণের বিলম্বে অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সুবিধা ও উদ্দেশ্য আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়। (৬) সংরক্ষণ নীতির সাথে পুরোপুর সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত (Imperial Preference) নীতি অনুসৃত হওয়ায় (১৯৩১, '৩৫ ও '৩৯ সালের ভারত-ব্রিটেন চুক্তিসহ) ভারতে ব্রিটিশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হতে থাকে। এর ফলে সংরক্ষণ নীতি সবিশেষ ক্ষুণ্ন হয়। তবে, সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায়, প্রথম ফিসক্যাল নীতিতে ভারতের প্রধান শিল্পগুলির সম্প্রসারণের কিছুটা সুবিধা হয়েছে।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধারম্ভের পর বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়। উপরন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ-ভারত সরকার ঘোষণা করে যে যুদ্ধকালে স্থাপিত শিল্পগুলি উপযুক্তরূপে সংগঠিত ও পরিচালিত হলে তাদের সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হবে। এ অবস্থায় যুদ্ধকালে ভারতে কয়েকটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার একটি শুল্ক পর্ষৎ নিয়োগ করে সংরক্ষণ লাভেচ্ছু শিল্পগুলির নিকট থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে। এ সময়ে সরকার সংরক্ষণের যোগ্যতা বিচারের কঠোর শর্ত খানিক পরিমাণে শিথিল করে এবং শুল্ক পর্ষৎকে নির্দেশ দেয় যে, জাতীয় স্বার্থে কোনো শিল্পে সংরক্ষণদানকে তারা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলে, পর্ষৎ সেরূপ সুপারিশ করতে পারবে। তা ছাড়া, সংরক্ষণের বিকল্প বা অতিরিক্ত সাহায্যদানের সুপারিশ করার ক্ষমতাও শুল্ক পর্ষৎকে দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালে শুল্ক পর্ষৎ পুনর্গঠন করে তিন বৎসরের জন্য যুদ্ধকালীন শিল্পগুলিকে সহায়তা দান সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলা হয়। ৯০টি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে অন্তবর্তী শুল্ক পর্ষৎ পুরাতন ২২টি শিল্পের সংরক্ষণ অব্যাহত রাখার ও নতুন ৩৮টি শিল্পে সংরক্ষণের প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই নতুন শিল্পগুলির মধ্যে সাইকেল, সেলাইকল, বৈদ্যুতিক মোটর, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, সোডা-অ্যাস, তুলাবস্ত্রকলের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সংরক্ষণ মঞ্জুর করা হয়।

৩১৪. স্বাধীনতার যুগ ও শুল্কনীতি
Post-Independence Period and Tariff Policy

১. স্বাধীনতা লাভের পর শিল্প সম্পর্কে সরকারের নীতি যথাক্রমে, ফিসক্যাল নীতি, শিল্পনীতি, লাইসেন্স নীতি এবং একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের নীতি, এই চারটি নীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

২. **দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন** (১৯৪৯-৫০ সাল) **:** স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে গৃহীত শিল্পনীতি সম্পর্কিত প্রথম প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় : 'পরিবর্তনশীল জাতীয় নীতির আবশ্যকীয় লক্ষ্য হবে সর্ববিধ উপায়ে উৎপাদনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং তার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন। এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক হিসাবে নতুন করে উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী শুল্কনীতি নির্ধারণের কথা বলা হয়। এই সংকল্পের অনুসরণে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে ১৯২২ সাল থেকে সরকারের সংরক্ষণ নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলী পরীক্ষা ও ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ বা শুল্কনীতি সংক্রান্ত পরামর্শদানের জন্য দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয়। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে কমিশন সুপারিশ পেশ করে।

৩. **দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন** সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। কমিশন বলে,—(১) সংরক্ষণ নীতি নিজে কোনো লক্ষ্য নয়, তা লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। সে লক্ষ্যও সাময়িকভাবে একটি বা দু'টি

শিল্পে সহায়তা দান নয়; এর প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়ন ও জাতীয় কল্যাণসাধন। (২) সংরক্ষণ নীতি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক। তা না হলে, তাতে একদিকে যেমন ভারসাম্যবিহীন বিশৃঙ্খল শিল্পোন্নয়ন ঘটবে অন্যদিকে তেমনি দেশবাসীর উপর ব্যয়ভারের অসম বণ্টনও ঘটবে। (৩) সংরক্ষণের ব্যয়ভারকে অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক ব্যয় (social cost) বলে গণ্য করতে হবে। এবং এ ব্যয়ভার বণ্টনের বিষয়ে সর্বাধিক সামাজিক সুবিধার (maximum social advantage) নীতির সাথে সঙ্গতি রাখতে হবে। (৪) শুধু সংরক্ষণদান করলেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয় না। সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পগুলিকে পরবর্তীকালে পরিচর্যারও প্রয়োজন আছে।

৪. কমিশনের সুপারিশ হল: (১) প্রথম ফিসক্যাল কমিশন সংরক্ষণদানের যে তিনটি শর্ত আরোপ করেছিল তার পরিবর্তে শিল্পগুলিকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের সংরক্ষণের সুবিধালাভের যোগ্যতা নিম্নলিখিতভাবে বিচার করতে হবে,

(ক) ব্যয় যা-ই হোক, জাতীয় স্বার্থে দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠা ও সেগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বুনিয়াদী ও মূলশিল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত হলে, ঐ যুক্তিতেই তাদের সংরক্ষণ ও অন্যান্য সাহায্য দিতে হবে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এদের সাহায্যের পরিমাণ, শর্ত ইত্যাদি স্থির করবে ও বিভিন্ন সময়ে এদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

(গ) বাদবাকী অন্যান্য শিল্পের মধ্যে আবার তিন প্রকার শিল্প থাকতে পারে। প্রথমত, এদের মধ্যে যে সব শিল্পের উন্নয়ন অর্থনীতিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাবে তাদের ঐ যুক্তিতেই সংরক্ষণ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, এদের মধ্যে যে শিল্পগুলি পরিকল্পিত বুনিয়াদী ও মূল শিল্পের পরিপূরক ও সহায়ক, তাদের সংরক্ষণের দাবিও বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয়ত, অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে—(১) শিল্পটির বর্তমান সুবিধা ও তার প্রকৃত বা সম্ভাব্য উৎপাদন-খরচের বিবেচনায় সেটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা সহায়তা ছাড়াও আত্মনির্ভর হতে সক্ষম হবে কিনা; এবং / অথবা জাতীয় স্বার্থে শিল্পটিকে সংরক্ষণদান বাঞ্ছনীয় কিনা এবং সংরক্ষণ ব্যয়ভার দেশবাসীর উপর বেশি হবে কিনা—এই দু'টি বিষয়ের দ্বারা তাদের সংরক্ষণ-যোগ্যতা স্থির করতে হবে।

এ ছাড়া অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (২) অন্যান্য সুবিধা থাকলে কাঁচামালের স্থানীয় যোগানের প্রশ্নটি বিবেচনার প্রয়োজন নেই। (৩) সম্ভাব্য বিদেশী বাজারের কথা বিবেচনা করতে হবে। ৪) একটি সংরক্ষিত শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য অপর যে সকল সংরক্ষিত শিল্প কাঁচামালরূপে ব্যবহার করবে, তাদের 'ক্ষতিপূরণ-মূলক সংরক্ষণ' এর সুবিধা দিতে হবে। (৫) যে সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পে (embryonic industry) প্রচুর পুঁজি, বিশেষায়ন ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং যাদের ক্ষেত্রে তীব্র বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আছে তাদের সংরক্ষণদান বাঞ্ছনীয়। (৬) জাতীয় স্বার্থে কৃষিপণ্য-সংরক্ষিত হতে পারে। তবে ঐরূপ পণ্যের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। ৭) সংরক্ষণ নীতি পরিচালনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ ও স্থায়ী শুল্ক কমিশন স্থাপন করতে হবে। ৮) সংরক্ষণপ্রাপ্তির শর্ত হিসাবে সংরক্ষিত শিল্পগুলির দক্ষতা সর্বোচ্চ স্তরে বজায় রাখতে হবে। (৯) সংরক্ষণমূলক শুল্ক থেকে আয়ের একাংশ নিয়ে একটি উন্নয়ন তহবিল (development fund) গঠন করে তা থেকে প্রয়োজনীয় শিল্পে অর্থ সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

ভারত সরকার দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের সব সুপারিশই গ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সালে শুল্ক কমিশন আইন (Tariff Commission Act) পাস করে ৩ থেকে ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশন গঠন করে। বিভিন্ন বিষয়ে ঐ কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৫. ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুল্ক কমিশন কাজ আরম্ভ করে। শুল্ক কমিশনের কাজকর্ম অনুসন্ধান ও শুল্ক কমিশন আইনটির সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য কিছুদিন আগে ডঃ ভি. কে. রাও-কে সভাপতি করে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ-গুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল, যে সকল শিল্প থেকে সংরক্ষণ তুলে নেওয়া হবে ২।৩ বৎসর পর পর নিয়মিতভাবে তাদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে। ভারত সরকার এই কমিটির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশই গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে নবস্থাপিত শিল্পগুলির মধ্য থেকে সংরক্ষণের জন্য অতি অল্পই আবেদনপত্র আসছে। এর কারণ, সম্ভবত, বর্তমান আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি সংরক্ষণের প্রয়োজন আর তেমন অনুভব করছে না।

৬. মূল্যায়ন: দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ-কৃত সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে দু'টি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হল:

(১) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হলেই কোনো শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে হবে, এই যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং এর ফলে শুল্ক কমিশনের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তা

ছাড়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সকল শিল্পেরই সংরক্ষণ প্রয়োজন না হতেও পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লৌহ ইস্পাত শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৭ সালের পর থেকে এই শিল্পটি স্বেচ্ছায় সংরক্ষণের জন্য আর আবেদন করেনি।

(২) সংরক্ষণ নীতির অবসান সম্পর্কে কমিশন কোনো কথা বলেনি। অথচ অর্থনীতির উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এর প্রয়োজন থাকলেও বেসরকারী মালিকানাধীন শিল্পে এটা দীর্ঘকাল বজায় রাখা শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকরও হতে পারে। এতে সংরক্ষিত শিল্পে কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে রাজনীতিক দুর্নীতি ও একচেটিয়া শিল্পসংহতি ঘটতে পারে।

কিন্তু এই বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দেশের শিল্পোন্নয়ন ও পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নতির অঙ্গ ও উপায় হিসাবে সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের তুলনায় শুধু যে উদার তাই নয়, তা সামগ্রিক, যথাযথ ও বাস্তবানুগও বটে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে নিজের সুপারিশগুলিকে আবদ্ধ না রেখে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক কল্যাণের পটভূমিকায় সংরক্ষণের সমস্যাকে বিচার ও বিবেচনা করে কমিশন সুপারিশ করেছে। এর সুপারিশগুলি ভারতের শুল্ক ও সংরক্ষণ নীতিতে শুধু নবযুগের সূচনাই করেনি, দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটি নবপর্যায়ের সূত্রপাতও করেছে। ১৯৫২ সাল থেকে যে সকল শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করছিল তাদের অনেকগুলি সংরক্ষণের দরুন ইতোমধ্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়ায় তাদের উপর থেকে সংরক্ষণ তুলে নেওয়া হয়েছে। শুল্ক কমিশনের কাজেও বিলক্ষণ উন্নতি ঘটেছে। পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে সংরক্ষণ মঞ্জুর করে শুল্ক কমিশন দেশের শিল্পগুলির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অনেক নতুন শিল্প এর ফলে স্থাপিত ও বিকশিত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় ফিসক্যাল নীতি তার উদ্দেশ্য সাধনে যে বিশেষভাবে সফল হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩১.৫. সরকারের শিল্পনীতি
Government's Industrial Policy

১. স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার দেশের সুসংহত, ভারসাম্যযুক্ত এবং ব্যাপক শিল্পায়নের লক্ষ্য গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে প্রথম শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বিবেচনা করে সরকার আরেকটি শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রয়োজন মতো সংস্কার করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৮০ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত বিবৃতি।

২. **প্রথম শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব (১৯৪৮ সাল):** (১) **উদ্দেশ্য:** (ক) সর্বসাধারণের জন্য ন্যায়বিচার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা হতে পারে এরূপ একটি সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন; (খ) দেশের সম্ভাব্য সম্পদ ব্যবহারে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নয়ন; (গ) ক্রমবর্ধমান উৎপাদন; (ঘ) সকলের জন্য সমাজের সেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মোচন—এই চারটি বিষয় প্রথম শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়।

(২) **সরকারের ভূমিকা:** এতে ভারতে মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্প উল্লেখ করে বলা হয় যে, এইরূপ ব্যবস্থায় দেশে পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের এবং জাতীয় স্বার্থে শিল্পগুলির নিয়ন্ত্রণের সর্বময় দায়িত্ব সরকারের উপর থাকবে। এজন্য রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান পরিমাণে শিল্পক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যাপকভাবে হয়ত এটা সম্ভব হবে না। সেজন্য সর্বসাধারণের স্বার্থে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার অধিকার সরকার ঘোষণা করলেও বেসরকারী উদ্যোগের জন্য উপরোক্ত ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়।

(৩) **বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা নির্দেশ:** নিজস্ব ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণের সকল সুযোগ সরকার দেবে, কিন্তু সামগ্রিক শিল্পায়নের স্বার্থে ও প্রয়োজনে একে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের পাশাপাশি অবস্থান করে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র দেশের শিল্পায়নের প্রয়োজন ও লক্ষ্য পূরণে সহযোগিতা করবে।

(৪ **সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রবিভাগ:** শিল্পগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়: (ক) **সম্পূর্ণ একচেটিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র:** অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দেশরক্ষা, শিল্পাদি, পরমাণুশক্তি উৎপাদন ও রেলপরিবহণ প্রভৃতি এর অন্তর্গত। (খ) **সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র:** কয়লা, লৌহ ইস্পাত, বিমান নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি নির্মাণ (রেডিও ব্যতীত) এবং খনিজ তৈল-শিল্পাদি এর অন্তর্গত। এ ক্ষেত্রে সরকার বর্তমান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দশ বৎসরের জন্য কাজ করতে অনুমতি দেবে। তারপর এ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা হবে। তবে প্রয়োজন হলে যে কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকবে এবং তজ্জন্য ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে তা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত 'পাবলিক

করপোরেশন' রূপে চালিত হবে। (গ) **সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসনাধীন বেসরকারী ক্ষেত্র :** জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত কতকগুলি শিল্প এর অন্তর্গত। যথা, লবণ, মোটরগাড়ি, ট্রাক্টর, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ভারী যন্ত্রপাতি, ভারী রসায়ন, সার, রবার, পশম ও তুলাবস্ত্র, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ, সংবাদপত্রের কাগজ, বিমান ও সমুদ্র পরিবহণ, খনিজ প্রভৃতি। এদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের ভার রাষ্ট্রের থাকবে। (ঘ) **সাধারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারী ক্ষেত্র :** ব্যক্তিগত ও সমবায় প্রচেষ্টার অন্যান্য সকল শিল্প এর অন্তর্গত। এটা সাধারণত বেসরকারী প্রচেষ্টার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, তবে প্রয়োজন মনে করলে সরকার এতেও অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(৫) **বিদেশী পুঁজি :** সাধারণভাবে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে রাখতে হবে। সর্বক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের স্থান গ্রহণের জন্য ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) **কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প :** এদের গুরুত্ব নির্দেশ করে বলা হয় যে, এদের উন্নয়নের ভার রাষ্ট্রের উপর থাকবে। স্থানীয় সম্পদের দ্বারা স্থানীয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পূরণে এরা বিশেষ উপযোগী।

(৭) **শুল্কনীতি :** বিদেশী অন্যায় প্রতিযোগিতা বন্ধ ও ভোগকারীদের উপর অযৌক্তিক বোঝা না চাপিয়ে ভারতের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত শুল্কনীতি গ্রহণের কথাও ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা অনুসারেই ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয়।

৮) **কর ব্যবস্থা :** সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহদান এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনমত কর নীতির পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হয়।

সমালোচনা : ভারতের প্রথম শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব দক্ষিণ অথবা বামপন্থী কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে ভারত সরকার যে এ ব্যাপারে একপ্রকার মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল সে কথা ঠিক। বস্তুতঃপক্ষে সরকার অবস্থানুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য একটি স্থিতিস্থাপক নীতি গ্রহণ করেছিল। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে সীমারেখা টেনে সরকার ভারতে এক নতুন নজীর স্থাপন করে। অনেক শিল্পপতি একে স্বাগত জানালেও সাধারণভাবে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার ভয়ে কিছুটা ভীত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া দশ বৎসর পর রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার কথাতেও তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। এ নীতিতে ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের বেড়াজালে শিল্প ব্যবস্থা কণ্টকিত হয়ে পড়ে। অবশ্য মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থায় এটা অপরিহার্য।

৩. শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব (১৯৫৬) : (১) **প্রয়োজনীয়তা :** (ক) ভারতের সংসদ কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের লক্ষ্য গ্রহণ; (খ) ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি দেশে শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি; (গ) প্রথম পরিকল্পনার দ্বারা দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রস্তুতি হিসাবে কৃষির পুনরুজ্জীবন; (ঘ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের অগ্রাধিকার প্রদান—এই চারটি কারণে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায়, ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকার দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে।

(২) **উদ্দেশ্য :** (ক) শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক বিকাশের হার বৃদ্ধি করা; (খ) ভারী যন্ত্রপাতি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা; (গ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ করা; (ঘ) ক্রমবর্ধমান সমবায় ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা; (ঙ) মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং বেসরকারী একচেটিয়া কারবার বন্ধ করা; এবং (চ) দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা—এই সকল উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) **বৈশিষ্ট্য :** (ক) প্রথম শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে মোট ১৭টি শিল্প রাখা হয় (পরমাণু শক্তি শিল্প, লৌহ ইস্পাত, ভারী ঢালাই, ভারী যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, বিমান নির্মাণ, বিমান ও রেলপরিবহণ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন ইত্যাদি)। এদের ক্ষেত্রে বর্তমান বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার অনুমতি প্রদত্ত হলেও এদের ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্পূর্ণ ভার রাষ্ট্রের থাকবে। প্রথম শিল্পনীতির প্রথম দুটি শ্রেণীর শিল্প নিয়ে দ্বিতীয় শিল্পনীতির এই প্রথম শ্রেণীবিভাগ গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প অন্তর্ভুক্ত হয় (যথা, অ্যালুমিনিয়াম, মিশ্র ধাতু, মেশিন টুলস্, অ্যান্টি-বায়োটিক, রবার, রাসায়নিক সার ইত্যাদি)। এই শ্রেণীর শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। তবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে বেসরকারী ক্ষেত্রকে বিকাশের

সুযোগ দেওয়া হবে। এটা প্রথম শিল্পনীতির তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পগুলির অনুরূপ। তৃতীয় শ্রেণীতে উপরোক্ত দু'টি তালিকা বাহর্ভুত অন্যান্য যাবতীয় শিল্প রাখা হয়। বেসরকারী উদ্যোগের জন্য এই শিল্পগুলির ক্ষেত্র খোলা রাখা হয়েছে। তবে প্রয়োজনবোধে এদের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে পারে। এটা প্রথম শিল্পনীতির চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পগুলির অনুরূপ।

(খ) আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে শিল্পের যে কোনো বিভাগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে করা হয়েছে। কিন্তু সামান্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারী উদ্যোগকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণ পৃথক করার পরিবর্তে সকল শ্রেণীর শিল্পেই এদের সহাবস্থানের ব্যবস্থা করে পরস্পরকে পরস্পরের অনুপূরক ও পরিপূরক করা হয়েছে এবং বেসরকারী উদ্যোগকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(গ) জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য গ্রাম্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। বৃহদায়তন শিল্পের সাথে এদের সামঞ্জস্য স্থাপনও সরকারের লক্ষ্য।

(ঘ) আঞ্চলিক শিল্পায়ন দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পায়নের ভারসাম্য আনয়ন, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের অভাব দূর করবার জন্য কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবার জন্য শ্রমিকদের নানা প্রকার আরাম ও প্রণোদনার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

(৪) **প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পনীতির তুলনা :** (ক) প্রথম শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তিত হয়েছে। (খ) প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। (গ) দ্বিতীয় শিল্পনীতির দ্বারা অল্প কয়েকটি শিল্প বাদে প্রয়োজন মনে করলে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দানের অধিকার সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। (ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় ক্ষেত্র গঠনের কথা দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে বলা হয়েছে। এটা প্রথম প্রস্তাবে ছিল না। (ঙ) প্রথম প্রস্তাবে বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে কথা বলা হয়েছিল, দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সেরূপ কোনো উল্লেখই নেই। বরং সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে সমপরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

(৫) **মূল্যায়ন :** (ক) উল্লিখিত তিন শ্রেণীর যে কোনোটিতে রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার ঘোষিত হওয়ায়, এর দ্বারা বেসরকারী ক্ষেত্রের সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়েছে। এ জন্য বেসরকারী উদ্যোগের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আর কোনো ক্ষেত্র রইল না বলে শিল্পপতিরা দ্বিতীয় শিল্পনীতির প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। (খ) তাঁদের আর একটি সমালোচনা ছিল, সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী উদ্যোগের সহাবস্থানের ব্যবস্থা করা হলেও বেসরকারী ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের লেজুড় হিসেবে রাখা হয়েছে। (গ) দ্বিতীয় শিল্পনীতির আর একটি সমালোচনা এই যে, এতে সরকার বাস্তব জ্ঞান অপেক্ষা আদর্শবাদ দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হয়েছে। (ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা তুলে দেওয়ায় সরকার দক্ষিণপন্থীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে বলে বামপন্থীরা সমালোচনা করেছে।

দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সরকার পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি স্থিতিস্থাপক নীতি গ্রহণের চেষ্টা করেছে বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা সত্ত্বেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পুনর্ঘোষণা না করায় এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনবোধে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও সহায়তা দানের ঘোষণার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামো এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের লক্ষ্যের চৌহদ্দির মধ্যে দ্বিতীয় শিল্পনীতির দ্বারা বেসরকারী উদ্যোগকে তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের নতুন সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেসরকারী উদ্যোগ বজায় থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার বেসরকারী উদ্যোগের উপরই দেওয়া হয়েছে। তবে আঞ্চলিক শিল্পায়ন, সমবায় ক্ষেত্রের প্রসার প্রভৃতি দ্বিতীয় শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি যে বাঞ্ছনীয় তাতে সন্দেহ নেই।

৪. **জনতা সরকারের শিল্পনীতি ১৯৭৭ :** (ক) জনতা সরকারের শিল্পনীতির সাথে পূর্বতন ভারত সরকারের শিল্পনীতির (১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির) কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। বরং ১৯৭৭-এর শিল্পনীতি ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হয়েছিল।

(খ) এ শিল্পনীতিতে মূল গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলির শিল্পোন্নয়নের উপর।

(গ) এ শিল্পনীতিতে ৫০০টি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল (পূর্বে এর সংখ্যা ছিল ১৮০)।

(ঘ) ৫ লক্ষের কম জনসংখ্যা সম্পন্ন শহরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ঋণ, কাঁচামাল, সাজসরঞ্জাম ও শক্তি সরবরাহের এবং উপযুক্ত কর-রেহাইয়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি গ্রহণ করে।

(ঙ) এ শিল্পনীতিতে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সার, কীটনাশক ঔষধ, পেট্রো কেমিক্যালজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সৃষ্টির দায়িত্ব দেওয়া হয় বৃহদায়তন বুনিয়াদী শিল্পের উপর।

(চ) ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করতে চাইলে সেই প্রতিষ্ঠানের নিজেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এ ব্যাপারে অর্থ সরবরাহকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ তাকে দেওয়া না হতেও পারে।

(ছ) যে সব বৃহদায়তন শিল্প ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান স্তর থেকে বাড়াতে দেওয়া হবে না।

(জ) বৈদেশিক বিনিয়োগ: যে সব কোম্পানি তাদের বৈদেশিক শেয়ারের (ইকুয়িটি) অংশ কমিয়ে এনে মোট শেয়ারের শতকরা ৪০ ভাগের নিচে নামিয়ে এনেছে, সে কোম্পানিগুলি ভারতীয় কোম্পানির সমতুল বলে গণ্য হবে। এবং ঐ সব কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের কাজ ভারতীয় কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নিয়মানুসারেই হবে।

(ঝ) সরকার অনুমোদিত সব বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফা, রয়্যালটি, নিজ দেশে ডিভিডেন্ড প্রেরণ ও স্বদেশে পুঁজির প্রত্যাবর্তন এ সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেশে প্রচলিত বিধিবিধান অনুসারেই দেওয়া হবে।

(ঞ) যদিও এ সব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিকানা ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নীতিগতভাবে ভারতীয়দের হাতেই থাকবে, তবুও কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন, সূক্ষ্ম প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল ও রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে) মালিকানা ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বিদেশীদের হাতে থাকতে পারবে।

(ট) সরকার অবশ্য নিজেই নির্ধারণ করবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ও কি কি শর্তে বৈদেশিক পুঁজি ও কারিগরী বিদ্যা ভারতে আসতে দেওয়া হবে।

মন্তব্য: স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, জনতা সরকারের শিল্পনীতি আসলে নতুন কোনো শিল্পনীতি ছিল না। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজনের তাগিদে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। জনতা সরকারের শিল্পনীতি পুরাতন শিল্পনীতিরই রকমফের মাত্র। মৌলিক কোনো বৈশিষ্ট্য এতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫. শিল্পনীতি সংক্রান্ত বিবৃতি (১৯৮০): জনতা সরকারের পতনের পর ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে এ সরকারের শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এ শিল্পনীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল:

(১) সামাজিক অর্থনীতিক লক্ষ্য: এ শিল্পনীতিতে যেসব সামাজিক অর্থনীতিক লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে সেগুলি হল—

(ক) স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

(খ) সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতার হার বৃদ্ধি করা।

(গ) কর্মসংস্থানের আরও বেশি সুযোগ সৃষ্টি করা।

(ঘ অনগ্রসর অঞ্চলগুলির পক্ষপাতিত্বমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অঞ্চলগত ভারসাম্যহীনতা দূর করা।

(ঙ) কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলিকে পক্ষপাতিত্বমূলক বিশেষ সুবিধাদানের মাধ্যমে কৃষির ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের আন্তঃসম্পর্ক প্রসারিত করা।

(চ) রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনকারী ও আমদানী-পরিবর্ত (import substitutes) উৎপাদনকারী শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটান।

(ছ) সারা দেশে বিনিয়োগ যাতে সুষমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিই যাতে অধিকতর উপকৃত হয় তার ব্যবস্থা করা।

(২) অর্থনীতিক অন্তর্কাঠামোর পুনরুজ্জীবন: এ শিল্পনীতির অন্যতম লক্ষ্য হল অন্তর্কাঠামোগত বাধাবিপত্তি অপসারণ করে অর্থনীতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করা। এ ব্যাপারে প্রধানত শক্তি ও কয়লা উৎপাদনের এবং পরিবহণের ব্যাপক সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হবে।

(৩) সরকারী ক্ষেত্রাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনমত মেরামত ও কর্মক্ষম করা: ভারতের অর্থনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রেরই যে প্রাধান্য থাকবে সে সম্পর্কে এ শিল্পনীতি নতুন করে আস্থা প্রকাশ করেছে। এ উদ্দেশ্যে সরকারী ক্ষেত্রের শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিচালনা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

(৪) বেসরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা নির্দেশ : এ শিল্প-নীতিতে বলা হয়েছে, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে যে পরিকল্পনা ও নীতি গৃহীত হবে বেসরকারী ক্ষেত্রে সেগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের কর্মধারা নির্ধারণ ও পরিচালনা করবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চোখে দেখা হবে না বরং এ ক্ষেত্রকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানান হবে।

(৫) অর্থনীতিক যুক্তরাষ্ট্রবাদ (Federalism) প্রতিষ্ঠা : এতকাল যে ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে কৃত্রিম বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছিল, (ধারণাটা ছিল এই যে এরা পরস্পর বিরোধী) এ শিল্পনীতি সে ধারণা সম্পূর্ণ বর্জন করে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে সুসমঞ্জস সহাবস্থান ও সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে এক ধরনের অর্থনীতিক যুক্তরাষ্ট্রবাদ (economic federalism) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। এর রূপরেখা যে ভাবে কল্পিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে দেশের প্রতিটি অনগ্রসর জেলাতে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রী শিল্পসরঞ্জাম স্থাপন করা হবে এবং এ কেন্দ্রী শিল্পগুলিই নিজের প্রয়োজনে যতগুলি সম্ভব সহায়ক শিল্প ও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে ক্রিয়াশীল হবে। এর ফলে সারা দেশে বৃহদায়তন, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প গড়ে উঠতে থাকবে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে।

(৬) কেন্দ্রী শিল্পসরঞ্জাম : এ শিল্পনীতিতে একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করা হয়েছে। সেটি হল কেন্দ্রী শিল্পসরঞ্জাম (nucleus plants)। এর কাজ হবে এরই কর্তৃত্বাধীন ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে অবস্থিত যাবতীয় সহায়ক শিল্প সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্যের একত্রীকরণ, ঐ অঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান উৎপাদন এবং ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা। এই কেন্দ্রী (nucleus) নানা ধরনের বিনিয়োগের ব্যবস্থা করবে, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং শিল্পায়নের সুবিধাগুলি ব্যাপক ক্ষেত্রে বন্টন করবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলির কৃৎকৌশলের উৎকর্ষ সাধন করাও কেন্দ্রীর অন্যতম কাজ হবে।

(৭) ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে উৎসাহ ও সাহায্য দান : (ক) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-এককগুলির আর্থিক সমস্যার সুরাহা করার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান ঋণদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ও প্রয়োজনমত প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করার কথা এ শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় অথচ সাধারণভাবে দুর্লভ এমন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের একটি মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রকল্পের কথা এ শিল্প-নীতিতে বলা হয়েছে।

(গ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে বিশেষ সাহায্যদানের এবং এদের উৎপাদন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য যে নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল সে নীতি পূর্বের মতই অনুসরণ করা হবে।

(ঘ) গ্রামীণ শিল্পনীতি (যেমন হস্তচালিত তাঁত, কারিগরী শিল্প, খাদি বস্ত্র ইত্যাদি) যাতে আরও দ্রুত সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী হয় সে জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করার লক্ষ্য এ শিল্পনীতিতে ঘোষিত হয়েছে।

(৮) শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অঞ্চলগত ভারসাম্যহীনতা দূর করার লক্ষ্য এ শিল্পনীতিতে ঘোষিত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হয়ে দেশের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে অনগ্রসর অঞ্চলে এগুলি স্থাপিত হবার আগ্রহ বোধ করে সে জন্য সরকার এদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করবে।

(৯) নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধি এ নীতির অন্যতম লক্ষ্য। শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যাতে কোনো একস্থানে স্থাপিত শিল্প চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে (ripple effect) ঐ অঞ্চল জুড়ে আরও সহায়ক শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এটা করা তখনই সম্ভব যখন কোনো একটা শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে স্থানীয় উপাদানের ও স্থানীয় জন সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়।

(১০) শিল্প লাইসেন্স নীতির উদারীকরণ : এই শিল্প নীতি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের বিষয়টি আরও উদারতার সাথে বিবেচনা করবে। দেশের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করাই এ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

(১১) শিল্পগুলির স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা : ১৯৭৫ সালে সরকার ১৫টি শিল্পকে তাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতার উপর আরও ২৫ শতাংশ পর্যন্ত সম্প্রসারণের অনুমতি দিয়েছিল। বর্তমানে শিল্প নীতিতে এই ১৫টি শিল্প ছাড়াও আরও বহু শিল্পকে এ ধরনের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতার স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের অনুমতি দিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে শিল্পনীতির একটি নতুন ব্যবস্থা।

(১২) শিল্প লাইসেন্স পদ্ধতির সরলীকরণ : এ নীতিতে লাইসেন্স দেবার পদ্ধতির আরও বেশি সরলীকরণ ও যুক্তিসিদ্ধ সংস্কার সাধনের কথা বলা হয়েছে।

(১৩) এ শিল্পনীতি রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের স্থাপনা ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে।

(১৪) শিল্প প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কার্যকর প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োজনমত বিদেশ থেকে আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হবে।

(১৫) এ শিল্পনীতি একটা তথ্য ব্যাঙ্ক (Data Bank) স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে। উক্ত তথ্য ব্যাঙ্কের কাজ হবে বিবিধ বিনিয়োগ প্রকল্পের কাজ কতটুকু এগিয়েছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি সংবাদপ্রার্থী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া।

(১৬) এ শিল্পনীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছে, সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পকে যে সব প্রণোদনামূলক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে সেগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে হবে।

(১৭) সরকার মনে করে ইচ্ছাকৃত কুপরিচালনা ও আর্থিক অন্যায় আচরণের জন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি রুগ্ন হয়ে পড়ে তবে তার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কিনা সে সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরেই তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শিল্পনীতিতে বলা হয়েছে।

(১৮) যে সব রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে দেশের ঐ ধরনের সুস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের একত্রীকরণের ব্যবস্থা করার কথা এ শিল্পনীতিতে বলা হয়েছে। অপরদিকে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনের অন্য কোনো পথ থাকবে না জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সরকার সে সব শিল্পের পরিচালনার দায়িত্ব অধিগ্রহণ করবে।

(১৯) নতুন শিল্পনীতিতে ত্রিদলীয় শ্রম সম্মেলন (tripartite labour conference) পুনঃ প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(২০) এ শিল্পনীতিতে বলা হয়েছে সরকার শিল্প-স্থাপন ও শিল্পবিকাশের জন্য সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ও ও উৎসাহ দেবে।

(২১) এ শিল্পনীতিতে জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলি (District Industries Centres) বাতিল করে দেবার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে এ সব কেন্দ্রে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার তুলনায় আশানুরূপ প্রতিদান পাওয়া যায়নি।

মন্তব্য : এ শিল্পনীতিতে এমন কিছু নেই যাকে সম্পূর্ণ নতুন বলা যেতে পারে। বস্তুত পক্ষে এ শিল্পনীতি নতুন কিছু বলতেও চায়নি। ১৯৪৮ সালে প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে যে শিল্পনীতি অনুসরণ করে এসেছে সেই পুরাতন নীতিগুলিকেই ১৯৮০ সালের জুলাই মাসের শিল্পনীতি আরো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। এ শিল্পনীতি বিশেষভাবে সরকারী ক্ষেত্র ও বেসরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছভাবে বর্ণনা করেছে। এটা বোঝা যায়, দীর্ঘ ৩২ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে সরকার তার শিল্পনীতি রচনায় আদর্শবাদী চিন্তাধারা পরিত্যাগ করেছে। তার প্রমাণ হল, সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা সম্পর্কে এ শিল্প-নীতিতে আদর্শগত কোনো কথার উল্লেখ নেই। সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণের কোনো প্রস্তাবও এ শিল্প-নীতিতে নেই। শুধুমাত্র আছে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে সেগুলির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থার কথা। বেসরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারের নীতি যে অনেক বেশি উদার হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধা, বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির ব্যবস্থা, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, লাইসেন্স দেবার ও পাবার পদ্ধতির সরলীকরণ—এ দিকগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, ১৯৮০ সালের শিল্পনীতি ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পায়নে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উপরেই বিরাটভাবে নির্ভর করে অগ্রসর হবে।

এ শিল্পনীতির বিরুদ্ধে অন্যতম সমালোচনা হল :

(ক) এটি বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলির দিকে খুব বেশি পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছে।

(খ) এ শিল্পনীতি দেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অস্তিত্ব রক্ষা ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। এর কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, বৃহদায়তন শিল্প-গুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির ফলেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাবে।

(গ) বৈদেশিক প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির যে সুযোগ দেবার ব্যবস্থা শিল্পনীতিতে করা হয়েছে তাতে দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যা ও উদ্যোগ নিরুৎসাহিত হবে।

(ঘ) বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ফলে মালিকদের হাতে বিপুল সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকবে এবং শিল্পায়নে অঞ্চলগত বৈষম্য বিদূরিত হওয়ার পরিবর্তে আরও তীব্র হবে। এগুলি ঘটলে তা হবে ভারত সরকারের এতকালের ঘোষিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষার নীতির পরিপন্থী।

৩১.৬. শিল্প লাইসেন্স নীতি
Industrial Licensing Policy

১. ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির রূপদানের জন্য ভারতে শিল্পসংস্থা স্থাপনের সরকারী অনুমতি বা লাইসেন্স নেবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল: (ক) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য অনুযায়ী শিল্প বিনিয়োগ ও উৎপাদনের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ; (খ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের রক্ষা ও উৎসাহদান; (গ) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে বাধা দান; এবং (ঘ) বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূর করা। শিল্প সংস্থা স্থাপনে সরকারী অনুমতি প্রদান ও সংগ্রহের আইনগত ব্যবস্থা তিনটি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একটি হল ১৯৫১ সালের শিল্প (বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন। দ্বিতীয়টি হল ১৯৬৯ সালের এম. আর. টি. পি. (MRTP) আইন। তৃতীয়টি হল ১৯৭৩ সালের ফেরা (FERA) আইন।

২. **১৯৫১ সালের শিল্প (বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন [Industries Development and Regulation Act, 1951]:** ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিটি রূপায়ণের জন্য এই আইনটি ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাস হয় ও ১৯৫২ সালের ৮ই মে থেকে বলবৎ হয়।

আইনটিতে তিন রকমের ব্যবস্থা আছে: (ক) জাতীয় অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে যাতে কোনো শিল্পসংস্থা কাজ করতে না পারে সেজন্য এই আইনে শিল্প সংস্থাগুলির বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রীকরণের ব্যবস্থা, শিল্পসংস্থাগুলি সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা এবং শিল্প লাইসেন্স বাতিল করার ব্যবস্থা আছে। (খ) শিল্পসংস্থাগুলির দোষত্রুটি দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা শিল্প সংস্থায় প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার এবং পণ্যের সরবরাহ বা দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। (গ) শিল্পসংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রিত বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা পর্ষৎ, আলাদা আলাদা শিল্পের জন্য উন্নয়ন পর্ষৎ স্থাপন প্রভৃতি বিশদ সহায়তামূলক ব্যবস্থা রয়েছে।

এই আইনের তফসিলভুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সমস্ত শিল্পসংস্থা: রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং শিল্পসংস্থার মালিকদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিতেই হবে। নতুন শিল্পসংস্থা স্থাপন, বর্তমান সংস্থার সবিশেষ সম্প্রসারণ এবং নতুন দ্রব্য উৎপাদন ও শিল্প সংস্থার স্থান পরিবর্তন—এই চার রকম ক্ষেত্রেই সরকার থেকে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। ২৫ লক্ষ টাকার বেশি সম্পত্তির সংস্থা আগে লাইসেন্স না নিলে স্থাপন করা যাবে না।

আইনটির তফসিলভুক্ত শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে যে সব সংস্থায় ৫০ বা তার বেশি শ্রমিক বিদ্যুৎ বা বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য নিয়ে কিংবা ওই জাতীয় শক্তির ব্যবহার না করে যে সব সংস্থায় ১০০ জন বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে সেই সমস্ত সংস্থাতে এই আইনটি বলবৎ রয়েছে। আইনটি থেকে বাদ পড়েছে এমন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ও সহায়ক শিল্পসংস্থাগুলি (ancillary industries) যে সব শিল্প সংস্থায় স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ কোটি টাকার বেশি নয়।

৩. **প্রতিযোগিতাবিরোধী ও একচেটিয়া কারবারী আচরণ আইন ১৯৬৯ (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969):** এই আইনটির উদ্দেশ্য হল: (ক) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে বাধা দান; (খ) একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ; এবং (গ) একচেটিয়া কারবারমূলক ও নিষেধাত্মক কারবারী আচরণ নিষিদ্ধকরণ।

বৃহদায়তন কারবারী গোষ্ঠীগুলি ও শিল্পে আধিপত্যকারী (dominant) কারবারী সংস্থাগুলি সম্পর্কে কঠোর নজরদারীর ব্যবস্থা এই আইনে রয়েছে। এই রকম সংস্থাগুলি সবিশেষ সম্প্রসারণে ইচ্ছুক হলে, এবা নতুন কোনো কারবারীসংস্থা স্থাপন করতে চাইলে, অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইলে কিংবা অন্য কোনো সংস্থা কিনে নিতে চাইলে সরকারের অনুমতি এদের নিতে হবে। এই ধরনের কোনো সংস্থাকে তার কাজকারবারের একাংশ পরিত্যাগ করতে, সংস্থাটিকে ভেঙে দিয়ে কতকগুলি ছোট ছোট সংস্থায় পরিণত করতে বাধ্য করার ক্ষমতাও এই আইনে সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে সরকার ইচ্ছা করলে এম. আর. টি. পি. কমিশনের অভিমত জানতে চাইতে পারে। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়।

এই আইনে বলা হয়েছে যে, কারবারী কার্যকলাপ সংক্রান্ত আচার আচরণে যদি এক বা একাধিক একচেটিয়া ধরনের কারবারী সংস্থা জড়িত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনের ৫০ শতাংশ যদি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাহলে তা একচেটিয়ামূলক কারবারী আচরণ বলে গণ্য হবে এবং তা যদি অন্য সংস্থার উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, যোগানদারদের মুনাফা বাড়িয়ে দেয় কিংবা অন্যায্য-ভাবে প্রতিযোগিতা ক্ষুণ্ণ করে কিংবা উৎপন্নসামগ্রীর মান নিচু করে দেয় তাহলে তা জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলে পরিগণিত হবে। এরকম অপরাধে কোনো সংস্থা অপরাধী বলে সরকারের সন্দেহ হলে তা অনুসন্ধান করার জন্য এম. আর. টি. পি. কমিশনকে অনুরোধ করতে পারে। কমিশনের রায় সকলকে মেনে নিতে হবে।

অনুরূপভাবে, যদি কোনো সংস্থার কারবারী কার্যকলাপ সংক্রান্ত আচার আচরণের দ্বারা প্রতিযোগিতা বন্ধ, বিকৃত বা ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে সে সংস্থার কারবারী আচরণকে নিষেধাত্মক কারবারী আচরণ (restrictive trade practices) বলে গণ্য করা হবে। এম. আর. টি পি. কমিশন এরূপ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে দেখতে পারে ঐ আচরণ জনস্বার্থবিরোধী কিনা। জনস্বার্থবিরোধী বলে গণ্য হলে, কমিশন তা থেকে বিরত থাকার জন্য ঐ সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারে। ১৯৮৫ সালের একটি সংশোধনীর দ্বারা এই আইনের এক্তিয়ারভুক্ত কোম্পানিগুলির বিত্ত-সম্পত্তির ন্যূনতম সীমা ২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

৪. **বিদেশীমুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (ফেরা), ১৯৭৩** [Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1973]: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালে প্রবর্তিত বিদেশী মুদ্রার লেনদেন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সগুলি একত্রিত করে ১৯৪৭ সালে প্রথম বিদেশীমুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করা হয়েছিল (FERA, 1947)। তারপর ১৯৭৩ সালে নতুন একটি বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন পাস ও বলবৎ করা হয়। বিদেশীমুদ্রা ও বিদেশী কোম্পানির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ও বিদেশী সরকারী ঋণপত্র (foreign securities) প্রভৃতির বেচাকেনা এবং বিদেশী মুদ্রা ও সোনারুপোর আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, দেশের বিদেশীমুদ্রা সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে তার উপযুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হল এই আইনটির উদ্দেশ্য। এজন্য এই আইনে সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তদারকি, নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত এবং নির্দেশদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে বিদেশী কোম্পানিগুলির দ্বারা বিনিয়োগ, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের ভারতে অবস্থিত সম্পত্তির মালিকানা, বিদেশে অবস্থিত সম্পত্তির ভারতীয়দের মালিকানা, বিদেশে ভ্রমণ ও অবস্থান, ভারতে বিদেশীদের নিয়োগ এবং বিদেশী মুদ্রার বেচাকেনা প্রভৃতির উপর এই আইনটির দ্বারা নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

৫. **ভারতে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা** (Industrial Licensing in India): ১৯৫১ সালের শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনে শিল্পসংস্থার লাইসেন্স নেবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর এক দশক শেষ হতে না হতেই এমন অভিযোগ উঠতে থাকে যে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার দ্বারা দেশে বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ সাধিত হচ্ছে এবং ব্যবস্থাটি অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সাহায্য করছে এবং শিল্পগত পরিকল্পনায় অদক্ষতার কারণ হয়ে উঠেছে। এই কারণে শিল্প লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বারংবার সমালোচনা ও পুনর্বিচারের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

১৯৬০ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের সভাপতিত্বে নিযুক্ত আয়বন্টন ও জীবনযাত্রার স্তর সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Distribution of Income and Levels of Living) ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে এই বলে মন্তব্য করে যে, পরিকল্পিত অর্থনীতির কাজকর্ম দ্বারা ভারতীয় শিল্পে বড়ো বড়ো কোম্পানির উৎপত্তি ঘটেছে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন, ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল প্রভৃতির আর্থিক সহায়তার দ্বারা তারা পরিপুষ্ট হয়েছে। বড়ো ও মাঝারি আয়তনের উদ্যোগগুলি দেশের ব্যাঙ্কঋণের সর্বাধিক সুযোগ পেয়েছে। সমস্ত প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। কমিটির মতে, শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা হল শিল্পগত একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি বন্ধ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

মহলানবিশ কমিটি বলেছিলেন, বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তা গ্রহণ করে ভারত সরকার ১৯৬৪ সালে একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধানী কমিশন (Monopolies Enquiry Commission) নামে বিচারপতি কে. সি. দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন তার রিপোর্টে মন্তব্য করে, সঠিক পথে দেশের শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে সরকার যে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছে তা অর্থনৈতিক ক্ষমতার আরও কেন্দ্রীকরণের একটি শক্তিশালী উপাদান বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থাকে এর অন্যতম কারণ বলে কমিশন মন্তব্য করে।

মহলানবিশ কমিটি ও দাশগুপ্ত কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৬ সালে অধ্যাপক আর. কে হাজারি কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করে। ১৯৬৭ সালে চূড়ান্ত রিপোর্টে অধ্যাপক হাজারি মন্তব্য করেন, লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থাটি মূলত নেতিবাচক অস্ত্র হলেও, পরিকল্পনাগুলিতে নির্ধারিত লক্ষ্য পর্যন্ত বা তার কাছাকাছি উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির বিষয়ে এটি একটি ইতিবাচক প্রশাসনিক অস্ত্রের ভূমিকা নিয়েছে। রিপোর্টে তিনি লাইসেন্সিং ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি উল্লেখ করেন এবং তার সংশোধনের পরামর্শ দেন। ভারত সরকার

অধ্যাপক হাজারির সুপারিশ গ্রহণ করে ১৯৬৭ সালে অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার-কে সভাপতি করে, শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিটি (Industrial Licensing Policy Committee) নামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি (Expert Committee) নিয়োগ করেন। কমিটি তার রিপোর্টে মন্তব্য করে, শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থাটি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলির সপক্ষে কাজ করেছে। পরিকল্পনার অগ্রাধিকার অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে এবং আমদানি-পরিবর্ত নীতির উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিল্পের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ অবহেলা করেছে। সর্বদা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের তুলনায় বেসরকারী ক্ষেত্রকে পছন্দ করেছে। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কমিটি অনেকগুলি সুপারিশ করে।

কমিটির সুপারিশগুলির পটভূমিতে ভারত সরকার ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নতুন লাইসেন্সিং পলিসি (Industrial Licensing Policy, 1970) ঘোষণা করে। তাতে শিল্পক্ষেত্রটিকে (ক) সংরক্ষিত ক্ষেত্র (reserved sector); (খ) মূল ক্ষেত্র (core sector); (গ) মূল ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ভারী শিল্প ক্ষেত্র (non-core heavy industries sector); (ঘ) মধ্যবর্তী ক্ষেত্র (middle sector); (ঙ) লাইসেন্স বহির্ভূত ক্ষেত্র (unlicensed sector); এবং (চ) রপ্তানি-আমদানি ক্ষেত্র (export-import sector)—এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

এরপর যথাক্রমে ১৯৭৩, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৮০ এবং ১৯৮২ সালে শিল্প লাইসেন্সিং পলিসি সংশোধিত হয়। ১৯৮৫ সালে শিল্প লাইসেন্সিং পলিসির নতুন সংস্কার করা হয়। একের পর এক ওই সংস্কারের দ্বারা বৃহৎ শিল্প-গোষ্ঠীগুলির অনুকূলে শিল্প লাইসেন্স নীতির উদারীকরণ ঘটেছে। সেই সঙ্গে এম. আর. টি. পি. আইনেরও উদারী-করণ ঘটেছে। এই আইনের এক্তিয়ারভুক্ত কোম্পানির বিত্ত-সম্পত্তির ন্যূনতম পরিমাণ ২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে। সর্বোপরি ১৯৮৫ সালে শিল্পনীতিটির উদারীকরণের একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৬. **মূল্যায়ন (Evaluation)**: ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতের শিল্পনীতি এবং ১৯৫১ সাল থেকে শিল্প লাইসেন্স নীতি বিগত প্রায় চার দশক ধরে কার্যকর রয়েছে। বিগত চল্লিশ বৎসরে দেশের শিল্প ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও শিল্পোৎপাদন গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে বহুগুণ বেড়েছে। মূল, ভারী, মধ্যবর্তী ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিস্তার ঘটেছে। রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের চরিত্রে বদল ঘটেছে। শিল্পের পরি-কাঠামো infra-structure) গড়ে উঠেছে। বহু অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে ভারত এখন স্বাবলম্বী হয়েছে। এই সবই হল উজ্জ্বল দিক। কিন্তু এর পাশাপাশি কয়েকটি অন্ধকার দিকও রয়ে গেছে। শিল্পোন্নয়নের হার এখনও অল্প থেকে গেছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দিন দিন ক্রম-বর্ধমান। শিল্পোন্নয়নের তুলনায় কর্মসংস্থান অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিল্পগুলির আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ এখনও ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রয়েছে।

শিল্প ও লাইসেন্স নীতির এই ত্রুটি ও ব্যর্থতাগুলি অত্যন্ত গুরুতর।

৩১৭ যুক্ত ক্ষেত্র
Joint Sector

১ 'জয়েন্ট সেক্টর' হল সরকারী (অর্থাৎ) রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারী উদ্যোগের যুক্ত মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত কারবারী সংস্থার ক্ষেত্র। ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে শিল্পগুলিকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ (ক তালিকা), ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ (খ-তালিকা) এবং বেসরকারী উদ্যোগ (গ তালিকা), এই তিন ভাগে ভাগ করে বলা হয়েছে বেসরকারী উদ্যোগের সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্র ঋণ কিংবা পুঁজি দিয়ে সাহায্য করবে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি 'জয়েন্ট সেক্টর' শব্দটি না থাকলেও তার এ নির্দেশের মধ্যে 'জয়েন্ট সেক্টর' এর বীজটি নিহিত আছে বলে মনে করা হয়। 'জয়েন্ট সেক্টর' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে ১৯৬৯ সালে গঠিত শিল্প লাইসেন্স কমিটি বা দত্ত কমিটি। এই কমিটি তার রিপোর্টে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত উদ্যোগের করবারী সংস্থা নিয়ে একটা যুক্ত উদ্যোগের ক্ষেত্র স্থাপনের সুপারিশ করে। দত্ত কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়ে ১৯৭০ সালে ভারত সরকার যে শিল্প লাইসেন্স নীতি ঘোষণা করে তাতে 'জয়েন্ট সেক্টর' স্থাপনের নীতিও স্বীকার করা হয়। ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তে তা আরেকবার উল্লেখ করা হয়।

২. **জয়েন্ট সেক্টর সম্পর্কে সরকারের ঘোষিত নীতি হল**: (১) সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত উদ্যোগের সংস্থা স্থাপন করা হবে এবং সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাদের চলতে হবে। (২) যে সব শিল্পকে বেসরকারী উদ্যোগের বাইরে রাখা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে যুক্ত উদ্যোগের সংস্থা স্থাপন করা যাবে না। (৩) নতুন ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বেলায় যুক্ত উদ্যোগ নতুন কারবারী সংস্থা প্রবর্তনের হাতিয়ার রূপে কাজ করবে।

(৪) যুক্ত উদ্যোগাধীন সংস্থাগুলির নীতি নির্ধারণে, ব্যবস্থাপনায় ও কাজকর্মে সরকার একটি কার্যকর ভূমিকা নেবে।

৩. **জয়েন্ট সেক্টর স্থাপনের সপক্ষে যুক্তি :** (১) রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থসংস্থানকারী সংস্থাগুলি বেসরকারী উদ্যোগের সংস্থাগুলিকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দেওয়ায় বড়ো বড়ো একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে এবং অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে বিপুল বিত্ত-সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই সব একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীর অধীন সংস্থাগুলি এখনই রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্ভব নয়। অথচ তাদের কাছে থেকে ওই ঋণ ফেরত চাওয়ারও অসুবিধা আছে। সুতরাং ঐ সংস্থাগুলিকে যুক্ত উদ্যোগের সংস্থায় পরিণত করা হলেই তাদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(২) অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে পুঁজি সংগ্রহ, গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে যেমন আশানুরূপ কাজ করতে পারেনি, তেমনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ঘটেছে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রের সম্বলগুলি একত্রিত করলে যুক্ত উদ্যোগের দ্বারা ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

(৩) যুক্ত উদ্যোগের ক্ষেত্র মাঝারি ও নতুন উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করে মাঝারি আয়তনের সংস্থার প্রসারের দ্বারা শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ বাড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে অনেক ছোট ছোট উদ্যোক্তাও এগিয়ে আসতে সাহস পাবে।

(৪) অনুমোদিত শিল্পগুলিতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে সরকার যুক্তভাবে অংশ নিলে বেসরকারী শিল্পের মুনাফা সামাজিকভাবে উপযোগী ক্ষেত্রগুলিতে লগ্নি করার সুযোগ ঘটবে।

(৫) এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি অল্প মুনাফা ও বেশি পুঁজি লগ্নির ক্ষেত্রগুলি বেছে নিয়েছে আর বেসরকারী সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে অল্প পুঁজি লগ্নি করে বেশি মুনাফা উপার্জনের ক্ষেত্রগুলি। যুক্ত উদ্যোগের সংস্থা গঠিত হলে সরকার বেশি মুনাফা উপার্জনের ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশের সুযোগ পাবে এবং তাতে বেসরকারী বৃহদায়তন একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীগুলির আধিপত্য কমবে। এমনি করে পূর্ণ জাতীয়করণ এবং সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগ, এই দুই চরমপন্থা বাদ দিয়ে একটি মধ্যপন্থায় শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হবে।

(৬) সরকার ও অর্থসরবরাহকারী সরকারী সংস্থাগুলি যুক্ত উদ্যোগাধীন সংস্থাগুলির ২৫ শতাংশ করে শেয়ার কিনে পুঁজি যোগালে, সাধারণ সঞ্চয়কারী মানুষও ভরসা পেয়ে যুক্ত উদ্যোগের সংস্থাগুলির শেয়ার কিনে বাকি ৫০ শতাংশ পুঁজি যোগাতে দ্বিধা করবে না। এমন করে যুক্ত উদ্যোগের ক্ষেত্র সাধারণ মানুষকে তাদের অল্প সঞ্চয় শিল্পে লগ্নি করার সুযোগ দেবে।

৪. **পুঁজির অনুপাত :** কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য, এই দুই স্তরেই যুক্ত উদ্যোগের ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত যে ক'টি যুক্ত উদ্যোগের সংস্থায় অংশ গ্রহণ করেছে, তার সবই হল বিদেশী পুঁজির সাথে যুক্ত উদ্যোগ। এদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কমপক্ষে পুঁজির ৫১ শতাংশ এবং কয়েক ক্ষেত্রে তারও বেশি পুঁজি সরবরাহ করেছে।

তা ছাড়া, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা স্থাপিত শিল্পে ঋণদানকারী সংস্থাগুলি বেসরকারী উদ্যোগের সংস্থাগুলিকে যে ঋণ দিয়েছে সে ঋণ ঐ সব বেসরকারী সংস্থার শেয়ার পুঁজিতে পরিণত করার অধিকারও ঋণদানকারী সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে। ঋণদাতা সংস্থাগুলি ঋণটাকে পুঁজিতে পরিণত করলে তারা ঋণগ্রহণকারী বেসরকারী উদ্যোগের সংস্থাগুলির আংশিক মালিক হয়ে দাঁড়াবে। তখন ঐ বেসরকারী উদ্যোগের সংস্থাগুলি যুক্ত উদ্যোগের সংস্থায় পরিণত হয়।

অনেক রাজ্য সরকার, রাজ্য শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের মারফত কতকগুলি যুক্ত উদ্যোগের সংস্থা স্থাপন করেছে। এদের অধিকাংশই হল মাঝারি আয়তনের শিল্প সংস্থা। এদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ হল : (১) এ সব সংস্থা স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হবে। (২) বিদেশী পুঁজির সাথে যুক্ত উদ্যোগের সংস্থা স্থাপন করতে হলে—রাজ্য সরকার বা রাজ্য শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন পুঁজির ২৫ শতাংশ, বিদেশী উদ্যোক্তা ২০ শতাংশ ও দেশী উদ্যোক্তারা ২০ শতাংশ সরবরাহ করবে এবং বাকি ৩৫ শতাংশ পুঁজি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে সংগ্রহ করতে হবে। (৩) কেবল দেশী উদ্যোক্তাদের সাথে সহযোগিতা হলে, রাজ্য সরকার বা রাজ্য শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন যোগাবে পুঁজির ২৬ শতাংশ, দেশী উদ্যোক্তারা যোগাবে ২৫ শতাংশ এবং বাকি ৪৯ শতাংশ পুঁজি জনসাধারণ ও ঋণদানকারী সংস্থাগুলির কাছে শেয়ার বিক্রি করে সংগ্রহ করতে হবে। (৪) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি না নিয়ে কেউ এককভাবে আদায়ীকৃত পুঁজির ২৫ শতাংশের মালিক হতে পারবে না।

সরকারী শিল্পক্ষেত্র
THE PUBLIC SECTOR

৩১.৮. ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন Origin of the Pub ic Sector and its Evolution

দেশের শিল্পায়নে কোনো জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র কেবলমাত্র নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন করবে এটা বর্তমানে অসম্ভব। দেশে শিল্পবিকাশের কাজে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র শুধু যে নেতৃত্ব দেবে এবং শিল্পগুলিকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করবে তাই নয়, শিল্পোন্নয়নের কাজে রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ভারত সরকার শিল্পের ব্যাপারে কোনো কিছু করা কর্তব্য বলে কখনই ভাবেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারত সরকার শিল্পের উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফলে, যুদ্ধোত্তর কালে সরকার শিল্পের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের এক কার্যসূচি গ্রহণ করে। তারই অঙ্গ হিসাবে ১৯৪৪ সালে 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ' স্থাপিত হয়।

ভারতে ১৯৪৮ সালে শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থার (mixed economy) প্রথম সূচনা হয়। এর আগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অস্ত্র উৎপাদন কারখানা ইত্যাদি ছাড়া উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ছিল না; ১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল জাতীয় সরকার স্বাধীন ভারতের শিল্প-নীতির প্রস্তাব ঘোষণা করে। ঐ শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভূমিকা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন্ কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে তা স্থির করে শিল্পগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। মাত্র ৯টি শিল্পকে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করে অবশিষ্ট শিল্পকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে রাখা হয়। তবে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অগ্রসর হতে হবে, এই নীতিও ঘোষিত হয়।

তারপর ভারতের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ভারতীয় সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি' গৃহীত হয়। তদুপরি ভারত সরকার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের নীতি ও লক্ষ্য গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও সফলভাবে রূপায়িত হয়। তাই পরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৫৬ সালে শিল্পনীতিরও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্য সাধনের জন্যই রচিত হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নভার রাষ্ট্রের এক্তিয়ারে আনা হয়। ১২টি শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে বলে স্থির হয়। অন্যান্য শিল্পগুলি যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রাধীনে রাখা হয় তবুও সরকার ইচ্ছা করলে এ সব ক্ষেত্রেও নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করতে পারবে বলে শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয়। শিল্পগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করার অর্থ এই নয় যে, বেসরকারী শিল্পগুলির প্রতি সরকার কোনো নজরই দেবে না। বস্তুত বেসরকারী শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য, শক্তি সরবরাহ ও পরিবহণের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ছাড়াও সরকার ঐগুলিকে সম্প্রসারণের জন্য উৎসাহ দানের নীতি গ্রহণ করে।

৩১.৯. পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ Expansion of the Public Sector during the Plan Period

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রীয় শিল্প-উদ্যোগের ক্ষেত্র নির্ধারিত এবং বহুবিধ শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচিতে শিল্প-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এইভাবে দেশের শিল্পোন্নতির গতিবেগ দ্রুততর করার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর পড়ায় দেশের শিল্প কাঠামোর ফাঁকগুলি পূরণ করার জন্য সরকার একের পর এক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। রাসায়নিক সার, ইস্পাত, ইলেকট্রনিক্স, মেশিন টুল, খনির যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, বিমান, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ, খনিজ তৈল অনুসন্ধান ও উৎপাদন, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক তার, সংবাদপত্রের কাগজ, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র ইত্যাদি অনেকগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও পুঁজি-ঘন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রে স্থাপিত হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত শুধু কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাগুলির সংখ্যাই প্রথম পরিকল্পনার গোড়াতে ৫টি থেকে বেড়ে ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ ১৭৬টিতে পরিণত হয়। ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে মোট বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ২৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০,০৩৯ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। এই মোট বিনিয়োগের ১৭ শতাংশ ইস্পাত শিল্পে ও ১২'৭ শতাংশ রাসায়নিক শিল্পে খাটছে। এখন ২০টি বৃহত্তম দেশীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ ৩০,০৯৩ কোটি টাকার মধ্যে ২৩,৮৬২ কোটি টাকা যা ৭৯'৫ শতাংশ বিনিয়োজিত ছিল উৎপাদন-

কারী ও বিক্রয়কারী উদ্যোগে। ৫,০৮১'৫ কোটি টাকা বা ১৬'৯ শতাংশ বিনিয়োজিত ছিল সেবা উদ্যোগে। ১,০৭৫ কোটি টাকা বা ৩৬ শতাংশ বিনিয়োজিত ছিল নির্মীয়মান উদ্যোগে।

সারণি ৩১ ১ : ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অগ্রগতি

	১৯৫০-৫১ (শতাংশ)	১৯৬০-৬১ (শতাংশ)	১৯৮২-৮৩ (শতাংশ)
১ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন (GDP) (কোটি টাকা)	৯,৫৫০ (১০০)	১৩,৩৩৫ (১০০)	১,৩৪,০৭৩ (১০০)
(১) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	৭২০ (৮)	১,৪২২ (১১)	৩১,৯৫০ (২৪)
(২) বেসরকারী ক্ষেত্র	৮,৮৩০ (৯২)	১১,৯১৩ (৮৯)	১,০২,১২৩ (৭৬)
২. মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (কোটি টাকা)	৯৫৩ (১০০)	২,৫১৮ (১০০)	৩৭,০৬২ (১০০)
(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	১৬৯ (১৮)	৬০২ (২৪)	৭,৪৩১ (২০)
(খ) বেসরকারী ক্ষেত্র	৭৮৪ (৮২)	১,৯১৬ (৭৬)	২৯,৬৩১ (৮০)
৩. মোট অভ্যন্তরীণ পুঁজিগঠন (কোটি টাকা)	৯৭৫ (১০০)	২,৯৭৯ (১০০)	৪০,৪৩৫ (১০০)
(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	৩০৯ (৩২)	১,৪৭২ (৪৯)	১৯,৮৪৯ (৪৯)
(খ) বেসরকারী ক্ষেত্র	৬৬৬ (৬৮)	১,৫০৭ (৫১)	২০,৫৮৬ (৫১)
৪. মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	—	— (১৯৬০-৬১)	—
(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	২৯	৯৫৩	৩০,০৩৯
(খ) বেসরকারী ক্ষেত্র	—	—	—
৫. মোট কর্মসংস্থান (লক্ষ) (সংগঠিত ক্ষেত্র)	—	১২০'৪৫ (১০০)	২৪০
(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	—	৭০'০৫ (৫৮'১)	১৬৪ ২ (৬৯)
(খ) বেসরকারী ক্ষেত্র	—	৫০'৪০ (৪১'৯)	৭৫'৮ (৩১)
৬. মোট পুঁজি দ্রব্যের পরিমাণ (১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরে) (কোটি টাকা) (capital stock)	—	৬২,৯৬০ (১০০)	(১৯৭৯-৮০) ১,৮৪,৫৬৭ (১০০)
(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	—	১৬,০৭৭ (২৬)	৬৮,৪৭৮ (৩৭)
(খ) বেসরকারী ক্ষেত্র	—	৪৬,৫৮৩ (৭৪)	১,১৬,০৮৯ (৬৩)
৭. মোট কারখানার সংখ্যা (factories)	—	৩৪,০০০	৯৫,১২৬ (১০০)
(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র	—	—	৬,১৫৮ (৬'৫)
(খ) যুক্ত ক্ষেত্র	—	—	১,৫৪৬ (১'৬)
(গ) বেসরকারী ক্ষেত্র	—	—	৭৭,৫৩১ (৮১'৪)
(ঘ) অনির্দিষ্ট	—	—	৯,৯৯১ (১০'৫)

সূত্র : India-Statistical Pocket Book-1983 ; Statistical Outline of India, Tata Services Ltd., 1976 and 1984 ; India-Pocket Book of Economic Information, 1971 ; Public Enterprises in India, Ghosh P. K., Book World ; Journal of Income and Wealth, Vol. 1, No. 2. April 1977, National Accounts Statistics, 1970-71 to 1980-81.

৩১.১০. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা Importance of and the need for the Public Sector

প্রয়োজনীয়তা ও সম্প্রসারণের কারণ : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল : অর্থনীতিক-সামাজিক দায়িত্ব অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করেই রাষ্ট্র জনসাধারণের ন্যায়-সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে পারে। এর দ্বারা উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ জাতীয়করণ বোঝায় না বা কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অপসারণও বোঝায় না। বরং এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনে সমগ্র অর্থনীতির সাথে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের সামঞ্জস্যবিধান বোঝায়।[1]

উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পাঁচটি প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করলে এর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যগুলি হল :

১. অর্থনীতিক উন্নয়নের হার সর্বাধিক করা এবং একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে স্বয়ং নির্ভর উন্নতির পর্যায়ে উপনীত হওয়া।

২ কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধমান সুযোগ সৃষ্টির জন্য অর্থনীতিক বুনিয়াদ রচনা করা এবং জনসাধারণের জীবনমান ও কাজের অবস্থার উন্নতিসাধন করা।

৩ আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো।

৪. বেসরকারী একচেটিয়া করবার এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বন্ধ করা।

৫. সরকারী সঞ্চয়ের সমস্ত সম্ভাব্য খাতগুলি প্রশস্ত ও গভীরতর করা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের **গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা** এইভাবে বর্ণনা করা যায় :

১. রাষ্ট্রের ভূমিকা ছাড়া উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কার্যসূচির রূপায়ণ সম্ভব নয়। শিল্পোন্নয়নের বিপুল কার্যসূচিকে রূপায়ণের মত আর্থিক সম্বল বা ইচ্ছা—কোনোটাই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের নেই।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রধান চালকশক্তি হল মুনাফার আশা, সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির ইচ্ছা নয়। যে ক্ষেত্রে মুনাফার আশা নেই কিংবা থাকলেও সেই মুনাফার পরিমাণ তা স্বল্প অথবা সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ আকৃষ্ট হয় না। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে সুলভ মুনাফার আশাহীন শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচি একমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই গ্রহণ করা সম্ভব।

৩. সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের প্রধান শর্তগুলি হল উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টন, সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে অসাম্য এবং অর্থনীতিক শক্তির কেন্দ্রীভবনের সম্ভাবনা দূর করা ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া এই সকল নীতি কার্যকর করা অসম্ভব।

৪. ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

৫ অর্থনীতিক পরিকল্পনার অন্যতম কাজ হল অগ্রাধিকার বিচার করে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন-সাধন। অর্থনীতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন অর্থনীতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের সমাধান প্রাথমিক কাজ। তারপর অগ্রাধিকার অনুযায়ী কার্যসূচি রচনা করে দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে রূপায়িত করতে হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রে এই প্রকারের অগ্রাধিকার সম্বলিত কার্যসূচি রচনা ও রূপায়ণ অসম্ভব।

৬. ভারতের শিল্পোন্নয়নের অন্যতম দুটি ত্রুটি হল সামঞ্জস্যহীন বিকাশ এবং বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে শিল্পের অত্যধিক কেন্দ্রীভবন। এই দুটিই অতীতের সরকার কর্তৃক অনুসৃত অবাধ-নীতি (laissez-faire) এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ কার্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। তাই বর্তমানে পুরাতন নীতি পরিহার করে এই ত্রুটি দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত হয়েছে। মিশ্র অর্থব্যবস্থা এই দুটি দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. ভারতে আধুনিক কালের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সরকারের সাথে অর্থনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ঐ সকল দেশ থেকে ঋণ, কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা একমাত্র সরকারের পক্ষেই করা সম্ভব; উপরন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পজ্ঞান, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই করা সম্ভব।

৮ রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি বেসরকারী শিল্প ক্ষেত্রকেও উৎসাহিত করে, তার সম্প্রসারণ বাড়ায়। কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্ষেত্রে বর্তমানে বেসরকারী শিল্প-গুলির অপরিহার্য নানা মূল কাঁচামাল (যথা—ইস্পাত, খনিজ আকরিক, কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য) উৎপাদন ও

1. First Five-year Plan : p. 31-39.

সরবরাহ করছে, বিদ্যুৎশক্তির যোগান দিচ্ছে। তা ছাড়া রেলপথের মত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রেল ওয়াগন ও যাত্রীগাড়ি তৈরি বাড়ান হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা ছোট বড় বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প তাতে অর্ডার পায় ও সম্প্রসারিত হতে পারে। অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রেও এই ধারা ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়।

৩১.১১. ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা Role of the Public Sector in the Indian Economy

১ স্বাধীনতালাভের সময় এবং ১৯৪৮ সালে শিল্প-নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণের আগেও ভারতে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ছিল। কিন্তু রেল, পোর্ট ট্রাস্ট, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, বৈদেশিক সংস্করণ, বেতার প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য ১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথ গ্রহণের পর থেকে ভারতের শিল্পায়নে, অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে, জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে রপ্তানির প্রসারের রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রথমাবধি, বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য অর্থনীতির শিখরদেশ (commanding heights of the economy) অধিকার করার ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকেই ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ শুরু হয়। কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংখ্যা ১৯৫১ সালের ৫ থেকে ১৯৬০-৬১ সালে ৪৮ ও ১৯৮২-৮৩ সালে ২০৯ এ পৌঁছায়। বিগত চার দশকের মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র কোন্ স্থানটি অধিকার করেছে তা বিচার করে দেখা যাক। সারণি ৩১-১-এ এ বিষয়ে তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

২. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অংশ : (Share of the public sector in the GDP) : ১৯৫০ ৫১ থেকে ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন চলতি মূল্যস্তরে ৯,৫৫০ কোটি টাকা থেকে ১৪ গুণ বেড়ে ১,৩৪,০৭৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ওই সময়ে ৭২০ কোটি টাকা থেকে ৪৪ গুণ বেড়ে ৩১,৯৫০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। তুলনায় বেসরকারী ক্ষেত্রের উৎপাদন ওই সময়ে ৮,৮৩০ কোটি টাকা থেকে সাড়ে ১১ গুণ বেড়ে ১,০২,১২৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অবদান ১৯৫০-৫১ সালে ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮২-৮৩ সালে ২৪ শতাংশে পরিণত হয়েছে। তুলনায় মোট অভ্যন্তরীণ-উৎপন্নে বেসরকারী ক্ষেত্রের অবদান ওই সময়ে ৯২ শতাংশ থেকে কমে ৭৬ শতাংশ হয়েছে। সুতরাং দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উৎপাদন বেড়েছে এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নের এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন উচ্চতর হারে বেড়েছে এবং বর্তমানে তার অবদান মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশে পরিণত হয়েছে। এটি হল ভারতের অর্থনীতির একটি তাৎপর্যমূলক কাঠামোগত পরিবর্তন। যে কৃষিক্ষেত্র থেকে এখনও জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক উৎপন্ন হয় তা এখনও সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্গত, একথাটি মনে রাখলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের এই অগ্রগতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করতে হবে।

৩. সঞ্চয় ও পুঁজিগঠন (Savings and Capital Formation) : সঞ্চয় ও পুঁজিগঠন ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকাটি লক্ষণীয়। আলোচ্য সময়ে দেশে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী, উভয়ক্ষেত্রের সঞ্চয়ই বেড়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এই সময়ে বেড়েছে প্রায় ৩৯ গুণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সঞ্চয় বেড়েছে ৪৪ গুণ ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সঞ্চয় বেড়েছে প্রায় ৩৮ গুণ। সুতরাং তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধির হারটি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ফলে ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৮২ ৮৩ সালের মধ্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অংশ ১৮ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে প্রায় ২০ শতাংশ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের অংশ ৮২ শতাংশ থেকে সামান্য কমে ৮০ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু পুঁজিগঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অগ্রগতি বেশি হয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট অভ্যন্তরীণ পুঁজি-গঠন ৪১ গুণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৬৪ গুণ ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ৩১ গুণ বেড়েছে এবং মোট পুঁজিগঠনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অংশ ৩২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৯ শতাংশ ও বেসরকারী ক্ষেত্রের অংশ ৬৮ শতাংশ থেকে কমে ৫১ শতাংশ হয়েছে। সুতরাং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভে সক্ষম না হলেও পুঁজিগঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪. মোট পুঁজি দ্রব্যের পরিমাণ (Capital Stock) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কলকারখানার মোট যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম ও হাতিয়ারপাতির মোট পরিমাণই হল মোট দ্রব্যপুঁজির পরিমাণ বা 'Capital Stock'। ১৯৭০-৭১ সালের মূল্যস্তরে (বা স্থির মূল্যস্তরে) ক্যাপিট্যাল

স্টক বা বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে প্রায় ৩ গুণ বেড়েছে ; তার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ক্যাপিট্যাল স্টক বেড়েছে ৪ গুণ ও বেসরকারী ক্ষেত্রের ক্যাপিট্যাল স্টক বেড়েছে আড়াইগুণ। বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় উচ্চতর হারে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পুঁজিদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মোট পুঁজিদ্রব্যের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে পুঁজিদ্রব্যের অনুপাত ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৭ শতাংশ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের অনুপাত ৭৪ শতাংশ থেকে কমে ৬৩ শতাংশ হয়েছে।

৫. **কর্মসংস্থান (Employment) :** ভারতে সমস্ত রকমের কাজে নিযুক্ত মোট কর্মরত ব্যক্তির কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রকে সংগঠিত ক্ষেত্র (organised sector) এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র (unorganised sector), এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বিধিবদ্ধ, রেজিস্ট্রিকৃত এবং কোম্পানিরূপে গঠিত অর্থনৈতিক কর্মে নিযুক্ত সংস্থাগুলিকে নিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রটি গঠিত। বাদবাকি অরেজিস্ট্রিকৃত, পারিবারিক ও একক মালিকানার উদ্যোগগুলি নিয়ে হল অসংগঠিত ক্ষেত্র। বর্তমানে কেবল সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে মোট কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাত্র ১০ শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশ নিযুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা ১৯৬১ সালে ১ কোটি ২১ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৮৩ সালে ২ কোটি ৪০ লক্ষে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৭১ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ হয়েছে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৭৬ লক্ষ হয়েছে। এর ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অবদান ৫৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৮ শতাংশ হয়েছে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অনুপাত ৪১ শতাংশ থেকে কমে ৩২ শতাংশ হয়েছে। বিবিধ ক্ষেত্রে ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শতাংশ হিসাবটি সারণি ৩১-২-এ দেওয়া হল।

৬. **রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রকৃতি ও অবদান (Nature and contribution of the public sector) :** কেবল অভ্যন্তরীণ উৎপন্নে, পুঁজিগঠনে, মোট পুঁজিদ্রব্যের পরিমাণে ও কর্মসংস্থানে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অংশের পরিমাণগত বিচারের দ্বারা দেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকাটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বিষয়ের পরিচয় নেওয়া দরকার। লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, তামা, বিদ্যুৎ, যন্ত্রোৎপাদন, দস্তা, কাগজ ও সংবাদপত্রের কাগজ, তৈল উত্তোলন ও পরিশোধন, রাসায়নিক পদার্থ ও রাসায়নিক সার, প্রভৃতি ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতার ৮০-১০০ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রয়েছে। বিমান ও রেল পরিবহণের ১০০ শতাংশ, জাহাজ পরিবহণের অধিকাংশ, জীবন ও সাধারণ বীমা এবং ব্যাঙ্কিং ও অর্থসংস্থানের প্রায় সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া হোটেল, পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিশেষভাবেই। এই ক্ষেত্রগুলি নিঃসন্দেহে জাতীয় অর্থনীতির একাধারে বুনিয়াদী ক্ষেত্র এবং শিখরদেশও বটে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ভারতের আধুনিক শিল্প ভিত্তিটি দৃঢ় করেছে।

কেবল তাই নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্ষেত্র নিজে যেমন নতুন

সারণি ৩১-২ : রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিবিধ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি

	বিবিধ ক্ষেত্রে	রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের শতাংশ	সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের শতাংশ
১.	কৃষি বন মৎস্য-শিকার	৫'৩	৩১'০
২.	খনি	৯'৭	৫০'৮
৩.	যন্ত্রশক্তির সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন	১৮'১	২৮'৯
৪.	বিদ্যুৎ জল গ্যাস	৭'৮	৯৫'০
৫.	নির্মাণ	১১'৮	৯৪'৫
৬.	পাইকারী খুচরা হোটেল রেস্তোরাঁ	১'৩	৩২'২
৭.	পরিবহণ গুদামজাতকরণ পরিবহণ	২৯'৩	৯৮'২
৮.	অর্থসংস্থান সীমা বিবিধ কারবারী সেবা	১০'৩	৮২'৪
৯	সরকারী প্রশাসন, সমষ্টিগত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৮৩'২	৮৬ ৩
	মোট	১০০	১০০

সূত্র : Economic Survey, 1987-88

নতুন সহায়ক শিল্প স্থাপন করছে তেমনি বেসরকারী শিল্প-ক্ষেত্রকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা ও উৎসাহ দিচ্ছে। ঘড়ি এবং রুটি ও কাপড়ের মতো ভোগ্যপণ্য শিল্পেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রবেশ করেছে।

বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া ভারত শিল্পায়নের পথে বিশেষ অগ্রসর হতে পারত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভারত স্বল্পোন্নত দেশ হয়েও বর্তমানে পৃথিবীতে শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে তার প্রধান কৃতিত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের।

৩১·১২· ভারতের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন শিল্পের মূল্যনীতি Price Policies of the Public Sector Industries in India

ভারতের সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যনীতি প্রবর্তন করতে পারেনি। এমনকি সমস্ত শিল্পে একই প্রকারের মূল্যনীতিও অনুসৃত হয় না। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য নানা প্রকারের অবস্থা বিচার করে মূল্যনীতি স্থির করে। ভারতের সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যনীতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়:

১· **মুনাফা-ভিত্তিক মূল্যনীতি:** ভারতের সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকেই সাধারণভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারতীয় রেলপথ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমন দুটি সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান, যারা নিজ নিজ মুনাফা থেকে রাজকোষে প্রচুর অর্থের যোগান দেয়। সিন্দ্রীর সার কারখানা, হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা এ প্রতিষ্ঠানগুলিরই সম্প্রসারণের জন্য পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়।

২. **"না-মুনাফা না ক্ষতির" মূল্যনীতি:** কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠান না-মুনাফা না-ক্ষতির মূল্যনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন হিন্দুস্থান ইন্‌সেক্‌টিসাইড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপন্ন দ্রব্য এমন মূল্যে বিক্রয় করে যাতে প্রতিষ্ঠানের কোনো মুনাফাও হয় না বা ক্ষতিও হয় না।

৩· **ক্ষতি স্বীকারের মূল্যনীতি:** কতকগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতি স্বীকার করেই তাদের কাজ চালায়। কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার প্রয়োজনে, অথবা দেশের সামাজিক রাজনীতিক ইত্যাদি কয়েকটি দিক বিচার করে এ মূল্যনীতি গ্রহণ করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠান হয়ত সমগ্রভাবে মুনাফা অর্জনের মূল্যনীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানেরই কার্যাবলীর বিশেষ একটি দিকে ক্ষতি স্বীকারের মূল্যনীতি গ্রহণ করা সম্ভব। যেমন, ছোট শহরে অথবা বড় গ্রামে স্টেট ব্যাঙ্কের নতুন শাখা যখন খোলা হয় তখন এই ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবনবীমা জনপ্রিয় করার জন্য জীবনবীমা করপোরেশন 'জনতা' নামে একটি বিশেষ ধরনের বীমাপত্র প্রবর্তন করেছে, সেই 'জনতা' বীমাপত্র ক্ষতি স্বীকারের নীতি দ্বারা চালিত হয়।

৪. **মূল্যহ্রাসের নীতি:** জীবনবীমা করপোরেশন বীমাপত্রের প্রিমিয়ামের হার কমিয়ে জীবনবীমাকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। (বীমাপত্রের প্রিমিয়ামের হার কমান মূল্যহ্রাসেরই নামান্তর।) এই মূল্যহ্রাসের অপর উদ্দেশ্য হল আগের বেসরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যখন সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হয়, ঐ প্রতিষ্ঠান যে দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তা প্রমাণ করা।

৫· **মূল্যবৃদ্ধির নীতি:** সরকারী মালিকানাধীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—ভারতীয় রেলপথ, সরকারী সড়ক পরিবহণ ও ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স্ করপোরেশন ইত্যাদি। এই সব প্রতিষ্ঠান বর্ধিত ব্যয় মেটাতে এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়।

৬· **আমদানী দ্রব্যমূল্যের সাথে সমতার নীতি:** এই নীতি সেই সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই গ্রহণ করে যাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশ থেকে সমজাতীয় আমদানীকৃত দ্রব্যের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডের জাহাজ কারখানায় একখানা জাহাজ নির্মাণ করতে যে খরচ পড়ে, হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ তাদের বিশাখাপত্তনমে নির্মিত সেইরূপ জাহাজও সেই দরেই বিক্রয় করে। যে সব দ্রব্য আগে বিদেশ থেকে আমদানি করা হত কিন্তু বর্তমানে ভারতে প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে সে সব দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব।

৩১.১৩ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভূমিকার মূল্যায়ন Evaluation of the Public Sector

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থাগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। সংসদের এস্টিমেট কমিটি ও পাবলিক আনডারটেকিং কমিটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির প্রধান দোষত্রুটির উল্লেখ করেছে। তা হল:

১· এইসব প্রকল্পের কাজ অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ করতে দেরী হয়েছে। ফলে খরচ বেশি পড়েছে, আশানুরূপ সুবিধা পাওয়া যায়নি এবং আয় সম্পর্কে যে অনুমানের ভিত্তিতে সেগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল তাদের প্রকৃত আয় তার চেয়ে কম হয়েছে।

২· যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কালের মধ্যে যে পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব করতে হবে উৎপাদনের সেই লক্ষ্যটা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয় না। অর্ডারের অভাবে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা হয় না।

৩· উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ সন্তোষজনক নয়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন সামগ্রীর মানও নির্দিষ্ট হয় না।

৪· মূল্যনীতি যুক্তিযুক্ত নয়।

৫· বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

৬· শ্রমিক পিছু বা বিনিয়োজিত প্রতিটি টাকাপিছু উৎপাদনশীলতা কম।

৭· কারখানার সাথে নগরী স্থাপন ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা প্রভৃতির দরুন উপরি খরচ (ওভার-হেড কস্ট) অত্যন্ত বেশি হয়।

৮· কতটা কাজ এবং কি রকম কাজ সম্পাদিত হয়েছে নিরীক্ষার দ্বারা তা যাচাই করা হয় না।

৯· দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা নেই বলে অপচয় ও অপব্যয় হয়। মজুদ করা সামগ্রীর পরিমাণ খুব বেশি হয়, যা প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

১০· কার্যকর পুঁজি ও উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশি। উপযুক্ত পরিমাণে খরচ নিয়ন্ত্রণ (কস্ট্ কনট্রোল), বাজেট নিয়ন্ত্রণ (বাজেটারি কনট্রোল) ও মজুদ-নিয়ন্ত্রণ (ইন-ভেনটারি কনট্রোল) এর ব্যবস্থা নেই। ফলে চলতি ও স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের উপর আয়ের হার অত্যন্ত কম।

১১· বিভিন্ন সংস্থার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি নির্দিষ্ট করা হয়নি; আর্থিক ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বগুলি সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি; কাজকর্মের মূল্যায়নের মাপকাঠি স্থির করা হয়নি; কাজের ফলাফলের দায়িত্ব নির্ধারণের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

১২· সুদক্ষভাবে ব্যয়সঙ্কোচনের সাথে এবং বাণিজ্যিক-ভাবে সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ত্রুটিহীন কাজ চালানোর জন্য সংস্থার মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাগুলির যথাযথ ভারার্পণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

১৩· বিদেশী কারিগরী পরামর্শদাতার ও বিদেশী সহযোগীদের উপর অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করা হয়।

সংসদের এস্টিমেট কমিটি ও পাবলিক আণ্ডারটেকিং কমিটির নির্দেশিত এই সব ত্রুটিগুলি ছাড়া আর যে সাধারণ অভিযোগ করা হয় তা হল:

১৪· রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে বহুক্ষেত্রে লোকসান চলেছে।

বেসরকারী শিল্প ক্ষেত্রের সমর্থকরা শিল্প ক্ষেত্রের কাল্পনিক গুণাবলীর সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের এই সব ত্রুটি-গুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সবই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং সেজন্য সে সব সংস্থা তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি সংস্থাই যে উপরোক্ত সবগুলি দোষে দুষ্ট তা নয়। কিংবা একটি সংস্থার মধ্যেই যে এই সমস্ত ত্রুটিগুলি দেখা গেছে তাও নয়। কিংবা এই দোষত্রুটিগুলি যে দূর করা অসম্ভব কিংবা পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, তা মনে করারও কোনো কারণ নেই। সুতরাং এ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি তাদের কাজকর্মে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এ কথা মনে করার আদৌ কোনো কারণ নেই।

প্রসঙ্গত, বেসরকারী ক্ষেত্রের সমর্থকরা যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগে পঞ্চমুখ, তাদের অবস্থাই বা কী? হিসাবের কারচুপি করে দাম বাড়ানো এবং তার মারফত ভোগীদের শোষণ করা, ভেজাল ও নিম্নমানের জিনিস উৎপাদন করা, কালোবাজারী, কোম্পানির হিসাবে প্রকৃত তথ্য সম্পূর্ণভাবে না দিয়ে মুনাফা কম করে দেখানো, প্রতিযোগিতা বিরোধী নানারকম আচার-আচরণ, মুনাফাখোরী, নিম্নমানের জিনিস ও খারাপ প্যাকিং ও চড়া উৎপাদন খরচের দরুন রপ্তানি বাজার নষ্ট করা, টাকা-পয়সার কারচুপি, শ্রমিক-কর্মীদের সাথে অসদ্ভাব সৃষ্টি করা ও তাদের কাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা ও কম মজুরি দেওয়া, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য না করা ইত্যাদি ভূরি ভূরি অভিযোগ বেসরকারী ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। এবং এসবের মধ্যে সততা যে অনেকখানিই রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এবং এসব ত্রুটির অনেক-গুলি থেকেই যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র মুক্ত তা স্বীকার করতেই হবে।

বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কাজকর্মের মূল্যায়ন করতে গেলে মনে রাখতে হবে: (১) কারবারী ও বাণিজ্যিক নীতি মেনে চলতে হলেও বেসরকারী সংস্থার মত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি কেবল মুনাফা রোজগারের প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হতে পারে না। কম মুনাফার শিল্পেও প্রয়োজন হলে তাকে বিনিয়োগ করতে হয়। (২) উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা-কর্মী সংগ্রহ করার সমস্যা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কম নয়। প্রথম দিকে তাই সরকারী প্রশাসন থেকে তাদের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্মী যোগাড় করতে হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা তাদের কমই ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে অসুবিধা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে

এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটছে। (৩) বেসরকারী সংস্থাগুলির তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মুনাফার হার অবশ্যই কম হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বেসরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে পুঁজিগঠনের হারের তুলনা করি, তাহলে দেখা যায়, বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে পুঁজিগঠনের হার অনেক বেশি। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে পুঁজিগঠনের হার ছিল ৯-১১ শতাংশ অথচ তখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে পুঁজিগঠনের হার ছিল ১৬-১৭ শতাংশ। সুতরাং পুঁজিগঠনের ক্ষেত্রে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কৃতিত্ব বেশি। তবে, এই সংস্থাগুলির অভ্যন্তরীণ উৎস এখনও পুঁজিগঠনের প্রধান নির্ভর হয়ে ওঠেনি। বাইরের উৎস থেকেই প্রধানত এটা হচ্ছে। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির লোকসানের পরিমাণ যেভাবে ক্রমশ কমছে, তার ফলে অচিরেই এদের মুনাফা পুঁজিগঠনের প্রধান উৎসে পরিণত হবে। (৪) দেশের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র একটি শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে কাজ করছে। ইস্পাত, ভারী মেসিন টুল, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ভারী রাসায়নিক পদার্থ, রাসায়নিক সার, খনিজ তৈল অনুসন্ধান ও উত্তোলন এবং প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে গুরুতর অভাব ছিল তা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। (৫) বিদেশী মুদ্রা উপার্জন এবং আমদানি করা দ্রব্যের পরিবর্তে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবন ও ব্যবহারের দ্বারা দেশীয় মুদ্রার সাশ্রয় করছে। (৬) দেশের বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় নতুন শিল্প বিস্তারের দ্বারা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পায়নের ভারসাম্যের অভাব দূর করতে অনেকটা পরিমাণে সফল হয়েছে। (৭) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা দেশে কর্মহীনতার সমস্যার সমাধানে সাহায্য করছে। (৮) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র দেশে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও একচেটিয়া গোষ্ঠীর হাতে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কমাতে সাহায্য করছে। সুতরাং ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ব্যর্থ হয়েছে, একথা বলার যুক্তি নেই। বরং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, প্রাথমিক বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা জয় করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এখন সুনিশ্চিত ভাবেই সাফল্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে; রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বর্তমান সমস্যাগুলি দূর হলে এই অগ্রগতি আরও বাড়বে।

৩১.১৪. রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সমস্যা
Problems of the Public Enterprises

আগামী দিনে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি শিল্পক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে এবং দেশের শিল্পোন্নতির গতিবেগ সৃষ্টির ভার নেবে বলে ভাবা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সংস্থাগুলিই বেশির ভাগ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং তাদের মুনাফা বা উদ্বৃত্ত থেকেই ভবিষ্যৎ শিল্প বিকাশের অর্থসংস্থান হবে বলেও ভাবা হয়েছে।

সুতরাং এই সংস্থাগুলির সাফল্য যদি সুনিশ্চিত করতে হয়, তবে যে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে তা হল: (১) এই সংস্থাগুলির সাথে সরকার ও সংসদের সম্পর্কটি কি হওয়া উচিত; (২) এদের ব্যবস্থাপনা কি ধরনের হওয়া প্রয়োজন; (৩) এদের সাংগঠনিক রূপ কি হওয়া উচিত; (৪) এদের মূল্যনীতি কি হওয়া উচিত; (৫) এসব সংস্থায় শ্রম সম্পর্ক কি ধরনের হওয়া দরকার ইত্যাদি।

১. নিয়ন্ত্রণ: নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তক্ষেপ এক নয়। এখানে নিয়ন্ত্রণ কথাটির অর্থ, একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা তার নির্ধারিত সামাজিক অথবা বাণিজ্যিক লক্ষ্য লাভে কতটা সক্ষম হচ্ছে তা বোঝার জন্য তার কাজকর্মের উপর সর্বদা নজর রাখা। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির উপর এ ধরনের নজর রাখা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে নেই বললেই চলে। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ না থাকার প্রধান কারণ হল, কোন্ সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক রীতিনীতিতে চলবে আর কোন্‌গুলি সামাজিক সেবার নীতিতে চলবে সে সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। অতএব রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির উপর কার্যকরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাছে সরকারের প্রত্যাশা কি তা আগে স্থির করতে হবে। এ বিষয়ে একটি অভিমত হল, যদি কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করতে না হয়, সেক্ষেত্রে তাকে অন্তত পুঁজির সুযোগ-খরচের (opportunity cost) সমান হারে আয় উপার্জন করতে দেওয়া উচিত।

২. সাংগঠনিক রূপ: এদেশে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সাংগঠনিক রূপ বিচার করলে দেখা যায় অধিকাংশই "প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি" রূপে স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮১ সালে দেশে মোট ৮৫১টি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের লিমিটেড কোম্পানি ছিল। তার মধ্যে ৩৫২টি ছিল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ও ৪৯৯টি ছিল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের একক মালিকানার কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১২৯টি।

১৯৫০ সালে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের "প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি" রূপটিই হল উপযোগী। এই ধরনের সরকারী সংস্থার যে সমালোচনা করা হয়েছে তা হল: (১) সংসদের কাছে হিসাব ও

কৈফিয়ত দেবার যে দায়িত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার রয়েছে, কোম্পানিরূপে গঠিত সরকারী সংস্থা তা এড়িয়ে যায়। (২) শেয়ারহোল্ডার ও ব্যবস্থাপকদের সমস্ত কাজই সরকারের উপর ন্যস্ত হয় বলে কোম্পানি আইনের বিধিব্যবস্থাগুলি সরকারী কোম্পানির ক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে পড়ে। (৩) সরকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সভা অনুষ্ঠানেরও কোনো মূল্য থাকে না। কারণ সরকারই তার মুনাফা ঘোষণা এবং পরিচালক পর্ষদ নিয়োগ করে। (৪) "প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি" রূপে গঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে যে পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়, সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার মারফত তা সহজেই ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

৩. **সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ :** রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সংস্থাগুলিতে রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োজিত রয়েছে এবং এই সংস্থাগুলিকে বহুল পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই দু'টি কারণে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি সম্পর্কে সংসদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব, দুই-ই রয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় নীতিটি কাজে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং কিভাবে ও কতটা পরিমাণে তা পালন করা হবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সুস্থ ও সুদক্ষ কার্যকলাপ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এদের উপর নিয়ন্ত্রণের একটি নমনীয় পদ্ধতি সংসদকে অনুসরণ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির প্রকৃতি, তাদের বিকাশের পর্যায় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের ধরন, পরিমাণ ও রূপটি বিভিন্ন রকমের হওয়াই উচিত।

৪ **ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দায়িত্ব :** রাষ্ট্রীয় সংস্থার উপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের প্রধান স্তম্ভ হল সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দায়িত্ব। এজন্য সংসদ সরকারকে নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি দিয়েছে : (১) সংস্থাগুলির পরিচালক সংস্থা নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ; (২) পুঁজি বৃদ্ধি অনুমোদন করা এবং ঋণগ্রহণের ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করা ; (৩) সম্প্রসারণের খরচ মঞ্জুর করা ; (৪) প্রয়োজনবোধে নানা প্রকার নির্দেশ দেওয়া প্রভৃতি। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ, তাদের নীতি নির্ধারণ ও সুদক্ষ কাজকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ব্যাপক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। এ কারণে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সাফল্য-অসাফল্যের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নেওয়া অবশ্যই উচিত।

৫. **ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা (অটোনমি) :** সংসদের এসটিমেট কমিটি লক্ষ্য করেছে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি কম বেশি পরিমাণে সরকারের বিভাগীয় দপ্তরের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। এর দরুন সরকারী লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির উৎপাদনশীলতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে কমিটি মন্তব্য করেছে। কমিটি বলেছে, এই অবস্থা দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় শিল্প সংস্থাগুলিতে দৈনন্দিন কাজ-কর্মে যথেষ্ট স্বাধীনতার সাথে সরকারী নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত ভারসাম্য থাকা দরকার। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির পরিচালকদের স্বাধীনতা ও উদ্যম বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরগুলির হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

৬. **ব্যবস্থাপনার ধাঁচ :** লোকসভার এসটিমেট কমিটির (১৯৫৪-৫৫) মতে সংস্থার আয়তন অনুসারে এক বা একাধিক ম্যানেজিং ডিরেক্টারের উপর ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া উচিত। কৃষ্ণ মেনন কমিটি বলেছেন, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রতিভা, কারিগরী জ্ঞান, বিশিষ্ট ব্যক্তি, শ্রমিক প্রতিনিধি, শ্রমিক কর্মী ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ প্রভৃতিদের নিয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত হওয়া উচিত। সংস্থার কর্মীদের মধ্য থেকেই পরিচালক নিয়োগ করা উচিত। চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি টীমরূপে পরিচালক পর্ষদের কাজ করা উচিত। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস্ কমিটি সুপারিশ করেছিল, পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান হবেন সংস্থার একজন পুরোসময়ের কর্মী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচালক পর্ষদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনস্বার্থে সংস্থার সুস্থ ও ত্রুটিহীন ব্যবস্থাপনা করা। এমন ব্যক্তিদের নিয়ে পর্ষদ গঠিত হওয়া উচিত যেন তাতে জনস্বার্থের প্রতি মনোযোগের সাথে সুদক্ষ বেসরকারী শিল্পপতিদের গুণাবলীর সমন্বয় ঘটে।

১৯৬৮ সালে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাধারণ রীতি হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে একজন করে পুরোসময়ের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার থাকবেন। ধাঁচটা হবে অনেকটা রেলওয়ে বোর্ডের মত। সম্প্রতি সরকার পরিচালক পর্ষদে শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধি গ্রহণের নীতিও কাজে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৭. **শ্রমিক-কর্মী প্রশাসন :** রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আরেকটি সমস্যা, সুশিক্ষিত ব্যবস্থাপনা কর্মীর অভাব। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্য থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রশিক্ষণের এবং ব্যবস্থাপনা কর্মী তৈরীর বন্দোবস্ত করা দরকার। সরকারী বিভাগ ও দপ্তর থেকে আমদানি করা কর্মীদের দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার ব্যবস্থাপনার কাজ চলে না। কিন্তু দীর্ঘকালীন প্রয়োজনের কথা না ভেবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের গরজে কর্মী নেওয়া হয়েছে। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে ভারসাম্য থাকেনি এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লোকও নিয়োগ করা হয়ে গেছে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির স্থির খরচ বা উপরি খরচ ('ওভারহেড কস্ট') বেশি হচ্ছে।

৮. **শ্রমিক সম্পর্ক :** স্বাধীনতা লাভের পর সরকারের মনোভাবটা ছিল, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের কাজের ও বসবাসের ব্যবস্থা হওয়া উচিত কল্যাণরাষ্ট্রের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শ্রমিকদের জ্ঞান ও কুশলতা বৃদ্ধির এমন ব্যবস্থা তাতে থাকবে যেন তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গোড়ার দিকে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট হিন্দুস্থান মেশিন টুলস প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বহু শিল্প নগরী গড়ে তোলা হয়েছিল। শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কার্যকর করার জন্য অনেক সংস্থায় জয়েণ্ট ম্যানেজমেণ্ট কাউন্সিলও গঠন করা হয়: তবে, মজুরি ও ভাতার দিক থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীদের অবস্থা বেসরকারী শিল্প থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়।

শ্রমিক কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে যেসব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ তাদের ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেয় না বা দিতে অযথা দেরী করে। জয়েণ্ট ম্যানেজমেণ্ট কাউন্সিলে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে বিশেষ কোনো 'পরামর্শ' করা হয় না, তাদের শুধু কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলি জানিয়ে দেওয়া হয়। অনেক স্থলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কথা শুনতে ও মানতে ইচ্ছুক হলেও, পরিচালকেরা এবং সরকার তা নাকচ করে দেয়। ব্যবস্থাপনা-কর্মী ও শ্রমিকদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান রয়েছে তাও সন্তোষজনক শ্রমিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে একটি বাধা হয়ে রয়েছে।

৯ **পুঁজিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ :** কৃষ্ণ মেনন কমিটি প্রস্তাব করেছিল, বাছাই করা কতকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পুঁজি আংশিকভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের একটি স্টাডি গ্রুপের সুপারিশ ছিল সিন্দ্রি ফার্টিলাইজার, হিন্দুস্থান মেসিন টুলস ও কয়েকটি রাজ্য পরিবহণ করপোরেশনের পুঁজির ২৫ শতাংশ জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত করে যে বর্তমানে এই প্রস্তাবটি কার্যকর করা সম্ভব নয়।

৩১·১৫ পরিকল্পনাকালে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারী নীতি
Government Policy towards the Private Sector during the Period of Planning

ভারত সরকারের ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি অনুসারে ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতের মিশ্র অর্থনীতিতে তিনটি ক্ষেত্র পাশাপাশি বিরাজ করছে : এক, সরকারী ক্ষেত্র; দুই, বেসরকারী (অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন) ক্ষেত্র; তিন, যুক্ত ক্ষেত্র। ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সরকারী ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের ভূমিকা ও কার্যক্ষেত্রের সীমানা এভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে : একটি ক্ষেত্র কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে; অন্য একটি ক্ষেত্রে সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ উভয়েই পাশাপাশি বিরাজ করবে তবে ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নতুন শিল্প কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই স্থাপিত হবে; এ ছাড়া অপর একটি ক্ষেত্র কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রের এ বিভাজন থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বুনিয়াদী ও ভারী শিল্পের বিকাশের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারী ক্ষেত্রের উপর এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পের বিকাশের দায়িত্ব ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক ও অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, রেলপথ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ, শক্তি উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি বিষয়গুলি সরকারী উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী, বাগিচা শিল্প, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বেশির ভাগ অংশ ইত্যাদি।

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন ভারতের উৎপাদন, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারী ক্ষেত্র কিছু কিছু সেচ-ব্যবস্থা, শক্তি, রেলপথ, বন্দর, ডাক ও তার বিভাগ, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫১ সালের পর থেকে সরকারী ক্ষেত্রের বিপুল সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও ব্যক্তিগত ক্ষেত্র দেশের অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ এবং মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং ভারতের মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের গুরুত্ব যে বিরাট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সম্পর্কে ভারত সরকারের সাধারণ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী কি সেটা নিম্নলিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে।

পরিকল্পনাকালে ব্যক্তিগত (অর্থাৎ বেসরকারী) ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সক্রিয় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বেশ কিছু অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NABARD), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া (IFCI), স্টেট্ ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন সমূহ (SFCs), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া (ICICI), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া (IDBI), এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক (EXIM) ইত্যাদি। এ ছাড়া, পরিকাঠামোর ব্যাপক সম্প্রসারণ, কাঁচামাল সরবরাহ, বিপণন, কৃৎকৌশল উন্নয়ন—প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সহায়তা করার জন্য সরকার বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এ সব সংস্থা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে, নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এবং ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সহায়তা ও সমর্থন করার উল্লিখিত সরকারী ব্যবস্থা ছাড়াও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ও ঐ ক্ষেত্রের কাজকর্ম যাতে সংযম ও নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হয় সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারে একটা বিশেষ ধারণার (এবং তার মধ্যে একটা প্রত্যাশাও রয়েছে) দ্বারাই সরকার পরিচালিত হয়েছে—সেটি হল, পরিকল্পিত মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের জন্য যে ধরনের ও যতটুকু কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে ব্যক্তিগতক্ষেত্র পরিকল্পনার মূল কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে ঠিক সে ধরনের এবং ততটুকু দায়িত্বই পালন করবে—শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের মনোভাবের দ্বারা ঐ ক্ষেত্র পরিচালিত হবে না।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটি পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ কত হবে তা স্থির করে দেয় এবং উৎপাদনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করে দেয়। পরিকল্পনা কমিশন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের জন্য যে ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তিগত ক্ষেত্র যাতে সেই ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে তার জন্যই সরকার নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের ভূমিকা কি হবে সেটা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে। এ আইনে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত উদ্যোগের সম্প্রসারণ ও শিল্পোন্নয়নে বৈচিত্র্য আনয়ন—প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী নীতি নির্দেশ করা হয়েছে। এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল : পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বেসরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ যাতে পরিচালিত হয় সেটা সুনিশ্চিত করা, বেসরকারী উদ্যোগের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে যাতে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্ভব করা যায় তার ব্যবস্থা করা, বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির সংরক্ষণের চেষ্টা করা, মুষ্টিমেয় পরিবারের হাতে অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা এবং যে সব বেসরকারী শিল্প বা কারবারী প্রতিষ্ঠান সরকারী নির্দেশ অমান্য করতে থাকবে অথবা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবে সে সব প্রতিষ্ঠানকে সংযত করা এবং প্রয়োজন হলে সেগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা। বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য সামনে রেখেই সরকার ১৯৫৬ সালে ভারতীয় কোম্পানি আইন (Indian Companies Act) এবং ১৯৬৯ সালে মনোপলি অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস্ অ্যাকট (Monopoly and Restrictive Trade Practices [MRTP] Act) পাস করে। এম. আর. টি পি. অ্যাক্ট অনুসারে যে সব প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূল্য ১০০ কোটি টাকা বা তারও বেশি সে সব প্রতিষ্ঠানকে MRTP কমিশনের নিকট রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হবে। এ সব প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে তাদের সম্প্রসারণ ঘটাতে চাইলে বা নতুন কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্তিকরণে ইচ্ছুক হলে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণ করতে চাইলে এসব করার আগে এদের সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। একচেটিয়া কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে MRTP কমিশনকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারী নীতির আলোচনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিষয়ে ভারত সরকারের শিল্প নীতি প্রস্তাবের (Industrial Policy Resolutions) উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, ভারতের ব্যক্তিগত উৎপাদন ক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাবে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে যে সরকার গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সব সময়েই সাহায্য করে যাবে এবং সে জন্য সরকার বৃহৎ শিল্পগুলির বিশেষ বিশেষ পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে দেবে, বৃহৎ শিল্পগুলির উপর পক্ষপাতিত্বমূলক হারে কর বসাবে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষেত্র সংরক্ষিত করে দেবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকার একদিকে যেমন এ ক্ষেত্রকে নানাভাবে সাহায্য করার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে অন্যদিকে তেমনই একে সংযত ও শাসনে রাখার জন্য

বহুবিধ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছে। তবে দুই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগুলি অন্য ব্যবস্থাগুলি থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, ব্যাপক ও কার্যকর। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সম্পর্কে অদ্যাবধি যতগুলি আইন রচিত হয়েছে তার বেশির ভাগই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত। এমন কি ১৯৫১ সালের যে ইণ্ডাস্ট্রিজ-(ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড রেগুলেশন) আইনটির মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শিল্প বিকাশ, সে আইনটিও পরবর্তী কালে শিল্পবিকাশ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও বিধিনিষেধ ছাড়াও ঐ ক্ষেত্রের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এ সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা সরকার এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে একটা পারস্পরিক আস্থা তথা বোঝাপড়ার অভাব সূচিত করে। এই পারস্পরিক আস্থাহীনতা ভারতের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হবার একটা কারণ হিসাবে গণ্য করা যায়।

তবে আশা ও আশ্বাসের কথা হল অধুনা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারের এত কালের অনুসৃত নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার শিল্প বিকাশে সহায়তামূলক ব্যবস্থার এবং তারই পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থারও যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে এ কারণে যে এটা করতে না পারলে ভারতের শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করা এবং শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি থেকেই সরকার এতকাল শিল্প বিকাশের সরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্য সম্পর্কে যে অনমনীয় মনোভাব পোষণ করত তা সাধারণভাবে পরিত্যাগ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াবার প্রয়োজনে সরকার তার অনুসৃত নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিও পরিবর্তন করেছে। বস্তুতপক্ষে বর্তমানে সরকার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের পক্ষে প্রযোজ্য লাইসেন্স-নীতি ও অন্যান্য নিষেধবিধি শিথিল করা অথবা সম্পূর্ণভাবে রদ করার কথা চিন্তা করছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. "১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশনে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের কর্তব্য বিচার করেছিলেন এবং সংরক্ষণের নতুন নীতি নির্ধারণ করেছিলেন।"—এ বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

["The Indian Fiscal Commission 1949-50 approached their task from a new angle of vision and laid down new principles of protection."—Elucidate the statement.]

২. ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা আলোচনা কর। [C.U. B.Com. (Hons.) 1985]

[Discuss the role of the Public sector in the Indian Economy.]

৩. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতে সরকারী উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের কারণগুলি লেখ। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে কি কি বাধা দেখা যাচ্ছে?

[State the causes of expansion of the public sector enterprises in India during the plan period. What obstacles stand in the way of efficient management of the enterprises?]

৪. পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the problems that the major public sector enterprises in India have been facing during the period of planning.]

৫. ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে কোন্ অর্থে তারা ব্যর্থ হয়েছে তা আলোচনা কর। যদি তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ যোজনাগুলিতে তাদের কি ভূমিকা পালন করতে দেওয়া উচিত?

[If the public sector enterprises are deemed to have failed, explain the nature of their failure. If it is true that these enterprises have failed, indicate the role that should be assigned to them in our future plans.]

৬. ইদানীংকালে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে জয়েণ্ট সেকটরের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

[Examine the role that the joint sector has been performing in recent times in the industrial field of India.]

৭. ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিটি ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার কি কারণে সংশোধন করা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেছিলেন তা বর্ণনা কর। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত বিবৃতিটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা কর।
[C U. B.Com. (Hons.) 1983]

[State the reasons for which the Government of India found it necessary to modify in 1956 its Industrial Policy statement on 1948. Review the main features of Industrial Policy statement of 1956.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১ ব্রিটিশ সরকার ভারতে কবে শিল্প-সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করে ?

[When did the British Government introduce the policy of industrial protection in India ?]

২. স্বাধীন ভারতে কবে নতুন শিল্প সংরক্ষণ নীতি ঘোষিত হয় ?

[When did the Government in independent India declare its new protection policy ?]

সপ্তম খণ্ড

সেবাক্ষেত্রের সমস্যাবলী
PROBLEMS OF THE SERVICE SECTOR

অধ্যায় ৩২ পরিবহণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
৩৩ বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

পরিবহণ ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Transport And Economic Development

পরিবহণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।
ভারতে পরিবহণের বিকাশ ও সমস্যা ঃ
পরিকল্পনাকাল।
ভারতে পরিবহণের প্রকারভেদ।
আলোচ্য প্রশ্নাবলী।

৩২.১. পরিবহণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব
Significance and Importance of Transport

১. যে কোনো দেশের অর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে পরিবহণ হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একারণে মানব সভ্যতার বিকাশে পরিবহণের অবদান, গুরুত্ব ও তাৎপর্য অসীম।

২. **পরিবহণের অর্থনীতিক গুরুত্ব ঃ** পরিবহণ একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক ক্রিয়া (function)। স্থান ও সময়গত উপযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন খরচ কমানো, শ্রমের বিভাগ ও বিশেষিকরণের বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন, বিপণন ব্যবস্থার ও বাজারের সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা দেশবাসীর ভোগের সুযোগ বৃদ্ধি, জীবিকা সৃষ্টি প্রভৃতি হল পরিবহণ ব্যবস্থার সাধারণ অর্থনৈতিক কাজ। এ ছাড়া বিকাশমান দেশের পক্ষে পরিবহণের অতিরিক্ত তাৎপর্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

৩. **অর্থনীতিক উন্নয়নে পরিবহণের গুরুত্ব ঃ** পরিবহণকে বলা হয় জাতীয় অর্থনীতির শিরা-উপশিরা। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে যে অবিরাম উৎপাদন প্রবাহ চলেছে তা দূরে দূরান্তের বাজারের ক্রেতার কাছে উপস্থিত করা এবং ক্রেতার চাহিদার ধরনধারণ পরিমাণ সম্বন্ধে উৎপাদককে জানানো পরিবহণ ও সংসরণের কাজ। তেমনি এদের দ্বারাই দেশের উৎপাদনের বিবিধ উপাদান যথা—শ্রম, পুঁজিদ্রব্য ও কাঁচামাল প্রয়োজনমত বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে আনা ও পাঠানো হয়। সুতরাং, দেশের অর্থনীতিক উন্নতি, কৃষি ও শিল্পের সম্প্রসারণ পরিবহণ ও সংসরণের উপর নির্ভর করে। এর অভাবে বাজার সংকুচিত ও উৎপাদন সীমিত হয়। এগুলির সম্প্রসারণ ছাড়া বাজারের আয়তন বাড়ানো ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা অসম্ভব। বিভিন্ন দেশের পরিবহণ ও সংসরণ কতটা প্রসার লাভ করেছে তার তুলনা করলে তাদের অর্থনীতিক উন্নয়নের স্তর বোঝা যায়।

কিন্তু দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবহণ ও সংসরণের গুরুত্ব আরও বাড়ে। স্বল্পোন্নত দেশে পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা সাধারণত সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পরিবহণ ও সংসরণের সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে পরিবহণ ও সংসরণের বিভ্রাট উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করতে দেয় না। এজন্য অর্থনীতিক উন্নয়নের পরিকল্পনায়

উপযুক্ত পরিমাণে পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে হয়।

তা ছাড়া, যতই উৎপাদন বাড়বে ততই কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর প্রয়োজন হবে। কাঁচামাল ও তৈয়ারী দ্রব্যসামগ্রীর চলাচল বাড়বে। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে জনসাধারণ ক্রমেই অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হবে। লোক চলাচল বাড়বে। দেশের আঞ্চলিক শিল্প সম্প্রসারণে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র সৃষ্টি হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন ঘটবে। সুতরাং, অর্থনীতিক উন্নয়নের সঙ্গে সমতালে পরিবহণ ও সংসরণের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরিবহণ হল জাতীয় অর্থনীতির অন্তকাঠামোর অন্যতম প্রধান অংশ। অন্তর্কাঠামোর সবলতা ও দুর্বলতার উপর জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের হার এবং প্রকৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে।

৪. **পরিবহণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ঃ** পরিবহণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যাতায়াত ও আদানপ্রদানের যোগসূত্ররূপে কাজ করে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা দূর করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে সহায়তা করে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও শান্তির পথ সুগম করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মতাবোধ ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি বাড়ায়। প্রশাসন ও দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে। আপৎকালে জাতীয় সম্পদ, লোকবল ও সম্বল সমাবেশে সহায়তা করে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

৫. এ ছাড়া, পরিবহণ ও সংসরণ জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম ক্ষেত্রও বটে। পুঁজির বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসাবে এদের গুরুত্ব আধুনিক দেশগুলিতে কৃষি ও শিল্প অপেক্ষা কম নয়। ভারতে পরিবহণ ও সংসরণে ১৬ লক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত রয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে জাতীয় আয় ৮,৫০০ কোটি টাকার সেবাকর্মের উৎপাদন এদের দ্বারা হয়েছে।

৬. **পরিকল্পনাকালে পরিবহণের উন্নতির জন্য ব্যয় ঃ**

৩২.২. ভারতে পরিবহণের বিকাশ ও সমস্যা ঃ পরিকল্পনাকাল

Transport Development and Problems in India : Plan Period

১. **পরিকল্পনাকালে পরিবহণের বিকাশ ঃ** অর্থনীতিক অন্তকাঠামোর উপর দেশের অর্থনীতিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল বলে, এবং পরিবহণ ব্যবস্থা দেশের অন্তকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলিতে পরিবহণের উন্নতি ও সম্প্রসারণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। **প্রথম পরিকল্পনায়** পরিবহণ ব্যবস্থার পুনর্বাসনের লক্ষ্যটি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর থেকেই কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির দরুন তৎকালীন দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থার উপর চাপ পড়তে আরম্ভ করে। এজন্য প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিকে পরিবহণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানো হয়। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** ইস্পাত, সিমেণ্ট, কয়লা প্রভৃতি প্রধান শিল্প-গুলির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রেলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সংযোজন স্থাপনের লক্ষ্যও গৃহীত হয়। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** পরিবহণ ব্যবস্থার বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটে কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনীতির সম্প্রসারণ কম হওয়ায় পরিবহণ ক্ষেত্রে অব্যবহৃত ক্ষমতা দেখা দেয়। **চতুর্থ পরিকল্পনায়** অতীত অভিজ্ঞতা থেকে, ভবিষ্যৎ চাহিদার সঠিক হিসাবের ভিত্তিতে পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারণের এবং অব্যবহৃত ক্ষমতা সৃষ্টি এড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রেল ও সড়ক পরিবহণে নানান অসুবিধা এবং স্বল্প অগ্রগতি ঘটে। পরিকল্পনাকালের শেষ দিকে সে সব সমস্যা দূর করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। **পঞ্চম পরিকল্পনাকালে** পরিবহণের সম্প্রসারণ চলতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। **ষষ্ঠ পরিকল্পনায়** পরিবহণ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন লক্ষ্যগুলি নির্ধারিত হয়। তার মধ্যে পরিবহণের বর্তমান অসঙ্গতিগুলি দূর করা, চাহিদা বৃদ্ধির হিসাব অনুযায়ী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা, বর্তমান ব্যবস্থার সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, দূরবর্তী

সারণি ৩২-১ ঃ পরিবহণের জন্য পরিকল্পনাকালে ব্যয় (কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয়	তৃতীয়	বার্ষিক	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম
ব্যয়ের পরিমাণ	৪০৪	১,৩০০	১,৯৮৩	১,০০২	২,৫২২	৬,৪২০	১২.৪১২	২২.৬৪৫
মোট ব্যয়ের শতাংশ	২২.১%	২৩.৩%	২৩.১%	১৫.৬%	১৬.০%	১৩.৮%	১২.৭%	১২.৬%

সূত্র ঃ Report of the National Transport Policy Committee, May, 1980 and Seventh Five Year Plan.

অজন ৭.১ [xviii]

ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির পরিবহণের অসুবিধা দূর করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম থেকে সপ্তম পরিকল্পনা পর্যন্ত পরিবহণের ব্যয়বরাদ্দ বিচার করলে দেখা যায়, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪৩৪ কোটি টাকা থেকে ২২,৬৪৫ কোটি টাকায় পরিণত হলেও, পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে পরিবহণের জন্য ব্যয় ২২'১ থেকে কমে ১২'৬-এ কমে এসেছে।

২. **পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যা:** পরিকল্পনাকালে পরিবহণের যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (ক) জাতীয় আয়, জনসংখ্যা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় উচ্চতর হারে পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে; (খ) গ্রামাঞ্চল, দূরবর্তী অঞ্চলগুলির পরিবহণ প্রয়োজনীয়তার দিকটি অবহেলিত হয়েছে; (গ) কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির এবং প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রগুলির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণসূচি রচিত হয়নি, (ঘ) লৌহপিণ্ড, খাদ্যশস্য, ইস্পাত, সিমেণ্ট ও কয়লা প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান দ্রব্যের রেলমাশুল ভারতে সর্বত্র এক করার যে নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তা সুফল দেয়নি, কি শিল্পোন্নতির দিক থেকে, কি কর্মসংস্থানের দিক থেকে; (ঙ) পরিবহণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি রচনায় কর্মসংস্থানের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি; এবং (চ) রেল সড়ক ও জলপথ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয় ও সংযোজনের বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব পায়নি। এই সব সমস্যা বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিবহণ পলিসি নির্ধারণের জন্য ১৯৭৮ সালে ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্ট পলিসি কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৮০ সালে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে।

৩২.৩. ভারতের পরিবহণের প্রকারভেদ
Different Types of Transport in India

ভারতে চার রকম পরিবহণ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। যথা —১. রেল পরিবহণ। ২ সড়ক পরিবহণ ৩. জলপথ পরিবহণ। এবং ৪. বিমান পারবহণ।

১. **রেলপথ পরিবহণ:** ১৮৪৯ সালে কলকাতার কাছে পরীক্ষামূলকভাবে রেলপথ স্থাপনের পর ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত ২০ মাইল পথে যাত্রী চলাচলের জন্য রেলপথ খোলা হয়। এই তারিখটি ভারতে রেল পরিবহণের জন্মতারিখ বলে গণ্য করা হয়। এর পর থেকে ক্রমাগত রেল পরিবহণের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। দেশভাগের ফলে রেলপথের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়ে ১৯৪৭-৪৮ সালে ২১,২৪০ কিলোমিটারে পরিণত হয়। তারপর থেকে অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে পুনরায় রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটেছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভকালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৫৩,৫৯৬ কিমি। ১৯৮৭-৮৮ সালে তা ৬১,৯৮০ কিলোমিটারে পরিণত হয়েছে।

সরকারী নীতি: (১) প্রথম থেকেই ভারতে রেলপথ স্থাপন ও পরিচালনার ভার ইংলণ্ডে গঠিত ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির হাতে দেওয়া হয়। সে সময় সরকার এদের পুঁজির উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ দেবার গ্যারাণ্টি দেয়। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় রেলপথ সংক্রান্ত সরকারী নীতির পরিবর্তন হয়। ১৮৬৯ সালে সরকার নিজেই রেলপথ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তাতেও সুবিধা না হওয়ায় পরে সংশোধিত আকারে আবার আগের 'গ্যারাণ্টি প্রথা' প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়মে ভারতে রেলপথ স্থাপন ও পরিচালনার তিন প্রকার পদ্ধতি গৃহীত হয়। যথা, সরকারী রেলপথে সরকারী পরিচালনা; সরকারী রেলপথে বেসরকারী কোম্পানি দ্বারা পরিচালনা, এবং বেসরকারী রেলপথ বেসরকারী কোম্পানির দ্বারা পরিচালনা। এভাবে প্রধানত বেসরকারী ব্রিটিশ পুঁজির দ্বারাই ভারতে রেলপথের বিস্তার ঘটে। ১৯০৫ সালে রেলপথের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য রেলওয়ে বোর্ড স্থাপিত হয়।

(২) ১৯২১ সালে নতুন রেলপথ নীতি গ্রহণ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্যার উইলিয়াম অ্যাকওয়ার্থের সভাপতিত্বে একটি সরকারী কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ক্রমে ক্রমে রেলপথের জাতীয়করণের সুপারিশ করে। এই সুপারিশ গৃহীত হয় ও ১৯২৫ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে ভারতীয় রেলপথের জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়।

(৩) বর্তমানে ভারতীয় রেলপথের মালিকানা রাষ্ট্রের। রেলপথ হল ভারতের সর্ববৃহৎ সরকারী উদ্যোগ। এতে প্রায় ১৩,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হয়েছে ও ১৬ লক্ষাধিক ব্যক্তি কাজ করছে। এর সামগ্রিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত রেলওয়ে বোর্ডের উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় রেল পরিবহণ মন্ত্রিদপ্তরের সচিব এর সভাপতি।

(৪) ১৯৪৯ সালে ভারতে ৩৭টি বিভিন্ন রেলপথ ছিল। সামগ্রিকভাবে এদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালনার সুবিধার জন্য ১৯৫১ সালে একটি আইন পাস করে এদের পুনর্গঠন করা হয়। ফলে ভারতের রেলপথগুলিকে ৯টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়:

(ক) দক্ষিণ রেলপথ; (খ) কেন্দ্রীয় রেলপথ; (গ) পশ্চিম রেলপথ; (ঘ) উত্তর রেলপথ; (ঙ) উত্তর-পূর্ব রেলপথ; (চ) পূর্ব রেলপথ; (ছ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ;

(জ) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ ; এবং (ঝ) দক্ষিণ কেন্দ্রীয় রেলপথ।

রেলপথ পুনর্গঠনের ফলে দেশের সর্বত্র যাত্রী ও পণ্য চলাচলে একই হারে মাশুল, যাত্রীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, রেলপথের আর্থিক স্থায়িত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রেলপরিবহণের গুরুত্ব : (১) ভারতের সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে রেলপরিবহণের গুরুত্ব প্রতিদিন বাড়ছে। নতুন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক শিল্পায়ন, গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, শিল্পাঞ্চলে কৃষিজাত কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্যের যথাযথ বণ্টন, শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি, রপ্তানিবন্দরগুলিতে পণ্যের সময়োপযোগী সরবরাহ বৃদ্ধি প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে ভারতের রেলপরিবহণ ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়তা করছে। বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন রেলপথগুলি ১১ হাজার ট্রেন চালাচ্ছে, এক কোটি যাত্রী ও ৬·৫৫ লক্ষ টন পণ্য বহন করছে।

(২) তা ছাড়া ভারতে রেলপরিবহণ দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় কারবারও বটে। এর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫,৫৭২ কোটি টাকা এবং তা থেকে মোট আয়ের পরিমাণ বৎসরে ৩,৫৪০ কোটি টাকার বেশি। রেলের আয় কেন্দ্রীয় বাজেটের এবং পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের অন্যতম উৎস।

(৩) কর্মসংস্থানের দিক দিয়েও ভারতীয় রেলপথের গুরুত্ব কম নয়। বর্তমানে এতে ১৮·৭ লক্ষ ব্যক্তি নিয়মিত কর্মে, ২·৩ লক্ষ সাময়িক কর্মে নিযুক্ত আছে।

(৪) এ ছাড়া রেলপথের সম্প্রসারণ দেশে দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের সুবিধা বৃদ্ধি, জাতীয় সংহতি, প্রশাসনিক ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে।

রেলপরিবহণ ও পরিকল্পনা : ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে পরিকল্পনার ৩৬ বছরে যাত্রী ও পণ্যপরিবহণ বহুগুণ বেড়েছে। পরিকল্পনাকালে নতুন লাইন স্থাপন, ডবল লাইন বসান, রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ ও ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা ট্রেন চালান, যাত্রীগাড়ি ও মালগাড়ি বাড়ান প্রভৃতি উন্নতি হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রেলপথের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে এখনও যথেষ্ট রেলপথ স্থাপিত হয়েছে বলা চলে না।

২. সড়ক পরিবহণ : পথ বা সড়ককে গতির চিহ্ন বলা হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষেও ভারতে মোট সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ৪,৯৮,৩৪৪ কিলোমিটার। ১৯৮৫ সালে কাঁচা ও পাকা মোট সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ১৭,৭০,০০০ কি. মি.। এখন দেশের প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ৪১·৮ কি মি করে সড়ক তৈরী হয়েছে। প্রতি ১ লক্ষ ব্যক্তিপিছু সড়কের দৈর্ঘ্য এখন ২৫১ কিলোমিটার। তুলনায় প্রতি বর্গ কি. মি. অঞ্চলে জাপানে পথের দৈর্ঘ্য ২৭২ কি. মি, ফ্রান্সে ১৪৩ কি. মি, ইংলণ্ডে ১৪৬ কি. মি., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৪ কি. মি.। শুধু দৈর্ঘ্যে নয়; গুণের দিক দিয়েও ভারতের অধিকাংশ সড়কই এখনও পর্যন্ত কাঁচা। পাকা সড়ক অল্প।

সড়ক পরিবহণ গুরুত্ব : ভারতের মত দরিদ্র, অনুন্নত, অথচ বিরাট কৃষি প্রধান দেশে সড়ক পরিবহণ জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে রেলপথের যে সম্প্রসারণ হচ্ছে তা প্রধানত বড় শহর, শিল্পাঞ্চলগুলি বন্দরসমূহকেই সংযুক্ত করেছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের বাসস্থান ও উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র গ্রামাঞ্চলের সামান্যই এতে উপকৃত হয়েছে। সারা দেশে বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, দুর্গম গ্রামগুলির মধ্যে উপযুক্ত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায়, কৃষি ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়, গ্রাম্য জনসাধারণের সচলতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, গ্রাম্য সঞ্চয়ের সংগ্রহ ও উপযুক্ত ব্যবহার, শিক্ষার প্রসার, গ্রামাঞ্চলে শহরের শিল্পজাত পণ্যের বাজার ইত্যাদি সকলেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। সুতরাং, কৃষির পুনর্গঠন, গ্রামীণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, গ্রাম্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারতে সড়ক পরিবহণের যথেষ্ট প্রসার অপরিহার্য। ভারতের বর্তমান প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির পরিবর্তে বাজারনির্ভর কৃষির প্রচলন করতে হলে গ্রামাঞ্চলে সড়ক পরিবহণের সম্প্রসারণ আবশ্যক। সারা দেশে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্য ও সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিস্তার সড়ক পরিবহণের প্রসার ব্যতীত অসম্ভব। এর প্রসার আঞ্চলিক শিল্পায়ন, গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক। রেলপথ পরিবহণ বেশি ব্যয়সাপেক্ষ। তুলনায় স্থানীয় প্রচেষ্টায় অল্প ব্যয়ে সহজেই সড়ক পরিবহণের বিস্তার সম্ভব। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও তুলনায় অল্প। দেশের এমন অনেক দুর্গম অঞ্চল আছে যেখানে রেলপথ স্থাপন অসম্ভব। সেজন্য সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সড়ক পরিবহণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেশরক্ষার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সরকারের সড়ক নীতি : ১৯৪৩ সালের আগে সড়ক সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো দায়িত্ব ছিল না। সড়ক-

গুলি তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের বিষয় ছিল। সড়ক পরিবহণের উন্নয়নের জন্য ১৯৪৩ সালে নাগপুরে ভারত সরকারের উদ্যোগে প্রাদেশিক পূর্তবিভাগের কর্মকর্তাদের এক সম্মেলন আহুত হয়। ঐ সম্মেলনে ১০ বৎসরের জন্য একটি সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। এটি নাগপুর পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

নাগপুর সম্মেলনে ভারতের সড়কগুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ

(ক) জাতীয় সড়ক। (খ) রাজ্য সড়ক। (গ) জেলার প্রধান ও অপ্রধান সড়ক। (ঘ) গ্রামীণ সড়ক।

এই পরিকল্পনায় জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের সম্প্রসারণ ও জেলা এবং গ্রাম্য সড়কগুলির সম্প্রসারণ দ্বারা গ্রাম ও জেলার বিভিন্ন অংশকে জাতীয় ও রাজ্য সড়কের সাথে এবং রেল স্টেশনের সাথে যুক্ত করার কার্যক্রম গৃহীত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কোনো গ্রামই যেন প্রধান সড়ক থেকে ৫ থেকে ২০ মাইলের বেশি দূরে না থাকে। নাগপুর পরিকল্পনায় মোট ৩৭১.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩,৩১,০০০ মাইল সড়ক নির্মাণের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কার্যের জন্য ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

পরিকল্পনাকালে সড়ক নির্মাণঃ প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে (১৯৫০-৫১) সালে ভারতে সড়কসমূহের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৪ লক্ষ কিলোমিটার। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬৬ সালে) তা ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছায়। ১৯৮৫ সালে দেশের মোট সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার। তার মধ্যে পাকা সড়ক কম। কাঁচা রাস্তা বেশি। দেশের প্রায় ৪৪ শতাংশ গ্রাম সড়কের দ্বারা যুক্ত হয়েছে।

সড়ক পরিবহণের সরকারী নীতিঃ সড়ক পরিবহণ সম্পর্কে সরকারী নীতি দুটি। একটি হল, সড়ক পরিবহণের জাতীয়করণ নীতি। অপরটি হল রেল ও সড়ক পরিবহণের সমন্বয় নীতি।

(১) **সড়ক পরিবহণের জাতীয়করণ নীতিঃ** ভারতে বেসরকারী উদ্যোগে মোটর পরিবহণের সূত্রপাত হয়। এদের প্রায় অর্ধেকই ছিল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। পুঁজি অল্প। পরিচালন ব্যয় বেশি। মেরামতি ব্যবস্থার জন্যও বেশি ব্যয় পড়ে। ফলে মোটর পরিবহণের মাশুলও বেশি হয়। তুলনায় বৃহদায়তন মোটর পরিবহণ সংস্থা স্থাপনের দ্বারা কার্যদক্ষতা ও ব্যয়সংকোচ বৃদ্ধি সম্ভব। তাতে মাশুলের হার কমানো ও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও পণ্য পাঠানোর নানা সুবিধা বৃদ্ধি পেতে পারে। নিজস্ব মেরামতি কারখানা প্রতিষ্ঠা করে আরও ব্যয় হ্রাস সম্ভব। এই সকল কারণে ১৯৪৬ সালে বেসরকারী ও রেলপথের অধীন মোটর পরিবহণের সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালের সড়ক পরিবহণ করপোরেশন আইনে রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে রাজ্য সরকারী সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ 'রাজ্য সড়ক পরিবহণ করপোরেশন' স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর থেকে রাজ্যে রাজ্যে পরিবহণ করপোরেশন স্থাপন দ্বারা রাষ্ট্রীয় পরিবহণের প্রসার ঘটেছে। এতে বেসরকারী পরিবহণ প্রতিষ্ঠানগুলির জীবিকাচ্যুত হওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের মত হল যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির একত্রিত হয়ে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে পরিবহণ কার্যের উন্নতির জন্য সমবায় পরিবহণ সমিতি গঠনেও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

(২) **রেল ও সড়ক পরিবহণের সমন্বয়ঃ** অযথা প্রতিযোগিতা দ্বারা রেল ও সড়ক পরিবহণ উভয়ের ব্যয় যাতে না বাড়ে ও আয় না কমে সেজন্য তাদের কার্যাবলীর সমন্বয় প্রয়োজন। তাতে উভয় প্রকার পরিবহণের অপচয় দূর ও উভয়ের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ভারতে ১৯৩০ সালের মধ্যে সড়ক পরিবহণের সঙ্গে রেল পরিবহণের প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং রেল পরিবহণের আয় কমতে থাকে। এই অবস্থায় রেল ও সড়ক পরিবহণের সমন্বয়ের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু উভয় প্রকার পরিবহণের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। অথচ সে সময় তা সম্ভবও ছিল না। সেজন্য ১৯৩৯ সালে মোটরগাড়ি আইন পাস করে সড়ক পরিবহণের নিয়ন্ত্রণ নীতি গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে সরকারী, বেসরকারী ও রেলপথ কর্তৃপক্ষ, এই তিন পক্ষের দ্বারা সম্মিলিতভাবে পরিবহণকার্যের ভার গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে ১৯৪৮ সালে পার্লামেণ্টে সড়ক পরিবহণ করপোরেশন আইন পাস হয়। ১৯৫০ সালে ঐ আইনটির স্থলে পার্লামেণ্ট আরেকটি আইন পাস করার মাধ্যমে রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশন গঠনের পথ প্রস্তুত করা হয়। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ রাজ্যেই রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশন গঠিত হয়েছে। বাকি রাজ্যগুলিতেও এজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

বর্তমানে পরিবহণের চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধি ও মোটরগাড়ি ও জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়া এবং রেল পরিবহণের সমগ্র ও সড়ক পরিবহণের একাংশ রাষ্ট্রীয়করণ হওয়ায় রেল-সড়ক পরিবহণের সঙ্গে তার সমন্বয়ের সমস্যা অনেকটা কমছে। তথাপি সরকার এ সম্পর্কে সচেতন। পরিবহণের

সমন্বয় সম্পর্কে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী নীতির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে পরিবহণ নীতি ও সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। বিভিন্ন প্রকার পরিবহণের মধ্যে সংযোজন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য 'সড়ক উন্নয়ন পরিষদ' স্থাপন করা হয়েছে।

৩. **জলপথ পরিবহণ :** ভারতের জলপথ পরিবহণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ, (খ) সামুদ্রিক পরিবহণ। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

(ক) অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ : ভারতের অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য ৫,২০০ কি. মি.-র বেশি। পূর্বাঞ্চলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখা প্রশাখা, মহানদীর খালসমূহ, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা-গোদাবরী ও তাদের শাখা-প্রশাখা, কেরলের খাল ও সামুদ্রিক খাঁড়িগুলি, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশের বাকিংহাম খাল এবং পশ্চিম উপকূলের খালসমূহই ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ হিসাবে উল্লেখনীয়। দেশের অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বাণিজ্যে এরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের উন্নতির জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়নি। ওই দুটি পরিকল্পনায় এজন্য মোট ১ কোটি টাকারও কম ব্যয় হয়েছে। ১৯৫২ সালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যুক্তভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পরিবহণ সমন্বয় পর্ষদ গঠন করে। এটি বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে গঙ্গার উর্ধ্বভাগে পরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করছে। অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ কমিটির পরামর্শকে ভিত্তি করে অভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের কর্মসূচি প্রণয়ন এবং রূপায়িত করা হচ্ছে।

(খ) সমুদ্র পরিবহণ : ভারতের মতো দেশের পক্ষে দেশীয় সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব রয়েছে। ভারতের নিজস্ব সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থা এখনো কম। অথচ দেশীয় জাহাজের অভাবে বিদেশী জাহাজের দ্বারা পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতে হয় বলে তাতে মাশুল বেশি লাগে। ফলে বিদেশের বাজারে রপ্তানী পণ্যের দাম ও স্বদেশে আমদানী পণ্যের দাম বেশি পড়ে। এতে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা শক্তি কমে। বিদেশী জাহাজের মাশুল দিতে গিয়ে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয়। দেশীয় সমুদ্র পরিবহণের দ্বারা এই সকল অসুবিধা দূর হতে পারে। তা ছাড়া এতে দেশে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বাড়বে।

সরকারী নীতি : ইংরাজ আমলে সরকারের প্রতিকূল নীতির ফলে ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করত। ফলে তাদের অস্তিত্ব কোনো রকমে বজায় ছিল মাত্র। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সরকার দেশীয় সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৪৭ সালেই এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য একটি সমুদ্র পরিবহণ নীতি-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করেন। তা ৫ থেকে ৭ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের পরিবহণ ক্ষমতা ২০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়। ১৯৫০ সালে সরকার ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের জন্য সংরক্ষণের নীতি ও সেজন্য উপযুক্ত কর্মীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ ছাড়া দেশীয় জাহাজী কোম্পানিগুলিকে পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণদান ও সাহায্যের নীতি গ্রহণ করে। সরকারকে সমুদ্র পরিবহণ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য 'জাতীয় সমুদ্র পরিবহণ পর্ষদ' নামে এক স্থায়ী সংস্থা নিযুক্ত হয়েছে। দেশীয় জাহাজী ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ নীতির অনুসরণে সরকারী উদ্যোগে দুটি সমুদ্র পরিবহণ করপোরেশন গঠিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে ভারত-জাপান ও ভারত-অস্ট্রেলিয়া পথে পণ্য পরিবহণ এবং ভারত-সিঙ্গাপুর ও ভারত দক্ষিণ-পূর্ব-আফ্রিকা পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের জন্য ১০ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে ইস্টার্ন শিপিং করপোরেশন স্থাপিত হয়। এটি ভারত-আন্দামান পথেও জাহাজ চালায়। ১৯৫৬ সালে ১০ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে ওয়েস্টার্ন-শিপিং করপোরেশন নামে আর একটি জাহাজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। এটি ভারত-পারস্য উপসাগর, ভারত-লোহিত সমুদ্র, ভারত-পোল্যান্ড ও ভারত-সোভিয়েত দেশ প্রভৃতি জলপথে জাহাজ চালায়।

এ ছাড়া বিশাখাপত্তনম শিপইয়ার্ডের (হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ) উন্নয়ন করা হয়েছে এবং কোচিনে দ্বিতীয় শিপইয়ার্ড স্থাপনের কাজ চলেছে।

(গ) বেসামরিক বিমান পরিবহণ : ১৯১১ সালে কয়েকটি স্থানে বিমান-ভ্রমণ প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আকাশে বিমানের আবির্ভাব সূচিত হলেও ১৯২৭ সালে বেসামরিক বিমানদপ্তর স্থাপনের আগে বেসামরিক বিমান পরিবহণের সূত্রপাত হয়নি। বিমান পরিবহণের প্রকৃত অগ্রগতি আরম্ভ হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। বর্তমানে ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তর ৮৫টি বিমান বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। অধুনা আরও চারটি নতুন বিমান বন্দর নির্মিত হচ্ছে।

সরকারী নীতি : প্রথমে ভারতের বিমান পরিবহণ কাজ অনেকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত

হতে থাকে। কিন্তু তাদের কাজ সন্তোষজনক না হওয়ায়, ব্যয় বেশি পড়ায় ও তীব্র প্রতিযোগিতার দরুন এরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, ১৯৫০ সালে বিমান পরিবহণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য রাজাধ্যক্ষ কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি স্বেচ্ছামূলকভাবে বিমান কোম্পানিগুলির একীকরণের পরামর্শ দেয় এবং বিমান পরিবহণের জাতীয়করণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু কোম্পানিগুলি একীকরণে রাজী না হওয়ায় অবশেষে বিমান পরিবহণের উন্নয়ন ও ব্যয় হ্রাসের জন্য ভারত সরকার সমগ্র বেসরকারী বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করে। ১৯৫৩ সালে পার্লামেণ্টে বিমান পরিবহণ করপোরেশন আইন নামে একটি আইন পাস করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিমান পরিবহণের কাজ পরিচালনায় জন্য দু'টি বিমান পরিবহণ করপোরেশন স্থাপিত হয়। এদের একটি হল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন এবং অপরটি হল ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল। প্রথমটি অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণের ভারপ্রাপ্ত, দ্বিতীয়টি বৈদেশিক বিমান পরিবহণের। বর্তমানে 'বায়ুদূত' নামে আরেকটি অভ্যন্তরীণ বিমান পরিণহণ সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. অর্থনীতিক উন্নয়নে পরিবহণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the importance of transport system in the economic development of a country.]

২. ভারতে রেল ও সড়ক পরিবহণের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain the need for bringing about co-ordination between railway and road transport of India.]

৩. ভারতের মতো একটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে সুদক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the importance of an efficient transport system in the economic development of an underdeveloped country like India.]

[C.U. B.Com, (Hons.) 1984]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. রেল ও সড়ক পরিবহণের সমন্বয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

[Write a short note on rail-road co-ordination.]

বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
Foreign Trade And Economic Development

৩৩.১. বিকাশমান অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
Importance of Foreign Trade in a Developing Economy

১. বিকাশমান স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে তিনটি কারণে দ্রুত গতিতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়ঃ (১) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দেশে তৈরী হয় না বলে, প্রথম দিকে পুঁজিদ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন হয়। এগুলি হল অর্থনীতিক বিকাশের অপরিহার্য আমদানী দ্রব্য (developmental imports)। (২) নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদনের যে ক্ষমতা সৃষ্টি হয় তা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য সাজসরঞ্জাম আমদানিব প্রয়োজন হয়। এদের বলা হয় উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার অপরিহার্য আমদানী দ্রব্য (maintenance imports)। একটা বিকাশমান দেশ যতটা পরিমাণে অর্থনীতিক বিকাশের এবং নব-সৃষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার অপরিহার্য দ্রব্যগুলি আমদানি করতে পারে তার উপর তার বিকাশের হার ও পারধি নির্ভর করে। (৩) শিল্পোন্নয়নের ফলে নানা ধরনের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির দরুন খাদ্য-শস্যসহ ভোগ্যদ্রব্যের যে অভাব দেখা দেয় তাও আমদানি করার প্রয়োজন হয়। এদের আমদানি দেশে মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ দমনে সাহায্য করে। সুতরাং, অর্থনীতিক বিকাশের ফলে বিকাশমান দেশে ওই তিন জাতীয় কারণে আমদানির পরিমাণ দ্রুত বেগে বাড়ে। তার ফলে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দেয় ও এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

২. বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূরে করার জন্য বিকাশমান দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের দ্বারা সাময়িকভাবে সে সংকট কাটলেও শেষ পর্যন্ত বিদেশী দেনা ও আমদানির দাম শোধ করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

৩. অর্থনীতিক বিকাশের আগে, সাবেক কাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলি কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি যে সব দ্রব্য রপ্তানি করত, অর্থনীতিক বিকাশের সাথে সাথে

দেশের প্রয়োজনেই তার অধিকাংশ লেগে যায় বলে সে সব সাবেকী রপ্তানী দ্রব্যের রপ্তানি কমে যায়। তাই তখন নতুন নতুন দ্রব্য রপ্তানি করতে হয়, নতুন বাজার খুঁজতে হয়। উন্নত দেশগুলি তখন যদি উদার আমদানি নীতি গ্রহণ করে তা হলে বিকাশমান দেশগুলির রপ্তানি বাড়তে পারে এবং তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ অক্ষুন্ন থাকতে পারে। এই কারণে, 'সাহায্য নয়, বাণিজ্য চাই' ('Trade, not aid') এই হল বিকাশমান দেশগুলির বর্তমান দাবি।

৩৩.২. স্বাধীনতাপূর্ব যুগে বহির্বাণিজ্য Foreign Trade in the Pre-Independence Period

পরশাসন যুগে ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চরিত্র ছিল ঔপনিবেশিক। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অর্থনৈতিক চিত্র ভারতের স্বাধীনতাপূর্ব যুগের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রবর্তনের প্রথম যুগে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়নি। সে সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে বস্ত্রশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি করতে উৎসাহ দিয়েছে। পরে ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে ধীরে ধীরে নানা উপায়ে ভারতের বস্ত্রশিল্প বিনষ্ট করে এদেশ থেকে ইংলণ্ডে কাঁচামাল রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ধীরে ধীরে ভারতকে সুকৌশলে কৃষিপ্রধান ও কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানিকারী দেশে পরিণত করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট বাড়ে। কিন্তু, ১৯২৯ সালের পর আন্তর্জাতিক মন্দার দরুন ভারতের বহির্বাণিজ্য বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতোমধ্যে ১৯০৫ সাল থেকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় শিল্প স্থাপিত হতে থাকে। ১৯২২-২৩ সাল থেকে বিচার-মূলক সংরক্ষণ নীতির প্রসাদে ভারতের নতুন শিল্পগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতার সমকক্ষ হতে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে বস্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করে এবং নিকট ও দূর প্রাচ্যের বাজারে বস্ত্র রপ্তানি আরম্ভ করে। ১৯৩০-৪০ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে সংকট দেখা দেয়। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হয়ে পড়ে। সে সময় অভ্যন্তরীণ সংকটে বিপর্যস্ত ভারতবাসী সঞ্চিত সোনা বাজারে বিক্রয় আরম্ভ করে। সে সময় ভারতের লেনদেনের ঘাটতি মেটাবার জন্য ঐ সোনা ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হয়। এভাবে ১৯৩০-৩৮ সালের মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ভারতের বাইরে চলে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুগে অবশ্য ভারতের বহির্বাণিজ্যে পরিবর্তন ঘটে। আমদানি সঙ্কুচিত হয়, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি বাড়ে, দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যস্তর বাড়ে। দেশের বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি পায়। লেনদেনের উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। ইংলণ্ডের নিকট ভারতের ১,৭০০ কোটি টাকার স্টার্লিং পাওনা জমে।

এ যুগের বহির্বাণিজ্য বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই :

১. আমদানি ও রপ্তানি—বহির্বাণিজ্যের এই দু'টি ক্ষেত্রেই ইংলণ্ডের স্থান ছিল প্রথম। পরে অবশ্য জাপান, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বহির্বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। তবে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

২. ভারতের ঔপনিবেশিক দেশসুলভ রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য ঐ সময় ছিল প্রাথমিক উৎপন্ন অর্থাৎ কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল। পাট, তুলা, চা, তৈলবীজ, কাঁচা চামড়া এবং পাটজাত ও তুলাজাত দ্রব্যই ছিল কয়েকটি মুষ্টিমেয় উল্লেখযোগ্য রপ্তানী পণ্য।

৩. আমদানী দ্রব্যগুলি প্রধানত ছিল ভোগ্যপণ্য। বস্ত্র, চামড়ার দ্রব্য, কাচের জিনিস, ঘড়ি, খেলনা, মোটর-গাড়ি, সাইকেল, সেলাইকল, কাগজ, কলম, পেনসিল, কালি ইত্যাদি ছিল প্রধান। রপ্তানির তুলনায় আমদানী দ্রব্যের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য ছিল বেশি।

৪. সংকটজনক বৎসর ছাড়া মোটামুটিভাবে এ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হত।

৩৩.৩. স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে বহির্বাণিজ্য Foreign Trade in the Post-Independence Era

১. সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্য : স্বাধীনতালাভ, দেশ-বিভাগ, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতির ফলে ভারতের সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল থেকেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে ঐ পরিবর্তন স্থায়িরূপ ধারণ করে। এই পরিবর্তনগুলি বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন, গতি ও প্রকৃতি সব ক্ষেত্রেই এমন গভীরভাবে ঘটেছে যে এজন্য ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বলা হয়। ভারতের সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যের উপর উন্নয়নমূলক অর্থনীতির স্বাক্ষর প্রতি-ফলিত হয়েছে। আগের ঔপনিবেশিক চরিত্র অনেক পরিমাণে বদলে গেছে।

২. বৈশিষ্ট্য : পরিমাণ ও মূল্য : ১৯৫০-৫১ সাল থেকে আমদানি ও রপ্তানি মিলে মোট বহির্বাণিজ্য, পরিমাণ ও মূল্যের বিচারে অভূতপূর্বরূপে বেড়েছে। ১৯৩৮-৩৯

সালে মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২১ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১,২৫০ কোটি টাকার বেশি। ১৯৮৮-৮৯ সালে তা ৪৮,৪৮৯ কোটি টাকা হয়েছে।

৩. গঠন বা ধাঁচ: (ক) আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, কাঁচাতুলা, কাঁচাপাট, পশম ও অন্যান্য কাঁচামাল, খনিজ তৈল ও অনুরূপ দ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ ও যন্ত্রপাতি এবং পরিবহণের সাজসরঞ্জাম প্রধান। আমদানী বাণিজ্যে খাদ্যদ্রব্যের প্রাধান্য ভারতের খাদ্য ঘাটতির কারণে দেখা দিয়েছিল। ১৯৮৮-৮৯ সালে আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ২৮,১৯৪ কোটি টাকা। (খ) রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে চা, কফি, মরিচ প্রভৃতি খাদ্য-পানীয় জাতীয় দ্রব্য, বিবিধ কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল, সুতীবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, পাকা চামড়া ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য প্রধান। এগুলি হল সাবেকী রপ্তানী দ্রব্য। এ ছাড়া চিনি, কিছু যন্ত্রপাতি ও পরিবহণের সাজসরঞ্জাম এবং রাসায়নিক প্রভৃতি নতুন দ্রব্য রপ্তানী হচ্ছে এবং তা বাড়ছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২০,২৯৫ কোটি টাকা।

৪ প্রকৃতি: আগের আমদানী-রপ্তানী দ্রব্যের সাথে বর্তমান আমদানী-রপ্তানী দ্রব্যগুলির তুলনা করলে সহজেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে মৌলিক পরিবর্তন ধরা পড়ে। আগে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে প্রাধান্য থাকত বিবিধ ভোগ্যপণ্যের। সাম্প্রতিক আমদানী দ্রব্যের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও পরিবহণের সাজসরঞ্জাম, তৈল, লুব্রিক্যান্ট এবং রাসায়নিক সার। এর তাৎপর্য হল, ভোগ্যপণ্যের আমদানি কমে গিয়ে যন্ত্রশিল্পে কাঁচামাল ও পুঁজিদ্রব্যের আমদানি বাড়ছে। অন্যদিকে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে আগে কাঁচামালই ছিল সর্বপ্রধান। বর্তমানে সে স্থান যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করেছে। এর সাথে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানিও আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাথমিক দ্রব্যাদির রপ্তানি কমে গিয়ে সম্পূর্ণ তৈরী বা, অর্ধ-প্রস্তুত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ছে। নিঃসন্দেহে এই ধরনের বহির্বাণিজ্য ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত অর্থনীতির ইঙ্গিত দেয়।

৫. দেশগত দিক: বহির্বাণিজ্যের দিক বলতে কোন্ কোন্ দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি চলে তা বোঝায়। আগের তুলনায় বর্তমান ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বহির্ভূত দেশগুলির সাথে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ছে। এশিয়ার ও আফ্রিকার দেশগুলির সাথে এবং সোভিয়েত সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বিপুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হচ্ছে। রপ্তানী বাণিজ্যে বর্তমান ভারতের খরিদ্দার হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়, ব্রিটেন তৃতীয় ও জাপান চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। এবং আমদানি বাণিজ্যে ভারতের যোগানদার রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, জাপান দ্বিতীয় এবং সোভিয়েত রাশিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

৬. বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত: ভারতের বহির্বাণিজ্যের অপর বৈশিষ্ট্য হল বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি। প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভে ১৯৫০-৫১ সালে বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি ছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে সেটা বেড়ে ৪৭৯ কোটি টাকা হয়। ১৯৭০-৭১ সালে বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত কমে ৯৯ কোটি টাকা হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে অনুকূল বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় (১৬৪'৪৫ কোটি টাকা)। ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘঠেছে ৭,৯০০ কোটি টাকা।

৩৩.৪. ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য
India's Export Trade

সাম্প্রতিক কালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব বেড়েছে এবং এর সম্প্রসারণ দেশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এজন্য এর বৈশিষ্ট্য, রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা, সম্ভাবনা ও এ সম্পর্কে সরকারী নীতি এবং গৃহীত ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

১. বৈশিষ্ট্য: ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিশ্লেষণে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়: **পরিমাণ ও মূল্য:** পরিকল্পনার প্রথম ১০ বৎসর রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ বাড়লেও সেটা প্রায় একই স্তরে ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালে তা ৮০৫ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ১৯৮৮-৮৯ সালে তা ২০,২৯৫ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে।

২. গঠন: রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোটামুটি সাত শ্রেণীর দ্রব্য ভারত বর্তমানে রপ্তানি করছে। গুরুত্ব হিসাবে সেগুলি হল—যন্ত্র-শিল্পজাত দ্রব্য, খাদ্য, পানীয়, কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল, তৈল ও চর্বি, খনিজ ও জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য, চিনি এবং অন্যান্য।

একক দ্রব্য হিসাবে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি প্রথম, চা দ্বিতীয়, চামড়া ও চামড়ার তৈরী সামগ্রী তৃতীয় এবং তুলাজাত বস্ত্র চতুর্থ স্থানের অধিকারী। নতুন রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য, রেশমজাত বস্ত্র, পরিবহণের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্র-শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য এবং কারিগরি শিল্পজাত দ্রব্য (যেমন—মুক্তা, মূল্যবান পাথর, অলঙ্কার) প্রভৃতি বহির্বাণিজ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতির পরিচয় বহন করছে। অবশ্য আগের মতো

কাঁচামাল প্রভৃতি সাবেকী দ্রব্যের রপ্তানি এখনও বন্ধ হয়নি তবে তার পরিমাণ কমছে। এদের মধ্যে লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, তুলা ও অভ্র প্রধান। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে রয়েছে চা, কফি, কাজুবাদাম প্রভৃতি।

৩. **অঞ্চল ও দেশগত দিক :** ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপের বারোয়ারি বাজারে সদস্যদেশগুলি এবং জাপানের সাথে। ভারতের আমদানী বাণিজ্যে এই দেশগুলির অংশ প্রায় ৪৪ শতাংশ। রপ্তানী বাণিজ্যে এই দেশগুলির অংশ ছিল প্রায় ১৩ শতাংশ।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির কাছে ভারতের রপ্তানি বাড়ছে। আমদানী বাণিজ্যেও এই দেশগুলির অংশ বাড়ছে। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের দেশগুলির (জাপান সহ) অংশও বাড়ছে। অন্যদিকে, ভারতের আমদানী বাণিজ্যে এই দেশগুলির অংশ কমছে।

৪. **রপ্তানি বৈচিত্র্য :** রপ্তানী সামগ্রীর বৈচিত্র্যও বেড়েছে। স্বাধীনতালাভের সময় ভারত ৫০ রকমের দ্রব্য রপ্তানি করত। এখন ভারতের রপ্তানী তালিকায় প্রায় ৩ হাজার দ্রব্যসামগ্রীর নাম রয়েছে।

৫. **প্রকৃতি ও সমস্যা :** ভারতের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য যন্ত্র-শিল্পজাত নানাপ্রকার ভোগ্যপণ্যের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। এদের উৎপাদন ব্যয় যেমন তুলনামূলকভাবে অধিক তেমনি বিদেশী বাজারে এদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অন্যদিকে রপ্তানীকৃত কাঁচামালের চাহিদা সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয়। ফলে ভারতকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বেগ পেতে হচ্ছে। এর একটি সমাধান হল যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজি দ্রব্যের রপ্তানি বাড়িয়ে যাওয়া। সেই মতো এ দ্রব্যের রপ্তানি আরম্ভ হয়েছে কিন্তু ভারতের বুনিয়াদী শিল্প এখনও দৃঢ় ভিত্তিতে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পুঁজিদ্রব্যের রপ্তানি কাম্য স্তরে পৌঁছাতে সময় লাগবে।

সারণি ৩৩-১ : ভারতের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য (কোটি টাকায়)

বছর	আমদানি	রপ্তানি	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত
১৯৫১-৫২	৬৫০	৬৪৭	—৩
১৯৮১-৮২	১৩,৮৮৬'৫	৭,৭৬৫'৫	—৬,১২১
১৯৮৫-৮৬	১৭,২৯৭'৭	৯,৫৬২'৭	—৭,৩৮৫
১৯৮৬-৮৭	২০,০৮৪'০	১২,৫৬৭'০	—৭,৫১৭'০
১৯৮৮-৮৯	২৮,১১৪	২০,২১৫	—৭,৮৯৯

সূত্র : Economic Survey, 1951-52 to 1989-90.

সারণি ৩৩-২ : ভারতের আমদানির পরিবর্তনশীল গঠন (শতাংশ রূপে)

দ্রব্য	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৮-৮৯
১. পেট্রল ও লুব্রিক্যান্ট	২৫'৪	১১'৩	১৫'৫
২. পুঁজিদ্রব্য ...	২৩'৪	২৭.২	২৪'০
৩. ভোজ্যতেল ...	৩'৭	৩'১	২.৬
৪. দানাশস্য ও প্রস্তুত খাদ্য ...	০'৬	০'২	২'২
৫. মূল্যবান মণিমুক্তা ...	৫'৬	৭'৫	১১'৩
৬. রাসায়নিক সার ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্য .	৭'৩	৩'৯	৩'৩
৭. লৌহ ইস্পাত	৭'১	৭'২	৬'৯
৮. রাসায়নিক পদার্থ ...	০'৭	০'৬	৬'৯
৯ অলৌহ ধাতু ...	২'৮	২'১	২'৮
১০. অন্যান্য ...	২৫'০	৩৫'০	২৪'০

সূত্র : Economic Survey, 1987-88.

সারণি ৩৩ ৩ : ভারতে আমদানী পণ্যের উৎস (শতাংশ রূপে)

দেশ	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৮-৮৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০'৫	৯'৮	১১'৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন ...	৮'৫	৫'৩	৪.৫
গ্রেট ব্রিটেন ...	৬'৪	৮'১	৮'৫
পশ্চিম জার্মানি ...	৭'৯	৯'৬	৮'৮
পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ...	১২'৪	১৪'৮	১৭'৩
জাপান ...	৯'০	১২'৭	৯'৩
২৭টি ধনতন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার অন্যান্য দেশ (other OECD countries) ...	৭'৪	৯'৪	৫'৫
পেট্রোলিয়াম উৎপাদক সংস্থার সদস্যদেশসমূহ (OPEC) ...	১৭'৪	৮'৮	১৩'৫
পূর্ব ইয়োরোপের দেশসমূহ ...	২'৫	২'২	২'৪
বিকাশমান দেশসমূহ ..	১৭.৬	১৮'৭	১৮'৯
অন্যান্য দেশ ...	০'৪	০'৫	৩'৩

সূত্র : Economic Survey, 1988-89.

সারণি ৩৩-৪ : ভারতের রপ্তানির পরিবর্তনশীল গঠন (শতাংশ হিসাবে)

দ্রব্য	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৮-৮৯
অপরিশোধিত তেল	··· ১'২	০'০	২'৮
মণিমুক্তা জড়োয়া গহনা	··· ১৩'৮	১৬'৫	২১'৭
৮টি গুরুত্বপূর্ণ			
কৃষিভিত্তিক পণ্য	··· ১২'৪	১২'৮	১২'০
তৈরি পোষাক	··· ৯'৮	৯'৭	১০'৩
ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য	··· ৮'২	৭'০	১১'৪
রাসায়নিক	··· ৪'২	৪'৭	৭'৬
লোহ আকরিক	··· ৫'৩	৪'৩	৫'০
চামড়া ও চামড়া			
নির্মিত দ্রব্য	··· ৭'১	৬'৩	৭'৩
মাছ ও মাছের তৈরি দ্রব্য	··· ৩'৮	৩'৮	৩'১
অন্যান্য	··· ৩২'৬	৩৫'৩	১৮'৭

সূত্র : Economic Survey, 1987-88.

সারণি ৩৩-৫ : ভারতের রপ্তানী পণ্যের গন্তব্যস্থল (শতাংশ হিসাবে)

দেশ	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৮-৮৯
গ্রেট ব্রিটেন	··· ৪'৮	৫'৯	৫'৭
পশ্চিম জার্মানি	··· ৪'৭	৫'৯	৬'১
পশ্চিম ইয়োরোপের			
অন্যান্য দেশ	··· ৮'২	১০'৬	১২'৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	··· ১৮'১	১৮'৮	১৮'৪
জাপান	··· ১০'৭	১০'৭	১০'৭
২৭টি ধনতন্ত্রী দেশের			
সংস্থার অন্যান্যরা			
(other OECD			
countries)	··· ৪'৩	৪'৯	৪'৮
সোভিয়েত রাশিয়া	··· ১৮'৪	১৪'৯	১২'৯
পূর্ব ইয়োরোপের			
দেশগুলি	··· ২'৬	৩'৫	৩'৭
তেল উৎপাদক দেশসমূহ	··· ৭'৭	৬'২	৮'০
বিকাশমান দেশসমূহ	··· ১৩'৪	১৫'৩	১৬'৬
অন্যান্য দেশ	··· ৭'১	৩'৩	২'৭

সূত্র : Economic Survey, 1988-89.

৩৩.৫. রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা Need for Export Promotion

১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। পরিকল্পনাকালে এই প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। তার প্রধান কারণ ভারতের অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা অধিক পরিমাণে আমদানি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিযুক্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলি প্রথমাবস্থায় উন্নয়নের মাল মশলা, যন্ত্রপাতি এবং কারিগরী জ্ঞানের আমদানির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই ভারতের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু এর সাথে ভারতে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি আমদানির উপর এই নির্ভরশীলতাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল। তুলনায় ভারতের মোট রপ্তানি প্রায় একই স্তরে থেকে গিয়েছিল। এখন অবশ্য রপ্তানির যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাচ্ছে। তবে আমদানি-রপ্তানির সামগ্রিক বিচারে ঘাটতি এখনও দূর হয়নি। আমদানির তুলনায় রপ্তানি ঘাটতির ফলে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ধারাবাহিকভাবে প্রতিকূলই থেকে যাচ্ছে। এর ফলে ভারতের বিদেশী মুদ্রা তহবিলে বিরাট চাপ পড়েছে। প্রতিকূল অবস্থার সামাল দিতে বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরতা বেড়ে গেছে। কিন্তু এটা স্থায়ী সমাধান নয়। স্থায়ী সমাধান হল রপ্তানি বৃদ্ধি। ক্রমবর্ধমান আমদানির জন্য লেনদেনের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দূর করে অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্যই রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২. **রপ্তানি বৃদ্ধির সমস্যা ও বাধা : (ক) অভ্যন্তরীণ কারণ :** (১) বর্তমানে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির দরুন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা বাড়ছে। ফলে উৎপাদন যা বাড়ছে তার অধিকাংশই দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়ছে না। (২) দেশের মূল্যবৃদ্ধির চাপে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায়, বিদেশে প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য বিক্রয় করা যাচ্ছে না। (৩) ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যগুলি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উৎপন্ন হয় না। মোড়ক বাঁধাইও নিকৃষ্ট ধরনের। এতে ক্রেতারা নিরুৎসাহ হয়। (৪) অত্যধিক রেলভাড়া এবং রপ্তানী শুল্ক রপ্তানি বৃদ্ধির আরেক বাধা।

(খ) বাহ্য কারণ : (১) ভারতের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য মাত্র তিনটি, যথা—পাটজাত দ্রব্য, চা, তুলাবস্ত্র। এদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা রয়েছে। এদের উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় লাভজনক দামে বিক্রয় করে এদের বাজার সম্প্রসারণ করা কঠিন। (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের আমদানি সর্বাধিক। অথচ সে দেশে ভারতের রপ্তানি কম। এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী নীতি দায়ী। ফলে ডলার এলাকার

সাথে বাণিজ্যে ঘাটতি হচ্ছে। এতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে মার্কিন সাহায্য ও ঋণের উপর ভারতের নির্ভরতা বাড়ছে। (৩) বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা প্রবল। কিন্তু ভারত কিছু কিছু পুঁজিদ্রব্য রপ্তানি আরম্ভ করলেও যেহেতু ভারতে ভারী ও মূল শিল্প যথেষ্ট সংখ্যায় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি সে জন্য এর পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। (৪) বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপের বারোয়ারী বাজার-ভুক্ত দেশগুলির আমদানি নীতির ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। (৫) বিভিন্ন দেশে ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্য প্রেরণের ব্যাপারে বিদেশী জাহাজ পরিবহণের উপর নির্ভরতা ও তজ্জন্য চড়া হারে জাহাজ-ভাড়া ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির পথে আর একটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। (৬) বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় বাজারে মার্কিন ডলারের সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দাভাবের দরুন উন্নত দেশগুলির সাথে প্রতি-যোগিতায় সফল হওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি সংকোচন নীতি গ্রহণ করার ফলে এবং অন্যদিকে ব্রিটেনের ইউরোপের বারোয়ারি বাজারে যোগদানের ফলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার স্বল্পোন্নত দেশগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনও (GATT) কোনো নতুন পথ দেখাতে পারেনি। তবে অতি সম্প্রতি ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যে কমে যাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ দেখা দিয়েছে।

৩. **রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা :** পরিকল্পনার শুরু থেকেই রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়াস যথেষ্ট সফল হচ্ছিল না। এর জন্য ভারতের অভ্যন্তরীণ কারণগুলি কিছু পরিমাণে দায়ী হলেও, প্রধানত দায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রাধান্য। সম্প্রতি একটি হিসাবে দেখা গেছে দুনিয়ার সব স্বল্পোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্যে প্রতি বৎসর গড়ে আমদানি ৬ শতাংশ বেড়েছে অথচ রপ্তানি বেড়েছে ৪ শতাংশ হারে। এর কারণ বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সহজেই এ সব দেশে পুঁজিদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্যের রপ্তানি বাড়াচ্ছে, অথচ নিজেরা আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রসাদে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভরতা লাভ করেছে বলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আমদানি কমাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন বা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম হলেও, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সাথে এবং বিশেষত সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া বাংলাদেশেও ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। চীনের সাথে ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে সেখানেও ভারতের পণ্যের নতুন বাজার পাওয়া যাবে। অতএব ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. **রপ্তানি বৃদ্ধির নতুন ক্ষেত্র ও পন্থা :** (১) এই অবস্থায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে দ্রব্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থাব দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ বলেই মনে হয়। (২) বরং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের দেশগত দিকের আরও পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে। ৩) তা ছাড়া, ঐ সকল দেশে পুঁজি দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা থাকায় এই সকল নতুন অঞ্চলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

৫. **রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য গৃহীত সরকারী ব্যবস্থা :** পরিকল্পনাকালের শুরু থেকে ভারত সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বহু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী নীতিকে এক কথায় রপ্তানী প্রসার নীতি বলা যায়।

রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উদার শর্তে ঋণের ব্যবস্থা, নানা ধরনের সাহায্য ও আর্থিক প্রণোদনা সৃষ্টি, পরিবহণের সুবিধা, ট্রেনিং, বিদেশী বাজার সম্পর্কে গবেষণা, কারিগরী সাহায্য ও নতুন সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রপ্তানী শিল্পগুলির প্রয়োজনে বিদেশী কাঁচামাল আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রা যোগানোর ব্যবস্থা, সুবিধাজনক দরে ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা, রেলভাড়া কনসেশন, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা ও অন্যান্য দেশে রপ্তানিকারীরা সচরাচর যে সুবিধা ভোগ করে ভারতের রপ্তানিকারীদের সে সব সুযোগ লাভের ব্যবস্থা।

তা ছাড়া, সমগ্র রপ্তানী বাণিজ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র বলে গণ্য করা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারীদের সুবিধাজনক শর্তে ঋণ দিচ্ছে। উপরন্তু রপ্তানী বীমার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। জাহাজের মাল তোলার আগে ও

পরে রপ্তানিকারীরা এখন কম সুদে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রপ্তানিকারীদের যতটা ঋণ দিচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও আবার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে সেই পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে (ঋণের পুনঃসংস্থান)। ভারতের ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহায়তায় রপ্তানিকারীদের পুঁজিদ্রব্য রপ্তানির জন্য সরাসরি ঋণ দিচ্ছে।

রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৬২ সালে স্থাপিত বোর্ড অব ট্রেড। সংস্থাটি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়ে সর্বদা রপ্তানি উন্নয়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা করছে। বিভিন্ন শিল্পের জন্য এ পর্যন্ত যে ১৯টি রপ্তানি প্রসার পরিষদ গঠিত হয়েছে তাদের কাজকর্মের সমন্বয় করার জন্য ও পথ দেখাবার জন্য তাদের নিয়ে ভারতীয় রপ্তানী সংগঠনগুলির ফেডারেশন নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয়েছে। ছয়টি পণ্যের জন্য ছয়টি পণ্য পর্ষদ গঠিত হয়েছে। রপ্তানী পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য ১৯৬৩ সালের রপ্তানী (উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন) আইন অনুযায়ী একটি রপ্তানী পরিদর্শন পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। রপ্তানী পণ্যের উৎকৃষ্ট ধরনের মোড়ক বাঁধাইয়ের কলাকৌশল সংক্রান্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং স্থাপিত হয়েছে। রপ্তানী বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা প্রভৃতির জন্য ১৯৬৪ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেন ট্রেড স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া, রপ্তানী বাণিজ্যে এক্সপোর্ট হাউস নামক বিশেষ ধরনের রপ্তানী কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারত সরকারের উদ্যোগে ও সাহায্যে ভারতীয় রপ্তানিকারীরা অংশগ্রহণ করছে। রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য-সাধনের জন্য বিভিন্ন দেশে সরকারী ও বেসরকারী বাণিজ্য প্রতিনিধিদল পাঠান হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও অন্যান্য ধরনের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা হচ্ছে। সর্বোপরি, বহির্বাণিজ্যের উন্নতি ও বিশেষত রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বেসরকারী রপ্তানীকারীদের এই ধরনের সাহায্য করার সাথে, রপ্তানী বাণিজ্যে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন স্থাপন করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গঠিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাথে রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার ঘটান এর প্রধান লক্ষ্য।

৩৩.৬. পরিকল্পনা ও বৈদেশিক বাণিজ্য

Planning and Foreign Trade

১. রপ্তানি প্রসারের অগ্রগতি : ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ও কৃষিপ্রধান দেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই ছিল ব্রিটেন ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দেশগুলির সাথে। প্রধান রপ্তানী সামগ্রীর মধ্যে ছিল তুলাবস্ত্র ও পাটজাত দ্রব্য, চা ও মশলার মত কৃষিভিত্তিক পণ্য এবং চামড়া, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের মত কিছু খনিজ কাঁচামাল। আমদানিও প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত দ্রব্যের মধ্যে। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ছিল অনুকূল। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই কাঠামোর ভিতরেই প্রচ্ছন্ন ছিল দেশের শিল্পোৎপাদন এবং উন্নয়নের অবনত স্তরটি।

১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে যে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগ শুরু হল তা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে সমস্ত দিক দিয়ে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় এর সূত্রপাত হয়। বর্তমানে এই পরিবর্তন একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রথম পরিকল্পনায় অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র সর্বপ্রথম যে সুনির্দিষ্ট নীতি গৃহীত হয় তা হল : (১) রপ্তানি বৃদ্ধির উঁচু স্তর বজায় রাখতে হবে ; (২) কেবল জাতীয় স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করা হবে ; এবং (৩) বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতিটি দেশের বিদেশী মুদ্রার সম্বলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পরবর্তী পরিকল্পনাতে এই মূল নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে রপ্তানি প্রসার, আমদানি পরিবর্ত উদ্ভাবন ও ব্যবহারের উপর এবং স্বনির্ভরতার উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে শিল্পপ্রসার ও কৃষির অগ্রগতির এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াটি অবিসংবাদিতরূপেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর পড়েছে এবং তার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন, বৈচিত্র্য-সাধন, দেশগত দিক, বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ইত্যাদি সমস্ত দিকেই মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হারের সাথে যে বৈদেশিক বাণিজ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই উপলব্ধিও নতুন করে ঘটেছে।

২. আমদানি : শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে একের পর এক পরিকল্পনাকালে আমদানির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভকালে আমদানির পরিমাণ (১৯৫০-৫১ সালে) ছিল ৬৫০'২১ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনাকালে প্রতি বৎসর গড়ে ৭২৪ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানি হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পায়নের গতিবেগ বৃদ্ধির দরুন গড়পড়তা বাৎসরিক আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৭২ কোটি টাকা। তৃতীয়

পরিকল্পনাকালে শিল্পায়নের গতিবেগ আরও বৃদ্ধির ফলে, গড়পড়তা বাৎসরিক আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২১০ কোটি টাকারও বেশি। ১৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়নের পর, তৃতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী তিন বৎসরে (১৯৬৬-৬৯) গড়পড়তা বার্ষিক আমদানির পরিমাণ হয় ১,১৯৭ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে গড়পড়তা বার্ষিক আমদানির পরিমাণ হয় ১,৯৬৫ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনার চতুর্থ ও শেষ বৎসরে আমদানির পরিমাণ হয় ৬,০৬৮ কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনার পাঁচ-বৎসরে আমদানি ৮,৭৯০ কোটি টাকা (১৯৭৯-৮০) থেকে বেড়ে ১৩,৮৫০ কোটি টাকায় (১৯৮৪-৮৫ সালে) পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ১৯৮৩ ৮৪ সালেই আমদানির পরিমাণ ১৫,000 কোটি টাকায় পৌঁছায়। সপ্তম পরিকল্পনায় বাৎসরিক গড় আমদানির পরিমাণ যেখানে ১৯,০৮০ কোটি টাকা হবে ব'লে অনুমান করা হয়েছিল সেখানে ১৯৮৮ ৮৯ সালে আমদানির পরিমাণ হয় ২৮,১৯৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকে সপ্তম পরিকল্পনার শেষ বৎসর পর্যন্ত ৩৯ বৎসরে ভারতের বার্ষিক আমদানির পরিমাণ প্রায় ৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ রকম অবিশ্বাস্য বৃদ্ধির কারণ হল: (১) শিল্পবিকাশের গতিবেগ বৃদ্ধির দরুন শিল্পের কাঁচামাল ও সাজসরঞ্জাম আমদানি বৃদ্ধি; (২) তা ছাড়া রয়েছে খাদ্য আমদানি; (৩) অতি সম্প্রতিকালে আমদানির অঙ্ক বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি ও তেল সংকটের দরুন আমদানী পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি।

গত ৪০ বৎসর ধরে ভারত সরকারের আমদানী নীতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম পরিকল্পনা কালের "আমদানির বিচারমূলক উদারীকরণ" নীতি থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে কঠোর আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতির পর, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষদিকে শিল্পের বিশেষ করে রপ্তানী শিল্পের, অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে উদার আমদানী নীতি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু অন্যান্য আমদানির উপর কঠোর বিধিনিষেধ বজায় থাকে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার দ্বিতীয় বারের অবমূল্যায়নের পর রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আমদানি খানিকটা উদার করা হয়। তারপর থেকে শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৫৯টি শিল্পকে অগ্রাধিকারযুক্ত শিল্প বলে ঘোষণা করে এদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সাজসরঞ্জাম আমদানির উদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরে এই শিল্পগুলির অনুরূপ দ্রব্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকেও একই সুবিধা দেওয়া হয়। আমদানি পদ্ধতিরও সরলীকরণ করা হয়। বর্তমান আমদানী নীতিতেও রপ্তানী শিল্পসহ বিবিধ শিল্পের কাঁচামাল, পুঁজিদ্রব্য এবং সাজসরঞ্জাম আমদানির উদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চাদপদ অঞ্চলের শিল্পগুলির জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

৩. **রপ্তানি প্রসার:** আমদানি যত বেড়েছে, এই ৪০ বৎসরে রপ্তানি কিন্তু ততটা বাড়েনি। প্রথম পরিকল্পনাকালে রপ্তানি বৃদ্ধি কিছুই হয়নি বলা যায়। তখন বাৎসরিক গড়পড়তা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬২০ কোটি টাকার স্তরে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলেও বাৎসরিক গড়পড়তা রপ্তানির স্তর একই থেকে যায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সে স্তর পার হয়ে বাৎসরিক গড়পড়তা রপ্তানির পরিমাণ ৭৬০ কোটি টাকার স্তরে পৌঁছায়। তৃতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী তিন বৎসরে তা ১,২০০ কোটি টাকার সীমা পার হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বাৎসরিক গড়পড়তা রপ্তানির পরিমাণ হয় ১,৮০০ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনার চতুর্থ ও শেষ বৎসরে রপ্তানির পরিমাণ হয় ৫,৩৭৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ সমগ্র পরিকল্পনাকালে বাৎসরিক গড়পড়তা রপ্তানির পরিমাণও বেড়ে প্রায় নয় গুণ হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে অনুমান করা হয় ১৯৭৯ ৮০ সালের ৬,৪২০ কোটি টাকার রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৯,৮৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। কিন্তু ১৯৮৩-৮৪ সালেই রপ্তানির পরিমাণ ১০ ০০০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। সপ্তম পরিকল্পনায় বাৎসরিক গড় রপ্তানির পরিমাণ ১২.১৪০ কোটি টাকা হবে ব'লে হিসাব করা হয়েছিল বটে তবে ঐ পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে রপ্তানির পরিমাণ ২০,২৯৫ কোটি টাকায় পৌঁছায়।

মোট রপ্তানি বাড়লেও রপ্তানি বৃদ্ধির হার কিন্তু দেশের উন্নয়ন হারের মতই অস্থির রয়েছে। পরিকল্পনার প্রথম দশকে সামান্য হারে রপ্তানি বৃদ্ধির পর পরিকল্পনার দ্বিতীয় দশকে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি বাড়ে ৭ শতাংশ হারে। তৃতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী তিন বৎসরে সে হারটি আবার কমে যায়। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর ৭ শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির হয়েছিল। বাস্তবে, চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে রপ্তানি বৃদ্ধির গড়পড়তা বার্ষিক হার হয়েছে ১২ ৪ শতাংশ। পঞ্চম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের রপ্তানি বৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি। তবে, রপ্তানির ক্ষেত্রে এত দিনের বাধা যে অনেকটা দূর করা গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সপ্তম পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ঐ বছর রপ্তানির পরিমাণ ২০,২৯৫ কোটি টাকায় পৌঁছায়। কিন্তু এ নিয়ে আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। পঞ্চম পরিকল্পনায় বাস্তবসম্মতভাবেই রপ্তানি বৃদ্ধির বার্ষিক

হার ৭'৬ শতাংশ বলে ধরা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে রপ্তানি বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ৯ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান দেশের তুলনায় ভারতের রপ্তানির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে ব্রিটেনের রপ্তানি হল ২১%, পশ্চিম জার্মানীর ২৫%, জাপানের ২০%, আর ভারতের রপ্তানি হল জাতীয় আয়ের ১৪% মাত্র।

রপ্তানী নীতির মূলকথা হল রপ্তানি প্রসার। রপ্তানী শিল্পগুলিকে দেশের অগ্রাধিকারযুক্ত শিল্প বলে গণ্য করা হয়েছে। এজন্য আর যে সব পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে তা হল: (ক) রপ্তানির বৈচিত্র্যসাধন; (খ) বাজারের বৈচিত্র্যসাধন; (গ) রপ্তানী শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি; (ঘ) রপ্তানী পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও মোড়ক বাঁধাইয়ের উন্নয়ন; (ঙ) উৎপাদন খরচ হ্রাস; (চ) রপ্তানী শিল্পগুলিকে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহের উদ্দেশ্যে উদার আমদানী নীতি গ্রহণ; (ছ) আমদানী শুল্কে ছাড় ও রপ্তানী শুল্ক হ্রাস বা ক্ষেত্র-বিশেষে প্রত্যাহার; (জ) আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রার ব্যবস্থা করা; (ঝ) যে সব রপ্তানী শিল্প নানান সুযোগ-সুবিধা এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না তাদের দণ্ডবিধান; এবং (ঞ) রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টি।

আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রতি বৎসর নতুন করে স্থির করা হচ্ছে এবং একটি এক্সপোর্ট ইমপোর্ট পলিসি কমিটির উপর এ-কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

৪. **বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত:** পরিকল্পিত উন্নয়ন আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্তও বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় গড়পড়তা বার্ষিক প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১০৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা ৫৭৫'৪ কোটি টাকায় ওঠে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বার্ষিক গড়পড়তা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ৭০২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পরবর্তী তিন বৎসর বার্ষিক গড়পড়তা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত প্রায় একই থাকে (৭৬৫ কোটি টাকা)। চতুর্থ পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে চতুর্থ বৎসরেই অনেক দিন পরে সর্ব-প্রথম বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা দেয় (১০০'৪ কোটি টাকা)। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক বলে প্রমাণিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর এবং পঞ্চম বৎসরেও বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটে। বার্ষিক গড়পড়তা হিসাবে চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রতিকূল উদ্বৃত্ত কমে এসে ১৬৩'৭ কোটি টাকা হয়। কিন্তু পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ বছরে (১৯৭৮-৭৯ সালে) প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেড়ে ১,৮৪২ কোটি টাকায় ওঠে। ১৯৭৯-৮০ সালে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বেড়ে ২,৩৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অনুমান করা হয়েছিল প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ১৯৮৪-৮৫ সালে ৩,৯৭২ কোটি টাকায় পৌঁছুবে। সপ্তম পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মোট পরিমাণ ৩৪,৭০০ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ এই অঙ্ককে ছাড়িয়ে গেছে।

পরিকল্পনাকালে ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের কারণ হল, প্রধানত, অর্থনীতিক বিকাশের তাগিদে আমদানি যে হারে বাড়ছে সে তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধির হারটি কম। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল সমস্যাই এখন হল আমদানি বৃদ্ধির হারের তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধির হারটি বাড়ানো। আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি প্রসার নীতির দ্বারা অবশ্য চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছিল এবং এমন কি এক বৎসর অনুকূল উদ্বৃত্তও হয়েছিল। তবু এ লড়াই এখনও শেষ হয়নি। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক তৈল সংকট আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের আমদানির অঙ্কটা বিশেষভাবেই বেড়ে গেছে।

প্রতিকূল বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের ঘাটতিও ঘটেছে এবং বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উপর দারুণ চাপ থেকে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিদেশী ঋণের কিস্তি শোধের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। সুতরাং, বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করার এবং বিদেশী ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার প্রয়োজনে রপ্তানি বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই প্রয়োজনগুলি মেটানোর স্থায়ী পন্থা হল রপ্তানী বাণিজ্যের আরও সম্প্রসারণ। শিল্প বিকাশের প্রয়োজনে অত্যাবশ্যকীয় আমদানির দাম মেটাতে, দেশের অদৃশ্য আমদানির দাম শোধ করতে এবং বিদেশী ঋণের কিস্তি শোধের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের একমাত্র পথ হল রপ্তানি বৃদ্ধি। তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে অর্থনীতিক উন্নয়নের গতিবেগ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। এই কারণে রপ্তানি প্রসার এখন দেশের অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে এবং তৎসহ রপ্তানি প্রসারের চেষ্টায় পরিকল্পনাকালের গত ৪০ বৎসরে রপ্তানী পণ্যের বৈচিত্র্যসাধন এবং রপ্তানী বাজারের বৈচিত্র্যসাধনও ঘটেছে [এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

৩৩.৭. ভারত সরকারের বাণিজ্য নীতি Commercial Policy of the Government of India

১. **প্রাক স্বাধীনতাকাল :** ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের ব্রিটিশ সরকার দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ অবহেলা করে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে। ১৯২৩ সালে বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি গৃহীত হয়। তার ফলে কয়েকটি ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য তাদের প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৩২ সালে কানাডার অটোয়া শহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির একটি সম্মেলনে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে শুল্কগত সুবিধা দেওয়ার নামে তাদের সামান্য কিছু এবং ব্রিটেনকে বিপুল সুবিধা দিয়ে একটি পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। এটি 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স' বা 'অটোয়া চুক্তি' নামে পরিচিত। ১৯২৯-৩৩ সালের অর্থনীতিক মন্দার আঘাতে ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, এই চুক্তির দ্বারা সেই সংকটের বোঝা ব্রিটেন তার উপনিবেশগুলির উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে। ভারতের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলেও ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঐ চুক্তি বলবৎ থাকে এবং সেটা সংশোধনের নামে ১৯৩৯ সালে একটি ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই চুক্তির দ্বারা বাস্তবিকপক্ষে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সকেই রক্ষা করা হয়।

২. **স্বাধীনতার যুগ :** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের নাম পরিবর্তন করে কমনওয়েলথ প্রেফারেন্স করা হয়। ভারতসহ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সব দেশেই ঐ চুক্তিটি বলবৎ থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারত সহ ২০টি দেশ জেনেভাতে, একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মহা-সম্মেলনে মিলিত হয়ে শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ চুক্তি নামে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করে (General Agreement on Tariffs and Trade or GATT)। তার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি পরস্পরকে বাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত সুবিধা দেয়। ভারতের রপ্তানী পণ্যের ৫০ শতাংশ এই সকল সুবিধা ভোগ করে। চুক্তিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রতি বৎসর GATT সদস্যদের বৈঠক বসে ও তাতে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়। এই চুক্তি সংস্থার পক্ষ থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বার্থে তাদের আমদানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করার জন্য 'কোটা' প্রথা চালু করার এবং উন্নত দেশগুলিতে তাদের রপ্তানির উপর শুল্ক কমাবার সুপারিশ করা হয়। উন্নত দেশগুলি এখন এই অনুরোধ কিছুটা মেনে নিয়েছে। ফলে, অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের সাথে ভারতও এই ব্যবস্থায় উন্নত দেশ-গুলি থেকে আমদানির 'কোটা' চালু করে আমদানি সীমাবদ্ধ করায় এবং ঐ দেশগুলিতে চা, পাট, কফি এবং যন্ত্রশিল্প-জাত নানান দ্রব্য রপ্তানিতে শুল্কগত সুবিধা পেয়েছে। ১৯৬৭ সালে জেনেভাতে বিকাশমান ও উন্নত দেশগুলির মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদনুযায়ী ৫০% শুল্ক হ্রাস করতে সম্মত হয়। এর ফলে ভারত বিশেষভাবে উপকৃত হবে। ব্রিটেন ইউরোপের বারোয়ারি বাজারে প্রবেশ করায় কমনওয়েলথের দেশগুলি থেকে বিনা শুল্কে কিন্তু সীমাবদ্ধ পরিমাণে যে আমদানি করত তার পরিবর্তে ঐ সকল আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করেছে। ব্রিটেন বারোয়ারি বাজারের সদস্য হওয়ায় কার্যত কমনওয়েলথ প্রেফারেন্স ব্যবস্থারও অবসান ঘটেছে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১. ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিচার কর। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার সাম্প্রতিক কালে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

[Examine the need for promoting India's exports. What measures in recent times has the Government of India taken to increase the volume of exports from India?]

২. ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ধাঁচ ও দিকের প্রধান পরিবর্তনগুলি বর্ণনা কর।

[Indicate the major changes that have taken place in the pattern and direction of India's foreign trade since 1947.]

৩. ভারতের রপ্তানি প্রসারের পথে যে সকল বাধা দেখা দিচ্ছে তা নির্দেশ কর। সম্প্রতি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি আলোচনা কর।

[Indicate the obstacles that impede the growth of Indian exports. Discuss the measures that have been taken to increase the volume of export from India.]

৪. ভারতের বর্তমান বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন ও দেশগত দিকের আলোচনা কর। (ক) রপ্তানি ও (খ) আমদানি সম্পর্কে সংক্ষেপে ভারত সরকারের বর্তমান নীতিটি বর্ণনা কর।

[Discuss the composition and countrywise

direction of India's export trade. Describe, in brief, the present policy of the Government of India in regard to (a) exports and (b) imports.]

৫. ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কালে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Describe the main features of India's foreign trade. Give a brief account of the measures that have been adopted to effect an increase in India's export.]

৬. সম্প্রতিকালে ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা আলোচনা কর। এই ব্যবস্থাগুলি কতটা পরিমাণে সফল হয়েছে?

[C.U. B.A. Pass (III) '85]

[Discuss the measures taken in recent years to promote India's exports. To what extent have these measures been successful ?]

৭ ভারত সরকারের বাণিজ্য নীতি বর্ণনা কর।

[Discuss the commercial policy of the Government of India]

৮. ভারতের পরিকল্পনাগুলি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তা ব্যাখ্যা কর।

[Explain how India's five-year plans have influenced India's foreign trade.]

৯. পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বর্ণনা কর।

[Describe the changes that have taken place in the composition of India's foreign trade during the period of planning.]

১০. আধুনিককালে ভারতের বাণিজ্যিক আয় বৃদ্ধির কারণগুলি নির্দেশ কর।

[What are the causes of the recent rise in India's export earnings ?]

১১. ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির পথে বাধাগুলি নির্দেশ কর। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা আলোচনা কর।

[C.U. B.Com. (Hons.) 1984]

[Indicate the obstacles that impede the growth of export from India. Discuss the measures that have been taken to increase the volume of Indian exports.]

১২. স্বাধীনতার পরবর্তীযুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা নির্দেশ কর। এই পরিবর্তনের তাৎপর্য কি ? [C.U. B.A. (III) 1984]

[Indicate the chahges that have taken place in the composition of India's foreign trade since independence. What do these changes signify ?]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য আমদানী দ্রব্য বলতে কি বোঝায় ?

[What is meant by development imports ?]

২. উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার অপরিহার্য আমদানী দ্রব্য বলতে কি বোঝায় ?

[What do you mean by maintenance imports ?]

৩. ভারতের কয়েকটি সাবেকী রপ্তানী দ্রব্যের নাম কর।

[Name some traditional items of India's exports ?]

৪. নিম্নলিখিত দ্রব্যের কোন্‌গুলি ভারতের রপ্তানী তালিকায় স্থান পায় ?

চিনি, কেরোসিন, ভোজ্য তৈল, লৌহ আকরিক, দিয়াশলাই।

[Which of the following commodities appear on the list of India's exports ?

Sugar, kerosene, vegetable oil, iron ore, matches.]

৫. পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় এমন দু'টি রপ্তানী দ্রব্যের নাম কর।

[Mention two items of export that are produced in West Bengal.]

৬. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) কি ?

[What is GATT ?]

কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, বিদ্যাসাগর ও রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের
কলা ও বাণিজ্য স্নাতক বিভাগের
অর্থনীতির পাঠক্রম

SYLLABUS : ECONOMICS

CALCUTTA UNIVERSITY

B.COM. (HONOURS)

Compulsory Papers : Economic Problems of India (100 Marks)

1. Evaluation of the Indian Economy—Economics of Underdevelopment and the Indian Economy—National Income Analysis.

2. Economic Problems relating to Indian Population, Agriculture, Co-operation, Industry, Labour, Banking & Currency, Trade, Transport and Public Finance.

3 Current Economic Problems of India.

B.A. (PASS)

Paper II : Economic Development and India's Five Year Plans (100 Marks)

1. General factors in economic development :

Organization of production growths. Natural resources. Capital accumulation, Specialization, division of labour, large-scale production. Efficiency in the use of resources. Technological progress.

2. Approaches to the theory of development :

The 'stages' of economic growth. The 'classical' theory. Labour surplus theories. Obstacles to growth. Self-sustaining and self-limiting aspects of growth. The problem of getting started.

3. Growth and underdeveloped countries :

The meaning of underdevelopment. The case for planning. Obstacles to development ; Issues in development policy-raising the rate of investment ; sources of capital—domestic and foreign ; balanced or unbalanced growth ; population, unemployment and choice of techniques.

4. Planned economic Development in India : a broad over-view :

Rationale of planning in India. Over-all objectives of the five year plans. Sectoral allocations of public investments. Achievements of each five year plan. Lessons of planning experience.

5. Indian National Income—trends and structure, since 1951 :

Growth of national income and per capita income. Contribution on different sectors in income generation. Consumption and saving.

Distribution on national income : Inequality and poverty in India.

6. Employment aspect of Indian Plans :

Unemployment in India : Nature, causes and remedies, Policies regarding population and unemployment.

7. Government's industrial policy since Independence :

The industrial policy resolutions. Role of the public sector. Policies regarding foreign capital. Policies regarding monopoly and small-scale industries. Policies regarding foreign capital. Policies regarding imbalances. Protection of Indian industries.

8. Financing the Plans :

Sources of Plan finance. Role of direct and indirect taxes, loans, deficit financing, foreign aid, etc.

9. Trade and balance of payments during the plan period :

The foreign exchange problem. The nature and causes of imbalances in the balance of payments of India during the plan period. Government policies regarding imports, exports and exchange rates.

Paper III : Economic Problems of India (100 Marks)

1. Human and natural resources :

Size and growth rate of population. Occupational structure. Land resources and their utilization. Major crops. Water resources and methods of irrigation. Mineral resources. Power resources—power crisis in India.

2. Agricultural Problems :

Place of agriculture in the national economy—importance of increasing productivity in agriculture. Agricultural productivity—causes of low productivity. Land reforms—abolition of intermediaries ; ceilings on land holdings ; co-operative farming. Organisation of rural credit. Progress of agriculture since 1951. Scientific farming and the green revolution.

3. Industrial Problems :

Industrial structure—changes during the plan period. Traditional and small-scale industries : importance and problems ; institution for their development. Financing large-scale industries : methods and institutions.

4. Labour Problems :

Industrial disputes : causes and methods of settlements. The trade union movement and its problems. Social security for industrial workers. Problems of agricultural labourers. Minimum wages.

5. Monetary system and monetary policy :

Commercial banking in India : Objectives of nationalization ; trends since nationalization. Reserve Bank of India : functions ; methods note issue and credit control. Causes of inflation and recession during the plan period. Monetary policy during the plan period.

6. Foreign Trade :

Changes in the pattern and direction of Indian's exports and imports. Trends in India's balance of payments and foreign exchange reserves since independence.

7. Public Finance :

Centre-state financial relations. Revenues and expenditures of the Central Government (a brief description). Revenue and expenditure of the West Bengal Government.

BURDWAN UNIVERSITY

B.COM. (PASS)

Paper II : Resources and Economic Planning (100 Marks)

1. Resource : Meaning and basic factors—factors that create resource, Nature, man and culture—Physical environment and cultural adjustment—Resource conscious flow resources and fund resources.

2. Resource and nature : Nature's paradoxes : Natural endowment—its distribution and mans economic activities.

3. Energy : Animate and inanimate—Economics significance of inanimate energy —its superiority—use of energy.

4. Land : Definition—dimensional concepts—limitations cultivability.

5. Human. Resources : Man as means and ends—demographic distributions—modern demographic pattern—pressure of population vis-a-vis carrying capacity of land.

6. Conservation of Resources—Concept, needs and features.

7. Planning Economic Development : Meaning of Economic Planning—Need for planning in underdeveloped countries—prerequisites for successful Planning—Socio-psychological factors in Planning. Planning under Socialism and Capitalism, Planning in a mixed economy.

8. The problems of the less developed countries : Meaning of economic under-development—Characteristics of an underdeveloped economy—the vicious circle of poverty. The obstacle to development. Basic requirement for economic development. Economic and non-economic factors in development.

9. Some Issues in planning in relation to resources : Industry Vs. Agriculture, Labour-Intensive Vs. Capital-Intensive Technology, Small Industry Vs. Big Industry.

Paper III : Economic Development of India (100 Marks)

1. India as a developing economy—its basic-features. Planning—need for planning in Ind a—Basic features of India's Five Year Plans.

2. National Income : Estimates of National Income in India—Sectoral and per capita distribution and concentration of Income.

3. Primary Sector : Principal food and non-food crops in India. Needs and actual production—General policy under Five year plans relating to Land reforms and agriculture.

Farming—Methods of farming—needs for Co-operative farming—its problems and prospects—mechanised farming—its viability in India.

Agricultural labour : Features and Problems of agricultural labour in India.

Rural Finance and Marketing : Problems of rural credit—Role of SBI, Co-operative Banks and Agricultural Banks—Agricultural marketing—Problems and Government Policy—Regulated Market and State Trading.

4. Industry : Infra-structural facilities—power and transport, Problems and prospects of major Indian industries, namely, Jute, Tea, Cotton Textile, Iron and Steel Fertilisers.

Industrial Labour : Features of Trade Unionism in India—Collective bargaining.

5. Foreign Trade : Composition and direction.

6. Allocation of revenue between the Centre and the States.

B.A. (HONOURS)

Paper IV : Economic Problems of India since Independence and Planning (100 Marks)

1. **India's National Income and National Wealth :**

National income and per capita income—Method of national income estimates—

Trends in national income during the plans—Limitations of national income estimation in India—Estimates of tangible wealth in India.

2. Pattern of Income Distribution in India and Pattern of Consumption :

Inequality of personal income distribution—Mahalanobis Committee and NCAER finding—Reasons for unequal distribution—Consumption pattern and poverty.

3. Human Resources and Economic Development :

Demographic transition during the growth process—Size and growth rate of population in India—Density of population—Urbanization and economic growth—Government's Population policy—Appraisal of the Family Planning Programme.

4. Changes in the Occupational Structure :

Working population and changes in the occupational structure—Census of 1971—Government policy of changing the occupational structure.

5. The Problem of Capital Formation :

Various estimates of physical capital formation—Saving and Investment—Mobilisation of Savings in India—Human Capital formation—Capital formation during the plan period.

6. Productivity Trends in Agriculture :

Importance of agriculture in economic development—Productivity trends—Land productivity—Labour productivity—Causes for low productivity—Problems ahead.

7. Land Reforms :

The need for land reform in a developing economy—The abolition of intermediaries—Tenancy reforms—Ceiling on land holdings—Land Redistribution Schemes.

8. Size of Farms :

Economic holding—Size Patterns of holdings in India—Causes of Small Size holdings—The Problem of sub-division and fragmentation of holdings—Co-operative Farming—Kind of Co-operative Farming—Co-operative Joint Farming and Collective Farming—A critical estimate of Co-operative Farming in India—Appraisal of land reform policy—Land Reform and the Fifth Plan.

9. The Food Policy of the Government of India :

Why a food policy ? Take over of food-grains trade—Food Policy of 1974—Factors affecting food-grains prices—Measures to solve the food problem.

10. Marketable Surplus and Development :

Marketable Surplus and Marketed surplus—Measurement of marketed surplus—causes for the low marketable surplus in India—The Price Responsiveness of supply of marketable surplus—Measures to increase the marketable surplus.

11. Organization of Rural Credit in India :

Nature of the Credit requirements of Indian farmers—Sources of Credit—Money-lenders—Co-operative Credit Societies—Land Development Banks—Reserve Bank of India and Rural Credit—Nationalised Banks and Rural Finance—The role of the Government.

12. Agricultural Taxation in India :

Present position of agricultural taxation—Tax burden on Indian agriculture—Additional taxation of agriculture and Raj Committee's proposals.

13. New Strategy in Indian Agriculture :

New Strategy and its effect—HYV. Programme under the new strategy—Criticism of HYV Programme—Green Revolution and Agricultural labourers—Does the strategy of intensive agricultural development lead to optimisation of the benefits from the package of agricultural inputs ?

14. Mechanisation of Indian Agriculture :

The case for mechanisation—The case against mechanisation—Agricultural productivity and the choice of technique.

15. Industrial Policy after Independence.

Industrial Policy of 1948—Evaluation of the policy—Industries (Development and Regulation) Act of 1951—Industrial Policy of 1956 and its evaluation—Few Industrial Policy of 1978—The concept of Joint-sector.

16. Industrial Licensing Policy :

Why a change in the Industrial Licensing Policy—Hazari Committee's and Dutta Committee's Recommendations—the classification of sectors—The concept of Joint-sector—Merits and weaknesses of the new licensing policy—Industrialists view of the new policy—Why the Private Sector and Big units have not much to fear—Industrial Licensing Policy of 1978 and the Fifth Plan.

17. The Role of Small-scale Enterprises in India's Economic Development :

Why small-scale enterprises—the employment argument—the equality argument—the latent resources argument—the decentralization argument. Difficulties of small-scale industries and the measures to remove them—Allocation of Raw materials, imported components and equipment—credit and finance—Technical assistance—Industrial Estates—Village and small industries in the plans.

18. Industrial Finance :

Financing of small-scale and medium-sized industries—finance of large-scale industries —institutions like IFC, SIDC, ICICI, IDBI, Unit Trust of India, etc.—Critical examination of their role.

19. Unemployment and Surplus Labour :

Unemployment and manpower utilisation—nature of Indian unemployment—unemployment in the Rural sector—unemployment in the Urban sector—estimates and causes of unemployment—solution measures—Employment programmes under the fourth and fifth plans —The Bhagavati Committee on unemployment—The requirements of an employment policy formulation—plan statements on unemployment and non-attainment of employment goals—problem of skill formation.

20. Industrial Labour and its Problems :

Characteristics of industrial labour—Trends in Money and real wages of industrial labour—Trade Union Movement—Measures to strengthen the movement Industrial disputes in India—Industrial disputes Act of 1947 as amended in 1956—Social security measures—Labour and wage policy of the Government—Labour policy evolved during the Second Plan—Workers' participation and Joint Management Councils—Workers' education scheme—Government policy regarding Trade Unions—Government policy regarding wages—Recommendations of the National Commission on Labour.

21. The Role of Foreign Capital in India's Development Planning :

Pattern of foreign investment in India—Government's policy towards foreign capital—foreign collaboration in Indian industries—Merits and defects of Private Foreign Capital—External Assistance and the Five Year Plans.

22. The Foreign Trade of India :

Foreign trade and development—Foreign trade during the post-independence period—composition of India's foreign trade—Direction of India's foreign trade.

23. India's Balance of Payments :

Balance of payments on current account in the post-independence period—Trade Policy and India's Balance of Payments—Import policy-Export policy—Devaluation of June 1966—Balance of payments in the Fourth and Fifth Five Year Plans.

24. Commercial Banking in India :

Indigeneous banking—Recent trends of Commercial banking—Social Control of Banks Nationalisation of Commercial Banks—Its rationale—Its evaluation. Report of the Banking Commission of 1972—Lead Bank Scheme—Rural Banks.

25. The Reserve Bank of India :

The Reserve Bank of India and the Indian Money Market—Monetary Policy of the RBI—The RBI and the bill market scheme.

26. Prices, Price Policy and Development :

Price movements after independence—Causes of the rise in prices since 1950-51—Price policy of the government—Price policy in a developing economy.

27. Economic Concentration and Monopoly Capital in India :

Concentration of economic power in India—Growth of Monopoly Capital—Measures to check economic concentration and Monopoly Capital—Report of the Monopoly Inquiry Commission—Ceiling on urban property.

28. Indian Public Finance :

The Central and State Governments budget—Trends in taxation and public expenditure in recent years—India's public debt—Fiscal policy in India—deficit financing—Recommendations of the Wanchoo Committee.

29. Fiscal Relations between the Centre and the States :

Financial relations under the constitution—The finance commissions—Centre-State conflict on finances.

30. Public Sector and Indian Planning :

Evolution of the public sector in India—Role of the public sector—Causes for the expansion of public enterprises—Prices policy in public enterprises—profitability of public sector undertakings—shortcomings of the public sector.

31. Poverty and the Planning Process in India :

The concept of poverty—Different studies of the poverty of India—Trend of per capita private consumption expenditure—the Five Year Plans and Antipoverty programme—its failure to remove poverty—poverty eradication programme and its basic pre-requisites—A reorientation of agricultural relations—elimination of inflation and the spiralling rise of prices—poverty eradication programme in the fifth plan.

32. A General Review of India's Five-Year Plans :

Plan objectives—Conflict of objectives—strategy—financial resources—plan performance—Rolling Plan and plan prospects.

B.A. (PASS)

Paper II : Group B—Economic Development (40 Marks)

1. General factors in economic development :

Organisation of production—Population growth—Natural resources—Capital accumulation,—Specialisation, Division of Labour, Large-scale production—Efficiency in the use of resources—Technological Progress.

2. The Problems of the less developed countries :

Meaning of economic underdevelopment—The demand for development—The obstacles to development—The Scale of possible development—The key issue—Role of foreign assistance.

3. Approaches to the Theory of Development :

The 'Stages' of Economic growth—The 'Classical' theory—Labour Surplus Theories—a general framework—Self-sustaining and Self-limiting aspects of growth—Industrial Revolution, Take-off, Big push.

Paper III : Indian Economic Problems since Independence (100 Marks)

1. Basic characteristics of the Indian Economy as an underdeveloped economy—A general discussion of the causes of economic backwardness of India.

2. India's National Income :

Estimates of national income—the problems of estimation—Growth and Distribution of national income—the concept of poverty.

3. Human Resources and the problem of population :

Size and growth rate of population in India—the density of population—Is the size of population a helpful or a retarding factor in India's economic development ? Family Planning progamme.

4. Land Reform :

A. The concept and scope of land reform—the Abolition of Intermediaries—Tenancy reforms—ceiling on land holding.

B. Size pattern of holding in India—causes of small size holdings—the problem of subdivision and fragmentation of holdings.

C. Co-operative Farming in India.

5. Agricultural Labour :

Causes of the poor economic condition of agricultural labour in India—Government measures in regard to agricultural labour—Agricultural labour and minimum wages.

6. Rural Credit in India :

Sources of Credit—The Banking System and the provision of rural credit.

7. Small-scale Enterprises :

Definition of Small-scale and Cottage Industries—The role of small enterprises in Indian Economy—Policies for removing the difficulties of these enterprises.

8. **Basic problems facing some selected large-scale industries :**

(a) The Jute Industry, (b) Tea Industry, (c) Iron and Steel Industry.

9. The Problems of Industrial Finance :

Different financial institutions for the provision of short and long term capital for industries—IFC, SFC, IDBI, ICICI—An evaluation of their role.

10. Industrial Policy of the Government :

Main features of the industrial policy of the Government—Industrial Licensing Policy —Foreign Capital—Foreign Aid and Foreign collaboration in Industry.

Measures to check economic concentration and the growth of Monopoly Capital in India.

11. Industrial Labour and Trade Union Movement :

Characteristics of Industrial labour—Trade Unions and their activities—causes of labour unrest in India—Methods for the settlement of industrial disputes—Labour and Wage policy of the Government.

12. The Foreign Trade of India :

Composition of India's Foreign Trade—Changes in the direction of India's foreign trade.

13. The Reserve Bank of India :

Indian money market and the RBI—Monetary Policy of the RBI.

14. Price Movements Since Independence :

Causes of the rise in prices—The measures to control price rise—How far the measures are effective.

15. India's Five Year Plans :

An outline, objectives and financial resources.

16. The Five Year Plans and Economic Progress in India.

NORTH BENGAL UNIVERSITY

B.COM. (PASS & HONS.)

Paper II : Economic Problems of India (100 Marks)

1. Economic underdevelopment—

Basic features of the Indian Economy as an underdeveloped economy—causes of economic backwardness of India.

2. Growth and welfare Indicators—Growth of national income—Distribution of income and economic opportunities—composition of national output—decrease of welfare in polluted environmental conditions.

3. Population Growth and Employment—Pressure and effects—causes of unemployment—employment in Five Year Plans.

4. Agriculture—Causes of low productivity—size of farms co-operation and agriculture—agricultural marketing—agriculture in Five Year Plans.

5. Industry and labour—Heavy and light industries in Five Year Plans—small-scale industries problems, present position and future prospects of Iron and Steel, Sugar, Cotton—

Textile and Jute Industries—Problems of Trade Union Movement in recent Years (Since 1970) —Industrial disputes—collective bargaining and machinery for settling Industrial disputes— —Industrial Policy since 1970.

6. Trade and Balance of Payment—Direction and composition of India's foreign trade since 1970—Balancing of payment since 1970—Change in the external value of the rupee.

7. Money and Banking—Credit control policy of the Reserve Bank of India since 1970—Industrial finance for small, medium and large-scale industries—working of the IFCI and SFCs.

8. Fiscal Policies and Taxation—Financial relations between the centre and the states—constitutional provisions and recommendations of the last two Finance Commisions—Sources of revenue and items of expenditure of the Government of India and the Government of West Bengal.

9. Planning and five year plans—controls in Plans with reference to price control, exchange control and licensing policies—financing of the Plans—taxation —Public borrowings —deficit financing—surpluses of public enterprises—foreign capital and external assistance—detailed critique of the recent Five Year Plan.

B.A. (PASS)

Paper III : Indian Economics (100 Marks)

1. Introducing Indian Economy—Nature of underdeveloped Economy with special reference to India.

2. Trend of National Income during the Plan Period.

3. Agriculture—Causes of Low Productivity ; Land Tenure system. Agricultural Finance ; Co-operative Farming.

4. Industry—Industrial Policy Resolution ; Industrial Finance—IFC ; SFC ; IDBI ; Concentration of Economic Power in Indian Industries.

5. Role of Cottage and Small-scale Industries in Indian Economy ; Problems of Small-scale and Cottage Industries ; Government Policy towards small-scale and Cottage Industries.

6. Labour—Trade Unionism in India. Present position and future prospects. Social security measures.

7. Causes of Price Rise during the Plan Period and means to combat it.

8. Foreign Trade—Composition and direction of Foreign Trade ; Balance of Payments Problem during the Plan Period. Government measures to solve the balance of payments crisis.

9. Fiscal and Monetary policies—changes in Tax structure during the Plan period, Deficit Financing during the plan period. Reserve Bank of India's Monetary Policy during the plan period. Centre-State Financial relations.

10. Objectives and achievements of India's Five Year Plans with reference to the last two plans.

VIDYASAGAR UNIVERSITY

B.COM. (HONOURS)

Paper VIII : Economic Problems of India, including Farm Economics (Marks—100)

GROUP—A

Economic Problems of India Marks—50

1. Economics of under-developed and the Indian Economy. Need for planning basic features of Five-year Plans.
2. National Income—Estimates of National Income—National Income Analysis.
3. Economic problems relating to Indian population, Agriculture, Co-operation, Industry, Labour, Banking, Currency, Trade and Transport and Public Finance.
4. Current Economic Problems of India.
5. Problems of Public-sector undertakings.

GROUP—B

Farm Economics Marks—50

1. Nature and scope of Farm Economics—Relative importance of Farming in developed and under-developed economics—Farming in a Developing Economy. Demand for farm products—Production and supply—Returns to scale—Land utilisation. Crop-rotation and Production—Animal Husbandry and Irrigation.

   Farm Management : Principles and Practice—Location of Production and Regional Specialisation.
2. Finance : Long-term and short-term needs of the Farmers—Agencies of Supply —Regulation of Rural Credit—Debt Redemption—Co-operative credit—Role of the State.
3. Marketing : Marketing Institutions—Regulated Markets—Forward Trading and Hedging—Warehousing—State Trading.
4. Agricultural Prices and Incomes : Causes of Instability—Parity Prices and Stabilisation measures—Taxation of Agricultural land Incomes.
5. Agricultural Labour : Employment—Wages—Conditions of work Non-Farm employment—Rural Industries.
6. Agricultural Organisation : Peasant Farming—Collectivised Agricultural—Estate Farming—Plantation—International Agencies—International Commodity Agreements.

B.A. (PASS)

Paper—II **(Marks—100)**

1. Meaning of Under-Development and Development. Role of Capital in Development. Capital and Saving. Role of Finance in Development. Role of Technology in Development. Choice of Techniques. Role of Foreign Trade and Foreign Capital in Development. Assessment of Foreign Aid Programmes in Under-developed Countries.

(12 lectures+4 tutorials)

2. **Problems of Rural Development.** Land Tenure and Land Reforms Rural Society—Characteristic Features and Influence on Economic development. Need for Rural Industrialisation. Policies for Rural Industrialisation. (12 lectures+4 tutorials)

3. Rural Finance. Advantages of Co-operative Credit. State and Rural Finance. Commercial Banks and Rural Finance. (8 lectures+3 tutorials)

4. Co-operative farming. Advantages and shortcomings of Farm Co-operatives. Management Problems of Co-operative Farms. (6 lectures+2 tutorials)

5. Development of Rural Infra-structure, Transport, Communications, Energy Sources, Irrigation. Role of the State. Co-operation for Infra-structure Development. (6 lectures+2 tutorials)

6. **Agricultural Development in Japan.** Role of the State in Agricultural Development. Rural Industry in Japan. Land Reforms in Japan in the post-World War II Period—Effects on Rural Development. (5 lectures+2 tutorials)

7. **Agricultural Development in China** since 1949. Systems of Land Use in Rural China. Rural Industry in China.

8. **Agriculture in the Soviet Union.** Organisation of Agriculture in collective and State Farms. Agricultural Productivity in the Soviet system. (6 lectures+2 tutorials)

9. **Agriculture in the United States of America** Historical Development in the pre-1914 period and post-war period. (6 lectures+2 tutorials)

10. **Agriculture in the United Kingdom.** Agricultural Revolution of the pre-1800 period. State Aid to Agriculture in UK. (6 lectures+2 tutorials)

11. **Programmes of Rural Reconstruction in India.** Constructive Programme of Mahatma Gandhi. Village Reconstruction—the Sreeniketan Experiment of Rabindranath Tagore. Community Development Programme and National Extension Service. Integrated Rural Development Programme. Employment Programmes for Small and Marginal Farmers. (10 lectures+3 tutorials)

12. Surveys of Rural Employment Pattern and Consumer Expenditure Pattern. National Sample Survey Rounds. Major Findings of Rural Surveys. (6 lectures+2 tutorials)

Economic Development with special Reference to Rural Development Policies.

Paper III : Economic Problems of India (Marks—100)

1. Background :

A brief outline of the economic condition of the country on the eve of Independence—Impact of British rule.

Features of Economic Structure of an underdeveloped country with reference in India.

2. Planned economic development in India a broad over-view. Rationale of planning in India. Over-all objectives of five year plans. Scheme of financing the plans with special reference to deficit financing. Sectoral allocation of public sector investment. Review of economic performance under the plans. Trend of increase of NI and per capita income during the plans. (12 lectures+3 tutorials)

3. Natural and human resources :

Land resources and their utilisation. Water resources and methods of Irrigation.

Mineral resources and economic development. Fisheries and their prospects. Forest resources and air pollution. Power—resources and power crisis in India. Size and growth rate of Population. Occupational structure. Population growth and economic progress.

(10 lectures + 2 tutorials)

4. Agricultural Problems :

Place of agriculture in the national economy. Progress of agriculture since 1951. Food Problem Govt.'s policy. Land reforms—ceilling on land holding—Green Revolution Size of the farms co-operative farming. Problem of rural credit—Role of co-operative system. Agricultural marketing—co-operative marketing—State trading in food grains—FCI.

(10 lectures + 2 tutorials)

5. History of Co-operative movement in India :

Different types of co-operative organisation—their role. Place of co-operation in National Planning. (2 lectures + 1 tutorial)

6. Industrial Problem :

Need for industrial progress of the country, Major obstacles to industrial progress. Government's Industrial policy. Justifiability of increasing role of public sector in India's industrial structure. Main features of India's industrial structure—changes during the plan period—over-all progress of industrialisation since 1951.

Traditional and small scale industries their place and problems—Measures for assistance to small and cottage industries during the plan period.

Role of private sector in the industrial structure of the country. Regulation of monopolies. Objectives of Industrial licensing policy of the Government and their fulfilment.

(12 lectures + 2 tutorials)

7. Industrial Finance :

Problem of finance in the public sector and private sector. Different organisations for supplying the finance—their organisations and functions. Role of foreign capital. Government's policy regarding foreign capital and foreign loans. (8 lectures + 2 tutorials)

8. Labour Problems :

Agricultural labour—measures to improve employment in agriculture. Wages of agricultural labour.

Industrial labour—measures to improve wages and working conditions. Nature of unemployment in India—some remedial measures.

Trade-union movement progress and problems. Industrial disputes—causes and methods of settlement. (10 lectures + 2 tutorials)

9. Monetary System :

Structure of Indian money market. Currency system. Banking structure Reserve Bank, State Bank, Commercial Banks, Co-operative Banks. Regional Rural Banks—organisation and functions. Reasons for the nationalisation of commercial banks, Reserve Bank's Credit control measures. (8 lectures + 2 tutorials)

10. **Monetary Policy :**

Trend of price rise in the country since 1956. Causes of inflation and recession during the plan period. Measures of price control. Public distribution of essential consumer goods. (6 lectures + 1 tutorial)

11. **Public Finance :**

Revenue and expenditures of the central and State Government (West Bengal), Centre-State financial relation.

Indian Tax structure, Some important taxes. Problem of Public debt including external debt and loans from International Monetary Fund. (10 lectures + 2 tutorials)

12. **Foreign Trade :**

Changes in the pattern and direction of India's foreign trade since independence. Trend in balance of payments and foreign exchange reserves since 1951. Measures of correct balance of payment deficits. Currency devaluation and its effects (5 lectures + 1 tutorial)

RANCHI UNIVERSITY

B.COM. (PASS)

Paper II : Economic Development of India (100 Marks)

1. Features of Indian Economy.
2. Population—Growth and distribution—the problem of over-population—the problem of unemployment—population policy.
3. National Income—its size and variation.
4. Development of Agriculture—Land reforms—problems of Indian agriculture—size of holdings—sub-division and fragmentation—consolidation of holdings—types of farming, Subsistence, Co-operative and Collective—Food Problem—problems of agricultural labour—Agricultural marketing—Financing of Agriculture.
5. Co-operative movement—growth and structure of movement—current trends.
6. Agriculture under the Plans.
7. Development of major industries—Cotton Textiles, Iron & Steel, Sugar, Jute and Coal.
8. A brief survey of the Cottage and village industries and future possibilities.
9. Industrial Policy.
10. The Development of Rail, Sea, Road and Air Transport—future possibilities—co-ordination between different forms of Transport.
11. India's Foreign Trade and Commercial Policy since the Second World War.
12. The Five Year Plans—Objectives and Sources of Finance.

CALCUTTA UNIVERSITY

1986

B.A. (PASS) : SECOND PAPER

Group—A

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) জনবিস্ফোরণ বলিতে কি বুঝায় ?

(খ) দারিদ্র্য-সীমা বলিতে তুমি কি বুঝ ?

(গ) পুনর্নবীকরণযোগ্য ও নবীকরণ সম্ভব-নয় এরূপ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে প্রভেদ, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।

(ঙ) শ্রমবিভাগ ও বাজারের বিস্তৃতির মধ্যে সম্পর্ক কি ?

(চ) গঠনগত বেকারত্ব কাহাকে বলে ? দুইটি উদাহরণ দাও।

(ছ) পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি বলিতে কি বুঝায় ?

(জ) ভারতের আর্থিক বিকাশে আঞ্চলিক বৈষম্যের দৃষ্টান্ত দাও।

(ঝ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(ঞ) "জনসংখ্যার ফাঁদ" বলিতে কি বুঝায় ?

(ট) ভারতে পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থানের চারটি প্রধান উৎসের নাম উল্লেখ কর।

(ঠ) স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের যে-তিনটি মূল চাবিকাঠি আছে তাহাদের নাম বল।

(ড) ১৯৬৯ সালের 'একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায়' সঙ্কোচনমূলক আচরণ আইনের মূল উদ্দেশ্য কি ?

(ঢ) 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' কাহাকে বলে ?

(ণ) উন্নয়নের জন্য আমদানি ও উৎপাদন বজায় রাখার জন্য আমদানির পার্থক্য কি ?

Group—B

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে সাধারণ উপাদানগুলি ক্রিয়াশীল সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। নূতন নূতন উদ্ভাবনের প্রয়োগ ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কিভাবে স্বয়ং-পোষিত হইতে সাহায্য করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৪। কোনও অর্থ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 'সমতা' বলিতে কি বুঝায় ? এই প্রসঙ্গে উন্নয়নের সময় কৃষি ও শিল্পের আপেক্ষিক ভূমিকার পর্যালোচনা কর।

৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর বলিতে কি বুঝায় ? এই প্রসঙ্গে রস্টো (Rostow) বর্ণিত উন্নয়নের পাঁচটি স্তর পর্যালোচনা কর।

৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাত্রা শুরু করার সমস্যা কি ? উন্নয়নের কৌশলরূপে 'জোর ধাক্কা' তত্ত্ব অথবা 'একান্ত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম প্রচেষ্টা' তত্ত্ব আলোচনা কর।

৭। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৮। ভারতের ন্যায় জরাজীর্ণ পুঁজি ঘাটতি দেশে উৎপাদনের কলাকৌশল নির্বাচনের সমস্যাগুলি পর্যালোচনা কর।

৯। প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের কাজে নিয়োগ করিয়া কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি করা যায় কি ? ভারতের ন্যায় দেশে এই কাজে কি কি ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তাহা আলোচনা কর।

১০। শিল্পক্ষেত্রে যৌথ সেক্টর সম্পর্কে ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি কি? ইদানীং কালে দেশের শিল্পোন্নয়নে যৌথ সেক্টরের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

১১। পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কি হারে বাড়িয়াছে তাহা উল্লেখ কর। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার কিছু মাত্রায় অস্থির কেন?

B.A. (PASS) : THIRD PAPER

Group—A

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) ১৯৭১-৮১, এই দশকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার কত ছিল?

(খ) ১৯৮১ সালের লোকগণনা অনুসারে ভারতে জনসংখ্যার কত শতাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত রয়েছে?

(গ) 'রবিশস্য' কাকে বলে?

(ঘ) শিল্প রুগ্নতার একটি লক্ষণ উল্লেখ কর।

(ঙ) শিল্প বিরোধের দু'টি কারণ উল্লেখ কর।

(চ) পশ্চিমবঙ্গে সরকারের রাজস্বের দু'টি উৎস উল্লেখ কর।

(ছ) 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' কাকে বলে?

(জ) ভারতে শক্তি উৎপাদনের দু'টি প্রধান উৎস নির্দেশ কর।

(ঝ) বর্তমান ভারতে কোন্ রাজ্যে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে কম?

(ঞ) 'দারিদ্র্য রেখা' বলতে কি বোঝায়?

(ট) জাতীয় অর্থনীতির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্র বলতে কি বোঝায়?

(ঠ) 'ভরণপোষণ ভিত্তিক কৃষি' বলতে কি বোঝায়?

(ড) ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের দু'টি কারণ নির্দেশ কর।

(ঢ) 'প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা' কাকে বলে?

(ণ) 'ঘাটতি ব্যয়' বলতে কি বোঝায়?

Group—B

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। ভারতের কৃষি-অর্থনীতির গঠন বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। বৃহদায়তন শিল্পের অর্থসংস্থানের বর্তমান ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।

৪। ভারতে শিল্পবিরোধের মীমাংসার ব্যবস্থাটি বর্ণনা কর।

৫। ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকাটি আলোচনা কর।

৬। ভারতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির বিবরণ দাও ও দুর্বলতাগুলি উল্লেখ কর।

৭। পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা নির্দেশ কর এবং সে পরিবর্তনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৮। পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯। ভারতের কর-কাঠামোর বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

১০। ভারতে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের সমস্যাটি আলোচনা কর।

১১। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে কম উৎপাদনশীলতার কারণ কি কি? এই সমস্যার সমাধানে সবুজ বিপ্লব কতটা কার্যকরী হইয়াছে?

1987

B.A. (PASS) : SECOND PAPER

Group—A

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' বলিতে কি বুঝায়? (খ) প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বলিতে কি বুঝায়? (গ) এক্স-দক্ষতা বলিতে কি বুঝায়? (ঘ) ১৯৫২ সালে ভারতে শিল্প-লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যগুলি নির্দেশ কর। (ঙ) ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা হইতে কাঠামোগত কর্মহীনতার দু'টি উদাহরণ দাও। (চ) বিগত দশকে ভারতের জাতীয় আয়ের গড়পড়তা বৃদ্ধির হার নির্দেশ কর। (ছ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে রস্টো-বর্ণিত পাঁচটি স্তর কি কি? (জ) 'ভারসাম্যবিহীন উন্নয়ন' বলিতে কি বুঝায়? (ঝ) টাকার অবমূল্যায়ন বলিতে কি বুঝায় এবং স্বাধীনতার পর কখন ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন হয়? (ঞ) কেন প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্য কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় নয়? (ট) কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে সাধারণ উপাদানগুলি ক্রিয়াশীল সেগুলির একটি তালিকা রচনা কর। (ঠ) ভারতীয় করব্যবস্থা হইতে উপযুক্ত উদাহরণসহযোগে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (ড) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহে ঘাটতি ব্যয় কিভাবে সাহায্য করে? (ঢ) কোন অর্থনীতিতে 'সেবাসৃষ্টিকারী (tertiary) ক্ষেত্র' বলিতে কি বুঝায় উদাহরণসহ লেখ। (ণ) 'দারিদ্র্যরেখা' বলিতে কি বুঝায়?

Group—B

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। শ্রমবিভাগের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। শ্রমবিভাগের ফলে কিভাবে শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায় আলোচনা কর।

৩। প্রযুক্তিগত উন্নতির ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। এই প্রসঙ্গে উদ্ভাবন ও তাহার বাণিজ্যিক প্রবর্তনের পার্থক্য নির্দেশ কর।

৪। মূলধন-গঠন বলিতে কি বুঝায়? মোট এবং নীট মূলধন গঠনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন গঠনের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের 'ক্ল্যাসিক্যাল' তত্ত্বটি পর্যালোচনা কর। তুমি কি মনে কর বর্তমান বিশ্বের কিছু কিছু অঞ্চলে এই তত্ত্বটির কিছু প্রাসঙ্গিকতা আছে?

৬। উন্নয়নশীল দেশগুলি হইতে যথাযোগ্য উদাহরণ সহযোগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

৭। বৈদেশিক সহায়তা কি কি বিভিন্ন আকারে আসে? এই সাহায্যে একটি অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করিতে কতখানি সহায়ক হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৮। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অর্থসংগ্রহের মূল অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি নির্দেশ কর। এই প্রসঙ্গে ঘাটতি ব্যয় ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করে তাহা বিশ্লেষণ কর।

৯। অনুন্নত অর্থ-ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? 'ভারতের অর্থব্যবস্থা একটি উন্নয়নশীল অর্থ-ব্যবস্থা'—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

১০। ভারতে একচেটিয়া কারবারের প্রসার ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। এই ঝোঁকগুলি প্রতিহত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

১১। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যগুলি এবং উদ্দেশ্য সাধনের উপায়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

B.A. (PASS) : THIRD PAPER

Group—A

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) 'খারিফ' শস্য বলিতে কি বোঝায় ? (খ) কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে তফাৎ কোথায় ? (গ) শিল্পে যৌথ-ক্ষেত্র (জয়েন্ট সেক্টর) কাকে বলে ? (ঘ) ভারতীয় রপ্তানির চিরাচরিত পণ্যবহির্ভূত দুইটি পণ্যের উল্লেখ কর। (ঙ) 'সবুজ বিপ্লব' কি ? (চ) ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান কত শতাংশ ? (ছ) দারিদ্র্য-রেখার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার আনুমানিক শতাংশ কত ? (জ) 'কালো টাকা' কি ? (ঝ) ভারত সরকারের করজনিত রাজস্বের মূল উৎসের দুইটি উল্লেখ কর। (ঞ) পরিকাঠামো বলিতে কি বোঝায় ? (ট) 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' কি ? (ঠ) 'রুগ্ন শিল্প' কাকে বলে ? (ড) 'ভরণপোষণ' ভিত্তিক কৃষি বলিতে কি বোঝায় ? (ঢ) 'বাজেট ঘাটতি' কাকে বলে ? (ণ) 'কাজের জন্য খাদ্য' কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল ? (ত) 'সেবামূলক সমবায়' কাকে বলে ? (থ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্বের দুটি উৎসের উল্লেখ কর। (দ) ১৯৮৬ সালে ভারতের আনুমানিক খাদ্য শস্য উৎপাদন কত ? (ধ) আজকাল ভারতের চারটি প্রধান রপ্তানী দ্রব্যের নাম কর। (ন) ভারতে শিল্পের মূলধনের প্রধান উৎসগুলি কি কি ?

Group—B

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। ভারতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

৪। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের ফলাফল কি কি ?

৫। ভারতীয় কর কাঠামোটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতাগুলি আলোচনা কর।

৭। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আর্থিক উৎসগুলির বণ্টনে কি কি নীতি অনুসৃত হয় ? এই নীতিগুলির পুনঃনির্ধারণ করার প্রয়োজন আছে কি ?

৮। ভারতে ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি বিষয়ে সংক্ষেপে বিবরণ দাও।

৯। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যগুলি আলোচনা কর।

১০। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

1988

B.COM. (HONS.) : SECOND PAPER

ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA

যে-কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। ১৯৫১ সাল হইতে ভারতের অর্থনীতির যে কাঠামোগত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

২। ভারতের কর ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। তুমি কি মনে কর যে, কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য করা উচিত ?

৩। "ভারতবর্ষে শিল্পবিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিগুলিতে ঐচ্ছিক নিষ্পত্তি অপেক্ষা আবশ্যিক নিষ্পত্তির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।"—আলোচনা কর।

৪। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৫। "ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন, ধনী কৃষকদের উপকার করিয়াছে।"—সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

৬। ভারতের কার্পাস শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর। ইহার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা সম্পর্কে মন্তব্য কর।

৭। ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার কি পরিমাণে পরোক্ষ কর ও ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবহার করিয়াছেন এবং উহার ফলে (ক) জাতীয় আয়ের হারবৃদ্ধি এবং (খ) আয় বণ্টন কি ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে ?

৮। সাম্প্রতিক কালে ভারতে মূল্যাস্তর বৃদ্ধির কারণগুলি পর্যালোচনা কর। এই মূল্য বৃদ্ধির কতটা ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য হইয়াছে ?

৯। ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কার্যের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

১০। ভারতের বর্তমান বেকার সমস্যার বিশেষ করিয়া 'শিক্ষিত বেকার' সমস্যার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

১১। সাম্প্রতিক কালে ভারতের লেনদেন হিসাব প্রতিকূল হওয়ার কারণগুলি পর্যালোচনা কর। এই প্রসঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১২। ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয়করণের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যগুলি কতটা সফল হইয়াছে ?

১৩। যে কোনো দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) ভারতের অর্থব্যবস্থায় 'কালো টাকার' সমস্যা

(খ) নাবার্ড

(গ) ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ

(ঘ) ভারতে মিশ্র অর্থনীতি

(ঙ) ভারতে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী।

1989

B.COM. (HONS.) : SECOND PAPER

ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA

যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও

১ স্বল্পোন্নত অর্থব্যবস্থা প্রসঙ্গে দ্বৈতবাদ বলতে কি বোঝায় ? এর ফলাফল কি ?

২. সাম্প্রতিক কালে ভারতের জনসংখ্যার বহর ও বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ দাও।

৩. ভারতের অর্থনীতিতে সবুজ বিপ্লবের ফলাফল কি হয়েছে তার একটি বিবরণ দাও।

৪ ভারতে সাম্প্রতিক কালে সামগ্রী উৎপাদনে মন্থর বৃদ্ধি কিন্তু সেবামূলক কার্যে দ্রুততর বৃদ্ধি ঘটেছে। এই প্রবণতা তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ?

৫. ভারতে বর্তমান কর ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬. বর্তমানে কি কি ধরনের শস্য ভারতে উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা কর। তোমার মতে শস্যের এই ধরন নির্ধারণ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করছে ?

৭. ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর।

৮. ১৯৬৫ সালের পরবর্তী কালে ভারতে শিল্প বৃদ্ধির হারে মন্থরতার প্রধান কারণগুলি কি ?

৯. ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মসৃষ্টির এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিকেন্দ্রীকরণে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০. রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ধারণা ভারতের পক্ষে কেন উপযোগী নয় বলে বিবেচিত হয়েছে তাহা আলোচনা কর।

১১. ঘাটতি ব্যয়ের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার আলোচনা কর।

১২. কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের ব্যাপারে একটি নিবন্ধ লেখ।

১০. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনো দুইটির উপর টীকা লেখ।

(ক) মুচলেকাবন্ধ মজুর প্রথার অবসান ;

(খ) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ;

(গ) ভারতের কৃষিপণ্যের বিপণন ;

(ঘ) শিক্ষিত বেকার ;

(ঙ) বহুজাতিক সংস্থা ও ভারত ;

(চ) ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ।

1990

B.COM. (HONS.) : SECOND PAPER

ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA

যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নকালে কি প্রকারের কাঠামোগত পরিবর্তন তুমি প্রত্যাশা কর? ভারতে কি সেই ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

২। 'ভারতের পাটশিল্প একটি সমস্যাজর্জরিত ক্ষেত্র।'—আলোচনা কর।

৩। ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলির নিম্নমানের কৃতকর্মের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪। ভূমি সংস্কার কাহাকে বলে? স্বাধীনতার পর অবলম্বিত ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৫। ভারতবর্ষে কৃষিশ্রমিকদের উন্নয়নেব জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলির সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

৬। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকসংঘ যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে তাহা আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি আলোচনা কর।

৭। ভারতীয় অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা কর। মূল্যস্তর স্থির রাখতে সরকার সাম্প্রতিককালে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে?

৮। ভারতের লেন-দেনের উদ্বৃত্তের সমস্যার কারণগুলি কি? ইহার সমাধানের সরকার সাম্প্রতিককালে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে?

৯। ভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্যসমূহ কি? কতদূর সেই সমস্ত লক্ষ্যগুলি সফল হইয়াছে?

১০। ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণ কেন করা হইয়াছিল? কতদূর সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে?

১১। ভারত সরকাবের বর্তমান শিল্পনীতি আলোচনা কর।

১২। রুগ্নশিল্প বলিতে কি বুঝায়? ইহার কারণগুলি কি? ইহার সমাধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।

১৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে-কোনো দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী ;

(খ) ভারতীয় অর্থনীতিতে ঘাটতি ব্যয় ;

(গ) ভারতীয় অর্থনীতিতে 'কালো টাকার' সমস্যা ;

(ঘ) আমদানি-রপ্তানী ব্যাঙ্ক ;

(ঙ) কৃষিক্ষেত্রের উপর কর ;

(চ) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন।

BURDWAN UNIVERSITY

1987

B.Com. (PASS) : THIRD PAPER

যে-কোনো ছ'টি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। উন্নয়নশীল দেশ রূপে ভারতের অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। ভারতের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা কৌশল পর্যালোচনা কর।

৩। ভারতের মোট এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় কত ? ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন আলোচনা কর। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যা দাও।

৪। পরিকল্পনাকালে ভারতীয় কৃষির অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা কর।

৫। সমবায় চাষ বলতে কি বুঝ ? ভারতে এর ভূমিকা ও অগ্রগতি বিচার কর।

৬। ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

৭। ভারতে কৃষি-ঋণ যোগানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকার সমালোচনা লিখ।

৮। ভারতে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাগুলির পরিচয় দাও।

৯। ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সমস্যা ও সুযোগ সুবিধা সমূহ সৃষ্টির অগ্রগতি পর্যালোচনা কর।

১০। ভারতীয় পাটশিল্পের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ কর।

১১। ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

১২। নিম্নলিখিত যে কোনো দুটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ

(ক) শিল্প ঋণ

(খ) ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

(গ) যৌথ দর কষাকষি

(ঘ) ফিনান্স কমিশন।

1988

B.Com. (PASS) : SECOND PAPER

RESOURCE AND ECONOMIC PLANNING

যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। উপকরণ সম্বন্ধীয় মানুষের ধারণা যে চাহিদা ও যোগ্যতা হইতে অবিচ্ছেদ্য- একান্তভাবে একটি কার্যকারিতানির্ভর ধারণা, এই বক্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণ কর।

২। প্রকৃতির কয়েকটি আপাত বিরোধী স্বভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। পরিবেশের সংজ্ঞা দাও। সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের কার্যকারিতা নির্ণয় করে ?

৪। সম্পদসৃষ্টিকারী উপাদানগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

৫। ভারতে জনসংখ্যা বণ্টনে প্রাকৃতিক কারণগুলি কি কি ?

৬। ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাসমূহ আলোচনা কর।

৭। পরিকল্পনায় সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৮। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পরিকল্পনার পরিধি ও সুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

৯। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ (যে কোন দুটি) ঃ

(ক) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা ;

(খ) সার্বিক পরিকল্পনা ও আংশিক পরিকল্পনা ;

(গ) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ।

B.Com. (PASS) : THIRD PAPER

ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDIA

যে কোনো ছ'টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। আর্থিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা কর।

২। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রধান ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ কর।

৩। পরিকল্পনাকালে ভারতে ক্রমবর্ধমান আয়বণ্টনের বৈষম্য তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পার?

৪। ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার প্রধান কারণগুলি কি কি? ওগুলির নিরাকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা কর।

৫। ভারতে সমবায় আন্দোলনের সমস্যাগুলি কি কি? প্রতিকার নির্দেশ কর।

৬। ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। পরিকল্পনা-কালে এখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিচয় দাও।

৭। ভারতীয় কৃষির যান্ত্রিকরণের পক্ষে যুক্তি দেখাও। এর সঙ্গে কি কি সমস্যা জড়িত?

৮। ভারতের গ্রামীণ ঋণ সমস্যাটি পর্যালোচনা কর। এক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকার পরিচয় দাও।

৯। ভারতের তুলাবস্ত্র শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে যা জান লিখ।

১০। ভারতের কয়লাশিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনা কর। ইহার সাম্প্রতিক অবস্থা কিরূপ?

১১। ভারতে শিল্পরুগ্নতার কারণগুলি আলোচনা কর। কিরূপে ইহা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করিতেছে?

১২। নিম্নলিখিত যে কোনো দু'টির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) ভারতে শ্রমিক সংঘ ;

(খ) জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ;

(গ) ন্যূনতম মজুরি ;

(ঘ) দ্বৈত অর্থব্যবস্থা।

B.A. (PASS) : SECOND PAPER

বিভাগ খ

৭। অর্থনৈতিক উন্নতি বলিতে কি বোঝ? অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

৮। অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধাগুলি আলোচনা কর।

৯। স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা আলোচনা কর।

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন দুইটি) :

(ক) বড় ধাক্কা তত্ত্ব।

(খ) সুষম সম্প্রসারণ।

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর।

B.A. (PASS) : THIRD PAPER

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ঋণ নিয়ন্ত্রণে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

২। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩। ভারতের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য কি কি? এই পরিকল্পনার রণকৌশল পরীক্ষা কর।

৪। ভারতের পাট শিল্পের সমস্যাগুলি আলোচনা কর। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের মূল্যায়ন কর।

৫। ভারতের শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সবলতা, দুর্বলতা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলি আলোচনা কর।

৬। পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন এবং গতি প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন এসেছে সেগুলি বর্ণনা কর।

৭। দারিদ্র্যদূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ব্যাখ্যা কর। "সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর" ওপর তোমার মন্তব্য দাও।

৮। ভারতের শিল্পের উন্নতিতে বৈদেশিক সাহায্য এবং সহযোগিতার ভূমিকা আলোচনা কর।

৯। ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন বর্ণনা কর। পরিকল্পনাকালে ভূমি সংস্কারের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা-গুলির অগ্রগতি কতদূর হয়েছে তার মূল্যায়ন কর।

১০। যে কোন দু'টির ওপর টীকা লিখ :

(ক) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক।

(খ) কৃষির যন্ত্রীকরণ।

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর ভারতের বৃহৎ এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ।

(ঘ) ন্যূনতম প্রয়োজন কর্মসূচী।

B.A. (HONS.) : FOURTH PAPER

১। ভারতে মাথাপিছু আয়ের অগ্রগতি যে প্রায়ই পরিকল্পিত লক্ষ্যের তুলনায় পশ্চাদ্‌বর্তী তা দেখাও। এই পশ্চাদ্‌বর্তিতার কারণ কি?

২। পরিকল্পনাকালে অর্থনীতিতে মোটামুটি অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতে পেশাগত কাঠামোর আপেক্ষিক নিশ্চলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। ভারতে সম্প্রতি প্রবর্তিত প্রধান প্রজাস্বত্ব সংস্কারগুলি কী? কৃষি উৎপাদনশীলতাকে তা কীভাবে প্রভাবিত করেছে?

৪। ভারতে গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি আলোচনা কর।

৫। ভারতের কৃষি উন্নয়নে নূতন প্রযুক্তি কৌশলের ভূমিকা আলোচনা কর। এই প্রযুক্তি কৌশল কি কৃষিতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করেছে? তোমার উত্তরের যাথার্থ্য দেখাও।

৬। ভারতের অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগের ভূমিকার সমালোচনামূলক বিচার কর। কতিপয় সরকারী উদ্যোগের বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তরিত করার যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

৭। ভারতের শিল্পায়নে IDBI-এর ভূমিকার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন কর।

৮। ভারতে শিল্প বিরোধের মূল কারণগুলি কি? শিল্প বিরোধ সমাধানের বর্তমান ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিচার কর।

৯। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে দেনা-পাওনার প্রধান প্রবণতাগুলি আলোচনা কর এবং এই প্রেক্ষাপটে সপ্তম পরিকল্পনার বহির্বাণিজ্য কৌশল কতটা যুক্তিযুক্ত বিচার কর।

১০। ভারতে সম্প্রতি প্রচলিত দারিদ্র্য অবসানের বিভিন্ন কার্যক্রমগুলির সমীক্ষা কর।

১১। সপ্তম পরিকল্পনার ঘোষিত লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে ঐ পরিকল্পনার প্রয়োগ কৌশলের পর্যাপ্ততা বিচার কর।

১২। ১৯৮৮-৮৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী? এই বাজেট মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক কিনা মন্তব্য কর।

1989

B.COM. (PASS) : THIRD PAPER

ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDIA

যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখ

১। উন্নয়নশীল অর্থনীতি বলতে কি বুঝ? উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসাবে ভারতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা কর।

২। সপ্তম পরিকল্পনাকালে ভারতে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার কর।

৪। সমবায় চাষ বলতে কি বুঝ? ভারতে এরকম চাষের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। এই চাষের সমস্যাগুলি কি কি?

৫। ভারতের কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা আলোচনা কর। এদের সমস্যাগুলি কি কি?

৬। গ্রামীণ ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকার সমালোচনা কর।

৭। ভারতের কৃষি-পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলি বর্ণনা কর। এই প্রসঙ্গে সরকারী নীতির পরিচয় দাও।

৮। ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ সুযোগ সুবিধাগুলির সমস্যাদি পর্যালোচনা কর।

৯। ভারতের লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ কর।

১০। ভারতের কয়েকটি প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের নাম লিখ। সাম্প্রতিককালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

১১। ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক পর্যালোচনা কর।

১২। যে কোনো দুটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:

(ক) পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প;

(খ) ভারতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন;

(গ) ভারতে কৃষির যান্ত্রিকরণ;

(ঘ) ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য।

B.A. (PASS) : THIRD PAPER

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। স্বল্পোন্নত অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিকে কি স্বল্পোন্নত অর্থনীতি বলা যায়? তোমার উত্তরের যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা কর।

২। পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা কর। ভারতবর্ষে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি কি কি?

৩। ভারতবর্ষের পটভূমিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কটি বিশ্লেষণ কর।

৪। ভারতবর্ষে কৃষি-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তুমি অন্যান্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ কর?

৫। ভারতের গ্রামীণ ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সংস্থাগুলি বর্ণনা কর। গ্রামীণ ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকাটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই সমস্ত শিল্পের ভূমিকা আলোচনা কর।

৭। ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশনের গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও, মূল্যায়ন কর।

৮। সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণগুলি ব্যাখ্যা কিভাবে করা যেতে পারে ? র্ষের সংক্ষিপ্ত

৯। ভারবর্ষের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিকল্পনা-কৌশলটি ব্যাখ্যা কর। এই পা৯ সংগ্রহের উৎসগুলি আলোচনা কর।

১০। নিম্নলিখিত যে কোন দুটির ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) ভারতের শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সহযোগিতার ভূমিকা ;

(খ) ভারতবর্ষের পটভূমিতে-দারিদ্র্য-সীমারেখা' ;

(গ) পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ ;

(ঘ) যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্র।

1990

B.COM. (PASS) : THIRD PAPER

ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDIA

যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' কাহাকে বলে ? ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

২। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ কর :

৩। ভারতীয় কৃষির কম উৎপাদনশীলতার প্রধান কারণসমূহ কি কি ? সরকার এই কারণগুলি দূরে করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলির মূল্যায়ন কর।

৪। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যাগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। ভারতে সমবায় আন্দোলনের সমস্যাগুলি কি কি ; এইগুলি দূরীভূত করার ব্যবস্থাসমূহের সুপারিশ কর।

৬। ভারতে গ্রামীণ ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির ভূমিকা আলোচনা কর।

৭। ভারতের পাটশিল্পের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ কর। সমস্যাগুলির সাম্প্রতিক রূপধারা কিরূপ ?

৮। ভারতের শ্রমিক-সংঘগুলির আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৯। ভারতের শিল্পগুলির রুগ্নতায় কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। ইহা কিভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত করছে।

১০। ভারতের সুতিবস্ত্র শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন ও গতিপ্রকৃতি আলোচনা কর।

১২। নিম্নলিখিত যে কোন দুইটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) শিল্প অর্থসংস্থান, (খ) নাবার্ড, (গ) সর্বনিম্ন মজুরি, (ঘ) শিল্প শ্রমিক।

B.A. (PASS) : SECOND PAPER

বিভাগ—খ

৭। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

৮। রস্টোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্তরতত্ত্বটি বর্ণনা কর।

৯। স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলি আলোচনা কর।

১০। যে কোন দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) অর্থনৈতিক বিকাশে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা ;

(খ) প্রযুক্তিগত উন্নতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ ;

(গ) অসম উন্নয়ন তত্ত্ব ;

(ঘ) 'জোর ধাক্কা' তত্ত্ব।

B.A. (PASS) : THIRD PAPER

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে বিদেশী সাহায্যের প্রভাব আলোচনা কর।

২। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারতে যে ভূমিসংস্কার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং উহার ফলাফল পর্যালোচনা কর।

৩। ভারতে কৃষিশ্রমিকের আর্থিক অবস্থা বর্ণনা কর। তোমার মতে এই অবস্থার কারণ কি ?

৪। সামাজিক নিরাপত্তা কাকে বলে ? ভারতে শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৫। ভারত সরকারের বর্তমান শিল্পনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৬। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কী কী পদ্ধতিতে ঋণের পরিমাণগত ও গুণগত নিয়ন্ত্রণ করে ?

৭। ভারতের সমবায় ঋণ আন্দোলনের পর্যালোচনা কর।

৮। পরিকল্পনাকালে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন ও গতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বর্ণনা কর।

৯। ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যগুলি লিখ। এই উদ্দেশ্যগুলি কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে ?

১০। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অর্থসংস্থানের উৎস কি কি ? এই প্রসঙ্গে ঘাটতি অর্থসংস্থানের সীমাবদ্ধতাগুলি পর্যালোচনা কর।

NORTH BENGAL UNIVERSITY

1989

B COM. (PASS) : ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। তুমি কি মনে কর যে এই পরিকল্পনা কালে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

২। ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি ? এই উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কি পরিমাণ সাফল্য লাভ হইয়াছে ?

৩। ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভূমিকা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

৪। বর্তমান অবস্থায় ভারতে বৈদেশিক মূলধন সরবরাহে উৎসাহদান করার পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি দিয়া আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত সরকারের বর্তমান নীতি আলোচনা কর।

৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। স্বল্পোন্নত অর্থব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায় ? ভারতের বিশেষ উল্লেখসহ একটি স্বল্পোন্নত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৭। (ক) শিল্পের রুগ্নতা বলিতে কি বোঝায় ?

(খ) শিল্পের রুগ্নতার কারণগুলি কি ?

(গ) শিল্পের রুগ্নতা দূরীকরণের জন্য সরকার যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিয়াছে সেগুলি আলোচনা কর।

৮। ভারতের পাটশিল্পের গুরুত্ব ও সমস্যাগুলি আলোচনা কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর।

৯। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির আয়ের উৎস হিসাবে ঘাটতি অর্থসংস্থান কতটা কার্যকরী হইয়াছে ?

১০। টীকা লিখ (যে কোন দুইটি) :

(ক) ভারতের 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন'।

(খ) গ্রামীণ ব্যাঙ্কসমূহের কার্যাবলী।

(গ) ভারতে কৃষি পণ্য বিক্রয়ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ।

B.A (PASS) THIRD PAPER

১। যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) ভারতে পাট শিল্পের দুইটি সমস্যার উল্লেখ কর।

(খ) ভোগভিত্তিক কৃষি কাহাকে বলে ?

(গ) দ্বৈত অর্থব্যবস্থা কাহাকে বলে ?

(ঘ) ১৯৮১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতে গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যায় বণ্টন বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

(ঙ) দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণের ২টি কারণ কি কি ?

(চ) ঘাটতি অর্থব্যয় বলতে কি বোঝ ?

(ছ) (আই. আর. ডি. পি) সুসংহত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কি বোঝ ?

(জ) 'জমির উর্ধ্বসীমা' ধারণাটি বুঝিয়ে বল।

(ঝ) প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত বলিতে কি বুঝ ?

(ঞ) কৃষিতে নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ভারতে এখন যে কার্যসূচী নেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে দুটি প্রধান কার্যসূচীর উল্লেখ কর।

(ট) ভারতে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রব্যবসার পক্ষে দুটি যুক্তি দর্শাও।

(ঠ) ভারতে দারিদ্র রেখা বলিতে কি বোঝান হয়।

(ড) 'আই. এম্. এফ্.' এর কার্যাবলীর মধ্যে দুটি কাজের উল্লেখ কর।

(ঢ) 'শিল্প লাইসেন্স পদ্ধতি' বলিতে কি বুঝ ?

(ণ) 'অপূর্ণ' নিয়োগ বলিতে কি বুঝ ?

২। ভারতে দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি আলোচনা কর। সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে ?

৩। ভারতের লেনদেনের ব্যালান্সে ক্রমাগত ঘাটতির কারণ আলোচনা কর। ভারত সরকার ইহা দূরীকরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা করিয়াছে ?

৪। ভারতের শিল্পনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। দ্রুত শিল্পায়নের পক্ষে ইহা কতদূর সহায়ক ?

৫। সমবায়মূলক চাষের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৬। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা পর্যালোচনা কর।

৭। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি কি কি ? ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা সমালোচনা সাপেক্ষ কি ?

৮। ভারতে কৃষির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উন্নয়ন ধারা এবং কৃষকদের মধ্যে আয় বণ্টনের উপর 'সবুজ বিপ্লবে'র প্রভাব বর্ণনা কর।

৯। ভারতের শিল্প বিবাদ-এর মূল কারণগুলি কি লেখ। এই সমস্ত বিবাদ সমাধানের প্রধান কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা কর।

১০। ভারতে গত ১৫ বছরে সাধারণ মূল্যস্তরের গতিপ্রকৃতি বর্ণনা কর। এই গতিপ্রকৃতির কারণগুলি কি— তা আলোচনা কর।

১১। ভারতে বর্তমানে যে ধরনের কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক আছে—তা উল্লেখ কর। এই সম্পর্কে কোন পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তুমি কি মনে কর? যদি তা মনে কর, কেন কর, তা বর্ণনা কর।

১২। ভারতের বিশেষ উল্লেখ সহযোগে অনুন্নত দেশগুলির প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

B.Com. (HONS.) : EIGHTH PAPER.

বিভাগ—ক

যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। সংখ্যা বৃদ্ধি কি ভারতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের পথে প্রধান অন্তরায়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। শিল্পশ্রমিকদের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ আলোচন কর।

৩। সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্যের অগ্রগতির বিবরণ দাও।

৪। ভারতের কৃষিতে নতুন কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কব। এ কর্মপদ্ধতি কি সফল হয়েছে?

৫। স্বাধীনতার পব থেকে ভারতে শিল্পায়নের অগ্রগতিব একটি মূল্যায়ন কর।

৬। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কর-রাজস্ব বিভাজনের বর্তমান ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা কর।

৭। যে কোনও দুটির উপর টীকা লিখ:

(ক) স্বল্পোন্নত দেশ

(খ) বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ

(গ) স্ট্যাগফ্লেশন

(ঘ) ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক।

VIDYASAGAR UNIVERSITY

1989

B.A. (PASS) : THIRD PAPER

প্রথম প্রশ্নসহ (অনিবার্য) ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনো দশটির উত্তর:

(ক) অনুন্নত দেশের দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

(খ) ভারতের শ্রম-আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২৬ সালটি স্মরণীয় কেন?

(গ) অর্থনৈতিক জোতের ধারণাধি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কি?

(ঙ) অর্থ কমিশনের কাজ কি?

(চ) কালোটাকা কাহাকে বলে?

(ছ) শিল্পে রুগ্নতার কারণ কি?

(জ) মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে?

(ঝ) বহুজাতিক সংস্থা কি?

(ঞ) বেসরকারী শিল্পে অর্থসংস্থানের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি কি?

(ট) ভারতের আমদানীকৃত দ্রব্য সামগ্রীগুলির মধ্যে কোনটির উপর ব্যয় সর্বাধিক ?

(ঠ) জাতীয় শিল্প আদালতে কোন কোন বিরোধের মীমাংসা হয় ?

(ড) দাস (বন্ধ) শ্রম বলিতে কি বোঝায় ?

(ঢ) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অনুদান দেয় কেন ?

(ণ) বাধ্যতামূলক সালিসী কাহাকে বলে ?

২। ঘাটতি কর কাহাকে বলে ? আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি করের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব বর্ণনা কর।

৪। ভারত সরকারের শিল্প লাইসেন্স নীতির উদ্দেশ্যগুলি লিখ। এই উদ্দেশ্যগুলির কতখানি পূর্ণ হয়েছে ?

৫। পরিকল্পনাকালে ভারতে শিল্প কাঠামোর কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা লিখ।

৬। শিল্পে যে বিভিন্ন ধরনের অর্থের প্রয়োজন হয় তা বর্ণনা কর এবং এগুলির উৎসগুলি সম্পর্কে লিখ।

৭। ভারতে কৃষিতে কর্মহীনতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। ভারতে কৃষকের নিকট সাংগঠনিক ঋণের উৎসগুলি কি কি ? এই ধরনের ঋণের প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধাগুলি কি কি ?

৯। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা কর। এই উদ্দেশ্যগুলি কতটা সফল হয়েছে ?

১০। ভারতে স্বাধীনতার পর রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবং তার কারণগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১১। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য বণ্টনের ক্ষেত্রে যে সরকারী ব্যবস্থা আছে তার দোষ ও গুণগুলি লিখ।

ভারতের অর্থনীতির পরিচয়

বসাক
চক্রবর্তী